পঞ্চাশৎ-পরিক্রমা

পঞ্চাশৎ-পরিক্রমা

রবীন্দ্রপ্রয়াণোত্তর বাংলা সাহিত্য

গবেষণা-প্রকাশন বিভাগ
বিশ্বভারতী । শান্তিনিকেতন

ভূমিকা

কালকৃৎ স্বরূপ রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরবর্তী অর্ধ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যের কালান্তর কিভাবে ঘটল এই প্রশ্নের নানাবিধ উত্তর এই বইটিতে উপস্থাপিত। এই জাতীয় উত্তরগুলি প্রত্যেক পারদর্শী সাহিত্যালোচকের নিজস্ব। এবং পারদর্শিতা, যেটার মৌলিক অর্থ পরিণামদর্শনের সামর্থ্য, অত্যন্ত নিকটের সময়ের ওপরে সেই দখল আনতে পারে না যার দাবি করা চলে দূরের ইতিহাসের ওপর। তা ছাড়া, সময়ের অনবচ্ছিন্ন প্রবাহের মধ্য থেকে এই পঞ্চাশ বৎসরকে পৃথক করে দেখার একটা সমস্যা আছে, যা বৃহত্তর প্রেক্ষিতের দ্বারাই কেবল নিরাকৃত হতে পারে। মনে হয় এই বইটিতে প্রায় সমকলীন সাহিত্যের পথে দিক্ নির্ণয়নের চেষ্টা হয়েছে এই সকল কথা সচেতনরূপে মনে রেখে।

সাহিত্যের সাহচর্য আমি পেতে পারি কেবল মাত্র পাঠক হিসেবে। সুতরাং আমি পরমুখাপেক্ষী। তাই সমালোচকদের শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুধাবন করার চেষ্টা করি। এই গ্রন্থস্থ আলোচনাপ্রবাহ নানা চিন্তা মনে আনে।

এই প্রবন্ধসমূহে একটা লক্ষণীয় ব্যাপার দেখি : সাহিত্য সমালোচনার আত্মাপহার। এই বইটির আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে রয়েছে রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতা, উপন্যাস, ছোটোগল্প, নাটক, প্রবন্ধ ইত্যাদি, কিন্তু সাহিত্য সমালোচনার ইতিহাস অনুপস্থিত— অথবা আছে কেবল ততটুকু যা প্রবন্ধ বা রবীন্দ্রচর্চার প্রসঙ্গে এসে পড়েছে। যে তাত্ত্বিক ভিত্তির ওপর সংস্কৃত সাহিত্য-রস-সন্ধান বা আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্য আলোচনা প্রতিষ্ঠিত, সেই কাঠামোর অভাবে বাংলা সমালোচনা-সাহিত্য সৃষ্টিশীল লেখার তুলনায় দুর্বল হয়ে আছে কি ? যদি তাই হয় তবে সমালোচনার সমালোচনা বা আত্মানুসন্ধানের প্রয়োজন এই প্রবন্ধাবলীর দ্বারা অনুভূত হলে একটি সম্পাদ্য কর্ম সম্পন্ন হয়েছে ভাবা যেতে পারে।

আর একটি চিন্তা আসে এই প্রবন্ধগুলিতে নিহিত ইতিহাসের পথ বেয়ে। সেটা হলো রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির কালপারঙ্গমতার রহস্য। এখানে গ্রন্থিত প্রবন্ধগুলিতে দেখি, রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি 'সর্বত্রগামী' না হলেও তার প্রভাব প্রায়শ পড়েছে উত্তরকালে। তিনি উপস্থিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে, পূর্বপক্ষ বা উত্তরপক্ষ রূপে। ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে আমি জানি যে ঐতিহাসিকেরা সাধারণত মানুষকে ইতিহাসের সীমাবদ্ধতায় দেখতে অভ্যস্ত। ঐতিহাসিকদের কারবার দশক, শতাব্দী, বা কয়েক সহস্র বৎসরের মানবিক কৃতি ও তার বিনাশ নিয়ে। "কালজয়ী" বলে যে কথাটা যত্রতত্র প্রযুক্ত হতে দেখি চট্ করে তাঁরা সেটা মানতে চান না। এইখানেই একটা গোলমাল আছে। ঐতিহাসিকদের এই জ্ঞান অনেক সাহিত্যরসস্রষ্টাদের সম্বন্ধে সত্য নয়

বোধ হয় । এটা সত্য নয় বলেই ভবভূতির বিনয়ের অভাব, বিপুলা পৃথ্বী এবং নিরবধি কাল সম্বন্ধে সেই বিখ্যাত উক্তি । কেমন করে মানুষের সৃষ্টি ইতিহাসের সীমা পেরিয়ে উত্তরকালের মনকে স্পর্শ করে ?

রবীন্দ্রনাথের নিয়ত আত্মানুসন্ধানের মধ্যে বারংবার কালের প্রতি একটি জিজ্ঞাসা : কি রূপে ভবিষ্যৎ রবীন্দ্রনাথকে চিনবে ? এই চিন্তা যেমন জীবনের মধ্যগগনে, তেমন জীবনের সায়াহ্নে । যেমন 'চিত্রা'র যুগে ('আজি হতে শতবর্ষ পরে....' ২ ফাল্গুন ১৩২২/১৮৯৫) তেমনই 'সেঁজুতি'তে ('যখন রব না আমি মর্তকায়ায়...' ২৫ চৈত্র ১৩৪৩/১৯৩৬) আবার 'নবজাতক'-এ ('তোমরা রচিলে যারে নানা অলংকারে...' ২৫ বৈশাখ ১৩৪৬/১৯৩৯) কিংবা 'রোগশয্যায়' ('আমার কীর্তিরে আমি করি না বিশ্বাস', ২৮ নভেম্বর ১৯৪০) । চতুর্দিকে যশঃকীর্তনের ঊর্ধ্বে তাঁর চিন্তা সতত কালের নিরিখের প্রতি । "সংসারখেলার কক্ষে তাঁর/যে খেলনা রচিলেন মূর্তিকার/মোরে লয়ে মাটিতে আলোতে,/ সাদায় কালোতে/কে না জানে সে ক্ষণভঙ্গুর/ কালের চাকার নীচে নিঃশেষে ভাঙিয়া হবে চুর ।" তাই কবি সন্দিগ্ধ "ক্ষণেকতরে অমরের ভান" সম্বন্ধে, তিনি দেখেন থাকে শেষে "কালরাত্রি সব-চিহ্ন ধুয়ে-মুছে-ফেলা" । "তোমাদের জনতার খেলা/ রচিল যে পুতুলিরে/সে কি লুব্ধ বিরাট ধূলিরে/এড়ায়ে আলোতে নিত্য রবে" ? (২৫ বৈশাখ ১৩৪৬/১৯৩৯) । আরও নির্মম রূপে একই চিন্তা রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষ বৎসরে : "আমার কীর্তিরে আমি করি না বিশ্বাস/ জানি কালসিন্ধু তারে/ নিয়ত তরঙ্গাঘাতে/ দিনে দিনে দিবে লুপ্ত করি ।" (২৮ নভেম্বর ১৯৪০)

মৃত্যুর মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে রবীন্দ্রনাথ দু-এক কথা বলেছিলেন ইতিহাসের বদ্ধতা থেকে সৃষ্টির মুক্তি বিষয়ে । "আমরা যে ইতিহাসের দ্বারা একান্ত চালিত এ কথা বার বার শুনেছি এবং বার বার ভিতরে ভিতরে খুব জোরের সঙ্গে মাথা নেড়েছি । এ তর্কের মীমাংসা আমার নিজের অন্তরেই আছে, যেখানে আমি আর কিছু নই, কেবলমাত্র কবি । সেখানে আমি সৃষ্টিকর্তা, সেখানে আমি একক, আমি মুক্ত... । আপন সৃষ্টিক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ একা,...আমার অন্তরাত্মার কোনো রহস্যময় ইতিহাসের মধ্যে সে বিকশিত হয়েছিল এবং আপনাকে আপনার আনন্দরূপে নানা ভাবে প্রত্যহ প্রকাশ করছিল ।... সৃষ্টিকর্তা যে তাকে সৃষ্টির উপকরণ কিছু-বা ইতিহাস জোগায়, কিছু-বা তার সামাজিক পরিবেষ্টন জোগায়, কিন্তু এই উপকরণ তাকে তৈরি করে না । এই উপকরণগুলি ব্যবহারের দ্বারা সে আপনাকে স্রষ্টারূপে প্রকাশ করে ("সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা", মে ১৯৪১) । ইতিহাসকে অতিক্রম করে যে সৃষ্টি, কালসীমাবদ্ধতা থেকে তা মুক্তি পায় এবং তার চেয়ে বড়ো স্রষ্টার প্রাপ্তি "এ বিশ্বের নিত্যসুধা/ করিয়াছি পান" প্রতিপক্ষ কালের প্রতি কবির শেষ শান্ত উত্তর : "আমি জানি, যাব যবে/সংসারের রঙ্গভূমি ছাড়ি,/ সাক্ষ্য দেবে পুষ্পবন ঋতুতে ঋতুতে/ এ বিশ্বেরে ভালোবাসিয়াছি । এ ভালোবাসাই সত্য, এ জন্মের দান ।/ বিদায় নেবার কালে/এ সত্য অম্লান হয়ে মৃত্যুকে করিবে অস্বীকার ।" (২৮ নভেম্বর ১৯৪০)

বিশেষজ্ঞরা বিচার করবেন রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয় কালচেতনা ও চিন্তার মধ্যে কোথায়

লুকিয়ে আছে সেই রহস্যের চাবিটা, কেমন করে 'বহুযুগের ওপার হতে' কোনো সৃষ্টিশীল মন উত্তরকালের মনকে স্পর্শ করে, কোথা থেকে আসে সেই বিরল কালপারঙ্গমতা ।

সব শেষে, আর একটি প্রশ্নের উত্তর এষণীয় মনে করি । পৃথিবীতে মানবসভ্যতাকে সামগ্রিক রূপে মনে ধারণ করতে চাইলে, তাকে বিভিন্ন সংস্কৃতি বা মানব গোষ্ঠীর মধ্যে কথোপকথন রূপে কল্পনা করা চলে । এই কথোপকথন নিয়ত চলছে, সভ্যতা বিবর্তমান । কখনো কখনো এই মানব সভ্যতার কোনো কোনো অংশ যেন নীরব হয়ে যায়, তার কিছু বলার থাকে না । ভারতে ইংরেজ ঔপনিবেশিক রাজত্বের গোড়ার দিকে এমন একটা নীরবতা নেমে এসেছিল । ভারতের যে কণ্ঠস্বর পৃথিবীর ঐ কথোপকথনে আবার শোনা গেল নতুন করে বিংশ শতাব্দীতে, সেটা রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধীর । তাঁদের উচ্চারণের মধ্য দিয়ে ভারত-সভ্যতার নিজস্বতার প্রকাশ বিশ্বের কাছে পৌঁছলো নতুন বার্তা নিয়ে । অনুরূপ ভাবে সর্বভারতীয় সংস্কৃতির ঐকতানে যে কয়জন ধ্রুবপদ বেঁধে দিলেন তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ প্রধান একজন । এখন প্রশ্ন এই যে রবীন্দ্রোত্তর কালে বাংলা সাহিত্য-কৃতির কী বলবার আছে, কতটা এবং কি ভাবে এই সাহিত্যকৃতি ভারত উপমহাদেশের ও পৃথিবীর সৃজ্যমান সভ্যতার অংশভাক এবং স্রষ্টা । এই প্রশ্নের উত্তরের অন্বেষণ করতে বাংলা সাহিত্যের পরিধির বাইরে যাওয়া হয়তো দরকার । আশা করি ভবিষ্যতে এই বৃহত্তর পরিধির পরিক্রমা বিশ্বভারতীর গ্রন্থমালার আগামী কোনো প্রকাশনের লক্ষ্য হবে ।

এই সংকলনের সম্পাদনার কাজ যাঁরা করেছেন তাঁরা সুন্দর নাম চয়ন করেছেন, "পঞ্চাশৎ-পরিক্রমা" । তাঁদের নিবেদন : রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যকে যে অবস্থায় দেখে গিয়েছিলেন তার পর থেকে পঞ্চাশ বছরে তার অগ্রগতি ও পরিবর্তন কতখানি হয়েছে তার একটা হিসাব নেওয়াই ছিল এই গ্রন্থ প্রকাশের উদ্দেশ্য । প্রবন্ধগুলির বিন্যাস কালানুক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় পঁচিশ বছর —এই ধারায় করা হয়েছে ; একমাত্র ব্যতিক্রম লোকসাহিত্য-বিষয়ক একটি প্রবন্ধ । এই গ্রন্থ সম্পাদনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল প্রবীণ অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরীকে । তিনি কাজ আরম্ভ করে দিয়েছিলেন কিন্তু অধ্যাপক চৌধুরী শারীরিক ও অন্যান্য কারণে অপারগতা জ্ঞাপন করলে বইয়ের কাজ কিছুকাল স্থগিত থাকে । এ কাজ আবার আরম্ভ হয় অধ্যাপক ভবতোষ দত্ত এবং অধ্যাপক পশুপতি শাসমল-এর সম্পাদনায় । মুদ্রণের দায়িত্ব দেওয়া হয় বিশ্বভারতী গবেষণা-প্রকাশন বিভাগকে । এই বিভাগের অধ্যক্ষ অধ্যাপক সুব্রত চক্রবর্তী শুধু মুদ্রণে নয় সম্পাদনার কাজেও প্রভূত সাহায্য করেন ।

বিশ্বভারতী কলা ভবনের প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্তী এই গ্রন্থের প্রচ্ছদটি কারুমণ্ডিত করেছেন ।

প্রেসকপি প্রস্তুত করার কাজে রবীন্দ্রভবনের প্রাধিকারিক শ্রীদ্বিজদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের অকুণ্ঠ সহযোগিতা স্মরণীয় । বাংলা বিভাগের প্রাক্তন ছাত্রী শ্রীমতী হেনা সিংহ এবং বর্তমান গবেষিকাছাত্রী শ্রীমতী অঞ্জনা ঘোষের থেকেও যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া গিয়েছে । অধ্যাপক অশীন দাশগুপ্ত এবং অধ্যাপক শিশির মখোপাধ্যায় যখন উপাচার্য কার্যভারে নিযুক্ত ছিলেন, এই গ্রন্থের

পরিকল্পনা ও উৎসাহ দেওয়ার ব্যাপারে তখন তাঁরা অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন । আমি বিশ্বভারতীর পক্ষ থেকে এঁদের সকলকে, এই গ্রন্থের সুযোগ্য লেখকদের, এবং ব্যক্তিগতভাবে অধ্যাপক ভবতোষ দত্ত মহাশয়কে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি । আমার বিশ্বাস বঙ্গীয় বিদ্যানুরাগী সমাজ অনুরূপভাবে এঁদের অপরিমেয় ধন্যবাদার্হ বিবেচনা করবেন ।

সব্যসাচী ভট্টাচার্য
উপাচার্য

সূচীপত্র

পঞ্চাশৎ-পরিক্রমা

কবিতা

১

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পরবর্তী পঁচিশ বছরের আধুনিক বাংলা কবিতার ধারা ও বিস্তৃতি অনুসরণ করলে দেখা যাবে আশ্বস্ত হবার মতো বেশ-কিছু উপকরণ বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন কবির নির্মাণে ও উচ্চারণে ছড়িয়ে রয়েছে। দীর্ঘ ষাট বছরেরও অধিককাল কবিতার জগতে সক্রিয় থেকে কবিতার বিচিত্র ভুবন নির্মাণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, বহুমুখী ছন্দোবৈচিত্র্য ও বহুস্তরময় সুভাষিত পদাবলীতে পরিপূর্ণ তাঁর সৃজনশীলতার জগৎ, সমকালীন ও উত্তরকালের পাঠকচিত্ত অবাক বিস্ময়ে পৌঁচেছিল উপলব্ধির গভীরে। তৎসত্ত্বেও কাব্যজীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন তাঁর বিপুল কাব্যসমগ্র বহু বিচিত্র প্রকাশের উজ্জ্বল স্বাক্ষর রাখলেও সর্বত্রগামী হয় নি। প্রখর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এই কবিমনীষী বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর জীবদ্দশায় বাংলা কবিতায় যে নবত্বের আন্দোলন শুরু হয়েছিল তা তরুণ কবিদের রচনায় ক্রমশই একটি সংগঠিত রূপের প্রকাশকে অনিবার্য করে তুলেছিল। ক্রমশ দেখা গেল রবীন্দ্রনাথ ষাট বর্ষব্যাপ্ত কাব্যরচনার জগতে যে ঐতিহ্যের সৃষ্টি করেছিলেন তাকে স্বীকার করে নিয়েও কিছুটা স্বতন্ত্রভাবেই তিরিশের কবিদের সমকালে বাংলা কবিতার একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও ভিন্নতর রূপ প্রত্যক্ষগোচর হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের অব্যবহিত পরবর্তীকালের কবিদের অনেকেই ছিলেন মূলত রবীন্দ্রনাথের ভাবশিষ্য, আরো পরবর্তীকালের নজরুল মোহিতলাল যতীন্দ্রনাথ সমকালীন বাংলা কবিতায় যোগ করেছিলেন স্বতন্ত্র সুরের অনুরণন কিন্তু বাংলা কবিতা তখন পর্যন্ত যেন আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুতে এবং সমগ্রভাবে রূপের পরিবর্তনের অপেক্ষায় ছিল।

রবীন্দ্রনাথের তিরোধান চল্লিশ দশকের শুরুতেই এবং এই সময়ে তিরিশের কবিদের কবিতায় আধুনিকতা একটা স্পষ্ট চেহারা নিয়েছিল। এই সময়ের কবিদের অনেকেই পরেও বহুকাল পর্যন্ত অজস্র নতুন কবিতায় এই আধুনিকতাকে লালন ও সমৃদ্ধ করেছেন। জীবনানন্দ দাশ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত অমিয় চক্রবর্তী বুদ্ধদেব বসু বিষ্ণু দে তার দৃষ্টান্ত। চল্লিশ দশকে বয়োজ্যেষ্ঠ কবিদের পাশাপাশি দেখা দিলেন বেশ কয়েকজন তরুণ কবিও, সমর সেন সুভাষ মুখোপাধ্যায় যাঁদের অন্যতম। বস্তুত এই তরুণ কবিসমাজকে দশকব্যাপী কাব্যচর্চার মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে চিহ্নিত করবার মতো যথেষ্ট উপকরণ ক্রমশই সঞ্চিত হয়ে উঠেছিল। এই সময়কার বাইরের ঘটনাবলীও নানা কারণে স্মরণীয়। একটির পর একটি ঘটনায় বারবার বাংলাদেশের হৃদয় কেঁদে উঠেছিল। ১৯৪২-এর আগস্ট বিপ্লব, বিদেশী শোষণ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার দুঃখজয়ী সংগ্রাম ; এবং নৌবিদ্রোহের সেই স্মরণীয় কয়েকটি দিন এই সংগ্রামেরই শেষ পর্যায়। ১৯৪৬ চিহ্নিত হয়েছিল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভয়াবহতায় এবং ১৯৪৭-এর আগস্ট মাস ভারত বিভাগের ভিত্তিতে স্বাধীনতার উদ্‌বোধনের কাল। বাইরের এই ঘটনাবলী সর্বদাই যে প্রত্যক্ষভাবে বাংলা কবিতায় প্রভাব বিস্তার করেছিল তা নয় কিন্তু ১৩৫০-এর মন্বন্তর

ও দাঙ্গার ঘটনার আবর্তে বাঙালি কবিও যে গভীরভাবে ভাবিত ছিলেন সে সময়কার অনেক বাংলা কবিতা তার সাক্ষ্য।

বলতে পারা যায় ১৯৪২-এ কলকাতায় বোমা পড়লেও এবং ভারতীয় জোয়ানরা বিদেশী শাসকের অধীনে দলে দলে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন করলেও এই যুদ্ধের সমর্থনে বাঙালি কবিসমাজ কখনোই উদ্‌বুদ্ধ হতে পারেন নি। সুতরাং অন্য দেশে, যেমন ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা কিংবা রুশ দেশে এই সময়ে যে-রকম যুদ্ধকালীন কবিতা লেখায় কবিরা নিজেদের নিয়োজিত করেছিলেন বাঙালি কবিসমাজ কখনোই সে-রকমভাবে অনুপ্রাণিত হতে পারেন নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রায় সূচনাকাল থেকেই বাংলাদেশে নিয়ে এসেছিল ক্ষুধা ও মৃত্যু, দুর্ভিক্ষ ও মড়ক। মন্বন্তরের পটভূমিকায় লেখা বেশ-কিছু কবিতায় কবিপ্রাণের সাড়া পাওয়া গেল। অমিয় চক্রবর্তী প্রেমেন্দ্র মিত্র বিষ্ণু দে প্রমুখ অগ্রজ কবি থেকে শুরু ক'রে সমর সেন সুভাষ মুখোপাধ্যায় সুকান্ত ভট্টাচার্য পর্যন্ত প্রায় সমস্ত বিবেকবান কবি মন্বন্তর বা দাঙ্গার পটভূমিকায় কিছু-না-কিছু উল্লেখযোগ্য কবিতা লিখেছিলেন। তিরিশের বয়োজ্যেষ্ঠ কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'ফ্যান' ও অমিয় চক্রবর্তীর 'অন্নদাতা' উল্লেখ্য। এই দশকের কবিদের অন্যতম বিমলচন্দ্র ঘোষ জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র অরুণ মিত্র দিনেশ দাস মণীন্দ্র রায় মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের দাঙ্গা ও যুদ্ধের বিষয়কেন্দ্রিক কবিতায় পীড়িত মানবাত্মার মর্মান্তিক রূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে ১৯৪২ থেকে ১৯৪৭-এর মধ্যে নানা ঘটনায় বাংলাদেশ যেন প্রায় ছিন্নভিন্ন হতে চলেছে। মন্বন্তরের মতো ভয়াবহ ঘটনার দু'বছর আগেই রবীন্দ্রনাথের তিরোধান ঘটেছিল। কিন্তু তাঁর স্মৃতি, তাঁর আদর্শবাদ তখন পর্যন্ত বাঙালি কবির আশ্রয়স্থল, অন্তত অনুপ্রেরণার জন্যে তখন পর্যন্ত রবীন্দ্র-ঐতিহ্যই বাঙালি কবির অবলম্বন; রবীন্দ্রনাথের মতোই অন্যায়ের বিরুদ্ধে পীড়িতের স্বপক্ষে বাঙালি কবি সংগ্রামরত। কবিতাগুলোর তাৎক্ষণিক মূল্য কিছু অবশ্যই ছিল, আজ বাংলাদেশের পরিবর্তিত পটভূমিকায় হয়তো এই ধরনের কবিতা ইতিহাসের দলিলমাত্র; কিন্তু উচ্চারণে অন্বেষণে সেই সময়ের কবিতাবলী সৎ ও বিবেকচিহ্নিত ঐশ্বর্যে অনুপ্রাণিত বলতে পারা যায়। সমগ্র চল্লিশ দশকে যে-সব কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল তার সংখ্যা বড়ো অল্প নয়। আমার উল্লিখিত উক্তির সমর্থনে বিশেষভাবে স্মর্তব্য তরুণ কবিদের কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ: খোলা চিঠি (সমর সেন), নবজীবনের গান (জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র), দ্বিপ্রহর (বিমলচন্দ্র ঘোষ), সেতুবন্ধের গান (মণীন্দ্র রায়), ছাড়পত্র (সুকান্ত ভট্টাচার্য), অগ্নিকোণ (সুভাষ মুখোপাধ্যায়)। এই প্রসঙ্গে অবশ্যই উল্লেখ্য যে অস্থিরতা ও আবর্তসংকুল ঘটনাবলীর মধ্যেও ভিন্ন একটি গীতিরসের কাব্যধারা এই সময়েই লক্ষ্য করা যায়। অশোকবিজয় রাহা (রুদ্র বসন্ত), কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (সোনার কপাট), দিনেশ দাস (কবিতা ১৩৪৩-৪৮), হরপ্রসাদ মিত্র (পৌত্তলিক), পরমানন্দ সরস্বতী (দিগন্ত) এই সময়েই তাঁদের নতুন কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। এঁরা কোনো কাব্য-আন্দোলনের শরিক ছিলেন না, এঁদের কবিতাবলীতে সমাজমনস্কতারও দৃষ্টান্ত অপ্রতুল নয় কিন্তু এঁরা সমকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘটনায় সমর সেন সুভাষ মুখোপাধ্যায় অরুণ মিত্র মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় সুকান্ত ভট্টাচার্যর মতো তত চিন্তিত ছিলেন না বলে মনে হতে পারে। চল্লিশ দশকের পরিবেশ যে নানা দুর্যোগের লক্ষণাক্রান্ত এ কথার উল্লেখ আগেই করা হয়েছে, সমগ্রভাবে কবিতায় এর প্রভাব শুভ না হলেও এই সময়টাকে বৃহৎ পরিবর্তনের কাল হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। তিরিশ ও চল্লিশ দশকের কবিদের অধিকাংশই নাগরিক কবি হওয়ায় তাঁদের কবিতায়ও ছিল নাগরিকতার প্রতিফলন। কবিদের অধিকাংশই ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত এবং তাঁরা যে শুধু স্বদেশ ও স্বকালের ঘটনাবলীকে বিচার-বিশ্লেষণ করেছিলেন তাই নয়, রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারাকে অনুগমন করে মানবিকতা ও বিশ্ববোধ কবিকল্পনায় প্রসারিত হয়েছিল। এই সময়ের ইউরোপ ও এশিয়ার নানা দেশের ঘটনাবলীর চিন্তায়ও তাঁরা আলোড়িত হয়েছিলেন। সমকালীন ইংরেজ মার্কিন সোভিয়েত ও য়ুরোপীয় আধুনিক কবি ও লেখকদের সঙ্গেও তাঁদের প্রাণের যোগ অনেক পরিমাণে সম্ভব হয়েছিল। স্বদেশচিন্তার ক্ষেত্রে, মানবিক আদর্শের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে, তিরিশ ও চল্লিশের

কবিসমাজ অবশ্যই প্রথম পাঠ নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের কাছে। কবিতা রচনার ক্ষেত্রে, রবীন্দ্রপ্রভাব থেকে দূরে ভিন্ন কাব্যরীতির প্রবর্তনে অনেক পরিমাণে সফল হলেও কাব্যচর্চার ক্ষেত্রে শেষ বয়সেও রবীন্দ্রচিন্তার সক্রিয়তার দৃষ্টান্তসমূহ তরুণ কবিসমাজ বিস্মৃত হন নি। বিশেষত কাব্যজীবনের শেষের দিকেও নানা বিস্ময়কর পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক কাব্যরচনায় রবীন্দ্রপ্রতিভার ক্রিয়াশীলতা যেভাবে উম্মোচিত হয়েছিল তাতে ভাবিত হবার মতো উপকরণ লক্ষ্যগোচর না হওয়ার কারণ ছিল না। রবীন্দ্রনাথ যদি দীর্ঘকালের সাধনায়, বিশেষ করে তাঁর জীবনের শেষের দিককার বছরগুলোতে, পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বাংলা কবিতার নব-নব দিগন্তের রশ্মিরেখা না উম্মোচিত করতেন তা হলে একালের বাংলা কবিতার এই দ্রুত সার্থক রূপান্তর সম্ভব হত কিনা সন্দেহ। খুব সুখের বিষয়, এই রূপান্তর বিশ শতকের চতুর্থ ও পঞ্চম দশকে সমৃদ্ধতর হয়েছে। আধুনিক বাংলা কবিতা একদিকে যেমন গদ্য-পদ্যের সীমারেখাকে হ্রস্বতর করে এনেছে অন্য দিকে তেমনই সতর্ক পদান্বয়ে, ভাবের সংহতিতে, চিত্রকল্প ও রূপকের বাস্তবনিষ্ঠ বিস্তারে এবং প্রকরণগত বৈচিত্র্যে স্বতন্ত্র এক অবয়ব ধারণ করেছে।

চল্লিশ দশকের প্রতিনিধিস্থানীয় কবি সমর সেনের কবিতায় দেখা গেল লুপ্ত রোম্যান্টিক সৌন্দর্যের জন্যে হাহাকার, অন্য দিকে সমকালীন নগরজীবনের ক্লান্তি হতাশা বিক্ষোভ ও সামাজিক বিরোধ তাঁর কবিতার পটভূমি। রবীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত গদ্যছন্দের সঙ্গে তাঁর গদ্যছন্দের প্রভেদও সুস্পষ্ট। অগ্রজ কবি বিষ্ণু দে-র কবিতার মতো তাঁর কবিতাও কখনো ব্যঙ্গ-বিদ্রুপে, কখনো সমাজচিন্তার অনন্যতায় অথবা বিশ্বাস ও স্বীকৃতিতে বহুল পরিমাণে সার্থক। রবীন্দ্রনাথ থেকে স্মরণযোগ্য পঙ্‌ক্তির সংযোজনায় ব্যঙ্গাত্মক ভাবপ্রকাশ তাঁর কবিতায়ও লক্ষ্য করা যায়, যদিও বিষ্ণু দে-র কবিতায় উপকরণগত বৈশিষ্ট্য, দেশী-বিদেশী প্রতীক ও চিত্রকল্পের বিস্তার সমর সেনের কবিতায় তেমন চোখে পড়ে না। ইংরেজি কবিতার, বিশেষ করে এলিয়ট থেকে নানা উদ্‌ধৃতিও এই দুই কবির কবিতায় দৃষ্টিগোচর হবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন কবিতার জগতে সমর সেনের পাশাপাশি সক্রিয় ছিলেন কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, বিমলচন্দ্র ঘোষ, অরুণ মিত্র, হরপ্রসাদ মিত্র, মণীন্দ্র রায় ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়। সুভাষ তাঁর কবিতার বহুবিধ বৈশিষ্ট্যের জন্যে প্রথম আবির্ভাবেই শুধু তৎকালীন পাঠকসমাজকেই নয় পূর্ববর্তী অগ্রজ কবিদেরও সচকিত করে তুলেছিলেন। সমর সেন গদ্যকবিতা রচনায় সম্পূর্ণ নিজস্বতা অর্জন করেই দেখা দিয়েছিলেন এবং রবীন্দ্রগদ্যকবিতা কিংবা জীবনানন্দ বুদ্ধদেব বসু প্রেমেন্দ্র মিত্র বিষ্ণু দে প্রমুখ অগ্রজ কবিদের গদ্যকবিতা থেকে তাঁর গদ্যরীতি ছিল অনেকটাই স্বতন্ত্র। অথচ সুভাষ এলেন পুরোপুরি ছন্দমিলের কবিতা নিয়ে, যে-কবিতার স্বভাব প্রকৃতি ও ছন্দের দোলা ছিল অভূতপূর্ব। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'পদাতিক'-এর অন্তর্ভুক্ত 'পদাতিক' নামের দীর্ঘ কবিতাটি, 'অতঃপর' এবং 'চীন : ১৯৩৮' দ্রষ্টব্য। সুভাষের কবিতার মেজাজ, শব্দপ্রয়োগের কৌশল তির্যক ব্যঙ্গময় বক্তব্য ছাড়াও ছিল দৈনন্দিন জীবনের মুখের ভাষায় কাব্যনির্মাণের কৌশল। জীবনানন্দের অনেক কবিতায় মুখের ভাষার ব্যবহারের সার্থক দৃষ্টান্ত রয়েছে। পরবর্তী সময়ে সুভাষই সম্ভবত সবচাইতে যোগ্যতার সঙ্গে দৈনন্দিন জীবনের পারিপার্শ্বিকতায় চেনা ও জানা নানা শব্দকে কবিতায় নিয়ে এসেছেন। ষাট-সত্তর দশক পর্যন্ত তাঁর এই দক্ষতা অব্যাহত। উল্লেখ করা দরকার গদ্য কবিতাও প্রচুর লিখেছেন সুভাষ এবং কবির নিজস্ব বাক্‌ভঙ্গি ও স্তবকবিন্যাস অনন্যতা অর্জন করেছে। কয়েকটি উদাহরণ : 'কুঁজো হয়ে যারা ফুলের মূর্ছা দেখে / পৌঁছয় নাকি হাতুড়ি তাদের পিঠে ?' 'ভাজা ইলিশের গন্ধে গলি ছেড়ে কিছুতেই নড়তে চায় না হাওয়া।' 'দজ্জাল ঘড়িটা / একদিন আমাকে বাজিয়ে দেখে নেবে ব'লে / টিকটিক শব্দে শাসিয়েছে।' গদ্য ও পদ্য কবিতায় বিষয়ের ব্যাপ্তি ও আঙ্গিকনৈপুণ্যে দীর্ঘকালের সাধনায় ও শ্রমে কবিতাজগতে সুভাষ যেখানে পৌঁচেছেন তা যে-কোনো তরুণ কবির কাছেই ঈর্ষণীয়। 'অগ্নিকোণ' 'মিছিলের মুখ' 'জয়মণি স্থির হও' একদিকে যেমন পাঠকের গভীর অনুভবের নিকটবর্তী,. অন্যদিকে তেমনই 'ফুল ফুটুক না ফুটুক' 'এখন ভাবনা' 'পাথরের ফুল' সমকালীন বাংলা কবিতার বিচিত্রগামিতার মধ্যে শুধুমাত্র শব্দপ্রয়োগ ও আঙ্গিকের

গঠনপারিপাট্যে এমন-কি; অমনোযোগী পাঠককেও নাড়া দিয়ে যায়। ব্যঙ্গ কবিতা দিয়ে শুরু করেছিলেন সুভাষ কিন্তু পঞ্চাশ দশকে নিছক হাল্কা সুর বর্জন করলেও পরবর্তীকালে কিংবা একই সময়ে ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গি ও তির্যক বিদ্রূপ তাঁর কবিতায় ফিরে ফিরে এসেছে। 'মুখুয্যের সঙ্গে আলাপ' বা 'ল্যাং' এইদিক থেকে উল্লেখ্য। সুভাষের কবিতার একটু বিস্তৃত উল্লেখ করা হল এইজন্যে যে চলতি বাংলা কবিতার রীতি ও ভঙ্গির নিগড় ভেঙে তিনি যে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছিলেন তার তুলনা বিরল।

বাংলা কবিতার একটি পরিপূর্ণ রূপের মুখচ্ছবি পাওয়া যায় পঞ্চাশ দশকে যখন তিরিশ ও চল্লিশের কবিদের পাশাপাশি এক তরুণতর শক্তিমান কবিগোষ্ঠীর আবির্ভাব সম্ভব হয়েছিল। তিরিশের কবিদের অনেকেই রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পূর্বেই সুপ্রতিষ্ঠিত। কেউ কেউ তাঁর প্রশংসাও অর্জন করেছিলেন। পঞ্চাশ দশকেই এঁদের কাব্যরচনার সর্বাঙ্গীণ বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। অমিয় চক্রবর্তীর 'পারাপার' ও 'ঘরে ফেরার দিন' এই সময়েই প্রকাশিত। বুদ্ধদেব বসুর 'শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর' ও 'যে আঁধার আলোর অধিক', জীবনানন্দর 'রূপসী বাংলা', সঞ্জয় ভট্টাচার্যর 'স্বনির্বাচিত কবিতা', বিষ্ণু দে-র 'আলেখ্য' 'তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ' উল্লেখ্য। স্থানাভাবে বইগুলির বিশদ বিবরণ দেওয়া এখানে সম্ভব নয়। শুধু এই মন্তব্যই অপরিহার্য যে তিরিশের বয়োজ্যেষ্ঠ কবিদের দৃষ্টান্ত পরবর্তী অন্তত তিনটি প্রজন্মের তরুণ ও তরুণতর কবিদের কবিতাবিষয়ক নানা প্রশ্নের সদুত্তর জুগিয়েছিল। চল্লিশ দশকের শেষ ভাগে যে ক'জন তরুণ কবি কাব্যরচনায় উদ্যোগী হয়েছিলেন তাঁদের কয়েকজনের কাব্যগ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছিল এই দশকেই। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ('রাণুর জন্য' 'মৃত্যুত্তীর্ণ' 'লখিন্দর') নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ('নীল নির্জন') অরুণ ভট্টাচার্য ('ময়ূরাক্ষী') গোবিন্দ চক্রবর্তী ('অরণ্য মরাল') নরেশ গুহ ('দুরন্ত দুপুর') অরুণকুমার সরকার ('দূরের আকাশ') এই সময়েই পাঠকদৃষ্টি আকর্ষণ করে। জগন্নাথ চক্রবর্তী ('নগর সন্ধ্যা') কৃষ্ণ ধর ('অঙ্গীকার') যদিও চল্লিশ দশকেই তাঁদের কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন তাঁরাও মনোযোগ আকর্ষণ করেন এই দশকেই। রাম বসুর 'যখন যন্ত্রণা' ও 'নীলকণ্ঠ' প্রকাশিত হওয়ায় দায়বদ্ধ কবিতার একটি নতুন শিল্পরূপও উন্মোচিত হয়েছিল।

তিরিশ চল্লিশ ও পঞ্চাশের কবিতায় নাগরিকতার ছবি ব্যাপকভাবে লক্ষণীয়। এই সময় শহরের পরিবেশ ও জীবনযাত্রাপ্রণালী কবিকল্পনায় স্পষ্ট চেহারা নিয়েছে। শুধু তাই নয়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে কবির উক্তি ও উপলব্ধিতে বুদ্ধিবৃত্তির প্রভাব প্রত্যক্ষ। রবীন্দ্রনাথ হয়তো তাঁর জীবনের শেষ লগ্নে তরুণতর কবিদের রচনায় এই নাগরিকতার আভাস পেয়েছিলেন। বস্তুত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত অমিয় চক্রবর্তী বিষ্ণু দে সমর সেন সম্পূর্ণ আলাদা-আলাদা ভঙ্গিতেই যন্ত্রসভ্যতালালিত শহরজীবনের বিভিন্ন দিক নিজেদের কবিতায় প্রতিফলিত করেছেন। বলা বাহুল্য, বাঙালি নাগরিকজীবনের পরিসর খুব পরিব্যাপ্ত নয় এবং মহানগরী কলকাতা এই নাগরিকতার প্রাণকেন্দ্র হওয়ায় একালের কবিতার নাগরিকতাও প্রধানত কলকাতাকেন্দ্রিক। অবশ্য হাওড়া বা অন্য শহরের কিছু উল্লেখ কোনো কোনো কবিতায় থাকতে পারে কিন্তু সমগ্রভাবে বঙ্গদেশে কলকাতাই শিক্ষিত বাঙালির কাছে নাগরিকতার প্রেরণার উৎস। সম্ভবত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই নাগরিকতা বলতে কলকাতা-জীবনের অভিজ্ঞতা ও অন্বেষণকেই মেনে নেওয়া হয়েছে। কলকাতা শহরের বহুতল বাণিজ্যকেন্দ্রগুলো, হাওড়া ও হুগলী নদীর উভয় তীরবর্তী পাটকল ও অন্যান্য কারখানাসমূহ, হাওড়া সেতু ও গঙ্গার ভাসমান জাহাজের সারি—সব মিলিয়েই শহরকেন্দ্রিক বণিক সভ্যতার ছবি একালের নাগরিক কবির কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এখনকার দিনে আধুনিক প্রতিনিধিস্থানীয় কবিদের প্রায় কেউই স্বভাবকবি নন, তাঁরা অনুশীলনে আগ্রহী নাগরিক কবি। কলকাতাকেন্দ্রিক জীবনের বাইরে তাঁদের অনেকেরই জীবনে অন্য বৈচিত্র্য ও ভিন্নতর অভিজ্ঞতার সুযোগ অল্প। ফলে বর্তমান নাগরিক জীবন বৈচিত্র্যহীন ও একঘেয়ে হলেও সে-জীবনই অধিকাংশ কবির আশ্রয়। সুতরাং এটা স্বাভাবিক যে এখনকার কবি উপমা, চিত্রকল্প প্রভৃতিও সংগ্রহ করবেন নগরজীবনের নানা অভিজ্ঞতার স্তর থেকেই। চল্লিশ

দশকের কবিদের অন্যতম কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মণীন্দ্র রায় সুভাষ মুখোপাধ্যায় মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় চিত্ত ঘোষের অনেক কবিতায় শহরকেন্দ্রিক সভ্যতার ছবি স্পষ্ট। নরেশ গুহ ও অরুণ সরকারের কবিতায়ও সংহত নাগরিক শিক্ষিত মনের আভাস। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শুধু পূর্ববর্তী যুগের নয়, একালে পঞ্চাশ-ষাট দশকে লিখিত তাঁর কবিতায় নাগরিক জীবনের, বিশেষ করে নাগরিক সভ্যতার স্টিম রোলারে পিষ্ট ও বিদীর্ণ সাধারণ মানবজীবনের ছবি বার বার এঁকেছেন। তিরিশের কবি বিষ্ণু দে, চল্লিশের কবি সমর সেন ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় নাগরিকতা সামাজিক ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ অনেক সময় শিক্ষিত নরনারীর সংশয় ও বিকার বা অরুচিকে ঘিরেই পরিদৃশ্যমান। এইদিক থেকে পঞ্চাশ দশকের নবীন কবিদের রচনায় নাগরিকতার ব্যাপ্তি লক্ষণীয়। নাগরিকতায় ব্যঙ্গ একটি উপাদান মাত্র কিন্তু তাকে মাত্রাতিরিক্ত প্রশ্রয় না দিয়ে সমকালীন জীবনযাত্রার প্রবাহ থেকে আহরিত সরল দুরূহ নানা ঘটনা উল্লেখের মধ্য দিয়েই তাঁরা নাগরিকতার পরিসরকে বিস্তৃত করেছেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় শক্তি চট্টোপাধ্যায় আলোক সরকার স্নেহাকর ভট্টাচার্য শঙ্খ ঘোষ শঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায় মানস রায়চৌধুরী অমিতাভ দাশগুপ্ত এবং আরো অনেকেই নগর জীবনযাপনপ্রণালী এবং তৎসংশ্লিষ্ট নানা রুচি ও মেজাজের বিস্তার ঘটিয়েছেন।

পঞ্চাশ দশকে পৌঁছে কাব্যপাঠক তরুণতর কবিদের কবিতায় নবজাগরণের চাঞ্চল্য অনুভব করেন। চল্লিশ দশকে বাইরের কারণে যে-সব অনুভূতি ও আবেগ, বাসনা ও আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ সম্ভব কিংবা সহজ ছিল না তার স্বতঃস্ফূর্ততা কাব্যপাঠককে সচকিত করে তুলেছিল। সময়টা ছিল স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পরবর্তী কাল। স্বাধীনতা-পূর্ব যুগে প্রধানত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত -সম্পাদিত 'পরিচয়' পত্রিকা ও বুদ্ধদেব বসু -সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকাকে ঘিরে আধুনিক বাংলা কবিতার আন্দোলনের প্রসার ঘটেছিল। সঞ্জয় ভট্টাচার্য -সম্পাদিত 'পূর্বাশা' পত্রিকায়ও এই সময়ের প্রতিষ্ঠিত কবিরা লিখতেন। পঞ্চাশ দশকের তরুণ কবিরা প্রায় দল বেঁধেই 'কৃত্তিবাস' ও 'শতভিষা' নামের দুটি ছোটো পত্রিকার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করলেন। এই তরুণ কবিগোষ্ঠীর বেশ কয়েকজন এখন কাব্যরীতির স্বাতন্ত্র্যের জন্যে সুপরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত। এঁদের চোখের সামনে অবশ্যই ছিল তিরিশ ও চল্লিশ দশকের বাংলা কবিতার বিশাল ঐশ্বর্য যার আদিতে ছিলেন জীবনানন্দ, অন্তে সুকান্ত ভট্টাচার্য। কৃত্তিবাস পত্রিকার তরুণ কবিগোষ্ঠী সম্পর্কে সমর সেন ওই পত্রিকারই প্রথম সংখ্যায় লিখেছিলেন: 'প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির মধ্য দিয়ে আগের যুগের কবিরা যেখানে পৌঁচেছিলেন, কালধর্মে এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার অনুকূলতায় সেখান থেকেই এঁদের যাত্রা শুরু হয়েছে।' ১৯৬৩তে শান্তি লাহিড়ী -সম্পাদিত 'বাংলা কবিতা' সংকলনে ছিয়াত্তর জন কবির মোট একশো পঞ্চাশটি কবিতা স্থান পেয়েছিল। সংকলনটি শুরু হয়েছিল অরবিন্দ গুহর কবিতা দিয়ে যাঁর জন্মসাল ১৯২৮ এবং সর্বশেষ কবিতাটি পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের, যাঁর জন্মসাল ১৯৪০। এই সংকলনটি এখন পাওয়া যায় না কিন্তু যে কাব্যপাঠক পঞ্চাশ দশকের তরুণ কবিদের প্রথম দিককার রচনার সঙ্গে পরিচিত হতে চান তাঁদের কাছে সংকলনটির কিছু মূল্য থাকতে পারে। পঞ্চাশ দশকে সম্পূর্ণ একটি নতুন প্রজন্মের কবিরা বাংলা কবিতায় যে স্বাতন্ত্র্যের ধারার সূত্রপাত করলেন তার প্রয়োজন ছিল। পঞ্চাশ ও ষাট দশক জুড়ে এঁদের সাবলীলতার অনুশীলন চোখে পড়বেই। গোড়ার দিকে এঁদের অনেকেই ছন্দ-নৈপুণ্য এবং ব্যাকরণগত বিশুদ্ধির দিকে সজাগ দৃষ্টি রেখেই অগ্রসর হয়েছিলেন। কুশলী শব্দশিল্পী যেমন অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত শঙ্খ ঘোষ আলোক সরকার শক্তি চট্টোপাধ্যায় এই সময়েই দেখা দিয়েছিলেন। অলোকরঞ্জনের 'যৌবন বাউল' শঙ্খ ঘোষের 'দিনগুলি রাতগুলি' আলোক সরকারের 'আলোকিত সমন্বয়' শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 'হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য' পাঠকের কাছে অনেক প্রত্যাশা নিয়ে এসেছিল। সুখের বিষয় পরবর্তীকালেও নিরবচ্ছিন্ন কাব্যচর্চার ভিতর দিয়ে সে-প্রত্যাশাকে এঁরা এবং এঁদের সমকালীন আরো কয়েকজন কবি বহুলাংশে পূরণ করতে সমর্থ হয়েছেন। প্রথম পর্বের হৈ-চৈ হল্লাগোল্লার পরে দেখা গেল পঞ্চাশের বহু শক্তিমান কবি স্ব স্ব কাব্যরীতির জন্যেই লক্ষ্যগোচর হয়েছিলেন। গোড়া থেকেই উচ্চারণের

বিশিষ্টতার জন্যে তৎকালীন কাব্যপাঠককে আকর্ষণ করেছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় । অলোকরঞ্জন বা শঙ্খ ঘোষের মতো শব্দের ধ্বনি বা ছন্দ নিয়ে নানা পরীক্ষায় এগিয়ে না এলেও সুনীলের কবিতায় একান্ত ব্যক্তিগত অনুভবের মধ্যে এমন এক ধরনের নাটকীয় আবেগ কাজ করে যায় যা এক সময় দারুণভাবে তরুণ পাঠককে আকর্ষণ করেছিল । সুনীলের প্রথম দিককার কবিতা সম্পর্কে তাঁরই সমকালীন কবি জ্যোতির্ময় দত্ত লিখেছিলেন : তাঁর অধিকাংশ পদ্যই নায়ক-নায়িকা নির্ভর । 'তুমি' 'তোমাকে' ইত্যাদি ব্যক্তিস্বাক্ষরযুক্ত শব্দ তিনি অধিক ব্যবহার করেছেন । এ-সব কবিতার স্বাদ ভিন্নতর, এতে আমাদের দম আটকিয়ে আসে না, হয়তো ভাবনার জন্ম দেয় না কিন্তু একটা স্বস্তি পাওয়া যায় । উত্তরকালে দেখা যায় সুনীল সর্বদা সঞ্চরণশীল, এক নিমেষেই 'দ্বারভাঙা জেলার রমণী' থেকে 'চে গুয়েভারার প্রতি' কবিতায় পৌঁছে যেতে পারেন । অন্যদিকে ছন্দ আর মিলের জগতে শক্তি এলেন অসামান্য পদ্যপ্রশিক্ষা নিয়ে । দীর্ঘতর কবিতার স্তবকসজ্জায় সেইসঙ্গে চতুর্দশপদী কাব্যরচনায় এবং তারও পরে ছোটো কবিতার সূক্ষ্মতর ব্যঞ্জনায় শক্তির ব্যতিক্রমী স্বাক্ষর সুস্পষ্ট । এদিক থেকে আলোক সরকার নির্মোহ নির্জন । নিরন্তর চিত্রাবলী সৃষ্টির মাধ্যমে তিনি উপলব্ধির গহনে পাঠককে নিয়ে যাবার পক্ষপাতী । অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও শঙ্খ ঘোষের কবিতার স্বতন্ত্র উল্লেখও অনিবার্য । অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ছন্দ ও মিলের দোলায়, নতুনতর শব্দের যোজনায় এবং উচ্চারণের শুদ্ধতায় অনেক দার্শনিক স্বগতোক্তিকে গভীর তাৎপর্য দেবার চেষ্টা করেছেন । ভারতীয় ও রবীন্দ্র-ঐতিহ্যের মধ্যেই তাঁর সৎ ও বিবেকমন্থিত রচনার প্রয়াস । কুশলী কবিমাত্রেই শব্দ নিয়ে পরীক্ষা করেছেন কিন্তু জীবনানন্দ ও সুধীন্দ্রনাথের পরে, সমর সেন সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও অরুণ মিত্রের শব্দপ্রয়োগের বৈচিত্র্যকে অতিক্রম করে এসেও তন্নিষ্ঠ মনের উপযোগী শব্দকে অলোকরঞ্জন ধ্বনি ও নানা অনুষঙ্গের মাধ্যমে নতুনতর অভিঘাতের বিষয়ীভূত করেছেন । অলোকরঞ্জন ও শঙ্খ ঘোষ উভয়েই সুসংস্কৃত কবিমানসের অভিব্যক্তিকে নিজ নিজ কবিতায় উপস্থিত করেছেন স্বকীয় প্রণালীতে । শঙ্খ ঘোষ বার বার অবগাহন করেন রবীন্দ্র-ঐতিহ্যে, ফিরে আসেন সমকালীন সমাজের বিশৃঙ্খল পরিবেশে একান্ত সাধের নিজস্ব নির্মাণে । কোনো সময়েই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ধ্যানের সন্ধানে সব চেয়ে প্রয়োজনীয়কে বর্জন করেন নি তিনি । সমকালীন কবিবন্ধুদের তুলনায় শঙ্খর কবিতার সংখ্যা অল্প । পুনরাবৃত্তিকে সর্বদা এড়িয়ে চলেছেন । তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতার ভূমিকায় তিনি নিজেই জানিয়েছেন : 'আমি যে আধুনিকতার কথা ভাবি সেখানে মন্থর পুনরাবৃত্তির কোনো মানে নেই, অবাধ প্রগল্‌ভতার কোনো প্রশ্রয় নেই । তাই কম লিখি বলে আমার কোনো ভয় হয় না ।' প্রবহমান ঐতিহ্যের যা-কিছু সারবান তাকে আত্মসাৎ করে নতুনতর প্রতীক ও চিত্রকল্পের নির্মাণে তাঁর কবিতা সত্যাশ্রয়ী হতে চেয়েছে ।

পঞ্চাশ দশকেই দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজজীবনের পটভূমিকায় উল্লেখযোগ্য সৎ-কবিতা লিখেছেন তরুণ সান্যাল মানস রায়চৌধুরী অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় এবং চল্লিশের প্রান্তরেখার কবিদের অন্যতম সিদ্ধেশ্বর সেন ও কৃষ্ণ ধর । অলোকরঞ্জন তাঁর সমকালীন তরুণ কবিদের কাব্যরচনা সম্পর্কে তাঁর গ্রন্থে ('দিকে দিগন্তরে') লিখেছেন, 'পরিবর্তন নানা-ভাবেই সূচিত হয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহের সুযোগ নেই তবে এই সব পরিবর্তনের পরম্পরা এক একটি বলয়ের মধ্যে আধারিত হয়ে ঘুরপাক খেয়ে মরছে, এই অবলোকনও অবান্তর অথবা মিথ্যে নয়।' শেষ পঞ্চাশের কবিদের অন্যতম অমিতাভ দাশগুপ্ত সর্বাগ্রে স্বীকার করেন যে কবিতা লেখা জীবনযাপনেরই অন্যতম শর্ত । এই বোধ তাঁর কবিতাকে শুদ্ধ কবিতা থেকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করেছে । অপেক্ষাকৃত ছোটো কবিতায় সফল শব্দ ব্যবহার মাঝে মাঝে তাঁর কবিতায় এমন অভিঘাতের সৃষ্টি করে যা পাঠককে সচকিত করতে পারে । পূর্বেই বলা হয়েছে পঞ্চাশের শুরুতেই যে-সব কবি কবিতা রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন তাঁরা সংখ্যায় বড়ো অল্প ছিলেন না । রম্য কবিতা অনেকেই লিখেছেন এবং এঁদের মধ্যে অদ্যাবধি যাঁরা নতুন নতুন কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেছেন— শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় শঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায় শোভন সোম সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

মণিভূষণ ভট্টাচার্য তাঁদের অন্যতম। এটা ঠিক যে চল্লিশের কবিসমাজের দায়বদ্ধতার চাপ পঞ্চাশ দশকে তেমন ছিল না বলেই অতিরিক্ত সমাজভাবনাকে তাঁরা এড়িয়ে যেতে পেরেছিলেন। গভীর উচ্চারণ ততটা নয় যতটা স্পর্ধিত উচ্চারণ— পঞ্চাশের কবিতাকে সূচনায় বিশিষ্টতা দান করেছিল। পূর্ব যুগে আবেগ যেন সংক্ষিপ্ত হয়ে এসেছিল, পরবর্তীকালে দেখা গেল তার বাধ্যবাধাহীন উৎসার। পূর্ববর্তী কবিতার রথ মাটির ওপর দিয়ে চলতে গিয়ে অনেক সময় কাদা ও রক্তে চিহ্নিত হয়েছিল কিন্তু পঞ্চাশ দশকের কবিতা বুঝি যুধিষ্ঠিরের রথের মতোই মাটির দু'আঙুল ওপর দিয়েই চলমান, ফলে যে-কোনো দিকে নির্বিঘ্নে অগ্রসর হবার, পরিভ্রমণের, কোনো বাধা ছিল না। সবচেয়ে উল্লেখ্য, কয়েকজন ব্যক্তিপ্রতিভাযুক্ত কবি ছাড়া এঁরা পরস্পর পরস্পরের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। যে-কোনো নিশ্বাসে অধিকাংশ কবি নির্ভার কথাবার্তা বলেছেন, বলেছেন আত্মবোধ, আত্মকরুণা ও যৌনতার কথা। কোনো আত্মক্ষয়কারী বাধাবিঘ্নকে অতিক্রম করার দরকার না হওয়ায় খুব সামান্য পরিশ্রমে প্রতিষ্ঠা অর্জনের সুযোগ পাওয়া গিয়েছিল। এরকম একটি ফসলবিলাসী হাওয়ায় পঞ্চাশের কবিদের অনেকেই প্রধানত নিজের চার দিকেই নিজের মনের আকাশ তৈরি করেছিলেন। আবার বলতে হয় চল্লিশ দশকের রক্তক্ষয়কারী আবহাওয়া ও প্রত্যক্ষ উচ্চারিত সমাজচিন্তার পর এই পরিবর্তনের প্রয়োজন ছিল। একটু যেন নতুন ঢেউ নতুন নিশ্বাসের আভাস পাওয়া গেল। কিছুকাল পর্যন্ত কবিতার এই নব উদ্ভাসিত পটভূমি বাঙালি কাব্যপাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু এই কবিগোষ্ঠীর একাংশের বিরুদ্ধে একটি প্রধান অভিযোগ তাঁরা কবিতায় বক্তব্যকে নির্বাসন দিয়েছেন। নিপুণ প্রয়োগে শব্দ সমাবেশের মাধ্যমে মাঝে মাঝে সুন্দর সুন্দর ছবি হয়তো পাওয়া গেল, সুন্দর সুন্দর পঙ্‌ক্তিবিন্যাস লক্ষ্য করা গেল অথচ দেখা গেল উচ্চারণে কোনো গভীর অভিনিবেশ, কোনো সুনিশ্চিত অভিজ্ঞতার উন্মোচন নেই। ব্যক্তিজীবন যে অন্তর্দ্বন্দ্বের দ্বারা আচ্ছন্ন তার প্রকাশ থাকলেও কবির সমাজসত্তার পরিচয় তেমন পরিস্ফুট নয়। ফলে উচ্চারণ ও বাকভঙ্গিতে একপ্রকার যান্ত্রিকতা ক্রিয়াশীল, কবিতার শব্দ সমাবেশ এবং পঙ্‌ক্তিবিন্যাসে যে-মোহ জাগে তা যেন মুহূর্তের ; কবিতাপাঠ শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গেই সে সম্মোহন মিলিয়ে যায়। উৎকৃষ্ট কবিতার একটি প্রধান গুণই এই যে পড়বার পর তার কোনো কোনো স্তবক কি পঙ্‌ক্তি, মনের মধ্যে গুনগুন করতে থাকে, অনেক অন্যমনস্ক মুহূর্তে মনে হানা দিতে থাকে। সে-রকম কবিতা পঞ্চাশের তরুণ কবিরা লেখেন নি এমন নয় কিন্তু তার স্বল্পতা শেষ পর্যন্ত পাঠককে বিস্মিত করে।

পঞ্চাশ দশকের কবিতার জগৎ সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণেও স্মরণীয়। এই দশকে তিরিশ ও চল্লিশের বেশ-কয়েকজন প্রবীণ কবির নতুন কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের ফলে আধুনিক বাংলা কবিতায় পরিণত কবিমানসের রূপ ও রীতির সঙ্গে তৎকালীন কাব্যপাঠকের নতুন করে পরিচয় লাভের সুযোগ হয়েছিল। অমিয় চক্রবর্তী বুদ্ধদেব বসু ছাড়াও পূর্ববর্তী কবিদের মধ্যে সঞ্জয় ভট্টাচার্য অরুণ মিত্র দিনেশ দাস মণীন্দ্র রায় সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও বিমলচন্দ্র ঘোষের কবিতায় দীর্ঘকালের স্বকীয় কাব্যভঙ্গির পরিবর্তে কবিতাকে ভাবে ও বহিরঙ্গে নতুন করে প্রকাশের চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। এই সময়ে শেষ চল্লিশের কয়েকজন কবি পূর্বগামী কবিতার ধারার পক্ষপাতী না হয়ে যুগোপযোগী নতুন পরিবেশে কবিতা রচনায় মনোযোগী হয়েছিলেন। সে-কারণেই নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী অরুণকুমার সরকার নরেশ গুহ অরুণ ভট্টাচার্য লোকনাথ ভট্টাচার্য সিদ্ধেশ্বর সেন রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরী বা বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতায় অস্তিত্বের যন্ত্রণা বা বিদ্রূপ পরিপার্শ্বের সঙ্গে সংগ্রামের যন্ত্রণা নেই ; যা আছে তা নিচু গলার হার্দ্য উচ্চারণ। বাংলা কবিতার লিরিক সুরটি যেন আবার নতুন ভঙ্গিতে ফিরে এসেছিল। অথচ চল্লিশ দশকের মূল ধারাটিও একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায় নি। গোলাম কুদ্দুস প্রসাদ মুখোপাধ্যায় সতীন্দ্র মৈত্র মৃগাঙ্ক রায় তরুণ সান্যালের কবিতায় তার পরিমার্জিত স্বাক্ষর। এই দশকের আরো কয়েকজন কবি দীর্ঘকালের কাব্যচর্চার মধ্য দিয়ে সুপরিচিত হয়েছেন, গোপাল ভৌমিক শুদ্ধসত্ত্ব বসু তাঁদের অন্যতম। পরমানন্দ সরস্বতী চল্লিশ দশকেরই কবি, গৃহজীবনে নাম ছিল মৃণালকান্তি দাশ।

এক সময় কিসের টানে সন্ন্যাসী হয়ে গেলেন, আশ্রম করলেন। অথচ তাঁর কাব্যনির্মাণ অব্যাহত রইল সত্তর দশক পর্যন্ত। কোনো আধ্যাত্মিক মন্ত্রের উচ্চারণ নয়, বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গিতে উপস্থাপনায় যথার্থ আধুনিকতার স্মারক।

রবীন্দ্র-তিরোধানের প্রথম পঁচিশ বছরের প্রান্তে এসে অর্থাৎ ষাট দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত কবিতার ক্ষেত্রে কাব্যপাঠক পুনর্বার কয়েকজন তরুণতর কবির মুখোমুখী হন। এঁদের অন্যতম পবিত্র মুখোপাধ্যায় রত্নেশ্বর হাজরা আশিস সান্যাল সামসুল হক তুলসী মুখোপাধ্যায় বাসুদেব দেব সাগর চক্রবর্তী ও সজল বন্দ্যোপাধ্যায়। ষাটের দশকে যে-সব নতুন কবি দেখা দিলেন তাঁদের মধ্যে পঞ্চাশের সুবিধাভোগী কবিগোষ্ঠীর স্ফূর্তির প্রকাশ আর তেমন দেখা যায় না, তাঁরা অনুকূল পরিবেশের অভাব বোধ করলেন কবিতার জগতে ; নানা কারণে পঞ্চাশের কবিদের মতো দলবদ্ধ হয়ে কাব্যচর্চার মেজাজও তাঁদের ছিল না। তাঁরা লক্ষ্য করলেন পূর্বগামী পঞ্চাশের কবিদের অধিকাংশই বৃহৎ পুঁজি -পরিচালিত ও বহুল প্রচারিত পত্রিকার ছত্রছায়ায় নিজেদের কবিতা ও কবিসত্তাকে প্রসারিত করার অবাধ সুযোগ নেবার পর তরুণতরদের জন্যে আর এরকম সুযোগের কিছুই অবশিষ্ট নেই। এরকম একটি কঠিন পরিবেশে ষাটের তরুণ কবিসমাজ যার যার স্বভাব ও সংগতি অনুযায়ী প্রথম দিকে প্রায় নিঃসঙ্গ এককভাবেই কাব্যরচনায় অগ্রসর হয়েছিলেন। বর্তমান নিবন্ধে ষাট দশকের কবিদের মধ্যে যাঁরা ষাট দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত সময়সীমায় কাব্যজীবনের সূত্রপাত করেন শুধুমাত্র তাঁদের উল্লেখ করা হচ্ছে এই কারণে যে রবীন্দ্র-তিরোধানের পরবর্তী পঁচিশ বছরের বাংলা কবিতার গতি-প্রকৃতির সংক্ষিপ্ত আলোচনাই এই নিবন্ধের লক্ষ্য। অথচ বর্তমানকালের পাঠক জানেন ষাটের দশকের কবির সংখ্যাও কম নয় এবং তাঁরাও এখন পর্যন্ত বিচিত্ররূপে ক্রিয়াশীল। ষাটের দশকের শেষভাগে আরো বহু কবি এসেছেন যাঁরা নানাদিক থেকে বাংলা কবিতাকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছেন। তাঁরা আমার আলোচনার অন্তর্ভুক্ত নন।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় -সম্পাদিত 'কৃত্তিবাস' ও আলোক সরকার -সম্পাদিত 'শতভিষা' কবিতাপত্র দুটিকে যদি পঞ্চাশ দশকের তরুণ কবিদের মুখপত্র হিসেবে চিহ্নিত করা যায় তা হলে ষাটের দশকে পবিত্র মুখোপাধ্যায় -সম্পাদিত 'কবিপত্র' পত্রিকাটিকে সমকালের কবিদের প্রধান বিচরণক্ষেত্র বললে অত্যুক্তি হবে না। ১৯৬১-তে প্রকাশিত পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের 'শবযাত্রা' উল্লেখ্য এই কারণে যে মাত্র কুড়ি বছর বয়সে এরকম দীর্ঘ শোককাব্য যে তরুণ কবি লিখতে পারেন তাঁর কাব্যশক্তি সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ ছিল না। পবিত্র নিঃসন্দেহে ষাট দশকের প্রতিনিধিস্থানীয় কবি এবং নিরন্তর বিচ্ছিন্নতাবোধে পীড়িত। তাঁর কবিতা পড়লে বোঝা যায় মধ্যবিত্ত জীবনের বিস্তর অভাববোধ ও ভগ্নদশার মধ্যে তিনি কোনো আশ্রয় খুঁজে না পেয়ে অনেক সময়েই বিপর্যস্ত বোধ করেছেন। অথচ তাঁর কাব্যভাষা সুপরিণত, শব্দের নির্মাণ যথাযথ এবং অভিনিবেশ গভীরতাসন্ধানী। এই সময়কার অপর একজন কবি রত্নেশ্বর হাজরার কবিতা স্থিরতা ও বিশ্বাসের হাতে সমর্পিত। তাঁর কবিতা অন্তর্মুখী, দার্শনিকতায় চিহ্নিত ও অনুভূতিপ্রধান। ষাটের দশকের প্রথম দিকে আশিস সান্যাল তুলসী মুখোপাধ্যায় নিজ নিজ কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সজল বন্দ্যোপাধ্যায় ও সাগর চক্রবর্তীর গ্রন্থ এই সময়েই প্রকাশিত। তুলসী ও সজলের কবিতার আঙ্গিক পারিপাট্যে কিছুটা অভিনবত্ব লক্ষ্য করা যেতে পারে। ষাট দশকেই প্রকাশিত হয়েছিল মণিভূষণ ভট্টাচার্যের কাব্যগ্রন্থ 'কয়েকটি কণ্ঠস্বর'। পঞ্চাশ দশকে প্রকাশিত তাঁর কবিতায় তখনকার কাব্যগুণ সমসাময়িকদের থেকে আলাদা ছিল না কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি স্পষ্টতই রাজনীতিমনস্ক কবি, ক্রোধ প্রতিবাদ ও মনুষ্যত্ববোধে তাঁর কবিতা উদ্দীপ্ত।

একটি ক্ষুদ্র রচনার পরিসরে তিনটি দশকের কবি ও কবিতার সন্ধান দেবার উদ্যোগ ব্যাহত হতে পারে। চল্লিশ পঞ্চাশ ও ষাট দশকের কবিতার বিষয় ও আঙ্গিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা এখন পর্যন্ত তেমন হয় নি। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় -সম্পাদিত 'আধুনিক কবিতার ইতিহাস' সত্য গুহর 'একালের গদ্যপদ্য আন্দোলনের দলিল' বার্নিক রায়ের 'কবিতা চিত্রিত ছায়া' এবং আরো দু-একটি গদ্যগ্রন্থে বিভিন্ন দশকের

কবিদের বিষয়ে ও কবিতা সম্পর্কে যে আলোচনা হয়েছে প্রয়োজনের তুলনায় এখন পর্যন্ত তা পর্যাপ্ত নয় । একালের কবিকৃতি ও কাব্যবিচার সম্পর্কে, বিশেষত বিভিন্ন দশকের প্রতিনিধিস্থানীয় কবিদের কবিতার আলোচনা অবশ্যই বিভিন্ন সময়ের পত্রপত্রিকায়, বিশেষত লিটল ম্যাগাজিনগুলোতেই, ছড়িয়ে রয়েছে যার গ্রন্থনা অত্যন্ত জরুরি ।

আপাতত বলা যায় চল্লিশ পঞ্চাশ ও ষাট দশকে শক্তিমান কবিগোষ্ঠী বিভিন্ন দিক থেকে বাংলা কবিতার সমৃদ্ধি ঘটিয়েছেন । দেশে বিদেশে যে-সব ঘটনা সংগঠিত হয়েছিল কোনো কোনো কবি তার দ্বারা প্রবলভাবেই এক সময় প্রভাবিত হয়েছিলেন এ কথা মেনে নিয়েও বলা যায় বেশ-কয়েকজন চল্লিশের কবি আপন কবিপ্রতিভার উন্মোচন ঘটিয়ে নিরানন্দ পরিবেশ অতিক্রম করে নতুন নতুন কাব্যরচনায় চিরায়ত কবিতার স্বাক্ষর রেখেছেন । অরুণ মিত্র কিংবা সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মণীন্দ্র রায় বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই সময়কার কবি হলেও কয়েক দশকের কাব্যচর্চার মধ্য দিয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত । কবিদের সমাজসচেতন কবিতার পাশাপাশি এমন কবিতাও রয়েছে যাতে ছন্দ-নৈপুণ্য ও ব্যাকরণগত বিশুদ্ধি অব্যাহত । বিভিন্ন ধরনের ফর্ম নিয়ে এঁদের পরীক্ষা এবং গীতিকবিতার স্বাচ্ছন্দ্যকে এঁরা স্বকীয় প্রণালীতে রূপ দিয়েছেন কবিতায় । এই দশকের চতুর্দশপদী রচনা এবং দীর্ঘ কবিতাও বেশ ব্যাপক । এ প্রসঙ্গে মণীন্দ্র রায় ও হরপ্রসাদ মিত্রের সনেট রচনার দক্ষতা অবশ্যই মনে আসতে পারে । পঞ্চাশ দশকেও প্রতিনিধিস্থানীয় কবিদের কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে শিল্পদক্ষতা । অরবিন্দ গুহ অসিতকুমার ভট্টাচার্য সুনীলকুমার নন্দী প্রফুল্লকুমার দত্ত কবিতা সিংহ ফণিভূষণ আচার্য স্বদেশরঞ্জন দত্ত বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত সুধেন্দু মল্লিক দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় উৎপলকুমার বসু মলয়শঙ্কর দাশগুপ্তর কবিতাবলী সমকালীন কবিতায় নিজ নিজ কৃতিত্বের স্বাক্ষরে সমৃদ্ধ । তিরিশের প্রবীণতর কবিদের কাব্যভাষা ও শিল্পরীতির পূর্ণাবয়ব রূপও এই সময়ে পরিদৃষ্ট হয়েছিল জীবনানন্দ অমিয় চক্রবর্তী বুদ্ধদেব ও বিষ্ণু দে-র কবিতায় । চল্লিশ দশক পর্যন্ত বাঙালি কবি ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইংরেজি কাব্যসাহিত্য পাঠের মধ্য দিয়েই প্রধানত নিজেদের কাব্যানুভূতিকে নিবিড় করে তুলেছেন । সুইনবার্ন ইয়েটস লরেন্স এলিয়টের কবিতা থেকে প্রেরণা পেয়েছিলেন তিরিশের কবিসমাজের বেশ-কয়েকজন । অন্যদিকে চল্লিশের কবিতাও কিছু পরবর্তীকালের ইংরেজ কবি— অডেন স্পেণ্ডর ইশারউডের অভিজ্ঞতার স্মারক । পঞ্চাশের দশকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে দেখা গেল ফরাসি জার্মান সোভিয়েট ও আরো কয়েকটি ভাষায় রচিত কাব্যসাহিত্যের দিকে বাঙালি কবির পক্ষপাত । স্মরণ করা যেতে পারে পঞ্চাশ দশকেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্যের বিভাগ খোলা হয় । তখন থেকেই তরুণ বাঙালি কবি প্রধানত পঠনপাঠনের মধ্য দিয়েই য়ুরোপের প্রধান দেশগুলির সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হয়ে ওঠেন । সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বুদ্ধদেব বসু তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপক হওয়ায় তরুণ ছাত্রসমাজের কবিতার দিকে ঝোঁক বিদেশী কবিতার অন্তঃসারকে আয়ত্ত করার আন্তরিক ইচ্ছায় প্রবল ছিল । বস্তুত সমগ্র বিশ্বব্যাপ্ত কবিতার আকাশ বিভিন্ন দেশের কবিতাবলীর অনুবাদের মধ্য দিয়ে বাঙালি পাঠকের কাছে এই সময় থেকেই নিকটতর । অনূদিত কবিতার রসাস্বাদন শুধুমাত্র পাঠকের অনুবাদের সীমাকেই প্রসারিত করে নি, বাঙালি কবিসমাজও উপকৃত হয়েছিল এবং মার্কিন ও ইউরোপের সাহিত্য ছাড়াও তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কবি ও কবিতার সঙ্গে পরিচয় হওয়া সহজ হয় । এযাবৎকাল প্রায় অনাবিষ্কৃত শিল্পরূপ, আঙ্গিকের বিন্যাস ও উচ্চারণ বাঙালি কবির কাছে আর অগম্য রইল না । বিদেশী কবিতার বাংলা অনুবাদ নিয়ে বিস্তারিত উল্লেখ এই সীমিত প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নয় । শুধু এটুকুই বলা যায় বাঙালি কবির অনুবাদচর্চা অপ্রত্যক্ষভাবে বিস্তৃত শিল্পকর্মের সন্ধানী হওয়ায় সম্পদের দিক থেকে কবিতার ধারা হয়ে উঠেছিল ঐশ্বর্যবান । শঙ্খ ঘোষ ও অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত -সম্পাদিত **'সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত'** একালের বাঙালি কবির অনুবাদচর্চার প্রামাণ্য গ্রন্থ, যদিও তিরিশ চল্লিশ ও ষাট দশকের কবিদের অনুবাদচর্চার প্রমাণও অপ্রতুল নয় । বিদেশী কবিতার অনুবাদের প্রসঙ্গটি এইজন্যেই উল্লেখ করা হল যে আধুনিক বাঙালি

কবির অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র এতে বিস্তৃততর হওয়ায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে নতুন নতুন চিত্রকল্প ও প্রতীক কাব্যভাষায় রূপান্তর ঘটিয়েছে ।

বহুকাল বাদে এখন উপলব্ধি করা যায় যে রবীন্দ্রকাব্যের বিশাল ঐতিহ্যকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয় নি । রবীন্দ্রকাব্যের শব্দভাণ্ডারের কাছে পরবর্তীকালের আধুনিক কবি ঋণী, শক্তিমান আধুনিক কবিদের অনেকেই নতুন নতুন শব্দ ব্যবহারে কবিতায় বৈচিত্র্য এনেছেন, অনেক বিদেশী ও ইতিপূর্বে অব্যবহৃত শব্দাবলী যোগ্যতার সঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে কিন্তু রবীন্দ্র-কবিপ্রতিভাসৃষ্ট অজস্র শব্দের ব্যবহারকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয় নি । উত্তরকালে দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ-ব্যবহৃত অজস্র শব্দ নতুন তাৎপর্যসন্ধানে ব্যবহৃত । ছন্দে ও শব্দচিত্রে যে বৈচিত্র্য দেখা যায় তাতে রবীন্দ্র-প্রবর্তিত নানা শব্দের অপ্রতুলতা সাধারণত নজরে পড়ে না । যেখানেই লিরিক সুরের ব্যাপ্তি, যেখানেই রোম্যান্টিক মানসিকতার গুঞ্জরণ সেখানেই রবীন্দ্রসৌন্দর্যের ঐশ্বর্য ব্যবহৃত । সুধীন্দ্রনাথ অমিয় চক্রবর্তী বুদ্ধদেব বসু পুরনো শব্দকেই নতুন তাৎপর্য দান করতে চেয়েছেন, সে-প্রয়াস তিরিশের পরবর্তীকালেও অব্যাহত । নরেশ গুহ অরুণ সরকার অলোকরঞ্জন শঙ্খ ঘোষ আলোক সরকার পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের কবিতা এ প্রসঙ্গে মনে পড়বে । বিশেষ বিশেষ মন্তব্যের সমর্থনে কবিতার স্তবক বা পঙ্‌ক্তির উদ্‌ধৃতি সাহিত্য-সমালোচনার অন্তর্ভুক্ত হলেও আলোচ্য রচনার সীমিত পরিসরে তা সম্ভব নয় । চিত্রকল্প প্রতীক উপমা গত তিন দশকের কবিতায় ছড়িয়ে রয়েছে, ভাষা কখনো নিরাভরণ কখনো অলংকারে সমৃদ্ধ । যে-কোনো কবির উচ্চারণ তাঁর নিজস্ব ব্যাপার, কিন্তু শব্দ সংগ্রহের জন্যে তাঁকে প্রবহমান ঐতিহ্যের মুখোমুখী হতে হবে । চল্লিশের কবিরা বলতে গেলে ক্ষয়িষ্ণু সমাজের পরিবেশে আশ্বস্ত হবার উপকরণগুলো খুঁজে পান নি । সুতরাং নিঃসঙ্গতা তিক্ততা ও কখনো কখনো ক্রোধ তাঁদের সৃষ্টিশীলতায় এক সময় প্রবল প্রভাব বিস্তার করেছিল । কিন্তু মনে রাখা দরকার তাঁদের অনেকেই ফিরে এসেছিলেন হৃদয়সংবেদ্য অনুভূতির জগতে । আত্মকেন্দ্রিকতার জগৎকে কেন্দ্র করে পঞ্চাশের দশকে যে কবিতা রচিত হয়েছিল তার অধিকাংশই ছিল শরীরজাত অনুভূতিতে আচ্ছন্ন এবং অনেক সময় তীব্র যৌনবোধ এই কবিতাকে একটা বাড়তি মাত্রা দিয়েছিল । সুখের বিষয় চল্লিশের সফল কবিরা যেমন সামাজিক সংকটের ধূসর জমিতে পদচারণ করার পরেও ছন্দমিল ও ধ্বনিমাধুর্যের দৃশ্যের জগতে ফিরে তাকিয়েছেন, পঞ্চাশের সফল কবিরা তেমনি অনেক ক্ষেত্রে একান্ত ব্যক্তিগত স্বীকারোক্তিমূলক উচ্চারণের স্তর পেরিয়ে একালের কবিতার পটভূমিকে পরিব্যাপ্ত করেছেন । প্রকৃত প্রস্তাবে যথার্থ কবি, তিনি যে কালেই কবিতা লিখুন-না কেন, পাঠককে প্রভাবিত করবেন তাঁর শিল্পপ্রকরণের মধ্য দিয়েই । ষাট দশক পর্যন্ত বাংলা কবিতার ধারায় এই বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে এবং পরবর্তীকালেও একজন সংবেদনশীল কবি শিল্প আস্বাদনের ক্ষেত্রে পাঠককে সঙ্গে নেবার পক্ষপাতী ।

সম্পাদকীয় সংযোজন :

বাংলা কবিতার এই পর্বে প্রবন্ধলেখক কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত নিজে একজন বিশিষ্ট কবি । তাঁর প্রথম কবিতাগ্রন্থ 'স্বপ্নকামনা' রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পূর্বে প্রকাশিত হলেও তাঁর কবিতা লেখা এখনো অব্যাহত । চল্লিশের দশকে রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক কবিতার ভাবধারায় সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি যাঁরা প্রবর্তন করেছেন কিরণশঙ্কর তাঁদের অন্যতম । এই ভাবের কবিতা নিয়ে বের হয় তাঁর দ্বিতীয় কবিতাগ্রন্থ 'স্বর ও অন্যান্য কবিতা' ১৯৫৩তে । তবে একই সঙ্গে সমাজ-সচেতনতা এবং কবিতার শুদ্ধতা রক্ষা দুই প্রবণতা নিয়েই তাঁর বিশিষ্টতা ।

কবিতা
২

সুমিতা চক্রবর্তী

একদা ১৯৪৪ সালে 'ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক সঙ্ঘ' থেকে প্রকাশিত এক রচনা-সংকলনের মুখবন্ধে হিরণকুমার সান্যাল ও সুভাষ মুখোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিলেন—

"একথা আজ স্বীকৃত যে সাহিত্যের ও শিল্পের তাগিদ আসে সমাজ থেকে, মেঘলোক থেকেও নয়, মানুষের অন্তরলোক থেকেও নয়।"[১]

এরই পাশাপাশি উল্লেখ করা যাক একুশ বছর পরে একটি পত্রিকায় এক কবিগোষ্ঠীর কবিতা-বিষয়ক প্রত্যাশা—

"জৈব আর্তনাদ কিংবা সমাজ-চিন্তার স্থান যেখানেই হোক কবিতায় নয়।"[২] ঐ 'শ্রুতি' পত্রিকারই পরবর্তী একটি সংখ্যায় লেখক-নাম-বিহীন একটি ঘোষণা-পত্রের ছয়টি সূত্রের তৃতীয়টিতে বলা হয়েছে— "ব্যক্তির কল্পনাময় আন্তরিক অভিজ্ঞতা বা উপলব্ধির প্রকাশে ব্যক্তিত্বের পরিমণ্ডল রচনাই কবিতা। তাই কবিতা হবে— ব্যক্তিগত, মগ্ন এবং একান্তই অন্তর্মুখী।"[৩]

আমাদের মনে রাখতে হবে, 'কেন লিখি' সংকলনের ভূমিকা— লেখকদ্বয় যেমন বিশেষ একটি গোষ্ঠীগত মানসিকতা প্রকাশ করেছিলেন— তেমনিই, 'শ্রুতি' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীও লিখেছিলেন তাঁদের কয়েকজনের মনের কথা। সম্পূর্ণত সকলের কথা নয়। তবু, দুই যুগের মূল প্রবণতাটির বৈপরীত্য হয়তো এই দুই সময়ের উদ্‌ধৃতি-দুটিতে প্রতিফলিত।

'সকলের কথা' নামক কোনো এক মতের মঞ্চে সম্ভবত শিল্প-সাহিত্য নিয়ে কখনোই দাঁড়ানো যায় না। তবু সাহিত্য-সৃষ্টি-ব্যাপারে রবীন্দ্র-তিরোধানের পঞ্চাশ বছর পরেও রবীন্দ্র-উক্তিই সম্ভবত গোষ্ঠীচাপ-বিরুদ্ধ সাহিত্য-রসিকদের মুক্ত মনের কাছে সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য।

"জগতের উপরে মনের কারখানা বসিয়াছে এবং মনের উপরে বিশ্বমনের কারখানা— সেই উপরের তলা হইতে সাহিত্যের উৎপত্তি।"[৪]

'বিশ্বমন' সংক্রান্ত কোনো ব্যাখ্যায় যাবার আগে আমাদের ধীরভাবে বুঝে নিতে হবে 'জগৎ' এবং 'মন' —এই দুটি বিষয়। একটি দেশের একটি সময়-পর্বের কবিতার বিচারে সমকালীন আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, স্বাদেশিক ও আন্তর্জাতিক পটভূমিটি (জগৎ) যেমন দেখতে হবে, তেমনই করতে হবে কবি-ব্যক্তিত্বের (মন) স্বাতন্ত্র্যের সন্ধান।

রবীন্দ্রজীবৎকালের শেষ দশকে, খানিকটা আন্তর্জাতিক সাহিত্যের নতুন বাস্তববাদী দৃষ্টির অনুসরণে বাংলা

কবিতা (কথাসাহিত্যও) হয়ে উঠেছিল মহাযুদ্ধ-ধ্বস্ত ইউরোপের নৈরাশ্যবোধের শরিক । সেইসঙ্গে ইউরোপীয় কবিতায় যে নব্য রূপ-রীতি দেখা যাচ্ছিল উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, ফ্রান্সে ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার কবিতায় যার পরিস্ফুটন ঘটে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে— ইংরেজি ভাষার সূত্রে তার প্রত্যক্ষ স্বাদ পেয়েছিলেন বাঙালি কবিরা । প্রসঙ্গ ও প্রকরণ উভয় ক্ষেত্রেই বাংলা কবিতার ঘটল তুমুল রূপান্তর । কবিতা একই সঙ্গে হল ভাঙন-সচেতন ও অন্তর্মগ্ন । সিমবলিজ্‌ম্, সুররিয়ালিজ্‌ম্, স্ট্রিম অভ্ কনশাস্‌নেস্ ইত্যাদি শিল্প-ধারণাগুলি কিছু কিছু গ্রহণও করলেন বাঙালি কবিরা । কোথাও তাঁদের দৃষ্টিতে মিশে গেল লরেন্সীয় যৌনচেতনা, কখনো হুইটম্যানের মানবতাবোধ, কখনো একান্ত সমকালীন বামপন্থী হাওয়া । পাউণ্ড আর এলিয়ট-এর অনুসরণ তো ছিলই । একদিকে রবীন্দ্রসৃষ্টির অমেয়-গভীর অজস্রতা, অন্য দিকে আন্তর্জাতিক সাহিত্যের এই সম্পন্ন উত্তরাধিকার বাংলার সাহিত্য-ক্ষেত্রে জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ, অমিয় চক্রবর্তী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু ও বিষ্ণু দে-র মতো কবি সম্ভব করেছিল ।

বছর ছয়-সাতের মধ্যেই কিন্তু বাংলা কবিতার ধাত বদলায় কিছুটা । তার মূলে ছিল বিশ্বের রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতির বিক্ষুব্ধতা । এক পক্ষে তখন একনায়কতন্ত্রী উত্থান ও তার প্রতিরোধ, অন্য পক্ষে সাম্যবাদের উত্থান ও তার বিরুদ্ধতা । বিশ্বের সর্বত্র সাম্রাজ্যবাদী ও পুঁজিবাদী শক্তিসমূহের প্রতিযোগিতামূলক আগ্রাসন ; দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জটিল বৈনাশিকতা । ভারতে সেইসঙ্গেই স্বাধীনতা-আন্দোলনের ক্রমবর্ধমান চাপ । জন-জীবনভাবনাকে কেন্দ্রে রেখে বাংলা কবিতার ভাব ও রূপের বদল ঘটল অনেকটাই । আমরা পেলাম চল্লিশের দশকের সমাজমনস্ক কবিতাবলী ।

১৯৪৭-এ স্বাধীনতা অর্জিত হবার তিন-চার বছরের মধ্যেই বাংলা কবিতার সমাজমনস্ক চরিত্রটি আবার অন্তর্মুখীন হয়ে পড়বার প্রবণতা দেখা দেয় নানা কারণে । সদ্যঃস্বাধীন দেশের তরুণেরা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের শৃঙ্খল-হীন উন্মেষ-পর্বে নিজেদের ভিতর-মনটিকেই প্রথমে চিনে নিতে চাইলেন । আত্মগত রোম্যান্টিক কবিতার দীর্ঘ ঐতিহ্য নতুনভাবে আত্মপ্রকাশ করল । অনুশাসন-না-মানা ব্যক্তিচিত্তের স্বতঃস্ফূরণ এই সময়েই বাংলা কবিতার প্রধান প্রবণতা হয়ে ওঠে । পঞ্চাশের দশকের প্রথমার্ধে এবং মধ্যভাগে সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করা পত্রিকা 'কৃত্তিবাস'-এর (প্রকাশ ১৯৫৩) কবিবৃন্দ বেশ সচেতনভাবেই আত্মবৃত্ত এবং আত্মগত হতে চাইলেন । হতে পারলেনও । বহির্বিশ্বের প্রেক্ষিত সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে কোনো আত্মমগ্নতাই সম্ভব হয় না । কিন্তু প্রত্যাখ্যাত বহির্বিশ্বের সংকট-বিক্ষোভ-প্রতিকার ইত্যাদিকে কবিতা থেকে প্রায় বর্জনই করলেন এই কবিরা এই সময়ের কবিতায় । আর একটি ক্ষীণকায় পত্রিকা 'শতভিষা' (প্রকাশ ১৯৫১) পরবর্তী সময়ে ধীরে ধীরে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল কবিদের মধ্যে । এখানেও সমাজ-প্রসঙ্গ গুরুত্ব পেত না— চিত্তের অসংবৃত উচ্ছ্বাস বা বাসনা-তীব্রতার প্রকাশও কবিতায় খুব জরুরি মনে করতেন না এই পত্রিকার প্রধান কবিরা । রাজনৈতিক বিশ্বাস ও সামাজিক সচেতনতার স্পষ্টতাকে কবিতা থেকে সাধারণভাবে পঞ্চাশের কবিরা দূরেই রাখলেন । খানিকটা হয়তো পূর্ববর্তী সময়ের অজস্র উচ্চ-কণ্ঠ কবিতার প্রতিক্রিয়ায় । খানিকটা সম্ভবত, সমকালের রাজনৈতিক গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের প্রতি বিমুখতায় ।

এই সমগ্র প্রেক্ষণ-পট পিছনে রেখে আমরা ষাটের দশকের নাড়ীতে হাত রাখলেই অনুভব করি সময়ের স্পন্দন-ছন্দ জটিলতর— সে আর তেমন নিয়মিত নয় । ষাটের দশকই সম্ভবত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধারা ও ধারণার বিন্যাসে ও প্রতিন্যাসে সবচেয়ে গ্রন্থিলতাময় । অনেকে ষাটের দশকের কবিতাকে পঞ্চাশের কবিতার অনুবর্তন মনে করেন । কিন্তু খুবই অসম্পূর্ণ এই ধারণা— বে-ঠিকও বলা যায় । এই দুই দশকের কবিতার বাইরের রূপেও আছে যথেষ্ট পার্থক্য— যদিও প্রতিটি ক্ষেত্রেই তা বড়ো হরফে দেখিয়ে দেবার মতো নয়। ভিতর থেকেও বাংলা কবিতা একটি গভীর পরিবর্তন-প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল । ষাটের কবিরা প্রধানত অন্তর্মুখী কবিতাই লিখেছেন, প্রত্যক্ষভাবে সমাজ ও রাজনীতির পরিস্থিতি-স্পর্শী কবিতা প্রায়ই লেখেন নি । তবু তাঁদের

কবিতার অন্তর্মুখীনতার কারণ ও ধরন পঞ্চাশের কবিদের অন্তর্মুখীনতার চেয়ে ছিল অনেকটাই আলাদা। উৎস ও অভিপ্রায়— উভয়তই তা ভিন্ন পথযাত্রী।

স্পষ্টভাবে কোনো সামাজিক বক্তব্য প্রাধান্য না পেলেও ষাটের কবিদের কবিতার অবয়ব ও অস্তিত্ব যেন কোনো এক নিহিত বিপন্নতাবোধে আক্রান্ত। আবার অন্য দিকে কবিতার বহিরঙ্গের শিল্পিত বন্ধনগুলি এলোমেলো করে দেবার পক্ষে তাঁরা একেবারেই নন। সুস্থ এবং স্বচ্ছ কাব্য-ধারণা গড়ে নেবার পক্ষপাতী তাঁরা। আবেগ ও মনন -মিশ্রিত এক উপলব্ধির ভিতের ওপর প্রথম থেকেই তাঁরা কবিতাকে দাঁড় করাতে সচেষ্ট ছিলেন। পরবর্তী সময়প্রবাহে তাঁরা লক্ষ্যভ্রষ্ট হন নি প্রায়ই। তবে এ-সবের ফলে সব সময়েই উৎকৃষ্ট কবিতা রচিত হতে পেরেছে এমন নয়, কারণ কবিতার জন্ম-উৎসে সম্ভবত আছে সেই রহস্যময়তা যেখানে পরিণত দর্শন আর সমূহ বিভ্রান্তির প্রায় একই দাম।

ষাটের দশকের কবিতার বাতাবরণ বোঝার জন্য কয়েকটি সামাজিক-রাজনৈতিক ঘটনা-সূত্র সন্ধান করতে হবে।

স্বাধীনতার পরেই দেশের নাগরিকেরা কম-বেশি এক দশক সময় অতিবাহিত করেছিলেন রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের প্রতি ধৈর্যশীল ও সহানুভূতি-সম্পন্ন প্রত্যাশায়। কিন্তু দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৫৬–১৯৬০) যখন শিল্পোন্নয়নের দিকে প্রায় সম্পূর্ণ গুরুত্ব দেওয়া হল খাদ্যে স্বনির্ভরতা আসার আগেই— তখনই দরিদ্র দেশের খাদ্য-সংকট ক্রমে বৃদ্ধি পেতে থাকে। পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যের দাবিতে আন্দোলন এবং ময়দানের কৃষকসমাবেশে গুলিবিদ্ধ হয়ে কৃষকের মৃত্যু ১৯৫৯ সালের ঘটনা। তার পর হরতাল। ১৯৬০-এ রেল ধর্মঘট। ১৯৬১-তে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে ভিয়েতনাম যুদ্ধের সংকট ও পুঁজিবাদী শক্তির আগ্রাসী মুখ। ১৯৬২-তে চীন-ভারত যুদ্ধ বেশ বড়ো আঘাতই হেনেছিল। একদিকে ভারতের প্রস্তুতিহীন প্রতিরক্ষা বিভাগের দুর্বল প্রতিরোধে দেশবাসী কোনো আশ্বাস পান নি, অন্য দিকে তৎকালীন বাঙালির রাজনৈতিক ভরসাস্থল বামপন্থী দলটি চীনের আক্রমণের সামনে রাজনৈতিক আনুগত্য নিয়েও বিপদে পড়েছিল বেশ।

এই আত্মবিশ্বাসহীন সামাজিক পরিস্থিতিতে আমেরিকার কবি অ্যালেন গিন্‌স্‌বার্গ ভারতে এসেছিলেন ১৯৬১-র শেষে। তিনি পরিচিত হলেন পাটনার দুই তরুণ কবি সমীর রায়চৌধুরী ও মলয় রায়চৌধুরীর সঙ্গে। এই সম্মেলন থেকে জন্ম নিল ষাটের দশকের প্রথম আলোড়ন তোলা কবিতার আন্দোলন— 'হাংরি জেনারেশন' বা 'ক্ষুৎকাতর প্রজন্ম'।

আলোড়ন খানিকটা তুললেও এই কবিতা-ভাবনা বাংলা কবিতার ধারায় খুব বড়ো যে কোনো পরিবর্তন আনতে পেরেছিল তা নয়। তবু ষাটের দশকের কবিতার চরিত্র বুঝতে গেলে এই কবিগোষ্ঠীকে একটু বুঝতে হবে।

১৯৬১-র ডিসেম্বরে লিফলেট ধরনের কাগজের টুকরোয় প্রথম হাংরি জেনারেশন সম্পর্কে কিছু কথা লেখা হয়। কিন্তু তেমনভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল ১৯৬২-র এপ্রিল মাসে প্রকাশিত প্রথম 'হাংরি জেনারেশন' বুলেটিন। এই বুলেটিনে নাম ছিল তিন জনের। স্রষ্টা মলয় রায়চৌধুরী, নেতৃত্বে শক্তি চট্টোপাধ্যায় এবং সম্পাদনায় দেবী রায়। পঞ্চাশের কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের অন্তর্ভুক্তিতে মনে হ.ে ারে যে ষাটের কবিদের পৃথক কোনো ভাবনা ছিল না এই বুলেটিনের মূলে। কিন্তু এক হিসেবে তা ছিল। প্রথম থেকেই এই কবিরা বলতে চেয়েছিলেন এক নতুন প্রজন্মের কবিতার কথা— সম্মিলিতভাবে। পঞ্চাশের কবিরা ব্যক্তিগত ছিলেন আক্ষরিক অর্থেই। 'শতভিষা' বা 'কৃত্তিবাস'-এর কবিরা একত্র হন নি কোনো ঘোষিত ঐকমত্যের ভিত্তিতে। নিজেদের মতোই লিখতেন তাঁরা, কেবল কবিতা প্রকাশের জন্য মিলিতভাবে অবলম্বন করেছিলেন একটি পত্রিকা। কিন্তু ষাটের কবিরা প্রথম থেকেই কবিতা-ভাবনাকে একটি যৌথ রূপ দেবার চেষ্টা করেছিলেন। এই গোষ্ঠীগত কাব্যভাবনা চল্লিশের দশকের মতো রাজনৈতিক বিশ্বাসের মঞ্চে সংবদ্ধ হয় নি। ব্যক্তিগত চেতনাকেই যেন তা প্রবল ও সংহত করে তুলতে

চাইছিল কোনো এক সামূহিক বিপন্নতাবোধ ও যন্ত্রণাবোধ থেকে ।

মলয় রায়চৌধুরী প্রথম বুলেটিনে লিখেছিলেন— "কবিতা এখন জীবনের বৈপরীত্যে আত্মস্থ । সে আর জীবনের সামঞ্জস্যকারক নয়, অতিপ্রজ অন্ধ বল্মীক নয়, নিরলস যুক্তিগ্রন্থন নয় । এখন, এই সময়ে অনিবার্য গভীরতার সন্ত্রস্তদৃক ক্ষুধায় মানবিক প্রয়োজন এমনভাবে আবির্ভূত যে, জীবনের কোনো অর্থ বের করার প্রয়োজন শেষ ।... প্রাগুক্ত ক্ষুধা কেবল পৃথিবীবিরোধিতার নয়, তা মানবিক, দৈহিক এবং শারীরিক । এ ক্ষুধার একমাত্র লালনকর্তা কবিতা, কারণ কবিতা ব্যতীত আর কি আছে জীবনে ।"— প্রারম্ভিক বাক্যগুলির উচ্ছ্বাস এবং ভাষাগত অসতর্কতা সত্ত্বেও সময়ের এক কাতরতা ব্যক্ত হয়েছে এই ছত্রগুলিতে । পৃথিবী যেন এখানে কবির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে । দেহের ক্ষুধা এখানে অন্যান্য মানসিক ক্ষুধার সঙ্গেই স্বীকৃত ।

রচনাটিতে এর পর কবিতার নির্মাণ বিষয়ে লেখা হয়েছিল বিকল্পহীন স্বতঃস্ফূরণের কথা ।— "বিষ খেয়ে অথবা জলে ডুবে সচেতনভাবে বিহ্বল হলেই এসব কবিতা সৃষ্টি সম্ভব ।..."

কথাটি কিছু নতুন নয় । ফরাসি সুর-রিয়েলিস্ট-রা এই শতাব্দের তৃতীয় দশকে স্পষ্ট করেই তুলেছিলেন কবিতার নিয়ন্ত্রণমুক্ত উৎসারণ ও স্বয়ংক্রিয় সৃষ্টিকর্মের দাবি । পশ্চিমী কবিতায় সেই উনিশ শতক থেকেই মাঝে মাঝে কথাটি বলা হয়েছে । বাংলা কবিতায় যে কথাটি জোর গলায় বলা হল এই প্রথম— তারও প্রেরণা এসেছিল পশ্চিম থেকে— সদ্যঃপরিচিত অ্যালেন গিন্‌স্‌বার্গ-এর ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে ।

চল্লিশের দশকের আমেরিকায়, হয়তো বা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভাঙনের সমকালবর্তিতায়, এক দল তরুণের মনে জেগেছিল সভ্যতার আপাত-উন্নতি ও সু-শৃঙ্খলার প্রতি তীব্র বীতরাগ । প্রচলিত অর্থে সুখী, শোভন ও উচ্চাশী জীবনের কাঠামো পরিত্যাগ করে তাঁরা অস্তিত্বের মর্মমূল সন্ধান করতে চেয়েছিলেন, চেয়েছিলেন চেতনার গভীরতম সত্যে পৌঁছতে । অবশ্য ভারতীয় ধারণার ধ্যানের পথও তাঁদের কাছে গ্রহণীয় ছিল না । তাঁরা বেছে নিলেন জীবন-যাপনের চূড়ান্ত নিয়মহীনতা । সচেতনভাবে নিশ্চেতনায় ডুবে যাবার পথ তাঁদের কাছে হয়ে দাঁড়াল মাদক-সেবন । জীবন-যাপনের এই ভঙ্গি আর কবিতা-বিষয়ক উচ্চকণ্ঠ দাবির জন্য এঁরা যতটা খ্যাতিমান— কবিতায় তাঁরা ততটা প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন নি । উইলিয়াম বারোজ, নীল ক্যাসাডি, জ্যাক কেরুয়াক প্রমুখ কবিদের তুলনায় গিন্‌স্‌বার্গ কবি হিসেবে ছিলেন সফল । এঁরাই আমেরিকার 'বীট' কবিগোষ্ঠী । তাঁদের মতে কবিতা হবে সচেতন মনের নিয়ন্ত্রণ-হীন । শোভন-সুন্দরকে প্রকাশের কোনো দায় নেই কবিতার । নিহিত সত্তার ক্রোধ ও আর্তি -তাড়িত বিস্ফোরণময় প্রকাশ ঘটবে কবিতায় । তা হবে উন্মত্তবৎ, আতঙ্কিত, দুঃস্বপ্নময় ।

১৯৬০-এর পর আমেরিকায় এই কাব্য-আন্দোলন স্তিমিত হয়ে আসে । তবে গিন্‌স্‌বার্গ তরুণ বয়সের আতিশয্যগুলি পরিহার করে পরবর্তীকালে খানিকটা প্রথাসিদ্ধ মূল ধারায় ফিরে আসেন । আমেরিকার যে নাগরিকেরা ষাটের দশকে যুদ্ধ-বিরোধী আন্দোলন করেছিলেন তাঁদের সঙ্গে মিলিত হয়ে সামাজিক দায়ও স্বীকার করেছিলেন তিনি ।

বীট কবিদের দ্বারা বাংলার 'হাংরি জেনারেশন' কবিরা প্রভাবিত ছিলেন কিনা এ-বিষয়ে তাঁরা নিজেরা কিছু বলেন নি । তবে সমকালীন পত্র-পত্রিকায় কথাটি মাঝে মাঝে উঠত । আবু সয়ীদ আইয়ুব একটি চিঠিতে গিন্‌স্‌বার্গকে লিখেছিলেন—

"I do not agree with you that it is the prime task of the Indian Committee for Cultural Freedom to take up the cause of these immature imitators of American Beatnik poetry."[৫]

হাংরি জেনারেশন-এর কবিরা 'বীটনিক' আন্দোলন সম্পর্কে সচেতন ছিলেন বলেই মনে হয় । গিন্‌স্‌বার্গ-এর ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর "হাউল" কবিতাটির ('হাউল অ্যাণ্ড আদার পোয়েম্‌স্', ১৯৫৬) অসামান্য জনপ্রিয়তা তুচ্ছ করা সম্ভব ছিল না । আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিতি লাভ করবার একটা ইচ্ছেও ছিল তাঁদের মধ্যে । তা না

হলে এই বাঙালি কবিরা কেন বার বার ইংরেজি ভাষায় রচনা করবেন তাঁদের ম্যানিফেস্টো ? 'হাংরি'-র চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ বুলেটিন রচিত হয় ইংরেজিতে । চতুর্থ বুলেটিনে প্রকাশিত চৌদ্দ সূত্রের ইশ্‌তাহারটি এখানে তুলে দেওয়া যাক—

1. The merciless exposure of the Self in its entirety.
2. To present in all nakedness all aspects of the Self and thing before it.
3. To catch a glimpse of the exploded Self at a particular moment.
4. To challenge every value with a view to accepting or rejecting the same.
5. To consider everything at the start to be nothing but a 'thing' with a view to testing whether it is living or lifeless.
6. Not to take reality as it is but to examine it in all its aspects.
7. To seek to find out a mode of communication, by abolishing the accepted modes of Prose and Poetry which would instantly establish a communication between the poet and his reader.
8. To use the same words in poetry as are used in ordinary conversation.
9. To reveal the sound of the word, used in ordinary conversation, more sharply in the poem.
10. To break loose the traditional association of words and to coin unconventional and here-to-fore unaccepted combination of words.
11. To reject traditional forms of poetry and allow poetry to take into original forms.
12. To admit that poetry is the ultimate religion of man.
13. To transmit dynamically the message of the restless existence and the sense of disgust in a razor-sharp language.
14. Personal ultimatum.

এ-জাতীয় ম্যানিফেস্টো রচনার প্রবণতা ইউরোপীয় কবিদের মধ্যে যথেষ্ট দেখা দেয় । এজরা পাউণ্ড -রচিত ইমেজিস্ট ম্যানিফেস্টো-র সঙ্গে এই সূত্রাবলীর সাদৃশ্যও লক্ষণীয় । কিছু উচ্ছ্বাস, পুনরুক্তি ও অসংবদ্ধতা বাদ দিলে এই চৌদ্দ সূত্রের মূল বক্তব্য হল দুটি । এক. কবিতা হবে সত্তার অবারিত নগ্ন প্রকাশ । দুই. কবিতার ভাষা এবং অবয়ব হবে সর্বতঃস্বাধীন এবং অকৃত্রিম ।

কিন্তু এই সূত্রাবলীতে যা বলা হয় নি তার নিদর্শন 'হাংরি জেনারেশন'-এর কবিতায় ও অন্যান্য কোনো কোনো ঘোষণায় পাওয়া যায় । সেখানে দেখা যায়, এই কবিদের ঘিরে রয়েছে এক অভাবী সমাজ যেখানে মেটে না মানুষের ন্যূনতম প্রয়োজনগুলি, যে-সমাজ বিকৃত, বিকলাঙ্গ, অসুস্থ । 'হাংরি'-র দ্বিতীয় বুলেটিনে প্রকাশিত শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার নাম "সীমান্ত প্রস্তাব ১ - মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি নিবেদন"—

কবিতা ভাতের মতো কেন লোকে নিতেই পারছে না
যুদ্ধ বন্ধ হলে নেবে ? ভিখারিও কবিতা বুঝেছে
তুমি কেন বুঝবে না হে অধ্যাপক, মুখ্যমন্ত্রী সেন?

কবিতাটির প্রত্যক্ষ ভাষণ এক ক্ষুৎকাতর স্বদেশকে তুলে ধরে ।

'হাংরি জেনারেশন'-এর পুস্তিকা, বুলেটিন ও লিফলেটগুলি প্রায়শই ছিল দিনাঙ্কহীন । তবে বেশির ভাগই বেরিয়েছিল ১৯৬২ থেকে ১৯৬৪-র মধ্যে । গদ্য লেখাগুলিতে 'বুর্জোয়া', 'শ্রেণী', 'অরাজকতা' ইত্যাদি শব্দের পৌনঃপুনিক প্রয়োগ আমাদের বুঝিয়ে দেয় যে ব্যক্তির এই আর্ততা প্রতিহত হচ্ছে এক বিমুখ, আগ্রাসী, হৃদয়হীন সমাজের দেয়ালে । 'বীট' কবিদের ভাবনায় কিন্তু ঠিক এই মাত্রাটি এভাবে ছিল না । থাকার কথাও নয় । সে এক ভিন্ন সমাজ । এদেশে অ-প্রাপ্তির যন্ত্রণা ; সেদেশে অতি-প্রাপ্তির অবসাদ ।

'হাংরি'-আন্দোলনের কাব্যফসল খুব বেশি ছিল না । কিন্তু তাঁদের নিয়ে কলকাতার কবি-পাঠক মহল আলোড়িত ছিল বেশ । ১৯৬৪-তে হাংরি-র অষ্টম সংখ্যাটিকে অশ্লীলতার দায়ে আদালতে অভিযুক্ত করা হয় । অভিযুক্তদের মধ্যে দু-একজন একটু বাইরের হলেও অধিকাংশই ছিলেন 'হাংরি-জেনারেশন' কবি । অভিযুক্ত এগারোজনের নাম— সমীর রায়চৌধুরী, মলয় রায়চৌধুরী, সুবো আচার্য, প্রদীপ চৌধুরী, দেবী রায়, সুবিমল বসাক, বাসুদেব দাশগুপ্ত, শৈলেশ্বর ঘোষ, উৎপলকুমার বসু, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, সুভাষ ঘোষ।

এঁদের বিরুদ্ধে কিভাবে মামলা চলেছিল সে বিবরণ এখানে নিষ্প্রয়োজন । আমরা দেখব— কী ছিল এই গোষ্ঠীর কবিদের বৈশিষ্ট্য এবং বাংলা সাহিত্যে কী তার ফলাফল ।

'হাংরি জেনারেশন' পত্রিকার যে সংখ্যাটি প্রচার আদালত -কর্তৃক নিষিদ্ধ হয়েছিল— তাতেই প্রকাশিত মলয় রায়চৌধুরীর "প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার" কবিতাটিকে হাংরি-কবিতার মডেল হিসেবে নেওয়া যেতে পারে । যন্ত্রণা-দগ্ধ ও অস্থির কবিসত্তার শালীনতা-বন্ধন-ছিন্ন বিস্ফোরক প্রকাশ দেখা যায় কবিতাটিতে—

> "ওঃ মরে যাবো মরে যাবো মরে যাবো
> আমার চামড়ার লহমা জ্বলে যাচ্ছে অকাট্য তুরুপে
>
> * * *
>
> চুর্মার অন্ধকারে জাফ্রান মশারীর আলুলায়িত ছায়ায়
> সমস্ত নোঙর তুলে নেবার পর শেষ নোঙর আমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে
> আর আমি পার্ছিনা, অজস্র কাচ ভেঙে যাচ্ছে কর্টেক্সে
> আমি জানি শুভা, যোনি মেলে ধরো,
> শান্তি দাও"

দীর্ঘ কবিতাটিতে তিনটি জিজ্ঞাসার চিহ্ন, কয়েকটি কমা এবং শেষে কয়েকটি ডট্ ছাড়া নিয়মিত কোনো যতিচিহ্ন নেই । যৌনতাগন্ধী অভিব্যক্তি কবিতাটিতে যথেষ্টই । অশ্লীলতার অভিযোগটি অস্বীকার করা কঠিন তবে ব্যাপারটিকে এতটা গুরুত্ব দেওয়া উচিত ছিল না বলেই মনে হয় ।

ক্রমেই 'হাংরি জেনারেশন' কবিতার এই উচ্চকিত ভঙ্গির দুর্বলতা অনুভূত হতে লাগল । পাঠকের মনে হল— সমাজবদ্ধ মানবাত্মার যন্ত্রণার আর্ততা নয়, বড়ো হয়ে উঠছে যৌনতাসর্বস্ব, দেহগন্ধী চমকসৃষ্টির প্রয়াস। ফলে কবিতাগুলি অভিঘাতের ক্ষমতা হারাল এবং উত্তেজনার স্বাভাবিক অবসান ঘটল ১৯৬৫ সালের মধ্যেই। তার পরেও অপ্রধানভাবে চলতে চলতে তা ১৯৬৮-তে একেবারেই বন্ধ হয়ে যায় ।

তবু বাংলা সাহিত্যে এই আন্দোলন দু-একটি কাজ করে গেছে । কবিতার নির্মাণে এক দিকে থাকবে শিল্পবোধের কঠিন অনুশাসন, অন্য দিকে থাকবে শিল্পীর অনন্ত স্বাধীনতা । ত্রিশের দশক থেকেই বা বলা উচিত —কল্লোল-পর্ব থেকেই কবিরা এই স্বাধীনতাটি স্পষ্টভাবে চাইছেন । কবিতার বিষয় ও প্রকাশভঙ্গির একটি বিশিষ্ট ধরনকে অনেকদূর টেনে নিয়েছিলেন এই কবিরা । কোনো কোনো সময়ে মনে হয় পঞ্চাশের দশকের দু-তিনজন কবি ও ষাটের দশকে এই আন্দোলনের তরঙ্গেই একটু বেশি যৌনতা-বিষয়ক সচেতনতা কবিতায় সঞ্চারিত করতে

চেয়েছিলেন। 'কৃত্তিবাস' পত্রিকা যে পঞ্চাশের দশকের থেকে ষাটের দশকে একটু ভিন্ন চরিত্র পেয়েছিল তার মূলে কিছুটা গিন্‌স্‌বার্গ এবং কিছুটা 'হাংরি' কবিরাও ছিলেন বলেই মনে হয়। 'হাংরি জেনারেশন' বন্ধ হয়ে গেলেও এ-জাতীয় একাধিক ছোটো পত্রিকা প্রকাশিত হত ১৯৬৭ থেকে ১৯৬৯-এর মধ্যে। হয়তো বা ষাটের দশকের আরো দু-একটি কাব্য-আন্দোলনের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল এই 'হাংরি জেনারেশন'। পরবর্তীকালে এই গোষ্ঠীর কবিরা তাঁদের আতিশয্যের ঝোঁক পরিহার করে সুচিন্তিত ও সুশিল্পিত কবিতা লিখেই বাংলা কবিতার মূল স্রোতে ফিরে এসেছেন। দেবী রায় ও সুবো আচার্যের নাম উল্লেখ্য।

হাংরি কবিতার চরিত্র বুঝতে সাহায্য করবে এমন আর-একটি উদাহরণ—

"মা, তোমার গর্ভের চেয়ে সাংঘাতিক মনে হচ্ছে সভ্যতা ও ব্লাস্টফার্নেস। ৮২ বর্গমাইল বালুর মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে আমি, সময় চেতনাহীন পরস্পরের শরীর থেকে শুষে নিচ্ছে সার পদার্থ, কোন অভিযোগ নাই, শয়তান গলা টিপে ধরবে— আমার ১৬', ১৬" — এই অবস্থায় আমি ভালো মানুষের মতো বেঁচে থাকায় লিপ্ত হতে চাই, নিজেকে

ঠকাতে চাই খুব— "

কবিতাংশটির রচয়িতা শৈলেশ্বর ঘোষ। হাংরি কবিদের রচিত কোনো কোনো কবিতাংশ এখনো কবিতা-পাঠককে নাড়া দেয়। তবে সামগ্রিকভাবে তা যতটা কোলাহলময় ততটা শিল্পময় হয়ে উঠতে পারে নি— নিরপেক্ষ কাল আজ সেই কথাই বলে।

ষাটের দশকের ঠিক মধ্যভাগে 'শ্রুতি' নামের একটি পত্রিকাকে ঘিরে দেখা দিল আর-একটি যৌথ কাব্যভাবনার সক্রিয়তা। ১৯৬৫-র এপ্রিল মাসে বেরিয়েছিল 'শ্রুতি'-র প্রথম সংখ্যা, শেষ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ১৯৭১-এর অগাস্ট-এ।

বাংলার রাজনৈতিক পট তখন অনেকটাই উত্তপ্ত ও আন্দোলিত। কমিউনিস্ট পার্টি দ্বিখণ্ডিত হয়েছে ১৯৬৪-তে, ১৯৬৫-তে চলেছে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ। ১৯৬৬-তে বাংলায় রাজনৈতিক অন্তর্ঘাত প্রবল, খাদ্যের দাবিতে উত্তেজিত সাধারণ মানুষ। ১৯৬৭ থেকে ১৯৬৯-এর মধ্যে নকশালবাড়ি আন্দোলনের উত্তালতা।

এই অশান্ত সময়ের মধ্যেই কিন্তু কয়েকজন বাঙালি কবি সত্তার নিগূঢ়, নিহিত অবলম্বন রূপে কবিতাকে নিবিড়ভাবে গ্রহণ করতে চাইছিলেন। কবিতার বিকীর্ণ তাপে চৈতন্যের পরিস্রুতি ছিল তাঁদের কাঙ্ক্ষিত। সামাজিক-রাজনৈতিক অস্থিরতাকে প্রত্যক্ষ স্পষ্টতায় তাঁরা কবিতায় আনেন নি। কখনো কখনো সময়ের টেনশন-কে স্বীকৃতি দিলেও তাঁদের কবিতা-তত্ত্বটির কেন্দ্রে ছিল কবি-সত্তার আত্মস্থ সৃজনক্রিয়া থেকে উদ্‌ভূত এক শিল্পশুদ্ধতা।

'শ্রুতি'-র প্রথম সংখ্যায় সমবেত ছিলেন পাঁচজন কবি— পুষ্কর দাশগুপ্ত, মৃণাল বসুচৌধুরী, অনন্ত দাশ, পরেশ মণ্ডল এবং সজল বন্দ্যোপাধ্যায়। এই পাঁচজনের মধ্যে পুষ্কর দাশগুপ্তই ছিলেন এই গোষ্ঠীর কাব্য-ভাবনার মূল উদগাতা। এঁদেরই কাছাকাছি কবি ছিলেন সুকুমার ঘোষ, তপনলাল ধর। এই পত্রিকায় কবিতা লিখেছেন এই সময়ের অনেকেই— যাঁরা ছিলেন অনেকটা সম-মনস্ক। যেমন অতীন্দ্রিয় পাঠক। লিখেছেন কিছুটা স্বতন্ত্র মানসিকতার কবিরাও— যেমন গৌরাঙ্গ ভৌমিক। আত্মভাবময় কবিতা প্রাধান্য পেলেও তারই মধ্যে কবিতার বিচিত্র সম্বরণ-ভূমির অধিকার বিষয়ে 'শ্রুতি' পত্রিকার কবিদের দ্বিধা ছিল না। এই পত্রিকায় লিখেছেন কালীকৃষ্ণ গুহ, রত্নেশ্বর হাজরা, অশোক চট্টোপাধ্যায়, অভী সেনগুপ্ত, রথীন ভৌমিক, রবীন সুর। ক্বচিৎ সমাজ-মনস্ক কবিতাও জায়গা পেয়ে গেছে। 'শ্রুতি' গোষ্ঠীর কবিদের কবিতা-ধারণায় খুব অনড় কোনো অনুশাসন ছিল না কিন্তু তাঁদের নিজস্ব একটা কাব্যাদর্শ খুব পরিষ্কারভাবেই ছিল। তাঁরা নিজেরা সেই আদর্শ অনুযায়ী কবিতাও লিখেছিলেন। অত্যন্ত কোলাহল না তুললেও কবিতাচর্চার এই বিশেষ ধরনটি ষাটের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে ভাবিয়েছিল অনেক কবিকেই।

পুষ্কর দাশগুপ্তের একটি উক্তি আমরা আগেই উদ্ধার করেছি— "জৈব আর্তনাদ কিংবা সমাজচিন্তার স্থান যেখানেই হোক কবিতায় নয় ।" 'শ্রুতি'-র প্রথম সংখ্যার এই প্রথম রচনাটিতে পুষ্কর আরো বলেছিলেন— "উপলব্ধির প্রকাশকে সকারণক্ষম করে তোলার ক্ষমতা ও নৈপুণ্য প্রয়োজন । কবিকেও তাই শিক্ষিত হতে হয় । প্রথম শিক্ষা আত্মমগ্নতার । দ্বিতীয় শিক্ষা প্রকাশের ।" এ ছাড়াও তাঁর আর-একটি স্বীকৃতি— "কবিকে পথনির্দেশ দেয় পূর্বজ কবিদের কাব্যকৃতি । আর বর্তমানকালে কবিতার আন্দোলন এবং চরিত্র পৃথিবীর কাব্য-ঐতিহ্যের মূল ধারার সঙ্গে যুক্ত ।"

'শ্রুতি'-তে ইশ্‌তাহার ধরনের সূত্রাবলী একাধিকবার প্রকাশিত হয়েছে । বিশ শতকের প্রথমার্ধে ইউরোপীয় কবিতায় এই সূত্র-নির্দেশের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছিল । সেখান থেকেই ধরনটি পেয়েছিলেন এই কবিরা। একাধিকবার সূত্রাবলী প্রণয়নের ফলে পুনরুক্তি ছাড়াও কিছু স্ব-বিরোধও কখনো কখনো দেখা গেছে । 'শ্রুতি'-র পঞ্চম সংখ্যায় প্রকাশিত ছয়টি নিয়ম-সংবলিত ইশ্‌তাহারটিই সবচেয়ে সুচিন্তিত বলে মনে হয় ।—

১. কোনো রকম ব্যাখ্যা, বিধান বা তত্ত্ব প্রচারের দায়িত্ব কবিতার নেই ।

২. চিৎকার বা বিবৃতি এর কোনটাই কবিতা নয় । রাজনীতি প্রচারিত সামাজিকতা বা ক্ষুৎকাতর যৌনকাতর জৈবমত্ততার স্থান আর যেখানেই থাকুক কবিতায় নেই ।

৩. ব্যক্তির কল্পনাময় আন্তরিক অভিজ্ঞতা বা উপলব্ধির প্রকাশে ব্যক্তিত্বের পরিমণ্ডল রচনাই কবিতা । তাই কবিতা হবে— ব্যক্তিগত মগ্ন এবং একান্তই অন্তর্মুখী ।

৪. এ ছাড়া কবিতায় কোন একমুখী বক্তব্য বা একটিমাত্র বিষয় থাকে না, থাকে বহু অনুভবের মিলনে জটিল উপলব্ধির আবহ ।

৫. ব্যক্তিগত বিষয়ের জন্য দরকার ব্যক্তিগত রচনারীতি । আর রচনাপদ্ধতি এবং রচনার বিষয় অবিচ্ছেদ্য । তাই বিবৃতিধর্মী জীর্ণ প্রকাশপদ্ধতি ত্যাগ করে সব সময়েই উপযুক্ত প্রকাশরীতি খুঁজতে হবে যার মাধ্যমে রচনা করা যায় ব্যক্তিত্বের সেই রহস্যময় পরিমণ্ডল যাতে থাকে দৃশ্য-শব্দ-গন্ধ-স্বাদ-স্পর্শের ব্যাখ্যাতীত সমন্বয় ।

৬. সব শেষে বলা দরকার যে চরিত্রের স্থবিরতার চেয়ে ব্যক্তিত্বের পরিবর্তনশীলতাই আমাদের লক্ষ্য।[৮]

'শ্রুতি'-র এই-সব ঘোষণা থেকে এবং এই গোষ্ঠীর কবিদের রচনা থেকে মোটের উপর এটাই বোঝা যায় যে, সামাজিক দায়বদ্ধতা অথবা উচ্ছ্বাসময় ব্যক্তিগত আবেগের অবারিত প্রকাশে তৃপ্ত না থেকে তাঁরা গড়ে নিতে চাইছিলেন এক নিজস্ব শৈল্পিক ভুবন । উপলব্ধি যেখানে ঘন ও সংহত রূপ নেবে, কবিতা হয়ে উঠবে প্রগাঢ় সংবেদনাময় । তা বহির্বিমুখ ঠিক না হলেও ভিতর-মুখী । বহিরাশ্রয়কে তাঁরা অন্তর্লীনতায় নিয়ে আসতে চান ।

'শ্রুতি'-র এই কবিতা-ধারণায় সবচেয়ে বেশি পূর্বজ প্রভাব ফরাসি কবিতার । পুষ্কর দাশগুপ্ত ফরাসি কবিতার অনুরাগী ছিলেন । বোদল্যের-পরবর্তী ফরাসি কবিতায় ; বিশেষ করে মালার্মে, ভার্লেন, ভালেরি-র রচনায় এই অন্তর্মুখীনতার ঝোঁক দেখা গেছে যা প্রতীকী আধারে প্রকাশিত হয়েছে বার বার । শব্দের বিন্যাসে সুর, বর্ণ, গতি মিলিয়ে নিয়ে নিজস্ব শিল্পরহস্য-লোক নির্মাণও করতে চেয়েছিলেন তাঁরা । 'শ্রুতি'-র কবিদের কার কতটা প্রতিভা ছিল— এ বিতর্ক নিষ্প্রয়োজন । তাঁদের মনোভাবটি কিন্তু অনেক সময়েই ছিল ফরাসি কবিদের অনুরূপ। আত্মসর্বস্ব বিহ্বলতার দিকটি সচেতনভাবে তাঁরা পরিহার করতেও চেয়েছিলেন । তাঁরা আগ্রহী ছিলেন সযত্ন, সচেতন অনুশীলনে । এখানে তাঁরা পঞ্চাশের কবিদের চেয়ে আলাদা । পঞ্চাশের যে-কবি এঁদের সামনে কিছুটা আদর্শ স্থাপন করেছিলেন তিনি আলোক সরকার । সচেতন নির্মাণে সত্তানিহিত শুদ্ধ চেতনালোককে উন্মোচিত ও প্রসারিত করবার চেষ্টা ছিল আলোক সরকারেরও । এ কাজে তিনিও আদর্শ মেনেছিলেন মালার্মে প্রমুখ

প্রতীকবাদীদের ।

সামগ্রিকভাবেও ইউরোপীয় কাব্য-আন্দোলনগুলি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন 'শ্রুতি'-র কবিরা । যদিও 'দাদাইজম্'-এর বিদ্রূপ-পরায়ণতা বা সুররিয়েলিজম্-এর অবচেতন-তল-স্পর্শী স্বয়ংক্রিয় লিখনের ভাবনা— কোনোটিই তাঁদের আকর্ষণ করে নি । তবে বিংশ শতাব্দের প্রথম দুই দশকের মধ্যেই প্রতিষ্ঠা পাওয়া ফিউচারিজম্-এর প্রবক্তা কবিরা পৃষ্ঠার সাদা অংশটিকে ব্যবহার করে শব্দ-সজ্জার সাহায্যে ভাবানুসারী দৃশ্যময় কবিতা রচনার যে-ধারা প্রবর্তন করেছিলেন— রচনার ক্ষেত্রে সেই রীতি এই বাঙালি কবিরাও অনুসরণ করেন । মারিনেত্তি, আপোলিনেয়ার, মায়াকোভ্‌স্কি ছাড়াও এই রীতি কবিতায় প্রয়োগ করেছিলেন কামিংস, আর কিছুটা এলিয়ট-ও। বাঙালি কবিদের মধ্যে অমিয় চক্রবর্তী এই রীতির সচেতন প্রয়োগ করেন কোথাও কোথাও । সে-কারণে ত্রিশের কবিদের মধ্যে অমিয় চক্রবর্তী প্রকরণের দিক থেকে ষাটের কবিদের প্রিয় ছিলেন । কবিতার দৃশ্য-সম্ভাবনাকে নানাভাবে কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছিলেন 'শ্রুতি'-র কবিরা ।

'শ্রুতি'-র প্রথম সংখ্যাতেই 'সূর্যস্তোত্র' নামে একটি কবিতায় পুষ্কর দাশগুপ্ত যজ্ঞবেদী-র আয়তক্ষেত্রটির আকার অনুযায়ী পঙ্‌ক্তি-বিন্যাসে একটি দীপ্ত অভিনবত্ব সৃষ্টি করলেন—

<table>
<tr><td colspan="5">তোমার আশ্চর্য গতি নিত্য উদ্ভাসিত
যেন স্বর্ণপক্ষ পাখি আকাশমণ্ডলে</td></tr>
<tr><td rowspan="3">জী
ব
নে
র
আ
দি
বী
জ
তু
মি</td><td rowspan="3">উ
ন্মে
ষি
ত
জ্যো
তি
র
উ
চ্ছ্বা
স</td><td>আগ্নেয় কুসুম</td><td rowspan="3">অ
ন
ন্ত
প্রা
ণে
র
উ
দ্দী
প
ন</td><td rowspan="3">ক্লা
ন্তি
হী
ন
প্র
ব্র
জ্যা
তো
মা
র</td></tr>
<tr><td>ওঁ</td></tr>
<tr><td>অমোঘ প্রকাশ</td></tr>
<tr><td colspan="5">হে আদিত্য জ্বলে ওঠ ধাত্তারি বিভায়·
এই সত্তা তোমার আলোর অনুগামী</td></tr>
</table>

পঙ্‌ক্তি-সজ্জার কারণে কবিতাটি সেই সময়ে বেশ সাড়া তুলেছিল ।

পুষ্কর দাশগুপ্তের আর-একটি কবিতা "রাস্তা" — 'শ্রুতি', জুলাই ১৯৬৮-তে প্রকাশিত । কবিতাটির দৃশ্যরূপে প্রলম্বিত পথ এবং বাক্যে না-বাঁধা শব্দগুলির বিন্যাসে সম্পর্কহীন বিশৃঙ্খল এক ভিড়ের ছবি ফুটে ওঠে। শেষ

রাস্তা
বাস
ট্রাম
গাড়ী

রাস্তা
ফুটপাথ
দোকান
আলো
চীৎকার
...
...
..
..
রাস্তা
রাস্তা
রাস্তা

স্তবকে দেখি জনারণ্যের নির্জনতায় নিঃসঙ্গ পথিকমানুষের অসহায়তার রূপ। সাধারণত তাঁর কবিতা যতিচিহ্নহীন। পুষ্কর দাশগুপ্ত কবি-কল্পনা, অভিনিবেশ ও পরিশীলনের সংযোগ ঘটাতে পেরেছিলেন নিঃসন্দেহেই। ষাটের দশকে বহু কবিতা লিখেছিলেন তিনি। 'এখানে আমি' (১৯৬৭) এবং 'শব্দ শব্দ' (১৯৭১) সংকলন দুটিতে তা অনেকগুলিই সংগ্রথিত।

'শ্রুতি' পত্রিকাগোষ্ঠীর অন্যান্য কবিদের মধ্যে পরেশ মণ্ডলের প্রথম কবিতা-গ্রন্থ 'অদূরে জলের শব্দ' (১৯৬৩), দ্বিতীয় সংকলন 'প্রতিবিম্ব' (১৯৬৭)। দ্বিতীয় সংকলনটিতে কবিতার সংবেদনময়, ঘন অবয়ব নির্মাণে তিনি স্বকীয় দক্ষতা আয়ত্ত করেছিলেন। পরবর্তীকালে তা আরো পরিণত হয়েছে। দৃশ্য-স্পর্শময় জগৎ থেকে অন্তরোপলব্ধি ছেঁকে নেওয়া ও কাব্যময় ভাষায় তাকে প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছেন তিনি কবিতায়। বহুলাংশেই তিনি সফল। কবিতার শব্দ ও বর্ণ-সজ্জার তাৎপর্যেও তিনি গভীরভাবে বিশ্বাসী। পরেশ মণ্ডলের তৃতীয় কবিতা-সংকলন 'মানমন্দির' (১৯৬৯)-এ তাঁর এই পর্বের প্রবণতাগুলির স্পষ্টতম অভিব্যক্তি পাওয়া যায়।

নাম ধরে ডেকেছে সে তাই
প্র তি ধ্ব নি
ছড়িয়ে ছড়িয়ে
পড়ে
ooooooooooooooooo
....
....
....
এ
কা
কী
প্র .....তি .....ধ্ব .....নি
নী
র
ব
জ্যোৎস্নায়

—(ইংগিত)

কিন্তু এ জাতীয় অভ্যাসকে বেশি গুরুত্ব দিলে কখনো কখনো তা যে খানিকটা চমক-সৃষ্টিপ্রবণ বাক্‌চাতুর্যে পরিণত হয় তারও নিদর্শন আছে পরেশের কবিতায় এই সংকলনেই—

স্বরে বর্ণে হৈ চৈ
গিসগিস করছে উঠোন

অ
আ
১
০
কী
কেমন
বেশ তো
আজকাল
চলি —(হৈ চৈ)

তবু কবিতাটিকে অসফল বলা যায় না। পরবর্তী চার পঙ্‌ক্তির শেষ পঙ্‌ক্তি-তে একটিমাত্র 'না' রেখে যায় প্রত্যাশিত রেশ।

পরেশ মণ্ডলের কবিতায় প্রকৃত রোম্যান্টিক চেতনার স্বরূপ ও সৌন্দর্য ক্রমেই গভীরসংহত হয়েছে।'শ্রুতি'-র কবিরা রোম্যান্টিকতার বিরোধী একেবারেই ছিলেন না। বিরোধী ছিলেন অতিশয়িত উচ্ছ্বাসের। পরবর্তীকালে চমক সৃষ্টি করতেও আর চান নি তিনি। ১৯৭৯ সালে প্রকাশিত 'পেণ্ডুলাম' থেকে একটি ছোটো কবিতা উদ্ধার করছি—

আকাশটা হাঁস হয়ে চরে বেড়ায়
মেঘলা দিঘিতে
বারমাস
আকাশ না হাঁস
কাকে ফেলে কাকে রাখি
কাকে রাখি
—(দিঘি)

নিসর্গ-কেন্দ্রিক মধুর রহস্যবোধের অব্যর্থসঞ্চার ঘটেছে কয়েকটি মাত্র শব্দে।

মনে পড়ে মৃণাল বসুচৌধুরীর কবিতা।

'শ্রুতি'-র নবম সংখ্যায় (জুলাই ১৯৬৮) তিনি লিখেছিলেন "বর্গাকার"।—

পিছন দিকে একটা জানালা
ছোট বর্গাকার
সামনে দরজা দুপাশে জানালা
ছোট বর্গাকার
টেবিলে বই চেয়ারে কাপড়
আলনায় জামা দেয়ালে ছবি
ছোট বর্গাকার
আলোর সামনে কেউ ছায়া
আলোর পিছনে কেউ ছায়া
ছোট বর্গাকার

দৈনন্দিন জীবনযাপনের আবদ্ধতার এই ভাষা-চিত্রের কোনো ব্যাখ্যাই বাহুল্য। অথচ সংহতি ও যাথার্থ্যগুণে তা

আমাদের স্পর্শ করে । আলোকে ঢেকে বড়ো হয়ে ওঠে ছায়া— এই প্রতীকী দৃশ্যও তিনি অনায়াসে মূর্ত করতে পারেন । মৃণাল বসুচৌধুরীর অপ্রতিরোধ্য রোম্যান্টিক কবিমানসে জীবন-রহস্যের আরো এক অপরূপ অনুভবের অভিব্যক্তি 'যেখানে প্রবাদ' (১৯৭২) সংকলনের "তবু" কবিতায়—

তবু
সমাধির গভীরে অস্ফুট
ঠোঁটের দুপাশে তুমি জমিয়েছো কথা
নিজের সর্বস্ব দিয়ে
সমারোহ কফিন সাজিয়ে
আনন্দিত বসে আছ
একা
স্থির অবিচল

'শ্রুতি'-গোষ্ঠীর সকলেরই কবিতার উদাহরণ দেওয়া এখানে সম্ভব নয় স্থানাভাবে । তবু অশোক চট্টোপাধ্যায়ের কথা বলতে হবে । ষাটের দশকের শেষ এবং সমগ্র সত্তরের দশক জুড়ে কবিতা লিখেছিলেন তিনি । কবিতা -সংকলন বেশ-কয়েকটি । প্রগাঢ় কবিতা-প্রবণতা ছিল তাঁর কিন্তু তাঁর কবিতায় কিছুটা ভিন্ন সুরও ছিল । সাধারণভাবে 'শ্রুতি'-র কবিতার যে স্বীকৃত চরিত্র— আত্মমগ্নতা, সত্তা স্পর্শ করবার চেষ্টা, নিচু স্বর, ভাষ্য বর্জন ও সুমিত অবয়ব— এ-সবের অনেকটা থাকলেও অশোকের কবিতার স্বরগ্রাম মাঝে মাঝে একটু উচ্চকিত হয়, বাগ্ভঙ্গি কিছু তীক্ষ্ণ । কিছুটা বিদ্রুপ-বাচন অভ্যাস করেছিলেন তিনি । কবিতায় দাদাবাদ, ফবিজ্‌ম্ বা ফিউচারিজ্‌ম্-এর যাঁরা সমর্থক তাঁদের কবিতায় মাঝে মাঝেই এক-একটি তীব্রতা-স্বাতন্ত্র্যময়, একটু উদ্ভট, একটু আক্রমণাত্মক —হয়তো বা আপাত-বেমানান পঙ্‌ক্তি চলে আসে । পাঠককে চকিত ক'রে আকৃষ্ট করাই কবির লক্ষ্য । সেরকম পাওয়া যায় অশোক চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় । বড়ো কথা যে তাঁর এই অভ্যাসটি কেবল চমক সৃষ্টি করেই থেমে থাকে না, উপলব্ধির সত্যতায় ঢেউ তোলে পাঠকের চেতনায় । তাঁর প্রথম সংকলনটির নাম '...এবং অন্যান্য কবিতা' । 'শ্রুতি'-র অন্য কবিদের তুলনায় ক্রমেই তাঁর কবিতা উচ্চকণ্ঠ হয়ে উঠেছে । নতুন কবিতার আন্দোলনে অশোক চট্টোপাধ্যায় সব সময়েই সচেতন ও সক্রিয় ছিলেন । ১৯৬৯-এর ডিসেম্বর মাস থেকে তিনি ও পরেশ মণ্ডল 'ঈগল' নামে একটি কৃশকায় নতুন পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করেন । কবিতার সঙ্গে নব্য রীতির গল্পও থাকত এ পত্রিকায়, থাকত প্রবন্ধও । 'শ্রুতি' আর 'ঈগল'-এর চরিত্র ঠিক এক ছিল না । 'ঈগল' ছিল কিছু উচ্চকণ্ঠ— কিছু বা আপাত স্পর্ধিত ।

১৯৮৩-তে প্রকাশিত অশোক চট্টোপাধ্যায়ের 'তথ্যপঞ্জী' নামক সংকলনের একটি কবিতাংশ তাঁর পরিণত কবিতার সামান্য পরিচয় দেবে—

এখন আমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে
কয়েকটি ভৌতিক ঘোড়া
দরজা খুললেই তারা দৌড়বে এক এক দিকে
নানা রঙে আর রেখায়
আমার কাজ হবে তাদের অনুসরণ করা
তাদের পুষ্ট করা
ঘোড়ারা কি খায় ?

ঘোড়ারা কি কৃষ্ণচূড়া খায় ?
চৈত্রমাস খায় ?

—("কৃষ্ণচূড়া কিংবা চৈত্রমাস নিয়ে")

'শ্রুতি' পত্রিকার কবিদের কবিতা-চর্চার ক্ষেত্রে দেখা যায়— সমকালীন সামাজিক-রাজনৈতিক অস্থিরতা— যা ১৯৬৬ থেকে ১৯৭২ পর্যন্ত অবিরাম অস্থির করেছে পশ্চিমবাংলাকে— এই কবিদের আত্মমগ্ন শিল্প-রচনার ধারণা থেকে চ্যুত করতে পারে নি । নিজের মনকে সংহত করে একটি অকম্প্র-গভীর কাব্যলোক সৃজনের প্রয়াসেই ব্যাপৃত থেকেছেন এই কবিরা । অথচ মনে উদ্‌বেজনা-বীজটি যে তাঁরা সমকালীন সমাজের অ-শান্ততা থেকে গ্রহণ করেছিলেন অনেকটা, তাতেও সন্দেহ নেই । এজন্যই এঁরা পঞ্চাশের দশকের 'শতভিষা' বা 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার চরিত্র এবং পঞ্চাশের কবিদের থেকে কিছুটা আলাদা ।

ষাটের দশকের কবিতার প্রধান প্রবণতা ছিল এটাই । 'হাংরি' কবিগোষ্ঠীর কোলাহলময় অস্তিত্বটি কিছু ব্যতিক্রম । তার বাইরে কবিরা দলবদ্ধভাবেই হোক অথবা এককভাবে— হৃদয়-মননের গভীরে অবিচল নিমজ্জন চেয়েছিলেন ; বর্জন করেছিলেন সমাজ-রাজনীতি-মনস্ক প্রত্যক্ষভাষণ এবং শিল্প-পরিমিতি-রহিত ব্যক্তিগত ভাবোচ্ছ্বাসের অসংবৃত উচ্চারণ— দুইই । কিন্তু, প্রায়শই তাঁদের আত্মমগ্নতার সর্বতো-প্রেক্ষিত ছিল এক সংকীর্ণ, জটিল, নৈরাশ্য-পীড়িত বহিঃসমাজ । সেই সমাজটির অস্তিত্ব পাঠকচিত্তে মুদ্রিত হয় পরোক্ষে কিন্তু অনিবার্যতায় ।

অত্যন্ত নির্দিষ্ট কোনো কবিতা-সূত্রের ঘোষণা নিয়ে আবির্ভূত না হলেও এই সময়ের অনেক কবিই নিজেদের মতো করে ষাটের দশকের কবিতার লক্ষণ-নিষিক্ত কবিতা লিখে গেছেন অবিরলভাবে । কবিতাকে মূল্য দিয়েছেন নিজেদের সমগ্র জীবনচর্যার বিনিময়ে । অন্তত সেই সময়টিতে শ্রমের বিনিময়ে আত্মতৃপ্তি ছাড়া অন্য কোনো লাভ তাঁদের ছিল না ।

সেরকম কবিদের মধ্যে মনে পড়বে পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের নাম । মনে পড়বে দীর্ঘকাল ধরে সম্পাদিত তাঁর কবিতা-পত্রিকা 'কবিপত্র'-এর কথা । ১৯৫৮ সালের মে মাসে ষোলো পৃষ্ঠার পুস্তিকারূপে 'কবিপত্র'-এর প্রথম আত্মপ্রকাশ ; পবিত্র মুখোপাধ্যায় ও মৃণাল দত্ত— এই দুই অতি-তরুণ কবির অদম্য আগ্রহে । প্রথম সম্পাদকরূপে কিন্তু ছিলেন শান্তি সেন । দুই তরুণকে উৎসাহ এবং অনেকটা খরচপত্রও জুগিয়েছিলেন সেই মহিলা । প্রথম থেকেই কোনো স্বতন্ত্র 'চরিত্র' অর্জনের ব্যস্ততা ছিল না এই পত্রিকার । কবিতা সম্পর্কে সার্বিক শ্রদ্ধা, অ-তল প্রীতি আর মুক্ত মন নিয়ে পত্রিকাটিকে গড়েছিলেন দুই তরুণ কবি । কোনো দশক-ভিত্তিক কবিতা-চিন্তাও ছিল না তাঁদের । ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশের কবিদের কবিতা তাঁরা প্রথম পর্বে অজস্র ছেপেছেন এবং এমন-কি, সম্পাদনার দায়িত্বও অর্পণ করেছেন সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, তরুণ সান্যাল প্রমুখ অগ্রজ কবিদের হাতে । ষাটের দশকের মধ্যভাগ থেকে পত্রিকাটি পুরোপুরি হাতে নেন তাঁরা দুজনে । তবে তার পরেও এবং চিরকালই সব যুগের সব রকম ভালো কবিতার জন্য উন্মুক্ত 'কবিপত্র'-এর দরজা । প্রেমেন্দ্র মিত্র ও সঞ্জয় ভট্টাচার্যের কবিতা থাকত প্রায়ই, প্রায় প্রতি সংখ্যায় কবিতা দিতেন বিষ্ণু দে । সর্ব মতের কবি স্থান পেতেন, পূর্বজ কবিদের নিয়ে প্রবন্ধ লেখা হত, সব দশকের কবিদের বই-এর সমালোচনা লিখতেন কবিরা । এ-সবের সঙ্গে ষাটের তরুণ কবিরাও সমাদৃত স্থান পেতেন, গুচ্ছ-কবিতা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করতেন এই পত্রিকার পৃষ্ঠায় । পরে পবিত্র মুখোপাধ্যায় লিখেছেন —"'কবিপত্র' সে অর্থে অনেক বেশী উদারতা নিয়ে বেরুতো ; প্রায় দুই মেরুর লেখক ছিলেন সে সময় পঞ্চাশের কবিরা ; রক্ষণশীল বিশুদ্ধতাবাদী অলোকরঞ্জন আলোক সরকার একদিকে, অন্যদিকে রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে, অনেকটা স্বেচ্ছাচারীও সুনীল, শক্তি, শরৎ প্রভৃতি কবিরা ; আবার এই দুই শিবির-বিরোধী বামপন্থী রাম বসু, সিদ্ধেশ্বর সেন, তরুণ সান্যাল, অমিতাভ দাশগুপ্ত ; কবিপত্রে এদের স্থান ছিলো পাশাপাশি । আর মণিভূষণ,

রত্নেশ্বর, চিন্ময় গুহঠাকুরতা, গণেশ বসু, পুষ্কর দাশগুপ্ত, পরেশ মণ্ডল সকলেই কবিপত্রের নিয়মিত কবি..."।[৭]

এই ঔদার্য— এই মেলামেশাই ছিল প্রথম পর্বের 'কবিপত্র'-এর বিশিষ্টতা । কিন্তু ১৯৬৬ সাল থেকে 'কবিপত্র' -ও একটু স্বতন্ত্র চেহারা নিল । হয়তো 'হাংরি' এবং 'শ্রুতি'-র যৌথ আন্দোলনের কিছুটা পরোক্ষ প্রভাব ছিল এই পরিবর্তনের মূলে । পবিত্র মুখোপাধ্যায় ঐ প্রবন্ধটিতেই লিখেছেন— "ছেষট্টিতে এসে কবিপত্র নতুনভাবে বেরুতে শুরু করলো । অপেক্ষাকৃত তরুণ উৎসাহী কাননকুমার ভৌমিক, প্রভাত চৌধুরী, গল্পলেখক চণ্ডী মণ্ডল যুক্ত হলেন ; আমরা সাহিত্য নিয়ে নতুন ভাবনা-চিন্তায় ব্যস্ত তখন ; আমাদের ধ্বংসকালীন আন্দোলনের অন্যতম মুখপত্র হলো তখন কবিপত্র ; উদার প্লাটফর্ম হিসেবে না রেখে আন্দোলনের মুখপত্ররূপে কবিপত্র আত্মপ্রকাশ করতে লাগলো ।"

এই উদ্ধৃতিতে আমরা পাচ্ছি 'ধ্বংসকালীন আন্দোলন' নামে আরো একটি সমবেত প্রয়াসের প্রসঙ্গ । সমকালীন কবি অনন্ত দাশ লিখেছেন— "এই সময় 'সাম্প্রতিক' পত্রিকার সম্পাদক কাননকুমার ভৌমিকের নেতৃত্বে ধ্বংসকালীন কবিতার আন্দোলন শুরু হল । যারা শ্রুতি-আন্দোলনের এই ফর্ম-ভাঙার খেলায় নিজেদের মেলাতে পারছিলেন না তারা ধ্বংসকালীন আন্দোলনে যোগ দিলেন ।"[৮]

'সাম্প্রতিক' পত্রিকার প্রথম প্রকাশ সম্ভবত ১৯৬৬-র সামান্য আগে থেকে । ১৯৬৬ সাল থেকে তা 'শ্রুতি'-র পাশাপাশি চলতে থাকে এবং বিশেষ চরিত্র নিয়ে স্পষ্ট হয় ওঠে ১৯৬৭-র ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত অষ্টম সংকলন থেকে । প্রথম থেকেই সমকালীন সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতির অবনমন ও ক্ষয় সম্পর্কে ক্রোধ ও ঘৃণা-র একটি উৎসার এই নতুন চিন্তার কবিতার মূল শক্তি ছিল ।'শ্রুতি'-র কবিদের মতো সংযতবাক শিল্পলোক নির্মাণে আগ্রহ ছিল না এই আন্দোলনের কবিদের । তবে তাঁরাও তাঁদের ঘোষণায় অকৃত্রিম উপলব্ধির প্রকাশের উপরেই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন । অষ্টম সংকলনটির প্রথম পৃষ্ঠার সম্পাদকীয়-তে 'সাম্প্রতিক' পত্রিকার কবিতা-ধারণা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত ।—

"আমরা যা তাই আমাদের কবিতা । আমরা যা নই তা আমাদের কবিতায় নেই । অকৃত্রিমতাই আমাদের উপাস্য ।" এর পর তাঁরা স্বীকার করেছেন যে অসংবৃত উচ্ছ্বাস নয়, ভাবনার সংহত ঘনতাই কবিতায় কাম্য এবং বলেছেন যে "কবিতাই কবির জীবনদর্শন ।" তাঁরাও বহমান কাব্য-ঐতিহ্যের গুরুত্বকে মূল্য দিয়েছেন এবং সব শেষে বলেছেন— "মানবসভ্যতার ক্রান্তি মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আমাদের প্রজ্ঞাময় উপলব্ধির মহৎ উচ্চারণ ধ্বংসকালীন কবিতা ।"

এর পরেই পত্রিকাটিতে স্থান পেয়েছে পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের "ইবলিসের আত্মদর্শন" কবিতার প্রথমাংশ যার শিরোনামে লেখা হয়েছে 'ধ্বংসকালীন কবিতা', শব্দবন্ধটির প্রয়োগ সেই প্রথম । কাজেই 'সাম্প্রতিক'-এর সম্পাদক পবিত্র মুখোপাধ্যায় না হলেও একেবারে প্রথম থেকেই তিনি নিজেকে এবং 'কবিপত্র' পত্রিকাটিকে ধ্বংসকালীন আন্দোলনের অঙ্গীভূত বলে মনে করেছেন । "ইবলিসের আত্মদর্শন" কবিতাটির কিছু অংশ—

চোখের ভিতরে কোনো চোখ নেই বলে
কানের ভিতরে কোনো কান নেই বলে
বুকের ভিতরে কোনো স্বর্গীয় উদ্যান নেই বলে
নর্তন কুর্দন করি
ঈশ্বরের মুখ মনে করতেই পারি না
ঈশ্বরের মুখ ভাবলে চিন্তায় বা অনুভবে
লোমশ যোনির ছবি ভাসে ।

শেষ পঙ্‌ক্তিটির যে যৌন চিত্রকল্প— তা-ও ধ্বংসকালীন কবিতায় যথেষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। হাংরি জেনারেশন কবিদের মতো অতটা আতিশয্যময় না হলেও সমকালীন সমাজজীবনের ক্লেদাক্তিতার উপমারূপে যৌন-প্রসঙ্গের ব্যবহার এই কবিরা ব্যাপকভাবেই করেছেন।

'সাম্প্রতিক' পত্রিকার নবম সংকলনটির (জুলাই ১৯৬৮) প্রচ্ছদে লেখা হয়েছিল 'ধ্বংসকালীন কবিতা আন্দোলনের মুখপত্র'। কবিদের মধ্যে ছিলেন সুকোমল রায়চৌধুরী, দীপেন রায়, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, অনন্ত দাশ, রবীন সুর, সত্য গুহ, শিবেন চট্টোপাধ্যায়, প্রভাত চৌধুরী, অঞ্জন কর এবং কাননকুমার ভৌমিক। এঁরা অনেকেই দীর্ঘ কবিতা লিখেছেন। এঁদের দীর্ঘ কবিতার কেন্দ্রে প্রায়ই উপস্থাপিত কোনো শয়তান, পাপী, শাপগ্রস্ত বা বিদ্রোহী —অর্থাৎ ঈশ্বরের বিপরীত কোটিতে দাঁড়ানো কোনো সত্তা।

ধ্বংসকালীন আন্দোলন সম্পর্কে যে-ব্যাখ্যা সম্পৃক্ত কবিরা পরবর্তীকালে দিয়েছেন তাতে সমকালীন সমাজ সম্পর্কিত ভাবনা খুবই স্পষ্ট। অনেক জায়গাতেই সে কথা বলেছেন তাঁরা। ১৯৬৮-তে 'কবিতা সংবাদ' নামে একটি দুই পৃষ্ঠার পাক্ষিক পত্র প্রকাশিত হয় প্রভাত চৌধুরীর সম্পাদনায়। কাননকুমার ভৌমিক তাতে লিখেছিলেন —"যুদ্ধ ইত্যাদি হৈ হট্টগোলে যখন আমাদের সর্বপ্রকারেরই মূল্যবোধগুলো— সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, নৈতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি আর পূর্বের অবস্থায় বজায় রাখা যাচ্ছিল না। সব দিকেই একটা ভাঙন। ধ্বংসকালীন কবিতার নিহিতার্থ এখানেই।"[৯]

সব জড়িয়ে ধ্বংসকালীন আন্দোলনের ধারণাটি 'শ্রুতি' পত্রিকার মতো একটি পত্রিকা-কেন্দ্রিক গোষ্ঠীবদ্ধ আন্দোলন বলা চলে না। অবনমিত সামাজিক পরিবেশে কবিদের নিরাশা-ঘৃণা-ক্রোধ-তপ্ত উপলব্ধির প্রকাশ ছিল এই ধারণাটির মূল কথা এবং তা ছড়িয়ে গিয়েছিল একাধিক পত্রিকায়, অনেক কবির মধ্যে।

এই সময়টিতেই এই কবিগোষ্ঠীগুলির সঙ্গে কখনো কখনো পঞ্চাশের কোনো কোনো প্রতিষ্ঠিত কবির মানসিক বিরোধ দেখা দেয়। 'কৃত্তিবাস' গোষ্ঠীর তরুণেরা ষাটের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে অনেকেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন জীবনে। বাণিজ্যিক প্রকাশনা-সংস্থার সাহিত্য পত্রিকায় সুনির্দিষ্ট হয়ে গেছে তাঁদের স্থান। কবির স্বাধীনতা যতই থাক্‌, বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত সাহিত্যিকের লেখায় কোনো-না-কোনোভাবে ব্যবসায়িক পরিকল্পনার একটা ছাপ পড়েই। হয়তো বা একটু পারস্পরিক ঈর্ষার চলাচল ছিল। প্রতিষ্ঠিত অগ্রজেরা কখনো বা একটু উপেক্ষা করতে চেয়েছেন অব্যবহিত পরবর্তীদের,ষাটের তরুণ কবিদের মনে আর্থিক সংগতির অভাবজনিত ক্ষোভ ছিল। তা প্রায়ই পরিণত হয়েছে বাণিজ্যিক পত্রিকা-গোষ্ঠীর প্রতি ক্রোধে। কবিদের মধ্যে বাদানুবাদে উত্তপ্ত একটি পরিবেশ প্রায়ই সৃষ্ট হত ষাটের দশকে। সে ধারা পরেও প্রবাহিত হয়েছে।

ষাটের দশকে কবিতা-চর্চা বহুলভাবে ছড়িয়ে গিয়েছিল— এ কথা আগেই বলেছি। কলকাতার বাইরেও বাংলার মফঃস্বল শহরগুলিতে একাধিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। সেই-সব শহরে বসেও কবিতা লিখে গেছেন কবিরা। একদিকে গোষ্ঠী-নির্ভর কবিতার চর্চা যেমন ছিল, অন্য দিকে এমনও অনেক কবি ছিলেন যাঁরা একান্তভাবে কোনো গোষ্ঠী বা পত্রিকাকে ধরে থাকেন নি। নিজেদের মতো কবিতা লিখেছেন স্বাধীনভাবে। একাধিক পত্রিকার সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন, সব ধরনের পত্রিকায় কবিতা দিয়েছেন— বিশেষ কোনো বাঁধাবাঁধির মধ্যে না গিয়ে। তাঁদের মধ্যে অনেকেই ষাটের দশকের প্রথম সারির কবি এবং বর্তমানে গভীরভাবে সৃষ্টিশীল। তাঁদের অন্তত কয়েকজনের কথা না বললে ষাটের দশকের কবিতাচর্চার সুবিস্তৃত পরিসরটি বোঝা যাবে না— এঁদের মধ্যে আছেন বিভিন্ন বয়সের, বিভিন্ন মত ও পথের কবি। অল্প কয়েকজনের নামই করা যাবে। ভবিষ্যতে এই সময়ের কবিতা নিয়ে সম্পূর্ণ বই যিনি লিখবেন কেবল তাঁর পক্ষেই সম্ভব হবে সকলের প্রতি সুবিচার করা।[১০]

পবিত্র মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে কিছু কথা বলা হয়েছে আগেই। ১৯৬০-এ প্রকাশিত তাঁর প্রথম কবিতাগ্রন্থ 'দর্পণে অনেক মুখ', তখনো আপন স্বাতন্ত্র্যে তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটে নি। আত্মমগ্ন সুরের কবিতা, মূলত মহাপয়ারে

সনেট-কল্প (সনেটের সুনির্দিষ্ট বন্ধন অনুসরণ করেন নি) রচনাগুলির প্রাকরণিক সম্পূর্ণতা যথেষ্ট । লঘুতার কোনো ছাপ নেই । প্রথমাবধি তিনি জীবনের গভীরতর স্তরের উন্মোচন-প্রয়াসী । বাংলা ভাষার তৎসম শব্দপ্রধান ঈষৎ গম্ভীর ঝংকারময় ধ্বনিটিই তিনি কবিতায় বাজাতে ভালোবাসেন । প্রথম সংকলনের একটি কবিতাংশ—

"আলো চাইনা হে রাজন ! আলো চাইনা জলধর্মী মনে ।
প্রিয়দর্শী অন্ধকার ! মৃত্যুর বালিশে মাথা রেখে
তোমার প্রতীক্ষা কোরছি ! তুমি মুখ এঁকো না দর্পণে,
ফিরে যাও জলগতি প্রসন্ন শিখাটি বুকে ঢেকে ।"

—("আলো চাইনা হে রাজন !")

'শবযাত্রা' (১৯৬১) নামের সংকলনটিতেই পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের স্বাতন্ত্র্য সুপ্রতিষ্ঠিত । জাগতিক পাপমদিরামুগ্ধ আত্মার শবযাত্রা-পথের বিবরণরূপে পরিকল্পিত এই ধ্রুপদী গড়নের কাব্যগ্রন্থটি অনেকগুলি পারম্পর্য-যুক্ত দীর্ঘ কবিতার সমন্বয়ে রচিত । মৃত্যু, নরক, পাপ, জীবন-মোহ, স্বর্গ-সম্ভাবনাহীন আধুনিক মানুষের নিরাশ্বাস শেষযাত্রার রূপকটি তাঁর বহু কবিতায় ব্যবহৃত । 'শবযাত্রা'র "প্রার্থনা" অংশের কিছু পঙ্‌ক্তি—

"আমার হাত ধরো শুষ্ক হাত ধরো মাংসহীন এই কঠিন হাড়
চিবুকে ঝুলে আছে নগ্ন শূন্যতা এবং ভয়াবহ মাড়ির দাঁত
শব্দ নেই কোনো শব্দ নেই, এক কুটিল স্তব্ধতা জানায় খেদ
মুখের গহ্বরে মৃত্যু খেলা করে, আহা কী মৃত্যুর কঠিন রূপ ।"

১৯৬১-র পর ১৯৭৩-এ 'শবযাত্রা'র দ্বিতীয় সংস্করণে 'ভাসান' অংশটি সংযোজিত । সেখানে বেহুলা-লখিন্দরের সিদ্ধ প্রতিমার সাহায্যে কবি আর্ত মানবাত্মার এক মহান বেদনাময় অন্তিম যাত্রার ছবি এঁকেছেন । লক্ষণীয় যে গতানুগতিক ধরনের কোনো উত্তরণে কিন্তু পৌঁছয় না তাঁর কবিতার কেন্দ্রীয় সত্তার অধিকারী নারী বা পুরুষ—

"স্খলিত কংকাল লয়ে একাকী সে কলার মান্দাস
ভেসে যায় কালো জলে চরিতার্থ অমল উদাস"

নরকযাত্রা বা নরকবাসের রূপক অবশ্য ভারতীয় ও পাশ্চাত্য কাব্যধারণায় চিরকালই আছে । দান্তে থেকে র‍্যাঁবো, মধুসূদন থেকে রবীন্দ্রনাথ । সে অর্থে ঐতিহ্যকে সম্পূর্ণভাবেই স্বীকার করেছেন পবিত্র মুখোপাধ্যায় ।

ষাটের দশকের প্রারম্ভ থেকেই কবিতা লিখেছেন রত্নেশ্বর হাজরা এবং লিখেছেন এককভাবে, নিজের মতো । প্রথম কবিতাগ্রন্থ 'বিষণ্ন ঋতু' (১৯৬২)-তে নিঃসঙ্গতা ও আত্মনির্বাসিত এক জগতের বিষাদবোধ প্রাধান্য পেয়েছে । পরবর্তীকালে রত্নেশ্বর হাজরার কবিতা-রূপের মধ্যে বহুবিধ বৈচিত্র্য দেখা দিলেও সংকটবিদ্ধ এক মননী চেতনার পথ-সন্ধানের ব্যাকুলতা প্রায়ই ধারক উপলব্ধি হয়ে দাঁড়ায়— "যাত্রীরা সমুদ্রগামী, আমি এক যন্ত্রণার গ্রহে নির্বাসিত ।" এই সংকলনের কোনো কোনো কবিতায় সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এবং বিষ্ণু দে-র কাব্যকলার অনুসরণ লক্ষ করা যায় ।

অনেকের এমন ধারণা আছে যে চল্লিশের দশকের পর বাংলা কবিতায় অধীত বৈদগ্ধ্য আর সার্থকভাবে অনুশীলিত হয় না । ষাটের দশকের যে-কোনো প্রতিষ্ঠিত কবির লেখা এই ভুল ধারণাটি অপ্রমাণ করতে সক্ষম । রত্নেশ্বর হাজরার কাব্যকর্মের মধ্যে আছে 'গীতগোবিন্দ' ও 'ঋতুসংহার'-এর অনুবাদ । প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কাব্য-ঐতিহ্য তাঁরা সহজভাবেই গ্রহণ করেছিলেন, তেমনিই স্নাত ছিলেন রবীন্দ্রসৃষ্টিধারায় ; ত্রিশের কবিদের লেখারও ছিলেন অনুরাগী পাঠক । অথচ সে-সব উৎস থেকে ভাব প্রকাশের আধারটি নিপুণভাবে কখনো কখনো তুলে নেওয়া ছাড়া অনুসারী ছিলেন না কারোরই । রত্নেশ্বর হাজরার তৃতীয় কবিতা-সংকলন 'জলবায়ু' (১৯৬৭)-তে

তার চমৎকার চিহ্ন আছে । এই সংকলনের "তীর্থযাত্রা" নামের দীর্ঘ কবিতাটি খুব অভিনব না হলেও সুলিখিত এবং কবিতাটির মধ্যে বহু ঐতিহ্যের সুন্দর স্বীকৃতি লক্ষ করা যায় । ব্যক্তিগত ভাবনা, কিছু নিঃসঙ্গ নিমগ্নতা ও কিছু বিষাদ প্রাধান্য পেলেও রত্নেশ্বর হাজরার কবিতায় বৈচিত্র্যহীনতা অনুভূত হয় না । উপলব্ধির উপযুক্ত বহিরাশ্রয় তিনি সহজেই খুঁজে নেন । একটি উদাহরণ—

"হরতকীবনের মধ্যে পুরুষেরা
সঙ্গিনীকে নিজের ঘোড়ায়
তুলে আনে
তাদের সমস্ত ঘোড়া সাদা   সঙ্গিনীরা
কালো ঘোড়াগুলো এনেছিল— কালো ঘোড়াগুলো
খালি পিঠ
শীতে কাঁপে ।"

—"হাওয়া উঠলে", 'জলবায়ু'

রত্নেশ্বর কবিতার উপলব্ধি-সঞ্চারের প্রয়োজনে টাইপোগ্রাফির দিকেও নজর রাখেন কিছুটা । ক্বচিৎ একটু চমক সৃষ্টির প্রবণতাও এসেছে । কিন্তু মূলত তিনি গভীর-স্বভাব কবি । সম্প্রতিককালের কবিতায় তিনি ইতিহাসবোধ ও সমাজমনস্কতার অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন স্পষ্টতরভাবে । কিন্তু কবিতা যে কবির অন্তর্গত মনের সৃজন— এই বিশ্বাস ও লক্ষণ থেকে তাঁর কবিতা কখনো বিচ্যুত হয় নি ।

ষাটের দশকের কবিতার ধারায় প্রথম থেকেই সম্পৃক্ত আর-এক বিশিষ্ট কবি কালীকৃষ্ণ গুহ । বহু পত্র-পত্রিকায় লিখেছেন, কখনো কখনো কোনো কোনো পত্রিকা সম্পাদনার সঙ্গেও যুক্ত থেকেছেন । তাঁর কবিতা-ভাবনা পরিব্যাপ্ত কিছু প্রবন্ধে এবং ইয়েটস, পাউণ্ড, ল্যাংস্টন হিউজ প্রমুখ কবিদের রচনার কিছু অনুবাদে । গভীরতা কালীকৃষ্ণ গুহ-র কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য । আবেগ ও মননের বহু তরঙ্গ-নিষিক্ত আলোড়ন পার হয়ে উপলব্ধি জমাট বাঁধলে তবেই তিনি লেখেন । নিজের কথাই বলেন তিনি— কিন্তু ব্যক্তিগত আকৃতি প্রায়ই তাঁর কবিতায় এক দার্শনিক জিজ্ঞাসায়— এক সর্বাত্মক অস্তিত্ব-চেতনায় রূপান্তরিত হয় । বিষাদ ও নিঃসঙ্গতাবোধ তাঁরও আছে, কিন্তু যেন তারও চেয়ে বেশি আছে এক নিমগ্ন অস্তিত্ব-উপলব্ধি ।

"সারাদিন বৃষ্টি হলে বজ্র শুধু দিতে বলে আমাদের—
আমরা তো জীবন দিয়েছি, জীবনের বীজ
অন্ধকারে ছড়িয়ে দিয়েছি, তবু
কোন দান ?"

—"সময়ের পাশে কিছুক্ষণ, পাগলের মতো"

প্রথম সংকলন 'রক্তাক্ত বেদীর পাশে' (১৯৬৭) থেকে এই উদ্ধৃতি ।

প্রতিটি শব্দই তিনি সযত্নে ব্যবহার করেন কিন্তু বিশেষভাবে পাঠককে টানার জন্য কোনো পদ্ধতি ব্যবহার করবার কথা ভাবেন না । অথচ তাঁর কবিতা ব্যক্তিগত ও আত্মমগ্ন উচ্চারণ হলে তা আত্মবদ্ধ নয় একেবারেই। বরং তা যেন পরিব্যাপ্ত বিশ্ব-প্রকৃতির অনন্ত রহস্যের বিচিত্রতায় । প্রকৃতি-প্রতীক তাই তাঁর কবিতায় নতুন করে প্রাণ পায়— আকাশ, নক্ষত্র, সূর্য, জল, গাছ, রাত্রি । তাঁর কবিতার ব্যাকরণিক ভাষাটি জটিল নয় কিন্তু অন্তরের ভাষাটি ঠিকমতো ধরতে পারা কিছু আয়াস-সাপেক্ষ ।

ষাটের দশকের কাব্যচর্চার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকা আর-এক কবি আশিস সান্যাল । ১৯৬১

সাল থেকেই ছোটো ও বড়ো পত্রিকায় কবিতা প্রকাশিত হয়েছে তাঁর। প্রথম কবিতা-গ্রন্থ 'শেষ অন্ধকার প্রথম আলো' (১৯৬০) থেকে পঞ্চম কবিতা-গ্রন্থ 'পটভূমি কম্পমান' (১৯৭২) পর্যন্ত সমস্ত দশকটি জুড়ে লিখেছেন বহু কবিতা। পরবর্তী সময়েও তিনি সমানই সক্রিয়। বিভিন্ন পত্রিকা সম্পাদনা ছাড়াও তিনি সম্পাদনা করেছেন প্যালেস্টাইনের কবিতা ও নিগ্রো কবিতার অনুবাদ-সংকলন। এ ছাড়াও তিনি বহু প্রবন্ধের লেখক। ষাটের কবিরা কবিতা-চর্চায় মেধা ও অধ্যয়নের প্রয়োজন অনুভব করেন না— এমন একটি ভ্রান্ত অভিমত কেউ কেউ জ্ঞাপন করেন বলেই এ কথা বলা।

আশিস সান্যালের কবিতার ভুবন নৈরাশ্যের নয়। কবিতার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত বলয় অবশ্যই তাঁর আছে কিন্তু তিনি, মনে হয়, মূলত বিশ্বাসের ও ভালোবাসারই কবি। ক্লান্তি, বিষণ্নতা, অন্ধকারের কথা বললেও প্রত্যাশায় ফিরে আসার দিকেই তাঁর প্রবণতা। ঐতিহ্যে, দেশপ্রেমে, ভালোবাসায়, রোম্যান্টিকতায়, মানবিকতায়, প্রকৃতির শুদ্ধতায় এবং প্রেমে আস্থাশীল কবি আশিস সান্যাল বস্তুতই ষাটের দশকের প্রধান প্রবাহ থেকে কিছু অন্যরকম। মোটের উপর তাঁর কবিতা দুরূহতাহীন ও সরলভাবে আবেগ-সঞ্চারে সক্ষম। কখনো কখনো কিছু লঘু বিচিত্রতাকে প্রশ্রয় দিলেও তাঁর রচনায় কবিতার রহস্যময়তার সঞ্চারও নির্ভুল, গভীরতারও অভাব নেই। তিনি খুব সহজে লিখতে পারেন— 'যতই গভীরে যাই/মৃত্যু কাঁপে ধ্বনিময়/রৌদ্রের ভিতরে।' ("যতই গভীরে যাই, স্বপ্নের উদ্যান ছুঁয়ে")

সুনির্দিষ্ট কোনো তাত্ত্বিকতা নয়, কেবলই ভালো কবিতার জন্য ভালোবাসা থেকে ষাটের দশকের কবিতাসংক্রান্ত সক্রিয়তায় জড়িয়ে গিয়েছিলেন আরো অনেক কবি। তাঁরা কবিতা লিখেছেন নিজেদের ভাবনা, কল্পনা, আবেগ ও উপলব্ধি দিয়ে; পরস্পরের সঙ্গে সংযোগ রেখেছেন— কখনো সে সংযোগ সৌহার্দ্যে উত্তপ্ত কখনো বা সাময়িক ভুল বোঝাবুঝিতে আক্রান্ত— কিন্তু বিচ্ছিন্ন কখনোই নয়। বিভিন্ন সময়ে তাঁরা বিভিন্ন পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন কিন্তু সাধারণতই তাঁরা অনতিক্রম্য কোনো শিবির-বিভাগে বিশ্বাস করেন নি। পরিবর্তে তাঁরা বিশ্বাস করেছেন যে, যে-কোনো বিষয় নিয়ে ভালো কবিতা রচিত হতে পারে, উপলব্ধির সততা ও অনুভূতিময় সত্য ভাষণই কবিতার মূল শক্তি। তবে সমাজ-রাজনীতি-বিষয়ক প্রত্যক্ষ উচ্চভাষণ কবিতার কাজ নয় বলেই মনে করেছেন তাঁরা। এই কবিদের পৃথকভাবে কোনো গোষ্ঠী বা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করা যাবে না কিন্তু ষাটের দশকের কবিতা-চর্চার সম্পূর্ণ জমিটি সর্বদা ভরাট রাখবার কাজটি তাঁরা সানুরাগে ও সযত্নে করে গেছেন। পরবর্তী দুই দশকেও তাঁদের ভূমিকার বদল ঘটে নি। কবিতার নির্মাণে তাঁরা সনিষ্ঠ, চমক-বিরোধী, মনের গভীরতম তলের অনুভূতি ও আবেগ-কম্পনগুলিকে কেবল মরমী পাঠকের জন্যই লিপিবদ্ধ করতে চান তাঁরা। এমন অনেকের মধ্যে কয়েকজনের উল্লেখ করব উদাহরণ হিসেবে।

মৃণাল দত্তের কবিতা সংকলন 'মৌলিক নিষাদ' (১৯৬৬) একগুচ্ছ স্পন্দনময় লিরিকের সংকলন। বিপুল নৈঃসঙ্গ্যের আততি যেমন আছে কোনো কোনো কবিতায়, তেমনি আছে প্রসন্ন প্রেমের কবিতাও। নিসর্গের সূক্ষ্ম রূপাবয়ব এঁকে তোলেন তিনি— সেই ছবির রেখায় রেখায় তাঁর অন্তরবাসী গোপন সত্তার সঞ্চরণ। কবি নানা সুরে ও ভঙ্গিমায় কেবল সেই অন্তর-পুরুষের সঙ্গেই যেন কথা বলেন— সে কথা স্পর্শ করে পাঠককে। তিনি কখনো লেখেন—

"হে লক্ষ নক্ষত্রপুঞ্জ তোমরা সকলেই সাক্ষী আছো
শেষবার হেঁটে যাচ্ছি হাঁক দিয়ে পাড়া-পড়শী : 'যাই...
যাচ্ছি আমি,... কোনোদিন কখনো ফিরবো না,... হাওয়া কেঁদে যাক'।"

—"শেষ দশা"

আবার অন্যত্র লিখেছেন—

"বৈকালী দিনান্ত লগ্নে স্থির সায়ন্তনী উন্মোচনে
পদ্মের প্রতিটি পর্ণ দেখে নেবো উতলা
নির্জনে ।" —"সাড়া"

এক কথায় মৃণাল দত্তের কবিতাকে একাকীত্বের কবিতা বলাও যায় । সে একাকীত্ব কখনো বেদনাময়, কখনো শূন্যতাময় কখনো পূর্ণতায় ভরা । মৃত্যুর অনুভব মাঝে মাঝে থাকলেও জীবনের অসুস্থ বা বিকারগ্রস্ত দিকগুলির ছাপ তাঁর কবিতায় প্রায় নেই ।

সেই রকমই একাকীত্বের কবিতা লেখেন ভাস্কর চক্রবর্তী । তাঁর নিঃসঙ্গতার মধ্যে টেনশন কিছু বেশি, কিছু বেশি যন্ত্রণার ও অন্ধকারের ভাগ । তাঁর প্রথম কবিতা-সংকলন 'শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা' (১৯৭১) । কবিতাগুলির বহিরঙ্গে মাঝে মাঝেই আকর্ষক বিচিত্রতা আছে— কিন্তু ভিতরের কথাটি নিঃসঙ্গতা ও স্তব্ধতা । একটি উদাহরণ—

"স্তব্ধতা বিষয়ে যদি চাও, আরও কিছু আমি লিখে
জানাতে পারি
তোমাকে— এখন, আমাকে দ্যাখো
দ্যাখো, একা একা আমি রান্নাঘরে নেমে আসছি
কীরকম
ও বাড়ির গুরুপদ, সেই কখন ঘুমিয়ে পড়েছে
ইঁদুর মারা কল, এখন ছুটে চলেছে ইঁদুরের
পেছন পেছন
পোড়া কয়লা, এদিক ওদিক, জ্বল জ্বল করছে মেঝেতে"
—"স্তব্ধতা বিষয়ে"

ভাস্কর চক্রবর্তী অজস্র কবিতা লিখে যেতে অভ্যস্ত নন । দশ বছর পরে প্রকাশিত তাঁর দ্বিতীয় সংকলনটিতে ('এসো, সুসংবাদ এসো', ১৯৮১) প্রথমাংশে একাকীত্বের অতল নিমগ্নতা ও যন্ত্রণাবোধও যেমন তীব্র তেমনি দ্বিতীয়াংশে তা ছিন্ন করবার আকাঙ্ক্ষার আর্তিও অনুভব করা যায় । ভাস্কর চক্রবর্তীর কবিতার প্রবল বেধশক্তি আছে । পরের কালের কবিরা অনেকেই তাঁর কবিতায় নিজেদের ভাষা খুঁজে পান ।

ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকেই কবিতা লিখলেও অভী সেনগুপ্তের প্রথম কবিতা-গ্রন্থ 'হিমস্বরে পৃথিবীকে' সংকলিত হয় ১৯৭৬-এ । ব্যক্তিগত অনুভূতিকে কেন্দ্রে রেখেই তিনিও কবিতা লেখেন কিন্তু তাঁর কবিতায় মূর্ততাগুণের বৈচিত্র্য অনেকের চেয়েই বেশি । তাঁর কবিতায় আধুনিক মানুষ, আধুনিক সভ্যতার নানা চিহ্ন বহন করা মহানগরটিকে দেখতে পাওয়া যায় । সব ধরনের শব্দ ও 'মুড'-কে অনায়াসে ব্যবহার করেন তিনি । চিত্রকল্পগুণে খুবই সমৃদ্ধ অভী সেনগুপ্তের কবিতা । রচনারীতির কিছু কিছু পরীক্ষার দিকে তিনি মনোযোগী —টানা গদ্যে বেশ-কিছু কবিতা লিখেছেন । আধুনিক সভ্যতার কৃত্রিমতা ও অসুস্থতাকে জেনেও তিনি মনের মধ্যে এক সুস্থতাকে লালন করেন ।—

"কবিতা আমার কাছে বেঁচে থাকার জন্য
উবে যেতে যেতে / তলানির যা কিছু
সুগন্ধি" —"কিছু কিছু গুহামুখ", —'সুসময় চলে যায়', ১৯৮৩

লিখতে পারেন তিনি যে-কোনো সময়ে ।

কিন্তু ষাটের দশকে এমন কতিপয় কবিও ছিলেন যাঁরা প্রথম থেকেই যাত্রা করেছিলেন সহজ সুস্থতার বিপরীত মুখে । মৃত্যুবোধ তাঁদের কবিতায় বিকীর্ণ । জীবন-যাপন যেন এক কাতর অভিজ্ঞতা । কখনো তাঁরা বিষাদের নিমগ্ন অতলকে কবিতায় রূপ দিতে চেয়েছেন, কখনো যন্ত্রণার দাহকে । ব্যক্তিগত জীবনেও এই কবিরা সহজ, সংযত, সুস্থ যাপনকে কৃত্রিম মনে করতেন ; নেশার নিমজ্জনে তাঁরা অনেকেই খুঁজেছিলেন বাঁচার সত্য উপলব্ধি । এঁরা প্রায়ই অকালমৃত । তুষার রায়-কে এঁদের প্রতিনিধিত্ব দেওয়া চলে । তাঁর প্রথম কবিতা-গ্রন্থ 'ব্যাণ্ড-মাস্টার' (১৯৬৯) তাঁর প্রতিভার সৃজন । কবিতার বহিরবয়বে উচ্চকিত, চমকে দেওয়া ও ছটফটে ভাবটি বজায় রেখে অভ্যন্তরে মৃত্যু ও যন্ত্রণাবোধের তীব্র রেখা টেনে দেন তুষার রায় । বস্তুত তাঁর নির্মাণ সেদিক থেকে অতীব নিপুণ । কবিতা-গ্রন্থের নামটিতে যে আভাস আছে, অনেকটা সেরকমই ক্লাউন-সুলভ প্রচ্ছন্ন বেদনা-দীর্ণতা তাঁর কবিতায় । একটি উদাহরণই যথেষ্ট হবে—

"লাল আলোর সিগন্যালটা ডাউন
তারপরে আপ
আইঃ ...... ব্বাপ
ঘচাং করে ঘ্যাচ
তারপরে প্যাচ্‌প্যাচ্‌ রক্তে হড়্‌কে
চলে গেল বাহান্নটা কামরা ।

আরে ইয়ার—
ফর্দা ফাঁই জীবনখানা অল ক্লিয়ার
মুচকি হাসলুম দেখে নিজেরই মুণ্ড
স্থির রেল লাইনে—"

—"মা কি ডাকছে"

যে-কয়েকজনের কবিতার কথা বলা হল তাঁরা ছাড়াও আরো বহু কবি সমৃদ্ধ করেছেন এই সময়ের কবিতাকে । যেমন শামসের আনোয়ার, বাসুদেব দেব, মঞ্জুষ দাশগুপ্ত, নচিকেতা ভরদ্বাজ প্রমুখ । সব নাম করা সম্ভব নয় কিন্তু মোটামুটিভাবে সব প্রবণতাগুলির সন্ধান আমরা করতে চাইছি ।

ষাটের দশকের কবিতার বৈচিত্র্যের এখানেই শেষ নয় । এই দশকেই আমরা দেখেছি, বাংলা কবিতার চর্চা কলকাতা-কেন্দ্রিক বাতাবরণের বাইরেও আত্মবিশ্বাসে বেড়ে উঠতে পারছে । মহানগরের প্রত্যক্ষতায় না থাকলেও সে কবিতায় নাগরিকতার মননী নির্যাসটি প্রোজ্জ্বল দ্যুতি ছড়িয়ে দিচ্ছে অবলীলায় । সেই অর্থে আধুনিক বাংলা কবিতার চর্চা সারা বাংলায় একটি সম মানদণ্ড খুঁজে পেয়েছে এই দশকেই । বাংলা কবিতার নাগরিকতা আর সচেষ্টতার ছাপ বহন করছে না— হয়ে উঠেছে সর্বগামী এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের মতোই স্বাভাবিক । এ সত্যটিও হয়তো মনে রাখা যায় যে, বাংলার গ্রাম স্বাধীন ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক বিবর্তনগত কারণে এই সময়েই পুরোপুরি অর্জন করেছে তার গ্রামীণ সারল্য ।

কলকাতার বাইরে থেকেও অসম্ভব তীক্ষ্ণ নাগরিক মননকে কবিতার উপলব্ধির সঙ্গে মিশিয়ে নিয়েছেন এমন একজন বিশিষ্ট কবি সামসুল হক । দারিদ্র্য ও গ্রামীণ পরিবেশ তাঁর কাব্যানুভবকে বহুস্তরীয় বিস্তার থেকে বিচ্যুত করতে পারে নি । ক্রমেই তিনি অর্জন করে নিয়েছেন আধুনিক জীবনের তীক্ষ্ণতা, কাঠিন্য, স্বার্থপরতার অন্তর্বর্তী

একাকীত্বের বাধ্যতামূলক উত্তরাধিকার। সামসুল হকের কাব্যভাষা সমকালীনদের মধ্যে স্বতন্ত্র। প্রায়ই শাণিত তাঁর বাচন, কিছু বিদ্রূপ, কিছু আপাত-ঔদাস্য, কিছু কৌতুক, কিছু ক্রোধ ও প্রত্যাঘাত দিয়ে তিনি যেন নির্মাণ করেছেন তাঁর গভীরভাবে স্পর্শকাতর কবি-হৃদয়ের আত্মরক্ষার বর্মটি। সহজ-সরল ভঙ্গি নয়, কিছু বাঁকানো, শ্লেষদীপ্ত ভঙ্গীতেই তিনি সাবলীল[৭]। কবিতার ভাবনাতেও প্রত্যক্ষ ও সরলরৈখিক আবেগ-পরিবহনের পরিবর্তে পাঠককে কিছু চমকিত, কিছু বা আহত করতে তাঁর আগ্রহ। কিন্তু কাব্যময় ও উপলব্ধি-গভীর সেই আঘাত পাঠককে দেয় শিল্পাস্বাদের বিচিত্র পূর্ণতা। সামসুল হকের প্রথম দুটি কবিতা-গ্রন্থ 'হৃদয়ের গন্ধ' (১৯৬৪) এবং 'নিজের বিপক্ষে' (১৯৬৫)-তে এই প্রকরণ কবির সম্পূর্ণ আয়ত্ত ছিল না। নিসর্গের সৌন্দর্য ও শুদ্ধতায় তাঁর যে আশ্রয়ের বোধ পরবর্তী কালে তিনি প্রচ্ছন্ন রেখেছেন— তা প্রত্যক্ষভাবে অভিব্যক্ত হয়েছিল ঐ সময়ের কবিতায়। কিন্তু তৃতীয় সংকলন 'প্রটোপ্লাজম' (১৯৬৭)-এই সামসুল হক নির্দিষ্ট করে নিয়েছেন নিজের পথ।

"ঘর বাঁধার প্রথম শর্ত তোমাকে ভালোবাসা :
ডাইনোসর পৃথিবী থেকে বিদায় নিলো কেন ?
অমোঘ প্রথা ভালোবাসার কোথায় পরিভাষা ?
রিয়েলিটির প্রথম অঙ্কে নায়ক ভালোবাসা,
শেষ দৃশ্যের ফ্লাওয়ার ভাসে গভীর প্রত্যাশা।"

—"ভালোবাসা"

সামসুল হকের পরবর্তী কবিতাবলীতেও দেখি অনুভূতির প্রগাঢ়তা ও বাচনের তীক্ষ্ণতার সুন্দর সমন্বয়।

কলকাতার বাইরের আর-একজন কবি— যিনি স্বতন্ত্রভাবে ও শান্তভাবে নিজের কবিতা-চর্চার আন্তরিকতায় ষাটের কবিদের মধ্যে সম্মানিত স্থায়ী আসন করে নিয়েছেন তিনি কবিরুল ইসলাম। সামসুল হকের সঙ্গে তাঁর মিল নেই। সামাজিক অবস্থানগত প্রতিকূলতা প্রত্যক্ষ নয় তাঁর কবিতায়। মানুষ, প্রকৃতি এবং জীবন-যাপনের স্বাভাবিক পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে ধীর অন্তর্মগ্নতা তাঁর স্বভাব। অল্প উপকরণ অথচ চিত্ততলের গহন তিনি স্পর্শ করেন খুব সহজেই। তাঁর স্বর শান্ত, আস্তিক্যময়, কিছু দার্শনিকতায় স্বচ্ছ। ষাটের কবিদের পক্ষে বিরল এক প্রসন্নতা— প্রায় স্নিগ্ধতা— পাওয়া যায় তাঁর কবিতায়। কবির নির্জনতা তাঁকেও ঘিরে থাকে কিন্তু তার অনুভূতি যন্ত্রণাময় নয়। প্রথম কবিতা-গ্রন্থ 'কুশল সংলাপ' (১৯৬৭)-এ কবি পরিণত বাগ্‌ভঙ্গিটির অপেক্ষায় ছিলেন যা তিনি খুঁজে পান দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'তুমি রোদ্দুরের দিকে' (১৯৭১)-তে। সেই সংকলনের একটি কবিতাংশ—

"আমার অসুখ রৌদ্র জ্যোৎস্নার ভিতরে
আপতিক, যেন প্রতিকারহীন
আমার অসুখ জলে স্থলে

তুমিই অসুখ, তুমি বিশল্যকরণী।"

—"তুমিই অসুখ, তুমি বিশল্যকরণী"

এঁদের মতোই আরো বহু কবি এইভাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন কলকাতার বাইরে থেকে। বিশিষ্টদের মধ্যে শিল্পাঞ্চলবাসী মতি মুখোপাধ্যায়, আসামে বাংলা কবিতার অন্যতম পুরোধা শক্তিপদ ব্রহ্মচারী, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা-র বিনোদ বেরার নাম করা যায়।

আরো একটি কারণে ষাটের দশক পূর্ববর্তী সময়ের থেকে একটু আলাদা। ত্রিশ ও চল্লিশের কবিতা-চর্চায়

মহিলাদের স্থান ছিল না বললেই হয় । তিনটি দশক জুড়ে রাধারানী দেবী, রাজলক্ষ্মী দেবী, কবিতা সিংহ আর নবনীতা দেবসেন— এই চারজনকে মাত্র স্মরণ করতে পারি রবীন্দ্রোত্তর পর্বে । কিন্তু ষাটের দশকে পরিবর্তিত সামাজিক পরিস্থিতিতে মেয়েদের কবিতা-চর্চা হয়ে উঠল ব্যাপক । মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারে শিক্ষাক্ষেত্রে মেয়েদের সমান সুযোগ এসেছে বেশ-কিছুদিন আগে থেকেই । সামাজিক পরিবেশ প্রায় সর্বক্ষেত্রে উন্মুক্ত হয়ে গেছে পঞ্চাশের দশকেই । সেই আলো বাতাস থেকে মেয়েদের পক্ষে কবিকল্পনার বীজ তুলে নেওয়ার সম্ভাব্য সময়টিই হল ষাটের দশক । যখন থেকে এঁরা কবিতার আসরে নামলেন তখন থেকেই চিন্তা-স্বাতন্ত্র্যে ও আঙ্গিকের কুশলতায় হয়ে উঠলেন বিশিষ্ট । পরবর্তী দশকে মেয়েদের কবিতা লেখাকে আর 'মেয়েদের' বলে আলাদা করবার কোনো প্রবণতা দেখা গেল না ।

দীর্ঘকাল নিয়মিত কবিতা চর্চা করেছেন সাধনা মুখোপাধ্যায় । ১৯৬০-এই প্রকাশ পায় তাঁর প্রথম কবিতা-সংকলন 'আকাশ কন্যা' । মধ্যবিত্ত নারী-জীবনের ইতস্তত অভিজ্ঞতার পুঞ্জ থেকে কাব্য-প্রতিমা নির্মাণে সাধনা মুখোপাধ্যায় স্বচ্ছন্দ । খুব স্পষ্ট সামাজিক একটি মন আছে তাঁর, ঈষৎ তির্যক দৃষ্টিভঙ্গি । তাঁর কবিতায় নারীর ব্যক্তিত্ব সর্বদা স্বীকৃত । খুব গভীর কোনো যন্ত্রণা বা দাহের চিহ্ন খুব বেশি নেই তাঁর কবিতায় । সাধনা মুখোপাধ্যায়ের তৃতীয় কবিতা-গ্রন্থ 'কুন্দ কদলী কৃষ্ণচূড়া' (১৯৭১) থেকে একটি কবিতাংশ—

"কেন যে পীড়ন কর লাউডগা ইচ্ছেদের
মাছমাংস সব ছেড়েছুড়ে
গন্ধেতে আতুর ক্ষুধা লোভের মাচায়
লক্ লক্ করে ওঠে বেড়ে
হৃদয়ের তৃপ্তি শুধু গোপন সুরভিসার
নির্জন বাক্সে রাখলে মুড়ে ।"

—"নিষ্ঠাবতী"

বিজয়া মুখোপাধ্যায়ের কবিমানস কিন্তু প্রথম থেকেই মনোগহনচারী । অভিজ্ঞতা তিনি আহরণ করেন, আর সেই অভিজ্ঞতাকে জারিত হতে দেন নিজেরই মনের নানা প্রশ্নে, সংশয়ে, উত্তাপে, বেদনায়, প্রীতিতে । তার পর এক সময়ে ভাষা পায় সেই সংবেদনা । কোনো দ্রুততার ভাব নেই— অনুভূতিটি সংহত না হলে যেন তাঁর মনের মধ্যে কবিতা প্রস্তুত হয় না । সৌন্দর্য ও মঙ্গলে বিশ্বাসের একটি কেন্দ্রভূমি আছে তাঁর কিন্তু জীবনের জটিলতা —এমন-কি, শূন্যতাকেও অস্বীকার করেন নি কখনো । কবিতার সূক্ষ্ম-বিচিত্র সম্পন্ন ভাষা তাঁর আয়ত্ত । ষাটের দশকে বিজয়া মুখোপাধ্যায় খুব বেশি লেখেন নি । দিনে দিনে পরিণত হয়েছেন । তবু তাঁর প্রথম সংকলনেই ('আমার প্রভুর জন্য', ১৯৬৭) পাওয়া যায় তাঁর কবি-প্রতিভার নির্ভুল স্বাক্ষর । দুটি উদাহরণ—

"কে আমাকে ডেকে বলে, 'শোনো
শান্তির অমোঘ বিভা শ্বেত সৌম্যমুখে
নির্ভুল প্রশংসাপত্র বয়সের,
মনে যাই থাক, ভদ্রভাবে বৃদ্ধ হতে হবে, না হলে ধিক্কার ।" —"ব্যক্তিগত"

"একদিন রাতে
অসতর্ক ঘুমের আড়ালে
পদ্মানদী চুরি হয়ে গেল ।

চারদিকে কত খোঁজাখুঁজি
মন্ত্র পড়া ঝাড়া পিঁড়ি চালা
ডাকাডাকি তর্জনগর্জন ।
কিন্তু চোর অতি বুদ্ধিমান
রা'টি কাড়ে না ।"

—"পদ্মা : ২"

কাব্যপ্রকরণ ও কল্পনা— উভয়তই একটি সজীব নতুন ধরন নিয়ে এসেছেন দেবারতি মিত্র । তাঁরও কবিতার অভিমুখ অন্তর্মগ্নতার দিকে । আধুনিক মানুষের তীব্র বিপন্নতাবোধ ধরা পড়েছিল তাঁর প্রথম কবিতা-গ্রন্থ 'অন্ধ স্কুলে ঘণ্টা বাজে' (১৯৭১)-তে ।—

"আমার গলায় এত শক্ত হিম নীল ফাঁসি
এমন জড়িয়ে এঁটে আছে ।"

—"সে অমূল বঞ্চনা"

আবার আস্তিক্যবোধ দুর্লক্ষ্য নয় ঐ সংকলনে । কিন্তু ক্রমে পরিচিত দৃশ্যের মধ্যে আপাত অবাস্তবের এক মায়া সঞ্চারিত হয়েছে তাঁর লেখায় । প্রতিদিনের দেখা প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যেই রহস্যের সন্ধান পান তিনি । তার রহস্যটি বজায় রাখেন কবিতার বর্ণনা ও চিত্রকল্পে । এই গুণটি ক্রমেই তাঁর কবিতায় সুপরিণত, কবিত্বস্বাদমণ্ডিত স্বাতন্ত্র্যময় হয়ে উঠেছে । সেই সমৃদ্ধ কবিকল্পনার সম্যক পরিচয় পাওয়া যাবে সত্তরের দশকে প্রকাশিত দুটি কবিতা-সংকলন 'আমার পুতুল' (১৯৭৪) ও 'যুবকের স্নান' (১৯৭৮-এ) । দেবারতির কবি-কল্পনার উদাহরণ—

"আলতো সবুজ ঝিঁ ঝিঁ থোকা থোকা
সমস্ত গা গুঞ্জরণময় একটি বাজনা গাছ
গোল ফোয়ারার মতো আকাশের নিচে
যে যেন আরম্ভ হল এইমাত্র ।

—"একটি বাজনা গাছ"

আরো কয়েকজনের মধ্যে উল্লেখ্য গীতা চট্টোপাধ্যায় । কল্পনার বিচিত্রচারিতা ও ভাষার ওপর নিপুণ দখল নিয়ে প্রথম এসেই পাঠকদের আকৃষ্ট করেছিলেন তিনি । একটি-দুটি পত্রিকা ছাড়া তাঁর লেখা বিশেষ কোথাও প্রকাশিত হত না বলে তাঁর প্রথম দিকের কবিতার নিদর্শন উপস্থিত করা সহজ নয় । সম্ভবত তাঁর কোনো কবিতা-সংকলনও নেই । প্রথম পর্বে পুরাণ-প্রতিমা ব্যঞ্জিত, সুশীলিত, আবেগ-গভীর রোম্যান্টিক কবিতা লিখেছেন তিনি । পরবর্তীকালে নাগরিক সভ্যতার জটিল রেখাগুলিকে রূপ দিয়েছেন কবিতায় । তাঁর পরবর্তী সময়ের কবিতার একটি উদাহরণ—

"বাঁদিকে দুরন্ত ঝড় ছুটে আসছে দক্ষিণের মিনি
ডানদিকে ড্রাগনের ফোঁস ফোঁস ডবল ডেকার
পেছনে আদিম জন্তু হিস হিস ট্রামের লাইন
কোথায় পালাবো বলো দু'পা ডেবে গেছে কাঁচা পিচে ।

মেদিনী গর্ভের থেকে চাকা তুলতে অর্জুন দেবে না ?
শুনেছি অনন্য বীর, নামাবে না মুহূর্ত ধনুক ?"

নাম করা যায় কেতকী কুশারি ডাইসন-এর। বিদেশবাসের সূত্রে তাঁর অভিজ্ঞতার কিছু অন্যরকম বিস্তার আছে। প্রবাসী চোখে ভারতকেও যখন দেখেন— সেখানেও কিছু অভিনবত্ব উঠে আসে যা আমাদের কাছে অনেক সময়ে ধরা পড়ে না। তাঁর কবিতা বিবৃতিময়— মোটের ওপর সরল। জীবনের টুকরো অনুভূতিগুলির চিত্রণ তাঁর কবিতায়। 'বল্কল' তাঁর প্রথম কবিতা-সংকলন প্রকাশ পেয়েছে সত্তরের দশকের প্রথমার্ধে।

এতক্ষণ আমরা দেখাবার চেষ্টা করেছি যে ষাটের দশকের বিক্ষুব্ধ রাজনৈতিক পরিবেশ ও সামাজিক অ-নিরাপত্তা ভিতরের দিক থেকে বহু কবিকে আলোড়িত করলেও প্রত্যক্ষ রাজনীতি-সচেতন কবিতার দিকে তাঁদের ঝোঁক প্রধান হয়ে ওঠে নি। কিন্তু এমন একটি কবিতা-চর্চার ধারাও এই সময়ে বহমান ছিল যেখানে সমাজ-রাজনীতি সচেতনতার বিশিষ্ট ভঙ্গিটিকেই লালন করা হয়েছে আলাদাভাবে। বলা বাহুল্য, এই কবিরা প্রায় সকলেই প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

১৯৬৪ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি দ্বিখণ্ডিত হবার পর 'মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি'-র পশ্চিমবঙ্গ শাখা থেকে 'নন্দন' নামে যে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয় ১৯৬৫-তে— সেই পত্রিকা ঘিরে মিলিত হয়েছিলেন সাম্যবাদে বিশ্বাসী কবিরা নির্দিষ্ট সামাজিক ও রাজনৈতিক বিশ্বাস থাকার জন্য, সেই বিশ্বাসকে সাহিত্যে প্রতিফলিত করতে হবে— এই দায়বোধে এবং খানিকটা সময়ের চাপের মধ্যে নিজেদের কথাটিকে স্পষ্ট করে তুলতে হবে— এই সংকল্পে তাঁদের কবিতার খুব সুনির্দিষ্ট এক ধরনের রূপ ও বক্তব্য গড়ে উঠেছিল। এ-জাতীয় রাজনৈতিক কবিতাকেও কিন্তু মুছে দেওয়া যাবে না কবিতার ইতিহাস থেকে। প্রাক-স্বাধীনতা পর্বে সমগ্র চল্লিশের দশক জুড়ে এ-জাতীয় বহু কবিতা লেখা হয়েছে। ষাটের দশকে এ-সব কবিতার সবচেয়ে বড়ো সমস্যা হয়ে উঠল বৈচিত্র্যহীনতা। বলবার কথা একটিই— তা হল পুঁজিবাদ, প্রতিক্রিয়াশীলতা এবং সরকারের (কেন্দ্র ও রাজ্য— কারণ সময়টা ১৯৮৮-এর আগে) বিরুদ্ধতায় দরিদ্র মানুষের পক্ষে দাঁড়ানো। বলবার ভঙ্গি একটিই — তা হল— এখন নৈরাশ্য কিন্তু সংগ্রামী আশা জাগিয়ে রাখতে হবে— দিন বদলাবেই। এই ধরনের কবিতায় ব্যক্তিগত আত্মনিমজ্জিত ভঙ্গিটি আনুকূল্য পায় না। এতখানি সীমাবদ্ধতা পরের দশকগুলিতে শিথিল হয়েছিল। তার আগে পঞ্চাশের দশকের ব্যক্তিমনের স্বাধীনতায় সঞ্চারিত কবিতার হাওয়ায় শ্বাস গ্রহণ করেছিলেন যে সাম্যবাদী কবিরা— তরুণ সান্যাল ও অমিতাভ দাশগুপ্ত— তাঁরা কোনোদিনই এ-ধরনের বাধ্যতাকে প্রশ্রয় দেন নি। ষাটের দশকে এই আবহাওয়ার কবিদের মধ্যে নাম করতে পারি প্রণব চট্টোপাধ্যায়, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, রথীন্দ্রনাথ ভৌমিক, শ্যামসুন্দর দে, অরুণ মুখোপাধ্যায়, অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়, শ্যামল সেন, দীপংকর চক্রবর্তী, অমল চক্রবর্তী প্রমুখের। এঁদের মধ্যে শক্তিমান কবি আছেন কিন্তু পূর্বপোষিত ধারণার ছকে কবিতা লেখার দুরূহ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যাবার ফলে সব সময়ে তাঁদের শক্তির পূর্ণ বিকাশ ঘটে নি। এ কথাটি অনেককেই দুঃখিত ও বিরূপ করতে পারে। কিন্তু আজ বোধ হয় এ কথার যাথার্থ্যে কোনো মত ও পথের কবি বা পাঠক সংশয় রাখেন না। এর মধ্যেও এই কবিরা অনেক ভালো কবিতা লিখেছেন। তিনটি উদাহরণ দিচ্ছি—

"বাপ মোর ঠেশ দেত ঘরের দাওয়ায়,
বলত, আহ্, জল না জেবন।

...

না রে বা প
আখুনও জেবন হয়নি জল

আখুনও যে কম-জলে অতি-জলে
মিত্যু আসে বাপ ;
মোদের এ হাতে
আখুনও জলের নাম হয়নি জেবন,
জেবন আখুনও অভিশাপ ।"

—"ভাসান", 'স্বদেশের প্রতিমা ভাসানে'— অমল চক্রবর্তী

বাবা বললেন, আয়,
ভুলিস নে রে, বুঝলি খোকা
অস্ত্রের ঘা বুকে ধরিস
পিঠে নয় রে— বুঝলি খোকা
বুকে ধরিস ।
আয় !!

—"রণযাত্রা", 'চেনা আয়নায়' —রথীন্দ্রনাথ ভৌমিক

এপারেতে তেল সিঁদুর / খোঁজে কনে বরে
ওপারেতে ভিয়েতনাম / লাল টুকটুক করে ।

—"ছড়া", 'সীতারামের খেলা' — দীপংকর চক্রবর্তী

ষাটের দশকের দ্বিতীয়ার্ধ বামপন্থী রাজনৈতিক পরিস্থিতির দিক দিয়েও ছিল যথেষ্ট জটিল । ১৯৬৪-তে কমিউনিস্ট দল দ্বিখণ্ডিত হবার পর একটি অংশকে 'শোধনবাদী' আখ্যা দিয়ে অপর অংশটি নিজেদের প্রকৃত বামপন্থী বলে প্রতিষ্ঠিত করতে অগ্রসর হয় । সেই অংশেরই মুখপত্র ছিল 'নন্দন' পত্রিকা । কিন্তু একদিকে যেমন অন্য দলটিরও অস্তিত্ব থেকে যায়, অপর দিকে নবগঠিত 'প্রকৃত' বামপন্থীদের একটি অংশ ক্রমেই অতিবামপন্থার দিকে ঝুঁকে পড়তে থাকে । ষাটের দশকেই এক কমিউনিস্ট দল তিন টুকরে হয়েছিল । সেই তৃতীয় অংশটি দানা বেঁধে ওঠে ১৯৬৭-তে নকশালবাড়ির কৃষক অভ্যুত্থানের ঘটনার প্রেক্ষিতে । ১৯৬৯-এ যথাযথভাবে 'মার্কসবাদী-লেনিনবাদী কমিউনিস্ট পার্টি' এবং বাঙালির চলতি ভাষায় 'নকশালপন্থী' কমিউনিস্ট দল প্রতিষ্ঠিত হল ।

রাজনীতি-মনস্ক ও ঘোষিতভাবে সামাজিক দায়বদ্ধ কবিতার কবিরাও, অতএব, বিভক্ত হয়ে যেতে লাগলেন তিনভাগে । 'নন্দন' পত্রিকাগোষ্ঠীর পাশাপাশি সেই সময়ের 'পরিচয়' এবং পুনঃপ্রকাশিত 'সীমান্ত' পত্রিকাকে (দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রকাশ ১৯৬৬) কেন্দ্র করে একত্র হলেন এমন কয়েকজন কবি যাঁরা ছিলেন কমিউনিস্ট দলের পুরোনো অংশটির সঙ্গে । যদিও, মনে রাখতে হবে, অধিকাংশ কবিই একাধিক পত্রিকায় লিখতেন । একটি পত্রিকার গণ্ডিতে থাকতেন না সীমাবদ্ধ । তত্ত্বগতভাবে রাজনৈতিক মতবাদের দিক দিয়ে 'পরিচয়', 'সীমান্ত' প্রমুখ পত্রিকার কবিরাও ছিলেন সাম্যবাদী । কবিতায় তার চিহ্ন অবশ্যই আছে । তবে মণীন্দ্র রায়, রাম বসু, তরুণ সান্যাল প্রমুখ প্রতিষ্ঠিত অগ্রজ কবিদের সঙ্গে নিয়ত সংযোগের ফলে তাঁদের কবিতা-ধারণায় শিল্পমনস্কতার একটি পরিণত ছাপ লক্ষ করা যায় । প্রত্যক্ষ ঘোষণামূলক, উচ্চকণ্ঠ ভঙ্গি অথবা অনাবৃত বিদ্রূপোক্তির সূচীমুখ রীতি কবিতার ক্ষেত্রে বর্জনই করেছিলেন তাঁরা মোটামুটিভাবে । কবিতায় একটি শৈল্পিক আড়াল মনে করেছেন বাঞ্ছনীয় ।

ষাটের দশকে এই ধারার কবিদের মধ্যে একটি বিশিষ্ট নাম গণেশ বসু । এক অর্থে তাঁকে এই ধারার ষাটের কবিদের প্রতিনিধিত্বও দেওয়া চলে । নিজের কাব্যভাবনা সম্পর্কে এবং তাঁর মতে কবিতা কেমন হওয়া উচিত সে সম্পর্কে তিনি লিখিত অভিমত ব্যক্ত করেছেন নিজের একটি কবিতা-সংকলনের ভূমিকায় । 'অমৃত আস্বাদে

মৃত্যু বাংলাদেশ'(১৯৭১) সংকলনে তাঁর উক্তি— "পুঁজি-নিয়ন্ত্রিত সমাজের জটিল যন্ত্রের মধ্যে যাঁরা দিশা হারান তাঁরা দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে মানব ইতিহাসে কেবলই ঊষরতা দেখতে পান ।... সত্যিকারের আধুনিক কবিতা, গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির মূলমন্ত্র ধারণ করে । জনগনের স্বাধিকার রুটি রুজির সংগ্রামে সে হবে একাত্ম ।" এই উক্তি যতটা স্পষ্টতাময়, গণেশ বসুর কবিতা কিন্তু সেই অনুপাতে ইঙ্গিতময় অনেক বেশি । গভীর রেখায় মূর্ত চিত্রকল্প গড়ে তুলেই তিনি তাঁর কাব্য-উপলব্ধি পাঠকের মনে পরিবাহিত করতে চান ।

গণেশ বসুর প্রথম কবিতা-সংকলন 'বনানীকে কবিতাগুচ্ছ' (১৯৬৪) তুলনায় আত্মমগ্ন, লিরিক্যাল ভাবনা-প্রধান । কিন্তু দ্বিতীয় সংকলন 'নিজের মুখোমুখি' (১৯৬৭) এবং বিশেষ করে তৃতীয় সংকলন 'সমুদ্রমহিষ' (১৯৬৯) কবিকে তাঁর নিজস্ব চারণভূমি, স্বরগ্রাম এবং শৈল্পিক উত্তরণে স্থিত করেছে । কেউ কেউ অবশ্য তাঁর কবিতায় বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রভাবের কথা বলেছেন । 'সমুদ্রমহিষ'-এর কবিতাগুলি তাঁর স্বাতন্ত্র্যের ও সাফল্যের অভ্রান্ত প্রমাণ বলেই মনে হয় ।—

"মাঝে মাঝে ক্ষেপে ওঠে শিরাফোলা সমুদ্রমহিষ
আমার ভেতর বুকে ফসফরাস,
রক্তে টান প্রবলতা, বিস্ফোরণ ঘটে যায় যেন
আকাশ পাতাল জুড়ে, চুল ছেঁড়ে বাহুর পারদে
ভয়ংকর অস্থিরতা, বিধ্বস্ত চোয়াল ।"

—"সমুদ্র মহিষ"

গণেশ বসুর মতোই একই কাব্য বিশ্বাসের শরিক কবি তুলসী মুখোপাধ্যায় । তবে বিভিন্ন ধরনের পত্র-পত্রিকায় তাঁর কবিতা প্রকাশিত হয়েছে— যেমন 'পরিচয়', 'সীমান্ত', 'নতুন পরিবেশ', 'এক্ষণ' ; তেমনিই 'কৃত্তিবাস' বা 'গঙ্গোত্রী'— আবার 'দেশ' ও 'অমৃত' । ষাটের দশকে রচিত কবিতাগুলিতে কবির সামাজিক-রাজনৈতিক বক্তব্য ছিল অত্যন্ত স্পস্ট । তাঁর বাগ্‌ভঙ্গিও তুলনায় কিছু প্রত্যক্ষ । দ্বিতীয় কবিতা-সংকলন 'অন্ধকারের প্রতিবাদে' (১৯৭১) থেকে এই জাতীয় কবিতার একটি নিতান্ত সরল উদাহরণ—

"লেনিন সরনি দিয়ে একবার হেঁটে গেলেই
আমার মনে হয়
মৃত্যুর আগে আমি নিশ্চয় দেখে যেতে পারব
যেখানে মানুষ হাঁটে সেখানেই লেনিন সরণি"

—"লেনিন সরণি দিয়ে"

পরবর্তী কালে তাঁর কবিতার বিষয়গত পরিসর বেড়েছে অনেক । তুলসী মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় কিন্তু সব সময়েই একটি আবেগতীব্রতা অনুভব করি । ব্যক্তিগত একটি হৃদয়-তাপ বিকীর্ণ হয় যেন তাঁর কবিতা থেকে । ক্রোধ তাঁর কবিতায় বড়ো সুন্দরভাবে শিল্পিত হয় । তৃতীয় কবিতা-সংকলন 'সময় আসবে' (১৯৭৬)-তে এমনি কয়েকটি পঙ্‌ক্তি— "আমাদের বরাদ্দ প্রোটিনে বাঘ হয় ওদের কুকুর"— শ্রেণীবিভক্ত সমাজে বিত্তবানদের প্রতি নিক্ষিপ্ত ঘৃণা ; "মৃত্যুশয্যাতে তোমাকে এক ফোঁটা জলও দেব না ।"— এখানে কবির বিরাগ নকল শুভানুধ্যায়ীর প্রতি ; আর 'অতএব' কবিতায় তাঁর অভিমানী ক্রোধ রমণীর প্রতি— "তুমি হৃৎপিণ্ড বাজেয়াপ্ত করে / বাস্তুময় খালি আহ্লাদ পুষেছ ।"

ধারাটি বোঝবার জন্য এর বেশি আর উদাহরণ নিষ্প্রয়োজন । এই কবিদের সঙ্গে ছিলেন দীপেন রায়, তুষার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ আরো অনেকেই ।

ষাটের দশকের কবিতার আলোচনায় আরো একটি তথ্য উল্লেখ্য— তা হল অজস্র পত্রিকার প্রকাশ । কিছু

পত্রিকার নাম প্রসঙ্গত করা হয়েছে আগেই । চল্লিশের দশকের তিন কবি জগদীশ ভট্টাচার্য, অরুণ ভট্টাচার্য এবং শুদ্ধসত্ত্ব বসু যথাক্রমে 'কবি ও কবিতা', 'উত্তরসূরি' এবং 'একক' পত্রিকায় সম্পাদক হিসেবে অবিরল সুযোগ দিয়েছেন ষাট ও সত্তরের কবিদের ।

ষাটের দশকের কবিতার গতি-প্রকৃতি আলোচনায় এই দীর্ঘ পরিসর এই অর্থেই প্রয়োজনীয় যে রবীন্দ্র-উত্তরকালে ত্রিশ চল্লিশ ও পঞ্চাশে দশকের কবিতা-চর্চার প্রধান ধারা ছিল অনেকটা সুস্পষ্ট এবং অবিতর্কিত। কিন্তু ষাটের দশকেই সম্ভবত 'প্রধান ধারা' বলে কিছু রইল না । বহু ধারা— বহু সুরের কবিতার সমন্বয় এই সময়ের বৈশিষ্ট্য ।

দ্বিতীয়ত, ষাটের দশকের কবিতার যে অনেকটা অনুপুঙ্খ ছবি তুলে ধরবার চেষ্টা হল সেই ছবিটি তাঁদের ক্ষেত্রে অনেকাংশে আশির দশকেও একই রকম আছে । বলা বাহুল্য, সত্তরের দশকেও এই ষাটের কবিরা তাঁদের নিজেদের মতো কবিতা লিখেছেন । তবে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁদের শিল্পনৈপুণ্য হয়েছে মসৃণতর । ফলত ষাটের দশকের কবিতার এই চেহারা— এই দৃশ্যপটটি সত্তর এবং আশির দশকেরও বাংলা কবিতার একটি বড়ো অংশের পরিচয় প্রতিফলিত করছে আগের মতোই । এই মঞ্চে নতুন নতুন কবি এসেছেন, তাঁদের স্বাতন্ত্র্যও অনুভূত হয়েছে কিন্তু সামগ্রিক গতি-প্রকৃতিটি তাতে পরিবর্তিত হয় নি । সমাজমনস্কতার একটি সুগভীর-প্রোথিত শিলাপটের ওপর দাঁড়িয়ে ব্যক্তিমনের কেন্দ্রমূলস্পর্শী অনুভবের ব্যাকুলতাকে বিভিন্ন ও বিচিত্ররূপে প্রকাশ করবার আর্তি— একেই আমরা বলতে পারি ষাটের দশকের প্রধান প্রবণতা । কিছু বিবর্তিত রঙ ও রেখা এসে গেলেও সত্তরের দশকের অনেক ও আশির দশকের প্রায় সবটাই ঐ একই ছবির যেন পুনর্মুদ্রণ দেখতে পাই । কাজেই আমাদের আলোচনার জন্য যা অবশিষ্ট থাকে তা এটুকুই দেখা— সত্তরের দশক বা আশির দশকে এই সাধারণ চালচিত্রটির বাইরে নবীন সৃষ্টিস্রোত কিছু ছিল কিনা এবং থাকলে তার স্বরূপ কী ।

উত্তরটি দুরূহ নয় । সত্তর দশককে মুক্তির দশক করে তোলবার সাধনা ছিল যাঁদের ; রাজনৈতিক দর্শনের অপূর্ণতা বা পরিকল্পনাগত ভ্রান্তি বা নেতৃত্বের অন্তঃকলহ ও ফলত সমগ্র আন্দোলনের পরিণামী অসাফল্য সত্ত্বেও ষাটের দশকের শেষ দু-বছর এবং সত্তরের প্রথমার্ধে তাঁরাই এনেছিলেন বাংলা কবিতায় প্রজ্বলন্ত নতুন দিনের বাণী । রাজনৈতিক ও সামাজিক বিশ্বাসের দিক থেকে তা চল্লিশের দশকেরই অনুসারী বাহ্যত কিন্তু ভিতরে ভিতরে তার অগ্নিস্রাবের জাত আলাদা । স্বার্থান্বেষী রাজনীতিবিদ ও ধনতন্ত্রমুখী সামজিক প্রবণতাকে একই সঙ্গে ক্রোধ ও ঘৃণার অস্ত্রে বিদ্ধ করতে উঠে এলেন একদল তরুণ । কবিতা তাঁদের হাতে ভিন্ন রূপ নিল । তবে, স্বাভাবিক কারণেই এই উত্তেজনাপ্রসূত এবং একমুখী রাজনৈতিক বিশ্বাসজাত কবিতাগুলি অনেক সময়েই তেমন শিল্পোত্তীর্ণ হল না । তবু চল্লিশের দশকের পরে রাজনীতির স্বেদ-রক্ত-উত্তাপ উৎসারিত কবিতার স্রোত নতুন করে অনর্গল হল বাংলা সাহিত্যে । কবিতা-গতিপথের এ এক নতুন বাঁক ।

এই পরিবর্তিত গতিস্রোতে আমরা প্রথমেই দু'জন বিশিষ্ট কবির আলোচনা সেরে নেব ।

কবি কমলেশ সেন পূর্ব-বাংলায় বাস করেছেন ১৯৬২ সাল পর্যন্ত । পূর্ব বাংলার যে ছাত্ররা মার্কস্‌বাদের চর্চায় নিষ্ঠাবান ছিলেন তাঁদেরই একজন তিনি । ১৯৬২ সাল নাগাদ বাংলাদেশের বহমান ভাষা-আন্দোলন তথা স্বাধীনতা-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তিনি বিশেষভাবে কবিতা লিখতে শুরু করেন । আবার সেই সংযোগই তাঁকে বাধ্য করে সীমান্ত পার হয়ে এই বাংলায় পুনর্বাসিত হতে । তার পর থেকে তিনি পশ্চিমবাংলারই কবি। এপারে পা দেওয়া মাত্র তাঁর যোগ স্থাপিত হল মার্কস্‌বাদী গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে । ষাটের দশকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে তাঁর সংযোগ মূলত নকশালপন্থীদের সঙ্গেই । তাঁর কবিতা চিরকালই প্রতিবাদী । প্রথম ও দ্বিতীয় সংকলন প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৯৬৩ ও ১৯৬৫-তে । সাধারণ সাম্যবাদী বিশ্বাসের কবিতার পাশাপাশি আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার মানুষের নিপীড়ন ও সংগ্রামের কথা লিখেছিলেন তিনি তাঁর প্রথম দুটি বইয়ে ('মানুষ শহর সমুদ্র'

এবং 'প্রচ্ছন্ন স্বদেশ') । কিন্তু নকশালবাড়ি আন্দোলনের সমকাল থেকে তাঁর কবিতার ভাষা ও ভঙ্গি হয়েছে তীক্ষ্ণতর, সরাসরি তিনি পক্ষ নিয়েছেন এবং হয়ে উঠেছেন এই ধারার কবিদের অন্যতম প্রতিনিধি । তৃতীয় কবিতা-গ্রন্থ 'সজ্জিত মানুষ' (১৯৭০) এবং চতুর্থ কবিতা-গ্রন্থ 'যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' (১৯৭৪)-তে কমলেশ সেনের কবিতা বিশেষভাবে সত্তরের দশকের এই বিশিষ্ট চরিত্রটি পেয়ে যায় । কবিতার রূপকর্মে অনায়াস এক স্বাচ্ছন্দ্য, কাব্যকল্পনার এক সাবলীল বিস্তার— এই সময়েই তিনি সম্পূর্ণ আয়ত্ত করে নিয়েছেন ।— "বলো কোথায় তোমাদের স্তুতির করপুট, / তোমাদের পাথর ধোয়া হাতে / শঙ্খচূড় সাপ ।" ('পৃথিবীর সব উপকূলেই পরিচিত কণ্ঠ', 'সজ্জিত মানুষ') এই পঙ্‌ক্তিগুলির চিত্রকল্পময় ব্যঞ্জনার পাশাপাশি একেবারে সোজা— একেবারে খোলা ভাষায় লিখতে তাঁর কোনো দ্বিধা হয় না—

"বারুইপুর সোনারপুর রোদ ঝলমল করছে
ব্যারাকপুর কাশীপুর মন গুন গুন করছে

...

কোথায় নাকি মানুষগুলো, রক্ত ঢেলে দিচ্ছে
কোথায় নাকি মানুষগুলো লাল পতাকা নিচ্ছে ।"

—"উত্তর থেকে আগত একটি খবর পড়ে"

এই জাতীয় অত্যন্ত স্পষ্টোক্তিময়, 'টপিক্যাল' এবং সংগ্রামের লক্ষ্য সম্পর্কে আশাবাদী কবিতাবলী সত্তরের রাজনৈতিক কবিতার বিশিষ্টতা ।

আশাবাদের পাশাপাশি ঘৃণা ও বিদ্রুপের প্রকাশভঙ্গি এ-সব কবিতায় অত্যন্ত বেশি অঙ্গীকৃত । কমলেশ সেন 'যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' কাব্যগ্রন্থে লিখেছেন—

"এখন স্বাভাবিক নিয়মেই পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে
লাখ টাকা ব্যয়ে তৈরী হয়
বিশ্বাসঘাতকের খোদাই করা পাথরের মূর্তি ।"

—"ভারতবর্ষে এসব নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে"

তাঁর মনে এমত দ্বিধা জাগে নি যে এই পঙ্‌ক্তিনিচয় উত্তীর্ণ কবিতার রূপ পেল না । তখন এমন লিখতে প্রারার অনুভূতি আর সাহসই ছিল বড়ো কথা । সাহসের কথাটি উল্লেখ করতেই হয় । সত্তরের শুরুতে বিনা বিচারে রাজনৈতিক বন্দীর বিপুল সংখ্যার কথা আমরা জানি । সেই বন্দীত্ব ছিল নিষ্ঠুর শারীরিক পীড়ন-লাঞ্ছিত — একথাও মিথ্যা নয় ।

তবু এই ধারাই সত্তরের দশকের কবিতার নবতর ধারার রূপ । একদিকে চল্লিশের কবি প্রবীণ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'মুখে যদি রক্ত ওঠে', 'মুণ্ডহীন ধড়গুলি আহ্লাদে চীৎকার করে' জাতীয় কাব্যপঙ্‌ক্তি-গ্রথিত কবিতা-পুস্তিকা পরপর লিখে যেতে দ্বিধা করেন নি ; অন্য দিকে তরুণ বিপুল চক্রবর্তী তাঁর প্রথম পুস্তিকায় লিখেছেন — "তোমার মারের পালা শেষ হলে আমাকে যেন ডোরাকাটা বাঘের মত দেখায় ।" ("তোমার মারের পালা")

একজন শক্তিমান কবির রচনারীতি পরিবর্তিত হয়েছিল এই নতুন রাজনৈতিক আন্দোলনের স্পর্শে । 'কয়েকটি কণ্ঠস্বর' নামের সংকলনটি নিয়ে ১৯৬২-তে যখন এসেছিলেন মণিভূষণ ভট্টাচার্য তখন ব্যক্তিগত প্রেম-বিরহ-প্রীতি-বেদনার ভাষাতেই রচিত হয়েছিল তাঁর কবিতা । সমালোচকের ভাষায় তা 'প্রথাসিদ্ধ সুখ দুঃখের পদাবলী, নিসর্গ বা নারীর কথা ।'[১১] তবু সেই সমালোচকও লক্ষ করেছেন যে এই পর্বেও মণিভূষণের কবিতায় সমাজ সম্পর্কে ভাবনার চিহ্ন পাওয়া যায় । "শ্রেণী-সচেতনতা" নামের কবিতাটি উল্লেখ্য যেখানে একটি প্রচ্ছন্ন

বিদ্রূপভঙ্গিও অনুভব করি। কিন্তু এ-ও ঠিক যে সব মিলিয়ে আত্মমগ্ন লিরিকই বেশি। অবয়ব প্রথাসিদ্ধ, বিষাদময়তা কিছু ব্যাপ্ত। ১৯৬২-তে প্রকাশিত হলেও কবিতাগুলি পঞ্চাশের দশকের লেখা। দ্বিতীয় সংকলন 'উৎকণ্ঠ শর্বরী' (১৯৭১)-তে আছে মণিভূষণের নিপুণ, সুন্দর, বিচিত্র কবিতামালার নিদর্শন। "স্বাধীনতা", "দেওয়াল লিপি", "সংসদীয় গণতন্ত্র" নামের কবিতায় অনুভব কবি কবির ক্রমপুঞ্জিত অসন্তোষ এবং নিজস্ব রাজনীতি গড়ে ওঠার প্রাথমিক পর্ব। "সংসদীয় গণতন্ত্র" কবিতায় ভোটপত্র ফেলে দিয়ে দিগন্তরেখায় ফুটে ওঠা চক্ষুষ্মান রক্তবর্ণ এক খড়্গ প্রত্যক্ষ করেছেন কবি।

কিন্তু ১৯৭৪-এ প্রকাশিত 'গান্ধীনগরে রাত্রি' সংকলনেই সত্তর দশকের স্বতন্ত্র রাজনীতির কবিকে পাওয়া গেল স্পষ্টভাবে—

"কী হবে আর পাতা উল্টে শঙ্খ ঘোষ বা হার্টক্রেনের ?

. . .

এখন শুধু গদ্য পড়ি, ফ্রন্টিয়ারে
সমর সেনের।"

সমাজের সেই শ্রেণী— চায়ের দোকানের শিশুকর্মী, ধূপকাঠি বিক্রি করা তরুণ, 'অপুষ্টিজনিত মৃত্যু'-তে মৃত ফুটপাথবাসীর দল— জীবন্ত হয়ে উঠল তাঁর কবিতায়। তীব্রবেধী হল নেতা, মন্ত্রী, মধ্যশ্রেণীর প্রতি বিদ্রূপ। আশ্চর্য এক কবিত্বময় ঝংকার তুললেন মণিভূষণ নতুন স্বাদের রচনায়— হয়ে উঠলেন সত্তর দশকের সামাজিক রাজনৈতিক কবিতার অন্যতম প্রতিনিধি—

"উনুন জ্বলেনি আর, বেড়ার ধারেই সেই
ডানপিটের তেজী রক্তধারা,
গোধূলি গগনে মেঘে ঢেকেছিল তারা।"

—"গান্ধীনগরে এক রাত্রি"

প্রায় একই ধরনের ক্রমপরিণতি সাগর চক্রবর্তীর। ষাটের দশকের 'নির্বাসন : দূরের জানালা' (১৯৬৩), 'নির্জনতার সঙ্গে সংলাপ' (১৯৬৬) নামের দুটি লিরিক-সংকলনের পর ক্রমে 'থানার চাতালে শুয়ে' (১৯৭১), 'চারিদিকে ভাঙা শহীদ বেদী' (১৯৭৭) ইত্যাদি সংকলনে তাঁর রাজনৈতিক বিশ্বাস এবং কাব্যভাবনা ; তাঁর সময়-চেতনা ও মানবিকতাবোধ— সবই প্রকাশিত। প্রাকরণিকতার নৈপুণ্যে সাগর চক্রবর্তী বহুজনের চেয়েই সুদক্ষ, সত্তরের রাজনৈতিক চেতনার কবিতাকে যাঁরা সক্ষম লেখনীতে শিল্পোত্তীর্ণ করেছেন মণিভূষণ ও সাগর তাঁদের অন্যতম। যদিও সত্তরের এই ধারার কবিতার বিশেষ লক্ষণ যে অনাবরণ, প্রায় গদ্যময় সরলভাষণ— তা-ও পাওয়া যাবে সাগর চক্রবর্তীর কবিতায়।

এই ধারার কবিতার বিস্তৃততর পরিচয় দান নিষ্প্রয়োজন। অজস্র তরুণ এই সময়ে কবিতা লিখতে শুরু করেছিলেন। তাঁরা অনেকে পরবর্তীকালে কবি হিসাবে ততটা প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারেন নি, কারো কারো প্রাণ স্তব্ধ হয়ে গেছে থানার চাতালেই। যেমন— দ্রোণাচার্য ঘোষ। আবার কেউ কেউ এই সময়ে এই ধারায় রচনা শুরু করে পরবর্তী সময়ে ছড়িয়ে গেছেন বিচিত্রতর বিস্তারে। কেউ কেউ নকশালবাড়ি আন্দোলন ভেঙে যাবার পরও সমাজসচেতন কবি হিসেবে নিজেদের জমি জয় করেছেন বাংলা কবিতার ধারায়। এই আত্মস্থ বিশ্বাসেও পৌঁছতে পেরেছেন কেউ কেউ— সে-সব সময়েই, কবিতায় উত্তোলিত মুষ্টিবদ্ধ হাতের আদল তুলে ধরতেই হবে— তার কোনো মানে নেই। এঁদের মধ্যে কয়েকজন— সব্যসাচী দেব, পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়, নবারুণ ভট্টাচার্য, সমীর রায়, রঞ্জিত গুপ্ত, অজয় নাগ প্রমুখ।[১২]

প্রতি দশকেই নতুন কাব্য-আন্দোলন গড়ে উঠবে— এমন সম্ভব নয় । ষাটের দশকের কবিরা নানা ধরনের সঙ্ঘবদ্ধতায় ও কাব্য-ধারণার ভিত্তিতে গোষ্ঠী গড়তে পেরেছিলেন বলে খানিকটা আন্দোলনের আভাস দেখা গিয়েছিল । কিন্তু সত্তরের দশকে কোনো পৃথক কবিতার আন্দোলন ছিল না । নকশালবাড়ি আন্দোলন ছিল সম্পূর্ণই রাজনৈতিক । তবে বাংলার তরুণ সমাজকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করতে পেরেছিল বলে বাংলা কবিতায় তার যথেষ্ট অভিঘাত সৃষ্টি হয়েছিল ।

মনে রাখতে হবে, এই ধারার কবিতার বাইরেও অসংখ্য কবি ছিলেন । পঞ্চাশের ও ষাটের কবিরা ছিলেন অত্যন্ত সক্রিয়। বহু নতুন কবির কবিতায় নিয়ত-স্পন্দিত ছিল সত্তরের দশকের পশ্চিমবাংলা । অনেকেই কোনো বাঁধাধরা ধারণা বর্জন করে, 'বাম' অথবা 'দক্ষিণ' রাজনীতির প্রত্যক্ষ সংযোগ ছাড়া, কোনো দল বা নির্দিষ্ট পত্রিকা বা বাণিজ্যিক পত্রিকার আনুকূল্য ছাড়া নিজের মতো করে কবিতা লিখতে এগিয়ে এসেছিলেন । কোনো কোনো কবি ষাটের দশক থেকে লিখলেও সত্তরের দশকে ষাটের মানসিক ও প্রাকরণিক চারিত্র্যটি সঙ্গে অর্জন করেন ঠিকঠাক। যেমন বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত বা রণজিৎ দাশ । তাঁদের কবিতায় পরিণতি দেখা দিয়েছিল এই দশকে ।

বয়সের দিক থেকে ষাটের দশকেই কবিতা লেখার সম্ভাবনা ছিল এবং সম্ভবত লিখেওছিলেন আনন্দ ঘোষ হাজরা । কিন্তু সত্তরের দশকের মধ্যভাগ থেকে তাঁর সংকলন প্রকাশিত হতে শুরু করে । 'দ্রুত ধাবমান স্বয়ম্বরে' (১৯৭৪), 'শীত চলে যাচ্ছে' (১৯৭৮) এবং তার পর আরো কয়েকটি সংকলনে তাঁর স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি, সুশিল্পিত রচনারীতি এবং পরিণত কাব্যভাবনার নিদর্শন দেখি । বিজ্ঞানের সন্ধান ও আবিষ্কারসমূহ একালের মানুষের কল্পনা ও সমাজবোধকে বিপুল বিস্তার দিয়েছে । আনন্দ ঘোষ হাজরা নিজের কবিতায় এই বিশিষ্ট কল্পনাটির চমৎকার রূপায়ণ ঘটিয়েছেন ।

সত্তরের দশকে স্বতন্ত্রভাবে কবিতা লিখে অনেক তরুণ কবি মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলেন এবং পরবর্তী দশকে ও সাম্প্রতিককালে তাঁদের কেউ কেউ অত্যন্ত শক্তিমান ও গুরুত্বপূর্ণ একালের কবি রূপে বিবেচিত । তাঁদের অল্প কয়েকজনের কথা বলার আগে সামগ্রিকভাবে ষাটের কবিতা এবং সত্তরের কবিতার মধ্যে দু-একটি সাধারণ পৃথকত্ব নির্দেশ করা যেতে পারে । মনে রাখতে হবে যে এই প্রভেদগুলিকে কোনো রেখা টেনে দেখানো চলবে না এবং এগুলি সর্বাত্মকও নয়— বহু ব্যতিক্রম-চিহ্নিত ।

সত্তরের দশকের কবিতা যে ব্যাপকভাবে সামাজিক-রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টি করেছিল তার প্রত্যক্ষতা কেবল নকশালবাড়ি রাজনীতিতে বিশ্বাসী কবিদেরই নয়— স্পর্শ করেছিল প্রায় সকলকেই । সেজন্য দেখা যায় — ব্যক্তিগত মনোবৃত্তটিকে প্রাধান্য দিয়ে যাঁরা কবিতা লিখতে চেয়েছেন তাঁদেরও লেখায় ব্যক্তিগত মনোবৃত্তটিই গড়ে উঠছে অনেকখানি সমাজচেতনা অঙ্গীকার করে নিয়ে । তার মানে এই নয় যে, রোম্যান্টিক লিরিক বা সৌন্দর্যমুগ্ধতার কবিতা তাঁর লেখেন নি । তবে তাঁদের ধরনটা পঞ্চাশের কবিদের মতো একান্ত ব্যক্তিগত নয়।

ষাটের কবিরাও এই সমাজচেতনার দায়ভার যথেষ্ট বহন করেছিলেন তবে তাঁদের প্রকাশভঙ্গির মধ্যে প্রত্যক্ষ বাস্তবতার দাবি ছিল কম । সত্তরের দশকে দেখা যায় পঞ্চাশের প্রতিষ্ঠিত কবিরাও, যাঁরা বাণিজ্যিক পত্রিকার সঙ্গেও যুক্ত— তাঁদেরও কলমে প্রশাসন ও পুলিশী শাসন-বিরোধী কবিতা এসেছে কিছু কিছু ।

ষাটের কবিতার সমস্ত গড়নটাই ছিল নাগরিক পরিমার্জনা-সমুজ্জ্বল । প্রকৃতির কবিতা লেখা হয়েছে কিন্তু গ্রামীণতা ছায়া ফেলেছে কম । ভাবনাপ্রধান, কিন্তু তত্ত্বময় গভীরতায় চলে যাবার প্রবণতা ছিল ষাটের কবিতায়। সত্তরের কবিতায় গ্রামীণ মানুষ, গ্রামীণ বাস্তবতা— এমন-কি, গ্রামীণ শব্দাবলীরও আকাঁড়া অনুপ্রবেশ বেশি । সব জড়িয়ে কাব্যভাষার প্রত্যক্ষ-সরল ভঙ্গিটি বেড়েছিল এই সময়ে । তবে কোনো কোনো কবির মধ্যে ব্যক্তিগত বৃত্তের আত্মমগ্নতাও দেখি ।

সত্তরের দশকেই পরিচিত এবং পরে (আশির দশকে) কিছু সময়ের জন্য যথেষ্ট আলোড়ন তোলা কবি জয়

গোস্বামীর কথা বলা যায় । নিজস্ব সংবেদনের তীব্রতা, স্বকীয় মনন ও কল্পনার জগৎ, স্বতন্ত্র কাব্যভাষা নিয়েই এসেছিলেন জয় গোস্বামী । ১৯৭৭, ১৯৭৮ এবং ১৯৮১-তে প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর প্রথম তিনটি কবিতা-সংকলন— 'ক্রীসমাস ও শীতের সনেটগুচ্ছ', 'প্রত্নজীব' ও 'আলেয়া হ্রদ' । 'প্রত্নজীব'-এ তাঁর স্বাতন্ত্র্যের সন্ধান প্রথম আমরা পেলাম । তাঁর কাব্যজগতের নায়ক এক পীড়িত যুবক । বিরুদ্ধ এক প্রতিবেশের মধ্যে সে যেন আজন্ম নিক্ষিপ্ত । রোগ আর ব্যাধি তার শরীরের প্রতিটি কোষে । সে প্রেমে প্রত্যাখ্যাত, যৌনতায় একই সঙ্গে আকৃষ্ট ও বিক্ষত ; সে এক ব্যাকুল, দহিত, খণ্ডিত মানুষ । ছিন্নমূল প্রজন্মের মানুষ সে, আবার যেন সৃষ্টির আদিযুগ থেকেই অপূর্ণ, অতৃপ্ত, প্রতিবেশ-তাপিত এক মানবাত্মা । যন্ত্রণার মধ্যেও সৃষ্টির আদি রহস্য যেন তাকে রহস্যময় ইঙ্গিত দিয়ে যায় । মানব-অভিজ্ঞতার অদ্ভুত সব চিত্র উম্মোচন করে জয় গোস্বামীর কবিতা—

"নিশ্চল কিন্তু এইমাত্র জ্যান্ত হয়ে উঠল এমন কফিন / তীক্ষ্ণ আর
ফিসফিসে অথচ শেষ হয়নি, এমন চিৎকার / শুধু একটি প্রবাহ
সম্বল করে উঠে দাঁড়িয়েছে, এমন বাতাস / একটা পাতা পড়ছে না
গাছের, তার তলায়— / পড়ে রয়েছে লম্বা শেকল, ... "

—"মোমবাতি", 'প্রত্নজীব'

অন্ধকার, অপার্থিব আলো (আলেয়া হ্রদ), বহুবিধ শরীরী ও যৌন প্রতীকের এক শ্বাসরুদ্ধতা অনুভূত হয় তাঁর কবিতায় ।

ক্রমে তাঁর কবিতায় এসেছে পূর্ণতর প্রতীক— যেমন মা, আগুন, পৃথিবীর গতি । ক্রমে কণ্টক-যন্ত্রণাময়, লাভাতপ্ত, বিষবায়ু-প্রবাহিত খনি-গহ্বর থেকে অনেকটা স্বাভাবিক আলো হাওয়ায় এসেছে তাঁর কবিতার মানুষ । কিন্তু সেই স্বাভাবিকতা 'মধুময় পৃথিবী'র অনুভব নয় একেবারেই । মর্মান্তিকভাবে ঘাতক অভিজ্ঞতাসমূহ পার হয়ে এসে যেন এক রক্তময় ঊষর মাটি এতটুকু আশা । ১৯৮৬-তে প্রকাশিত 'উম্মাদের পাঠক্রম' জয় গোস্বামীর এই পর্বের শ্রেষ্ঠ সংকলন বলা যায় । "সৎকার গাথা" কবিতায় জননী-শব বহন করে দীর্ঘ মৃত্যু-আকীর্ণ পথ পরিক্রমা করা দুই ভাইবোনের যাত্রা । কিন্তু বড়ো কষ্টের সঙ্গে হলেও জয় গোস্বামী এসে পৌঁছতে পারেন এক ভিন্নতর উপলব্ধিতে—

"বোন তোকে বলি, এ-অস্থি পোড়াবো না
গাছের কোটরে রেখে যাবো এই হাড়
আমরা শিখিনি । পরে যারা আছে, তারা
তারা শিখবে না এর ঠিক ব্যবহার ?"

আঙ্গিকের উপর অসামান্য অধিকার, বাগ্‌ভঙ্গির অমিত নৈপুণ্য, অনুভবের তীব্র গভীরতা এবং বিচিত্র প্রকাশ ভঙ্গি নিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছেন অমিতাভ গুপ্ত । তাঁর কবিতায় তির্যক বিদ্রূপ আর সরল সংবেদনা— দুইই সমকুশলতায় বাজে । সমাজ-মানুষ-পারিপার্শ্বিক বিষয়ে তাঁর জাগ্রত উপলব্ধি তাঁর কবিতায় মূর্ত হয় । মেধা, অতীত অভিজ্ঞতা ও মননের সযত্ন মার্জনায় তিনি কবিতায় যে সমুজ্জ্বলতা নিয়ে আসতে পারেন তা উপেক্ষণীয় নয় ।

অমিতাভ গুপ্তের প্রথম পুস্তিকা 'আলো' (১৯৭০) এবং দ্বিতীয় কবিতা-সংকলন 'এসো আমার ঘরে' (১৯৭৭) । সত্তরের দশকে তাঁর কবিতার রূপকর্মে তির্যকতাই বেশি । যেখানে বেদনা, হৃদয়ের প্রত্যাখ্যান — তারও ভাষা কিছুটা বা গতানুগতিক । যেমন "ভাঙা রাস্তা" কবিতায় (দ্বিতীয় সংকলন) কুলুপ আঁটা ঘরে জ্বলন্ত শিকল আর সাপের ছবির ভয়ংকরতা,— "শার্দুল" (ঐ) কবিতায় পাথরে বিক্ষিপ্ত বাঘনখের ছাপ । পরবর্তী সময়ে অমিতাভ গুপ্তের কবিতায় সমাজবোধের প্রকাশ এবং সব ধরনের কবিতায় তাঁর মননী কল্পনার বিস্তার

আশ্চর্য ভাবসংহতি ও রূপমূর্ততা পেয়েছে। একটি উদাহরণ—

"আশ্বিন, ধ্বংসবীজের মতো নীলরঙ আকাশের নীচে
চালচিত্র : মুখের গর্জনতেল, মনে পড়ে দিদিকে মানাতো।
আমরা কয়েকজন আনমনে দেখে নিই সবুজ অসুর
সাবর্ণ চৌধুরীর বাড়ি— কলকাতার সবচেয়ে পুরোনো প্রতিমা
সবুজ রঙের অর্থ ঘৃণা :

...

কেউ কি পেয়েছে টের, সবুজ থাবার নীচে রোগাবোকা দিদি
বিবাহের উনিশ বছর ধরে ক্ষয়ে ঝরে,
তারপর শ্মশানে শুয়েছে।

...

বাংলার কনকদুর্গা, এদেশেই থেকো।

—শ্রীদুর্গা, মাতা ও মৃত্তিকা, প্রকাশ ১৯৮৪

ঐতিহ্যের সঙ্গে সংযোগ রেখে, মননশীলতার পূর্ণ আবহ-মণ্ডল রচনা করে হৃদয়াবেগের অব্যর্থ সংবাহন অমিতাভ গুপ্তের কবিতায় দিনে দিনে বেড়েছে। তাঁর কবিতায় ভারতের সুপ্রাচীন সাহিত্য ও ইতিহাসের উপাদানের সঙ্গে অন্-আর্য মৃত্তিকাময় মানুষের জীবনযাপনের কৃষ্ণ-কঠিন আবহমানতার ঐতিহ্য মিশেছে। সাবলীল প্রতিভায় এই দুরূহ মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন তিনি। সত্তর-আশির দশকের অন্যতম প্রধান কবি অমিতাভ গুপ্ত।

মধ্যবিত্ত বাঙালি তরুণদের মধ্যে কবিতা-চর্চার প্রতি প্রীতি, আন্তরিকতা— কিছুটা ফ্যাশনও বেড়ে উঠেছে ক্রমেই। ফলত, সত্তর ও আশির দশকে অজস্র কবি কবিতা লিখছেন। তাঁদের মধ্যে বেছে বেছে নাম করাও দুঃসাধ্য কারণ যে অমোঘ কালের বিচার আমাদের সাহায্য করে কবিদের মধ্যে নির্বাচন করে নিতে— সেই কালের নিক্তি সাম্প্রতিকের মূল্যায়ন করবার সুযোগ পায় না। আমরা প্রায় যথেচ্ছভাবে কয়েকজনের নাম করতে পারি যাঁরা মোটামুটিভাবে নিরলস চর্চার মধ্যে আছেন এবং কবিতা-পাঠকের স্মৃতিতে কিছুটা ছাপ ফেলেছেন। সত্তরের কবিদের মধ্যে ব্রত চক্রবর্তী আর মৃদুল দাশগুপ্ত ; অজিত বাইরী, একরাম আলি, কমল চক্রবর্তী ; ধূর্জটি চন্দ আর নির্মল হালদার ; পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল আর প্রমোদ বসু ; বীতশোক ভট্টাচার্য, রতনতনু ঘাটি, শ্যামল কান্তি দাশ আর সুব্রত রুদ্র-র কবিতা কারো পক্ষেই অবহেলা করা সম্ভব নয়। এই তালিকায় যুক্ত হতে পারে আরো অসংখ্য নাম। প্রবন্ধ-পাঠককে অনুরোধ করব প্রাসঙ্গিক সংকলনগুলি দেখে নিতে।[১৩] বহু কবির সম্মিলিত কাব্যসম্ভার সত্যিই বহু বর্ণময় এবং বহুস্তরিত। কিন্তু হয়তো, একথা বলা উচিত যে আলাদাভাবে দেখলে তাঁদের অনেকেরই কাব্যভুবনের বিস্তার কিছু কম মনে হয়, মনে হয় কিছু বৈচিত্র্যহীন। ত্রিশের কবিদের মতো কবিতায় নিত্য-বিকীর্ণ বহুলতায় এঁরা অনেকেই যেতে পারেন না, চল্লিশের কবিদের মতো দীপ্ত বিশ্বাসের ভূমি, পঞ্চাশের কবিদের মতো অকুণ্ঠ আত্মমগ্নতার পূর্ণতাবোধ এঁদের কখনো কখনো অনায়ত্ত থেকে যায়। সম্ভবত একদিকে তাঁরা বিশ্বাসের অটলতাও হারিয়েছেন অন্যদিকে স্ব-অস্তিত্বে আস্থাও, সামাজিকভাবেই, কিছু বিচলিত। কবিতার পৃথিবীর এই চেহারা যেন এই যুগেরই মন্থনজাত ভঙ্গুরতার রূপাবয়ব।

কবিতার জগতে, অন্তত পশ্চিমবাংলায় সত্তরের দশকে, মহিলা কবিদের রচনার পৃথক আলোচনা সহসা অবান্তর মনে হতে পারে। কিন্তু যদি পাঠক মনে রাখেন ষাটের দশকের বহুসংখ্যক পুরুষ কবির পাশে মহিলা কবিদের সংখ্যার দৈন্য তা হলে মনে হবে এদিক দিয়েও ভাববার প্রয়োজন আছে। অন্তত, মেসে থেকে, টিউশনি

করে রাত পর্যন্ত প্রেসে বসে পত্রিকা ছাপিয়ে, স্টলে স্টলে দিয়ে আসা যে-কবির ছবিটি আমরা মনে মনে দেখি — তিনি একজন যুবক-যুবতী নন— আজও নন । কোথায় বাধা সে আলোচনা থাক্‌ । আমরা কিন্তু দেখি, এই সত্তরের দশকেই মহিলা কবির সংখ্যা হঠাৎ করে যেন বেড়ে গেল একসঙ্গে । সত্তরের দশজন কবির নাম করতে গেলে তার মধ্যে অন্তত দুজন মহিলা বোধ হয় এসেই যাবেন নিজেরই দাবিতে । কয়েকজনের নাম করা যাক আগে । কৃষ্ণা বসু, অনুরাধা মহাপাত্র ; ব্রততী বিশ্বাস (সিংহরায়), স্নেহলতা চট্টোপাধ্যায়, সুভদ্রা ভট্টাচার্য, কাঞ্চনকুন্তলা মুখোপাধ্যায়, শুচিস্মিতা দাশগুপ্ত, তপোবৃতা লাহিড়ী, সুতপা সেনগুপ্ত, নমিতা চৌধুরী । সত্তরের দশকের শেষ এবং আশির দশকে এই ধারাতেই এসেছেন মল্লিকা সেনগুপ্ত, চৈতালী চট্টোপাধ্যায়ের মতো বিশিষ্ট কবি । এসেছেন ঈশিতা ভাদুড়ী, সুমিত্রা মজুমদার, সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়, রূপা দাশগুপ্ত ।

সমাজে নারী হিসেবে মেয়েদের একটি স্বতন্ত্র সংবেদন আছে, আবার মানুষ হিসেবে সমগ্র ইতিহাস ও সমাজ-প্রবাহের ধারায় তার একটা স্থান আছে । এই দুইয়ের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে যে কোনো বিরোধই নেই তা সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধ হল সত্তরের দশকেই । আশির দশকেও এই চেতনা অব্যাহত । ষাটের দশকেই অবশ্য এর শুরু— কিন্তু অল্প কয়েকজনেই ধারাটিকে কলমের মুখে ঠিকঠাক তুলতে পেরেছিলেন ।

রচনারীতির দিক থেকে সাবলীলতা, মানবিকতা, সমাজবোধ বা বিশ্ববোধ, অন্তর্মগ্নতা ও আত্মিক সংকট — কোনো কিছু ফুটিয়ে তোলার প্রশ্নেই মহিলা ও পুরুষ কবির মধ্যে আর কোনো পার্থক্য নেই এই সময় থেকেই । তবে কবিতায় পুরুষ-চিত্তের ভাবনা-মুদ্রাটিতেই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম আমরা । নারীর নিজস্ব ভাবনার দৃষ্টিকোণ — এই কবিরা প্রতিষ্ঠা করেছেন জোরের সঙ্গে । আমাদের কাছে সহসা তা বেশ নতুন মনে হয় । বস্তুত, ফেমিনিজ্‌ম্‌ এ সময়ের পুরুষ-কবিদের রচনাতেও কিছু ছাপ ফেলেছে । এটি একটি বিশেষ যুগলক্ষণ । স্বতন্ত্রভাবে আলোচনার পক্ষে স্থানাভাব । আমরা কয়েকটি উদাহরণ তুলে দিচ্ছি যাতে কিছুটা বোঝা যাবে এঁদের রচনা-বৈচিত্র্য ।

১. এমন মিহিন জ্যোৎস্না, এর মাঝে অপমান
মনে পড়ে কেন ?
কেন মনে হয় এই ক্ষীর জ্যোৎস্নার মধ্যে
কোথাও লুকিয়ে আছে ছুরি, তীব্র ছুরিখানি ?

—ভিতর ক্ষত, কৃষ্ণা বসু

২. পাপড়ি খুলছে— রক্তমাখা পাপড়ি খুলছে জ্যোৎস্নায়—
কাঁকালের নীলাভ নদী নিয়ে উথলে উঠলেন
অংকুরের মা ভোগবতীর পাড় দুলিয়ে
কেবল জলপ্রকৃতি হাঁটু মুড়ে বসে রইল
জনহীন অংকুরের শিয়রে ।

—অংকুরের মা, অনুরাধা মহাপাত্র

৩. বদরিকা ফলগুলি ঝরে থাকে ওদের চাতালে
বাউরী রাজার কানে সাবেক নিয়মে কলকে ফুল
আজও দোলে ; তাও অকুলন,
ছিপ্‌ টানে সোনা ব্যাঙ, মাছগুলি
নিয়ে গেছে চিল

তাই কালে কালে
আমরাও নিয়ে যাই ওদের তণ্ডুল

—বীরভূম বিবরণ, কাঞ্চনকুন্তলা মুখোপাধ্যায়

৪. একটি ফুলের গন্ধ জানিয়েছে
ভৌতিক সংকেত
আলৌকিক নিসর্গ গুপ্তঘাতক
আমার আজন্ম সহচর সে
পালাতে পালাতে কতদূর যাবো ?

—গুপ্তঘাতক নিসর্গ, ব্রততী বিশ্বাস

এখানেই উদাহরণ হিসেবে তুলে দিচ্ছি আশির দশকের কবি বলে পরিচিত কয়েকজন মহিলার রচনাংশ—

৫. আম্রপালী শরণ নেয় অমিতাভর পায়ে
আছড়ে পড়ে শান্তি চায়, পেছনে ছুটে আসে
হাউস অব কমন্সের গুপ্তচরদল
...
প্রত্যুষের আগেই তাকে বিম্বিসার অস্বীকার করে
...
আম্রপালী পালিয়ে যায় পেছনে তার সমাজ তাড়া করে .
আম্রপালী বাঁচতে চায় সমাজ চায় প্রমাণ লোপ হোক

—আম্রপালী, মল্লিকা সেনগুপ্ত

৬. কথা বৃষ্টির মত ঝেঁপে আছে
কথা মেঘেদের ভারে নত হয়
কথা কুকুরের মত বারুদের
ঘ্রাণ শুঁকে নিতে নিতে গর্জায়
...
আজ কথা বলি আর চাবুকের
দাগ ধুয়ে মুছে পথ আলো হয়

—আরো একবার তোমাকে, চৈতালী চট্টোপাধ্যায়

৭. যুদ্ধের পর ক্লান্ত সৈনিক
কি ভাবো তুমি ?
সন্তানের ছবি ? অথবা, যুদ্ধের দৃশ্য
পুনরায় ?

—যুদ্ধশেষে, ঈশিতা ভাদুড়ী

সত্তরের দশকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে আশির দশকের কবিতার মধ্যে খুব সুস্পষ্ট কোনো বিভাজন-রেখা নেই। পশ্চিমবাংলার রাজনীতিতে একটিমাত্র পটবদল এই সময়-পর্বে, ১৯৭৭-এ যুক্তফ্রন্ট সরকারের শাসনভার গ্রহণ। নির্বাচনের ভিতর দিয়েই এই ক্ষমতার হস্তান্তর ঘটেছে— ভারতীয় গণতন্ত্রের ত্রিশ বৎসর উত্তীর্ণ প্রশাসনের গতি-প্রকৃতির ধারায় ।

আশির দশকের তরুণ কবি আজ নিজের পারিপার্শ্বে বড়ো মাপের কোনো আদর্শ দেখতে পান না । প্রশাসনের সর্ব স্তরেই ব্যর্থতার ছাপ । রাজনীতি যে-আদর্শের কথা বলে সে-আদর্শ অনুযায়ী চলে না । দেশের প্রকৃত অধিকার শিল্পপতিদের হাতে । প্রতিদিন কমে যাচ্ছে একজন বেকারের কর্মসংস্থান সম্ভাবনা, প্রতিদিনই বেড়ে যাচ্ছে জিনিসের দাম । যেখানেই টাকার গন্ধ, সেখানেই অসাধুতা ; আর, সেই অসাধুতা রোধ করতে প্রশাসন এগিয়ে না এসে সেই চাকাতেই নিজেকে জুড়ে দেয় । এ-সবই এখন এত স্বাভাবিক যে এ নিয়ে ক্ষোভপ্রকাশও আমাদের কাছে বাহুল্য হয়ে গেছে ।

কিন্তু তার মানে এই নয় যে, দেশের মানুষ সকলেই বিপথগামী হয়ে যাচ্ছে অথবা নিরাশায় ডুবে গিয়ে অগ্রসর হচ্ছে আত্মহননের দিকে ।

কবিরা সাধারণত আসেন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে । শ্রেণীবিভক্ত সমাজে এই শ্রেণীটি শিক্ষাপ্রাপ্ত । ফলে তাঁরা তাঁদের মেধা, বুদ্ধি, শিক্ষা ব্যবহারের কোনো-না-কোনো ক্ষেত্র পেয়ে যান অনেকেই । এরকম করে টিকে যেতে পারেন এই বাঁচার লড়াইয়ে । সীমাবদ্ধ সুযোগগুলির কিছুটা করায়ত্ত হচ্ছে তাঁদের । সমাজের শ্রেণীবিভাজনটাই এমন যে বুদ্ধিজীবীরা একই সঙ্গে প্রশাসনের এবং পুঁজিবাদের আনুকূল্য খানিকটা পেয়ে যান । এইভাবে ব্যক্তিগত স্তরে একটা বাঁচবার জায়গা তৈরি হচ্ছে কবিদের । রাজনীতি বা প্রশাসনিক শক্তিগুলির বিন্যাসে বিশেষ কোনো আস্থা না রাখলেও ব্যক্তিগত স্তরে মানুষের শুভবোধে একেবারে অনাস্থাও রাখছেন না তাঁরা । সব মিলিয়ে আজকের তরুণ প্রজন্মের মানসিকতাকে বলা যেতে পারে সমাজ-সচেতন ব্যক্তিমনস্কতা ।

এই বৃত্তের মধ্য থেকে তাঁরা অনেকেই কবিতা লিখছেন । ফলে কবিতায় আত্মমগ্ন ব্যক্তিহৃদয়ের উপলব্ধির সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে ; কবিতার ছন্দ ও অলংকরণের দিকে অনেকটা সজাগ থাকছেন কবিরা । কারণ তাঁরা জানেন তাঁদের প্রতিষ্ঠা পেতে হবে মুক্ত প্রতিযোগিতার মধ্যে দিয়ে । রাজনীতি বা দর্শন— যে-কোনো ধরনের তত্ত্বভাবনা থেকে সরে এসে মানবিক মূল্যবোধের একটা জায়গা খুঁজে পাবার চেষ্টা অনুভব করা যায় সাম্প্রতিক কবিতায় । এই জায়গা থেকেই সমাজচেতনার অভিব্যক্তি দানা বাঁধে । সাম্প্রদায়িকতা, জাতিভেদ, নারী-নির্যাতন — ইত্যাদি বিষয়গুলি খানিকটা রাজনৈতিক দলীয়তা থেকে বিযুক্ত সমাজ-ভাবনা । এক কথায় হয়তো বলতে পারি— এখনকার কবিতায় সমাজ ভাবনা প্রশস্ত কিন্তু রাজনীতি-সংস্পর্শ কবিরা প্রায়ই ঘৃণায় ও অবজ্ঞায় বর্জন করেছেন । ভারতের রাজনীতি এতটাই নিরর্থক হয়ে গেছে আজকের তরুণদের কাছে ।

কবিতার ভাষা মোটামুটিভাবে সব বন্ধন কাটিয়ে উঠেছে তত্ত্বগতভাবে । কিন্তু আজও মোটের ওপর মার্জিত তৎসম ও তদ্ভব শব্দাবলীই কাব্যভাষার মুখ্য উপাদান । চিত্রকল্প-চেতনা সুন্দর, সূক্ষ্ম ও সবল হয়ে উঠেছে, দেশজ ঐতিহ্যের প্রতি সত্তর ও আশির দশকের কবিরা যথেষ্ট সচেতন [illegible] ; ছন্দের ও প্রকরণের পরীক্ষাতেও অক্লান্ত তাঁরা । ক্ষুদ্র কবিতা ও দীর্ঘ কবিতা, ছন্দে কবিতা ও গদ্যে কবিতা— সবই রচিত হচ্ছে— সর্বত্রই প্রায় বজায় থাকছে ন্যূনতম মান ।

সাম্প্রতিক কালে 'উত্তর-আধুনিক কবিতা আন্দোলন' অভিধায় একটি তত্ত্বকে দাঁড় করাবার চেষ্টা করেছেন কয়েকজন কবি । তাঁদের মধ্যে আছেন অমিতাভ গুপ্ত, অঞ্জন সেন, বীরেন্দ্র চক্রবর্তী । আধুনিকতা অর্থে আত্মমগ্নতার একান্ত অভিমুখীনতা, মনোরাজ্যের বাধাহীন বিস্তার— যেখানে যৌনতাবোধের অনুপ্রবেশ অবাধ— মূলত পঞ্চাশের দশকের এই প্রবণতাগুলিকেই তাঁরা আক্রমণ করেছেন । দেশজ অভিজ্ঞতা ও ঐতিহ্যের সর্বাত্মক

গ্রহণ— সেইসঙ্গে বিশ্ব-সংস্কৃতির উত্তরাধিকার ; সংহত উপলব্ধির সঙ্গে মেধা ও মননসঞ্জাত দীপ্তির মেলবন্ধন ঘটিয়ে কবিতা গড়ে তোলাই তাঁদের লক্ষ্য । বস্তুত তাঁদের তত্ত্বের সঙ্গে কোনো যুগেরই ভালো কবিতার কোনো বিরোধ নেই । সে কারণেই বিষয়টি নিয়ে কিছু বিতর্ক উঠলেও তা এখন স্তিমিত হয়ে এসেছে ।

জয়দেব বসু, রাহুল পুরকায়স্থ, সোফিওর রহমান, নীলাঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রত্নাংশু বর্গী, শ্যামল ভট্টাচার্য, নাসের হোসেন, জহর সেন মজুমদার এবং আরো অসংখ্য কবি এই মুহূর্তে আশির কবিতার চর্চায় ব্যাপৃত । তাঁদের মধ্যে যথার্থ প্রতিনিধিত্বের সম্মান কে বা কারা পাবেন তার বিচার মহাকালের হাতে অন্তত ত্রিশ বছর পরে । একটি কথা মনে হয়, ত্রিশ, চল্লিশ ও পঞ্চাশের কবিরা এখনো সচেতনভাবে রবীন্দ্র-ঐতিহ্য থেকে সরে আসতে চেয়েছেন বিশেষত কবিতার রূপকর্মে । কিন্তু সম্ভব হয় নি তা । ক্রমেই রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং হয়ে উঠেছেন এক ঐতিহ্যময় প্রতীক । কখনো তাঁকে গ্রহণ করা হয়েছে, কখনো হয় নি । কিন্তু সচেতনভাবে তাঁকে অস্বীকার করবার চেষ্টা এই সমগ্র ত্রিশ বছর ব্যাপী পর্বটিতে প্রায় দেখাই যায় না । এখানে এই প্রজন্মের কবিদের কিছু রচনার উদাহরণ তুলে দিয়ে আপাতত শেষ কথা অসম্পূর্ণ রেখেই শেষ করছি রবীন্দ্র-উত্তর কালের পঞ্চাশ বছর পরে সাম্প্রতিক কালের কবিতার আলোচনা । একান্তই যথেচ্ছ এই একমুঠো নির্বাচন । ভালোমন্দের কোনো বিচার নয়— বৈচিত্র্যের মধ্যে প্রবণতার সন্ধানটিই লক্ষ্য—

১. তবে কার জন্য আমি নিজের আদ্যন্ত আয়ু
জ্বালিয়ে দিয়েছি ? হ্যাঁ, আমি মাইকেল ডাট, প্রশ্ন
করছি, তবে কার জন্য আমি মায়ের চোখের জল
শুকতে দিই নি ? কার জন্য, আঁরিয়েৎ, তোমাকে
বেবাক দিন উপবাসী থাকতে হয়েছে ? দক্ষিণা-র
মুখ আমি দেখতে পাই আজকাল, বুঝতে পারি
কোন কোন বীজাণুগণিতে মানুষের পায়ে ফোটে
মানুষেরই ফেলে যাওয়া কাঁটা । বুঝি ক্লান্তি,
বিবমিষা, কার্মাটারে ঈশ্বরের চতুর্থ আশ্রম ।
পাথরের এই দেশে স্মৃতি তবু মাটি ফুঁড়ে ঢোকে ।

—ভবিষ্যৎ, জয়দেব বসু

২. ভাসতে ভাসতে নক্ষত্রবিন্দুর মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছি
তোমরা কেউ ছুঁতে পারছো না ।
বাতাসে এখন সঙ্কটময় বিস্ফোরণ ।
এবং একজন ভেঙে যাচ্ছে ... সম্ভাবনার একক শ্রীধর ।

—রমণ শহরে, শ্রীধর মুখোপাধ্যায়

৩. পায়ের নীচে কই বাসুকী ? মানুষ তো নয় অল্পে সুখী
জীবনব্যাপী কংস কারাগারে
পুনর্জন্মে বিশ্বাসী না বাণিজ্যে তার মর্ত্যসীমা
কানামাছি খেলছে অন্ধকারে ।

—তোমার নামে, নীলাঞ্জন মুখোপাধ্যায়

৪. একটা কবিতার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে এসেছি
আমার রথের মাথায় নিশান কেন ?
নিশান সরাও। আমি কোন দলের নই
আমার পরিচয় আমি নিজে।

—পরিচিতি, কাজল চক্রবর্তী

৫. শুধু একটি হলুদ পাখি বসন্তের
যে কোন সন্ত্রাস থেকে দূরে থাকার চুক্তিতে
বুঝে নেয় প্রকৃত সন্ত্রাস।

—যে কোন সন্ত্রাস, সঞ্চয়িতা কুণ্ডু

৬. চেরা হাত পেতে দ্বারে দ্বারে ঘুরে
আমি আকণ্ঠ কাঙাল
ছাই ঘেঁটে ঘেঁটে হাত জুড়ে ঠিক
হাজির হয়েছি সভায়
কাব্যকারেরা করতালি দাও
শব্দেরা বেজে উঠছে।

—কবি, রাহুল পুরকায়স্থ

৭. চুলের কাঁটাটি আটকিয়ে ছিল ঝোপে
সেই অনুরাগে কুর্চি হয়েছে লাল
জলপাইরঙা থামভাঙা ভোরবেলা
বহুদিন পরে ভাত খেয়েছিল কাল।

—রোমন্থন, রূপা দাশগুপ্ত

উল্লেখসূত্র

১. 'কেন লিখি' ১৯৪৪, পৃ. ১
২. পুষ্কর দাশগুপ্ত, শ্রুতি পত্রিকা, এপ্রিল ১৯৬৫
৩. শ্রুতি, জুলাই, ১৯৪৬
৪. 'সাহিত্যের বিচারক', সাহিত্য প্রথম প্রকাশ ১৩১৪ বঙ্গাব্দ
৫. ৩১ অক্টোবর, ১৯৬৪
হাংরি শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন, উত্তম দাশ, মহাদিগন্ত প্রকাশন সংস্থা, বারুইপুর চব্বিশ পরগণা ৭৪৩ ৩০২, প্রথম সংস্করণ ১৯৮৩, পৃ. ৪৪। 'হাংরি জেনারেশন' সম্পর্কে বিস্তৃততর তথ্যের জন্য বইটি দ্রষ্টব্য।
৬. শ্রুতি, জুলাই, ১৯৬৬ শেষ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত।
৭. 'কবিপত্রের তিরিশটা বছর 'পবিত্র মুখোপাধ্যায়, কোরক ৫১, জুলাই, ১৯৮৮
৮. ষাট দশকের সৃজনশীলতা ও আন্দোলনের দশক' কবিপত্র, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৮৭

৯. কবিতাসংবাদ, ৪র্থ সংকলন, ১১ মে ১৯৬৮

১০. ষাটের কবিদের বিষয়ে বিস্তৃততর তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য কমল তরফদার, 'ষাটের কবিদের পরিচয়', দে বুক স্টোর, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট ৭০০ ০৭৩, প্রথম সংস্করণ ১৯৮৩ ; সলিডারিটি, 'ষাট দশকের কবি', নির্বেদ, মানিক চক্রবর্তী-সম্পাদিত, ৪৫ এভিনিউ সাউথ ৭০০ ০৭৫, প্রথম সংস্করণ ১৯৮৩ । ষাটের সোনালি রেখা, প্রত্যূষ প্রসূন ঘোষ সম্পাদিত, সংরাগ, ৩৯ চারুচন্দ্র এভিনিউ ৭০০ ০৩৩, প্রথম সংস্করণ ১৯৯১

১১. অশ্রুকুমার সিকদার, 'শব্দের তলোয়ার ঘৃণার দলিল' এবং এই সময় পত্রিকা, এপ্রিল-জুন ১৯৮৮

১২. এই ধারার কবিদের নাম ও রচনার আরও উদাহরণের জন্য দ্রষ্টব্য কবিতাসংকলন 'রক্তে ভাসে স্বদেশ সময়', সম্পাদনা পুলক চন্দ্র, কথাশিল্প, ১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ৭০০ ০৭৩ প্রথম সংস্করণ ১৯৭৭

১৩. আধুনিক প্রজন্মের কবিতা 'উত্তম দাশ ও মৃত্যুঞ্জয় সেন সম্পাদিত, মহাদিগন্ত, বারুইপুর চব্বিশ পরগণা ৭৪৩৩০২ ; 'কবিতা ষাট সত্তর উত্তম দাশ, মৃত্যুঞ্জয় সেন, পরেশ মণ্ডল -সম্পাদিত, মহাদিগন্ত, বারুইপুর ; সত্তরের কবিতা, গৌরশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় -সম্পাদিত, মৈত্রেয়ী প্রকাশনী, ২০ চন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০ ০২৫ ।

উপন্যাস
১
রবীন্দ্র-চেতনার আলোয়

গোপিকানাথ রায়চৌধুরী

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর প্রেক্ষাপটে উত্তরপর্বের বাঙালি লেখকদের উপন্যাসের পূর্ণ তাৎপর্য ও মূল্য নির্ধারণসূত্রে এলিয়টের একটি বিশ্রুত মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য বলে মনে করি—"...no artist of any art, has his complete meaning alone. His significance, his appreciation is the appreciation of his relation to the dead artists..." — যথাস্থানে এর সারবত্তা বিবেচিত হবে।

মূল প্রসঙ্গে প্রবেশ করার আগে একটি কথা বলে নিই। রবীন্দ্রনাথের তিরোধান বৎসর হিসাবে বিশেষভাবে ১৯৪১-এর প্রত্যক্ষ ও তাৎক্ষণিক প্রাসঙ্গিকতা বাংলা কবিতা গল্প প্রবন্ধ ইত্যাদির ক্ষেত্রে যথেষ্ট থাকলেও উপন্যাস-সংক্রান্ত বর্তমান আলোচনায় সেই পরিমাণে আছে বলে মনে হয় না। কারণ রবীন্দ্রনাথের সর্বশেষ উপন্যাস 'চার অধ্যায়' বেরিয়েছে ১৯৩৪-এ। তার পর থেকে জীবনসীমার প্রায় শেষ প্রান্ত পর্যন্ত সাহিত্যের ভিন্নতর শাখাতে পর্যাপ্ত সৃষ্টিতে ঋদ্ধ করে তুললেও তাঁর উপন্যাস সৃষ্টির খাতে নতুন প্রবাহ আর এল না। শুধু বর্তমান নিবন্ধে ১৯৪১- উত্তরকালের উপন্যাস প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকার তাৎপর্য বিচার অনিবার্য গুরুত্ব পাবে। কারণ বিশ শতকের বাংলা উপন্যাসের প্রথমার্ধে যথার্থ আধুনিকতার প্রাণপুরুষ রবীন্দ্রনাথের উত্তরসূরিদের রচনায় সেই উজ্জ্বল আধুনিকতা তথা অনন্য জীবনদৃষ্টি দেশকালের ক্রমপরিবর্তনশীল প্রেক্ষিতে কী শিল্পিত রূপ মেলে ধরেছে— তার নিরীক্ষণ ও বিচার একান্ত আবশ্যিক। কারণ আধুনিকতা কখনোই স্বয়ম্ভু নয়, অমূলতরু-ও নয়। আধুনিকতার অর্থ তো ঐতিহ্যকে অস্বীকার করা নয়, তা বস্তুত বিগত দিনের ঐতিহ্যেরই এক নবায়মান প্রসারিত রূপ। বিগতদিনের মহান পূর্বসূরিদের সঙ্গে তুলনাত্মক মূল্যায়নের মধ্য দিয়েই একালের শিল্পীর এগিয়ে চলার পথ—"You must set him for contrast and comparison among the dead."

কিন্তু সেই প্রসঙ্গ আপাতত বিশেষভাবে বিবেচ্য নয়। আমরা বরং ফিরে যাই ১৯৪১ ও তার সন্নিহিত সময়ের তাৎক্ষণিক প্রেক্ষাপটে। সময়টা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের। প্রায় গোটা বিশ্বকে তোলপাড় করছে এই সর্বনাশা সংগ্রাম। আর সেই যুদ্ধের সমকালেই সারা দেশ জুড়ে জ্বলে উঠল বিয়াল্লিশের আগ্নেয় 'ভারত-ছাড়ো' আন্দোলন। এর পরেই এল ভয়াল মন্বন্তর। আর যুদ্ধ শেষ হতেই এল মর্মান্তিক ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা ও দ্বিখণ্ডিত ভারতের স্বাধীনতা। এই ভয়ংকর কঠিন বাস্তবের মখোমুখি চল্লিশের দশক ও তার উত্তরপর্বের উপন্যাস আত্মপ্রকাশ করল দূরপ্রসারিত ও জটিল গভীর বিচিত্র মাত্রা নিয়ে।

আগে প্রাক্-চল্লিশ বাংলা উপন্যাসের দিকে একবার তাকানো যাক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিঘাত ঘটে নি আমাদের জীবনের উপর। তবু সামাজিক তথা ব্যক্তিজীবনে রূপান্তরের সূচনা চোখে পড়ে এই পর্বে। মার্কসীয় চিন্তা ও রুশ-বিপ্লবের অভিঘাত একদিকে, অন্য দিকে ফ্রয়েড হ্যাভলক এলিসের রচনালব্ধ যৌন চেতনা

তথা মগ্নচেতনার ধারণার মধ্য দিয়ে জীবনের নতুন মাত্রা আবিষ্কার— একালের তরুণের মন ও মননে প্রচণ্ড আলোড়ন জাগালো ।

স্বদেশের প্রেক্ষাপটেও পালাবদলের আভাস । যুদ্ধ শেষ হবার কিছুদিনের মধ্যেই সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ল রাজনৈতিক আন্দোলন ।— বিশের দশকের শুরু থেকে তিরিশের দশক পর্যন্ত নানা সময়ে, নানা পর্যায়ে তার আত্মপ্রকাশ ঘটল । দেখা দিল অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলন, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন । অন্যদিকে বিশ্বব্যাপী আর্থিক মন্দা ডেকে আনল আমাদের জীবনে তীব্র বেকার সমস্যা ও অর্থনৈতিক সংকট । এদিকে স্ত্রীশিক্ষার প্রসারের ফলে মেয়েরা আত্মনির্ভর হবার তাগিদে চাকরিতে ঢুকছে । এ থেকে এক ধরনের আর্থসামাজিক সমস্যার মুখোমুখি হলাম আমরা । মেয়েরা ঘরের বাইরে বেরচ্ছে— পারিবারিক তথা সামাজিক বৃত্তে ফাটলের রেখা যেন স্পষ্টতর হতে লাগল এর ফলে । আর এরই অনুষঙ্গে আরো পরিস্ফুট হল ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য । আবহমান সামাজিক নীতিচেতনার চেয়ে মুখ্য হয়ে উঠল ব্যক্তির নিজস্ব নৈতিকবোধ । সত্তার গভীরে জাগছে অন্তঃসংঘাত আর নৈতিক সংকট । আপন সত্তার মুখোমুখি হয়ে এই সংঘাত-সংকটের উপলব্ধি থেকে জন্ম নিচ্ছে ব্যক্তির আত্ম-অন্বেষণ-প্রবণতা — 'একস্‌প্লোরেশন অফ্ দি ইন্‌ডিভিজুয়াল পার্সোন্যালিটি'র আকাঙ্ক্ষা । এই-সব প্রবণতা ফুটেছে জগদীশ গুপ্ত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখের রচনায় । প্রাক্-চল্লিশ পর্বের উপন্যাসে কেবল নগরকেন্দ্রিক ব্যক্তিজীবনের সংকটের ছবিই ফোটে নি, গ্রাম-জীবনের বাস্তবতারও সেখানে সজীব উপস্থিতি— শরৎচন্দ্রে একভাবে, অন্য দিকে তারাশংকরে ও বিভূতিভূষণে ভিন্নতর দৃষ্টিকোণ থেকে । এঁদের আগে বাংলা উপন্যাসে গ্রামীণ জীবনের সহজ বাস্তবতা এমন তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল রেখায় চিহ্নিত হয় নি । সব মিলিয়ে বলা চলে, এই পর্বে গ্রামীণ তো বটেই, নগরকেন্দ্রিক জীবনচিত্রেও সংকট সমস্যা ও রূপান্তরের আভাস ফুটেছে ঠিকই, তবু জীবনের একেবারে শিকড় ধরে টান পড়ে নি । সব রূপান্তরমুখিনতার মধ্যেও কোথায় যেন একটা স্থিতিশীল মূল্যচেতনা, এক ধরনের জীবনপ্রত্যয় ও সহজ মানবিক সম্পর্ক তখনো বর্তমান । পারিবারিক জীবনবৃত্তে ফাটলের রেখা তখনো খুব বেশি দূর ছড়িয়ে পড়ে নি ।

প্রাক্‌চল্লিশ কথাসাহিত্যে একদিকে দেখেছি, রাষ্ট্রনৈতিক ও আর্থসামাজিক বিভিন্ন রূপান্তরশীল ঘটনার অভিঘাত জীবনের আবহমান মূল্যচেতনার মূলে প্রবলভাবে নাড়া দিয়ে যাচ্ছে, অন্য দিকে এ-ও লক্ষ্য করছি, সেই আঘাত-অভিঘাতের ধাক্কা সত্ত্বেও মানবিক মূল্যবোধ তখনো একেবারে বিপর্যস্ত হয় নি— জীবনের প্রতি আস্থা তখনো সম্পূর্ণ বিনষ্টির কবলিত নয় । বলা বাহুল্য, জীবন সম্পর্কে এই ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ।

বিশ শতকের শুরু থেকে তিরিশের দশক পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস-সাহিত্যের যে বিস্তৃতপট— তার ওপর দিয়ে অব্যবহিত পূর্ববর্তী ও সমসময়ের রাজনীতি-অর্থনীতি পরিস্ফুট ছায়া ফেলে গেছে, আর সেইসঙ্গে সুতীব্র রূপ পেয়েছে ব্যক্তির মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা-সংকটের অজস্র জটিল মুহূর্ত । কিন্তু তবু বলব, সুদৃঢ় মানবপ্রত্যয় ও জীবন সম্পর্কে গভীর বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনের যে মূল ভিত্তি— তা হয়তো দেশকালের বিশেষ পরিস্থিতিতে স্বাভাবিক কারণেই বিচলিত হয়েছে, কিন্তু কখনোই সার্বিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয় নি । তাঁর বহুশ্রুত সেই অন্তিম ঘোষণা প্রসঙ্গত আরেকবার স্মরণীয় : "মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, এই বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব ।" তাঁর উপন্যাস-সাহিত্যের পরিণামী আবেদনেও জীবন-জগৎ সম্পর্কে এই প্রত্যয়ী অস্তিবাদী দৃষ্টির সুনিশ্চিত প্রতিফলন । যথাস্থানে এ নিয়ে আরো প্রাসঙ্গিক আলোচনা করা যাবে ।

রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণ ঘটল উনিশশো একচল্লিশে । তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জোয়ার ক্রমশ উত্তাল হয়ে উঠছে । সেই সর্বনাশা যুদ্ধের ধাক্কায় আমাদের জীবন এসে দাঁড়ালো দারুণ বিপর্যয়ের মুখে । যুদ্ধ আমাদের শান্ত গৃহকোণে বজ্রপাত ঘটালো । সে কথা আগেই উল্লেখ করেছি । বিয়াল্লিশের আগস্ট বিপ্লব-সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রীয়

সামাজিক আলোড়নের মধ্য দিয়ে যে পর্বের সূচনা, একে একে মহামন্বন্তর, ভ্রাতৃঘাতী ভয়ংকর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও শেষ পর্যন্ত দেশকে দু'টুকরো করে স্বাধীনতালাভে সেই পর্বের আপাত-সমাপ্তি । কিন্তু বস্তুত সেখান থেকে শুরু হল দুরারোগ্য ব্যাধির মতো বহুবিচিত্র কঠিন আর্থসামাজিক সংকট । তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল — ছিন্নমূল মানুষের মর্মান্তিক উদ্বাস্তু সমস্যা ।

আর সে কারণেই স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা সাহিত্যে স্বাধীনতার অভ্যর্থনায় কোনো আনন্দ-শঙ্খ ধ্বনিত হল না । এই পর্বের কথাসাহিত্যে মুখ্যত মানুষের অশেষ দুঃখ-দুর্গতির কাহিনী । মন্বন্তরের মর্মন্তুদ ছবি, উদ্বাস্তু নরনারীর সংকট-কণ্টকিত জীবনের চিত্তদাহী আলেখ্য, তীব্র বেকার সমস্যা ও দাঙ্গাবিধ্বস্ত হতশ্রী সমাজের চিত্র— এ সবই কম-বেশি ফুটেছে একালের জীবননিষ্ঠ কথাসাহিত্যে । মনে রাখতে হবে, রাষ্ট্রীয়-অর্থনৈতিক সংকট-দীর্ণ বাঙালি-জীবনের বাস্তব চিত্র প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে, চল্লিশের দশকের প্রায় মধ্যকাল থেকেই বাংলা গল্পে উপন্যাসে আত্মপ্রকাশ করেছে । বস্তুত চল্লিশের, ও তার উত্তরপর্বের পঞ্চাশ-ষাট দশকের বাংলা কথাসাহিত্যে শুধু এই আর্থ-সামাজিক দিক থেকে বিস্রস্ত বিভ্রান্ত জীবনের ছবিই নয়, এর প্রতিক্রিয়ায় নরনারীর নৈতিক বিকৃতি ও মানসিক বিচিত্র জটিলতার রূপচিত্র বাস্তবতার উজ্জ্বল অক্ষরে উৎকীর্ণ হয়েছে ।

কিন্তু সংবেদী পাঠকের মনে এই প্রসঙ্গে স্বতই একটা প্রশ্ন জাগে । সেটা এইরকম— চল্লিশের দশকের বাংলা উপন্যাস এবং তার পরবর্তী সময়ের, বলতে পারি, পঞ্চাশ-ষাট দশকের উপন্যাসের মধ্যে প্রবণতার দিক থেকে কোনো বিশেষ প্রভেদ চোখে পড়ে কি ? অর্থাৎ রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক, নৈতিক কিংবা ব্যক্তির আত্ম-অন্বেষণ-সম্পর্কিত প্রবণতার কোনো পার্থক্য ফুটে ওঠে কিনা, এটাই প্রশ্ন । আর যদি তেমন কিছু লক্ষিত হয়, তবে তা কি কেবল মাত্রা বা পরিমাণগত, নাকি তা একেবারে মৌলিক প্রকৃতিগত প্রভেদ ? এর উত্তরে বলা চলে যে, সম্ভবত ক্ষেত্র বিশেষে দু রকমই ঘটেছে । চল্লিশের দশকে প্রকাশিত 'গণদেবতা' 'পঞ্চগ্রাম'-এ গ্রামীণ কৃষিভিত্তিক পরিবেশে দরিদ্র মানুষের ওপর শোষণ-পীড়ন ও সেইসঙ্গে তাদের আত্মরক্ষা ও প্রতিবাদ প্রয়াসের এমন জীবন্ত ছবি উত্তরকালের রচনায় কোথায় ? চল্লিশের দশকের উপন্যাসে এই গ্রামীণ পরিবেশ-প্রবণতার আরেকটি বিশিষ্ট নিদর্শন— মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত কিন্তু অনন্য রচনা 'চিন্তামণি' । দুর্ভিক্ষ-পীড়িত গ্রামীণ নরনারীর আত্যন্তিক আর্থিক দুর্গতির সংহত এক দলিল বিশেষ এই রচনা । চল্লিশের দশকে রচিত বিভূতিভূষণের 'ইছামতী' কিংবা 'অশনি সংকেত'-এও সময়ের নানান স্তরে বিধৃত হয়েছে গ্রামীণ মানুষের আর্থ-সামাজিক সংকট-সমস্যার আলেখ্য । চল্লিশের দশকে রচিত গ্রামীণ নিম্নবিত্ত মানুষের দুঃখ-দুর্গতি ও জীবনের নানান দিকের বিচিত্র রূপায়ণ ধরা পড়েছে আরো অনেক উল্লেখযোগ্য উপন্যাসে । এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে তারাশংকরের 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা', 'সন্দীপন পাঠশালা' ও 'পদচিহ্ন' সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াইচরিত মানস (১ম পর্ব)', গোপাল হালদারের 'পঞ্চাশের পথ', 'উনপঞ্চাশী' ও 'তেরশো পঞ্চাশ', এবং নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'দ্বীপপুঞ্জে'র নাম । চল্লিশের দশকে এই অনাগরিক জীবনপটপ্রবণতা আরো চোখে পড়ে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'উপনিবেশ' কিংবা তাঁর বিভিন্ন রাজনীতি-নির্ভর উপন্যাসে ।

এই প্রেক্ষিতে পঞ্চাশ-ষাট দশকের বাংলার উপন্যাসকে বিচার করতে গিয়ে দেখি— এই-সব রচনায় কয়েকটি পূর্বতন প্রবণতা স্ফুটতর হয়েছে, কিংবা দু-একটি নতুন তাৎপর্যবহ প্রবণতার আবির্ভাব ঘটেছে । প্রথমত দেখি, পঞ্চাশ-ষাট দশকের কালপর্বে নাগরিক প্রেক্ষাপটের দিকে ঔপন্যাসিকদের বিশেষ প্রবণতা । এই নগরজীবনের পটে একদিকে ফুটেছে শ্রমজীবী (অনেকক্ষেত্রে কারখানার) মানুষের ছবি (নগর বলতে শহরতলীকেও বুঝতে হবে— কারণ সেই পরিবেশ বাংলার গ্রামীণ পটভূমি থেকে প্রায় সম্পূর্ণ আলাদা)— যেমন সমরেশ বসুর উপন্যাস 'বি. টি. রোডের ধারে', 'জগদ্দল', 'সওদাগর' ইত্যাদি । অবশ্য একথা স্বীকার করতেই হবে যে, চল্লিশের দশকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'শহরতলী' কিংবা 'দর্পণ'-এ কারখানার মেহনতি মানুষের ওপর পীড়ন ও তাদের প্রতিবাদী

মনোভাবের চিত্রাঙ্কনের ক্ষেত্রে পথিকৃৎ। কিন্তু পঞ্চাশ-ষাট দশকের নগর-প্রবণতার আরেকটি স্বাতন্ত্র্য-চিহ্নিত দিক হল মধ্যবিত্তের বা নিম্ন মধ্যবিত্তের আর্থ- তথা নৈতিক সংকটের কঠিন বাস্তব চিত্র। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রবল অভিঘাত প্রচণ্ড অর্থনৈতিক বিড়ম্বনারূপে আত্মপ্রকাশ করেছে যুদ্ধ শেষ হবার কিছুদিন পরে— স্বাধীনতালাভেরও উত্তর পর্বে, যখন পূর্ব বাংলা থেকে উদ্বাস্তুরা কোটালের বন্যাস্রোতের মতো এসে সমগ্র পশ্চিম বাংলার অর্থনীতিকে অনিশ্চিত অকূলের দিকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সার্বজনীন', 'স্বাধীনতার স্বাদ' এই সত্যের সাক্ষ্য বহন করেছে। কিন্তু কেবল অসহায় উদ্বাস্তু মধ্যবিত্তের ছবিই নয়, এই পর্বের বহু উপন্যাসে যুদ্ধ-প্রহত মধ্যবিত্তের আর্থিক সংকটের যে ছবি আছে, তা থেকে নগরবাসী মধ্যবিত্ত জীবনের বিপর্যয় ও ভাঙনের নিশ্চিত প্রতীতি ঘটে পাঠকমনে। 'কিনু গোয়ালার গলি', 'চেনামহল', 'বারো ঘর এক উঠোন' কিংবা 'দেওয়াল'-এর মতো উজ্জ্বল সৃষ্টিগুলি এর অনুষঙ্গে মনের মধ্যে ভিড় করে। এই-সব উপন্যাসে যে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ছবি আছে, তা আমাদের মনকে এর নীরন্ধ্র অন্ধকার সুড়ঙ্গপথের দিকে ঠেলে দেয়— যেখানে মনুষ্যত্বের মূল্যবোধ এক চরম বিনষ্টির মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে।

চল্লিশের দশক থেকে পরবর্তী দুই দশকের উপন্যাসের প্রবণতার পার্থক্যের আরেকটি প্রধান দিক্ লক্ষণীয়। শেষোক্ত দুই দশকের রচনায় অন্তর্লোকের আলো-আঁধারি সমস্যা-জটিল পথের মধ্য দিয়ে ব্যক্তির গূঢ় আত্ম-অন্বেষণের ছবি আরো অনেক বেশি গুরুত্ব পেয়েছে— সেই-সব ছবিতে যুক্ত হয়েছে আরো সূক্ষ্ম ও মননদীপ্ত বিভিন্ন মাত্রা। তিরিশ এমন-কি চল্লিশের দশকের উপন্যাসের চেয়ে পরবর্তী পর্বের উপন্যাস এদিক থেকে অনেক স্ফুটতর স্বকীয়তায় চিহ্নিত। বলা বাহুল্য, এই-সব উপন্যাসের প্রস্থানভূমিতে আছে নাগরিক মধ্যবিত্তের জীবন। তারাশংকর, বনফুল ও সতীনাথ থেকে শুরু করে সমরেশ বসু, সন্তোষকুমার ঘোষ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও অসীম রায় প্রমুখের বিভিন্ন উপন্যাস প্রসঙ্গত স্মরণীয়। অবশ্য বলা নিষ্প্রয়োজন যে, ব্যক্তির অন্তশ্চেতনার ছবি পূর্বোক্ত লেখকদের রচনায় একই রেখায় ও রঙে আঁকা নয়— তাঁদের আবেদনও পৃথক্। বিষয়টি নিয়ে যথাস্থানে আরো কিছু আলোচনা করা যাবে। বস্তুত চল্লিশ এবং পরবর্তী দুই দশকের উপন্যাস আমাদের আলোচনার সামগ্রী। কিন্তু আমরা মনে করি, চল্লিশ এবং পরবর্তী দুই দশকে রচিত উপন্যাসসমূহের মধ্যে প্রবণতার দিক থেকে কয়েকটি পার্থক্য লক্ষিত হয়। বলা বাহুল্য, দেশকালের বাস্তব প্রতিবেশ ও বিভিন্ন উপাদানের কার্যকরণগত টানাপোড়েনের ফলে এই-সব পার্থক্য গড়ে উঠেছে। এতক্ষণ আমরা তার একটা সংক্ষিপ্ত রূপরেখা দিতে চেয়েছি। এরপর আলোচ্য সমগ্র কালপর্বের উপন্যাসের গতিপ্রকৃতি নিয়ে আরো কয়েকটি কথা বলা যেতে পারে। প্রসঙ্গত বলে রাখি, সীমিত পরিসরে এক দীর্ঘ সময়পর্বের উপন্যাস ও ঔপন্যাসিক নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে স্বাভাবিকভাবেই অনেক নাম বাদ পড়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, এই-সব রচনা বা লেখক অনুল্লেখ্য। আসলে এই নিবন্ধে আলোচ্য পর্বের কেবল মুখ্য প্রবণতাগুলি নিয়ে কিছু বলাই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। কোনো তালিকা রচনা নয়। কিংবা উপন্যাসের বিশদ শিল্পবিচারও নয়।

একটু আগেই বলেছি, দেশকালের বাস্তব প্রতিবেশ বিভিন্ন পর্ব বা দশকের উপন্যাসের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। এই প্রতিবেশগত প্রভাবের একটি প্রধান দিকে পরিস্ফুট হয় উপন্যাসের বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে। চল্লিশের দশকে বাংলা উপন্যাসে এমন একটি প্রধান বিষয়— রাজনৈতিক আন্দোলন। বস্তুত পরাধীন মানুষের মুক্তির স্বতঃস্ফূর্ত আকাঙ্ক্ষা সব দেশেই ধীরে ধীরে প্রবল রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপ নেয়। আর তার প্রতিফলন ঘটে স্বাভাবিক কারণেই বাস্তবনিষ্ঠ সাহিত্যে— বিশেষত উপন্যাসে। উনিশ শতকের 'আনন্দমঠ' থেকে শুরু করে বিশ শতকে রবীন্দ্রনাথের রচনার মধ্য দিয়ে সেই ধারা এসে পৌঁচেছে স্বাধীনতার প্রায় অব্যবহিত পূর্বে রচিত উপন্যাসসমূহে। চল্লিশ দশকের উপান্ত্যকালে আমাদের স্বাধীনতা এল, বলা বাহুল্য, কতকটা সেই কারণেই পরবর্তী পঞ্চাশ-ষাট দশকে রাজনৈতিক উপন্যাসের ধারা নিতান্ত ক্ষীণ হয়ে এল। স্বাধীনতা-উত্তর পর্বের নানান কঠিন

আর্থ-সামাজিক বাস্তব সমস্যা জাতীয় জীবনকে বিপন্ন করে তুলল । বিগত দিনের রাজনৈতিক আন্দোলনের স্মৃতি এই প্রেক্ষিতে ক্রমেই ধূসর হয়ে এল । কিন্তু চল্লিশের দশকে যখন নানা শাখায় প্রবাহিত জাতীয় আন্দোলন প্রবল ও উদ্দাম হয়ে উঠেছে— তখন বাংলা উপন্যাসেও এ ধরনের সৃষ্টির যেন ঢল নামল ।

প্রাক্-চল্লিশ পর্বে রবীন্দ্রনাথের তিনটি উপন্যাস— 'গোরা', 'ঘরে বাইরে' ও 'চার অধ্যায়'-এ রাজনৈতিক চেতনার পরিচয় সুস্পষ্ট । বিশ শতকের প্রথম দশকে স্বদেশী আন্দোলনের পর্বে রচিত হলেও উনিশ শতকের প্রেক্ষাপটে উপস্থাপিত 'গোরা' উপন্যাসের কাহিনীতে রাজনৈতিক উপাদান আদৌ কেন্দ্রীয় বিষয় নয়, অনেকাংশে প্রান্তিক । গোরার দেশপ্রেম তথা হিন্দু জাতীয়তাবোধ ও ইংরেজ-বিদ্বেষ উপন্যাসটিতে আংশিক রাজনৈতিক বাতাবরণ রচনা করেছে বটে, কিন্তু ধর্মীয় ও সামাজিক নানা সমস্যাই গ্রন্থটিতে ক্রমশ বেশি গুরুত্ব পেয়েছে যেন । সেইসঙ্গে গোরার প্রেমসমস্যা যুক্ত হয়ে তার আত্মজিজ্ঞাসাকে তীক্ষ্ণতর করেছে । আর তারই অনুষঙ্গে আরেকটি যে জিজ্ঞাসা অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে গেছে— তা নিছক ভারতের রাষ্ট্রীয় মুক্তির প্রশ্ন নয়— তা সামগ্রিকভাবে ভারত-জিজ্ঞাসা, ব্যাপকতর স্বদেশকল্যাণের অন্বেষণ ।

'গোরা' উপন্যাসের চেয়ে 'ঘরে বাইরে' ও 'চার অধ্যায়'-এর (বিশ শতকীয়) রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপট স্বভাবতই আরো স্পষ্ট । বিদেশী দ্রব্য বর্জন ইত্যাদি দ্বারা চিহ্নিত অপেক্ষাকৃত অহিংস স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদ যুক্ত হয়ে বিশ শতকের প্রথম দশক রাষ্ট্রীয় চেতনার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা পেয়েছিল, সন্দেহ নেই । 'ঘরে বাইরে'-র নিখিলেশ-সন্দীপ-এর রাজনৈতিক সংঘাত, অন্য দিকে 'চার অধ্যায়ে' ইন্দ্রনাথের কর্মকাণ্ডে আলোচিত এই দুটি গ্রন্থ বিশ শতকীয় বাংলা উপন্যাসে রাজনৈতিক চেতনাকে বহুলাংশে সূচিহ্নিত করেছিল । কিন্তু মনোযোগী পাঠকমাত্রই জানেন, উপন্যাস দুটিতে রাজনীতির উপাদান থাকলেও, ব্যক্তির আত্মসমীক্ষা তথা প্রবল নৈতিক দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে আত্ম-অন্বেষণই মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে ।

আগেই বলেছি, বিশ শতকের বাংলা উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক চেতনাকে যুক্ত করার দিক থেকে বরেণ্য পথিকৃৎ, সন্দেহ নেই, কিন্তু স্বাধীনতার জন্য সুতীব্র আস্পৃহা তথা গণসংগ্রাম চেতনাকে কেন্দ্রীয় বিষয়রূপে গ্রহণ করার প্রবণতা নিয়ে চল্লিশের দশকে দৃপ্ত স্বাতন্ত্র্যে আত্মপ্রকাশ করলেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় । 'তিমিরতীর্থ', 'মন্দ্রমুখর', 'স্বর্ণসীতা', 'সূর্যসারথি', 'শিলালিপি' ইত্যাদি একের পর এক প্রকাশিত উপন্যাস এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য । এমন-কি, 'উপনিবেশে'র বিষয়বস্তু নিছক রাজনীতিকেন্দ্রিক না হলেও, উপন্যাসটির শেষাংশে স্বাধীনতাসংগ্রামীদের আবির্ভাবে চর ইসমাইলে সংগ্রামী চেতনা জেগে উঠছে ক্রমশ । দুর্ভিক্ষের ভয়াল প্রেক্ষাপটে জমির শেখের প্রেরণায় সাম্যচেতনায় উদ্দীপ্ত প্রতিবাদী সংকল্প ক্রমশ দৃঢ় হচ্ছে সাধারণ মানুষের মনে । পূর্বোক্ত অন্য উপন্যাসগুলিতেও একদিকে আগস্ট আন্দোলন, অন্য দিকে সাম্যবাদী মনোভাব নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের রাজনীতি-আশ্রিত উপন্যাসের কেন্দ্রীয় 'মোটিফ' রূপে দেখা দিয়েছে । আর এই 'মোটিফ'-এর নেপথ্যে আছে এক স্বপ্নদর্শী স্রষ্টার রোম্যান্টিক আবেগ । আর এই আবেগের অতিরেকের ফলে হয়তো অনেক সময়েই তাঁর উপন্যাস প্রত্যাশিত বাস্তবতা ও সংযত কল্পনার সীমারেখাকে অতিক্রম করে গেছে । শিল্পসৃষ্টির প্রার্থিত সাফল্য হয়তো তিনি সর্বত্র অর্জন করতে পারেন নি, কিন্তু তবু শোষক ও শাসকের হাত থেকে মুক্তিলাভের স্বপ্নকে সার্থক করার সংগ্রামী চেতনায় মুখর, উত্তাল জনগণের রূপচিত্র অঙ্কনে তাঁর আন্তরিকতা ও শিল্পীজনোচিত সততা সংশয়াতীত । বাংলা কথাসাহিত্যে তাঁর আবির্ভাব রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণের পর । কিন্তু তবু তাঁর সারস্বত সাধনার প্রাণকেন্দ্রে অধিষ্ঠিত ছিল সেই মহান স্রষ্টার প্রেরণা । উপন্যাসে যে রাজনৈতিক ভাবাদর্শকে তিনি রূপ দিতে চেয়েছিলেন, তার নেপথ্যে ছিল রবীন্দ্রনাথের জীবনাদর্শ, যা একান্তভাবে স্বদেশের মৃত্তিকাস্পর্শী । "শিল্পীর স্বাধীনতা" প্রবন্ধে তাঁর সোচ্চার ঘোষণা এখানে উদ্ধৃতিযোগ্য : "আমার যদি কোন রাজনীতি থাকে, সে আমার ভারতবর্ষ এবং মানবতা, ...বহু ভাগ্যে রবীন্দ্রনাথের দেশে জন্ম নিতে পেরেছি— তাঁর জীবনসাধনা আমার আকাশে

ধ্রুবতারা হয়ে জ্বলতে থাকুক ।”

পরাধীন ভারতবর্ষের মুক্তির আগ্নেয় আকাঙ্ক্ষা বাণীরূপ পেয়েছিল যাঁদের রচনায়, তাঁদের মধ্যে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বাঙালি পাঠকের দৃষ্টি সহজেই আকর্ষণ করেছিলেন, কিন্তু নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের পূর্বসূরি ও সমকালীন আরো অনেকের চল্লিশের দশকে রচিত উপন্যাসে স্বাধীনতা আন্দোলনের সজীব প্রতিফলন চোখে পড়ে । এঁদের সকলের রচনাতেই রাজনীতি তথা মুক্তি সংগ্রাম মূল বিষয়বস্তু ছিল না— তারাশংকরের ‘গণদেবতা’, ‘পঞ্চগ্রাম’, ‘মন্বন্তর’ কিংবা ‘সন্দীপন পাঠাশালা’য় আর্থ-সামাজিক নানা সমস্যার আঘাত-অভিঘাতের মধ্যে গান্ধীবাদী, সন্ত্রাসবাদী কিংবা মার্কসিস্ট চিন্তা-চেতনা ও কর্মকাণ্ড সংক্ষিপ্ত হলেও অর্থবহ ভূমিকা পেয়েছে । সাম্যবাদকে সমাজ-রূপান্তরের প্রগতিশীল এক হাতিয়াররূপে মনের মধ্যে গ্রহণ করেছিলেন তারাশংকর । কিন্তু আবাল্য গান্ধীবাদে লালিত যাঁর রাজনৈতিক সত্তা, তাঁকে শেষ পর্যন্ত কমিউনিজমকে গান্ধীবাদের সহযোগী ও সহযোদ্ধারূপে মেনে নিয়ে, ঈষৎ ‘শোধন’ করে বাণীবদ্ধ করতে হয়েছে উপন্যাসে (‘মন্বন্তর’ প্রসঙ্গত স্মরণীয়) । এর অনুষঙ্গে বলা চলে যে তিরিশের দশকের একেবারে শেষে প্রকাশিত ‘ধাত্রীদেবতা’ উপন্যাসে তারাশংকরের রাজনৈতিক চেতনার— তাঁর গান্ধীবাদী আদর্শ ও বিশ্বাসের স্বাক্ষর সুস্পষ্ট । ‘ধাত্রীদেবতা’-র কেন্দ্রীয় ‘মোটিফ’ মূলত স্বাধীনতা আন্দোলন । রাজনৈতিক আদর্শ ও চেতনার এমন ব্যাপক ও পরিস্ফুট প্রতিফলন তারাশংকরের আর কোনো উপন্যাসে চোখে পড়ে না ।

চল্লিশের দশকের গোড়া থেকেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে যে প্রতিবাদী মনোভাব ক্রমশ সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামী চেতনার মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে চেয়েছে, তার মধ্যেই নিহিত ছিল তাঁর রাজনৈতিক প্রবণতা । ‘সহরতলী’ থেকে শুরু করে ‘দর্পণ’ উপন্যাসে কারখানার শ্রমিকদের প্রবল অসন্তোষের বিস্ফোরণের মধ্যে যে বিক্ষোভের সূচনা, ‘চিহ্ন’ উপন্যাসে চিত্রিত সুস্পষ্ট রাজনৈতিক আন্দোলনে তারই সোচ্চার ঘোষণা । মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাম্যবাদী দৃষ্টিতে রাজনৈতিক চেতনা সর্বদাই অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত থাকত । তাই স্বতন্ত্রভাবে তাঁর উপন্যাসে নিছক স্বাধীনতা আন্দোলনের রূপচিত্র তেমন মেলে না । একমাত্র ‘চিহ্ন’ উপন্যাসে ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ‘রসিদ আলি দিবসে’র বিশাল মিছিলের মধ্যে পরাধীন জাতির মুক্তি-স্পৃহার সংহত প্রতিফলন ঘটেছে ।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব অনেকাংশে প্রভাবিত হয়েছিল মার্কসিস্ট দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা । তার মধ্যে গান্ধীবাদী অহিংস আন্দোলন-প্রবণতার কোনো পরিস্ফুট পরিচয় চোখে পড়ে না । কিন্তু চল্লিশের দশকের প্রায় সমস্ত রাজনীতি-আশ্রয়ী উপন্যাস লেখকের রচনায় রাজনৈতিক আন্দোলনের দুটি প্রধান ধারা— অহিংস গান্ধীবাদী ও সাম্যবাদী, যা অহিংসায় একান্তভাবে বিশ্বাসী নয়— এই দুটি ধারার ছবি প্রায়শই দেখা গেছে । তারাশংকরের ‘মন্বন্তর’, বনফুলের ‘সপ্তর্ষি’, সুবোধ ঘোষের ‘তিলাঞ্জলি’ এবং বিশেষভাবে সতীনাথ ভাদুড়ীর ‘জাগরী’ এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য দৃষ্টান্ত । লেখকরা এ-সব ক্ষেত্রে সর্বদা পক্ষপাতমুক্ত হতে পারেন নি । কোনো বিশেষ রাজনৈতিক বিশ্বাসের প্রতি পক্ষপাত তাঁদের রচনাকে শিল্পাদর্শ থেকে স্খলিত করেছে । মনোজ বসুর রচনায় একদিকে গান্ধীবাদী আন্দোলনের প্রতি, অন্য দিকে সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডের দিকে আকর্ষণ প্রায় সমভাবে স্পষ্ট হয়েছে । এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার ক্ষেত্র এটি নয়, তবে চল্লিশের দশকের এই-সব রচনার মধ্য দিয়ে যেটি নিঃসংশয়ে স্বপ্রকাশ— তা হল ঔপন্যাসিকদের ঐকান্তিক স্বদেশপ্রীতি ।

আরেকটি কথা বলে এই প্রসঙ্গ শেষ করি । পূর্বোক্ত উপন্যাসগুলিতে স্বদেশপ্রীতি ও রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের আবর্ত বাস্তবভাবে চিত্রিত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু এদের চিরায়ত মানবিক মূল্য কতখানি ? মানুষের মনের গভীরে যে গূঢ় আত্মজিজ্ঞাসা জেগে থাকে রাজনীতির আবর্তে আকণ্ঠ ডুবে থেকেও— সেই অন্তশ্চেতনার ছবি কতটুকু ফুটেছে ওই-সব রচনায় ? রবীন্দ্রনাথের ‘ঘরে বাইরে’ ও ‘চার অধ্যায়’ উপন্যাসে ওই গভীর আত্ম-অন্বেষণের আর্তি ফুটেছে ঠিকই, কিন্তু ওই দুটি উপন্যাসে রাজনৈতিক বাস্তবতার ছবি তেমন প্রত্যাশিত প্রাধান্য পায় নি ।

আমাদের মনে হয়, রাজনৈতিক আন্দোলনের বাস্তবতা ও ব্যক্তির আত্মজিজ্ঞাসার সমন্বয়ের সার্থক রূপের উজ্জ্বলতম নিদর্শন— সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী'। বস্তুত এই উপন্যাসে ব্যক্তির (বাবা, মা, বিলু ও নীলুর) আপন সত্তার গূঢ় আবেগ অনুভব ও অন্বেষণের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের— গান্ধীবাদী, সমাজবাদী ও সাম্যবাদী আন্দোলনের চেতনা। জর্জি লুকাচ্ আধুনিক মানুষের জীবন সম্পর্কে বিখ্যাত সুইস্ লেখক গট্‌ফ্রিড কেলার-এর বিশ্রুত মন্তব্যটি স্মরণ করেছেন— "Everything is politics", সেটি 'জাগরী সম্পর্কে গভীর অর্থবহ হয়ে ওঠে। লুকাচ্ পূর্বোক্ত উদ্ধৃতিটির অনুষঙ্গে "division of human personality into a public and a private sector"-কে "multiliation of the essence of man" বলে যে মত প্রকাশ করেছেন— 'জাগরী' উপন্যাসে ব্যক্তিচেতনা ও রাষ্ট্রীয় চেতনার সমন্বয়ী শিল্পরূপের মধ্যে তার যাথার্থ্য প্রতিফলিত হয়েছে মনে করি। 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' যদিও 'জাগরী'র মতো একান্তভাবে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে রচিত উপন্যাস নয়, তবু নিরক্ষর, পিছিয়ে-থাকা মানুষের মনের দর্পণে 'গানহি বাওয়া'র রাজনৈতিক আন্দোলনের অভিঘাত নতুন নান্দনিক মাত্রা পেয়েছে।

চল্লিশের দশকের বাংলা উপন্যাসের দুটি প্রধান প্রবণতার কথা আগেই উল্লিখিত হয়েছে। একটি, গ্রামীণ জীবন-আশ্রয়ী ও অন্যটি রাজনীতি-বিষয়ক। কিন্তু পঞ্চাশের গোড়াতেই দৃষ্টি আকর্ষণ করছে, আর্থ-সামাজিক দিক থেকে বিপন্ন মানুষের; বিশেষত নাগরিক মধ্যবিত্ত নরনারীর জীবন নিয়ে উপন্যাস-প্রবাহ। আর এরই সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছে— ব্যক্তির নৈতিক সমস্যা এবং তার আত্মজিজ্ঞাসু সত্তার প্রবল অন্তঃসংঘাত। পঞ্চাশের দশকের গোড়াতেই অর্থাৎ ১৯৫০ সালেই প্রকাশিত 'কিনু গোয়ালার গলি'তে এই-সব প্রবণতা অনেকাংশে স্পষ্ট। পপলার পার্ক থেকে কিনু গোয়ালার গলি— কাহিনীর এই মঞ্চ-রূপান্তরের প্রেক্ষাপটে লেখক আঁকছেন ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্তের তিক্ত-করুণ ছবি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর জীবনের ক্রমক্ষীয়মাণ আর্থিক ও নৈতিক সংকটকে কয়েকটি আখ্যান-বৃত্তের মাধ্যমে ধরতে চেয়েছেন লেখক। অর্থনৈতিক দুর্গতির চাপে পিষ্ট নীলার চার পাশ ঘিরে লেখক মণীন্দ্র ও তার স্ত্রী শান্তি, কবি ইন্দ্রজিৎ ও প্রৌঢ় ধনী ব্যবসায়ী অবিনাশ— সবাই মিলে ভঙ্গুর মধ্যবিত্ত জীবন-প্রতিবেশের — শুধু দারিদ্র্য-দুঃখ নয়, বিচিত্র জটিল নৈতিক মনস্তাত্ত্বিক সমস্যার এক ধূসর বাস্তব চিত্রপট রচনা করেছে। নীলার নৈতিক বিপন্নতার আখ্যানে দেখি, কবি ইন্দ্রজিৎ-কে নীলা ছিনিয়ে নিতে চেয়েছে মণীন্দ্রের স্ত্রী মায়াবিনী শান্তির গ্রাস থেকে, যা তার জীবনে ভয়ংকর পরিণতি পেয়েছে ইন্দ্রজিতের সন্তান ধারণে। কিন্তু এর পরেও নীলা শান্তির মোহাবেশ থেকে ইন্দ্রজিৎ-কে পুরোপুরি সরিয়ে আনতে পারে নি। আর সেই চূড়ান্ত পরাজয়ের যন্ত্রণায় ইন্দ্রজিৎকে শেষ অবধি প্রত্যাখ্যান করে নিরুপায়, বিপন্ন নীলা প্রৌঢ় অবিনাশকে গ্রহণ করতে সম্মত হল। মণীন্দ্র-শান্তির জীবনেও আর্থিক অনটন থেকেই উদ্ভূত হয়েছে তাদের দাম্পত্য সম্পর্কের নিদারুণ শিথিলতা। তবু শেষ পর্যন্ত নৈতিক পতনের ঢালু পিছল পথে দ্রুত অবতরণের মুখে হঠাৎ তাদের চেতনা ফিরেছে যেন। তারা ফিরতে চেয়েছে সুস্থতর দাম্পত্য সম্পর্কের সীমিত বৃত্তে।

এর কাছাকাছি সময়ে প্রকাশিত নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'চেনামহল' ('দেশ' পত্রিকায় ১৩৫৭–৫৮ সালে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত)-এ নাগরিক ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্ত সমাজের অন্তর্ভেদী রূপ প্রতিফলিত। যুদ্ধোত্তর কলকাতা শহরের এক ধরনের 'শিথিল' যৌথ পরিবার উপন্যাসটির প্রেক্ষাপট। প্রবল বেকার সমস্যা তথা কঠিন আর্থিক দুর্গতি উপন্যাসের চরিত্রগুলির নৈতিক মেরুদণ্ডের উপর প্রচণ্ড আঘাত হানতে উদ্যত হয়েছে। আর একই ঘূর্ণাবর্তে পরিস্ফুট হয়েছে পরিবারের যৌথ প্রচ্ছদের আড়ালে প্রতিটি চরিত্রের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য তথা আত্মকেন্দ্রিকতার গূঢ় মুখচ্ছবি। অবনীর নিষ্ক্রিয়তা, উপেক্ষিতা বাসন্তীর বিষণ্নতা ও নৈঃসঙ্গ্য, স্বামী বৈদ্যনাথের সঙ্গে কনকের মানসিক সংযোগের অভাব— একই ছাদের নীচে এই পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতাবোধ আধুনিক নাগরিক জীবনের দুর্মোচ্য লক্ষণ হিসেবে 'চেনামহল'-এ রূপায়িত। নরনারীর অসামাজিক সম্পর্কের তির্যক জটিল সমস্যার নানা কৌণিক দিক একালের মধ্যবিত্ত ব্যক্তিমানুষের নৈতিক শিথিলতার বাস্তবতাকে চিহ্নিত করেছে। কনক ও অবনীর অনুচ্চার

ক্রমশিথিল সম্পর্ক, অরুণ ও বিধবা করবী, অতুল ও বিবাহিতা রমার ঘনিষ্ঠতা এবং বিজু ও তার পিসতুতো বোন প্রীতির মর্মান্তিক সমাজনিষিদ্ধ প্রেম-সম্পর্ক— সবই যুদ্ধোত্তর কালের এই প্রখর জটিল বাস্তবতার রূপক চিত্র যেন। তবু 'চেনামহল'-এ মানুষের সার্বিক মূল্যবোধের সম্পূর্ণ বিনষ্টি, তার সর্বাত্মক পরাজয়ের ছবি নেই, এর মধ্যে জীবন সম্পর্কে ইতিবাচক দৃষ্টি একেবারে অলক্ষ্য নয়; জীবন সম্পর্কে নরেন্দ্রনাথ মিত্র কোনোদিনই একেবারে বিশ্বাস হারানি নি। 'চেনামহল'-ও সেই জীবনপ্রত্যয়ী অথচ বাস্তববাদী লেখকের সৃষ্টি।

কিন্তু এরই সমকালীন রচনা 'বারো ঘর এক উঠোন'-এ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী নির্লিপ্ত নির্বিকার এক বাস্তব দৃষ্টি নিয়ে আর্থ-সামাজিক ও নৈতিক দিক থেকে সর্বরিক্ত জীবনের প্রায় সম্পূর্ণ নীরন্ধ্র অন্ধকার কাহিনীচিত্র এঁকেছেন। উপন্যাসের বারোটি পরিবারের নরনারী আজ যে চরম আর্থিক দুর্গতির মধ্যে আকণ্ঠ ডুবে আছে— এরা অনেকেই একদিন তেমন ছিল না। 'কিনু গোয়ালার গলি'র নীলাদের মতো সবাই পপ্‌লার পার্কের বাসিন্দা না হলেও, একদিন তাদের যথেষ্ট সচ্ছলতা ছিল, স্বাচ্ছন্দ্য ছিল। কিন্তু 'কিনু গোয়ালার গলি'র নরনারীর মতো, ক্রমশ সংগতি হারাতে হারাতে তারা এসে দাঁড়িয়েছে বারোটি খুপরি-ঘেরা এক সংকীর্ণ উঠোনের শ্বাসরোধকারী জগতে। এরা কেউই যুদ্ধোত্তর তথা স্বাধীনতাকালীন উদ্বাস্তু নয়— দেশের সাধারণ সর্বগ্রাসী বেকার সমস্যা ও আর্থিক বিপর্যয়ের শিকার। দেশের দারিদ্র্যসীমার নীচে পড়ে আছে যে বিপুল জনসমষ্টি— এই-সব প্রায়-বেকার মানুষগুলি তাদেরই সগোত্র। দেশ জুড়ে কালোবাজারী, অবৈধ মুনাফা-লোটা চোরাকারবারীদের প্রচণ্ড দাপটে, তাদের শোষণের চাপে এরা নিষ্পিষ্ট। এদের আর মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার সামর্থ্য নেই। আর এই আর্থিক মেরুদণ্ড ভেঙে পড়ার ফলেই এদের সব নৈতিক মূল্যচেতনাও প্রায় সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত। কোনো উত্তরণ বা আলোকিত উদ্ভাসনের এতটুকু আশ্বাস মেলে না উপন্যাসপাঠের শেষে। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নিজেরই স্বীকৃতি :

> "... আলো দেখাবার জন্য, উত্তরণ দেখাবার জন্য আমি এ বই লিখিনি ... বিপন্ন বিপর্যস্ত অবক্ষয়িত সমাজের মানুষগুলো শুধু বেঁচে থাকার জন্য কোনরকমে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য কতটা অন্ধকারে কতটা নীচে নেমে যেতে পারে, তাই আমি দেখিয়েছি।"[১]

কে. গুপ্ত, ক্ষিতীশ, রমেশ, বেবি, বীথি, রুচি এবং আরো অনেক চরিত্র— এদের নিদারুণ আর্থিক বিপন্নতা থেকে মুক্তি পাওয়ার নিষ্ফল আশায় নৈতিক মূল্যচেতনাকে অসহায়ের মতো সর্বনাশের অকূল স্রোতে ভাসিয়ে দেওয়ার নিরাসক্ত ও নির্মম রূপায়ণের এক অসামান্য অভিজ্ঞান এই উপন্যাস।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা। পূর্বোক্ত তিনটি স্মরণীয় উপন্যাস যখন প্রকাশিত হয়েছে— তারই সন্নিহিত কালে পঞ্চাশের দশকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনেক উল্লেখযোগ্য উপন্যাস বেরিয়েছে। সেই-সব উপন্যাসের একদিকে এক শ্রেণীর মানুষের অর্থনৈতিক চরম দুর্দশা, অন্য দিকে দুর্নীতিপরায়ণ অপর শ্রেণীর ফেঁপে ওঠার ছবির পাশাপাশি নৈতিক অবক্ষয়ের তামস রূপ চিত্রিত হয়েছে। কিন্তু 'সোশ্যালিস্ট রিয়ালিজমে' বিশ্বাসী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস এই দুর্দশা ও অবক্ষয়ের কানাগলিতেই আটকে থাকে নি। তিনি এ থেকে উদ্ধারের পথের ইঙ্গিতও দিয়েছেন। সে পথ— সম্মিলিত শোষিত মানুষের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের সংগ্রামী পথ। 'আরোগ্য' উপন্যাসের শেষে কেশবের সেই প্রত্যয়ী উচ্চারণ স্মরণযোগ্য : "সবার জীবন শুধরে দেবার লড়াই শুরু করব ঠিক করতে রোগ যেন অর্ধেক কমে গেছে। লড়াই আরম্ভ করলে নিশ্চয়ই আরোগ্য।"—

নাগরিক জীবনের প্রেক্ষাপটে লেখা 'কিনু গোয়ালার গলি', 'চেনামহল' কিংবা 'বারো ঘর এক উঠোন'-এ এই সামাজিক রূপান্তরের আশাবাদী সংকেত নেই। আমরা এখানে 'ক্রিটিক্যাল রিয়্যালিজম্' ও 'সোশ্যালিস্ট রিয়্যালিজম্'-এর সার্থকতার তুলনাত্মক বিচার করতে চাই নে। কেবল একই কালে, প্রায়-একই ধরনের জীবন-প্রতিবেশ থেকে আহৃত উপাদান নিয়ে লেখা উপন্যাসে সমাজ তথা জীবন-ভাবনার মৌল পার্থক্যের দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

'কিনু গোয়ালার গলি', 'চেনামহল', 'বারো ঘর এক উঠোন' এবং বিমল করের 'দেওয়াল' উপন্যাসে মানুষের নৈতিক তথা মনস্তাত্ত্বিক সংকটের যে সমকালীন বাস্তবতা-নির্ভর ছবি আছে তার মধ্যে পাই প্রথমত, নিদারুণ আর্থিক বিপন্নতার উপাদান ; এবং দ্বিতীয়ত, এক ধরনের পারিবারিক প্রেক্ষিত । এই-সব রচনার মাধ্যমে ঔপন্যাসিকরা যে যন্ত্রণাদীর্ণ অনুভবকে পাঠকের কাছে পৌঁছে দিতে চাইছেন তা এই যে— এ ধরনের আর্থিক তথা নৈতিক অর্থাৎ সর্বাত্মক অবক্ষয়ের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে মানুষের দাম্পত্য, পারিবারিক তথা সামাজিক সব সম্পর্কের বাঁধন দ্রুত শিথিল হয়ে যাচ্ছে । ক্রমশ আত্মসংবৃত তথা ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে উঠল মানুষ । বলা বাহুল্য, এরা নাগরিক, মধ্যবিত্ত মানুষ । পূর্বোক্ত উপন্যাসগুলি ছাড়াও এই সময়পর্বে আর-এক ধরনের উপন্যাস রচনার সূচনা হল, যার স্রোত ষাটের দশকের শেষ ও তার পরবর্তীকালে ক্রমশ আরো স্ফীত ও আবর্তসংকুল হয়েছে । কিন্তু সেই পর্ব আমাদের বর্তমান নিবন্ধের কালসীমা-বহির্ভূত । তবু ষাটের দশকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত প্রকাশিত উপন্যাসে এই প্রবণতা যে ইঙ্গিত বয়ে এনেছে, সে বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু বলা যেতে পারে । এই ধরনের উপন্যাসে পারিবারিক জীবনপট তেমন স্পষ্ট নয়, আর যেটুকু মেলে, তাও ব্যক্তির জীবন ও ব্যক্তিত্বের সঙ্গে শিথিলভাবে যুক্ত । আসলে পরিবারের কাছে এদের দায়বদ্ধতা নেই বললেই চলে । এ ধরনের উপন্যাসে অর্থনৈতিক সমস্যা আছে বটে এবং এদের অস্তিত্বের নানান সংকটের সঙ্গে উক্ত সমস্যার যোগ অলক্ষ্যও নয়, তবু 'বারো ঘর এক উঠোন' কিংবা 'দেওয়াল' উপন্যাসের মতো দারিদ্র্য-রাক্ষস-কবলিত নরনারীর নিদারুণ আর্থিক কষ্টের কথাই এখানে একান্ত মুখ্য হয়ে ওঠে নি । বরং এই-সব উপন্যাসের নায়ক বা প্রধান চরিত্রগুলির, যারা বয়সে অনেকেই নিতান্ত তরুণ, তাদের আত্মজিজ্ঞাসু সত্তার প্রবল আত্মসংঘাত তথা "ক্রাইসিস্ অব্ আইডেনটিটি"-র ওপরেই লেখক তীব্র সন্ধানী আলো ফেলতে চেয়েছেন । ব্যক্তির দ্বিধা, দ্বন্দ্ব ও প্রচল-মূল্যচেতনায়-প্রায়-সম্পূর্ণ অবিশ্বাস, তার আত্মদীর্ণ চেতনা, তার অসহায় আন্তরসত্তা, অন্যদিকে এইসব অন্তর্দাহ থেকে সাময়িক মুক্তির জন্য প্রচণ্ড যৌন ক্ষুধা চরিতার্থতার চেষ্টা, আবার এই গোটা পরিবেশ সম্পর্কে এক ধরনের সুতীব্র ঘৃণা ও বিবমিষা, নৈতিক পতনের উপলব্ধি-সম্ভব অন্তর্জ্বালা, এই সব-কিছু ; আবার এরই মধ্যে উত্তরণের ক্ষীণ, অনেক সময় হয়তো ব্যর্থ প্রত্যাশা— অর্থাৎ ব্যক্তির বহুধাবিদীর্ণ চেতনায় আধুনিক ঔপন্যাসিকবৃন্দ একালের সমগ্র অন্তর্জীবনের আত্মক্ষয়ী যন্ত্রণাকে প্রতিফলিত করতে চাইলেন ।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপন্যাসে ব্যক্তির আত্ম-অন্বেষণের ছবি এঁকেছেন । সেখানে দেখি 'চতুরঙ্গ'র শচীশ আপন অস্তিত্বের গূঢ় পরমার্থ সন্ধান করছে জীবনের পর্ব থেকে পর্বান্তরে চলতে চলতে । কিংবা 'ঘরে বাইরে'তেও দেখি, নিখিলেশ-বিমলা, বিশেষত বিমলা অন্তরঙ্গ স্বীকারোক্তির মধ্য দিয়ে আপন সত্তা ও সত্যের মুখোমুখি হয়েছে —আর তার মধ্য দিয়ে ঘটেছে ব্যক্তিসত্তার যন্ত্রণাবিদ্ধ উদ্ভাসন । কিন্তু আমরা জানি, এ-সব কাহিনী যখন লেখা হয় তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধই শেষ হয় নি । এর পর দুটি সর্বগ্রাসী বিশ্বযুদ্ধের ঝাপটায় আমাদের জীবনের যা-কিছু অমল বিশ্বাস ও মূল্যচেতনা সব ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে । বাইরের জগতে যেমন আমরা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তথা দেশ বিভাগে পরস্পরের কাছ থেকে আলাদা হয়ে গেছি এবং সেইসঙ্গে অনেকেই হয়েছে বাস্তুহারা ছিন্নমূল— তেমনি অন্তর্জগতেও আমরা ক্রমাগত হয়ে পড়েছি সামাজিক-পারিবারিক বা দাম্পত্য জীবনের বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন শিথিল-মূল অনিকেত মানুষ— 'এলিয়েনেটেড' ও 'রুটলেস' । একালের উপন্যাসে তাই সে-সব আত্মসংবৃত মানুষকে দেখি, তারা রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের আত্মসন্ধানী নরনারীর মতো নয়— এদের আত্ম-অন্বেষণের সঙ্গে জড়িয়ে আছে এদের অনেক বেশি গ্লানিকর পাপচেতনা ও দুষ্কর্মের ইতিহাস, আপন সত্তা থেকে ভ্রষ্টতার অনেক পঙ্কিল ও জটিল অভিজ্ঞতা । ব্যক্তির চার পাশে যে কদর্য জীবন-পট হতাশার অন্ধকারকে গাঢ়তর করে তুলেছে, তার মধ্য থেকে প্রতি মুহূর্তে বিষ-নিশ্বাস নিতে নিতে এদের সত্তার ভিতরে সেই কলুষ সঞ্চারিত হতে শুরু করে । আর তার ফলে তারা জড়িত হয়ে পড়ে স্থূল দেহকামনার উচ্ছৃঙ্খলতায়, এমন-কি, নৃশংস

হত্যাকাণ্ডে । এত গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে কোথাও নিশ্চয় নিহিত থাকে বিবেকী সত্তার স্ফুলিঙ্গের আভাস— আর তাই ব্যক্তিমানুষকে শেষ পর্যন্ত নিজর কাছেই স্বীয় কৃতকর্মের, তার 'বিকৃত' মানসিকতার জবাবদিহি করতে হয়। সমরেশ বসুর 'বিবর' ('৬৫), 'প্রজাপতি'('৬৭) ইত্যাদি প্রসঙ্গত উল্লেখ্য । বলা বাহুল্য, 'বি. টি. রোডের ধারে', 'শ্রীমতী কাফে'-র গণজীবনাশ্রয়ী কাহিনীর স্রষ্টা সমরেশ বসুর 'বিবর'-এ ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবনযন্ত্রণার কাহিনীর দিকে মোড় ফেরাকে একালের বাংলা উপন্যাসে এক বিস্ফোরক ক্রান্তিপর্বের সূচনা বলে অনেকে মনে করেন ।

আগেই বলেছি, এ ধরনের চরিত্রগুলির বেশির ভাগই তরুণ-তরুণী । প্রজন্মগত পার্থক্য বা 'জেনারেশন গ্যাপ'-এর যে সংকট, নিজেদের বিচূর্ণ আশা-স্বপ্নের যন্ত্রণা ও প্রায়-সম্পূর্ণ তিমিরাচ্ছন্ন ভবিষ্যতের জন্য আতঙ্কের কথা নিজেদের বৃত্তের বাইরে চার পাশের আর কারো কাছে পৌঁছে দেবার বা 'কমিউনিকেট' না করতে পারার যে অবরুদ্ধ অসহায়তা— তাই একালের বিশেষ শিল্প-প্রকরণে নানা উপন্যাসে আধারস্থ হয়েছে। এরা আর্থিক সমস্যা থেকে আদৌ মুক্ত নয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের সামাজিক পরিবেশে, তা সম্ভবও ছিল না । এই পরিবেশে যুবসমাজ হতাশায় বিভ্রান্ত, আর তারই ফলে অনেকে হয়ে উঠেছে কিছুটা উচ্ছৃঙ্খল । প্রচলিত নীতি-দুর্নীতির প্রভেদ এদের কাছে প্রায় মুছে গেছে । এরা পথে পথে অর্থহীনভাবে ঘুরে বেড়ায় এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দুর্মর দুরাকাঙ্ক্ষায় । এদেরই উন্মূলিত মূল্যবোধের কাহিনী বিধৃত হয়ে আছে 'যদুবংশে'র অভয়, কৃপাময় গণনাথ, নয়না-দের আখ্যানে— যাদের মূল্যচেতনা-হারা নিরর্থক জীবন সম্পর্কে বলা হয়েছে— "ওরা যা' বিকিয়ে দিতে চাইছে, ওরা তার মূল্য জানে না।" সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'আত্মপ্রকাশ' (১৯৬৬)-এও এই উদ্ভ্রান্ত তারুণ্যেরই ছবি। ১৯৬৭-তে প্রকাশিত 'প্রতিদ্বন্দ্বী'-তেও এই মানহারা বিক্ষুব্ধ তরুণসমাজের— যাদের 'ক্ষুধার্ত ও ক্রুদ্ধ প্রজন্ম' (hungry amd angry generation') বলা যায়, তাদেরই মর্মস্পর্শী বাস্তব প্রতিলিপি । অসীম রায়ের 'একালের কথা' ও 'গোপাল দেব' প্রসঙ্গত বিশেষভাবে উল্লেখ্য । এই-সব তরুণ 'বিবর' বা 'প্রজাপতি-'র নায়কের মতো 'নৈতিক স্খলনে'র অতটা অতল অন্ধকার গহ্বরে তলিয়ে যায় নি— যৌন অনাচার বা হত্যার অমন নিদারুণ কর্মকাণ্ডের সঙ্গে এরা জড়িয়ে পড়ে নি । সেদিক থেকে, একই কালের বিস্রস্ত যৌবনের দুটি স্তরের বস্তুনিষ্ঠ প্রতিফলন চোখে পড়ে এই দুধরনের উপন্যাসে।

বিশেষভাবে ষাটের দশকের বিস্রস্ত যুবসমাজকে নিয়ে লেখা এই দু ধরনের উপন্যাসের চরিত্রগুলির মধ্যে একটি গূঢ় মিল চোখে পড়ে । সেটি এদের নিহিত প্রতিবাদীসত্তা । প্রসঙ্গত স্মরণীয় ডেভিস ও সণ্ডারের উক্তি :

> "Every decade is associated with certain evocative images and symbols. The image of the 1960's is above all that of youthful rebellion...."[১]

'বিবর', 'যদুবংশ' কিংবা 'আত্মপ্রকাশে'র যুব-চরিত্রের মধ্যে কেউ কেউ নৈতিক দিক থেকে 'অসাড়তা' বা 'পক্ষাঘাত'গ্রস্ত 'অ্যান্টি-হিরো'র প্রতিফলন লক্ষ করেছেন । তৎসত্ত্বেও একালের সামগ্রিক যুবসমাজ সম্পর্কে সাধারণভাবে একথা বলা চলে যে, জীবন সম্পর্কে এই নিরর্থকতার বোধ, এই ছিন্নমূল চেতনা—হয়তো বলতে পারি, এক ধরনের অস্তিত্ববাদী দৃষ্টি, যা দেখা দিল এই সময়পর্বে, তার মধ্যে নিহিত আছে একটি সত্য । মানুষকে পুরাকথার সিসিফাসের মতো প্রয়াস তথা সংগ্রাম চালিয়ে যেতেই হবে— আর কোনো পথ নেই । এবং এখানেই তার জীবনের একমাত্র সার্থকতা । তরুণরা ভেঙে পড়ছে, বিচ্ছিন্ন-বিপর্যস্ত হয়ে যাচ্ছে— তবু এরই মধ্যে যেন জীবনের মহিমা খুঁজে পেতে চান লেখক । 'যদুবংশ' একেবারে নিশ্চিহ্ন হতে পারে না । কিংবা 'বিবরে' নিশ্ছিদ্র অন্ধকারই শেষ কথা হতে পারে না। কারণ এখনো মানুষের সত্তার গভীরে আত্মজিজ্ঞাসা জেগে আছে । এই আত্ম-অন্বেষণের ভিতর থেকেই এদের জীবনের এক ধরনের মূল্যচেতনা 'আত্মপ্রকাশ' করছে ক্রমশ । অর্থাৎ এখনো জীবন সম্পর্কে উপন্যাসের চরিত্রগুলির স্বপ্নের, প্রত্যাশার শেষ রেশটুকু হয়তো মুছে যায় নি—কারণ তা মুছে গেলে তো কোনো জিজ্ঞাসা বা অন্বেষণই আর থাকত না । এরা এখনো দেওয়ালে পিঠ দিয়ে লড়াই করতে

চায় প্রতিকূল পরিবেশের 'প্রতিদ্বন্দ্বী' রূপে— এরা নিরন্তর লড়াই করে চলেছে নিজের নিগূঢ় সত্তার সঙ্গেও।

বস্তুত, সার্ত্রের 'Nausea' কিংবা ফকনারের 'Sanctuary' বা আরো উত্তরপর্বের 'অ্যাবসার্ড' বা অ্যান্টি-নভেলে'র কথা মনে রেখে বলা চলে, আলোচ্য সময়পর্বে আমাদের জীবনের প্রতিরূপ যে বাংলা উপন্যাস, তা এখনো ওই সব পশ্চিমী রচনায় বিধৃত বিকলাঙ্গ মনুষ্যত্বের পঙ্গু রূপের অমন আত্যন্তিক পরিচয়বাহী হয়ে ওঠে নি।

এবারে বিপরীত কোটির আরেক দিগন্ত। যুদ্ধ-মন্বন্তর-দাঙ্গা-দেশবিভাগ ও তজ্জনিত নিদারুণ আর্থ-সামাজিক ও নৈতিক সংকট তথা প্রায়-বিপর্যস্ত মূল্যচেতনার আত্যন্তিক শূন্যতাবোধ থেকে ভিতরে ভিতরে মুক্তি চাইছিল বাঙালি মধ্যবিত্ত মন। অথচ মুক্তির আকাশ কোথাও চোখে পড়ছে না; যাঁরা লেখক তাঁদের মনও যখন সমস্যাভারে ক্লান্ত, অবসন্ন— তখন এই জীবন থেকে সাময়িক মুক্তির অবকাশ আনতে চাইলেন তাঁরা অতীত জীবনের প্রেক্ষাপটে কাহিনী সৃষ্টি ক'রে। এই-সব রচনার অনেকগুলিই হল বিবর্ণ-মলিন বাস্তবতা থেকে সরে গিয়ে অন্যতর এক বর্ণিল জীবনের অন্বেষণ। পঞ্চাশ-উত্তর বাংলা সাহিত্যে, বলা চলে, 'ইতিহাস'-আশ্রয়ী উপন্যাসের জোয়ার এল যেন হঠাৎ। এ ধরনের 'রোম্যান্স'ধর্মী রচনার শিল্পমূল্য যাই হোক, বাংলা উপন্যাস কেবল বর্তমানেই সীমিত না থেকে সময়সীমাকে দূর কালের দিকে ছড়িয়ে দিয়ে বিংশ শতকের বাস্তবতাপ্রধান বাংলা কথাসাহিত্যে এক নতুন 'ডাইমেনশন' যোগ করতে চাইল এই-সব রচনার মাধ্যমে। তবে এই-সব অতীত-আশ্রয়ী উপন্যাসমালার সবগুলিই তথাকথিত 'এস্কেপিজম্'-প্রবণ বা নিছক বর্ণিল-জীবন-চিত্রণধর্মী রচনা নয়। বিভূতিভূষণের 'ইছামতী' (১৯৫০) এর এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। বিগত শতাব্দীর প্রেক্ষাপটে নীল চাষের অনুষঙ্গে যে মর্মদাহী জীবনসমস্যা, আর তারই পাশাপাশি কৌলীন্যপ্রথা তথা বহু-বিবাহের যে সামাজিক বাস্তবতা— তাকে বিভূতিভূষণ আংশিক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বহুলপরিমাণে এক বস্তুনিষ্ঠ শিল্পসফল রূপ দিতে পেরেছেন, সন্দেহ নেই।

অতীতাশ্রয়ী জীবন নিয়ে তারাশংকরের যে-ক'টি উপন্যাস আছে, তার মধ্যে বিশেষভাবে স্মরণীয় সাঁওতাল-বিদ্রোহের পটভূমিতে লেখা 'অরণ্যবহ্নি' (১৯৬৬)। 'গন্নাবেগম', 'শক্করবাই', এমন-কি 'রাধা'-র মতো বর্ণবহুল অতিনাটক-প্রবণ রোম্যান্টিক গল্প ব'লে পাঠকের মনোরঞ্জন এখানে উদ্দেশ্য নয়, প্রবল অন্যায়ের বিরুদ্ধে অত্যাচারিত এক জনগোষ্ঠীর রুখে দাঁড়াবার বলিষ্ঠ অথচ মর্মস্পর্শী এক কাহিনী এই 'অরণ্যবহ্নি'। বিগত দিনের প্রেক্ষিতে রচিত আরেকটি ক্ষুদ্রায়ত উপন্যাসের শিল্পসাফল্য বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে। সেটি কমলকুমার মজুমদারের 'অন্তর্জলী যাত্রা' (১৩৬১)। কৌলীন্য প্রথা ও সহমরণের মতো কুসংস্কারের অমানবিক নিষ্ঠুরতার অন্ধকার দিকটি মৃত্যুর প্রেক্ষাপটে অনশ্বর জীবনতৃষ্ণার (সদ্যবিবাহিতা পত্নী যশোমতীর কাছে মুমূর্ষু বৃদ্ধ সীতারামের উক্তি— 'আমি...বাঁচব') স্পর্শে যে এক অত্যাশ্চর্য মাত্রা পেয়েছে, তা আমাদের স্তম্ভিত করে। বিষয়ানুগ ভাষার সাহায্যে ব্যঞ্জনাময় 'ইমেজে'র মাধ্যমে সমগ্র উপন্যাসের রহস্য-ঘেরা মায়াবী বাতাবরণের শিল্পসুষমা উন্মোচিত হয়েছে।

এ কালের নগর-কেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত মানুষের আর্থ-সামাজিক ও নৈতিক দিক থেকে ক্ষয়িষ্ণু পঙ্গু মধ্যবিত্ত জীবনের বিপ্রতীপতায় আমরা কেবল অতীতাশ্রয়ী কাহিনী নয়, আলোচ্য পর্বে আরেক প্রেক্ষাপটে-ধৃত ঋজু, সুস্থ জীবনের আলেখ্যও পাই। সেটি আঞ্চলিক পটভূমি-আশ্রয়ী উপন্যাস। কলকাতা মহানগরী বা শহরতলীর বুক-চাপা সংকীর্ণ পরিসর থেকে পাঠককে মুক্তি দিতে ঔপন্যাসিক তাঁর রচনায় আনলেন ভৌগোলিক পরিধির সীমা-বিস্তার। শৈলজানন্দ, তারাশংকর ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাসাহিত্যে যে আঞ্চলিক কাহিনীধারার প্রবর্তন করলেন, সেই ধারাই আরো দূরপ্রসারী অজ্ঞাতপূর্ব আঞ্চলিক জীবনকে আশ্রয় করে নানা রসবৈচিত্র্যে নগরকেন্দ্রিক বাংলা সাহিত্যের ক্লান্ত পাঠকসমাজকে আশ্বস্ত ও আকৃষ্ট করল। যে তারাশংকর বাংলা কথাসাহিত্যে আঞ্চলিক জীবনের অন্যতম প্রবর্তক, তাঁর হাতেই ঘটল এর পরমা সিদ্ধি। 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' (১৯৪৭)-য় মানুষ

ও তার পরিবেশের আলিঙ্গিত সম্পর্কটি অনিবার্য অচ্ছেদ্যতায় আবদ্ধ হয়েছে । কোপাই-তীরবর্তী বাঁশবাদি গ্রামের নিসর্গপটের সঙ্গে কাহার-গোষ্ঠীর নরনারীর জীবিকা ও আবহমান জীবনের— তাদের দুর্মর কুসংস্কার, লোকায়ত বিশ্বাস ইত্যাদির এক বস্তুনিষ্ঠ শিল্পসার্থক মেলবন্ধন রচনা করেছেন তারাশংকর ।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬) থেকে শুরু ক'রে অদ্বৈত মল্ল বর্মনের 'তিতাস একটি নদীর নাম' (১৯৫৬) কিংবা সমরেশ বসুর 'গঙ্গা'-র (১৯৫৭) মতো নদী-প্রকৃতিকে আশ্রয় ক'রে লেখা আঞ্চলিক কাহিনীগুলির পটভূমির অনুপুঙ্খ বাস্তবতার সঙ্গে ধীবর সম্প্রদায়ের নরনারীর জীবিকা ও জীবনচর্যার কেবল সার্থক সংগতিই নয়, এই তিনটি উপন্যাসেই নরনারীর জীবন তাদের পরিবেশের সঙ্গে এক অমোঘ নিয়তির আকর্ষণে আবদ্ধ । অবশ্য, এদের প্রত্যেকটিতেই মানবজীবন ও পরিবেশ-বিধৃত অদৃষ্ট-চেতনার সম্পর্কের স্বরূপ ও প্রকাশরীতি নিঃসন্দেহে আলাদা । আলোচ্য পর্বে লেখা তিতাস-এর মালোপাড়ার শান্ত গোষ্ঠী-জীবনের সঙ্গে নদীর স্নিগ্ধ আনুকূল্য এবং 'গঙ্গা'য় পাঁচু জেলে ও নায়ক বিলাসের ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে নদী-প্রকৃতির তথা রহস্যময়ী নিয়তিরূপী মৃত্যুর প্রতিস্পর্ধী সম্পর্ক উপন্যাস দুটিকে অবশ্যই স্বতন্ত্র্য মহিমায় মণ্ডিত করেছে ।

এই প্রসঙ্গে সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' (১৯৪৯-৫০) অবশ্যস্মরণীয় একটি শিরোনাম । ভৌগোলিক সীমানাকে বাংলার বাইরে প্রসারিত ক'রে বিহারের এক প্রত্যন্ত নিসর্গবেষ্টিত গ্রামাঞ্চলে নিয়ে এলেন সতীনাথ । তাৎমাটুলি-র তথাকথিত অন্ত্যজ শ্রেণীর ছেলে ঢোঁড়াই-এর জীবনে নিসর্গপট প্রতিকূলতা করে নি । কিন্তু দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও কুসংস্কারের জালে আবদ্ধ ঢোঁড়াই-এর জীবনে 'গানহি বাবা'র আবির্ভাব তার ঋজু প্রণোজ্জ্বল আন্তরসত্তাকে কীভাবে বলিষ্ঠ এক সত্যনিষ্ঠ জীবনবোধের দিকে অগ্রসর ক'রে দিল, রামায়ণের ছকে সেই জীবনচিত্রকে রূপায়ণ-প্রয়াসের মধ্য দিয়ে মৃত্তিকালগ্ন চিরায়ত দেশজ জীবনের সজীব রসমাধুর্য স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশের সার্থকতা পেয়েছে । মৃত্তিকাস্পর্শী আবহমান জীবনপ্রবাহের যে ছন্দ 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা', 'তিতাস একটি নদীর নাম' কিংবা 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'-কে প্রাণস্পন্দিত করেছে—বলা বাহুল্য, তার মধ্যে একটি ইতিবাচক জীবনদৃষ্টির আভাস পান পাঠক । এই প্রসঙ্গসূত্র অনুসরণ ক'রে এই পর্বের উপন্যাসের একটি বিশেষ মাত্রার দিক নির্দেশ ক'রে বর্তমান আলোচনা শেষ করতে পারি । এই দিকটির কথা আগেই আভাসিত হয়েছে । তবু আরেকটু স্পষ্ট করা যেতে পারে । আমাদের এই নিবন্ধে নানা প্রসঙ্গে বলতে চেয়েছি যুদ্ধোত্তর পর্বের উপন্যাসে নগরাশ্রয়ী দরিদ্র মধ্যবিত্ত মানুষের অর্থহীন বেঁচে থাকার, তাদের ক্ষয়িষ্ণু পঙ্গু জীবন-বিন্যাসের কথা— যাদের সম্পর্কে Aldridge-এর মন্তব্য যথার্থ মনে হয় —"modern man is still basically purposeless, ..the typical condition of modern man is still doubt, confusion and fear."[৩]

এই বিভ্রান্ত দিশাহারা নরনারীর দল—মধ্যবয়সী গৃহস্থ থেকে তরুণ-তরুণী— যারা "act and speak in a milieu of futility"—তাদের সব মূল্যচেতনা প্রায়-নঞর্থক এক ছিন্নমূল জীবনবোধের পরিণামী আবেদন জাগায় পাঠকচিত্তে ।

কিন্তু আলোচ্য পর্বের উপন্যাস সম্পর্কে এটিই শেষ কথা নয় । একালের বাংলা উপন্যাসে নগরই তো একমাত্র প্রেক্ষাপট নয়, সংকীর্ণ নগর-সীমার বাইরে ছড়িয়ে আছে সুদূরপ্রসারী-গ্রামীণ জীবন । এই 'গ্রামে-গাঁথা' দেশের খেটে-খাওয়া মানুষের দল, রক্ত-জল-করা দুঃসহ শ্রমের বিনিময়েও যাদের প্রতিদিন দু'বেলা অন্ন জোটে না —গণনার অতীত সেই মাটি-ঘেঁষা মানবগোষ্ঠী নিদারুণ দারিদ্র্য-বঞ্চনা-শোষণ সত্ত্বেও স্নেহ-প্রেম-মমতার মতো মৌল মূল্যচেতনাকে হারায় না । আবহমান ধর্ম, লোকাচার, সংস্কার ইত্যাদিতে বিশ্বাসের শিকড় তাদের সত্তার গভীরে তখনো দৃঢ়-প্রেথিত । তারা নাগরিক মধ্যবিত্তের মতো 'এলিয়েনেটেড' বা 'রুটলেস' হয় না অজস্র বিপন্নতা সত্ত্বেও । তাদের অস্তিত্বকে পরিব্যাপ্ত ক'রে স্থির নক্ষত্রের মতো জেগে থাকে জীবন সম্পর্কেএক ইতিবাচক মনোভঙ্গি ।

এই মনোভঙ্গির সঙ্গে একদিকে যেমন জড়িয়ে আছে তাদের আবহমান বিশ্বাস ও মূল্যবোধ, তেমনি তাদের সমবায়ী জীবনযাপন—গৃহ, পরিবার কিংবা ধর্ম যাদের এক না হলেও জীবিকা ও জীবনাচরণে যারা অনেকাংশেই সন্নিহিত ও সমষ্টিবদ্ধ । গ্রামীণ সমাজের এই-সব জীবনপ্রত্যয়ী অগণ্য মানুষের বিস্তৃত প্রেক্ষাভূমি গড়ে উঠেছে নগরকেন্দ্রিক উপন্যাস রচনার সমকালীন তারাশংকরের 'গণদেবতা' (১৯৪২) ও 'পঞ্চগ্রাম' (১৯৪৪)-এ, অতীতাশ্রয়ী হলেও, একালেও যে উপন্যাস প্রাসঙ্গিক, বিভূতিভূষণের সেই 'ইছামতী'তে (১৯৫০), সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' (১৯৪৯–৫০), অমিয়ভূষণ মজুমদারের 'গড় শ্রীখণ্ড' (১৯৫৭), গুণময় মান্নার 'লখিন্দর দিগর' ইত্যাদি উপন্যাসে ।

আমাদের আলোচ্য সময়বৃত্তের বাইরে পূর্ব বাংলা-থেকে-আসা বাস্তুহারা মানুষের চেতনায় শৈশব-কৈশোর জীবনের জন্য যে করুণ মধুর 'নস্ট্যালজিয়া', তার চিত্রণ আছে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে', প্রফুল্ল রায়ের 'কেয়াপাতার নৌকো' কিংবা শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'উজান' উপন্যাসে । এই 'নস্ট্যালজিয়া' আসলে নিজেরই নিহিত সত্তার কাছে উজান বেয়ে ফিরে যাওয়া, যে সত্তা ছিল বাসনায় ও বিশ্বাসে শুদ্ধ আর অমলিন ।

ষাটের দশকের মধ্যভাগে, যা আমাদের আলোচনার সময়-সীমান্ত, এই সময়কালে রচিত যে-সব উপন্যাসের কথা একটু আগে বলেছি, সেগুলি কেবল জীবনপ্রত্যয় আর মূল্যবোধের দিক থেকে অস্তিবাচক নয়, কোনো কোনো রচনায় আরো একটি দৃষ্টিভঙ্গির অনতিস্পষ্ট ইশারা আছে । বঞ্চনা ও বিড়ম্বনা, শোষণ ও পীড়নের অন্ধকারের মধ্যে আগামী দিনে সূর্যোদয়ের জন্য যে অতন্দ্র প্রতীক্ষা, শুধু নিরুচ্চার প্রতীক্ষা নয়, কোথাও বা তা প্রতিবাদী বিক্ষোভে ফুঁসে উঠতে চেয়েছে, তারই ইতস্তত সংকেত ছড়িয়ে আছে 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম', 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' কিংবা 'লখিন্দর দিগর'-এর মধ্যে । দারিদ্র্য-দীর্ণ, বঞ্চনা-বিড়ম্বিত ধূলিমলিন এই গণজীবন থেকে উজ্জ্বল উদ্ধারের বলিষ্ঠ প্রত্যয়ী চেতনার প্রতিফলনের মধ্যেই নিহিত মানুষের উত্তরণের চিরায়ত স্বপ্ন ।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপন্যাসে এই গ্রামীণ গণজীবনের ছবি আঁকেন নি সত্য, কিন্তু মানুষের প্রতি যে-বিশ্বাসকে তিনি আমৃত্যু রক্ষা করতে চেয়েছেন সমগ্র সত্তা দিয়ে, সেই বিশ্বাসের সুর জীবন-পরিবেশের নানা পালাবদল সত্ত্বেও তাঁর উত্তরসূরিদের অনেকের রচনায় অশ্রুত নয়, আর সেখানেই— সেই আবহমান মানবপ্রত্যয়ের গ্রন্থিবিন্দুতেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর উত্তরসূরিদের মেলবন্ধন ।

উল্লেখসূত্র

১. সাহিত্য সংখ্যা দেশ, ১৩৮২

২. A. Sinfield ed. *Society and Literature. 1945-70*, p. 42

৩. Aldridge, *After the Lost Generation*, p 90

উপন্যাস

২

ভাঙা প্রতিমা : বিপন্ন বেদী

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

যদি ছ'য়ের দশকের গোড়ার দিকে দাঁড়িয়ে আমরা তার আগের তিরিশ বছরে বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসের দিকে তাকাই তা হলে দেখি মাঝে মাঝে পরস্পর-আশ্লেষী হলেও স্পষ্ট দুটি ধারা সমান্তরাল বয়ে চলেছে । একটি ধারা সমাজ-বাস্তবতাকে অঙ্গীকার করে বহমান । আরেকটি ধারা ব্যক্তির অন্তরলোকের গহনের বার্তাবহ । একটি ধারা চরিতার্থতা খুঁজছে জীবননির্ভরতায় । আরেকটি ধারা শিল্পসার্থকতাকে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অগ্রাধিকার দিয়েছে ।'গোরা' আর 'চতুরঙ্গ' থেকেই এই দুই ধারার সমান্তরলতার শুরু । 'শহরতলী' এবং 'চতুষ্কোণ', 'একদা' এবং 'উনপঞ্চাশী'-'পঞ্চাশের পথে', 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' এবং 'অচিনরাগিণী'— এ-সব তো গেল এক-একজন লেখকের দুই ধারাতে সমান গুরুত্বে উপস্থিতির নিদর্শন । অন্যভাবেও লক্ষ্য করি 'সাড়া' এবং 'পটলডাঙার পাঁচালী', 'রাত্রি' এবং 'চৈতালী ঘূর্ণি', 'তিতাস একটি নদীর নাম' এবং 'অজয়', 'লখিন্দর দিগার' এবং 'মীরার দুপুর', 'ত্রিধারা' এবং 'এই তার পুরস্কার'— কখনো কাছে কাছে কখনো দূরে দূরে দুই ধারা বহে চলেছে । চারের-পাঁচের দশকে বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যে একটি লক্ষণ আস্তে আস্তে একটি বৃহৎ বিভাজনরেখা সৃষ্টি করল । বড়ো প্রকাশনসংস্থার আনুকূল্যে ও আহ্বানে বেস্ট সেলার্স একদল ঔপন্যাসিক দেখা দিলেন । অমিয়ভূষণ মজুমদার কোনোদিন বেস্ট সেলার নন । বিমল মিত্র বাজারে পড়তে পায় নি ।

এখানে একটা কথা বলা দরকার মনে করি । য়ুরোপে কেউ কেউ শিল্পশুদ্ধ উপন্যাস লিখেও বেস্ট-সেলার প্রায় হয়ে উঠতে পারেন । সেখানকার পাঠকমণ্ডলীর মধ্যে ওপরে নীচে শিক্ষার একটা সমানুপাতিক সংগতি আছে । এখানে তার অভাব খুবই । ফল হয়েছে, এখানে অমিয়ভূষণের (আমি নাম দুটি এখন প্রতীকী অর্থে ব্যবহার করছি) অনুরাগীরা কখনো বুঝতে চান নি, কেন অ্যাভারেজ পাঠক বিমল মিত্র বলতে অজ্ঞান । বিমল মিত্রের পাঠকরাও ধরতে পারেন না 'ফ্রাইডে আইল্যাণ্ড' বা 'মধু সাধুখাঁ' লেখার বস্তুত দরকার কোথায় । এমন কথা যদি কেউ বলেন, অমিয়ভূষণ শুধু নিজের জন্যই 'ফ্রাইডে আইল্যাণ্ড' লিখেছেন, উল্টোদিক থেকে যদি কেউ বলেন বিমল মিত্র কি নিজে একবারও 'বেগম মেরী বিশ্বাস' পড়েছেন— ডুমার ছেলে যে কথা ডুমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন— তা হলে কোনোপক্ষের উপরই রাগ করা যাবে না । গত পঁচিশ বছরের বাংলা উপন্যাসের গতিপ্রকৃতি বুঝে নেবার জন্যই এ কথাগুলি প্রাসঙ্গিক ।

একটা প্রশ্ন উদ্‌বেল হয়ে উঠতে বাধ্য— চারের দশকের বেস্ট সেলার ও শিল্পাভিপ্রায়ী (বা 'নভেল প্রপার'-এ) যে ব্যবধান ছিল, আজও তা আছে কিনা । আমার বয়সী পাঠকদের মনে থাকার কথা, চারের দশকে ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়ের 'আকাশবনানী জাগে' 'ভাগীরথী বহে ধীরে' প্রভৃতি উপন্যাস কী পরিমাণে লাইব্রেরিতে রিকুইজিশন স্লিপে সতত চাহিদার সামগ্রী ছিল । তারাশংকরের বিশুদ্ধ ঔপন্যাসিক প্রয়াসকে সে জায়গায় অনেক ধীরে ধীরে

বেড়ে উঠতে হয়েছে । প্রকাশন সংস্থার ক্যাশ কাউন্টারে যিনি বসেন, তিনি সেদিন জেনেছিলেন একটা সোজা সত্য কথা । ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায় আজ আছেন, কাল নেই । তারাশংকর প্রতিদিন ক্যাশমেমো কাটালেন, কাটাচ্ছেন কাটাবেন । কিন্তু এখনকার চেহারাটা আলাদা । যদি 'বেস্ট সেলার' এই অভিধায় আমরা বিমল মিত্র বা 'শঙ্কর'কে ধরিই তা হলে তাঁদের তিন দশকব্যাপী জনপ্রিয়তা আমাদের একটা প্রশ্নের সম্মুখে দাঁড় করিয়ে দেয়, রিডিং পাব্‌লিকের ক্রমবর্ধমান পরিধির অনেকাংশই তাঁরা জয় করে নিচ্ছেন কোনো মন্ত্রে— তাঁরা তো মার্কিন বেস্টসেলারদের মতো সেক্স + থ্রিল + প্রেমের যৌগমিলনে এক বিচিত্র হামবুর্গার সৃষ্টি করেন না । তা হলে ? এই তা হলেটার কাছে আমাদের নানা জিজ্ঞাসাচিহ্ন । সমরেশ মজুমদারের 'জনসমক্ষ' এবং দিব্যেন্দু পালিতের 'সহযোদ্ধা' একই দশকের সহোদর কীভাবে, তাও তো জানবার কথা ।

দুই

১৯৬৫ সালে 'বিবর' লিখলেন সমরেশ বসু । তখনো বাংলাসাহিত্যে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো সহৃদয় লেখক লিখছেন 'তুঙ্গভদ্রার তীরে'-র মতো বিনোদক উপন্যাস । বিমল মিত্রের কাঠামো-সজাগ নিখুঁত রচনা তখনো বাঙালি পাঠককে ধরে রাখছিল । 'বিবর' সবলে টান দিল পাঠককে । বাংলা উপন্যাসের সৌধে ফাটল এবার অমোচনীয় হয়ে উঠল । যে স্থিতিসাম্য ভিতরে ভিতরে অনেকদিন ধরে বিপন্ন হয়েছে, তা এবার ভাঙনের মুখোমুখি । এই সময়বৃত্তের মধ্যে বেরিয়েছে কমলকুমার মজুমদারের 'অন্তর্জলীযাত্রা' । 'বিবর' আর 'অন্তর্জলীযাত্রা'-র মধ্যে মিল-অমিলের প্রশ্নই ওঠে না— কেননা প্রসঙ্গেপ্রকরণে প্রভূত ব্যবধান । কিন্তু ঊনবিংশ শতকীয় বাতাবরণে লেখা উপন্যাসে যখন আসর জমজমাট, কমলকুমার তখন তা থেকে পিছিয়ে গিয়ে একটা বিষয়বস্তু তুলে নিলেন ; একটা টেক্‌নিকের অব্যর্থ ভাষায় সঞ্চারিত করলেন জীবনের দ্বন্দ্বময় সমগ্রতার অশান্ত স্বরূপ । আরোপিত রূপকার্থটি আমাদের— রূপ সৃষ্টি করেছেন কমলকুমার । 'বিবর' উপন্যাসেও সমরেশ বসু দেখালেন মধ্যবিত্ত জীবনসর্বস্ব, মধ্যবিত্ত নীতিসংঘর্ষসম্বল, মধ্যবিত্ত রোম্যান্টিকতার অবসাদ কোথায় তাকে পৌঁছে দিল । অর্থাৎ কমলকুমার এবং সমরেশ— দুই সমীক্ষক শিল্পী সময়ের স্পন্দনকে ধরতে চেয়েছিলেন— সেই সময়, যা ছয়ের দশকে আবর্তসংকুল এবং কীর্তিনাশা হয়ে উঠতে গিয়ে মূর্তি ভাঙাভাঙির খেলায় মেতে উঠবে ।

সুপার স্ট্রাক্‌চারে যখন এমন বোঝাপড়া চলছে, ইনফ্রাস্ট্রাক্‌চারে তখন নানা মোচড় আকুঞ্চন ও প্রসারণে এক ভূমিকম্পের ভূমিকা সৃষ্টি করছে । উত্তরবাংলার আকাশে এক কোণে তখন নতুন নক্ষত্রের নাম নকশালবাড়ি। অনেক চ্যালেঞ্জ, অনেক সংঘাত প্রতিবাদ সেই নক্ষত্রের প্রভাবে বিস্ফোরিত হবে । ১৯৬৫-তে বেরিয়েছে 'বিবর' — যে বছর বেরিয়েছে, সেই বছরই চারু মজুমদার নকশালবাড়ি আন্দোলনকে স্বতঃস্ফূর্ততা থেকে মুক্ত করে তাকে একটা সংহতমূর্তি দিতে চাইলেন । 'বিবর' নিজেও ভেঙে দিতে চেয়েছিল অনেক পুরোনো সংস্কার, রুচি সংস্কার, শুচিসংস্কার নীতি সংস্কার । বাইরে নকশালদের মূর্তি আক্রমণ দেখে আমাদের চমকিত হওয়া, আর 'বিবর'-এর বুর্জোয়া সংস্কারকে মূলে-স্থূলে আক্রমণে আমাদের আঁতকে ওঠা অবশ্যই একার্থক নয়, একাভিপ্রায়ীও নয়। কিন্তু বাইরের ঘটনা আর অন্তরের আলোড়ন একটা কথাই প্রমাণিত করে— আমাদের উত্তরাধিকার কালের হাতে এবার দেউলিয়াদলিল তুলে দিয়ে শূন্য হতে চলেছে । অনেকদিন ধরেই এই সমাসন্ন শূন্যতার সঙ্গে বোঝাপড়া চলছিল । খণ্ডিত দেশজননীর হাত ধরে যে-স্বাধীনতা ভারত-ইতিহাসে প্রবেশ করল, সে কোনো নতুন স্বপ্ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হল না । দেশবিভাগের অব্যবহিত পরে ভারতীয় কম্যুনিস্টপার্টির সচিবপদ থেকে পুরণচাঁদ জোশির বিদায় ও রণদিভে-নীতির প্রতিষ্ঠায় সর্বপ্রথম দেখা গেল 'সমুদ্রের আন্দোলন বান-ডাকা সন্ত্রাসে নিঃশেষ' হয় কীভাবে । সুতরাং ভারতীয় কম্যুনিস্টপার্টি নির্বাচনী রাজনীতিতে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবের স্বপ্ন জড়িয়ে যেতে

শুরু করল। স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর রাশিয়ার দ্রুত পটপরিবর্তন, অস্তালিনীকরণের ঢেউ এদেশে কম্যুনিস্ট বুদ্ধিজীবীদের যেমন একদিকে অন্তর্ভাবলীন করে তুলল, আশাহত মধ্যবিত্ত যুবকও তেমনি তার অবচেতনের গহনে পড়ে থাকা স্বপ্নের ভাঙা টুকরো হাতে নিয়ে রক্তাক্ত হলেন। সুতরাং 'আত্মপ্রকাশ'-এ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, 'পারাপার'-এ শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, 'বিবাহবার্ষিকী'-তে দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'শব্দের খাঁচায়'-এ অসীম রায়ের চরিত্রেরা খণ্ডবিখণ্ড অস্তিত্বের শতধা মুকুরে অন্তর্বাস্তবতা ও বহির্বাস্তবতাকে বুঝে নিতে চেয়েছেন। এর চাপ যেমন ছিল ভিতরে, এর তাগিদ তেমনই ছিল বাইরে। সেই ভিতর-বাহিরের কাটাকুটিতেই অনিবার্য হয়েছে উপন্যাসের আকৃতি ও প্রকৃতির পরিবর্তন।

নায়ক চরিত্রের অন্তঃসমীক্ষায় উপন্যাস আর কোনোমতেই হতে চাইল না সমাপ্তিতে সংবৃত। অভিজ্ঞতামাত্রেই উন্মুক্ত। কেউ বলতে পারে না কোথায় তার আরম্ভ, কোথায় তার শেষ। ভারী ঘটনার গুরুত্বে তার পরিমাপ হয় না। তথ্যজ্ঞান মাত্র অ্যাকাডেমিক। অভিজ্ঞতা মানসিক। সেই মানসিক অভিজ্ঞতার টানে একদিকের বাংলা উপন্যাসে অন্তর্লীনতা প্রাধান্যবিস্তার করেছে। বিমল করের উপন্যাসে সেই অন্তর্লীনতা গূঢ় সংকেতে গভীরভাষী হয়ে উঠেছে। তার মানে এ নয়, বিমল করের উপন্যাস ঘটনাদীন। সেখানে বড়ো ঘটনা বা ছোটো ঘটনা এই মাপের কোনো বাটখারা নেই— এটাই কথা। কারণ অভিঘাতটাই সেখানে আসল ব্যাপার। তাঁর উপন্যাসের গদ্যশৈলীতেও সেই অন্তর্গূঢ় অভিঘাতের মৃদু অথচ পরিমার্জিত স্পন্দন। মেজরাপের দাপট তাঁর গদ্যে কখনো তারের সূক্ষ্ম ঝংকারকে চাপা দেয় না। আমাদের আলোচ্য কালসীমায় লেখা হয়েছে, তাঁর একখানি উপন্যাস ধরে একটু এ প্রসঙ্গকে বিস্তারিত করছি। উপন্যাসটি 'অশেষ'। বিমল করের 'যদুবংশ' বা 'পূর্ণ অপূর্ণ' যেমন তাঁর জীবনকে বুঝে নেবার দুই স্বতন্ত্র প্রয়াস, 'অশেষ' সেই ধারায় নতুন সংযোজন। গূঢ় সংকেতে নামকরণটি এক গভীরের দিকে আমাদের দৃষ্টি টানে। বিমল কর যে দিকে ব্যক্তির অন্তর্জগৎকে ছুঁয়ে থাকেন, 'অশেষ' সে দিকের গল্প। পুরানো বন্ধু অশেষ অনেক দিন বাদে মিলনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। মিলনের ঘরে এখন শচীর মতো পরিতৃপ্তির প্রতিমা। এইটুকু আয়োজনকে নিয়েই আস্তে আস্তে পর্দাগুলি কাঁপতে থাকে, আমাদের কাছে ধরা দিতে থাকে পরিচয়ের আড়ালে যা অপেক্ষমাণ। ব্যক্তির অশেষত্ব ব্যঞ্জিত হতে থাকে। 'মুখ দেখে সুখ বোঝা যায় না' অথবা 'জ্বর দেখলে জ্বর বাড়ে'— গল্পের প্রসঙ্গে অনিবার্য এই-সব বাক্যবন্ধেও আভাসিত হয় ব্যক্তির বেদনার অশেষত্ব। এ জাতীয় উপন্যাসের কাঠামো-বিন্যাসটিও অন্তর্গূঢ়। কুমকুম এপিসোডকে সামনে আনা হয় নি। প্রত্যক্ষ করা হয়েছে শচী-বৃত্তকে। একদিন 'খড়কুটো', 'অসময়', 'যদুবংশ' প্রভৃতি উপন্যাসে মৃত্যুচেতনা বিমল করকে জীবনভাষ্য গড়ে তুলতে প্রধান উপাদান জুগিয়েছিল। লেখক তাঁর ব্যক্তিগত আত্মসমীক্ষায় এই প্রবণতার একটা কার্যকারণ ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করেছিলেন। তিনি বলেছেন শারীরিক রোগভোগের কথা, পারিবারিক মৃত্যুর কথা, স্নায়বিক চাঞ্চল্যের কথা। কিন্তু ক্রমশই দেখা গেল দেহদশাধীন মানবিক অসহায়তাকে ছাড়িয়ে বিমল কর ধীরে ধীরে পৌঁছে গেছেন মানুষের পরম প্রতীতির কাছে— সে প্রতীতি হারিয়ে গিয়েও হারায় না। 'বেদনাপর্ব' উপন্যাসটি তাঁর প্রধান প্রতিনিধি হবার দাবি রাখে না হয়তো, কিন্তু আজকের বিমল করের বিবর্তিত মানসিকতার পরিচয় সেখানেও পাওয়া যায়।

সময়ের ছাপ উপেক্ষা করে কোনো লেখক এগিয়ে যেতে পারেন না। কথাটিকে অন্যমাত্রায় বলেছিলেন রমাপদ চৌধুরী। 'বনপলাশীর পদাবলী' থেকে 'এখনই', 'যে যেখানে দাঁড়িয়ে' থেকে 'খারিজ'— সেই একই মাত্রা। তিনি বলেন— "শুধুমাত্র মৃত্তিকাগন্ধের জীবন নয়, যে জীবন আত্মদ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত, যে জীবন বাইরের জীবনের সঙ্গে একহাতে, নিজের আত্মবিরোধের সঙ্গে আরেকহাতে অবিরত পাঞ্জা লড়ে চলেছে, আমি তারই ভাষ্যকার হতে চেয়েছি।" তাই তিনি 'অভিমন্যু'-তে প্রতিফলিত করেন আধুনিক জীবনের একটা জটিল ক্ষতচ্ছবি। 'বাহিরি'-তে তাঁর বলার কথা চলে যায় আরো গভীরে। টেকনিকের গভীর ভাষায় 'বাহিরি' একটি সম্পর্কের দর্পণে

প্রতিফলিত করেছে বাঙালি মধ্যবিত্তমানসের ভিতরকার ছবি। এক অন্ধ ভিখারির হাতুয়া বাচ্ছা ছেলেটি আশ্রয় পেয়ে গেল দয়াময়ীর করুণায় সুধাময়বাবুদের সংসারে। দয়াময়ীর সহজ মাতৃসুলভ মমতায় তাদের সংসারে নাম পেল বংশী— দেখতে দেখতে নিজেকে চেনবার ভূমিকা পেতে শুরু করল। বংশীর নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রতিক্রিয়াটাই 'বাহিরি' গল্প। এক হিসাবে এ গল্প যেন বিমল করের 'অশেষ' গল্পের বিপরীত কথা। নেওয়া যেমন সহজ নয়, দেওয়াও তেমন সোজা ব্যাপার নয়। মুহূর্তের আবেগে দেব বলা যায়, কিন্তু দেবার ঝক্কি আরো বেশি। কেননা যাকে দিচ্ছি, সে যে চিরকাল আমার দানের অহমিকা তোষণ করেই চলবে, একথা কে বলেছে ? অথচ মানুষের এই স্বভাবও দুর্মর— মমতায় হোক ভালোবাসায় হোক, আমরা অপরকে বেঁধে ফেলতে চাই। রাসেলের একটা কথা মনে পড়ছে— আমাদের ভুল এখানে যে, আমরা নিজেকে মুক্ত করার চেয়ে অপরকে বাঁধতে বেশি ভালোবাসি। যে ছেলেটিকে দয়াময়ী পথ থেকে কুড়িয়ে নিয়ে এলেন, সে ধীরে ধীরে বংশী হয়ে উঠল, হয়ে উঠল বংশীধর অধিকারী— শেষে তার মিঃ বি. ডি. অধিকারী হওয়াও কেউ রুখতে পারে নি। কিন্তু গল্প তো সেটা নয়। গল্প হল বংশীর উপরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সুধাময়বাবুদের সংসার-সদস্যদের চমকে চমকে ওঠা। এমন-কি যে সুধাময় জানেন, 'ডেভিড হেয়ারের পাল্কির পিছনে পিছনে ছুটে তো সব ভদ্রলোক হয়েছিস', তিনিও স্কুলফেরতা বংশী 'বাবু' ডাক বিসর্জন দিয়ে 'মেসমশাই' সম্বোধন করলে চমকে ওঠেন। আমাদের স্নেহ ভালোবাসা বা ঔদার্যের খাঁচায় পোষা পাখিগুলি ডানা ঝাপটালে আর আমাদের ভালো লাগে না। সুতরাং একমাত্র দয়াময়ী বুঝি নিজের স্নেহের গৌরব কতকটা ধরে রাখতে পেরেছিলেন। অন্যেরা বুঝত বাহিরি ভেতর থেকে আলগা হয়ে যাচ্ছে অথবা সে কোনোদিনই ভেতরে আসে নি। হোমটাস্কের জন্য বিভার ফরমাশ না খাটা বাড়ির ছেলে হলে গৌণ হত। সে বাইরের বলেই কথাটা কেউ ভোলে না। দয়াদাক্ষিণ্য আমাদের ভদ্রয়ানার শৌখিন তবক। নিচেতলার মনুষ সমানাধিকার চাইলেই সেই তবকে টান পড়ে। কৃতকর্মা বংশী পরবর্তী সময়ে মাঝে মাঝে দয়াময়ীদের পরিবারে এলে একদা স্নেহের পসরা যিনি মেলে ধরেছিলেন, তিনি তো সংকুচিত হয়ে যানই, সঞ্জয় এবং অন্যেরাও শামুকের মতো গুটিয়ে যায়। গল্পটি শুধু এই মাত্রাতেই সমাপ্ত হয় নি। সমাপ্তির প্রাক্‌কালে গল্পটির তাৎপর্যে আরেকটি মাত্রার ইশারা লাগে। সঞ্জয়ের কর্মস্থলে তার পাওনা পদোন্নতি সহসা আটকে যায়। চাকুরে বাঙালের পক্ষে এর থেকে বড়ো সংকট আর হয় না। সংকটের কারণ বাইরে থেকে লোক আনা হবে— এবং সে লোক মিঃ বি. ডি. অধিকারী— বংশীধর— বংশী— সেই হাতুয়া ছেলে। সঞ্জয়ের পেটি বুর্জোয়া মানসিকতা প্রায় ভেঙে পড়বার জোগাড়। ছিঁড়ে গেল উনিশের শতকের ইংরেজের পোষ্যপুত্রসুলভ সমস্ত মুখোশ— 'শালা অচ্ছুতের বাচ্চা'। কিন্তু এখানেই রমাপদবাবুর কৃতিত্ব যে, গল্পটাকে তিনি আরেকটু এগিয়ে নিয়ে গেছেন। মিঃ বি. ডি. অধিকারী এ অফিসে এলেন না, তাঁর না আসার হেতু তিনি তাঁর অতীতের মুখোমুখি হতে চান না। তিনিও তাঁর অবাঞ্ছিত স্মৃতিটাকে বাহিরি করে দিতে চান। এ গল্প কারো উদারতা বা মহত্ত্বের গল্প নয়— বিচ্ছিন্নতাসর্বস্ব মধ্যবিত্তের সদাতঙ্ক সংশয়ের গল্প। খুব জরুরি গল্প। কিন্তু এ গল্প তারিফ করে পড়ার পরেও কলিং বেল বাজলে কি দরজা খুলতে ছুটে যাব ? মনে হয় না। যে ঔদাসীন্যে অথবা আলস্যে শুভার বাবাকে কি বংশীকে আমরা দাঁড় করিয়ে রাখি, তা সে আমাদের স্বভাবগত।

গত পঁচিশ-ত্রিশ বছরের বাংলা উপন্যাসের বিবর্তন-বিকাশের ইতিহাস বিচারে আমরা অবশ্যই মনে রাখি, শিল্পের টেকনিকের ইতিহাস বিচ্ছিন্ন একক ইতিহাস নয়। সামাজিক ইতিহাসের জটিল ও অন্তর্গামী নানা ঘাত-সংঘাতের বিষয়ে অবহিত থেকে সে ইতিহাসকে বুঝে নিতে গিয়ে আমরা দেখি, ব্যক্তির চেতনা পরিধি ও গভীরতায় বেড়েছে ভিতর-বাহিরের টানাপোড়েনে। সমরেশ বসু এই তিন দশকের সব থেকে আলোড়ক লেখক। এ কারণে তিনি সবচেয়ে আলোড়ক যে, তিনি তাঁর সমসময়ের ঢেউ এবং চোরাটানের ধাক্কা, প্রতিক্রিয়ার সম্মুখে ব্যক্তির লড়াইকে

এবং তার অসহায়তাকে সমানভাবে তুলে ধরতে চেয়েছেন। 'মহাকালের রথের ঘোড়া' স্বাভাবিকভাবে 'স্বীকারোক্তি'-র পরের কথা। 'শিকল ছেঁড়া হাতের খোঁজে', 'দশদিন পরে', 'খণ্ডিতা'— প্রত্যেকটি উপন্যাসে সমরেশ শুধুই নতুন নয়, ব্যক্তির গভীর থেকে উৎসারিত প্রশ্নকে জীবন্ত এবং তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর করেছেন। আলাদা করে উল্লেখ করব 'পুনর্যাত্রা'। সময়ের একটি পুরানো গিঁট এবং নতুন গিঁটকে ঠিকভাবে ব্যবহার করে লেখক অষ্টাদশ শতাব্দীর ও বিংশ শতাব্দীকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছেন। পার্টি আর পুলিশ দুইই আমার নিয়তি — একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান বিশ্বের সর্বত্রশায়ী বিপন্ন ব্যক্তির নিঃসঙ্গ স্বগতোক্তি গাঢ় হয়ে ওঠে। এখানেই সমরেশ বসুর টেক্‌নিকের বৈচিত্র্যেরও উৎস। ব্যক্তিগুলি এক-এক মাত্রায়, এক-এক পরিস্থিতিতে, এক-এক পরিবেশে, এক-এক ভাবে নিজ নিজ নিয়তির প্রতিস্পর্ধী হয়ে উঠেছে। তাদের সংকটের জটিলতায় তাই এত পৃথক পৃথক ধরনের অগ্নিকুণ্ড সৃষ্টি হল— তার আভায় তাদের মুখাবয়ব আলাদা আলাদা হয়ে যায়। তাই ভাষায়, গল্পের বুনুনিতে, কথকী চালে এত ভঙ্গিবিভিন্নতা। এ কারণেই তিনি গত পঁচিশ বছরের সব থেকে মহদভিপ্রায়ী কথাকার। আমরা অপেক্ষাকৃত গৌণ সৃষ্টি একটি উপন্যাস ধরে তাঁর মানবিক সমবেদনার একটি দিক বুঝে নিতে চাইব। এখানে তিনি পরিস্থিতির সমীক্ষক। 'বিজন বিভূঁই' একটি শ্বাসরোধী পরিস্থিতির প্রতিচ্ছবি। ব্যক্তির বিরুদ্ধে আধুনিক সভ্যতার যা-কিছু আয়োজন— এরকম ধরনের একটা বক্তব্য কখনো গাঢ়ভাবে, কখনো আবছায়ায় সমরেশ অনেকবার বলেছেন। বেশ কয়েকবার বলেছেন প্রতিকূল সমাজ রাষ্ট্র কীভাবে কোন্ মাত্রায় ব্যক্তির স্বাধীনতাকে বিপন্ন করে। 'বিজন বিভূঁই'-এ বক্তব্য একটু অন্যতর। এখানে তাঁর দেখানোর বিষয় আত্মরক্ষার অধিকার বিপন্ন। শুধু বিপন্ন বললে কম বলা হয়— অধিকারটি নেই-ই। আভা সেটা বুঝল ত্বরান্বিত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। প্রথম ছেলেটিকে মৃত্যুর হাতে তুলে দিয়ে। বড়ো ভয়াবহ এই কাহিনী। দ্রুত পরিবর্তমান পটভূমি পাঠককে পার হতে হয় নিশ্বাস বন্ধ করে। সব শেষে আভা যেখানে পৌঁছয়, সেখানে কোনো কিছুর সুরাহা নেই, দিশা নেই। একটি মেয়ে এবং তার বাচ্চা বাঁচল কি মরল, তাতে এ শহরে কারো কিছু আসে যায় না। এ জনপদ আভার আশ্রয় নয়। নীলরক্তের ধমনী বিকৃত কামনার পঙ্কে আবিল, একথা বুঝতে পেরে আভা তার স্বামীগৃহ পরিহারের সংকল্প নেয়। আভার সংকটের শুরু সেখান থেকে। সে সংকটের কোনো সমাধান দেখানো হয় নি। 'জঙ্গম' উপন্যাস লেখার সময় 'বনফুল' বেলা চরিত্রটির ভিতর দিয়ে দেখিয়েছিলেন, নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যচর্চা এদেশে তখন নানাদিক থেকে বিপন্ন ছিল, বিত্তশালী লম্পটের কামাতুরতা তার মধ্যে একটা। বেলা শেষপর্যন্ত ভারতবর্ষের বাইরে চলে গিয়ে নিজের সংকল্পকে রক্ষা করেছিল। বেলার মেধা বা ব্যক্তিত্বের দাপট আভার নেই। সুতরাং সে লড়াইও আভার থাকার কথা নয়। লেখকও আভার উপলব্ধির কোনো বিবর্তন বা বিকাশ দেখাতে চাইছেন না। আভা ব্যস্ত, উদ্‌বিগ্ন জৈব আত্মরক্ষার জন্য। সে নিজে বাঁচতে চায় ও বাকি ছেলেটাকে বাঁচাতে চায়। সে কি সক্ষম হবে? কিন্তু এ-সব প্রশ্ন এই গ্রন্থ সম্বন্ধে শেষ পর্যন্ত বুঝি নিরর্থক। দেখা যাবে, এই গল্পে প্রধান ব্যাপার আভার ভয়। সে ভয়টা এত নিরেট, কঠিন, বাস্তব এবং গুরুভার যে, আশু আত্মরক্ষা ছাড়া আভার মানসিকতা অন্য কোনো দিকে নড়াচড়া করতে পারে নি। এটাই ছিল লেখকের লক্ষ্য। ব্যক্তির অন্য বড়ো অধিকার তো পরের কথা, মাত্র বেঁচে থাকাটাও, নারী হলে ধর্ষিতা না হওয়াটা, শক্তিমানদের দাক্ষিণ্যনির্ভর। এটা কোনো বিশেষ শহরের বা দেশের কথা নয়— অপচয়-হীর্ন, প্রাচুর্যপ্রমত্ত, মেল-শোভিনিজ্‌ম্-দুষ্ট পশ্চিমা বিকারেরই শিকার আভা। আভার পাশে গিয়ে যখন কেউ দাঁড়ায় না, অনভিপ্রেত জাতকের মতো তাকে যখন দেখি পথের মধ্যে নিক্ষিপ্ত, তখন সত্যই মনে হয় বিজন বিভূঁইয়ে মেয়েটা একলা দাঁড়িয়ে আছে— নেমে আসছে অন্ধকার— নেকড়েরা এগিয়ে আসছে। গল্পের ভাষায় এই টেন্‌শন্‌টা সংক্রামিত করার ক্ষমতা রয়েছে।

এ-সবের পরে তিনি যখন হাতে তুলে নেন রামকিঙ্করের জীবন, তখন তাঁর আর 'পুনর্যাত্রা', 'তিনপুরুষ' বা 'খণ্ডিতা'-র মতো সময়ের সরণী বেয়ে অস্তিত্বের ভাষ্য খুঁজতে বের হবার দরকার হল না। ধ্রুপদী ঢঙে তিনি

বাঁধলেন শেষ আলাপ। গতে পৌঁছনোর আগেই কালের হাতে তাঁকে সঁপে দিতে হল অকথিত বাণী।

তিন

গত পঁচিশ বছরের বাংলা উপন্যাসের একটা বৈশিষ্ট্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারে না। পাঠকসাধারণ বড়ো নভেল অপেক্ষা ছোটো নভেলের দিকে বেশি ঝুঁকেছেন। ছোটোগল্পের বই বাজারে কাটে কম। ছোটো নভেল কাটে ভালো। কারণটা শুধুই আর্থিক নয়। বড়ো নভেলের জন্য পাঠকমণ্ডলীর যে অভিনিবেশী দায়িত্বশীল মনঃসম্পাত দরকার হয়, তা এই উন্মার্গ, উৎসন্ন, উৎকেন্দ্রিক সময়ের বেতালা নাচের আসরে দুর্লভ। তবু সে বড়ো মাপের নভেল লেখা হয়েছে, তার একটা অন্যতম কারণ লেখকদের শৈল্পিক নিষ্ঠা। বলবার কথার দ্রুত নৈতিক তাগিদে অনেকগুলি ছোটো আয়তনের উপন্যাস লেখা হয়েছে, তারা সামাজিক পটনির্দেশে ও ব্যক্তির ভূমিকাবিশ্লেষণে অনন্যসাধারণ তাৎপর্যে ভাস্বর। কিন্তু যখন বলবার কথা নয়, বলবার বিষয়টি বিস্তারিত— এবং সে বিস্তারিত বিষয়টি নানা প্রশ্নে প্রতিপ্রশ্নে, নানা মাত্রায় স্তরান্বিত, তখন বড়ো উপন্যাসের ফ্রেম ছাড়া তাদের ধরানো যায় না। আমাদের আলোচ্য সময়সীমার মধ্যে লেখা বড়ো মাপের বেশ কয়েকটি উপন্যাসে এ কথার প্রমাণ মিলবে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় শুরু করেছিলেন 'আত্মপ্রকাশ' দিয়ে। তিনি যখন এসে দাঁড়ালেন 'সেই সময়'-এর সুবৃহৎ পটে, তখন তাঁর পট ও পটধৃত ব্যক্তিপাত্রের অন্বয় ও সংঘর্ষবিষয়ে একটা স্বোপার্জিত চেতনা দৃঢ় ভিত্তি পেয়ে গেছে। প্রথমেই লক্ষণীয় উপন্যাসে ব্যবহৃত কালখণ্ড। এই কালখণ্ডে বা তার সন্নিহিত সময়ের সমাজ-পটে লেখা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কিছু বাংলা উপন্যাসের কথা আমরা এখানে মনে করতে পারি। কিন্তু সেই উপন্যাসগুলিতে পটভূমি গৌণ— ব্যক্তিজীবনবৃত্ত প্রধান রস-কৌতূহলের বিষয় হয়ে দেখা দিয়েছে। সুনীলের 'সেই সময়' এই উপন্যাসগুলি থেকে অপেক্ষাকৃত পৃথক। 'সেই সময়' সম্বন্ধে সুনীলের নিজের বক্তব্য ছিল এই রকম : "গত শতাব্দীর এই রেনেশাঁসের ধারণাটিকে নাড়াচাড়া করাই আমার এই গ্রন্থরচনার মূল উদ্দেশ্য।" বস্তুত এমন একটি সামাজিক-ঐতিহাসিক প্রশ্নের দীপশিখা সামনে জ্বেলে রেখে একজন লেখক যখন উপন্যাসের বৃহৎ পটভূমিতে পরিক্রমা শুরু করেন, তখন তাঁর দায়িত্ব হয়ে ওঠে বহুমুখী। সুনীলের রচনায় ইতিহাসের অনুপুঙ্খবিচারে কোথাও কোনো ত্রুটি আছে কিনা, এ আনুবীক্ষণিক পর্যবেক্ষণে সে দায়িত্বপালন কতটা সম্পন্ন হয়েছে, তা বোঝা যাবে না। তা বোঝা যাবে মাত্র উপন্যাসিকের দায়িত্ব পালনের সামগ্রিক সাফল্যে। সেজন্যই নবীনকুমার কতখানি কালীপ্রসন্ন সিংহ, এ প্রশ্ন তথ্যকৌতূহলী উপন্যাসবিচারে শেষ অবধি নিরর্থক। বরঞ্চ নবীনকুমার কতখানি নানা কাটাকুটিতে সমাকীর্ণ একটা সময়ের গণিতে খুঁজে খুঁজে চঞ্চল চলিষ্ণু চরিত্র হতে পারল — সে জিজ্ঞাসাই সমীচীন। তখন দেখা যাবে নবীনকুমার চরিত্রে যদি বা কালীপ্রসন্ন-চরিত্রের উপাদান ব্যবহৃত হয়েছে, তার গতিবেগ এবং ব্যক্তিত্ব অনেকটাই ঔপন্যাসিকের যুগায়ত কল্পনার ফল। সেইখানেই উপন্যাসটির বৈশিষ্ট্য। 'পূর্বপশ্চিম'-এ সুনীল ইতিহাসের বিস্তারের দিকে দৃষ্টি রেখেছেন বেশি। এরকম একটা ঐতিহাসিক কর্মকাণ্ডকে ঘিরে তলস্তয়ী বিস্তারকে আদর্শ করে আর কোনো বাংলা উপন্যাস লিখিত হয় নি। তবে একথাও আমার মনে না হয়ে যায় নি, 'পূর্ব-পশ্চিম'-এ 'সেই সময়'-এর সংহতি নেই।

অভিজ্ঞতার বহুমুখ আক্রমণের ভিতর থেকে ঔপন্যাসিক আজকের অস্তিত্বের একটা নৈতিক রোহভূমি খুঁজে নিতে চেয়েছেন এই কালখণ্ডে। তিনি জেনেছেন বুঝেছেন তাড়িত হয়েছেন স্পৃষ্ট হয়েছেন জটিল এই সময়ের বুকে দাঁড়িয়ে। এমন অবস্থায় তাঁর বড়ো উপন্যাসের ফ্রেম ছাড়া গত্যন্তর নেই। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় আলোচ্য সময়ের একজন প্রধান ঔপন্যাসিক। 'মানবজমিন' ও 'দূরবীণ' তাঁর শক্তির প্রতিনিধিস্থানীয় রচনা। 'মানবজমিন' নামটির ভাবানুষঙ্গে অষ্টাদশ শতাব্দীর এক ভক্তসাধক কবির মর্মবাণীর আভা নির্ভুল। আমি এই উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে বিশেষ করে উল্লেখ করব প্রীতম চরিত্রটি। অনারোগ্য ব্যাধিতে বিপন্ন। তবু অপরাজেয় তার

ভালোবাসবার ক্ষমতা । 'পারাপার'-এর ললিতকে আমাদের মনে পড়ে বটে, কিন্তু প্রীতম তাকে ছাড়িয়ে গেছে । লাবুর জন্মদিনে প্রীতমের বেলুন ফোলানো, প্রীতমের রঙিন শিকলি তৈরি করা— এ সমস্তই প্রতীকী ঘটনা— "ভারী তৃপ্ত হল প্রীতম । গভীর শ্বাস ছাড়লো একটা । মনে মনে বলল, আজ আমারও জন্মদিন! আমারও জন্মদিন । ভাবতে ভাবতে ক্লান্ত শরীরে ঝিমুনি এলো। বালিশে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল প্রীতম ।" প্রতীকী চরিত্রের একটা সংকট হল এই যে, তা যদি বাস্তবের রোদ জল শিশির হাওয়ার প্রত্যক্ষ সংযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তখন চরিত্রটি হয়ে পড়ে তন্মাত্র এবং পাংশু । শীর্ষেন্দু এ বিষয়ে অবহিত থেকে তাঁর চরিত্রগুলিকে আগে করে তোলেন সজীব। আগে করে তোলেন চলন্ত । তাঁর একটি ছোটোগল্পের চরিত্র সাঁটুলাল চোর । এমন-কি সে নিজের মেয়ের প্যান্টের কসি থেকেও পয়সা চুরি করে । কিন্তু প্রত্যেকবার প্রত্যেকটি চুরির পরই সে ভাবে, কাল থেকে সে ভালো হয়ে যাবে । তার এই বোধটুকুতে সে আর চোর নয়— পুরো মানুষ । প্রীতমও তেমনি তার অসুখের মধ্যেও তার ভালোবাসার অভিজ্ঞান বর্জন করে না । তৃষা একদিকে দীপনাথ অন্যদিকে আজকের অস্তিত্বের জটিল ছায়াকে বহন করছে । এরা সকলেই এই উপন্যাসে একটা কথা বলে গেল, এই অন্ধকার ভূখণ্ড, যার নাম জীবন, সেখানে অনেক খেলুড়ি খেলা বাকী থাকতে থাকতেই মাঠ ছেড়ে চলে যায়। কেউ মরে গেলেই কাহিনী সমাপ্ত হয়ে যায় না । এই বিবৃত (open) অভিজ্ঞতা নিয়ে শীর্ষেন্দুর উপন্যাস 'মানবজমিন'। বড়ো উপন্যাসের উপযুক্ত পটচেতনা ও পটধৃত চরিত্রজ্ঞান শীর্ষেন্দুর বৈশিষ্ট্য । 'দূরবীণ'-এর পরিকল্পনায় শীর্ষেন্দু আরো বেশি মননের পরিচয় দিয়েছেন । ত্রিস্তরবিশিষ্ট এই আখ্যানের গ্রন্থনে বেণীবন্ধনে লেখক বিরল ঔপন্যাসিকের দক্ষতায় অভিব্যক্ত করেছেন তাঁর জীবন-অধ্যয়ন । হেমকান্ত-কৃষ্ণকান্ত ও ধ্রুব মাত্র তিন প্রজন্মের প্রতিনিধি বললে ভুল হবে । জীবনার্থের এবং পুরুষার্থের সংকট ও সংঘাতকে লেখক ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে ধরে দিয়েছেন । বড়োমাপের কিন্তু বাহুল্যবর্জিত এই উপন্যাসের আর-একটি বৈশিষ্ট্য এর লয়বৈচিত্র্য । কখনো ঈষৎ দ্রুত, কখনো ঈষৎ বিলম্বিত লয়ের মধ্যেও লেখকের সময়চেতনার অঙ্গীকার । বৌদ্ধিক পরিকল্পনা, কাঠামো-সচেতনতা এবং ব্যক্তি ও পটের সম্বন্ধ সংঘাত বিষয়ে সুদৃঢ় উপলব্ধি ছাড়া বড়ো উপন্যাসের সৌধ ধসে যেতে বাধ্য । একটা ছোটো বাড়ি ধসলে 'রাবিশ' বা আবর্জনা স্বভাবতই বেশি মিলবে না । একটা সুবৃহৎ সৌধ ধসে যায় তখন, যখন তার গাঁথুনি কাঁচা, ভিত দুর্বল, পরিকল্পনা কমজোর । এবং সে বৃহৎ কাঠামো ধসে গেলে স্তূপীকৃত 'রাবিশ'-এর পরিমাণও যে অনেক বেশি হবে, এতে আর সন্দেহ কী। সমরেশ মজুমদারের 'গর্ভধারিণী' ও 'সাতকাহন' এ জাতীয় বৃহৎ ব্যর্থতা। 'গর্ভধারিণী' উপন্যাসের স্ফীত প্রতিশ্রুতি শেষ পর্যন্ত কুঁই কুঁই করে গুটিয়ে যায়। 'মাস'-কে মুগ্ধ করে রাখার মন্ত্র জানলে মিডিয়াকে নিয়ে মাথা ব্যথা থাকে না। এই নির্ভাবনা থেকে শৈল্পিক চরিত্রহানি কতটা ঘটে, তার আর একটা প্রমাণ সমরেশ মজুমদারের 'জনযাজক'। মার্কিন বেস্ট সেলারকে আদর্শে রেখে লেখা এই উপন্যাসটির প্রধান লক্ষ্য ছিল সাসপেন্স ও স্পিড। ঔপন্যাসিকের সেই মোহান্ধতার একটা বড়ো নজির 'জনযাজক'। অথচ এই লেখক একদিন যথার্থ পরিকল্পনায় সময়কে বুঝে নিয়ে প্রকৃত উপন্যাসলভ্য প্রত্যয়ে লিখেছিলেন তাঁর ত্রয়ী উপন্যাস 'উত্তরাধিকার' 'কালবেলা' ও 'কালপুরুষ'। এই তিনখণ্ডে সমরেশ মজমদার আমাদের কালের একটা ছবি তুলে ধরতে চেয়েছেন। 'কালবেলা' (১৯৮৩) 'উত্তরাধিকার' উপন্যাসের পরের খণ্ড। মাপে বেশ বড়োসড়ো বই। একটা বিশেষ দশকের স্বপ্ন-সংকল্প-ভ্রান্তি ও পরাজয়ের চেহারা লেখক আঁকতে চেয়েছেন। অনুবর্তী উপন্যাসের দুর্বলতার জনশ্রুতিবিষয়ে সজাগ থেকে লেখক অনিমেষকে দ্রুত পরিবর্তনশীল পটভূমি পার করেছেন। ফলে কাহিনীতে একটা অনির্বাপিত কৌতূহলের টান শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ন থাকে। সময়ের দ্রুত হাতে এঁকে দেওয়া নানা স্বাক্ষরের ছাপ। কলকাতার ছাত্র-আন্দোলনের কথা, নকশাল আন্দোলনের তুঙ্গ সময়ে ছাত্রদের নানা কার্যলাপ অনিমেষকে কেন্দ্র করে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু আমার মনে হয়েছে রাজনৈতিক উপন্যাসের একটা শর্ত এখানে সবটা পালিত হয় নি। রাজনৈতিক একটা ব্যাপার অবশ্যই রাজনৈতিক তত্ত্ব। যে-

কোনো উগ্রপন্থা— তা সে নিহিলিজম্ হোক, ভারতীয় সন্ত্রাসবাদ হোক, বা আধুনিক নকশালবাদই হোক— তা একটা তত্ত্বের ওপরেই দাঁড়িয়ে থাকে। পার্টি সেই তত্ত্বের কংক্রিট রূপায়ণের জিম্মাদার। কোনো পার্টির সদস্য একমাত্র তখনই উপন্যাসের চরিত্রপাত্র হিসাবে পরিগৃহীত হয়, যখন সে পার্টি শৃঙ্খলার মধ্যে থেকেই নিজের একান্ত ব্যক্তিসত্তার উত্থাপিত প্রশ্নের মোকাবিলা করতে যায়। অনিমেষের মধ্যে ঠিক সেইমাত্রার ব্যক্তিসত্তার জাগরণ, অন্তত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ফ্রেমে দেখতে পাওয়া গেল না। ছাত্র-পরিস্থিতিও খুব তলিয়ে বোঝা হয়েছে বলে মনে করি না। সরিৎশেখরের সঙ্গে ছাত্রাবাসের স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব নিয়ে আলোচনায় এই প্রজন্মের ছাত্রদের ক্ষোভ কোথায় তা মোটেই ধরা পড়ে না। এগুলি শুধু যে পটবিন্যাসের ত্রুটি তাই নয়, চরিত্রজ্ঞানেরও ঘাটতি। হোস্টেলে কর্তৃপক্ষীয় দুর্নীতির যে বিবরণ তিনি তুলে ধরেন, তা মাত্র খবর। অনিমেষ টেরই পেল না সমস্ত আলোড়নটার মূল কোথায়। সত্তরের দশকের সমস্ত হাঙ্গামা যে আর কিছু না— আমাদের অগ্রজদের অনুষ্ঠিত বহু কদাচরণের রক্তাক্ত, উদ্ভ্রান্ত কিন্তু বিস্ফোরক সমালোচনা, 'কালবেলা' সে কথা আমাদের বোঝাতে পারে নি। কিন্তু অনিমেষকে ধরতে ছুঁতে পারা যায় মাধবীর সঙ্গে জড়িয়ে নিলে। মাধবী অসামান্যা। সে শুধু পরিবারকে তুচ্ছ করেছে তার প্রেমের কারণে তাই নয়, সমাজকে তুচ্ছ করার সাহসও তার হয়েছে। অথচ সে মিটিং করে নি, থিয়োরি কপচায় নি। যথার্থ বৈপ্লবিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করার ক্ষমতা তারই আছে— এবং সে ক্ষমতার মূল রয়েছে তার নারীত্বে, তার ভালোবাসার অকৃত্রিমতায়। মাধবী যেখানে যেখানে এ উপন্যাসকে স্পর্শ করেছে, সেখানেই উপন্যাস তার সব দুর্বলতা অতিক্রম করে গেছে। তার জন্যই অনিমেষ শেষ পর্যন্ত করুণ বিয়োগান্ত নায়কেব অনুকম্পার্হ ভূমিকা থেকে উঠে এল সঠিক কার্যক্রমে ।

কখনো কখনো জীবন এবং শিল্পবিষয়ে দ্বিবাহু মনোযোগ একটি বিন্দুতে মিলিতে হয়ে রূপান্তর পায় লেখকের দৃষ্টিকোণ। মহোপন্যাসের প্রধান শর্ত সেটাই। দেবেশ রায়ের 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' সেই অর্থেই এক মহোপন্যাস। সতীনাথের 'ঢোঁড়াই-চরিতমানস' উপন্যাসে যেমন রামায়ণী চাল, দেবেশের 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'-তে তেমনি মহাভারতীয় পঠ পর্বান্তরের চাল। বাঘারু এর নায়ক। এই অর্থে সে মহানায়ক যে, সে একটি ব্যক্তি হয়েও তারই জীবনের দ্বন্দ্বময় পর্বে পর্বে সে ভেঙে ভেঙে এগিয়েছে জীবিকালগ্ন নানা পরিচয়ে। অনুপুঙ্খের সঙ্গে সমগ্রের সংযোগে, ব্যক্তির সঙ্গে পটের সংগ্রামে ও অভিঘাতে লেখকের পর্যবেক্ষণ মাত্রা পেয়েছে কথকী চালের বৈচিত্র্যে। বাঘারুর ভিতর দিয়ে অভিব্যক্ত হয়েছে একদিকে যেমন দেবেশ রায়ের বাস্তব অভিজ্ঞতাধৃত মানুষ-ধারণা, আরেক দিকে তেমনি বাঘারু মূর্ত হয়ে ওঠে ভারতীয় প্রকৃতি-আকাশ-মৃত্তিকালগ্ন জনতার এক জন হিসাবে। সে হিসাবেই বাঘারু বরঞ্চ সব থেকে জীবন্ত। লেখক বাঘারুকে অনুসরণ করেছেন খুব কাছ থেকে। কিন্তু কোথাও নিজের গরম নিশ্বাস বাঘারুর ঘাড়ের ওপর ফেলে তাকে চমকে দেন নি। যখন লেখক বলেন— "দ্বন্দ্বে দীর্ণ হওয়ার মন পর্যন্ত নেই যে বাঘারুর, শুধু শরীরটুকুই আছে যে-বাঘারুর, এমন-কি হাজার হজার বছর ধরে তৈরি মানুষের এত পোশাক-পরিচ্ছদের মধ্যে মাত্র দেড়হাতি এক ত্যানা লেগে আছে যে-বাঘারুর সম্পূর্ণ মানবশরীরটিতে, সেই দেড়হাতি ত্যানাতেই মাত্র যে-বাঘারু মানবসভ্যতার সঙ্গে বাঁধা— সেই বাঘারু প্লাবিত নদীতে, বৃষ্টিতে, ঝড়ে ও অন্ধকারে এতটা বন্যা পেরিয়ে আসা এই শরীরটা থেকে একটা গাছের বেঁচে থাকা বেচে দেবে কী করে?" বাঘারু কেন 'নিগাও কেনে' বলে নি, তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লেখক যখন এভাবে ঔপন্যাসিকের লেখকীয় নৈঃশব্দ্য ভেঙে দেন, তখন তাঁর লক্ষ্য থাকে বাঘারুর আঞ্চলিকতাকে ভারতীয় দলিত জীবন প্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে নেবার দিকে । জীবন থেকে, প্রকৃতি থেকে শুধু তো ঘটনাই জন্মায় না। জন্মায় মীথ। তারও ইঙ্গিত থাকে দেবেশের পর্যবেক্ষণে— গ্রহণের সমাসন্ন অন্ধকারে বাঘারুর মোষ পার করার ঘটনায় বাঘারু আর মোষের বোঝাপড়ার বর্ণনাটি বাঘারুকে দেয় আদিম অভিজ্ঞান। সূর্যগ্রহণকে সামনে রেখে এক হয়ে যায় বুড়িয়াল আর বাঘারু। বুড়িয়াল কানের ঝাপটা মেরে বাঘারুকে আশ্বাস দেয়। এই ঘটনায় একটা অসামান্য টেনশনের ভিতর দিয়ে জীবন্ত হয় গোটা

পটভূমি। "হঠাৎ বাঘারুর সন্দেহ জাগে, পোয়াতিটার বাচ্চো হওয়া ধরিল নাকি এ্যালায়?"— মানবিক প্রাণীনতা আর কাকে বলে আমি জানি না। এ কাহিনী চলে, তিস্তা বয়ে যায়। দেখতে দেখতে সত্যিই "তিস্তা যেন আর নদীমাত্র থাকে না"— সে তার প্রাচীন অস্তিত্বে ফিরে যেতে চায় এই একটিমাত্র কাহিনীকে অবলম্বন ক'রে । বন্যার উপকথা জন্মায় তিস্তাবুড়ির কোলে। পরিবর্তমান বাস্তবতা ব্যক্তিচেতনায় ছায়া ফেলার ধরনটি খুঁজে বের করার মধ্যে আছে ঔপন্যাসিকের মৌলিক শক্তির পরিচয়। বাঘারুর অস্বচ্ছ চেতনায় বাস্তবতা কতখানি স্বাক্ষর এঁকে দিল— এই উপন্যাসে ধীরে ধীরে সেই প্যাটার্নটা প্রধান হয়ে ওঠে। এত অকৃত্রিম এই জীবনকথা, এত ভারতীয় এর বস্তুবিন্যাস যে, এ উপন্যাসের আলোচনায় বিদেশী সমালোচনাগ্রন্থের আমদানি করা পরিভাষা অস্বস্তিকর ও অবান্তর মনে হয়। তিস্তা পাল্টায়— বাঘারু? সেটাই তো প্রশ্ন।

বড়োমাপের উপন্যাস আলোচনায় সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের 'রসিক' উপন্যাসটি উল্লেখ করছি একটি পৃথক কারণে। তিনি একটি বিশেষ অঞ্চলকে, এক বিশেষ গোষ্ঠীর মানুষের জীবনকে সরেজমিনে দেখে শুনে এই উপন্যাস লিখেছেন। তারাশঙ্কর ও সমরেশের পরে এ জাতীয় কাজ এমন অভিনিবেশে যাঁরা করছেন তাঁদের সংখ্যা খুবই কমে আসছে। সুব্রত সেই বিরলসংখ্যকদের অন্যতম। সুব্রতর সীমাবদ্ধতা এখানে যে, তিনি অভিজ্ঞতার অভিব্যক্তির দিকে যত দৃষ্টি দেন— অভিজ্ঞতার চাপ তাঁর শিল্পভাবনাকে তত প্রাণিত করে তোলে না।

চার

গত তিন দশকে শর্ট নভেল বা হ্রস্ব উপন্যাস আনুপাতিক হিসাবে সংখ্যায় বেশি লক্ষ্যভেদী হয়েছে। 'বাজারে খেয়েছে' বলে নয়— লেখকেরা নিজেরাও এই মাধ্যমটির ভিতর দিয়ে সময়ের স্পন্দনকে ধরতে পেরেছেন দ্রুত। সময়ের স্রোতে এক-একটা আবর্ত তাঁদের একাগ্র বক্তব্যকে যখন অনিবার্য করে তোলে, তখন এ জাতীয় মাধ্যম তাঁদের হাতে সব থেকে কার্যকর হয়েছে। লক্ষণীয় এই মাধ্যমে কোনো দায়িত্বদৃঢ় লেখক অতীতাশ্রয়ী বিষয়কে ধরতে চান না। এ মাধ্যম বিশেষভাবে বর্তমানেরই মুখাপেক্ষী। 'শাম্ব'-এর পৌরাণিক কাহিনী 'কালকূট'-এর হাতে প্রতীকী হয়ে উঠেছে বটে, কিন্তু সমরেশ-আনুপাতিক সাফল্যের বিচারে 'শাম্ব' সীমাবদ্ধ কালের হাতে উত্থাপিত নানা প্রশ্নের এক-একটিকে ধরা এবং প্রশ্নটিকে গভীরে নিয়ে যাওয়া— আধুনিক শর্ট নভেল বা হ্রস্বোপন্যাসের কাজ। সময়কে সমগ্রভাবে প্রতিফলিত করতে চাইলে, তার পর্ব-পর্বান্তরকে ধরতে চাইলে মহোপন্যাস হবে অবিকল্প মাধ্যম। এই শতাব্দী আজ শেষ প্রহরে এসে পৌঁচেছে। অনেক বিপ্লবের প্রতিশ্রুতি আজ ভেঙে চুরে গুড়িয়ে পড়ে রয়েছে ইতিহাসের রাজপথে এদিকে ওদিকে। তবু শতাব্দীর এই উদ্‌বিগ্ন শেষ প্রহরে ব্যক্তি তার স্বাধীন সত্তার সন্ধান করে চলেছে— একাকী— সংঘ বা সমিতির নির্দেশে নয়, অভিজ্ঞতার আকর্ষণে নয়— নিজেরই চাপে তার এই অন্তর্যাত্রা। সে যাত্রাপথের অনেকটাই হয়তো গ্লোবাল দূষণের ধোঁয়াশায়, হতবিশ্বাসের শবগন্ধে সমাচ্ছন্ন। তবু থামে না ব্যক্তির নিজের অবৈকল্যকে বুঝে নিতে চাওয়া। বেশ কতকগুলি হ্রস্বোপন্যাসে ঔপন্যাসিকদের এ প্রয়াস আমরা লক্ষ করেছি। কেউ কেউ এঁদের মধ্যে আবার কেবলমাত্র হ্রস্বোপন্যাসেই নিজেদের প্রেক্ষণবিন্দু স্থির করে নিয়েছেন। দিব্যেন্দু পালিত গভীর স্বভাবের অধিকারী লেখার জন্যই তিনি লেখেন না। পরিদৃশ্যমান বাস্তবতার আড়ালে যে গূঢ়তর অস্তিত্ব নিহিত থাকে, তাঁর অনুসন্ধিৎসা সেই গূঢ়তরের ঠিকানা-অভিমুখী। তাঁর 'সহযোদ্ধা' উপন্যাসটি এমন এক ঘটনার বীজ উপাদানে কল্পিত, যে ঘটনা আমরা জানি। উত্তরকাল যখন এত মূক থাকবে না, থাকবে না এত বধির, তখন লেখক-প্রদত্ত 'এই উপন্যাসের সমস্ত ঘটনা ও চরিত্রই কাল্পনিক,' এই স্বস্তিবাচনের প্রয়োজন হবে না। তখন এ হত্যার রক্তের দাগ হয়তো আর থাকবে না, কিন্তু আমাদের সমস্ত মৌন সাক্ষ্য আদিত্যের মধ্যে বেঁচে থাকবে। আমাদের সকলের হয়ে দিব্যেন্দু সে কাজটি সম্পন্ন করলেন তাঁর

আদিত্য চরিত্র-পরিকল্পনায়। 'স্মাগ্' হতে কোনো বাধা ছিল না আদিত্যর। সোপকরণ ফ্ল্যাট, বধূ কন্যা, সাদাকলারের চাকরি— সবই তার করতলগত ছিল। কিন্তু সহসা সময় প্রবেশ করল তার বৃত্তে। সে একটি রাষ্ট্রিক হত্যাকাণ্ডকে প্রত্যক্ষ করে বসল। এইবার শুরু হল তার দ্বিতীয় সত্তার আলোড়ন। বারবার সে তার অর্জিত প্রথম বৃত্তের দিকে তাকিয়ে হয়তো বলেছে, "তোমরা আমাকে ঘিরে থাকো," কিন্তু প্রত্যেক মানুষের নিয়তি কখনো-না-কখনো একবার তাকে মুখোমুখি করে দেয় দ্বিতীয় সত্তার সঙ্গে। আদিত্যের তাই হল। সঙ্গে সঙ্গে তার যাত্রা শুরু। দ্বিতীয় চিন্তার আলোয় আস্তে আস্তে সে চলে যায় আপাতের আড়ালে নিহিতের রহস্যে। দেবু চৌধুরীর দ্বিধা আদিত্যকে ভাবিত করে। সিগার টেনে কাসির সূত্রে একটি চমৎকার ডায়ালগ স্মরণীয়—"এসবে অভ্যস্ত হতে সময় লাগে।" আদিত্যর জবাবটাও মর্মজ্ঞ— "সময় লাগার ব্যাপারটা অজুহাত। আসল দরকার কষ্টটা সইয়ে নেওয়া—" ঘটনার অন্তর্গর্ভ চাপে সাধারণ সংলাপ হয়ে ওঠে দ্বিতীয়ার্থসম্পন্ন : ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে মধ্যরাত্রের আগন্তুকেরা অনিবার্য পদক্ষেপে এসে পৌঁছল। পড়ে রইল পৃথা আর শ্বেতা। পুলিশভ্যানে উঠতে উঠতে আদিত্য ভাবল, "হতে পারে এটাই সেই ভ্যান।" আদিত্য দেখল, সে তার মধ্যে বহন করেছে ব্যক্তির স্বাধীনতাবোধজনিত দণ্ডাজ্ঞা— তার দাম তাকে দিতেই হল। বাহুল্যবর্জিত গদ্যে, ছয়টি মাত্র পরিচ্ছেদে তলস্তয়ের 'রেসারেকশন'-এর কৌশলে দিব্যেন্দু একটা সময়ের কুশীলবদের উন্মোচিত করেছেন স্তরে স্তরে সঠিক প্রেক্ষাপটে।

'সহযোদ্ধা' যিনি লিখেছিলেন যিনি লিখলেন 'স্বপ্নের ভিতর', তিনি শুধু হৃদয়বানই নন, বৌদ্ধিক প্রস্তুতিতেও তিনি বিশিষ্ট। 'দক্ষিণী' ওয়ার্কিং উইমেন্‌স্ রেসিডেন্সিয়াল হোম, সেখানে থাকে বিশাখা, কলেজে পড়ায়; থাকে অর্পিতা, অফিসে ডিরেকটারের সেক্রেটারি। থাকে আরো অনেকে, রমার মতো হেল্‌থ্ ভিজিটার ; মিসেস ভদ্র, 'নার্সিং হোমে অ্যাটাচড্'। গল্প কিন্তু মুখ্যত বিশাখা এবং অর্পিতাকে নিয়ে। এ গল্প অবশ্যই অন্যরকম হতে পারত, হতে পারত এই জাতীয় রেসিডেন্সিয়াল হোমের তথ্যসমৃদ্ধ একটি তন্নিষ্ঠ উপন্যাস। অন্য কেউ লিখলে এগুলিই হত বইটির প্রধান গুণ। কিন্তু দিব্যেন্দুর মননশীলতা তাঁকে সামন্য সিদ্ধির আওতায় আটকে রাখে নি। এই বইয়ের আসল কথা হয়েছে বিশাখা এবং অর্পিতার নিয়তি। এবং তা শুধু বিশাখা আর অর্পিতারই নিয়তি নয়, সচেতন ও সজাগ প্রত্যেক আধুনিক মেয়ের নিয়তি। একটি মেয়ের দেহাধীন একটা নিয়তি থাকতে পারে, আজকের মেয়ে তা থেকে মুক্তি নিতেও পারে, একজন মেয়ের একান্ত নারীত্বনির্ভর একটা নিয়তিও থাকতে পারে। তা থেকে তার মুক্তি ঘটে যেতেও পারে। অর্পিতা আর বিশাখা এই দুয়েরই দুটি পৃথক প্রমাণ। কিন্তু লেখক এখানেই ছেড়ে দেন নি। এই দুটো মুক্তির অব্যবহিত পরেই নিয়তির সঙ্গে মোকাবিলা শেষ হয়ে যায় না। এর পরে যেটা বাকি রইল, সেটা সময়ের জালে ধৃত ব্যক্তির নৈঃসঙ্গ্যের প্রশ্ন। নারীর ক্ষেত্রে সে প্রশ্ন আরো তীক্ষ্ণ। কেননা, নারীর স্বভাবই হল সম্পর্কসূত্রে গ্রথিত হতে চাওয়া। এখানে দেখা গেল এই দুটি মেয়ে সে সূত্র নিজের হাতেই ছিঁড়ে ফেলল। তার পর? গল্পের শেষটুকু বলি— "ধরার দরকার নেই। আমি নিজেই যেতে পারবো—" বিশাখা দেখল, অর্পিতা এগিয়ে যাচ্ছে। একটু মন্থর, একটু বিমর্ষ; তবু পা ফেলায় ভুল নেই কোনো।"

অমলেন্দু চক্রবর্তী শক্তিমান কথাসাহিত্যিক। তাঁর 'গোষ্ঠবিহারীর জীবনযাপন' উপন্যাসটির বিষয় অতিসাধারণ একজন মানুষ। সে বড়োকীর্তি গাঢ় প্রেম এ-সব কোনো কিছুর ঠিকানা খোঁজে না। খেলার নিয়ম সে কখনো ভাঙে না। খেলার মধ্যেই সে থাকে। বাইরে যাবার কথা ভাবেও না। এরকম একটা বিষয় নিয়ে উপন্যাস নানা দিক থেকে বিপন্ন হবার কথা। কিন্তু অমলেন্দু অবিচল তন্নিষ্ঠতায় এইরকম একটা উপন্যাসকে শিল্পসিদ্ধ করে তুলেছেন। যদি তিনি কোনোদিক থেকে প্রলুব্ধ হতেন, তাঁর উপন্যাসের ফ্রেম ক্ষুণ্ণ হত। অমলেন্দুর কোনো কোনো লেখায় প্রসাদ গুণের ন্যূনতা ঘটে টেকনিকের অতিপ্রাধান্যে। তখন বোঝা যায় না, তিনি কাকে ব্যক্ত করতে চান, কলাকৃতিকে, না জীবনকে । 'গোষ্ঠবিহারীর জীবন যাপন' সে ত্রুটি থেকে মুক্ত। অমলেন্দু মূলত মধ্যবিত্ত সংকটের কথাকার।

মতি নন্দীর ‘সবাই যাচ্ছে’ এবং ‘চেয়ার’ লেখকের নিরাসক্ত, নির্মম অবিকল্প বাস্তব দৃষ্টির সাক্ষ্য বহন করছে। ‘সবাই যাচ্ছে’ গল্পের নায়ক সন্দীপ। তার স্ত্রী অলকা সপ্তাহে পাঁচটা দিন তাকে ছেড়ে থাকে চাকুরির খাতিরে। অলকা যখন থাকে না, সে বাণীর কাছে যায়— একটা বড়ো পরিবার অনেকদিন হল ভেঙেচুরে গেছে, তবু আলগা হয়ে যাওয়া বাড়ির ইঁটগুলো যেমন মশলাবিহীন পাশাপাশি অবস্থানে অভ্যস্ত, সন্দীপ, তার কাকা, পানু মানু এরাও সেই রকম। সন্দীপের দিনগুলি আজকের বহুপীড়িত, সময়ের কাছে সমর্পিতচিত্ত যে-কোনো পিছনের সারির মধ্যবিত্তের জীবন। নিরাবেগ দাম্পত্যজীবন তলানিতে এসে ঠেকেছে, অন্য যে মেয়েটির সঙ্গে তার মেলামেশা, সেই রত্নার কাছও সে শেষপর্যন্ত মান হারায়— গুণ্ডা মস্তানের কাছে তার নিষ্প্রতিরোধ অ্যাটিট্যুডের জন্য, বাইরের মহলে তার পরিচয় সে ডাকসাইটে উঠতি মানুষ মানুর ভাই।

নায়ক সন্দীপের বেলায় দেখলাম সামনে ‘প্রেমিকা’—এ শব্দ এখানে খাটে কি না জানি না— লাঞ্ছিত দেখলেও —দু-দুবার দেখলাম আমরা— অনুভূতি বা প্রতিক্রিয়া তার একই— ‘কেউ ঝাঁপাবেই বা কেন!’ এ উপন্যাসে সন্দীপ যে-সব ঘটনার ভিতর দিয়ে চলে, সেগুলি কোনোটাই বড়ো মাপের ঘটনা নয়। লেখক ইচ্ছে করে মাঝারি ঘটনা জড়ো করেছেন— এ কথা ভাবলে কিন্তু ভুল হবে। সময়টাই বুঝি বন্ধ্যা।

‘সবাই যাচ্ছে’-র সঙ্গে ‘চেয়ার’-র একটা তফাত আছে। কব্জা খুলে যাওয়া সময় দুটো উপন্যাসেরই মূল কথা। কিন্তু ‘সবাই যাচ্ছে’-তে সবাই নিষ্প্রতিরোধ। ব্যাঙ্ক ডাকাতির ঘটনাটি গোটা বইটার মূল বক্তব্যের ব্যঙ্গ প্রতীক — কেউ ঝাঁপাবে না। ‘চেয়ার’ গল্পে একজন ঝাঁপিয়ে পড়ল— সে হীরু। শুধু জানা হল না সে আর লাফিয়ে পড়বে কিনা। সে অবশ্য বলছে সে বুলওয়াকার কিনবে গায়ে বাড়াবে, আবার আসবে, দেখে নেবে। কিন্তু বস্তুত সে কী বলছে বোঝা গেল না। লেখকের দুটি গল্পেই বলার ভঙ্গিটি খুব শীতল। অনুচ্ছ্বসিত, প্রায় নিক্তিতে ওজন করা বাক্য ও শব্দসমাবেশ। মাকে যখন বনানী একাকিত্ব থেকে খানিকটা মুক্ত ভাবতে পারল, সেটাও একটা আয়রনি, তখনো গদ্য প্রয়োজনীয় দুটি কি একটির বেশি বাক্য তলব করে নি। দুটি কাহিনীতেই দেখলাম লেখক আজকের বেঁচে থাকা ব্যাপারটাকে প্রায় ব্যাধি বলে ধরে নিয়েছেন। নিরাময়ের কথা তিনি ভাবেন না, তার স্বপ্নও দেখেন না। রোগের গুরুত্ব ও উপসর্গ বুঝে নেওয়াই তাঁর কাছে জরুরি।

বাণী বসুর ‘স্বপ্নভূমি মাতৃভূমি’ উপন্যাসটিতেও লেখিকার আধুনিক জীবনভাবনার উজ্জ্বল পরিচয় মিলবে। স্বাধীনতার পর থেকেই বিদেশে ভারতীয়দের কাজ খুঁজতে যাওয়াও কাজ পেয়ে থেকে যাবার ঝোঁক বেড়েছে। সুখ আর স্বাচ্ছন্দ্য ব্যাপারটা এমনটা যে, একবার আটকে গেলে তার পাশ কাটানো খুব মুশকিল। কিন্তু দেশের মধ্যে থেকেও যেমন দেশত্যাগী হওয়া যায়, বিদেশে ঔপকরণিক প্রাচুর্যে আপ্লুত থেকেও কেউ কেউ স্বদেশী থাকতে ভোলে না। ‘জন্মভূমি ও মাতৃভূমি’ উপন্যাসের সুদীপ তেমনই একজন। বন্ধুরা কেউ কেউ মার্কিন নাগরিকত্ব নিলেও, স্ত্রী কমলিকার সে ক্ষেত্রে প্রচ্ছন্ন পক্ষপাত সত্ত্বেও সুদীপের ভিতরে কোথাও একটা যে নাগরিকত্ব গ্রহণে বাধা ছিল। কন্যা আরাত্রিকা জন্মসূত্রে আমেরিকান সিটিজেন। পুত্র বাবু অবশ্য তা নয়। এইবার সুদীপের দেশে ফেরার সিদ্ধান্তের পর থেকেই, তার মানে উপন্যাসের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ থেকে বইটির নামকরণের তাৎপর্য তীক্ষ্ণ হতে থাকে। ‘জন্মভূমি’ জন্মসূত্রে লব্ধ। মাতৃভূমি’ অর্জিত হয় ভালোবাসায়, বেদনায়।

আলোচ্য উপন্যাসটি পড়তে পড়তে, আরাত্রিকার মার্কিন জন্মভূমিতে ফিরে যাওয়ার ঘটনায় কথাটি আবার মনে পড়ল। আরাত্রিকার দাদা বাবু জন্মেছিল ভারতবর্ষে। মার্কিন মুলুককে সে জন্মভূমি বা মাতৃভূমি কোনোটাই মানতে পারে নি। সে আমেরিকা-প্রবাসী ভারতীয়দের জীবনযাপন পদ্ধতিতে খুশি নয়। বরঞ্চ সে-জীবন সম্বন্ধে সে খুবই ক্রিটিকাল। ‘‘স্বদেশের চিহ্ন এই ক্ষুদ্র সমাজে মেয়েদের শাড়ির বাক্সয়, কিছু পুরুষের রাত্রিবাসে, চোখমুখের আদলে বেঁচে আছে। আর একটা প্রজন্ম পরেই ঘরেও নহে, পারেও নহে, যে জন আছে মাঝখানে, সেই জনের আত্মপরিচয়হীন নিয়তির অন্ধকারে কিছু না জেনেই প্রবেশ করবে সে। ওই ক্ষীণ সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখবার

চেষ্টা করবে বাটিকের দুর্গা ঠাকুর পুজো করে।" বাবু ঠিক ভেবেছিল। সুদীপ, বাবুর বাবা ঠিক ঝুঁকি নিয়েছিল। জন্মভূমিকে মাতৃভূমিতে রূপান্তরিত করতে হলে অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হবে জেনেও সুদীপ ভারতে চলে এসেছিল। ততদিনে তার মার্কিন জীবনের মোহও কিছু ঘুচেছে। সে জেনেছে "একই পোস্টে আমেরিকানদের মাইনে আমার দেড়া"। আবিষ্কার করেছে, "এই বৈষম্যময় আচরণ ওদের রক্তে। বাইরে থেকে কিচ্ছু বুঝবে না।" ইংরেজের উপনিবেশে শোষণটা ছিল সার্বিক। এখন পাশ্চাত্যের ধনতন্ত্রী দেশগুলি জৈবিক স্বাচ্ছন্দ্যের দাম ধরে দিয়ে শোষণ করতে চাইছে ভারতীয় মস্তিষ্ক। সুদীপ তা বুঝতে পেরে ভারতে ফিরে এল। লেখিকা চমৎকার দেখিয়েছেন, সুদীপ কোনো ইউটোপিয়ার বশবর্তী হয় নি। এখানকার নানা দুর্নীতি, জীবনযাত্রার নানা গ্লানি সহ্য করতে করতেও লড়াই করতে গিয়ে সুদীপের হৃদযন্ত্র একদিন ভেঙে পড়ল। অধ্যক্ষ সুদীপের কলেজীয় অভিজ্ঞতাটি অতীব বাস্তব। অনেক চেনা কলেজ ও চেনা সহকর্মীর দেখা পাওয়া যায় এখানে। সুদীপের মৃত্যুর পর তার পরিজনদের সিদ্ধান্ত নেবার সময় এল কে কী করবে এবার। কমলিকা এখানেই থেকে গেল। আরাত্রিকা তার জন্মভূমিতে ফিরে গেল। নির্ভয়ে সে চলে গেল। তার ভাবনা হল— "একজন সব সময় সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন, বুকের মধ্যে নির্ভয় আত্মপ্রত্যয় জাগিয়ে। তিনি লিবার্টি।" এ উপন্যাসের উপসংহার আমার মনঃপূত হয় নি। এভাবে সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করা ঠিক নয় তা জানি। তবু আমাদের মনে হয়, চলে যাওয়াটা বাবুর পক্ষে তাৎপর্যপূর্ণ হত। কেননা সে স্বাধীনতাসম্ভোগের টানে যেত না। যেত আমেরিকার কালোদের পাশে দাঁড়িয়ে স্বাধীনতার দায়িত্ব বহন করতে। আরাত্রিকা এখানে থেকে গেলেই ভালো করত। সে বুঝতে পারত তা হলে, পড়ে পাওয়া স্বাধীনতার চেয়ে উপায় করা স্বাধীনতা অনেক দামী। আর একটা কাজ সে করতে পারত— সেটা তারই করার কথা। তার বাবার বুক-ঢালা স্নেহ সে পেয়েছিল। স্নেহের দাম শোধ করা যায় না। অন্তত সে চেষ্টা করতে পারত।

বাণী বসুর 'অন্তর্ঘাত' পুনরায় প্রমাণ করে লেখিকার বিষয় নির্বাচনের ক্ষমতা। সত্তরের দশকের প্রচণ্ড ভাঙচুরের দিনগুলোর জের এ উপন্যাসে খুলে ধরা হয়েছে। যাকে মনে হয়েছিল যবনিকা, তা যে বস্তুত যবনিকাপাত নয়, চৌদ্দ বছর পরে সচেতন সম্মিলিত কুশীলবেরা সে কথাই বলতে চাইছে। চৌদ্দ বছর আগের রক্তের দাগ, পুরাতন হিসাবনিকাশ কীভাবে মিটতে পারে? ক্ষমার্হ কে, ক্ষমা করতে না পারার দীনতাও কতখানি ক্ষমণীয়, এ-সব প্রশ্নও উঠেছে। তুলেছে সুমন্ত ও ব্রততী এবং অন্যান্যেরা। শীর্ষর চিঠি যেন একটা প্রকাণ্ড ইচ্ছার বিষণ্ন এপিটাফ। এক হিসাবে তা এক প্রজন্মের আত্মসমালোচনার চেষ্টাও।

শহরের মতোই গ্রামের জীবনেও লেগেছে সময়ের টান। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কুবেরের বিষয়আশয়' এবং 'ঈশ্বরীতলার রূপোকথা' লেখকের মৌলিক বিষয়জ্ঞান ও চরিত্রাবিষ্কার প্রতিভার নিদর্শন। বিশেষ করে বলছি শেষোক্ত উপন্যাসটির মতো উপন্যাস বাংলাসাহিত্যে দুর্লভ। তিনি এখন ঐতিহাসিক উপন্যাসের দিকে মনোযোগী। এতে তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় আছে। তবে এ মনোযোগের তাত্ত্বিক কারণ বোঝা যায় না।

সময়ের করস্পর্শ পড়েছে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'নদীর মতন' উপন্যাসটিতে। সিরাজও গ্রামীণ পটভূমি ব্যবহার করেন। তাঁর এই জাতীয় উপন্যাস পড়লে বোঝা যায় তারাশঙ্কর-বিভূতিভূষণের অভিজ্ঞতার গ্রাম আজ কত পাল্টে গেছে। আলোচ্য উপন্যাসের ধরিত্রী চরিত্রটিই সেই পরিবর্তনের আধুনিক প্রতিমা। ধরিত্রীর সব আছে, স্বামী আছে, সংসার আছে কিন্তু আর একটা এ-সবের চেয়ে বড়ো জিনিস তার আছে—স্বতন্ত্র, স্বাধীন জীবনবোধ। পুরুষশাসিত সমাজে কোনো নারী যখন এইভাবে সামাজিক কাজকর্মে, সামাজিক বাস্তবতার সঙ্গে অন্বিত হতে চায়, তখন দেখা যায় বাধা আসে বাঁধাধরা পথ ছাড়াও অন্য নানা ভাবে। ধরিত্রীর জীবনে সে সংকট কেমনভাবে এল, কেমনভাবে গ্রামীণ স্বার্থজট তার ভাইকে উপলক্ষ করে তাকে আঘাত হানল, এই উপন্যাসের স্টোরি এলিমেন্ট হল সেটাই। লেখকের কৃতিত্ব সেখানে স্বীকার্য, কিন্তু তাঁর কৃতিত্ব আরেকটু বেশিও বটে। ধরিত্রীর মতো মেয়েরা পুরুষের সংরক্ষিত কর্মচক্রে ঢুকে প'ড়ে অনেকসময় অর্জন করে ফেলে পারুষ্য। ধরিত্রী-কল্পনায় সিরাজের

চরিত্রজ্ঞানের এখানেই চরিতার্থতা যে, ধরিত্রী পঞ্চাতদিদি হয়েও নারীত্বের মৌল প্রেরণা হারিয়ে ফেলে নি। সে প্রেরণা হল ভালোবাসতে চাওয়া।

আলোচ্য কালখণ্ডে সব থেকে কঠিন দৃষ্টি-সম্পন্ন ঔপন্যাসিক হিসাবে মতি নন্দীর পরেই যদি কারো নাম করতে হয় তিনি তরুণ লেখক আবুল বাশার। আবুল বাশারের 'ভোরের প্রসূতি' উপন্যাসে লেখক যে-পটভূমি ব্যবহার করলেন, তা অন্ধকারে আচ্ছন্ন সীমান্তভূমি। এই পটভূমিটিও প্রতীকী। সে সীমান্তভূমি বুঝি সকল মূল্যমানের বিনষ্টির এলাকা। প্রাণের দাম, মানের দাম, মনের দাম, দেহের দাম সবই সেখানে ধুলোয় কাদায় লুটোপুটি খায়। যে নাতিক্ষীণ রাজনৈতিক বাতাবরণ 'ভোরের প্রসূতি' উপন্যাসে ব্যবহৃত হয়েছে, তা জরুরি ছিল না এজন্য যে, সেই রাজনৈতিক পটনিরপেক্ষ ভাবেই উপন্যাসের মূল বক্তব্য দাঁড়াতে পারত। রাজনৈতিক মুখোশ ছেঁড়াছিঁড়ির ঘটনাটি উপন্যাসে শেষাংশে ফালতু ঘটনা বলে মনে হয়েছে। উপন্যাসটি স্বাবলম্বী বলেই এ কথাটুকু বললাম। উপন্যাস দাঁড়িয়ে আছে সিতারা এবং দিলদারের জোরে। এক প্রায়ান্ধকার জগতে যারা ঘুরে বেড়ায়, সিতারা এবং দিলদার সে জগতে ঢুকে পড়েছিল। কিন্তু এক টুকরো আলোর খবর তারাই পেয়েছিল। সিতারাকে ভাসতে হল, ডুবতে হল, ডুবে আবার ভাসতে হল। যৌনব্যাধিতে সিতারাকে দূষিত হয়ে যেতে হল। আর শেষ পর্যন্ত দিলদারকে মরতে হল, উপন্যাসের ভাষায় 'জান বিরান' করতে হল। ভাত আর ভালোবাসা মিলিয়ে নিয়ে যে জীবন, তার যন্ত্রণার অন্ত নেই। জীবনব্যাপারি তার বউ সিতারাকে নরকের দরজায় বসিয়ে দিয়েছিল। দিলদার চেয়েছিল সিতারাকে তুলে নিয়ে যেতে, সেই সিতারাকে, যে জীবনে আজ সব থেকে অরক্ষিত আছে। রাজনীতি তার কাছে থেকে দূরে চলে গিয়েছে। এল-পি-র ব্যবসা নেই। স্বামী হারিয়েছে। চর প্রায় উচ্ছেদ হয়ে গেল। এখন কে বা কারা ওকে আগলায়। দিলদারের ভাবনা দিলদারকে নিয়ে গেল বিরান হয়ে যাবার পথে। সীমান্ত পার হয়ে যাবার জন্য যেখানে এত হানাহানি, সেখানে কে শেষ পর্যন্ত সীমা পার হল, তা বোঝা গেল না। সে বোধ হয় দিলদার।

আমার ঠিক বোধগম্য নয়— গত পঞ্চাশ বছরের বাংলা উপন্যাসকে দুভাগে ভাগ করা যায় কিনা। কেননা এই পঞ্চাশ বছরে কালের ঢেউ এবং ঢেউ পরম্পরায় এমনভাবে অন্বিত যে সে পরম্পরাকে দুভাগ করে প্রেক্ষাপটে ফেলা সম্ভব নয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে ওঠেন এবং পালটে যান লেখক। 'বৃহন্নলা'-র লেখক লেখেন কুবেরের বিষয় আশয়'। 'একালের কথা'-র লেখক লেখেন 'অসংলগ্ন কাব্য' অথবা 'অনি'। 'বায়োস্কোপের বাক্সে'র লেখিকা লেখেন 'জগমোহনের মৃত্যু'। প্রকৃত অর্থে যিনি ঔপন্যাসিক তিনি জানেন, সমাজ ইতিহাসবিবিক্ত হয় না, ইতিহাসও সমাজবিবিক্ত হতে পারে না। আমাদের আলোচ্য কালখণ্ডে ঔপন্যাসিকরা সমাজ-পরিবার ব্যক্তির সম্পর্ক ও সংঘাতকে, অন্বয় ও অনন্বয়কে কমবেশি প্রতিফলিত করেন। অসীম রায়ের উপন্যাসে, বিশেষত তাঁর বড়ো উপন্যাস 'আবহমান কাল'-এ এই প্রতিফলন একটি আলাদা তাৎপর্য পায় ঐ ত্রয়ীচেতনার পূর্ণ অন্বয়ের জন্য। উপন্যাসের আদর্শ ভাষাশৈলী ঔপন্যাসিকের স্বতন্ত্র জীবনবীক্ষার ফল। অসীম রায়ের 'দেশদ্রোহী' 'শব্দের খাঁচায়' প্রভৃতি হ্রস্বোপন্যাসে তাঁর বৌদ্ধিক উদ্‌বেগ, মননদীপিত শৈলীকে লক্ষ্যভেদী করে তুলেছিল।

বড়ো উপন্যাসের ক্ষেত্রে সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের 'লোটাকম্বল' ও 'বসবাস' এক অনন্য দৃষ্টিভঙ্গির জন্য মূল্যবান। প্রজন্মের ব্যবধান বা সংঘর্ষ ততটা নয়, তাঁর অভিনিবেশের বিষয় হয়েছে বৃদ্ধের ধূসর বিপন্নতাকে জীবনের নিকষে যাচাই করা। তিনি যদি শুধু এইটুকুই করতেন, তা হলেই আমরা তাঁকে 'দে অলসো র‍্যান' এই তালিকাতে রাখতাম না। কিন্তু তিনি সম্প্রতি একখানি উপন্যাস লিখেছেন— 'মুখোসের চোখে জল'। চারি দিক যখন ছিন্নভিন্ন, জীবনের মালকোষ ইমন যখন বহুদিন হল দীর্ণবক্ষ দোয়েলের মতো তাল সঙ্গত হারিয়ে ফেলেছে, দূষণে ভারাক্রান্ত পরিবেশে যখন নিশ্বাস ছন্দভ্রষ্ট, সেই সময়ে এই উপন্যাসটি আমাদের ধরিয়ে দেয় এখনো বেঁচে থাকার গহন রহস্য। ছোট্টমেয়েটির ডাক্তারবাবুকে নমস্কার, গল্পের নায়ক-নায়িকার অভিনব অভূতপূর্ব প্রেমালাপ এবং সমগ্র কাহিনীর

পরিণাম আমাদের একথা বলে কিছু হারায় নি, কিছু হারাবার নয় । এ বড়া জোরালো কথা ।

পাঁচ

আমাদের আলোচনার শেষ পরিচ্ছেদে আমরা একবার গত তিন দশকের সামাজিক-আর্থনীতিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রের সবথেকে বৃহত্তর জিজ্ঞাসাচিহ্ন ও বিস্ময়চিহ্নের মুখোমুখি হব । সে জিজ্ঞাসাচিহ্ন ও বিস্ময়চিহ্নের সম্মিলিত নাম 'নকশাল' আন্দোলন । সত্তরের দশক থেকে এই নামটি আগুনের গোলার মতো গড়াতে গড়াতে গ্রামে গঞ্জে শহরে শহরতলিতে ক্রমশ বেড়ে উঠেছিল । আজ যদিও সেই আগ্নেয় গোলক ভেঙে টুকরো টুকরো, যদিও পরস্পরের কাছে প্রতিহত হয়ে নিস্তেজ হয়ে গেছে তারা সামাজিকরাজনৈতিক শক্তি হিসাবে, তথাপি The term Naxalite has become to 'symbolize any assault upon the assumptions and institutions that hold up the established order' in India । খতম করার জন্য শ্রেণীশত্রু বাছাই, নগরের গলিপথে ও গ্রামের জঙ্গলে মাঠে গেরিলা সংগ্রামের যে কর্মপদ্ধতি এঁরা গ্রহণ করেছিলেন সে পদ্ধতিকে নিন্দা করব কিনা সেটা স্বতন্ত্র প্রশ্ন । কিন্তু একটা ব্যাপারে কোনো ভুল নেই । পনেরো থেকে বাইশ বছর বয়সের এক প্রজন্মের মেধাবী যুবকেরা —যাদের কোনো রাজনৈতিক ঠিকুজি ছিল না, তারা সব-কিছুকে চ্যালেঞ্জ করে বসল কেন ? শাসকগোষ্ঠী এবং শাসক শ্রেণী এই যুবকদের ক্রিমিনাল বলে চিহ্নিত করতে চেয়েছে । কিন্তু এই যুবকেরা একটা কাজ করেছিল । তাদের ভূমিকার ফলেই :

> "The tempestuous years of 1967-72 have shown that the serenity of the Indian country side is in appearance only; it hides the inflammability of desperate hungry masses— The burning fuse which is laboriously winding its way to reach the wild explosive that will bring down the present order."[১]

অপর দিকে প্রতিস্পর্ধী ভাবাবেগের ধাক্কায় মূর্তি ভাঙতে গিয়ে তাঁরা নিজেরাই ভেঙে বসলেন মধ্যবিত্তমানসের মূলস্রোতের সঙ্গে তাঁদের সেতুসংযোগ । অতিবামপন্থার আবশ্যিক পরিণাম বাল-বিশৃঙ্খলা, তার ঐতিহাসিক প্রমাণ এই আন্দোলন । অথচ এঁদের তাত্ত্বিক প্রাণপুরুষ চারু মজুমদার একটা মোক্ষম কথা বলেছিলেন তাঁর 'নকশালবাড়ি শিক্ষা'-য় এক উদ্ধৃতিতে— যে নিজে স্বপ্ন দেখে না, সে অপরকে স্বপ্ন দেখাতে পারে না, সে কখনো বিপ্লবী নয় । তার প্রমাণ অবশ্যই নকশাল ছেলেরা । একজন প্রখ্যাত সাংবাদিক এঁদের সম্বন্ধে বলেছিলেন— দস্তয়ভস্কি তাঁর নভেলের চরিত্র হিসাবে এঁদের পেলে গর্ব করতেন । প্রাপ্ত মাত্রেন এই মন্তব্যে ঘাড় কাত না করেও বলতে পারি, এই যদি এঁদের সৃষ্টি সামাজিক-রাজনৈতিক অভিঘাতের গুরুত্ব হয়, তা হলে অবশ্যই আমাদের জানতে ইচ্ছা করে, রুশিয়ায় নিহিলিস্টরা, আমাদের দেশে একদা রাজনৈতিক চরমপন্থীরা যেমন উপন্যাস সাহিত্যে অমর চরিত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছেন, এঁরা কতখানি সে জাতীয় প্রতিক্রিয়া রচনা করতে সক্ষম হলেন ! আরো জানতে ইচ্ছা হয়, উপন্যাসের সংস্থান-নির্মিতির ক্ষেত্রেই বা কতটা প্রভাব বিস্তার করেছে এই আন্দেলনকাহিনী এবং তার প্রোটাগনিস্টরা ? আলোচনার জন্য আমরা যেমন সকল ক্ষেত্রেই প্রতিনিধিস্থানীয় উপন্যাস বেছে নিচ্ছি, এখানেও তুলে নিচ্ছি একটি উপন্যাস । উপন্যাসটি 'অগ্নিগর্ভ— লেখিকা মহাশ্বেতা দেবী । মহাশ্বেতা 'হাজারচুরাশির মা' উপন্যাসে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন মধ্যবিত্ত জীবনের বিবর্ণ আবদ্ধ আত্মসন্তুষ্টিতে কতটা ধাক্কা লাগছে এই নব তরঙ্গের ঝাপটে । 'অগ্নিগর্ভ' উপন্যাসে মহাশ্বেতা আরো এগিয়ে গেলেন ভিতরের দিকে । এমন একটি চরিত্র এই উপন্যাসে তিনি উপস্থাপিত করলেন যা রাজনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক তাৎপর্যে একটি সময়ের প্রতিনিধি । চরিত্রটি বসাই টুডু । গত কয়েক দশকের বাঙালি জনজীবনের বৃহত্তর গভীরতর প্রাকৃত দ্বন্দ্বময়তাকে সমগ্রভাবে দেখতে পাওয়া যায় দুটি উপন্যাসের দুটি চরিত্রে— 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' উপন্যাসের বাঘের ও 'অগ্নিগর্ভ' উপন্যাসের বসাই

টুডু । যে বাবুশিক্ষার প্রতি ক্রোধের বিস্ফোরণকে কলকাতার অভিজাত কলেজের ল্যাবরেটরি ভাঙাভাঙিতে অলীক বাবুবিলাস মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক, সেই ক্রোধের একটা সঠিক মাত্রাকে ধরা যায় বসাই টুডুকে দেখলে । সে যখন বলে 'বাবুশিক্ষায় সানতাল মুতে দেয়"— তখন কথাটা শুনে ভাবতে বসতে হয়, বাবুবিপ্লবীকেও ভাবতে বসতে হয়, কথাটা কেন ঠিক সুরে বাজছে ? বসাই টুডু যখন বলে, "নকশালরা গরম লোহায় হাতুড়ি মারতেছু, লিজেরা মরথে ডরাছুনা, তাদের সবাই রেসপেট দিবু হে, তুমুরা যারা মরথে ডরাও, তুমাদের দিব না"— তখন দু দুটো দশকের অনেক জিজ্ঞাসা একসঙ্গে গর্জন করে ওঠে । এইভাবে চরিত্রটি অভ্রান্ত রাজনীতির ঠিকানা দিতে পারে কিনা জানি না, কিন্তু একটা সজীব চরিত্র স্বরূপের হদিশ মেলে । "বাবু একটো জাত । বাগদী— কাওরার মত জাত একটা"— তখন বসাই কোনো কেতাবী মার্কসবাদী 'জারগন' হাঁকে না, কিন্তু বোঝা যায় ভারতীয় মধ্যবিত্তের চরিত্র সে ঠিক-ঠিক ধরেছে । কালো পেশল বেঁটে আঙুল বেঁকিয়ে বসাই বাতাসের গলা মোচড়ায় । এটি তার মুদ্রাদোষ । সে আকাশ চেনে, বাতাস চেনে । ছোটো ছেলেদের প্রতি তার ব্যবহার স্নেহসিক্ত । সে ভালোবাসতে জানে । শেষপর্যন্ত এই রক্তাক্ত রিয়্যালিটি থেকে তৈরি হতে থাকে একটা 'মীথ' । পুলিশ মিলিটারির সঙ্গে এনকাউন্টারে বসাই মারা পড়ে । তার হারানো দিনের 'কমরেট' কালী সাঁতরার ডাক পড়ে লাশ শনাক্ত করার জন্য । লাশ শনাক্ত হয় । কিছুদিন পরে দেখা যায় "বসাই টুডু ইজ্ ইন্ অ্যাকশন এগেন" । একবার নয়, এরকম বার বার ঘটে । পুরানো দিনের গল্পে শুনেছি, বিশে ডাকাত মরে গেলেও তার হাড় থেকে আবার বিশে ডাকাত জন্মাত । এখানে সেই ধারণাকে ব্যবহার করা হয়েছে অন্যভাবে । 'অ্যাকশন' কখনো মরে না । অ্যাকশন মানেই বসাই টুডু । আর, বসাই টুডুর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া কালী সাঁতরা ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির দীর্ঘ আত্মপ্রবঞ্চনার আর ভুল পদক্ষেপের অসহায় দ্রষ্টা । সে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ কম্যুনিস্টদের বিরল নিদর্শন । বসাইয়ের মতো ডাইনামিক সে হতে পারে নি বটে, কিন্তু তার অন্তঃসমীক্ষায় প্রতিফলিত পথের ক্লান্তি, ভ্রান্তির স্বীকৃতি । পরিবারের কাছে উপেক্ষিত, পার্টির কাছে অবজ্ঞাত, তরুণ প্রজন্মের কাছে উপহসিত কালী সাঁতরা ভাবে— "ব্লকের কুয়ো থেকে ডোমরা জল নিতে পারে না দেখলে অথবা বিধবা সহকর্মিণীকে বিয়ে করার কারণে গ্রাম্য স্কুল থেকে নিত্যজীবন দলুইকে বিতাড়িত হতে দেখলে (বিধবাটি বামনী) কালী সাঁতরার মনে হয় প্রাথমিক সংগ্রামগুলিই বিফল হয়েছে— বিপ্লব এদেশে গালভরা কথা বই নয়, পানের তবক মাত্র ।" কালী সাঁতরা আর বসাই টুডু দুজনে দুদিক থেকে এই যথার্থ রাজনৈতিক উপন্যাসে এক অবিভাজ্য অর্থঘনতা সৃষ্টি করে । 'অগ্নিগর্ভ' উপন্যাসের বসাই টুডু এবং সমরেশ বসুর 'মহাকালের রথের ঘোড়া' উপন্যাসের রুহিতন কুরমি একই সঙ্গে আগুনের দহনশিখা ও ভস্মপরিণাম কিনা এ প্রশ্ন মুলতুবি রেখেই একথা বলা চলে, যেখানে এই আন্দোলন সংক্রান্ত অর্ধেক উপন্যাসে বিভ্রান্ত যৌবনের অপচয়ের বেদনা প্রাধান্য পেয়েছে, বাকি অর্ধেক উপন্যাসে যেখানে দায়বদ্ধ থাকতে গিয়ে শিল্পভ্রষ্ট স্বেচ্ছাচার প্রশ্রয় পেয়েছে, সেখানে 'অগ্নিগর্ভ'-ই এখনো পর্যন্ত নকশাল আন্দোলনের পটে একমাত্র উপন্যাস যা উপন্যাস-শিল্পের বিচারেই স্বাতন্ত্র্য পাবে । এই আন্দোলনের প্রত্যক্ষ আবেগ এবং উত্তাপের অভিজ্ঞতাকে উপন্যাসে কাজে লাগিয়েছেন শৈবাল মিত্র । তাঁর 'অগ্রবাহিনী' বা 'অজ্ঞাতবাস'-এর কথা অবশ্য এখানে ধরছি না, কিন্তু অবশ্যই স্মরণ করছি 'মহাজীবন'— মেরি টাইলারের লড়াইয়ের উপাদানে পরিকল্পিত উপন্যাসটি । সংবাদ— আলোড়ক সংবাদ যখন সমাজবাস্তবতার প্রতিচ্ছবি হয়ে ওঠে, তখন তার মধ্যে মেধাবী ঔপন্যাসিক ইতিহাস, মীথ এবং ট্র্যাজেডির সমন্বয়ী কল্পনার অবকাশ খুঁজে পান । 'মহাজীবন' সেই জাতীয় উপন্যাস ।

নকশাল আন্দোলনের একটি অব্যবহিত কিন্তু পরোক্ষ ফল হল আমাদের দৃষ্টি ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ পেল সমাজের শুধু নয়, জাতীয় জীবনের নানা প্রান্তে । দূর পাহাড় অরণ্যের আদিবাসী, এমন-কি বাংলার সীমান্ত ছাড়িয়ে ভিন্ন পটভূমি, সম্পূর্ণ অজানা আর্থ-সামাজিক পরিবেশে বন্দীদশা মানুষের কথা বলার দিকে ঔপন্যাসিকদের আগ্রহ অনিবার্য হল । অমর মিত্র বা আফসার আমেদ— অন্যদিকে অভিজিৎ সেন যেন এক-একটা অজ্ঞাতপূর্ব জীবনের

ঢাকা খুলে দিলেন। বিহারের গ্রাম-জীবনকে, তার অগ্নিসম্ভাবনাপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে বড়োমাপের উপন্যাসে ও হ্রস্বোপন্যাসে বার বার ধরতে চেয়েছেন। তাঁর লেখা 'চরিত্র' নিশ্চয় তাঁর অধিকারকে প্রমাণ করে। তিনি যথার্থ উপলব্ধি করেন সমাজ ও ইতিহাসের নিজ নিজ দ্বন্দ্বময় সমগ্রতাকে উপেক্ষা করে কোনো ঔপন্যাসিকের জীবনবেদ অধ্যয়ন চরিতার্থ হতে পারে না। 'আকাশের নিচে মানুষ' উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় চরিত্র ধর্মা। ছোটোনাগপুর অঞ্চলে ভূমিদাস দোসাদদের জীবনকথা এই উপন্যাসের বিষয়। 'মানি না' এই কথাটি বলতে পারার মতো ক্ষমতা অর্জন করতে ধর্মাদের কতদিন কেটে যায়, লেখক অবিকম্পিত দৃষ্টিতে তা পর্যবেক্ষণ করেছেন। তাঁর একখানি হ্রস্বোপন্যাস 'রামচরিত্র' তাঁর বিষয়াধিকারের ও চরিত্রজ্ঞানের অব্যর্থ প্রমাণ। প্রফুল্ল রায় 'পূর্বপার্বতী' থেকে তাঁর চলা শুরু করেছিলেন। সেই রোম্যান্টিক ভাবাবরণ পরিহার করে তিনি অনেকদূর হেঁটে এলেন। তিনি হৃদয়বান লেখক বলে এটা সম্ভব হল।

আমার এই সংক্ষিপ্ত সবাক সারণী থেকে একটা কথা আভাসিত হতে চায়। ইতিহাস বিবিক্ত নিঃসঙ্গতা থেকে উপন্যাস সৃষ্ট হতে পারে না। উপন্যাস কেন, কোনো কবিতাই কি একান্ত ব্যক্তিগত? উপলব্ধি এবং অভিনিবেশ থেকে এক-একজন লেখকের চরিত্রপাত্রজ্ঞান, পটচেতনা, শ্রেণী নিরূপণ এক-এক মাত্রা পায়। ইতিহাসের হাত ধরেই তারা আসে। শব্দবন্ধ বা বাক্‌ভঙ্গিও সেই ইতিহাস তাড়িতায়িত বলেই সমরেশ বসু - দিব্যেন্দু পালিত - মহাশ্বেতা দেবীর ভাষায় তির্যকচাল সমাজকে প্রতিফলিত ক'রে কল্পনা সহযোগে স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট। আবার কমলকুমার বা অমিয়ভূষণের ভাষাও যত ব্যক্তিগত হোক-না কেন 'অন্তর্জলি যাত্রা' বা 'মধু সাধুখাঁ' ইতিহাসের নির্দিষ্ট বাতাবরণকে ধরে দেয় বলেই তাদের উপন্যাসসার্থকতা তর্কাতীত। এইজন্যই ঔপন্যাসিকের কাজ খুব কঠিন। তাঁকে একই সঙ্গে এতদিকে খর নজর রেখেও বৃহত্তর পাঠককে আকর্ষণ করতে হয়— কী ভাব করবেন সেটা তাঁর মাথাব্যথা। নইলে যে উপন্যাস শুধু একটা 'কোটারি'র মধ্যে বেঁচে থাকবে বলে লেখা হয়, তার বৌদ্ধিক আস্ফালন ঔপন্যাসিক ন্যূনতার নিদর্শন। এই ধরনের তৃতীয় শ্রেণীর উপন্যাসই তৃতীয় শ্রেণীর সমালোচনার জন্ম দেয়। এইসব ঔপন্যাসিকদের ক্ষোভ সেজন্য নিরর্থক।

উল্লেখসূত্র

১. Sumanta Banerji, *In the Wake of Naxalbari.*

ছোটোগল্প
১

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর সময়টাতে সারা পৃথিবীতেই দুর্যোগ চলছে। তাঁর মৃত্যুর বছর দুয়েক আগে থেকেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে এবং সে যুদ্ধের সন্ত্রাস ক্রমশ আমাদের দেশেও ছড়িয়ে পড়ছে। এক কথায়, সময়টা 'সভ্যতার সংকট'কাল। আমাদের দেশেও স্বাধীনতা-আন্দোলন তখন আসন্ন আগস্ট আন্দোলনের প্রস্তুতি নেবে। যুদ্ধবিব্রত ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীও তখন আমাদের এই উপনিবেশে সাম্রাজ্য রক্ষায় শত্রু-আক্রমণের বিরুদ্ধে তৎপর হচ্ছে। ইয়োরোপে তখন স্বেচ্ছাচারী শাসক হিসেবে হিটলার-মুসোলিনির দাপট চলছে। তারও বছর পাঁচেক আগে স্পেনের গৃহযুদ্ধে মানুষ স্পেনের বিদ্রোহী জনগণের সাহায্যে এগিয়ে এসেছেন। সাহিত্যিক-শিল্পীরাও বাদ যান নি। এবং, সাধারণভাবে শিল্প-সংস্কৃতি প্রেমিকরা এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে শিল্প-সংস্কৃতিকেও হাতিয়ার করতে চাইছেন। নিছক নান্দনিক উপভোগের দৃষ্টিকোণ থেকে শিল্প-সংস্কৃতিকে তাঁরা আর দেখতে রাজি নন। পৃথিবীব্যাপী অত্যাচারিত ও শোষিত মানুষদের দুর্দশাকে শিল্পের মাধ্যমে প্রকাশ করার তাড়না তো অনিবার্য হয়ে উঠেছেই, সেইসঙ্গে কী কারণে কোন্ সূত্রে কী পদ্ধতিতে এই শোষণ-অত্যাচার চলছে তার স্পষ্ট ছবিও আনতে চাইছেন তাঁরা। বিশ্বের নানা দেশে শিল্প-সংস্কৃতিকে এই দৃষ্টিকোণে দেখার জন্যে, মানুষকে সচেতন করার জন্যেই প্রগতিশীল লেখক-শিল্পী সঙ্ঘের জন্ম। আর তারই ভারতীয় শাখা তৈরি হবার পর স্বভাবতই এখানকার শিল্পী-সাহিত্যিকরা 'সমাজ সচেতন' শিল্প-সংস্কৃতির জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন। সমাজের স্বরূপকে গভীরভাবে জানার চেষ্টা এবং সমাজকে পরিবর্তন করার তাড়না যদি শিল্পের না থাকে তা হলে শিল্প জীবন ও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে বলেই শিল্প-সাহিত্য-তাত্ত্বিকদের অনেকেই রায় দিলেন। রুশবিপ্লবের সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে এবং তিরিশ দশকের স্পেন-ইটালি-জার্মানির স্বেচ্ছাচারী শাসকদের অত্যাচারের পরিপ্রেক্ষিতে যে আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিকট রূপকে পৃথিবীর মানুষ লক্ষ্য করেছে তাতে তার সৃজন ক্ষমতাকে সমাজ-পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে ভাবাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। শিল্পের এই সামাজিক দায়কে মেনে নিয়েও অনেক বামপন্থী বুদ্ধিজীবী, দ্রষ্টা ও সমালোচক এবং তীক্ষ্ণ শিল্পবোধসম্পন্ন কিছু রাজনৈতিক নেতাও নিছক উদ্দেশ্যবাদী প্রচারধর্মী শিল্প-সাহিত্যকে নিন্দাই করেছেন। সামাজিক দায় হিসেবে শিল্প-সাহিত্যকে দেখেও তাঁরা শিল্পগুণকেই শ্রেষ্ঠ মূল্য দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর কিছু আগে থেকেই সৃষ্টি ও সমালোচনার ক্ষেত্রে সমাজবিশ্লেষণ ও সমাজ-পরিবর্তনের দৃষ্টিকোণটা স্পষ্ট হয়ে আসছিল। ১৯৪০-৪১ সালে যখন যুদ্ধ চলছে ও ছড়িয়ে পড়ছে, রবীন্দ্রনাথ যখন রোগশয্যায় তখনই বাংলা গল্প-উপন্যাসে বিষয়বস্তু ও বিন্যাসে সমাজ-বিশ্লেষণমুখী দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটাই বেড়ে গেছে। এবং মার্কসবাদে বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী কিংবা নিছক মানবিক বোধের তাড়নায় যাঁরা গল্প-উপন্যাস লেখেন, যুদ্ধবিব্রত এই সমাজে তাঁদের সকলেই প্রায় পারিপার্শ্বিক ব্যাপারে সচেতন হয়ে গেছেন। রবীন্দ্রনাথের একেবারে শেষপর্বের গল্পের মধ্যে নতুন মানবিক সম্পর্ক, পুরোনো মূল্যবোধের অবক্ষয়, ভাষার শাণিত বক্রতা এসেছিল। শরৎচন্দ্রের

গল্পকাহিনীর মধ্যেও সামাজিক, বিশেষ ক'রে গ্রামীণ সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসে, মানুষের প্রথাগত অবস্থানের শোচনীয় চেহারা ধরা পড়েছিল কিংবা সামাজিক অবস্থান পাল্টে যাবার ছবিও ধরা পড়ছিল। নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ও জগদীশ গুপ্তের গল্পে অপরাধ-রিরংসা ও নিয়তির কঠিন রূপ রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছের জগতের বাইরেকার অন্য এক সংসারের চেহারা হাজির করেছিল। প্রেমেন্দ্র মিত্র-অচিন্ত্য সেনগুপ্তের গল্পে নাগরিক মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষের অবক্ষয়িত জীবনবোধ, নতুন মানবিক সম্পর্ক (নরনারীর সাধারণ সম্পর্ক এবং দাম্পত্য সম্পর্ক দুক্ষেত্রেই), হাস্যকর উন্নাসিকতা ও মিথ্যা মর্যাদাবোধের ছবি এসেছিল। বিশেষত গ্রাম্য মুসলমান সমাজ নিয়ে অচিন্ত্য শৈলজানন্দ নরেশচন্দ্র খুবই বাস্তববোধসম্পন্ন গল্প লিখেছিলেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে ত্রিশঙ্কু মধ্যবিত্তজীবনের নির্মম বিশ্লেষণে এবং শ্রমজীবী মানুষের বিপন্নতা ও সংহতিবোধের দক্ষ রূপায়ণে প্রায় তুলনাহীন এক শিল্পীকে আমরা পেয়েছিলাম। তেমনি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মনে মেজাজে সম্পূর্ণ পৃথক হলেও গ্রাম্যজীবনের অপরিচিত নানা শ্রেণীর মানুষকে পরিবেশের নিখুঁত পারিপাট্যে ধরে দিয়েছিলেন। জমিদারি প্রথার অবক্ষয়ের ছবি কিংবা নতুন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে পুরোনো মূল্যবোধ-বিশ্বাস-সংস্কারের মরিয়া অথচ ব্যর্থ সংগ্রামের ছবি তারাশঙ্করের বহু গল্পকে স্মরণীয় করে রেখেছে। এই-সব গল্পলেখক এবং এঁদের সঙ্গে প্রায় সমতুল্য আরো কিছু গল্পলেখক— বনফুল, প্রবোধকুমার সান্যাল কিংবা সরোজ রায়চৌধুরী রবীন্দ্রনাথের শেষপর্বের সাহিত্যচর্চার সাক্ষী থেকেও নিজস্ব ভঙ্গিতে গল্পসাহিত্যের পরিবেশনে দৃষ্টিভঙ্গির নতুনত্বে, ঘটনা-নির্বাচনের দক্ষতায়, প্রকাশভঙ্গির সংযমে এবং একাগ্রতায় এই শিল্পটিকে বিশ্বসাহিত্যের গল্পলেখকদের প্রতিদ্বন্দ্বী করে তুলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরেও এই গল্পলেখকগণ পারিপার্শ্বিক-সচেতন হলেন আরো তীব্রভাবে, যুদ্ধ, মন্বন্তর বন্যা এবং আরো পরে, দেশভাগের মুহূর্তে, দাঙ্গায়, বিক্ষুব্ধ সময়কে তাঁরা আরো তীক্ষ্ণভাবে দেখতে লাগলেন।

তারাশঙ্কর তখন 'জলসাঘর', 'তারিণী মাঝি', 'নারী ও নাগিনী', 'অগ্রদানী', 'রসকলি' গল্পের খ্যাতি ছেড়ে এগিয়ে এসেছেন 'তিনশূন্য', 'বোবা কান্না', 'পৌষলক্ষ্মী', ও 'শেষকথা'-র লেখক হিসেবে। ১৯৪১ থেকে ১৯৪৩ সালের মধ্যেই মন্বন্তর ও রাজনৈতিক আন্দোলনের আদর্শের সংগ্রামের ছবি ফুটেছে তাঁর গল্পে। যদিও পুরোনো রেশ তখনও থেকে গেছে—১৯৪৩-এ প্রকাশিত 'বেদেনী' গল্পগ্রন্থের মধ্যে বেদেনী, পিতাপুত্র, ডাইনী-র মতো অসাধারণ গল্প তখন লেখা চলছে। কিন্তু 'তিনশূন্য' গল্পের বীভৎসতা কি আগে দেখেছি? 'শেষকথা' গল্পের আত্মত্যাগের 'সংযত' মহিমার তীব্র বিদীর্ণ প্রকাশ কি দেখেছি? না। তেমনি 'প্রাগৈতিহাসিক', শৈলজশিলা', 'মহাকালের জটার জট' ও 'সরীসৃপ'— গল্পের মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন 'কে বাঁচায় কে বাঁচে', 'যারে ঘুষ দিতে হয়', 'দুঃশাসনীয়', 'ছিনিয়ে খায় নি কেন', 'হারানের নাতজামাই' কিংবা 'ছোট-বকুলপুরের যাত্রী' বা 'শিল্পী'-র মতো গল্প। মন্বন্তর, মূল্যবোধের চরম অধঃপতন, মানুষের পাশবিক রূপ, সন্দেহ-সংশয়, সংহতি-আন্দোলনের এই ছবি ১৯৪৩-এর আগে আঁকা সম্ভব ছিল না। সম্ভব ছিল না বিভূতিভূষণের পক্ষে 'অশনি সংকেত', 'চাউল' কিংবা 'ভীড়' গল্প লেখা। অথবা সরোজ রায়চৌধুরীর পক্ষে 'আগুন' বা 'ক্ষুধা'-র মতো গল্প কিংবা প্রবোধ সান্যালের পক্ষে 'অত্রপর' কিংবা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের পক্ষে 'পুষ্করা' কিংবা 'দুঃশাসন' লেখা।

দুই

কিন্তু ১৯৪২-১৯৪৩ সালের কথা পরে বলছি। একটু পেছিয়ে ১৯৪০ সালের কথায় ফিরে যাই। কেননা, রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর বছর খানেক আগে থেকেই বাংলা গল্পের চরিত্র ও প্রকাশভঙ্গি পাল্টাতে শুরু করেছে 'অযান্ত্রিক' ও 'ফসিল' গল্পের লেখক সুবোধ ঘোষের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে। অযান্ত্রিকের বিষয়বস্তু ও প্রকাশভঙ্গি, পুরোনো একটি ফোর্ড গাড়ির সঙ্গে একটি দরিদ্র ড্রাইভারের জীবিকার সম্পর্ক, বার্ধক্যে ওই প্রায়-অচল গাড়ির ওপর নির্ভরতা এবং শেষকালে একেবারেই অচল গাড়িটিকে যুদ্ধের বাজারে জলের দামে বিক্রি করে দেওয়ার মধ্যে একই সঙ্গে

পুরোনো গাড়ির পাঁজর ভাঙার শব্দ এবং নেশাচ্ছন্ন শোকার্ত এক মানুষের একাত্মতার ট্র্যাজিক ছবি বাংলা গল্পে এই জাতীয় রূপক-উৎপ্রেক্ষায় আগে ফোটে নি। তেমনি 'ফসিল' গল্পে একটি দেশীয় রাজ্যকে কেন্দ্র ক'রে সামন্ততন্ত্র, ধনতন্ত্র এবং কৃষিজীবী-শ্রমজীবীর সম্পর্কের যে ছবি আছে তা শ্রেণীদ্বন্দ্বের প্রথম সার্থক ছবি। যে নতুন কালের সামাজিক দ্বন্দ্বের বিষয় নিয়ে বড়ো উপন্যাসই লেখা যায় সেই বিষয়টিকে বারো পাতার একটি গল্পের ফ্রেমে ধরা প্রায় অসাধ্য কাজ। সেই অসাধ্য কাজ অতি সংযত তীব্র শ্লেষাত্মক প্রকাশভঙ্গিতে সম্পন্ন করেছিলেন সুবোধ ঘোষ। বোঝা যাচ্ছিল, 'তিনসঙ্গী'-র রবীন্দ্রনাথ নিজেকে যতখানি বদলাতে পেরেছেন সে বদলানোর একটা সীমা আছে ; সে সীমা ভাঙতে পারেন 'ফসিল', 'অযান্ত্রিক' কিংবা 'সুন্দরম্' গল্পের লেখকই। এই-সব গল্প লেখার পরেই যখন অগাস্ট আন্দোলন, বন্যা দুর্ভিক্ষ এসে পড়েছে যুদ্ধত্রস্ত এই দেশে, তখন এই সুবোধ ঘোষ, কিংবা আগে থেকে যাঁর দক্ষতা প্রমাণিত সেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতেই এই বিধ্বস্ত সমাজের ছবি যে নিপুণভাবে ফুটে উঠবে এটাই প্রত্যাশিত। যুদ্ধবিষয়ক গল্পের মধ্যে আমাদের সামাজিক প্রতিক্রিয়া ফুটে উঠল অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'প্যানিক' (১৯৫২) এবং নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ডিম' 'খড়্গ' (১৩৫২), 'নক্রচরিত', 'ভাঙা চশমা' (১৩৫১) ইত্যাদি গল্পে। মন্বন্তরের অসহায়, করুণ ও বীভৎস ছবি দেখি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ে 'অশনি-সংকেত' (১৩৫০), 'চাউল' (১৩৫১) ও 'ভীড়' (১৩৫১) গল্পে, তারাশঙ্করের 'বোবা কান্না' (১৩৫১), 'পৌষলক্ষ্মী' (১৩৫১) এবং 'তিনশূন্য' (১৩৫০) গল্পে। এ ছাড়াও সরোজ রায়চৌধুরী, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বীরুর প্রশ্ন, ১৩৫০),পরিমল গোস্বামী ('মহামন্বন্তর' নামে একটি গল্পসংবাদ সম্পাদনা করেন, মার্চ, ১৯৪৪), অচিন্ত্যকুমার ('কালনাগ', 'হাড়', 'বাঁশবাদি', 'চিতা', 'কাক', 'বস্ত্র'-ইত্যাদি গল্প), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ('কালোজল', 'হাড়', 'পুষ্করা', 'দুঃশাসন'), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ('দুঃশানীয়', 'বেড়ী', 'সাড়ে সাত সের চাল', 'রাঘব মালাকার', 'ছিনিয়ে খায় নি কেন', 'কে বাঁচায় কে বাঁচে'), প্রবোধকুমার সান্যাল ('অঙ্গার'), নরেন্দ্রনাথ মিত্র ('মদনভস্ম', 'আবরণ'), নবেন্দু ঘোষ ('কল্কি'), সোমনাথ লাহিড়ী ('১৯৪৩', পরিচয় পত্রিকা- ১৩৫০), সুশীল জানা ('কুকুর') ইত্যাদি গল্পকার বহু স্মরণীয় গল্প লিখেছেন যা মানবিক সংকটের দলিল হিসেবে বিশ্বগল্পসাহিত্যের সম্পদ হিসেবেই গণ্য হতে পারে।

১৯৪২ সালের অগাস্ট আন্দোলন যুদ্ধত্রস্ত দেশে স্বাধীনতালাভের আগে শেষ বড়ো আন্দোলন— ব্রিটিশ শাসকদের ওপর শেষ বড়ো ধাক্কা। এই আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ছাপ স্বাভাবিকভাবেই পড়েছে আমাদের অনেক গল্প-উপন্যাসে। তারাশঙ্করের 'শেষকথা'. 'শবরী', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ইতিহাস', সুবোধ ঘোষের 'কালাগুরু', 'শিবালয়' ইত্যাদি গল্প এই প্রসঙ্গে সকলেরই মনে পড়বে। কিছু পরে চাষীদের ভাগ-চাষের ন্যায্য পাওনা নিয়ে যে তেভাগা আন্দোলন গড়ে ওঠে তাতে অনেক গল্পকারই উদ্‌বুদ্ধ হয়েছিলেন, বিশেষত মার্কসবাদী গল্পকারেরা। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'পেরাণটা', 'দীঘি', 'হারাণের নাতজামাই', 'ছোটবকুলপুরের যাত্রী', 'মেজাজ', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বন্দুক', ননী ভৌমিকের 'বাদা', সমরেশ বসুর 'প্রতিরোধ' এই আন্দোলনের সূত্রেই লেখা। এই জাতীয় গল্পের মধ্যে 'হারাণের নাতজামাই' ত্রাসে, অসহায়তায়, কৌতুকে উপস্থিতবুদ্ধির ক্ষিপ্রতায় ও শেষ পর্যন্ত মর্যাদাবোধের হঠাৎ জাগরণে নিছক আন্দোলনের ছবিই নয়, অসাধারণ মানবিক দলিলও বটে। ছোটোগল্পের সংহতি ও উদ্ভাসেও এ গল্পের তুলনা নেই। বড়ো ছোটো কলকারখানায় নানা ধরনের শ্রমিক আন্দোলনের ছবিও ফুটে উঠেছে বিশেষ করে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শিল্পী', 'ঢেউ', 'কংক্রীট' ইত্যাদি গল্পে। মালিক-শ্রমিক দ্বন্দ্ব বেড়েছে মূলত মালিকদের শোষণবৃত্তির উগ্র প্রকাশে। ধান, চাল, কাপড়-চোপড় ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস লুকিয়ে রেখে প্রশাসনের সাহায্যে অর্থলিপ্সু মালিকদের দাপট ও তার বিরুদ্ধে শ্রমিক-কৃষক সাধারণ মানুষের আক্রোশকে মানিক যে নির্মমতার সঙ্গে প্রকাশ করেছেন তার বাংলা দেশে প্রায় তুলনা নেই।

যুদ্ধ থামলে যুদ্ধের সুযোগ-সুবিধাগুলো আয়ত্ত করে নিয়ে মালিক ও প্রশাসন-সংশ্লিষ্ট মানুষ যেমন মধ্যবিত্ত

গরিব-দুঃখীদের শোষণ করার 'শিক্ষা' পেয়ে গেছে তেমনি ব্রিটিশ শাসনের অবসান-মুহূর্তে রাজনৈতিক চক্রান্তে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা, দেশভাগ ও উদ্বাস্তু -সমস্যা এসে আমাদের অর্থনৈতিক ভিতকে নষ্ট করে দিয়েছে। রাজনৈতিক ও সামাজিক চরিত্রকে প্রায় আমূল পালটে দিয়েছে । সামাজিক জীবনের উপর এই চাপ নিছক ব্যক্তিগত সমস্যা, পারিবারিক ও নিছক মানবিক সম্পর্কের মধ্যে কথাসাহিত্যিকদের আবদ্ধ রাখতে দেয় নি । দাঙ্গা নিয়ে গল্প লিখেছেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ('কলকাতার দাঙ্গা ও আমি', ১৩৫৩), বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ('বিশ্বাস',. 'সত্যাগ্রহী', ১৩৫৪), মনোজ বসু ('হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা', ১৩৫২, 'একটি দাঙ্গার কাহিনী', ১৩৫২),রমেশ সেন ('সাদা ঘোড়া', ১৩৫৩), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ('খতিয়ান', ১৯৪৭, 'ভালবাসা' ১৯৪৮, 'ছেলেমানুষি' ১৯৪৮, 'স্থানে ও স্থানে ১৩৪৮), অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ('স্বাক্ষর'), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ('ইজ্জত' ১৩৫৫ উস্তাদ মেহের খাঁ ১৩৫৫) এবং সমরেশ বসু-র ('অঙ্গার' ১৩৫৩) মতো প্রতিষ্ঠিত বা সদ্যপ্রতিষ্ঠিত গল্পকার। আর দেশভাগের ফলে উদ্বাস্তু সমস্যা—যা আজও শেষ হয় নি—তো আমাদের অজস্র গল্পের বিষয়। চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকের সন্ধিতে লেখা যে-সব গল্পের কথা এখনো মনে পড়ে তার মধ্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সুবালা' এবং 'চপার', হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের 'লাঠিয়াল', নরেন্দ্রনাথ মিত্রর 'হেডমাস্টার', সন্তোষকুমার ঘোষের 'দ্বিজ' এবং সমরেশ বসুর 'পশারিণী' অবশ্যই উল্লেখযোগ্য।

আর এই দুর্যোগ-দুর্ঘটনার মধ্য দিয়ে আমাদের পুরানো মূল্যবোধগুলি যেভাবে ভাঙতে শুরু করল তার স্মরণীয় ছবি পাই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'যাকে ঘুষ দিতে হয়', 'নমুনা', মনোজ বসুর 'রাজবন্দী' ও 'গান্ধীটুপি', নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'চোরাবালি' ও 'রসাভাস' (১৩৫২), সন্তোষকুমার ঘোষের 'কানাকড়ি' এবং নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'তীর্থযাত্রা'র মতো গল্পে। এই সমস্ত গল্পই দক্ষ কলমে লেখা সমকালীন মানবিক অবক্ষয়ের দলিল। আবার এই সামগ্রিক হতাশার মধ্যে কিছু গল্পে আশার কথাও ছিল। তারাশঙ্করের 'আখেরী', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মঙ্গলা' কিংবা 'বাগ্‌দীপাড়া দিয়ে', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'দরজা' কিংবা সুশীল জানার 'সওয়াল' গল্প এই প্রসঙ্গে মনে পড়বে।

তিন

চল্লিশের দশকের দুর্যোগের মধ্যে যে-সব উদীয়মান গল্পকারেরা তাঁদের সমাজ সচেতনতার পরিচয় দিয়ে গল্প-সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছিলেন তাঁদের অনেকেরই নাম করেছি ইতিপূর্বে প্রতিষ্ঠিত গল্পকারদের সঙ্গেই। সুবোধ ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, রমেশ সেন, সন্তোষকুমার ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, সুশীল জানা, সোমনাথ লাহিড়ী, সোমেন চন্দ কিংবা সমরেশ বসু—এই-সব গল্পকাররেরাই মূলত চল্লিশের দশকেই প্রথম প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। গল্পের ফর্মকে আয়ত্ত করে এঁরা সমকালীন নানা সমস্যাকে যেমন স্মরণীয় করে রেখেছেন তেমনি সাধারণভাবে মানবিক সম্পর্ক ও সমস্যাকে ফুটিয়ে তুলেছেন দক্ষ হাতে। তথাকথিত ভদ্র মধ্যবিত্তের রীতি নীতি, একটু অভিজাত শ্রেণীর মানুষের অহং-মন্যতা এবং প্রচলিত সংস্কারকে তীব্র বিদ্রূপ করা হয়েছে সুবোধ ঘোষের 'পরশুরামের কুঠার' ও সুন্দরম্' গল্পে । শেষ গল্পে ডাক্তারের হাতে গর্ভিণী মৃত একটি মেয়ের পোস্টমর্টেমের যে বর্ণনা আছে তার ভাষারও তুলনা নেই, অভিজ্ঞতায় ও বর্ণনার দক্ষতায় ওই গল্পটি রবীন্দ্রনাথেরও ঈর্ষণীয় হতে পারত। মধ্যবিত্তের দ্বিধা, কাপুরুষতা ও ভীরুতা ('নির্ধনু', 'কাঞ্চনসংসর্গাৎ'), সাম্প্রদায়িক বিভেদ ('চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধ') ইত্যাদি বিচিত্র বিষয়ের গল্প তিনি নিখেছেন। তির্যক বিদ্রূপে ও সাংকেতিক ভাষায় লেখা সে-সব গল্প এখনো মনে গভীর দাগ কেটে যায়। গল্পের শিল্পকর্মে অত্যন্ত সচেতন সুবোধ ঘোষ ঘটনা নির্বাচনে, তীব্র নাটকীয় উন্নয়নে বিন্যাস-বাঁধুনিতে সব সময়েই নজর রেখেছেন । তেমনি সমাজসচেতন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 'দুঃশাসন, 'পুষ্করা', 'নক্রচরিত', 'হাড়', কিংবা 'টোপ' ছাড়াও প্রেম ও দাম্পত্য প্রেমের জটিলতার দিকটিকেও

দক্ষতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করেছেন। অন্যদিকে আত্মকথনের ভঙ্গিতে ব্যক্তিমন ও সেই সূত্রে সমাজ-মানসিকতার তীক্ষ্ণ মননশীল বিশ্লেষণে সন্তোষকুমার ঘোষ আমাদের প্রথাগত পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কগুলিকে ধাক্কা দিয়েছিলেন। প্রচলিত সম্পর্কের বাইরে যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে, পূর্বসম্পর্কের সঙ্গে তার জটিল মিশ্রণে যে বিষণ্ণ মুখ ঘনিয়ে ওঠে মানুষের মনে, বিশেষ করে সেই জাতীয় অনুভবকে তুলনাহীন ভাষায় ধরতে পারতেন সন্তোষকুমার ঘোষ। 'শোক', 'ছোটকথা', 'যাত্রাভঙ্গ', 'দিনপঞ্জি' ইত্যাদি গল্পগুলি ধারালো ভাষায় লেখা তীক্ষ্ণ অনুভবের গল্প। শেষজীবনে গল্পের নানা পরীক্ষা করেছিলেন তিনি যতটা না টেকনিকের তার চেয়ে বেশি ব্যক্তিমনের গভীরে নানা কৌণিক পর্যবেক্ষণের। তথাকথিত প্লটের বাইরে বেগবান ভাষায় মানসিক জটিলতার বিশ্লেষণ তাঁর পরবর্তী গল্পরচনার এক নতুন চরিত্র।

সন্তোষকুমারের প্রকাশভঙ্গির মার্জিত ঔজ্জ্বল্য হয়তো নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছিল না। কিন্তু আন্তরিক বিশ্লেষণের সাহায্যে মানুষের মনের ধীর উন্মোচনে তাঁর ক্ষমতা ছিল প্রশ্নাতীত। চল্লিশের দশক থেকে সত্তর দশক পর্যন্ত বাংলা গল্পের রীতি নীতি নিয়ে অনেক পরীক্ষাই হয়েছে, কিন্তু খুব বেশি পরীক্ষা প্রবণতার দিকে তিনি যান নি। তাঁর প্রায় তিরিশ বছরের সাহিত্যচর্চায় দেশভাগ ও স্বাধীনতা, উদ্বাস্তু সমস্যা ও মূল্যবোধের নানা পরিবর্তন নিম্নবিত্ত বাঙালির মনে যে প্রতিক্রিয়া জাগিয়েছিল তাকে খুঁটিয়ে দেখতেই তিনি ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু এ-সবের আগে যে গল্পটি লিখে তাঁর স্বীকৃতি সেই 'রস' গল্পটি অবশ্য একেবারেই গ্রামীণ জীবনের— গুড় তৈরি করে এমন একটি মুসলমান তরুণের জীবন ও জীবিকার সংগ্রামের গল্প। জীবিকার সঙ্গে ভালোবাসার দ্বন্দ্বের এই গল্পে আঞ্চলিক ভাষার সংলাপের চাতুর্য কৌতুক যেমন উপভোগ্য, তেমনি দ্বন্দ্বে-পরাস্ত নায়কের সঙ্গে কর্মদক্ষ প্রথমা স্ত্রীর অতি সংযত শেষ সাক্ষাৎদৃশ্যটিও বড়ই মর্মান্তিক ও ইঙ্গিতবহ। এই দক্ষতা নিয়েই নরেন্দ্রনাথ পরে বিশেষ করে শহুরে নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনসংগ্রামের বিচিত্র দিকগুলি নিজস্ব অনুত্তেজিত ভঙ্গিতে দেখিয়েছিলেন। 'চোর', 'পালঙ্ক', 'হেডমাস্টার', 'বিকল্প', 'অবতরণিকা', 'অভিনেত্রী', 'এক পো দুধ', 'দোলা', 'একটি প্রেমের গল্প', 'রাণু যদি না হতো'—এমন অজস্র গল্পের নাম বলা যায় যেগুলির মধ্যে অনেকগুলি সমকালীন সমাজব্যবস্থারই ছবি, এমন কি নতুন ভাবনা-চিন্তারও ছবি। আবার, পুরোনো দুর্মর মূল্যবোধেরও ছবি। বিপর্যস্ত মূল্যবোধের মধ্যেও জীবনের ওপর অসীম মমতায় নরেন্দ্রনাথ অনেক গল্পে উচ্চ মাত্রা আনতে পেরেছিলেন।

আরেকজনের কথা এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়— বিশেষ করে মানবিক সম্পর্ক বিশ্লেষণের সূত্রে। খুব স্পষ্টভাবে সময়সচেতন না হলেও জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর দৃষ্টিভঙ্গিটা খুবই নতুন। ভাষার মধ্যেও জড়িয়ে থাকা প্রচ্ছন্ন ইন্দ্রিয়সত্তার স্বাদ তাঁর গল্পে নতুন মাত্রা এনেছিল। খানিকটা চেতনাস্রোতের ভঙ্গিতে লেখা তাঁর গল্পে স্মৃতি-অনুষঙ্গ আসে, প্রকৃতি মানুষ মিলে মিশে যায় এক অখণ্ড দৃষ্টিতে। মানুষের আন্তর্লোকের প্রতি তাঁর নজর বেশি। মানুষের স্বভাব-ধর্মের তীক্ষ্ণ ও বিশ্বাসযোগ্য বিশ্লেষণে অনেক পাঠকই নিজেকে খুঁজে পাবে। কাজেই প্রথাগত গল্পের মাঝে তাঁর গল্পগুলিকে বিচার করলে অন্যায় হবে। 'গিরগিটি' গল্পে একটি বৃদ্ধের চোখে কুয়োতলা, শ্যাওলা, জলের ধারা, গিরগিটি ও প্রজাপতির সঙ্গে একটি নগ্ন মেয়ের নিঃসঙ্গ রূপ মিলিয়ে এক ধরনের অখণ্ডতা পাওয়া যাবে যাকে অযৌন সৌন্দর্যদৃষ্টি বলা যেতে পারে। 'বনের রাজা' 'গিরগিটি', 'সামনে চামেলি', 'গাছ', 'সমুদ্র' এই-সব গল্পে প্রকৃতি যেন তার উদাসীন মন নিয়ে মানুষের চেতনায় বিচিত্র সব খেলা করে যায়, এবং জ্যোতিরিন্দ্র এক ধরনের 'ধ্যানী' দৃষ্টিতে সেই সব খেলার বিবরণ দেন। এমন স্বাতন্ত্র্যময় অ্যাবস্ট্র্যাক্ট্ গল্প-চিত্রশিল্পী বাংলা গল্পে কোনো উত্তরাধিকার রাখে নি, রাখতে পারেও না। এই-সব নতুন উদীয়মান গল্পলেখকদের পাশাপাশি পুরোনো কল্লোলগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠিত প্রেমেন্দ্র-অচিন্ত্য-বুদ্ধদেব-শৈলজানন্দ তো ছিলেনই, ছিলেন ব্যঙ্গবাণনিপুণ পরশুরাম, তারাশঙ্কর, মানিক, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মুখোপাধ্যায়, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, সুমথনাথ ঘোষ, সজনীকান্ত দাস, বনফুল, প্রমথনাথ বিশী, পরিমল গোস্বামী, প্রবোধকুমার সান্যাল, সরোজ রায়চৌধুরী,

আশালতা সিংহ, আশাপূর্ণা দেবী এবং সদ্য প্রতিষ্ঠিত বাণী রায়, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, নিমাই ভট্টাচার্য, প্রতিভা বসু ও শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁদের অনেকেই সমকালীন বিক্ষুব্ধ পরিবেশ নিয়ে যেমন গল্প লিখেছেন তেমনি নিজেদের নানা প্রবণতা অনুযায়ী ঐতিহাসিক রোম্যান্স্, ইতিহাসাশ্রিত গল্প, বিশুদ্ধ হাসির ও ব্যঙ্গের গল্প, এমন-কি অতিপ্রাকৃত-পরিবেশ-প্রধান গল্পেও দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছেন।

চার

যাঁদের কথা ইতিপূর্বে বলা হল তাঁদের তুলনায় বয়সে একটু ছোটো হলেও চল্লিশের থেকেই প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন রমাপদ চৌধুরী। বহির্বঙ্গের যে অঞ্চল নিয়ে সুবোধ ঘোষ গল্প লিখেছিলেন সেই সাঁওতাল পরগনার পটভূমি ও মানুষ নিয়েই রমাপদ চৌধুরীর লেখা গল্প 'দরবারী', 'লাটুয়া', 'ওঝার কাহিনী', 'রেবেকা সোরেনের কবর' স্মরণীয় হয়ে আছে। মানুষের স্বার্থপরতা, প্রতিযোগিতা, অন্তঃসারহীন সম্ভ্রমবোধ, নীচতা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা, কল্পনা ও বাস্তবের ব্যবধান সবই তাঁর সংযত গল্পশিল্পের ফর্মে চমৎকারভাবে ধরা পড়েছে। 'আমি, আমার স্বামী ও একটি নুলিয়া', 'ডাইনিং টেবল্', 'ফ্রিজ', 'চাবি', 'অটোগ্রাফ', বক্তব্যের পরিবেশনে গল্পশিল্পের নানা বৈচিত্র্যকেই প্রকাশ করেছে। চল্লিশের দশকের আর-এক শক্তিমান লেখক সমরেশ বসু পঞ্চাশ-ষাটের দশকে প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছিলেন 'আদাব' গল্প লেখার পর 'জোয়ার-ভাঁটা', 'কাণ্ড', 'পাড়ি', 'শানা বাড়রীর রূপকথা' ইত্যাদি গল্প লিখে। চরম দারিদ্র্য ও জৈবিক তাড়নার পাশাপাশি সুবিধাভোগী শ্রেণীর শোষণবৃত্তি ও বিকারের খুব বলিষ্ঠ ছবি আছে তাঁর গল্পে। অভিজ্ঞতাই তাঁর গল্পের শরীর গড়ে দিয়েছিল অনেক ক্ষেত্রে। পঞ্চাশ দশকের যখন আরো কিছু তরুণ গল্পলেখক এসেছেন তখন প্রায় উত্তর-তিরিশ বয়সের পরিণত লেখক বিমল কর এই-সব তরুণ লেখকদের সামনে রেখে এক আন্দোলনে নামলেন যার মুখপত্র 'ছোটগল্প নতুন রীতি'। পরে তাঁরই সম্পাদিত 'এই দশকের গল্প' এই সময়কার তাৎপর্যময় সংকলন। মানুষের সম্পর্ক, মানসিক প্রতিক্রিয়ার রোমাঞ্চকর বিশ্লেষণ এবং সেইসঙ্গে তার বিন্যাস ও ভাষা-পরীক্ষায় বিমল করের 'যযাতি', 'আত্মজা', 'পার্ক রোডের সেই বাড়ি', 'পিঙ্গলার প্রেম' ঠিক ছোটোগল্পের প্রচলিত সংজ্ঞার্থে আসে না 'জননী', 'সুধাময়' ইত্যাদি গল্পে জিজ্ঞাসার টেন্‌শনই তাঁর 'গল্প' তৈরি করে। যার জন্যে মানুষের ভয়, সংশয়, অনাস্বাদিত কোনো অভিজ্ঞতার অস্বস্তি তা-ই যেন ঘটে যায়—এই রকমই জীবন যাপনের নিয়তি তাঁর গল্পে মননশক্তির টান তৈরি করে। এইটেই নতুন রীতির ছোটোগল্পের বৈশিষ্ট্য। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি যাঁদের গল্প নিয়ে এই নতুন রীতির মুখপত্রের সূচনা ও আকস্মিক সমাপ্তি তাঁরা কেউই প্রচলিত প্লটের গল্প সব সময়ে লেখেন নি। প্লটহীন তুচ্ছ গল্পবস্তুর অসাধারণ বিন্যাস আমরা আগেও পেয়েছি, কিন্তু এই জাতীয় জিজ্ঞাসার টান আমরা আগে পাই নি। অন্তর্জগতের জিজ্ঞাসার টানে গল্পের তার টেনে বাঁধা খুবই শক্ত কাজ। বরং, বহিরাশ্রয়ী কোনো ঘটনাকে রূপকে-উদ্ভটে মিলিয়ে একটা অভিপ্রায়কে প্রকাশ করা তুলনায় সহজ। এবং তা-ই ঘটেছে অধিকাংশ গল্পকারের ক্ষেত্রে। কিন্তু এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে একটা প্রবণতা বেড়েছে। তা হল গল্পকে নাটকীয়ভাবে ক্লাইম্যাকসের দিকে না নিয়ে গিয়ে গল্পকে 'মুক্ত' রাখার চেষ্টা। যদিও পঞ্চাশ-ষাটের দশকের বহু গল্পলেখক প্রথাগত ভঙ্গিতেই সিদ্ধি পেয়েছেন তবু আরেক ক্ষেত্রেই এই প্রবণতা দেখা গেছে। 'কৃত্তিবাস' গল্পসংকলনের সম্পাদক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, মিহির আচার্য, প্রফুল্ল রায়, কবিতা সিংহ, মতি নন্দী, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ, দেবেশ রায়, আনন্দ বাগচী, সুধাংশু ঘোষ, রতন ভটাচার্য, দিনেশ রায়, উদয়ন ঘোষ, যশোদাজীবন ভট্টাচার্য, আশীষ বর্মণ, সমরেশ দাশগুপ্ত, প্রলয় সেন, নবনীতা দেব সেন, বীরেন্দ্র দত্ত, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদি অনেক লেখকই বিচিত্র স্বাদের ও ভঙ্গির গল্প লিখেছেন। এঁদের অনেকের গল্পেই

প্রচলিত পদ্ধতির বিন্যাস যেমন আছে তেমনি আছে মানসিক প্রতিক্রিয়ার চমৎকার বিন্যাস। পঞ্চাশ-ষাটের দশকের তরুণ প্রজন্মের হতাশা, ঘৃণা, অভিমান, প্রতিবাদ, প্রতিশোধস্পৃহা, প্রতিযোগিতা ও আত্মত্যাগের নিছক অনুভূতি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পের প্রাণ। অন্যদিকে হঠাৎ একটা পাখির ডাক কিংবা চেনা কণ্ঠের ডাক যেমন সুনীল গল্পের বিষয় করতে পারেন— কোনো প্রথাগত সিদ্ধান্তে বা ক্লাইম্যাকসে না পৌঁছে, তেমনি মানুষ, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের মানুষের একটু বিচিত্র ধরনের চরিত্র স্বভাব— কিংবা ঘটনার নিছক কৌশলী বিন্যাসেও শ্যামল গল্পের স্বাদ আনতে পারেন। অন্যদিকে মানুষের অন্তর্লোকের অনেক প্রার্থনা, আকাঙ্ক্ষা, অপ্রাপ্তি ও বিচ্ছিন্নতার গভীর কোনো মূল ধরে গল্প জমাতে পারেন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। মতি নন্দী এতখানি অন্তর্মুখী নন, তবু আত্মপীড়িত মানুষের তীব্র বিষাদ বিরল বাক্‌সংযমে, কৌতুকে, তীব্র গতিতে ফুটিয়ে তুলতে পারেন দক্ষ হাতে। আবার দিব্যেন্দু পালিত আত্মকথনের ভঙ্গিতে গল্প বলতে ভালোবাসেন। অস্তিত্বের নানা সমস্যাই তাঁর গল্পে সংযত রূপ পেয়েছে। আর যে জিনিসটার বাংলা গল্পে একান্ত অভাব-সেই বুদ্ধিদীপ্ত ব্যঙ্গ-কৌতুক দিব্যেন্দুর হাতে খোলে ভালো। দিব্যেন্দুর 'শুক্রেশনি' এবং আনন্দ বাগচীর 'স্বাজযোটক'-এর গল্পগুলি সেই অভাব খানিকটা পূরণ করেছে। রাজনৈতিক বিশ্বাসের সঙ্গে জটিল মানবিক সম্পর্ককে মেলাতে পেরেছিলেন, 'অশ্বমেধের ঘোড়া'-র লেখক অকালপ্রয়াত দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রায় একই রকম দক্ষতায় দেবেশ রায় 'পশ্চাৎভূমি', 'উদ্বাস্তু' এবং 'আহ্নিক গতি ও মাঝখানের দরোজা' ইত্যাদি গল্প রচনা করে খ্যাতি পেয়েছিলেন। নতুন রীতি-র গল্প নিয়ে তাঁর আলোচনাও ষাটের দশকে বিতর্ক তুলেছিল। অন্যদিকে সিরাজ, বরেন, অতীন, অভিজ্ঞতার জোরেই মূলত গল্পের টান বজায় রাখতে পারেন।

আবার, অন্তত লেখক-লেখিকার নাম করা যায় বয়সে যারা পঞ্চাশ-ষাটের সন্ধিকালের লেখক-লেখিকাদের চেয়ে বড়ো—তাদের গল্পকাররূপে প্রতিষ্ঠা মূলত এই তরুণদের সমকালেই। কাব্যময় ভাষায়— প্রথমদিকে সাধু ভাষায় —আখ্যানধর্মী গল্পে কমলকুমার মজুমদার যেন খানিকটা প্রাচীন গল্প বয়নের নতুন জন্মান্তর ঘটিয়েছিলেন। গল্পের শুরু ও সমাপ্তিতে অনেকটাই তিনি আধুনিক অর্থাৎ 'মুক্ত'। নিছক গল্পের নয়, গল্প 'বলা'র মাঝখান থেকে অসমাপ্ত বাক্যের সূত্র ধরেও তিনি গল্প শুরু করেছেন। বিশেষত প্রাচীন সমাজ, খ্রীস্টান সম্প্রদায়, অন্ত্যজ সমাজের লৌকিক-অলৌকিক বিশ্বাসকে খুব গভীর থেকে তুলে আনতে পারেন তিনি। 'মিস অন্নপূর্ণা', 'সুহাসিনী পমেটম' জাতীয় গল্পের দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রকাশভঙ্গি প্রায় অননুকরণীয়। অবশ্য অতিরিক্ত পরীক্ষা-প্রবণতা তাঁর অনেক গল্পের বীজকে স্পষ্ট রূপ দিতে দেয় নি। অন্য দিকে অমিয়ভূষণ মজুমদার সমাজচেতনার সঙ্গে রহস্যময়তাকে মিশিয়ে গল্পের ক্ষেত্রে এক নিজস্ব ভাষাভঙ্গি এনেছিলেন। যদিও, আরো পরে, কোনো কোনো গল্পের গদ্যে একইরকম অতিরিক্ত পরীক্ষা-প্রবণতা পাঠকের পক্ষে অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছে। আর একজন মহাশ্বেতা দেবী। আমাদের আলোচ্য পর্বের শেষের দিকে গল্পকার হিসেবে তাঁর প্রতিষ্ঠা হয়েছে সূলত অন্ত্যজ গোষ্ঠীর সঙ্ঘবদ্ধ জীবনে আবেগঘন সম্পর্ককে জৈবিকতার সঙ্গে মিলিয়ে খুবই বলিষ্ঠভাবে প্রকাশ করতে পারেন বলে।

পাঁচ

স্বাধীনতার সমকালে যাঁরা বড়ো হয়েছেন তাঁরা দাঙ্গা, দেশভাগ, প্রশাসনিক ব্যর্থতা ও ছিন্নমূল মানুষের অসহায়তার মধ্যে বড়ো হয়েছেন, কিংবা সে-সবেরই ঘনিষ্ঠ সাথী তাঁরা। তাঁদের অনেকেই সামাজিক ও রাজনৈতিক সংকটকে মূলত ব্যক্তির সংকট হিসেবেই দেখেছেন এবং শিল্প সাহিত্যে ব্যক্তি-অস্তিত্বের সংকটকেই জোরালোভাবে প্রকাশ করে নিজেদের 'হাংরি জেনারেশন' বলে দাবি করেছেন। প্রায় তিরিশজন গল্পলেখকের একান্তই 'গল্পকেন্দ্রিক' এই শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন মূলতই আত্মকেন্দ্রিক, ব্যক্তির অস্তিত্বকেন্দ্রিক। এঁদের অনেক গল্পে একটা সামাজিক ঘেরাটোপ থাকত, কিন্তু ঝোঁকটা ছিল 'ব্যক্তি'-র ওপরেই। যেমন রাধানাথ মণ্ডল, শেখর বসু, ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়,

তপন বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা অমর মিত্র। কিন্তু এই গোষ্ঠীরই সুব্রত সেনগুপ্ত, অতীন্দ্রিয় পাঠক কিংবা সুবিমল মিশ্র 'অতিরিক্ত' আত্মকেন্দ্রিক বলেই পাঠকসমাজে তেমন সাড়া জাগাতে পারেন নি। আবার অনেকেরই গল্প নিছক 'রচনা' কিংবা তাৎপর্যহীন অনুভূতির বিন্যাস কিংবা মানুষের শারীরিক ব্যাপার নিয়ে কৌতুক। আবার কিছু 'রচনা' একেবারেই গল্পবীজহীন দু-একটি শব্দের ইতস্তত বিন্যাস, একান্ত ব্যক্তিগত অনুষঙ্গ সে বিন্যাসে থাকতে পারে, তবে সাধারণ পাঠকের কাছে তা তাৎপর্যহীন। প্লটহীন ছোটোগল্পকে সোনার পাথরবাটি মনে না করলেও থীমহীন ছোটোগল্পকে ফ্যাটলেস চর্বি-র মতোই অবাস্তব বলে মনে হয়— কবিতা সিংহের এই অভিজ্ঞতাটা তাঁদের অনেকেরই হয় নি। অবশ্য সুখের কথা, এই ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা থেকে ধীরে ধীরে চমৎকার গল্পরেখায় বা তাৎপর্যময় থীমে স্পষ্ট হয়ে এসেছেন রমানাথ রায়, শেখর বসু, রাধানাথ মণ্ডল বা আশিস ঘোষের মতো কেউ কেউ। আর শাস্ত্রবিরোধিতার বাইরে শিল্পগত ভারসাম্য দিয়ে বেশ-কিছু প্রবীণ পরিণত গল্পকারদের পাশাপাশি কিছু নতুন গল্পলেখক এই সময় থেকেই লিখছেন। সমীর রক্ষিত, জীবন সরকার, অশোককুমার সেনগুপ্ত, সমরেশ মজুমদার, কল্যাণ মজুমদার, কণা বসু মিশ্র, সোমনাথ ভট্টাচার্য, চিত্ত ঘোষাল কিংবা সাধন চট্টোপাধ্যায়ের মতো আরো বেশ-কিছু গল্পকার বাংলা গল্পের ধারাকে বলিষ্ঠতার সঙ্গেই সত্তর দশকে পৌঁছে দিয়েছেন।

ছোটোগল্প
২

সমরেশ মজুমদার

রবীন্দ্র-প্রয়াণের পঁচিশ বছর অন্তে জাতীয়-জীবনে মূল্যবোধের অবনতি, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের আচরণে বিশ্বাসহীনতা, অসংখ্য ছিন্নমূল মানুষের অসন্তোষের তীব্রতা অসহনীয়স্তরে পৌঁছে গিয়েছিল, দাঙ্গার ক্ষতের অস্বস্তিকর জ্বালা নানা বিদ্রোহ ও আন্দোলনের রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছিল— এর প্রতিফলন সাহিত্যের আঙিনায় স্বতই এসে পড়েছিল। কথাসাহিত্যিকবর্গ দল ও মতের পার্থক্য সত্ত্বেও, তাঁদের রচনাসমূহকে ভরে তুলেছিলেন এ-সকল উপাদান দিয়ে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরও দ্বিখণ্ডিত দেশে বিদ্যার পাশাপাশি বিনয় বসবাস করে নি, উপরন্তু মুছে নিয়ে গেছে বিশ্বাস নামক বস্তুটিকে। রাষ্ট্রব্যবস্থার দৈন্যের সঙ্গে অর্থনৈতিক বিপর্যস্ত রূপ প্রকট হয়ে দেখা দেওয়ায় ক্রমাগত অবনতি ঘটেছিল সামাজিক মূল্যবোধের, অধোগতি এসেছিল সাধারণভাবে সকল শ্রেণীর মানুষের জীবনযাত্রায়, দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল শ্রমজীবী ও কৃষকশ্রেণীর দৈনন্দিনতায়। বিভিন্ন আন্দোলনের ধাক্কায় উদ্ভ্রান্ত মানবজীবন— ঘটে গেছে তেভাগা-আন্দোলন, রাজনৈতিক অপেক্ষা অর্থনৈতিক আন্দোলন-ই তাকে বলা সংগত, নিজস্ব রাজ্যের দাবিতে তৎপর দ্রাবিড়-মুনাত্রা-কাজাগাম, নানা অসন্তোষের রূপারোপের প্রতীকী হয়ে উঠেছিল তেলেঙ্গানা-বিদ্রোহ, তার অনুরূপ কাকদ্বীপ অঞ্চলে বিদ্রোহ আভাসিত হয়েছিল কংসারি হালদারের নেতৃত্বে, ঘটে গেছে ট্রাম-আন্দোলন, খাদ্য-আন্দোলনের রেশ তখনো মিটে যায় নি। আমাদের সময়সীমায় পশ্চিমবঙ্গে এতদিনের কংগ্রেসি-একচ্ছত্র রাজত্ব চূর্ণীকৃত, এসেছে অ-কংগ্রেসি সরকার— যুক্তফ্রণ্ট, অত্যল্পকালের মধ্যে শিলিগুড়ির অন্তর্গত নকশালবাড়ি অঞ্চলে অতিবাম বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে, ইতোমধ্যে চীন-ভারত যুদ্ধের প্রেক্ষিতে কম্যুনিস্ট পার্টি দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল, তবু জমি তার, লাঙ্গল যার বিশ্বাসীদের নেতৃত্বে কানু সান্যাল ও জঙ্গল সাঁওতাল এসে জীবনবোধের সংজ্ঞাকে পাল্‌টে দিতে চেয়েছিলেন। ফলত অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠেছিল ছাত্র-সমাজে, সেখান থেকে ধীরে ধীরে জনজীবনে আতঙ্ক ও দুর্যোগের কালোছায়া নেমে এসেছিল। বাষট্টির চীন-ভারত যুদ্ধের পর পঁয়ষট্টিতে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ, এরপর একাত্তরে যুদ্ধের বীভৎসতার মধ্যে 'বাংলাদেশ' নামক ভূখণ্ডের জন্ম। নকশালবাড়ি আন্দোলন থেকে শ্রেণীসংগ্রামের নামে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীহত্যার রাজনীতি শুরু হল, পুলিশে আন্দোলনকারীর মধ্যে তা সীমাবদ্ধ না থেকে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর মধ্যে তা প্রসারিত হয়ে গেল, অরাজকতার মধ্যে ভেঙে পড়ল শিক্ষা-ব্যবস্থা, গণ-টোকাটুকি, পরস্পরে অবিশ্বাস, মৃত্যুর রক্ত-স্নানে মেতে উঠল পশ্চিমবঙ্গ। যে দাঙ্গার পটভূমিকায় সমরেশ বসু 'আদাব' লিখেছিলেন, রমেশ সেন 'সাদা ঘোড়া', তার রঙ-রূপ পাল্‌টাতে শুরু করল। ফলে সত্তরের দশক মুক্তিদশক বলে দেওয়াল ও বাচনভঙ্গিতে ভরে গেলেও, তার পরিণাম হল ভয়াবহ, সত্তরের গোড়া থেকে শেষাশেষি নাগাদ অরাজকতা ও উদ্ভ্রান্তির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায় নি। সাতাত্তরে বামফ্রন্টের জন্মের পর স্থিতির পালে হাওয়া বইলেও, মৃত্যুর ক্লেদাক্ত দিনের স্বপ্ন মুছে যায় নি, রক্তাক্ত-বিপ্লবে বিশ্বাসীদের মধ্যে অনেকেই এই পর্বে সনাতন জীবনযাপনের নিশ্চিন্ত আরামে ফিরে এলেন।

দীর্ঘ রাজত্বের সুবাদে আশির দশকের শেষের দিকে একদা আন্দোলনের হোতারা নীরক্ত গতানুগতিকতায় আত্মস্থ হয়ে বিলাসের প্রাচুর্যকে আয়ুধ করলেন, যার বিপরীত মেরুতে এতকাল তাঁরা বসবাস করে এসেছেন। অপারেশন বর্গা, দৈনিক শ্রমের নির্ধারিত মূল্যবৃদ্ধি ভয়াবহ্ অর্থনৈতিক মন্দায় কতখানি অর্থহীন তা টের পাওয়া যাচ্ছে। ধাক্কা এসে লেগেছে নব্যরীতির রুশ দেশের। 'পেরেস্ত্রইকা' ও 'গ্লাসনস্তে'র প্রথমটি পুনর্গঠন, দ্বিতীয় অবাধ তথ্যপ্রচার, তার জের কাটতে-না-কাটতে রাশিয়ান রিপাব্লিকের সর্বময় কর্তৃত্ব বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় চলে এল ইয়েলৎসিনের হাতে, অনিবার্যকে ঠেকানো গেল না, ভেঙে গেল সোভিয়েট রাশিয়া। বিশ্বের এই তাৎপর্যময় ঘটনাটি এদেশেও কম তাৎপর্যপূর্ণ নয়, বাম-দক্ষিণ সকলের নির্ভরতার শক্তিমান দেশটির অস্তিত্ব রইল না।

দেশ-বিদেশের এই সচল ঘটনা ও তার জের অস্বীকার করতে পারেন না বস্তুজগতের কথাকারেরা। কথাসাহিত্যে এর প্রভাব অনিবার্য, স্বাধীনতার বহু পূর্বেই ১৯১৭-এর রুশ বিপ্লব ও ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের জটিল সম্মেলনে তিরিশের তখনকার নব্য কথাকারেরা গল্প-উপন্যাসে তৎপর হয়ে উঠেছিলেন। রবীন্দ্র-প্রয়াণের একটি দশক আগেকার ঘটনা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের তৃতীয় বছরে তাঁর মহাপ্রয়াণ, তখনকার কথাসাহিত্যের ভার যাঁরা নিজ স্কন্ধে নিয়েছিলেন তাঁরা দেশ-বিদেশের নানা মত ও পথকে আশ্রয় করে দেশজ রীতি প্রবর্তন করেছিলেন। আমাদের আলোচ্য সময়সীমার ছোটোগল্পে এঁদের কেউ কেউ অনুপস্থিত, অথবা লেখনী স্তব্ধ করে দেবার প্রান্তসীমায় এসে পৌঁচেছেন। যাঁরা ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত তাঁদের প্রথম আলোড়নকারী গল্প থেকে তাঁরা সরে এসেছেন আরো গভীর গভীরতর লোকের দিকে। তারাশঙ্কর আছেন বন্দ্যোপাধ্যায়-ত্রয়ীর মধ্যে, তবে উদ্দীপনা-সঞ্চারী লেখা এ সময়ে পাওয়া যায় নি। কল্লোলত্রয়ী অচিন্ত্য-প্রেমেন্দ্র-বুদ্ধদেব-ও তেমন কোনো আলোড়িত গল্প লেখেন নি এ-পর্বে। 'তিনসঙ্গী'র শেষ গল্পগ্রন্থের রবীন্দ্রনাথ সব সাহিত্যেই দুর্লভ। সুবোধ ঘোষ, সন্তোষ ঘোষ, নরেন্দ্র মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, রমাপদ চৌধুরী, বিমল মিত্র, বিমল কর, সমরেশ বসু প্রমুখ শ্রেষ্ঠ গল্পকারেরা আছেন। অনতিবিলম্বে এসে যাচ্ছে সত্তর ও আশির দশক, তার রেশ এই বিরানব্বই-এ এসে পৌঁচেছে। আমাদের আলোচ্য ছোটোগল্পকারেরা মূলত সত্তর-আশির— এঁরাই বাংলা ছোটোগল্পের পতাকাকে উড্ডীন করেছেন, সঙ্গে আছেন পূর্ববর্তী কিছু লেখক। আলোচনার উপান্তে সেরকম সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাবে।

'কল্লোলে'র কোলাহল রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতির কালেই অনুচ্চ হয়ে উঠেছিল, তার পর কালের অনিবার্য অভিঘাত এসে পড়ল, মহাযুদ্ধ ও স্বাধীনতার প্রাক্ মুহূর্ত পেরিয়ে ক্লেদস্নান করে দেশ ও জাতি অন্যতর বাঁকের মুখোমুখি দাঁড়াল, পাল্টে গেল চিন্তা ও ধারণার জগৎ, একের পর এক সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দিক্‌ভ্রান্ত সাহিত্যিকগণ— এরই মধ্যে রচিত হল বাংলা সাহিত্যে অত্যুৎকৃষ্ট বহু ছোটোগল্প। রবীন্দ্রনাথ যার সূচনা করেছিলেন, বঙ্গ-সাহিত্যে কনিষ্ঠ এই শিল্পকর্মটি বিস্তারে ও গভীরতায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রচনার সঙ্গে একই পঙ্‌ক্তিতে বসবাসের ধারাটি অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম হল। আপাত আকস্মিক বলে বোধ হলেও নিপুণ পর্যবেক্ষণ শক্তি সমাজসচেতন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সুবোধ ঘোষের আবির্ভাব সূচিত হয়েছিল। 'জতুগৃহে'র গল্পসমষ্টি থেকে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির আধুনিকতা নতুন পথের বাঁক নিল। সন্তোষ ঘোষের গল্পধারা সমকালীন চিন্তাবলীর সঙ্গে আন্তর্জাতিক রূপরেখায় অন্বিত হল। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী মনোজগতের রুদ্ধদ্বার উন্মোচনের দায়িত্ব বহন করলেন, অবচেতনার মধ্যে একটু একটু করে ফুটে উঠতে লাগল তাঁর জীবনদর্শন, বাংলা মনস্তাত্ত্বিক গল্পের একটি দিক ধরা পড়েছে তাঁর গল্পে। 'বিরলবাক্, নিঃসঙ্গ অন্তর্মগ্ন' তাঁর ঘ্রাণেন্দ্রিয় ছিল অতিমাত্রায় সজাগ, সচেতন, জ্যোৎস্না রায় ছদ্মনামের গণ্ডি ছেড়ে স্বনামে ফিরে আসেন। স্বর্ণাক্ষরে তাঁর নাম লেখা হয়ে যায় বাংলা সাহিত্যে, বিশেষত ছোটোগল্পে, 'গিরগিটি', 'সমুদ্র', 'খালাপোল ও টিনের ঘরের চিত্রকর'— তাঁর অধিকাংশ বিস্ময়-জাগানো ছোটোগল্পই আমাদের সময়সীমার পূর্বে, তবু তাঁকে সামগ্রিকভাগে উপলব্ধির জন্য একটি সেখানকার উদ্ধৃতি দেওয়া আবশ্যক।

'লোকটা কখন এসব আঁকে রে ?' একটি আর একটিকে বলছিল। ... অথচ আজ পর্যন্ত শুনেছি

কেউ ওকে দেখতেই পেলে না !' 'রাত্তিরে' । গম্ভীর হয়ে আর একটি মেয়ে বলছিল। 'আমরা যখন ঘুমিয়ে থাকি, সব মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে, তখন এঁকে যায়' ।[১]

মানুষের ভিতরে ঘুমিয়ে থাকা নানান বাসনা, অবদমিত ইচ্ছাসমূহের ছবি সেইভাবেই জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী এঁকে গেছেন । 'সমুদ্র' গল্পের কুড়ি বছর রাতে ঘুম-না-হওয়া মানুষটি '...এমন নিষ্ঠুর ভয়ংকর নিষ্ঠুর— স্ত্রীকে সমুদ্রে ঠেলে দিয়েছিল' তাকে ভুলে যাওয়া প্রায় অসম্ভব । স্মৃতিতে ভরপুর থাকে আরো অনেক অনেক গল্প, 'কৈশোর' গল্পের মতো, অন্তর্বিশ্লেষণই যার শেষ কথা । এই ধারায় আরেক রূপারোপ লক্ষ করা যায় বিমল করের গল্পে। 'আত্মজা' কিংবা 'উদ্ভিদ' গল্প লেখার মধ্যে শুধু কৌশল নয় অনেক দুঃসাহস, অনেক আত্মমগ্ন একান্ত নির্জন অনুভূতির প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় । ফ্রয়েডীয় মনোবিশ্লেষণের রীতি অনুসরণ উভয়ের রচনায় দৃষ্ট, তবে ষাটের শেষ ভাগ থেকে রোম্যান্টিক এক রেণুমাখা অপার্থিব সৌন্দর্যের অনুসন্ধান বিমল করের রচনায় ভর করতে থাকে। সরস গল্পের ভাণ্ডার যেমন মৃদু লঘু হাস্যে ভরে ওঠে, সেইসঙ্গে 'ছোটগল্প : নতুন রীতি' ধারাপ্রবর্তক জীবনেও উজ্জ্বল মুহূর্ত অপেক্ষা বিষাদের সমাচ্ছন্ন রূপ প্রদর্শনে তৎপর হয়ে ওঠেন, 'খড়কুটো' লেখার সময় এবং তৎপরে প্রচ্ছন্ন ঈশ্বর-ভাবনার সঙ্গে সমকালের যুব মানসে বিচরণ-ইচ্ছা প্রবল হয়ে ওঠে, তাই তরুণ লেখকবন্ধুদের সঙ্গে নৈকট্য অনুভব করেন ।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের অধিকাংশ ছোটোগল্প ইতোমধ্যে লেখা হয়ে গিয়েছিল । 'টোপ', 'হাড়', 'বীতংস' লেখার কাল বহুদিন পূর্বেকার। রোম্যান্টিকতার সঙ্গে নব্যবস্তুতন্ত্রবাদের সংমিশ্রণ তাঁর রচনায় অক্ষত ছিল । নরেন্দ্রনাথ মিত্র সে তুলনায় অনেক অনুচ্চ কণ্ঠ, নিজের গণ্ডির মধ্যে থেকে তুচ্ছতম বস্তুর মধ্যে সাহিত্যের ভাণ্ডারকে উজাড় করে দিয়েছেন । আলোচ্য সময়ে তাঁর 'কাঁটাতার' গল্পটির মধ্যে রূপমুগ্ধ তালিকার ছবি বারংবার তাঁর বিখ্যাত 'একটি ফুলকে ঘিরে' গল্পটি মনে করিয়ে দেয়, 'বিষাদযোগ' এ পর্বে তাঁর বিশিষ্টতার পরিচয় বহন করে। সবচেয়ে বেশি আকর্ষণপর বলে মনে হয় 'দুই যোদ্ধা' গল্পটি । নিরঞ্জন চৌধুরীর চাকুরি খোয়ানোর পর অর্থের জন্য হীনমন্য আচরণের চিত্র অঙ্কনে সহজাত পারদর্শিতা দেখিয়েছেন নরেন্দ্রনাথ । কোনোরূপ ভাষার কারুকৃতি ছাড়াই অসাধারণ উতরে যাওয়া এ-গল্পটি ।

বাণী রায়ের গল্পে নারীসমাজের প্রেম সম্পর্কের নানান সমস্যার বিচিত্রতার সমন্বয় ঘটেছিল । নারীমনের সংকোচের বাধা দূর করবার বলিষ্ঠতা তাঁর ছোটোগল্পে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল । আশাপূর্ণা দেবী কিংবা প্রতিভা বসুর রচনায় নারী-জগতের আঙিনাটি দেখা গেলেও বাণী রায়ের রচনা বা কাহিনীর নিজস্ব ধরন বা প্যাটার্ন পৃথক এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই । 'নারীজীবনের প্রেমকেন্দ্রিক ও মনস্তত্ত্ব-নির্ভর মুহূর্তগুলি বাণী রায়ের গল্প যেমন সত্যভাষণে ও সংস্কারাহিত্যে দুঃসহ-সুন্দর করে তুলেছে, বাংলা সাহিত্যে তা দুর্লভদোসর' ।

রমাপদ চৌধুরীর যিনি 'ভারতবর্ষে'র মতো গল্প লিখেছেন, তাঁর গল্পের কথা মনে হলেই 'দরবারী' গল্পগ্রন্থটি সর্বপ্রথমে মনে পড়ে । অনেক অভিজ্ঞতা ব্যেপে আছে তাঁর জীবন, সেই সকল একে একে ধরা দিল তাঁর গল্পে । স্থায়ী আসন পাতা হয়ে গেল বাংলা সাহিত্যে গল্পে এবং উপন্যাসে । 'দরবারী'র মতো 'প্রথম প্রহর'-ও সাড়া জাগাল । 'আমি, আমার স্বামী ও একটি নুলিয়া' বাংলা গল্পের চিরস্মৃত । আর সমরেশ বসু নামের জাদুই আলাদা। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সোশ্যাল-রিয়ালিজমের স্বপ্নসাধ নিয়ে তাঁর আবির্ভাব । জীবনকে দেখেছেন নানান অনুপুঙ্খে । কম্যুনিস্ট কর্মী থেকে শুরু করে নানান তরঙ্গভঙ্গে বাংলা ছোটোগল্পকে ধনী করে গেছেন তিনি । 'কেন গান্ধী' রচনার কথাও বিস্মৃত হওয়া যায় না, বামপন্থী আন্দোলনকে দূরে থেকে দেখা নয়, জীবনের অঙ্গীভূত করেছিলেন, মধ্যবিত্তের সংগ্রাম থেকে অন্ত্যজ শ্রেণী, দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী নানান মানুষের ছবি এঁকেছেন, শ্রমজীবী, কৃষক— নানান সংগ্রামের শরিকদের নিপুণ ছবিতে তাঁর গল্প সমৃদ্ধ। 'আদাব' থেকে 'দেশে' প্রথম প্রকাশিত 'গুণিন'— তারপর নানা মাপের সমাজজীবনের নানা ছবি 'মরেছে পালগা ফরসা', 'শুভ্রা-সন্ধ্যা সংবাদ',

'অকাল বসন্ত', 'স্বীকারোক্তি' সংখ্যাহীন অনন্য গল্পের সম্ভার । সমকালীন সমাজচেতনতা, প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বঙ্গজীবনকে বারে বারে দেখেছেন । রাজনৈতিক দৃষ্টির সঙ্গে শরীর-বর্ণনার অদ্ভুত এক মিশ্রণ ঘিরে আছে তাঁর সাহিত্য, আসলে জীবনের কোনো দিককে তিনি অস্বীকার করেন নি ।

অমিয়ভূষণ-কমলকুমার-অসীম রায় বাংলা গল্পের তিন শক্তিধর কথাকার । গুণময় মান্না উপন্যাসে যে অমিত ক্ষমতার অধিকারী, ততখানি ছোটোগল্পে নিজেকে নিয়োজিত করেন নি । তবে সমকালীন জীবন তিনি গল্পেও অস্বীকার করেন নি । কৃষক-শ্রমিকদের জীবনকাহিনী বিবৃতকরণে তাঁর কৃতিত্ব এখানেও যথেষ্ট লক্ষণীয় । 'একগুচ্ছ গল্প' গ্রন্থের 'ব্লাডপ্রেসার' গল্পে সুবোধবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, 'কথাটা তা নয়, ভাগচাষ আইন যা হয়েছে তাতে বলছে, চাষীর তিন ভাগ, মালিকের এক ভাগ । আরো সুবিধে আছে, ভাগচাষীর কাছ থেকে মালিক কোনো দিন জমি ছাড়াতে পারবে না, পুরুষানুক্রমে চাষী দখল করবে ...' ।

'উ কথা আমি শুনিছি বটে, বাবু, পাঁচজনের মুখে শুনিচি। ত উটি আপুনিদের ল্যায্যবিচার লয়... ' বলে ও গুম খেয়ে বসল, খানিক জাঁকিয়ে। 'মালিকের আট আনা, আমার আট আনা, এই চলে এস্‌ছে, ইটাই ভাল। ল্যায্য হল।...

মালিকের জুলুম আর কতদিন সহ্য করবে মতিদা?'[২]

অমিয়ভূষণ মজুমদারের 'শ্রীলতার দ্বীপ', 'পায়রার খোপ', 'মৃন্ময়ী অপেরা', 'মামকাঃ' গল্পের নিটোল রূপের সঙ্গে তাঁর অনায়াস সহজতার গদ্যরীতি মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। বীতশোক ভট্টাচার্যের ভাষায়, 'এক অর্থে অমিয়ভূষণের সব ছোটোগল্প অনার্দ্র গদ্যে লেখা কান্নার গল্প'। কমলকুমার সম্পর্কে সে কথা খাটে না। তাঁর কাব্য-নির্মিতি একেবারেই আলাদা। সাধুগদ্যে গল্প রচনায় কতখানি নৈপুণ্যে আধুনিককালেও কথা বলা যায়, বাংলা গদ্যে তার দ্বিতীয় দোসর খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে এক মত হওয়া যায় 'কমলকুমার চলতি ভাষায় বেশ কয়েকটি গল্প লেখার পর সাধু বাংলা গ্রহণ করতে দ্বিধা করেন নি, সাধু ক্রিয়াপদ এবং অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার করেছেন বহু পরিমাণে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর ভাষা আধুনিক'।[৩] কমলকুমার কিন্তু গদ্য-বিন্যাস বা নির্মাণরীতির জন্যই বাংলা গল্পে স্থান অধিকার করে নেন না, বিষয়বস্তুর কারণেও তাঁর গৌরব অনস্বীকার্য। অপ্রচলিত গদ্যভঙ্গি; অথচ সাধারণ গদ্য-ব্যবহারকারী মানুষের কথা গল্প রচনার সময় বিস্মৃত হন নি। 'রুক্মিণীকুমার', 'অনিত্যের দায়ভাগ', 'পিঙ্গলাবৎ' আলোচ্য সময়সীমার উল্লেখযোগ্য গল্প। এখানেও 'মতিলাল পাদরী' কিংবা 'নিম অন্নপূর্ণা'র কমলকুমার বিস্মৃত হতে দেন না। সমকালীন গল্পকার ও ঔপন্যাসিক অসীম রায় 'অন্তর্জলী যাত্রা' প্রভৃতির প্রেক্ষিতে লেখেন, 'কমলকুমার তাঁর এই গল্পগুলিতে যে জনগণ নিয়ে কারবার করেন তারা মাইকের সামনে দাঁড়ানো বক্তৃতার জনগণ নয়, রগড়ে ক্ষোভে বিশ্বাসে অবিশ্বাসে এই তাজা টগবগে জ্যান্ত জনগণ যেন চসারের ক্যান্টারবেরি টেলের চরিত্র'।[৪] অসীম রায়ের গল্প বাংলা ছোটোগল্পে নানান অভিনবত্ব নিয়ে দেখা দিয়েছিল। অভিনবত্ব ছোটোগল্প রচনার ইতিবৃত্তেও, 'সচরাচর বাঙালী ঔপন্যাসিকদের পরিক্রমা গল্প থেকে উপন্যাসে কিন্তু আমার পরিক্রমা ঠিক উল্টো, কবিতা-উপন্যাস থেকে গল্পে। ... গল্প সম্পর্কে আমার মধ্যে একটা স্ববিরোধ ছিল, গল্প যেন একশো মিটার দৌড়। আর আমি চাই নিরবচ্ছিন্ন ম্যারাথন যার আধার উপন্যাস'।[৫] সংখ্যা খুব বেশি না হলেও সমকাল ও কালান্তরে চিহ্নিত হয়ে থাকবার মতো গল্প লিখে লেখক-পাঠক উভয়ের পরিতৃপ্তির কারণ খুঁজে পাওয়া যায়।সমরেশ বসুকে আমরা সচেতন রাজনীতির আসর থেকে গল্প-উপন্যাসের মালমশলা উদ্ধার করতে দেখেছি। আর অসীম রায় তাঁর আকৈশোর সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবার লগ্নটি দ্বারপ্রান্তে দেখতে পান সাতষটির বামপন্থীদের কাছে কংগ্রেসের হারের মধ্য দিয়ে। কাগজের রিপোর্টার হিসেবে জনমানসের নতুন জোয়ার লক্ষ্য করেন, ভোরে ফিরে দুদিন বুঁদ হয়ে থেকে লিখলেন 'আরম্ভের রাত', 'এক্ষণে' বেরিয়েই চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। 'অনি' গল্পের মধ্যেও চারপাশের ঘটনার আচ্ছন্নতা, লালবাজারে উদ্বিগ্ন সারি সারি তরুণের মুখের মধ্যে নিজের মুখটাকেও প্রত্যক্ষ

করলেন। 'অনি' গল্প সম্পর্কে লেখকের নির্দ্বিধ স্বীকারোক্তি, '১৯৭১ সালের গোড়ার দিকে নক্‌সাল তরুণদের পুলিশী নির্যাতনের গল্পটাই এ-বিষয়ে বাংলায় প্রথম গল্প'।[৬] 'শ্রেণীশত্রু' গল্পটিতে উক্ত সময়ের সঠিক মূল্যায়ন আছে, অমলেন্দু চক্রবর্তীর 'পঞ্চাশটি মানবশিশু, একজন দেবদত্ত' প্রসঙ্গও মনে পড়ে, কমিটেড লেখক ছাড়াও বহু লেখক এই দিকটি ফুটিয়ে তুলেছেন । সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পলাতক ও অনুসরণকারী' একমাত্র এ-সময়েরই গল্প হতে পারে। সেই ভয়ংকর শঙ্কার দিন, অবিশ্বাস ও গুপ্তহত্যার উদ্দামলীলা সময়টিকে খুব বেশি স্মরণ করিয়ে দেয়। শ্রেণী-সংগ্রাম ও শ্রেণীশত্রু শব্দ-উচ্চারণের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেণীসংগ্রাম এবং কোনটি শ্রেণীশত্রু নির্ধারণ করতে গিয়ে বেলা বয়ে যায়। এর সামাজিক বা রাজনৈতিক মূল্য অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু অতঃপর?

অসীম রায়ের গল্পে এর পাশাপাশি 'রজনীকান্ত রায়', 'লখিয়ার বাপ', 'পিতাপুত্র', 'স্ট্যাচু' তাঁর গল্প-রচনার বিচিত্রতার কথা মনে করায়। শেষোক্ত গল্পের শেষ লাইনগুলি স্মরণযোগ্য, 'পারুলের হাত থেকে ভেজা ময়লা জলকাচা কাপড়গুলো হাতে নিয়ে তার মা বলে, 'এদ্দিনে একটা জায়গা হল'।

বাস্তবিক কাপড় মেলার জায়গা ছিল না তাদের। এখন থাকে যাতে রেলিং-এ শার্ট সেমিজ, শাড়ি, ধুতি চাদর মেলে দেওয়ায় স্ট্যাচু ঢাকা পড়ল।'[৭]

কোনো ব্যক্তি কিংবা কোনো গোষ্ঠী অথবা ভিন্ন ভিন্ন চিন্তার লেখক কোনো বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে গল্প লিখবেন, সেটাই স্বাভাবিক। তাঁকে বা তাঁদের কোনো তকমা দিয়ে দিলে তা বড়ো বেশি সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। লেখায় মতাদর্শ প্রকাশ পেতেই পারে, তবু গল্পের একটি সার্বজনীন রসাবেদন থেকেই যায়। সে কারণে 'প্রগতিশীল লেখক' ইত্যাদি শব্দে আপত্তি থাকা সত্ত্বেও অন্য অভিধা না পাওয়ায় প্রগতিপন্থীদের সে নামেই ডাকা যায়। সোমেন চন্দ, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ননী ভৌমিক, সুলেখা সান্যাল, দেবেশ রায়, সুশীল জানা, তপোবিজয় ঘোষ, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, রমেশচন্দ্র সেন, অমলেন্দু চক্রবর্তী প্রমুখের রচনাকে এই বিভাজনে আনা সম্ভব। এঁদের রচনার মধ্যে যে বৈপ্লবিকবোধ ও মানুষকে অগ্রসর করে দেবার প্রবণতা কাজ করে, তাতে বাংলা গল্পের বয়স আরো বাড়াতে সাহায্য করে। 'ইঁদুর' গল্পের প্রসঙ্গ না টেনেও বলা যায় প্রগতির কাজটি ত্বরান্বিত করতে এঁরা যে পণ করেছিলেন, তা কোনো অবস্থাতেই ব্যর্থ হয় নি, হয় না। সংগ্রামের পটভূমিকা চিত্রণে, মানব মনে সেই বোধ সঞ্চার করে দেওয়ার ক্ষেত্রটিকে ফ্যাসিবিরোধী লেখকগোষ্ঠী বড়ো করে দেখেছিলেন। সোমেন চন্দর কথা এ-প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে মনে পড়ে। 'কেন সোমেন চন্দ' প্রবন্ধে সে কারণে রণেশ দাশগুপ্ত লেখেন, 'তিনি স্পেনের ফ্যাসিবাদবিরোধী জনমোর্চার কর্মকাণ্ডের এবং এই তিরিশ দশকের ফ্যাসিবাদী সামরিক একনায়কত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রবৃত্ত বিশ্বের দেশ-দেশান্তরের নানা ধরনের প্রগতিবাদী চিন্তার পরিপোষক লেখক লেখিকা কবি শিল্পীদের আন্তর্জাতিক সৈনিকদলের খবরাখবর ও লেখাজোখা থেকে শিক্ষা পেয়েছিলেন সাহিত্য জনগণের ঐক্যের প্রয়োজনে'।[৮] দীপেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে প্রথমেই মনে হয় জীবন এত ছোটো কেন, আর ছোটোই যদি তখন ভাবা যায়, ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির কী লাভ হয়েছিল তাঁকে ব্যবহার করে জানা নেই, বাংলা গল্পের অসম্ভব ক্ষতি হয়ে যায় সাহিত্যরচনা থেকে বিরত হয়ে সর্বক্ষণের পার্টিকর্মী হয়ে যাওয়ার জন্য। 'অশ্বমেধের ঘোড়া', আর 'চর্য্যাপদের হরিণী' এখনো বিস্ময় জাগায়। ছোটগল্প: নতুনরীতি গল্পমালায় 'জটায়ু' এখনো উজ্জ্বল স্মৃতিতে বিদ্যমান। 'শোকমিছিল' বেরিয়েছিল শারদীয় 'পরিচয়ে' (১৯৭৪, সম্ভবত মহাশ্বেতা দেবীকে চিঠিতে লিখেছিলেন); 'শোকমিছিল' গল্পেই নকশালপন্থীদের প্রসঙ্গ আছে। দীপেন্দ্রনাথের আগেই বোধ করি ননী ভৌমিকের নাম আসা উচিত, 'ধানকানা'র মতো গল্প আর লেখা হল কই? দূরপ্রবাস থেকে বাংলা গল্প লেখার কথা ভুলেই গেছেন, স্বপ্নের দেশে গিয়ে ; স্বপ্ন অবশ্য এই মুহূর্তে ভগ্ন। সুলেখা সান্যাল অবশ্য বেশি লেখেন নি, বহুদিন প্রয়াত । শারদীয় এক্ষণ, ১৩৯৮ সুলেখার দুটি গল্প পুনর্মুদ্রণ করেছেন 'ছোটমাসি' 'খেলনা' এবং সুসংবাদ দিয়েছেন কলকাতার এক প্রকাশক সংস্থা তাঁর গল্প-সংকলনের পরিকল্পনা নিয়েছেন, সেটি সুসংবাদ। দেবেশ রায় লিখছেন বহুদিন, সেই 'দেশে'

পাঠানো 'হাড়কাটা' গল্প থেকে 'দুপুর' 'পা' তাঁকে পরিচিত করে দেয়। 'আহ্নিকগতি ও মাঝখানের দরজা' সম্পর্কে আলোচকের মন্তব্য 'একটি সুচিহ্নিত বিপজ্জনক গল্প'। দেবেশ রায়ের গল্পের বিষয়বস্তু প্রসঙ্গে উক্ত আলোচক জানান 'যাকে এক মধ্যবিত্ত প্রেক্ষিতের অ-ভূতপূর্ব ছবি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বা মতি নন্দীর ঘরানার সঙ্গে তাঁর কিছু সাদৃশ্য থাকলেও তিনি কেবল তাঁরই মতো এ-কারণে যে, তাঁর গল্পের বিন্যাস আমার শেষ পর্যন্ত ঠেলে দেয় এমন এক অতল গহ্বরের দিকে যে আমাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের আর কোনোরূপ উপায় থাকে না। খুব অস্থির বোধ হয়। খুব অসহায় লাগে। আর তার স্থানকাল-পাত্র আমাদের এত বেশি পরিচিত যে অস্বস্তি হয়, সেই অসহায় নিজস্ব নগ্ন প্রতিরূপ প্রত্যক্ষতার। যদিও তাঁর গল্পে লেগে থাকে মর্বিডিটি, কিন্তু তা শেষ পর্যন্ত স্থায়ী হয় না। আত্ম-অসহায়ত্বের কার্যকারণটি পাঠক চিনে নিতে পারেন খুব স্পষ্টভাবে'।[৯] সচেতন শিল্পী হিসেবে তিনি মনে করেন 'গল্প-উপন্যাসের, কথাসাহিত্যের, প্রকরণগত শুদ্ধতা প্রতিষ্ঠার দায় আজকের আধুনিক লেখক হিসেবে আমাদের ওপর বর্তায়। গল্প-উপন্যাস খবরের কাগজের গ্রন্থরূপ নয়, গল্প-উপন্যাস শব্দাশ্রিত শিল্প'।[১০] এই গল্পগ্রন্থের উল্লেখ্য গল্প 'কয়েদখানা', 'অন্ত্যেষ্টির রীতিবিধি', 'যৌবনবেলা'। বর্তমান কালে দেবেশ রায়ের গল্প-রচনার ধরনটি এ থেকে প্রত্যক্ষ হয়। সদ্য-প্রয়াত তপোবিজয় ঘোষ প্রগতিবাদী গল্প রচনাতেই আত্মমগ্ন ছিলেন। তাঁর 'মুক্তি চাই' 'মূল্যবৃদ্ধি ও তার প্রতিকার' নামকরণ থেকে তার অভীপ্সার স্বরূপ ধরা পড়ে। গণসংগ্রাম ও শোষিত মানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষী তপোবিজয় দুঃখ-বেদনা-সংঘাতে ন্যুব্জ চিত্রটি তুলে ধরেছেন, তাঁর মার্কসবাদী প্রত্যয় স্পষ্ট, কোনো কিছু দিয়ে তাঁকে আড়াল করতে চান নি, স্বক্ষেত্রে তিনি মহিম, তাঁর 'সামনে লড়াই', অতএব 'চলুন কমরেড, আমরাও বেরিয়ে পড়ি'। 'কালচেতনা'র গল্পে তাঁকে মানায় অনায়াসেই, 'নীল বিদ্রোহ'কে তিনি বেছে নিয়েছিলেন কেন তাঁর গল্প পড়লে সে সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। তপোবিজয়ের কালচেতনার সঙ্গেই মনে পড়ে সুশীল জানার, 'আম্মা' বা 'বেটি' গল্প, সলিল চৌধুরীর 'ড্রেসিং টেবিল', স্বণকমল ভট্টাচার্য-ও এ থেকে দূরে থাকেন না।

প্রগতিশীল লেখকচক্র থেকে গতানুগতিক ধারার গল্প লেখকদের কাছে ফিরে আসা যায় । ষাটের দশকে যাঁরা সাহিত্যের আঙিনায় প্রবেশ করেছেন, কিছু আগে-পরে আলোচ্য সময়ে তাঁরা স্ব-মহিমায়, প্রতিষ্ঠিত। প্রাতিষ্ঠানিক পত্র-পত্রিকার আসরে নামার কারণে বহুল পরিচিত এবং কেউ কেউ অতি জনপ্রিয়। এই জনপ্রিয়তাও মূল্যবান । বিমল কর তাঁর 'এদশকের গল্প' নামক অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ গ্রন্থটিতে গোড়াতেই তাঁদের কিছু উৎকৃষ্ট গল্প উপহার দিয়েছেন। রতন ভট্টাচার্যের 'পিঞ্জর' সম্পর্কে ভূমিকায় বিমল করের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। খণ্ডিত বঙ্গদেশের দুঃসহ জ্বালার একটি জীবন্ত দলিল গল্পটি, এ ছাড়া স্বল্পায়ু শংকর চট্টোপাধ্যায়, স্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, দিব্যেন্দু পালিত, মতি নন্দী, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব গুহ, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ এবং প্রফুল্ল রায় ও মহাশ্বেতা দেবী। এ ছাড়া সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় এবং সমরেশ মজুমদারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সুনীল-শীর্ষেন্দুর পাশে জনপ্রিয়তায় এ দুটি নাম অবশ্য মনে পড়বে। রতনকে দিয়েই শুরু করা যায়, রতনের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', তারপর 'হাঁস মুরগীর প্রতিপালক' লেখার অব্যবহিত পরে তিনি নিজেকে গুটিয়ে নিলেন, দীর্ঘ বিরতির পর ফিরে এসেছেন, তবু তাঁর যৌবনের অসামান্য সময় পেরিয়ে গেলেন না-লিখে। শ্যামল-অতীনের সঙ্গে সোমনাথ ভট্টাচার্য-যশোদাজীবনের প্রসঙ্গ আসে। শেষ দুজন আর লেখায় ফিরে এলেন না। 'বৃহন্নলা' উপন্যাসের প্রথমাংশ 'দেশে' প্রকাশিত হবার সময় তাকে গল্প বলেই মনে হয়েছিল, অথচ 'তুষারহারিণী'র মতো গল্প খুব বেশি চোখে পড়ে না। শ্যামল প্রসঙ্গে 'কুবেরের বিষয়আশয়' আলোচিত বেশি। সেদিকে বরেন তাঁর সামুদ্রিক অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েছেন। সিরাজের অভিজ্ঞতাও বিশাল, তাঁর অজস্র গল্পে তার প্রমাণ আছে। কবিতা লিখতেন না শুধু, মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে 'আলকাজে'র দলের মাস্টার ছিলেন। 'গোম্প'-র মতো গল্প দুর্লভ, 'অষ্টাবক্র ও প্রিন্স অ্যালবার্ট', 'বাদশা', 'হিজলকন্যা', 'যোগসূত্র'

গণনাতীত গল্পের জনক তিনি। ছোটোদের লেখায় মস্ত দড়, রহস্য গল্পের এক নামজাদা ব্যক্তিত্ব। বুদ্ধদের গুহের গল্পের প্রকরণ বিবিধ, তাঁর কর্মময় জীবন, তাঁর সাংগীতিক পরিমণ্ডল, শিকারপর্ব সব মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। বিব্যেন্দু পালিত আর 'শীতগ্রীষ্মের স্মৃতি' জড়িয়ে আসে, পর্বকালের পূর্বে অবশ্যই, তাঁর জাত এতেই চিনিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। পর্বকালে খুব আকর্ষণীয় গল্পগ্রন্থ 'মুন্নির সঙ্গে কিছুক্ষণ' (১৩৭৪) শীর্ষনামের গল্পটি তিক্ত স্বামী-স্ত্রীর বিরূপতার ঊষর ভূমির মধ্যে মুন্নির সাহচর্য স্নিগ্ধ মরূদ্যানের প্রত্যাশা জাগিয়ে তোলে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রথম উপন্যাস 'আত্মপ্রকাশে'র সুনীল নামক যুবকের সঙ্গে যমুনা নামে কিশোরীর মাধুর্যমণ্ডিত সম্পর্ক স্মরণ করিয়ে দেয়। 'জন্ম' আর একটি অসাধারণ— একটি শিশুর জন্মকে কেন্দ্র করে উদ্‌বেগ ও উৎকণ্ঠার রুদ্ধশ্বাসকারী গল্প। 'অপমান', বিশেষ করে 'অসুখ' গল্পটিতে হেমন্ত তার বন্ধু উৎপলকে স্যানিটোরিয়ামে পাঠিয়ে দেবার পর বন্ধুপত্নীর সঙ্গে যে মানসিক সংঘাতে পড়ে, তার চিত্রটি মানব-সংকটের আর-একটি দিক উন্মোচিত করে।

মতি নন্দী অবশ্যই পৃথক অস্তিত্ব নিয়ে বাংলা গল্পে এসেছেন। মধ্যবিত্তের আত্মিক সংকট যেমন তাঁর গল্পের মধ্যবিন্দু, আবার স্পোর্টস জার্নালিজমের দৌলতে তিনি খেলার জগৎকে বাংলা গল্প-উপন্যাসে এনে অভিনবত্বের দাবিদার হয়ে উঠেছেন। 'স্ট্রাইকার', 'স্টপার', 'কোনি'-র মতো উপন্যাস ছাড়াও খেলাধুলোর জগতের নানান ঘটনা ও প্রভাব তাঁর গল্পের বিষয়বস্তু। অকাদেমি-পুরস্কারপ্রাপ্ত 'সাদাখামের' লেখক সম্পর্কে পূর্ণেন্দু পত্রী লিখেছেন, 'হৃদয়বান মতি নিজের সময়ের বিশ্বস্ত ভাষ্যকার হতে গিয়ে যে সমাজ আর যে পরিবেশের ভিতরে টেনে নিয়ে যায় তার পাঠকদের, সেখানে যেন কসাইয়ের দোকানের কাটা ছাগলের ধড়ের মতো ঝুলে থাকে এক ধরনের নিষ্ঠুরতা। আসলে মতি নিষ্ঠুরতা বানায় না। চারপাশের সামাজিক নিষ্ঠুরতাই তাকে বানিয়ে দেয় এক লেখা থেকে আর এক লেখায় এগিয়ে যাওয়ার লেখক। বাংলা সাহিত্যের প্রথম নিষ্ঠুর লেখক জগদীশ গুপ্ত। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁরই যোগ্য উত্তরাধিকারী আরো বৃহত্তর পরিমণ্ডলে। মতির তালিম মানিকবাবুর ঘরানায়'।[১১] 'ব্লেজার' গল্পটির মধ্যে পিতাপুত্রের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছলনার পরিসমাপ্তি বড়োই স্পষ্ট। ছেলে বাবাকে বলছে, 'তোমাকে আলিম্পিয়নের মতই দেখাচ্ছে'।[১২] আর-একটি গল্পের উল্লেখ করতেই হয় তা সত্তরের অসহায় সময়ের কথা মনে করিয়ে দেয়, 'পর্দার নীচে এক জোড়া পা' এবং বিশেষ করে ভাবায় 'যুক্তফ্রন্ট' গল্পটি। শেষ গল্পটিতেসমকালের অরাজকতার ছবি ফুটে উঠেছে। মধ্যবিত্তের সংকটের নিদারুণ চিত্র আছে 'জলের ঘূর্ণি ও বকবক শব্দ' গল্পে।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বাংলাসাহিত্যে (কবিতা, উপন্যাস, ছোটোগল্প) একটি বিশিষ্ট নাম । 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার স্রষ্টা কবি হিসেবে আবির্ভূত হয়ে কাব্যচর্চার সঙ্গে কথাসাহিত্যের ভুবনটিকে আলোকোজ্জ্বল করেছেন। বিস্ময় এই যে, যে লেখনী তিনি কাব্যে ব্যবহার করেন গদ্য রচনায় তার সাক্ষাৎ কমই মেলে। তাঁর অসংখ্য রচনায় সমৃদ্ধ বাংলা সাহিত্য, বিচিত্র বিষয়সমন্বিত রচনায় তিনি অক্লান্ত সৈনিক। বাংলা ছোটোগল্পে তাঁর বিচিত্রধারার রচনা পাওয়া যায়। সত্তরের উত্তালকালকে অস্বীকার করেন নি, সংবাদপত্রের সঙ্গে যুক্ত থাকার কারণে "খরা"র মতো গল্পে সাংবাদিকদের শ্রেণীচরিত্রের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করেছেন। তিনিই আবার 'গরম ভাত অথবা নিছক ভূতের গল্পে'র স্রষ্টা, 'পলাতক ও অনুসরণকারী'র প্রসঙ্গ পূর্বে উঠেছে, 'মহাপৃথিবী'-তে বর্তমান সময়কালের সংকটময় অধ্যায়টি তুলে ধরেছেন, 'বিজনের বেঁচে থাকার উদ্দেশ্য' খুঁজেছেন। 'সন্ধেবেলা রক্তপাত' দেখেছেন। বিমল কর লিখছেন, 'গরম ভাত' কিংবা ভূতের গল্প, 'মহাপৃথিবী', 'পোস্টমর্টেম' প্রসঙ্গে, 'এই-সব গল্পকে অসামান্য বললেও সব বলা হয় না, বলতে ইচ্ছে করে, তুলনাহীন'।[১৩] সুনীলের সঙ্গেই শীর্ষেন্দুর নাম উচ্চারণ করা যায়, যদিচ গল্পে শীর্ষেন্দু এসেছেন আগে। 'স্বপ্নের ভিতরে মৃত্যু' ষাটের আমাদের সময়কালের পূর্বে রচিত। কিন্তু চমকে দেবার মতো বহু গল্প একের পর এক লিখেছেন শীর্ষেন্দু —'কলিকাল', 'গঞ্জের মানুষ', 'আক্রান্ত', 'লুলু', 'খগেনবাবু', রূপকথার আদলে 'ঘরের পথ', আর 'ক্রীড়াভূমি', 'আমাকে দেখুন' এবংবিধ নানান গল্প। অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষও বাদ পড়ে

নি মধ্যবিত্তদের কাহিনীর মধ্য থেকে। অগ্রজ সাহিত্যের মনে সংশয় জেগেছে, 'ধর্মের দিকে শীর্ষেন্দুর মতি কেন গেল, জানি না', এতে বাংলা কথাসাহিত্যের ক্ষতি-বৃদ্ধি কিছু নেই, শীর্ষেন্দুর দৃষ্টি বড়ো গভীর, মানুষকে চিনেছেন নানা দিক থেকেই। 'ঘুণপোকা'র শ্যাম থেকে লক্ষ্য করে দেখা গেছে এমন এমন চরিত্রকে নায়কপদে বৃত করেছেন, স্বাভাবিকতার বাইরে তারা বিচিত্র, ধারাবাহিকভাবে বিশ্লেষণ করলে সেটা মনে হতে বাধ্য। 'মানবজমিন' উপন্যাসেও একই ধারার চরিত্র দেখতে পাওয়া যায়। বিশেষ এক ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি না থাকলে এ-চরিত্রগুলি নির্মাণ করা যায় না। শীর্ষেন্দুর সমকালে লেখা শুরু করে প্রবোধবন্ধু অধিকারী যাত্রা-জগতের দিকে চলে যান, বাংলা ছোটোগল্পে কী অসামান্য অধিকার তাঁর ছিল। বিনাশ ও অবিনাশের দ্বৈত সত্তার গল্পটি ভোলা যায় না।

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় বাংলা ছোটোগল্পে আরেক সংযোজন। বিমল করের নতুন রীতির সিরিজে 'বিজনের রক্ত মাংস' খুবই আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। 'ক্রীতদাস ক্রীতদাসী' ও 'সমবেত প্রতিদ্বন্দ্বী ও অন্যান্য ' এবং 'সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের গল্প' থেকে তাঁর গল্পকারের চরিত্রটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ভঙ্গি ক্ষেত্রটিও তাঁর গল্পে উল্লেখযোগ্য । 'বিজনের রক্তমাংসে' হেডিং আইটেম নং অমুক বলে ফর্দ আছে 'আত্মক্রীড়া'য় শেষাংশে 'বাস চলতে থাকে' বলে তিনটি প্যারাগ্রাফ দিয়ে গল্প শেষ করেন। 'সমবেত প্রতিদ্বন্দ্বী ও অন্যান্য' গল্পের ব্যাক পেজে আছে 'বাংলা সাহিত্য যদি কোনদিন সত্যভাষী হয় তবে আজ থেকে ৩০ কি ৫০ বছর পরে এই কৃশকায় গল্পগ্রন্থটির আর একবার খোঁজ পড়বে'। সাম্প্রতিক গল্পের মধ্যে 'হ্যাঁ প্রিয়তম'-তেও আঙ্গিকগত সেই দিকটি চোখে পড়ে। 'সাপের চোখের ভেতর দিয়ে', 'মাতৃস্তোত্র', 'দোলনা', 'আলমারি', 'বড় দুঃসময়' উল্লেখযোগ্য গল্প। সমরেশ মজুমদার শক্তিধর কথাশিল্পী। তাঁর গল্প রচনার পদ্ধতিটা একান্ত নিজস্ব। "সমরেশ গল্পের কায়দা কানুন নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথা ঘামায় না। তার এ-ব্যাপারে কোনো আগ্রহ নেই। সে বিশ্বাস করে, গল্পের আকর্ষণ গল্পের বিষয়বস্তুতে, পাঠ্যগুণে, চরিত্র চিত্রণে, পরিবেশ রচনায়"।[১৪] তাঁর বহু সার্থক গল্পের একটি আশ্চর্য সুন্দর সাধুভাষায় লিখিত গল্প 'গুরুচণ্ডালী কথা'—স্বচ্ছ ও অনায়াস ভঙ্গি, অথচ ভণ্ডামির বাইরে বস্তুজগৎটাই বড়ো, লেখক তা দেখিয়েছেন অসাধারণ পটুত্বে। সমরেশের লেখার প্রধান গুণ সহজতা, ভাষার অস্বচ্ছ বাঁধনে গল্পকে কুয়াশাচ্ছন্ন করবার ঝোঁক তাঁর নেই। এখানেই তাঁর জনপ্রিয়তার চাবিকাঠি। যে সোপান ধরে তিনি ইদানীন্তন বাংলা ছোটোগল্পে ও উপন্যাসে নিজের আসনটি বজায় বেখেছেন, এক বিরাট ভক্ত পাঠক-গোষ্ঠী তৈরি করেছেন তার মূলে নিহিত বাস্তবতা, সমাজ-সচেনতা এবং জনচাহিদার মূল সূত্রটি। উত্তরবঙ্গ তাঁর আসনভূমি, এই অঞ্চলটি নতুন করে তুলে ধরেছেন নানান গল্পে-উপন্যাসে এবং ছোটোদের গল্পের গোয়েন্দা অর্জুনকে মাঝে মধ্যে সেখানে তুলে ধরছেন। 'জননী' গল্পের একটি লাইন স্মরণযোগ্য 'হেই বুড়ি তিস্তা, ওরে ডুবায়ে দাও জননী গো'। 'শূকর ছানা', 'চর, শহর ও একটি বেকুফ', 'ঠাকুর থাকবি কতক্ষণ', 'চাগুয়ন' প্রভৃতি অসংখ্য উৎকৃষ্ট গল্প তিনি রচনা করেছেন। প্রতিষ্ঠিত লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে তিনি কনিষ্ঠতম, কিন্তু ক্ষমতাগুণে অনেক বলিষ্ঠ লেখকের সঙ্গে তাঁর নাম উচ্চার্য— এ গৌরব কতজনের আছে?

সিরিয়াস গল্পরচনার পাশাপাশি হাস্যরসের স্রোতে ভাসানো গল্পও বাংলা সাহিত্যে প্রবহমান ছিল। শিবরাম চক্রবর্তী, প্র. না. বি., পরিমল গোস্বামী ও পরশুরামের কথা বাদ দিলেও ইন্দ্র মিত্র, তারাপদ, রায়, নবনীতা দেবসেন এবং সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় এই ধারাটিকে উর্বরা রেখেছেন। ইন্দ্র মিত্র কবি অরবিন্দ গুহের ছদ্মনাম, হাস্যরসাত্মক সংখ্যায় কম লিখলেও অনবদ্য কিছু গল্প উপহার দিয়েছেন। 'শুভদিন' গল্প-সংকলনের 'শুভদিন', 'সকল প্রেমিকের বিরুদ্ধে', 'বাবার নাম', 'আরেকটি শিশুর জন্ম', 'মাছ', 'গঙ্গার ধার ও অধীর ভট্টচার্য', এবং 'আর কোনোদিনও ও বাড়িতে আসবেন না' নির্মল হাস্যরসের ধারায় মনকে স্নিগ্ধ ও কোমল করে রাখে। আরেকটা ভ্যাকেন্সি হলেই দেবদাসের কপাল খুলে যায়, তার বিড়ম্বনা; সদ্যমৃত অমলেশের পত্নী জয়ন্তীর ইন্টেলেকচুয়াল ফিল্ম না দেখতে পাওয়ার চাঞ্চল্য; বাবার নামের সঙ্গে প্রেমিকার চিরিস্থায়ী হওয়া; মাছ নিয়ে মাতলামোহানা; বাংলায় এম. এ. পড়ানো

ছাত্রী এমিলির সমস্যা বিশুদ্ধ ও আঘাতহীন হাস্যরসে ভরপুর। তারাপদ রায়ের 'দুই মাতালের গল্প' তার বিচিত্র জট, নৈশ ক্ষণে রাত্রিকালীন নয়, নেশা সংক্রান্ত চিকিৎসালয় স্থাপন ।'কবিতা ও ফুটবল' গল্পে উদীয়মান কবি রঞ্জন চক্রবর্তীর ফুটবল খেলোয়াড়দের সঙ্গে সংবর্ধিত হতে গিয়ে কবিতা ও ফুটবল এই দুই বিপজ্জনক পদার্থ একত্র করা উচিত কিনা এবং তার পরিমাণ কত বিস্ফোরক হতে পারে ইত্যাদি ক্রিয়াকাণ্ড লেখক দেখিয়েছেন। নবনীতার গল্পও মধুর রসে আত্মস্থ, তাঁর 'জীবে দয়া' এক অভিনব গল্প, 'গদাধরপুর উইমেন্স কলেজ' সংক্রান্ত বিচিত্রতা, 'মিরাক্ল'-এ ফোন-বিভ্রাট নিয়ে শ্রীনিবাস হোটেলের জি. পি. চন্দর কেরামতি পড়লে বারংবার রসিক চিত্ত এই ধরনের গল্পের প্রত্যাশায় থাকে। সংকট, সংশয়, মনোবিশ্লেষণ, নানান 'বাদ'-এর মিছিলে গল্পের এ-ধারাটি অক্ষুণ্ণ থাকা সাহিত্যের সজীবতার লক্ষণ। এতেও যে কেউ কেউ নিজেদের ও অপরকে মজাতে চাইছেন, সেটুকুই আশ্বাসের কথা। এই পর্বেই সর্বশেষ এবং সবচেয়ে জনপ্রিয় লেখক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। 'শ্বেত পাথরের টেবিল', ও 'সোফা কাম বেডে'র মতো এত ক্ষমতাযুক্ত উৎকৃষ্ট হাসির ও সমাজ-ব্যঙ্গের গল্প বাংলায় আর লেখা হয়েছে কিনা জানা নেই। বিমল কর বলেছেন, 'কোনো সন্দেহ নেই আজকের দিনে আমাদের সাহিত্যে সে পয়লা নম্বর সরস্ কাহিনীর লেখক। তার খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা থেকেই সেটা বোঝা যায়'।[১৫] অসংখ্য শ্রেষ্ঠ হাসির গল্প তিনি পরিবেশন করেছেন। ক্রমাগত শ্রেষ্ঠ হাসির জোগান দেওয়া খুবই কষ্টসাধ্য, অথচ বৈচিত্র্যের আস্বাদনে তিনি পূর্বতন সকলকে ছাপিয়ে গেছেন। তাঁর শব্দ সংযোজনা, রচনারীতি, কাহিনীর চমক সৃষ্টির কোনো দ্বিতীয় উদাহরণ নেই।

প্রফুল্ল রায় ও মহাশ্বেতা দেবী লিখছেন দীর্ঘ দশক, কিন্তু রচনারীতি, বলা ভালো, বিষয় নির্বাচনে বহুতর পরিবর্তন ঘটিয়েছেন সত্তর-আশির রচনাকারেরা। যে অন্ত্যজ-ব্রাত্যদের জীবন-কথায় পূর্ণ করেছেন তাঁদের রচনা এবং যে ধারা এখনো অব্যাহত, তাতে উভয়ের স্থান অনস্বীকার্য। মহাশ্বেতা দেবীর জীবন-জিজ্ঞাসার ধরনেই এই উত্তরণ সাক্ষী হয়ে আছে, 'নটী'র লেখিকাকে আর চেনবার উপায় নেই। তেমনি 'পূর্ব-পার্বতী'-র মধ্যেই প্রথম প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসেও শহুরে জীবন তাঁর রচনায় বিষয়বস্তু হলেও "ইদানীং দেখছি, প্রফুল্ল লেখার বিষয়কে আরও গভীর করে তুলেছে। সে ঘনিষ্ঠ হতে চাইছে মাটির সঙ্গে। সমাজের হতভাগ্যতম মানুষের সঙ্গে । তার লেখা 'ভাতের গন্ধ', 'সাতঘরিয়া ও অন্যান্য গল্প' এর উদাহরণ। তার এখনকার ভাষা ও অলংকার বাহুল্য বর্জিত, ছিমছাম, স্পষ্ট লেখা।'ব্যমচরিত' সুন্দর লেখা'।[১৬] এই 'সাতঘরিয়া ও অন্যান্য গল্পে'র গল্পগুচ্ছের মধ্যে 'সাতঘরিয়া', 'মানুষ', 'চুনাও' প্রমাণ করে দেয় কী নিপুণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ও অভিজ্ঞতার গভীরতার ফলে এ-সকল লেখার উপাদান ও শক্তি খুঁজে পাওয়া যায়। 'সাতঘরিয়া' গল্পের শুরুতে আছে, 'মনপত্থল জল-অচল অচ্ছুৎদের গাঁ। এর উত্তর দিকে থাকে ধাঙড়েরা, দক্ষিণে গঞ্জরা, পশ্চিমে দোসাদরা'। দোসাদটোলার চাঁপিয়া কোয়েলের কাহিনী, যে চল্লিশ বছরের জীবনে মোট ছ'টি পুরুষের ঘর করেছে, তাতে বাধ্য হয়েছে, শুধুমাত্র পেটের ক্ষুধা নিবৃত্ত করার জন্যে। টিঁকল না নিজের দোষে নয়, প্রকৃতির বিরূপতায়, তার নিটোল শরীর দিয়ে রুজি রোজগার করে তবে স্বামীর ঘর, সেই শরীর একসময় ভাঙল। এদিকে 'পুরুষ' ছাড়া মেয়েদের নিরাপত্তা কোথায়, তবু নিজের খাদ্যের সংস্থান শরীর খাটিয়েই সংগ্রহ করতে হয়। প্রথম পুরুষ মুঙ্গীলাল থেকে, শেষ পর্যন্ত শরীরের জন্যই নাটোয়ার প্রত্যাখ্যান, শেষ পর্যন্ত গৈবীনাথকে গ্রহণ। এর চেয়ে আরো গম্ভীর, আরো আদিম গল্প 'মানুষ'। শেরমুণ্ডি কাছে এসে ঝড় ঝরতেই ডরো মালাল, যে একজন 'বীটার', এছাড়া ম্যুনিসিপ্যালটির বেওয়ারিশ কুকুর ধরে ফেলার ক্ষমতাবান, সে পথে পায় গর্ভিণী একটি নারীকে, অপরিচিতা, অসম্ভব দুর্যোগে-জলে-ঝঞ্ঝায় তাকে হাসপাতালে পৌঁছে দিতে যে অমানুষিক পরিশ্রমের ও নিষ্ঠার পরিচয় সে দিয়েছে, মানুষ শব্দটি ছাড়া আর কিছু লেখকের তার সম্পর্কে মনে হয় নি। যে-কোনো দেশের সাহিত্য এরকম একটি গল্প পেলে ধন্য জ্ঞান করবে। 'চুনাও' আর একটি গল্প, কোয়ারি অর্থাৎ হাভাতে গ্রামে ভোটের জন্য দুবেজি দশ টাকার বিনিময়ে ভোট চাইলেন, পরিত্যক্ত

বৃদ্ধ নাথুলালকে সেবা-শুশ্রূষা করে ডাক্তার দেখিয়ে বাড়ি রেখেও ভোটের দিন পর্যন্ত তাকে বাঁচানো গেল না। চুনাও-এর পূর্বে তার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ভোটের মধ্যে পয়সার খেলা, কন্যাদায় থেকে উদ্ধার হবার জন্য প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা, অর্থের বিনিময়ে টিঁকে থাকা ভোট-রঙ্গতে দেখিয়েছেন প্রফুল্ল রায়। মহাশ্বেতা দেবীর গল্পের কথা উঠলেই ইদানীংকালে 'স্তনদায়িনী' গল্পটি ভেসে ওঠে, এরই সঙ্গে পারিবারিক নানান মজাদার গল্প 'ন্যাদোশ', 'ছত্রপতি' একই সঙ্গে কী করে লেখেন, বিস্ময় জাগে। 'স্তনদায়িনী ও অন্যান্য গল্পে'র অন্তর্ভুক্ত 'আজীর' গল্পটি পড়ে এ-সমাজেই বংশানুক্রমিক ক্রীতদাস প্রথার প্রচলনের ছবি পাওয়া যায়। গল্পটির প্রথম লাইনেই আছে, 'নামে তুমি পাতন হে, তায় আজীরের বংশ। তুমারে আমি মিএ্যা দিব নাই হে'।[১৭] এই আজীরের অর্থ লেখিকার ভাষায় 'অতি অল্প অর্থের জন্য আত্মবিক্রয়কারী"। পাতন মদনলালের কাছ থেকে আজীর পাট্টা বের করতে পারে না। কোনো খরা-আকালে তার পিতৃপুরুষ আজীর পাট্টা লেখাতে বাধ্য হয়েছিল। পুন্নশশী তাকে ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিল পাট্টা, সঙ্গেও এনেছিল, সেই মনিবমার মৃতদেহের পাশে দাঁড়িয়ে এবার সে বোঝে দুপুরুষ আগেই তুলট কাগজ কালের প্রকোপে জীর্ণ হয়ে নষ্ট হয়ে যায়। 'স্তনদায়িনী' গল্প পাঠককে যুগপৎ বিস্মিত ও বিচলিত করে। যশোদার স্বামী কাঙালি ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারে যশোদার স্তনে ক্যানসার হয়েছে, সে বিস্মিত হয়, এত শিশুদের এই স্তনে মানুষ করে তুলে শেষে এ-দশা! কাঙালি জানায়, 'নিজের কুড়িটা, বাবুদের তিরিশটা ছেলে—খুব দুধ ছিল ডাক্তারবাবু—'

'কি বললে? কতজনকে ফীড করেছে?'

'তা পঞ্চাশ জনা তো হবে।'

'প- ঞ্চা- শ- জ- ন- ?'

'হ্যাঁ বাবু।' [১৮]

এর বাইরে অসংখ্য গল্প 'ভারতবর্ষ', 'রুদালী' (কান্নাকে জীবিকা করে জীবনধারণ করা এক শ্রেণীর মহিলা), ১৯৮৭তে মুর্শিদাবাদে গণহত্যার পরিপ্রেক্ষিতে লেখা 'রামরহিমের যা' তাঁকে জনমানসের মৌলিক অধিকার স্মরণ করিয়ে দেওয়া ব্যক্তিত্বে পরিণত করে। তিনি লিখেছেন, 'সব জেনে শুনে, রাজনৈতিক দলগুলির অপদার্থ ভূমিকা (কিছু ব্যতিক্রম আছে) দেখে আমি একে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বলতে রাজী নই। বামফ্রন্ট প্রশাসনে মৌলবাদী ধর্মীয় শক্তির বাড়বাড়ন্ত সকলেই দেখেছেন। যে রাজনীতি দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সচল প্রবাহ সৃষ্টি করতে পারে না সে রাজনীতি নিজের ব্যর্থতা অস্বীকার করে ঔদ্ধত্যে ও মৌলবাদিতার বিষ জমাতে সাহায্য করে'।[১৯] মহাশ্বেতা দেবীর রচনায় বারংবার যারা ফিরে আসে, তিনি তাদের বলেন 'The Voiceless Section of Indian Society' —এই অংশ এখনো শুধু নিরক্ষর, স্বল্পসাক্ষর ও অনুন্নতই শুধু নয়, মূল স্রোতের থেকে এরা বড়ই বিচ্ছিন্ন' — এদের জীবনের কথা লেখার তাগিদ কারো মধ্যে আসে নি, মহাশ্বেতা তদেরই পাদপ্রদীপের আলোয় আনবার চেষ্টা করেছেন। এখন তাঁর সঙ্গী এই সময়কার লেখকেরা।

বিমল করের 'ছোটগল্প : নতুন রীতি'-র পর অনেক জল গড়িয়ে গেছে, নানান পালাবদল ঘটেছে। বাংলা ছোটোগল্পের ধারা নানান স্রোতে অব্যাহত থেকে গেছে। 'ছোটগল্প : নতুন রীতিকে' যদি আন্দোলন বলে নাও ধরে নেওয়া যায়, তবু হাংরি, শ্রুতি, শাস্ত্রবিরোধী ব্যাপারগুলি আন্দোলন বলেই ঘোষিত হয়েছিল। সবগুলির খুব তাৎপর্য ছিল তা মনে করবার কারণ নেই, অভিনবত্ব ও আলোড়ন জাগানোর প্রচেষ্টা যে বহু পরিমাণে ছিল সত্যের খাতিরেই স্বীকার করে নিতে হয়। ষাটের গোড়ায় শক্তি চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ গিনস্‌বার্গের সঙ্গে কলকাতা কফি-হাউসে জমকালো পোশাক পরে মাতামাতি করেছেন, 'ক্ষুৎকাতর কিন্তু যৌনকাতর নয়' ইত্যাদি শ্লোগান মনে পড়ে। মলয় রায়চৌধুরীর নেতৃত্বে বিটল্‌সদের মতো বীটকবি নামধেয় নানান ক্রিয়াকর্ম মূল্যবোধের ধারা প্রবর্তন বা কোনো সাহসী নব্যরীতি প্রবর্তনের সূচনা হিসেবে দেখা দেয় নি, কারো মতে শুধুই স্টান্ট, বিদেশ থেকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

মলয়কে লিখেছিলেন "চালিয়ে যাও ওসব আন্দোলন কিংবা জেনারেশনের ভণ্ডামি"। শাস্ত্রবিরোধী গল্পের ক্ষেত্রেও প্রদর্শনের বাহুল্যই চোখে পড়ে পরিবর্তনের সূত্র অপেক্ষা। 'গল্পে কোলাজ' সংকলনে সম্পাদকীয় বক্তব্য : "৬-৭-৮ দশকে হাংরি, শাস্ত্রবিরোধী, নিমসাহিত্য, ছাঁচ ভেঙে ফ্যালো, নতুন নিয়ম, ঘটনা-প্রধান, নিওলিট মুভমেন্ট থার্ড লিটারেচার প্রভৃতি গদ্য আন্দোলনগুলি বিষয় ও আঙ্গিক সম্পূর্ণ পাল্টে পদ্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালালো"।[২০] শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলনের ঘোষণা করা হয় বাংলা ১৩৭২ সনে প্রকাশিত " 'এইদশক' নামে একটি ছোটোগল্পের পত্রিকার প্রথম সংকলনে"।[২১] শেষ সংখ্যা ১৯৬৪-তে। "সর্ব শ্রেণীর পাঠকদের উত্তেজিত করার জন্যে প্রথম সংকলনের কভারে কয়েকটি অতিমাত্রিক ঘোষণা এরা করলেন। (১) গল্পে যারা কাহিনী খুঁজবে তাদের গুলি করা হবে। (২) গল্পে আমরা আমাদের কথাই বলব। (৩) আমরা এখন বাস্তবতায় ক্লান্ত। (৪) অতীতের মহৎ সৃষ্টি অতীতের কাছে মহৎ আমাদের কাছে নয়"।[২২] গল্পকারদের মধ্যে ছিলেন রমানাথ রায়, সুব্রত সেনগুপ্ত, আশিষ ঘোষ, কল্যাণ সেন, সুনীল দাস, বলরাম বসাক প্রমুখ। অন্তর্বাস্তবতার একটি ধারা গল্পে যোজিত হল, এগুলি 'single sitting' বড়ো জোর Poe -এর 'a prose narrative requiring from half an hour to one or two hours for its perusal' ।

বাংলা সাহিত্য, ছোটোগল্প তো বটেই শহরমুখী, বিশেষত কলকাতামুখী হয়ে উঠেছে এরকম অভিযোগ বারংবার উঠেছে। প্রতিষ্ঠানিক পত্রিকায় বিশেষত গল্পসমূহের ধারায় তা কেউ কেউ লক্ষ্য করেছেন। তারাশঙ্কর-বিভূতিভূষণ যে গ্রাম-বাংলার কথা বলেছেন তা ধীরে দীরে নিশ্চিহ্ন হয়ে আসছে, অথচ এখনো এ শহর গ্রামের তুলনায় কতখানি জায়গা জুড়ে আছে ভারতবর্ষে, পশ্চিমবঙ্গে? স্থানের দৈর্ঘ্য নয়, তবু গ্রাম, সমাজ-ছুট মানুষ অন্ত্যজ-ব্রাত্যজ, নিম্নবর্ণের মানুষ, দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী অসংখ্য মানুষ কেন অবহেলিত থাকবে? মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এ-জাতীয় প্রশ্ন তো বহুপূর্বেই তুলেছিলেন। একটি সাক্ষাৎকারে[২৩] শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় বলেছেন 'গ্রাম নিয়ে লেখা আর শহর নিয়ে লেখা— এ ধরণের ভাগাভাগিতে আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি না। কারণ আমি গ্রাম ও শহর দু'য়ে মিলে বা দুই অঞ্চলেই ছড়িয়ে দিই আমার লেখাকে'। তবু অবহেলিত গ্রামের কথা প্রায় অধিকাংশ গল্পে ইদানীং উপস্থিত থাকছে এখানকার অসম্ভব প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন অথচ স্বল্পখ্যাত গল্পকারদের দৌলতে। সংখ্যায়-ও এঁরা নতুন নন । সাধন চট্টোপাধ্যায়, কানাই কুণ্ডু, শৈবাল মিত্র, অমর মিত্র, সুব্রত মুখোপাধ্যায়, রাধানাথ মণ্ডল, ভগীরথ মিশ্র, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, সৈকত রক্ষিত, সুবিমল মিশ্র, অভিজিৎ সেন, অনিল ঘড়াই, আবুল বাশার, আফসার আমেদ, হর্ষ দত্ত, সুচিরা ভট্টাচার্য, ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যয়, চিত্ত ঘোষাল প্রমুখ তাঁদের মধ্যে উল্লেখ্য।

সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'মহারাজ দীর্ঘজীবী হোন', 'বেলা অবেলার কুশীলব', 'নির্বাচিত গল্প' গ্রন্থগুলি তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে। এগুলির মধ্যে 'মহারাজ দীর্ঘজীবী হোন', 'যামিনী বাড়ুজ্জে ডেড', 'পরমায়ু', 'আবহমান', 'লণ্ঠন', 'মুখর মুকু', 'খেইচ্যা বাবলু', 'রামেন্দ্রলালের রেকর্ড' ইত্যাদি অসংখ্য উল্লেখযোগ্য গল্প রয়েছে, 'বেলাঅবেলার কুশীলব' গ্রন্থ সম্পর্কে আলোচনায় সত্যেন্দ্রনাথ রায় বলেন, "উৎকর্ষের তারতম্য থাকতে পারে, সব গল্পই হয়ত 'মুখর মুকু'-র সঙ্গে অনায়াসে সাফল্যের চূড়াকে স্পর্শ করে না। কিন্তু কাঁচা একটি গল্পও নয়, অসফল একটি গল্পও নয়"।[২৪] সুমিতা চক্রবর্তী বলেন, "সাহিত্যিক যশোপ্রার্থী হবার বাসনাতেও তাঁর কলম ধরা নয়। যে রাজনৈতিক আদর্শের সঙ্গে নিজের নীতিবোধকে তিনি মিলিয়েছিলেন— সেই আদর্শকে জীবনেও জড়িয়ে নিয়েছিলেন"।[২৫] তিনি নিজে লেখেন, "বিশ্বাস করি, কলকাতার সাহিত্যিকদের ব্যক্তিগত জীবন বড়ই সংকীর্ণ, বর্ণহীন, একঘেয়ে, জনগণের কাছে এক কণা সত্য হিসেবে দেয়ার কিছু নেই তাঁদের"[২৬] — এ সঙ্গে একমত হওয়া না গেলেও সত্যদৃষ্টি ও সত্য অভিজ্ঞায় ঋদ্ধ সাধন চট্টোপাধ্যায়ের আরো গল্প পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা বেড়ে যায়। কানাই কুণ্ডুর রচনা বিচিত্রধর্মী, তাঁর অভিজ্ঞতাও ব্যাপক। তিনি জানেন, "A writer does not need wide

experience so much as deep experience— and the wider experience is, the shallower it is likely to be."[২৭]—কৈশোর থেকে কানাই পালিয়ে বেরিয়েছেন, হঠাৎ দেখা দিয়েছেন মধ্যপ্রদেশের ছত্রিশগড়ে; গোন্ড, ধারুয়া, সৎনামী, কেওট, বাইশা, মারিয়া, মুরিয়া আদিবাসীদের ঝোপড়িতে টানা পনেরো বছর কাটিয়েছেন। পূর্ব ভারতের অধিকাংশ জায়গাতেই ভ্রমণ করেছেন, তার ফলশ্রুতি তাঁর গল্পে। 'বনশি বাইগার অভিষেক' গল্পগ্রন্থে ছড়িয়ে আছেন, 'চক্রব্যূহে'র মতো সভ্যতার আলোকস্পর্শহীন অঞ্চলে মালিকরামের খাড়া পাথরের দেয়াল, ভেতরে ছোটো আগাছার ঝোপ, নিচের নরম স্যাঁতসেতে গুহার মাঝখানে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন ভেদাভেদহীন দিনরাত্রিতে, তার বর্ণনা, মায় এতদঞ্চলের ভাষা ব্যবহারের আসম্ভব এক পটুত্বের পরিচয় দিয়েছেন কানাই কুণ্ডু। চমকে যাওয়ার মতো 'পিতৃঋণ', 'গাছ-পাড়ুয়া' গল্পের এক অলৌকিক বিষয়বস্তু বিস্ময়ে বিমূঢ় করে দেয়। খরার কয়েকটি গল্পের কথা এ পর্বে এসেছে— 'শেষ জলবিন্দু'র মতো শ্বাসরোধকারী গল্প বাংলায় পড়েছি বলে মনে হয় না, অনায়াসেই লেখক আমাদের নিয়ে আসেন সেইখানে যেখানে এক বিন্দু জল কত মহার্ঘ, অথচ কী প্রয়োজনীয়, তারাশঙ্করের নির্মোহ নিষ্ঠা কানাই কুণ্ডুর আছে, এ গল্প পড়ে তাতে সন্দেহ থাকে না, তবে কানাইবাবু পৌঁচেছেন বাংলা মুলুকের বাইরে তৃষ্ণায় ছাতিফাটা অঞ্চলে। 'জীবনের জন্য' গল্পটি আরেক ক্ষমতার কথা জানিয়ে দেয়, গাছের ডালে লুকিয়ে থাকা খুনীর তিল তিল করে মৃত্যুবরণ দেখানো তাঁর শক্তির পরিচয় বহন করে। কিংবা 'ঝাঁটিসালের সীতামাই' গল্পটি। অথচ এই কানাইবাবু 'টাকা পোকা' গল্পগ্রন্থে ভিন্ন জাতের গল্প লেখেন, তাঁর গল্প তাই একঘেয়েমি থেকে মুক্ত। উভয় শ্রেণীর গল্পেই তিনি সিদ্ধহস্ত এবং কৃতিত্বের অধিকারী।

একসময়ের নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত পরিণত গদ্য রচনার অধিকারী শৈবাল মিত্রের রচনায় খুব স্বাভাবিকভাবে রাজনৈতিক মূল্যবোধ ধরা পড়েছে দুটি গল্পসংকলনে— 'আতর আলির রাজসভা' এবং 'মা বলিয়া ডাক' দুটিতে। বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় ঘটমান বিষয়সমূহ সম্পর্কে তাঁর সজাগ দৃষ্টি আছে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছেন জীবনের গলিঘুঁজিকে। সদাজাগ্রত লেখক 'কথামৃত ও কাফকা' গল্পে একদিকে তাপস ও অন্যদিকে মুকুন্দের জীবনে দিবস-রজনী উতলা হওয়ার প্রেক্ষিতকে আশ্চর্য মনস্বিতায় উপহার দেন, কম্যুনিস্ট দীক্ষায় শৈবাল ছাত্রজীবন থকেই তাঁর আদর্শের প্রতি একনিষ্ঠ, ষাটের মাঝামাঝি থেকে এই বোধই তাঁকে নকশাল আন্দোলনের মধ্যে নিয়ে আসে। এখন এই আন্দোলনকে পাথেয় করে বিপ্লবী সাজার হিড়িক পড়েছে, যাঁদের সঙ্গে নামমাত্র সম্পর্ক ছিল না বরং এঁদের এড়িয়েই চলেছেন, এমনই-সব ব্যক্তিরা প্রাতিষ্ঠানিক কাগজে সেকালের ছবি আঁকতে গিয়ে নিজেদের একাত্ম করবার চেষ্টা করেন, তাঁদের থেকে পৃথক শৈবাল, সে কারণে বিশ্বাস্যও। যে সমাজব্যবস্থায় নিম্নবর্গের মানুষ দারিদ্র্যে ও সামাজিক অত্যাচারে জীবন-বায়ু নিঃশেষের পথে যায়, যেখানে তারা নিরাপত্তাহীন, সহায়-সম্বলহীন, গত্যন্তরহীন সময়ের কাছে সমর্পণ ভিন্ন লাঞ্ছনা ও অত্যাচারের শঙ্কায় উদ্‌বিগ্ন, রক্ষাকর্তা নেই, কিন্তু ভক্ষকের সংখ্যা অগণ্য, কেউ ছিন্নমূল, কেউ সামান্য জমি-জিরেত থাকা সত্ত্বে প্রকৃত অর্থে ভূমিহীন, পরিত্যক্ত সেই-সব মানুষ এসে জোটে শৈবালের গল্পে, তিনি দেখান কেমন করে নারীকে হারাতে হয় সম্ভ্রম। শুধু তিনি কেন এ-সময়ের অনেক গল্পকার দেখতে পান খরার পরে বন্যার আর বন্যার রেশ যেতে-না-যেতে অপেক্ষা করে থাকে খরার তীব্র দাহন। নানান উঞ্ছবৃত্তি সাধারণ মানুষকে গ্রহণ করতে হয়, সীমান্ত-কাছ-বরাবর মানুষেরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নানান অসৎ উপায়ে জীবিকার সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। পাপ-পুণ্য অর্থহীন শব্দের পাহাড় মাত্র। নক্‌কিরাণীদের 'বারমেসে পোয়াতি' হয়ে জীবনযাপন করতে হয়, আর প্রকৃত পোয়াতি একটু স্থিতির জন্যে ঘর থেকে বেরোতে বাধ্য হয়। এ সময়ের চোরাচলান পাচারকারীদের গল্প আরো দু-একজন লেখক লিখেছেন, এর মধ্যে শৈবালের গল্পে একটি আদিম মানবিকতার সুর বেজে ওঠে বুঁচকির মুখে তার মা ডাক শোনার ইচ্ছা। মনে রাখা দরকার গতর বাঁচিয়ে রাখার জন্যে যত অপকর্মই করুক, তার একটি বেদনার দিক আছে, মা ডাক শুনবার আকাঙ্ক্ষা। এই মানবিক দিকটি লেখক অবহেলা করেন নি। আশার কথা সেটুকুই। 'ভোটার বৈরাগীচরণ'

প্রফুল্ল রায়ের 'চুনাও' গল্পটি মনে করিয়ে দেয়, কোথায় যেন উভয়ের ঐক্য ধরা পড়ে।

অমর মিত্রের প্রসঙ্গ উঠলেই 'হস্তান্তর' গল্পের শেষ লাইন দুটি মনে পড়ে যায়: "চাষার জমি চাষার হৃদয়। সেই খোঁজে দুজন থেকে তিনজন, তিন থেকে চার, এমনি করে গাঁ উজাড় পাড়ি"।[২৮] অনেক নব্য গল্পকারের মতো অমর মিত্রের রচনায় নিম্নবিত্তের মুসলিম সমাজের কথা আছে, একালে কেবল আবুল বাশার কিংবা আফসার আমেদ যথাক্রমে মুর্শিদাবাদের মুসলমান শ্রেণী ও হাওড়ার মুসলিম সমাজের কথা বলেন না, অধিকাংশ লেখক সমাজের এ-অংশের দিকে অভিজ্ঞতার দৃষ্টি মেলে চেয়েছেন । বিজিতকুমার দত্ত একসময় যে আপসোস করেছেন, তার এখন আর কারণ দেখি না, 'বাংলা ছোটগল্পে মুসলমান সমাজের চিত্র সঙ্কুচিত, প্রায় উপেক্ষিত। অনেক কারণের মধ্যে মুসলমান লেখকের স্বল্পতা এর একটা কারণ। রবীন্দ্রনাথের গল্পে মুসলমান চরিত্র চকিত এবং তার মধ্যে সাম্প্রদায়িক রূপ অপেক্ষা সম্প্রদায়চ্যুট অন্তর-পুরুষটি প্রকাশিত'।[২৯] অমর মিত্রের জীবন ও মানুষের ব্যাখ্যা দানের পদ্ধতি দেখে আলোচকের মনে হয়েছে 'সাহিত্যজীবনের সূচনাতেই সমাজ, রাজনীতি ও মানুষের মন সম্পর্কে এই ধরনের চুলচেরা বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধান জোরালো কলমের পরিচয় দেয়'।[৩০] লেখক নিজ রচনা সম্পর্কে লেখা 'বৃক্ষের বেড়ে ওঠা' নিবন্ধে তাঁর জমির দলিল, তার হস্তান্তর ও পর্ব সম্পর্কে ধারণার হিসেব পেশ করেন— এই জমি ও দলিলের মধ্যে থেকে একসাথে বেরিয়ে আসা বাংলা গল্পের নতুন ধারা, 'জমি হস্তান্তরের বহু দৃশ্যাই তো দেখেছি, দেখতে হয়, দেখেছি জ্বরো রোগী উঠোনে বসে ধান ঝাড়ছে—পৌষের সকালে। খুব সামান্য জমি তার, এসব ঢুকে গেল হস্তান্তরের অনেক দৃশ্য, অনেক বেদনা এক হয়ে গেল এখানে। ছক বাঁধিনি। গল্পের ছক বাঁধা যায় বলে জানি না। হস্তান্তরের নানান দলিল সোলেনামা দানপত্র, হেজনামা না দাবি দেখতে দেখতেই 'দানপত্র'র উৎপত্তি। 'দানপত্র' গল্পটির আঙ্গিকও বিষয়বস্তুর মতোই অভিনব, দলিল নিয়েই কাহিনী শুরু, তার সঙ্গে সংগতি রেখে সাধুভাষায় গল্পটি লিখিত হয়েছে, এর উপযুক্ততা সম্পর্কে মনে কোনো প্রশ্নই জাগে না'। 'আত্মাপাথর' 'দানপত্র' গল্পগ্রন্থের একটি আকর বিশেষ। এখানেও লেখার আইনকে মর্যাদা দিতে হয় । মহুলবনি মৌজায় বুদাং মুণ্ডাকে কেন্দ্রে রেখে গল্পটি লিখেছেন, মহাপাত্রদের সঙ্গে তার সংযোগ, গোপীবল্লভপুরে থানার অন্তর্গত এই অংশে, সিলিং অনুসারে চব্বিশ একর কৃষিজমি রাখতে পারেন এক-একটি পরিবার, মহাপাত্ররা আইনের ফাঁকে যথেষ্টই তৎপর হয়েছেন, বুদাং মুণ্ডাকে ফরেস্টের জমি চাষে বাধা দেয় নি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত, ফসলের রসিদ দেবেন না তাঁরা, থানার সঙ্গে দহরম মহরম থাকলেও সম্মিলিত মুণ্ডাদের মশাল জ্বলে উঠল একুশে নভেম্বরে, রাজপুত ভাড়াটে সৈন্য দিয়ে না হলেও বহু বন্দুকের জোরে একসার বুদাংকে পাওয়া যায় নি, যাবেও না। কেন যাবে না তার সাক্ষ্য এই সময়, এই সমাজনীতি, এই রাষ্ট্রশাসন পদ্ধতি, পুলিস ও মহাজনের মধ্যকার সম্পর্কের মধ্যে নিহিত। ভগীরথ মিশ্রের গল্প আলোচনায় শৈবাল মিত্র প্রথমেই লিখেছেন, 'গল্পকার ভগীরথ মিশ্র কৃতবিদ্য হয়ে ওঠার প্রায় সমকালে ভারতীয় ইতিহাস চর্চায় সাব্ অলটার্ন তত্ত্ব এসে গেছে। সমাজ-বিজ্ঞানে মর্যাদা পেয়েছে গ্রামচি ফলিত জনবৃত্তের (সিভিল সোসাইটি) সামাজিক মনস্তাত্ত্বিক ভূমিকা'।[৩১] 'লেবারণ বাদ্যিগর' ভগীরথের সেই গল্পগ্রন্থ, যা থেকে তাঁর সাহিত্যিক মেজাজ ও ধর্মটি সম্পূর্ণভাবে চিনে নেওয়া যায়। ভগীরথের রচিত চরিত্রদেব এক অর্থে শৈবাল বীর আখ্যা দেন, গতানুগতিক অর্থে অবশ্য নয়। এদের কেউ ওঝা, কেউ চোর, কেউ ঢোলবাদক —এ ধারাই বীর। লেখক স্বয়ং মনে করেন তাঁর চোখ দুটি ক্রিয়াশীল ছিল। তাই সেই 'কৈশোর থেকে আমি অনেক ছবি দেখেছি। মানুষের জীবন-যাপন, আচার-আচরণ, অবিচার-অনাচার,— কিছুই আমার নজর এড়ায় নি'। প্রবল প্রতিক্রিয়ায় টানটান হয়েছে শরীর, মন । শুধু তাই ভগীরথ ভাবেন নি, আত্মসমীক্ষাও করেছেন, তাই লিখতে দ্বিধাবোধ করেন নি, "ষাটের দশকে যা যা 'চলবে না, মানবো না' বলে শ্লোগান দিয়েছি তার সবগুলো নব্বইয়ের দশকে বড় বেশি 'চলছে এবং মানছি' । ষাটের দশকে যে কৃশকায় মানুষটির পিছু পিছু নিঃসংকোচে ঢুকেছিলাম গভীর রাতে থানার হাজতে, তার সঙ্গে দেখা হল দীঘাতে । সঙ্গে স্থূলকায়া গৃহিণী । নিজেও মুটিয়েছেন

যথেষ্ট । মুখে পানবাহার, জর্দার ভুরভুরে সুবাস । বললাম, দাদা ? কেমন বুঝছেন ? চালে কাঁকর পাচ্ছেন ? পুলিশ ঘুষ খায় ? বেকার কমেছে ? আর কণ্ট্রাক্টরী ঘুষ ? মাস্তান আর সমাজবিরোধীদের হাল-হকিকৎ কি ? ... 'আচ্ছা, আচ্ছা, পরে হবে, ভেবো না' গোছের বলতে বলতে তিনি ঢেউ ভাঙতে ছুটলেন" ।[৩৩] এই ভগীরথ লোকায়ত জীবনের কথা বারংবার বলেন, 'মেলা, হাট, জঙ্গল' তাঁর লেখার মধ্যে অবস্থান করে । 'ইন্দর বাগ' গল্পে আছে খরা, আছে ভোজবিদ্যা, কুহকবিদ্যা, মধুবিদ্যা, ডাকিনী বিদ্যা, কাকচরিত্র ইত্যাদির কথা । তবু খরার প্রশ্নে স্কুলে পড়া বালকও জানে, "খরাতো হব্যেকই । সব জংগল যে কেইট্যে সাফ কইর‍্যে দিল্যেক । জংগল না থাইক্‌লে মেঘ জমে ? বিষ্টি হয় ? ইখনও সতর না হইল্যেঁ ঝাড়ে-বাঁশে মইরব্যেক ই জিলা" ।[৩৪] বাঁকুড়া জেলার গল্প 'বেঞ্জামিন মোলায়েজ বনাম ধনপতি সেন' অথবা 'মায়ের জন্য' তাঁর গল্পরচনার বিচিত্রতার ইঙ্গিতময়তায় ভরপুর । হাসান আজিজুল হক স্বপ্নময় চক্রবর্তীর ছোটোগল্প প্রসঙ্গে লেখেন, "প্রথমেই বলে নেই স্বপ্নময় চক্রবর্তী আমার প্রিয় গল্পকার" ।[৩৫] কারণ অনুসন্ধানের পূর্বে তাঁর সঙ্গে সহমত পোষণ করা যায় । অভিনবত্ব স্বপ্নময়ের অপর নাম । কত সহজ, সরল, অনাড়ম্বর ভঙ্গিতে পুনশ্চ দিয়ে কথা শুরু করেছেন । রূপকথার আদল, মঙ্গলকাব্যের কাব্য-বিন্যাস আছে, অথচ সবাই একালের । তাঁর দুটি গল্পগ্রন্থ 'অষ্ট চরণ ষোল হাঁটু' আর 'ভূমি-সূত্রে' — বিস্ময়বিমুগ্ধ করে দেবার মতো বহু গল্প আছে । আলোচক লেখেন, "স্বপ্নময়ের গল্প পড়তে যথেষ্ট সাহসের দরকার । কারণ সেগুলি পড়লেই বোঝা যায় । বোঝা যায় আমাদের স্বেদ-রক্ত-মেধা-লড়াইয়ের উৎস ও পরিণতি । স্বপ্নময়ের গল্পে সান্ত্বনা বা স্বস্তির অবকাশ নেই । এক ধরনের আগুন আছে । চাবুক আছে । সেখানে কোটি কোটি মানুষের রঙ জ্বলে যাওয়া জীবন, মৃত মুখগুলির বেঁচে থাকার লড়াই, জীবনের উঠোনে মৃতদের নির্মম মিছিল" ।[৩৬] স্বপ্নময়ের অধিকাংশ গল্প সম্পর্কে না বললে অস্বস্তি থেকে যায়, অতএব নিরুপায় । 'রক্ত' গল্প দিয়েই শুরু করা যায়, পাঁচু বলে, "... রক্ত বেচতো পিসি, বাড়িতে বলতো না । শরীরটা একেবারে শেষ করে দিয়েছে । এখন অনেক রক্ত লাগবে । হাসপাতালে বলে দিয়েছে রক্ত নেই । পিসি যেখানে রক্ত দিত, সেখানেও বাবা গেছিল । রক্ত নেই" । দুটি গল্প বর্তমান সমাজ-শিক্ষা ব্যবস্থাকে তীব্রভাবে আঘাত হানে । একটি 'বিদ্যাসাগর ! বিদ্যাসাগর !' অপরটি 'ভালো করে পড়্‌গা ইশ্‌কুলে', প্রথমটিতে বি. ডি. ও. অফিসে কাজ করতে আসা খোঁড়া মেয়ে দামোদর দেখতে চেয়েছিল । অফিসের সহকর্মী নিয়ে যান । অন্ধকারে কেবা কারা ভদ্রলোকের মাথায় মারে এবং মেয়েটির ওপর অত্যাচার করে । থানার বড়বাবু জেরার প্রথমেই জিজ্ঞেস করেন, 'কী করেন ? কোন্ ইউনিয়ন ? ফেডারেশন না কো-অর্ডিনেশন ?' যে গাড়িতে করে গুণ্ডারা আক্রমণ করে সেই গাড়িতে পরে একদিন দেখা যায় বি. ডি. ও. সাহেবের পরিবার । রুল্ নিয়ে ছুটে গাড়িতে বেপরোয়া যাবার ফলে তার ট্রান্সফার হয় । দামোদর দেখে কালো মেয়ে 'বিদ্যাসাগর', 'বিদ্যাসাগর' বলেছিল সেই দামোদর পেরোনোর কাহিনী স্মরণ ক'রে । আর দ্বিতীয় গল্পটিতে 'শিশুবর্ষ উপলক্ষে বিচিত্রানুষ্ঠানে'র পর্বে ১২।১৩ বছরের ছেলেকে মাস্টারমশাই ষাঁড়ের মূত্রযন্ত্রে একটা ন্যাকড়া লাগাতে দেখে ধমক দেন । সে বলে

> "নালুই বানাচ্ছি মাস্টার ।
>
> — নালুই আবার কী ?
>
> — আমাদের গাই-গরুটা ডাকছে বটে । এখন উয়ার পাল খাবার টাইম । গঞ্জের হাসপাতালে নে গেলে কলের পিচ্‌কিরি দে পাল খাওয়ালে বড় জাতের গাই হবে । কিন্তুক আমাদের গাইটা বড় ছেঁচড়া । কলের পিচকিরির ইন্‌জিশনের সময় খুব নাপানাপি করে । এই নালুইটা গাইয়ের মুকির সামনে ধইরলে আর নাপাবেনি, চুম্ মেরে থাইক্‌বে ।
>
> ওরে সবুজ । ওরে আমার কাঁচা । ... "[৩৭]

কাদের পড়াবার জন্যে স্বপ্নময় স্কুলে পাঠাবেন অতঃপর । জিজ্ঞাসার ভার আমাদের ওপরই ছেড়ে দিয়েছেন তিনি ।

'ভূমিসূত্রে'র শেষ গল্প 'তথ্যচিত্র' গল্পে আছে, "কার্তিক এখন এটা বুঝে গেছে— দেশের উন্নতি মানে বাবুদের উন্নতি এবং একটি চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র গোরুর রচনায় লিখেছে— 'গোরুর দুইটি চোখ দুটি কান ও একটি লেজ। গরু গোবর দেয়। গোবর সব রক্ষিতবাবুর গোবর প্লান্টে যায়'। 'রাঢ়বঙ্গ সমাচার' পত্রিকায় স্বভাবকবি ও সাংবাদিক শ্রীঅবনী ভট্টাচার্য্য বি. এ. -র রচনা—

"হেরিলাম দোমড়া গ্রামে— ভূপতি রক্ষিত নামে গৃহস্থ— দুরদৃষ্ট
করিলেন গোবর গ্যাস সৃষ্ট।
তাঁহার স্বধামে
জ্বলিতেছে আলো হের বিজলীর প্রায়
এক মাইল দূর হতে আলো দেখা যায়
মন্ত্রী আসিলেন— উদ্বোধন করিলেন, গত শুক্রবারে
তোমরা হে রাঢ়বাসী ব্লকের অফিসে আসি" ইত্যাদি।

অনিল ঘড়াই ও আবুল বাশারের গল্পের উল্লেখ স্বপ্নময়ের সঙ্গেই হওয়া উচিত। তবে অনিল ঘড়াইয়ের গল্পের পরে বাশার ও আফসার আমেদের গল্পের প্রসঙ্গ আনা যাবে। অনিলের গল্পই তাঁর পরিণত ক্ষমতার প্রমাণ। তাঁর 'জ্ঞানবৃক্ষের ফল', 'আগুন', 'পরীযান', 'কটাশ' প্রভৃতি গল্পগ্রন্থের গল্পের লেখক সম্পর্কে পূর্ণেন্দু পত্রী বলেছেন, "... ঘাড়ে ধরেই যেন লিখিয়ে নিয়েছে অতি চেনা বাস্তবতার নিস্তারহীন চাপ।"[৩৮] এবং একথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ব্যক্ত করেন, "সিংভূমের আদিবাসী অঞ্চলের অন্ত্যজ ও ছিন্নভিন্ন বাস্তবতাকে অনালোচিত অন্ধকার থেকে সভ্যতার আলোয় তুলে আনার দুর্বহ ঝুঁকি নেওয়ার দায়িত্ববোধেই তো প্রমাণ তিনি এসেছেন ঘোড়ায় চেপে, তাঁর কোমরবন্ধ দীর্ঘকালীন রাজ্যশাসনের অহংকারী তলোয়ার"।[৩৯] নিজের লেখা ও অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তিনি লেখেন, "আমরা বেঁচে আছি এই সত্য যখন বুকে হাত দিয়ে টের পাই, তখন ছানিপড়া চোখেও পৃথিবী অসম্ভব সুন্দরী, এক কথায় তিলোত্তমা। কিন্তু সুন্দরের পাশে লুকিয়ে থাকে অসুন্দর, তাকে তো আমরা অগ্রাহ্য করতে পারি না"[৪০] এবং "আমার লেখালেখির মধ্যে অভাব, অনটন, দরিদ্রতা, দুঃখবোধ আর গ্রামজীবন ঘুরে ফিরে আসে; কখনও আড়াল থেকে আমার মুখটা সেখানে অসহায় বিবর্ণ এক ছায়া ফেলে।"[৪১] 'জলচুরুণী' গল্পগ্রন্থের প্রথম পাতায় আছে "নিরন্নজনের ক্রোধ অশ্রু ভালবাসার দাউ দাউ আগুন"— এখানেও তিনি নিজেকে সমাপ্ত করেন না, ভাষা ও শব্দের ওপর তাঁর দখল তাঁর সদাজাগ্রত উপমায় বিধৃত করেন, "মানুষটা জাদু জানে, তার চোখ যেন মেয়ে মানুষের মরণ-কুয়া", "এই ঘন ঘোর শীতে কাঠবাদাম গাছটা কুঁড়ি ফুলে ঠাসা, হাভাতীও আঠার পেরিয়ে উনিশ ছুঁয়ে দূর্বাঘাস-যৌবনা", "মাঠ জুড়ে মাথা সমান আমন ধানে কার্তিক মাসের হাওয়া। এ সময় গর্ভবতী হয় ধানগাছ ?" অথবা সময় ও জীবন সম্পর্কে আশ্চর্য উপলব্ধি এভাবেই ধরা পড়ে "রাজনীতি অরাজকতা শেখায়", "অভাবী মানুষ সন্ন্যাসী না হলেও কদাচিৎ সততা হারায়", "রাজনীতি গরীবের ঘোড়া রোগ" ইত্যাদি। আবার দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারীদের নেহাৎ পেটের দায়ে অখাদ্য-কুখাদ্যে পেট-ভরানোর সঙ্গে পেট গুলনো যন্ত্রণার কথা ঘুরে ফিরে এসেছে অনিলের গল্পে। 'কাছিম' গল্পে 'পেটের চারপাশ থেকে এখন উঠে আসে গুলোনো কনকনে বেদনা। নামু পেটটা কেমন চাপ চাপ। গলা জ্বলে যায়, অম্বল-গ্যাসে। তার ওপর চোঁয়া ঢেকুর। কেমন গাভীন মেঘের গুড় গুড় আওয়াজ'। মেঘ-ডাকার শব্দের সঙ্গে পেটের গ্যাস জমে যাওয়ার উপমা 'বিষক্রিয়া' গল্পেও দেখা যায়। শুকরমনি বলে "পেট বেথা গো। কেমন গুড় গুড় মেঘ ডাকা শব্দ"। অথবা 'আলকাটা' গল্পে "গুড় গুড় ঢেকুর তুলল আকাশ। অবশেষে ঢেকুর থেকে বমি, হড় হড়ানো বমি"।

আজ আবুল বাশার বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট। 'রৌরব' পত্রিকায় মার্চ-জুন ১৯৮৩ সংখ্যায় 'দুই অক্ষরের গল্প' বিস্ময় উদ্রেক করেছিল। তাঁর অধিকাংশ রচনায় যেহেতু মুসলিম পরিবারের অন্তরঙ্গ ছবি আছে এবং মুসলিম

নারীর সংকট তিনি দেখিয়েছেন, তবু এখানেই বাশারের গল্পের রঙ সম্পূর্ণ হয় না। সম্পূর্ণ লেখক সংজ্ঞা তাঁর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যদিও 'সিমার' গল্পগ্রন্থের প্রথম ফোল্ডারে লেখা আছে তিনি দেখিয়েছেন "তালাক-ঈদ্দত-তহশীলের জটিল পাকে নিরন্তর নিষ্পেষিত নারী-সমাজ, কীভাবে ধর্ম হয়ে ওঠে এক কূট তামাশা"। মুসলিম সমাজের বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ, বহুবিবাহ নিপুণ কলমে তাঁর রচনায় উদ্ভাসিত। এদেশে শাহবানু মামলা কোর্টের সাহায্য পেলেও তৎকালীন লোকসভায়, সদস্যদের ভোটে খারিজ হয়ে যায়, কেন তালাক দিলে ভরণ-পোষণ পাওয়া যাবে না, কে তার উত্তর দেবে, শুধু মুসলিম সমাজে কেন, অসংখ্য খণ্ডে বিখণ্ডিত হিন্দুসমাজে আশির দশকেও 'সতী' নামক অলৌকিক তামাশায় রাজস্থানে রূপ কানোয়ারের নশ্বর শরীর জীবিতকালে জ্বালিয়ে দেওয়ার মহোৎসব চলে। 'নাস্তিক' গল্পে রাবেয়া আক্ষেপ করে বলেছিল, "শরৎবাবু লিখেছিলেন হিন্দু বিধবাদের নিয়ে, এমন কেউ নেই যিনি আজকের তালাক নিয়ে লেখেন, মুসলমান মেয়েদের অন্তর্বেদনার ছবি আঁকেন"। বাশার জানেন, "তালাক আসলে পুরুষের হাদীসী অসুখ, হিস্টিরিয়া"। বার্নার্ড শ যাকে Legal prostitute বলেছেন উক্ত 'নাস্তিক' গল্পে বলা হয়েছে "বিয়ে হচ্ছে চুক্তি, সোসাল কণ্ট্রাক্ট। নরনারীর যৌন সম্পর্কের বৈধতাকে স্বীকৃতি দেয় যে চুক্তি, সাতবালাকুম, সেই চুক্তির নামই নিকাহ"। "বললাম, নারীও মানুষ হামিদুল, আম পেয়ারার মতো ভোগের জন্য শুধু নয়"। তবু শরীফ সাহেব সম্পর্কে লেখকের ক্ষোভ ও ঘৃণা, "নিষ্পাপ সারল্যের পেছনে সাপের মতো চেরা জিভের লক্‌লকে ছায়া ভাসছে যেন। এদের মুখে অশ্লীল কোনো কথাই আটকায় না। মুসলিম নারীদের নিয়ে ফতোয়া দেয়ার কূটিল ব্যবসায়ে এদের সুখ্যাতি প্রচুর। এদের উপর সমস্ত আক্রোশ নিষ্ফল হয়ে যায়, বারবার এরা জেতে"। বিবাহ, পুনর্বিবাহ মুসলিম সমাজে যত সহজ, হিন্দু আইনে তত সহজ না হলেও নারী সমস্য কেন, কোনো সমস্যা আইন বা সমাজের মাতব্বরদের খবরদারিতে কেবল ভাঙে না, নিত্যদিনের সামাজিক ব্যবস্থাই তাকে ভেঙে দেয়, তাই বাশারের উল্লিখিত সমস্যা চিরন্তন নারীর সমস্যাও বটে। যদিও 'নাস্তিক' গল্পে প্রশ্ন ওঠে, 'আমি যদি হতাম হিন্দু, রাবেয়া যদি হতো শর্মিলা, হামিদুল হতো নির্মল অনিমেষ— তবে কি ও কাহিনী সৃষ্টি হতে পারত?" 'অমৃত বারিধি' গল্পগ্রন্থের জন্য বাশারকে লক্ষ্য করা যায়। এমনিতে ছোটো ছোটো সরল বাক্যে তিনি বক্তব্য স্পষ্টীকরণে সিদ্ধহস্ত। তা তাঁর সব গল্পেই আছে, অপূর্ব এক রোম্যাণ্টিক ভাবনার ও কল্পনার গল্প 'অমৃত বারিধি'। কল্পনার এক দ্বীপে কল্পনার এক চমকপ্রদ কাহিনী কবি বাশারকে স্মরণ করিয়ে দেয়। 'টি ভি' বা 'চোত পবনের কেচ্ছা', 'বড় জোর দুই মাইল' স্বাদে বিশিষ্ট।

আফসার আমেদ দীর্ঘসময় ধরে বাংলা সাহিত্যে দাপটে বিচরণ করবার প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসেছেন। বাশারের মতো "আফসারের অধিকাংশ রচনারই পরিপ্রেক্ষিত মুসলমান সমাজ। সেটা তার একান্ত আপন জগৎ, ঘনিষ্ঠ পারিবারিক বৃত্ত। কিন্তু তাঁর গল্প-উপন্যাসের চরিত্র মুসলিম হলেও, অখণ্ড সমাজ সত্তায় একজন মানুষ হিসেবেই বিচার্য। তথাপি তাকে যে মুসলিম সামাজিক জীবনকেই রচনার আধার হিসেবে গ্রহণ করতে হয়, সে-ও তার ইতিহাসচৈতন্যেরই দায়"— কথাগুলি 'আফসার আমেদে'র ছোটোগল্পের ভূমিকায় লেখেন অমলেন্দু চক্রবর্তী। তাঁর অন্য উক্তি : "অবাক হতে হয়, হাওড়া জেলার এ গ্রামে সীমাহীন অশিক্ষা আর দারিদ্র্য-অধ্যুষিত পরিবেশের নিত্য-বসবাসে অনুত্তীর্ণ ত্রিশের একজন যুবক এতটা আর্বান হল কোন উত্তরাধিকারে?" মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তরাধিকার তাঁর মধ্যে আছে, যে অর্থে তিনি লেখককে শ্রমজীবী কলমপেষা মজুর বলেছিলেন, সেই অর্থে আফসার লেখেন, "একজন মজুরকে দুই হাত পা শরীর দিয়ে শ্রম করে জীবন নির্বাহ করতে হয়, লেখকও এই মজুরের বাইরের কেউ নয়"।[৪২] তিনি বিশ্বাস করেন "একজন লেখক গুরুত্ব পান, প্রশংসা পান তাঁর লেখার ভেতর দিয়েই। প্রশংসা ও গুরুত্বের সীমাবদ্ধতায় তাঁর আক্রান্ত হলে চলে না"। "লেখার আসল উদ্দেশ্য নান্দনিকতা তিনি গ্রহণ করেছেন কিনা। সেই উত্তুঙ্গতায় তিনি নাই পৌঁছান, তাঁর উদ্দেশ্য তাঁকে সৎ একনিষ্ঠ হতে হবে।" কথাগুলি এখনো পর্যন্ত অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেছেন তিনি। 'আফসার আমেদ-এর গল্প-উপন্যাস

পড়ার সমস্যা' নিবন্ধে অগ্রজ সাহিত্যিক দেবেশ রায় সিদ্ধান্তে এসেছেন, "আফসার নিজের প্রতি সবচেয়ে নিষ্ঠুর, তিনি তাঁর লেখা থেকে নিজের কণ্ঠস্বরকে অবলুপ্ত করে দিতে পারেন" । এই স্বল্প বয়সে তিনি 'জিন্নত বেগমের বিরহ মিলন', 'গোনাহ্', 'জিন্নত বেগমের দিবস রজনী', 'খরা', 'হাড়' প্রভৃতি গল্পে নিজের পরিধিকে বিস্তৃত করেছেন" ।'গোনাহ্' সম্পর্কে দেবেশ রায় বলেন, "আমার ভাবতে ইচ্ছে করে এটা সারল্যে, প্রত্যক্ষতায়, নির্দ্বিধায় বাংলা সাহিত্যের একটা সেরা গল্প ।"

আমাদের সময়সীমার মধ্যে আলোচ্য অমলেন্দু চক্রবর্তীর 'অবিরত চেনামুখে'র গল্পগুলির মধ্যে 'পঞ্চাশটি মানবশিশু, একজন দেবদূত' গল্পটির প্রসঙ্গ পূর্বেই উঠেছে ব্যক্তিহত্যা ও নৈরাজ্যের সময় ব্যাখ্যা করবার প্রসঙ্গে। তিনি লিখছেন বহুদিন ; রাজনীতি-সমাজমনস্ক জীবনের জটিল গ্রন্থির ঠিকানা তাঁর জানা । সোমেন চন্দ-মানিকের রাজনীতির একটি ধারা চলে এসেছিল, সত্তরের সরাসরি রাজনৈতিক সংঘাতে তা উগ্রবাম, মধ্যবাম, দক্ষিণপন্থীর মধ্যে এসে খুন-জখমে পর্যবসিত হল— অমলেন্দুর আলোচ্য গল্পে শিক্ষক প্রণবেশ, 'রোহিতাশ্বের নামে' নরেশ ও ছাত্র শিবনাথ থেকে নরেশ একাই ইউনিয়ন অফিসে নীলুদার কাছে সব স্বপ্ন চূর্ণ হতে দেখে ; শোনে নেতার মুখের কথা "একটা মৃত্যুর জন্যে এরকম ফ্যাচ্‌ফ্যাচ কান্নাকাটি সেন্টিমেন্টালিজম্ । এ তো প্রায় ডজন দেড়ডজন রোজই শুনতে হচ্ছে। কী করা যাবে ? রাজনীতিটা ভীষণ ক্রূর"— রাজনীতি মানুষকে কী ভাবে অবিবেকী ও মনুষ্যত্বহীন করে তুলছে অমলেন্দু তা দেখাতে ভুল করেন না ।

মুখ্যত গ্রামের জীবনকে উপলক্ষ করে রাধানাথ মণ্ডলের অধিকাংশ গল্প লিখিত । খুব অভিজ্ঞতাঋদ্ধ তাঁর দৃষ্টি ।'আটঘরার মহিম হালদার' বা 'অমিতাভ অথবা সে নয়' গল্পগ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে প্রথমটি একান্ত গ্রাম্য ঘটনায় সমাহিত, দ্বিতীয়টি গ্রাম-সম্পর্ক-বিবর্জিত না হলেও শহুরে জীবনের আলেখ্য উজ্জ্বল । রাধানাথের গল্পের একটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে, অবশ্য গল্পগ্রন্থ থেকেই, তা হল একই নামের চরিত্র বিভিন্ন পরিবেশে গল্পে এসে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে, একে এক অর্থে অভিনবই বলা যায় । প্রথম গল্পগ্রন্থে বারোটি গল্পেই আটঘরার মহিম হালদার আছে, দ্বিতীয়টিও তদনুরূপ ।'চালে যখন কাচ গলছে' এবং 'আটঘরার মহিম হালদার' উল্লেখ্য গল্প তাঁর রচনার মধ্যে । অভিজিৎ সেন আর-এক বিশিষ্ট নাম । রাজনৈতিক অসাধুতা, আইনী লড়াইয়ের সীমানা, বিশ্বাস এবং প্রবঞ্চনা, প্রাকৃত মানুষের ঈশ্বর ও ধর্ম, এ-সব নিয়ে 'ব্যবচ্ছেদ', 'বর্গক্ষেত্র', 'মৌরসীপাট্টা', 'ঈশানী মেঘ', 'পাথর', 'বঘিনা' ইত্যাদি বহুতর গল্প লেখা হয়ে যায় তাঁর । তাঁর লেখাই উদ্ধৃত করা যায়, "অনেকেই জানে যে দিনাজপুর জেলার খাঁপুর গ্রামে তে-ভাগা আন্দোলনের সময় বেশ বড়সড় লড়াই হয় । সেই লড়াইতে একদিনে তেইশ জন কৃষক ও ভূমিহীন শহীদ হন । আমি এই খাঁপুর এবং তার আশেপাশের চার পাঁচটি থানার অসংখ্য গ্রামে অপারেশন বর্গা চলাকালীন সময়ে অনুসন্ধান করেছি এবং আগ্রহ নিয়ে শুনতে চেষ্টা করেছি যাবতীয় তৎপর্য। এই সব অনুসন্ধান ও অভিজ্ঞতার দলিল আমার 'দেবাংশী'র গল্পগুলো ।" তিনি মনে করেন "সত্তর দশকের আন্দোলনে বিপর্যয়, পরাজয় এবং পর্বতপ্রমাণ ভ্রান্তি থাকা সত্ত্বেও যে পরিবর্তনের চিহ্ন তা রেখে গেছে, ভারতবর্ষের ইতিহাসে তা বিরল" । সুবিমল মিশ্রের কণ্ঠস্বর প্রথম থেকেই প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার, উৎপলেন্দু চক্রবর্তীর সংস্কার বা কুসংস্কার বিরোধিতা ('দেবশিশু'), ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের শক্তিমত্তা ধরা পড়েছে তাঁর বিভিন্ন গল্পে, বিশেষত 'নোনা', 'বিনিয়োগ অথবা প্রয়োগ', 'আকাশের ফ্রেমে', 'লেবার সেটদার' তার মধ্যে উল্লেখ্য। সুচিত্রা ভট্টাচার্যের নাম নানা কারণেই উল্লেখযোগ্য । তাঁর 'রূপকথার জন্ম' গল্পগ্রন্থটি বিশিষ্টতার দাবি রাখে, তার মধ্যে 'রূপকথার জন্ম', 'বাদামী জড়ুল', 'প্রতীক্ষালয়', 'ভগবতীমঙ্গল' বিশেষ করে । এ সময়ের অন্য গল্পকারের মধ্যে উঠে এসেছেন সুব্রত মুখোপাধ্যায়, 'যে দেশে রজনী নাই' গল্পগ্রন্থে, 'চিত্ত ঘোষালের গল্পসংগ্রহ', 'অসুখে অনসুখে' অমিতাভ দত্ত । এ ছাড়া সৈকত রক্ষিত, হর্ষ দত্ত, সাধন দাশগুপ্ত, স্বর্ণ মিত্রের নাম উচ্চার্য । অনবধানবশত বহু নাম বাদ, অনভিপ্রেত বলে বিবেচিত হবে ।

সুদীর্ঘ পঁচিশ বছরের গল্পের সূত্রে সময়কালের পূর্বকার কিছু গল্পের উল্লেখ সূচনাপর্বের সাযুজ্য রক্ষা করার জন্য উপহৃত হল। ১৩৭৪ লেখা না হয়েও উল্লেখ্য, কারো মনে সংশয় জাগতে পারে। কোনো রচনাই আকস্মিক ও পূর্বের সঙ্গে সংযোগহীন হতে পারে না। সময়কালে উল্লেখ্য রচনা পাওয়া না গেলেও লেখক হিসেবে মৌলিক পরিবর্তন ঘটে নি। লক্ষ্য রাখা হয়েছে, সেদিকেও। রবীন্দ্র-পর্বে ছোটোগল্প রচনাকার যাঁরা পর্বকালের কিছু পূর্বে এমন সৃষ্টি রেখেছেন, যা অনুপ্রাণিত করেছে পরবর্তী পর্বে তা অনুল্লেখ্য থেকে গেলে স্রোতোধারা ক্ষুণ্ন হতে বাধ্য। আলোচ্যকালে মোটামুটি দুটি ক্ষেত্র দুর্নিরীক্ষ্য নয়, একটি প্রাতিষ্ঠানিক পত্র-পত্রিকা ও অপরটি নামে লিট্‌ল ম্যাগাজিন, এ ক্ষেত্রে দুয়েরই প্রাধান্য আছে, তবে প্রাতিষ্ঠানিক বিরোধিতা বা প্রতিষ্ঠানের উল্টো গোষ্ঠী থেকে সমসময়ে যে অসংখ্য ক্ষমতাবান ছোটোগল্পকারেরা বাংলা গল্পের ভাণ্ডারকে ধনী বা ঋণী করেছেন এরকম প্রতীতিতে পৌঁছানো অসমীচীন নয়। প্রথাগত লেখকেরা যে পথে যান নি, সেই অনাস্বাদিত ভুবনটিকে আলোয় ভরিয়ে যাঁরা তুলেছেন নিষ্ঠা-শ্রমে-অধ্যবসায়ে, তার প্রকৃত মূল্য নিরূপণের সময় হয়তো আসে নি, অথবা এখন থেকেই সূচনা হতে পারে। প্রতিষ্ঠান হোক বা না-হোক উৎকৃষ্ট রচনা সৃজনের দ্বারাই গৌরব আসা সম্ভব। সে-অর্থে রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা ছোটোগল্প যে রীতি ও প্রকৃতিতে পুষ্প-ফলভারে আনত হয়ে উঠেছে, আশার কথা সেটাই। সত্তর ও আশির দশক স্বভাবতই সফল। এঁরা নব্বইয়ের গোড়ায় লিখছেন, অনেক প্রলোভন উত্তীর্ণ হতে হবে তাঁদের এবং তৃণাঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়, ঋতুপর্ণ বিশ্বাস, বিদিশা ঘোষ দস্তিদার, অনিতা অগ্নিহোত্রীদের মতো যাঁরা সদ্য এ-জগতে এসেছেন, সামনে কঠিন বাধা হয়ে আছেন বাংলা ছোটোগল্পের বিখ্যাত দানবেরা। ঐ-সব ময়দানবদের কারুকৃতি অনুসরণ করলে চলবে না। অন্য কলাশৈলী চাই। অথবা তাঁদের কাউকে অনুসরণ করলে তাঁকে ছাড়িয়ে যেতে হবে— স্বপ্নময়ের সঙ্গে মতে কারো প্রভেদ থাকার কারণ নেই।

উল্লেখসূত্র

১. খালপোল ও টিনের ঘরের চিত্রকর, শ্রেষ্ঠ গল্প, প্রথম প্রকাশ, পৃ. ২২০
২. এক গুচ্ছ গল্প, প্রথম প্রকাশ, পৃ. ১৪৯
৩. ভূমিকা, গল্পসমগ্র
৪. কমলকুমারের গল্প, রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর উত্তরাধিকার, প্রথম প্রকাশ, পৃ. ১৪৮
৫. গল্প কেন, তদেব, পৃ. ২৫৩
৬. তদেব, পৃ. ২৫৪
৭. অসীম রায়ের গল্প, প্রতিক্ষণ সংস্করণ, পৃ. ৩৫
৮. অর্কিড, পঞ্চদশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১৩৯৮, পৃ. ২৭
৯. আহ্নিক গতি ও দেবেশ রায়ের কয়েকটি গল্প, গৌতম ঘোষ দস্তিদার, সিসৃক্ষা, জানুয়ারি, ১৯৯১, পৃ. ৫৪
১০. দেবেশ রায়ের গল্প, বাংলা ছোটোগল্পের আধুনিকতা, পৃ. ৯
১১. আজকাল, রবিবাসর, ২৬ জানুয়ারি, ১৯৯১
১২. কপিল নাচছে, প্রথম প্রকাশ, পৃ. ৩০
১৩. আমি ও আমার তরুণ লেখক বন্ধুরা, প্রথম প্রকাশ, পৃ. ১০৪
১৪. তদেব, পৃ. ১২১ •
১৫. তদেব, পৃ. ১১৬
১৬. তদেব, পৃ. ৪৯
১৭. প্রথম প্রকাশ, পৃ. ১৪৪

১৮. তদেব, পৃ. ২১৫
১৯. ভূমিকা, মহাশ্বেতা দেবীর গল্প, প্রথম প্রকাশ
২০. সন্দীপ দত্ত
২১. শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন ও অন্যান্য বিষয়, অতীন্দ্রিয় পাঠক, পৃ. ২৮
২২. তদেব, পৃ. ৩১–৩২
২৩. উদিত, সম্পাদনা : ঘনশ্যাম চৌধুরী ও পুষ্পল মুখোপাধ্যায়, পৃ. ১৯১
২৪. পুস্তক পরিচয়, আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২
২৫. সাধন চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস, কোরক, শারদীয় ১৩৯৭, পৃ. ৭১
২৬. আত্মসমীক্ষা, তদেব, পৃ. ৯
২৭. Some Principles Of Fiction, Robert Liddell, Reprinted 1961 edition, p 22
২৮. দানপত্র, পৃ. ৩৯
২৯. অচিন্ত্যকুমার ও বাংলা সাহিত্য, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৭৭, পৃ. ১৬৩
৩০. অমর মিত্র, নিরাপত্তাহীনতা থেকে আশ্বাসের দিকে, বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য, কোরক, শারদীয় ১৩৯৭, পৃ. ৫২
৩১. ভগীরথ মিশ্রের গল্প : লোকবৃত্তের আত্মানুসন্ধান, তদেব, পৃ. ৮১
৩২. মানুষের বিপক্ষে, তদেব, পৃ. ৩৮
৩৩. তদেব, পৃ. ৪৩
৩৪. লেখারণ বাদ্যিগর, পৃ. ৩৯
৩৫. কোরক, শারদীয় ১৩৯৭, পৃ. ৭
৩৬. ভূমিসূত্র, পৃ. ৮৪
৩৭. খুলে যাচ্ছে উত্তরের জানালা, কোরক, শারদীয়, ১৩৯৭, পৃ. ১৩–১৪
৩৮. তদেব, পৃ. ২৮
৩৯. সখের বাগানে শীতের রাত, তদেব, পৃ. ৬৪
৪০. তদেব, পৃ. ৭০
৪১. আত্মপক্ষ, আত্মনিরপেক্ষ, তদেব, পৃ. ৮০
৪২. আত্মপক্ষ, আত্মনিরপেক্ষ, তদেব, পৃ. ৮০

নাটক
১

পবিত্র সরকার

রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণ-বর্ষ হিসেবে চিহ্নিত ১৯৪১ সাল বাংলা নাটকের ধারাবাহিকতার ক্ষেত্রে কোনো বিশেষ তাৎপর্য নির্মাণ করে নি। তা না করলেও, তার ঠিক পরে পরেই বাংলা নাটকের ইতিহাসে একটি স্থায়ী পালাবদলের সূত্রপাত ঘটে, এবং সেদিক থেকে নিঃসন্দেহে ১৯৪১ সালকে বাঙালির সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণ হিসেবে গ্রহণ করে আমাদের পরিক্রমা শুরু করতে পারি।

এই পরিক্রমা দু-দিক থেকে করা উচিত। ১৯৪৩-৪৪ থেকে কলকাতা-নির্ভর বাংলা নাট্যচর্চায় যে যুগান্তর ঘটল, তা একই সঙ্গে নাট্যরচনা-প্রকরণকে যেমন প্রাচীন ধারা থেকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন করে এনেছে, তেমনই নাট্য-উপস্থাপনা এবং তার সংগঠনের চরিত্রও সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছে। আমাদের পর্যালোচনা এই দুদিকে লক্ষ্য রেখেই অগ্রসর হবে। বাংলা নাটকের প্রথাবদ্ধ ইতিহাসগুলিতে নাটককে মূলত সাহিত্যের পাঠ্য বা টেক্‌স্ট ধরে আলোচনা করার প্রবণতাটি চোখে পড়ে। আমরা নাটককে কেবল পাঠ্যবস্তু মনে করি না, তা মূলত অভিনেয়, এবং অভিনয়ের মধ্যেই নাটক তার চূড়ান্ত প্রমূর্তি লাভ করে বলে বিশ্বাস করি। তাই সাধারণ নাটকের ইতিহাসের তুলনায় আমাদের মনোযোগের এলাকা একটু ব্যাপক হবে।

ভূমিকায় আর-একটি কথা খুব স্পষ্ট করে বলে নেওয়া প্রয়োজন। ১৯৪১ বা ১৯৪৩ পর্যন্ত বাংলা নাটকের ইতিহাস হল মূলত উত্তর কলকাতার কয়েকটি রঙ্গমঞ্চে উপস্থাপিত 'পেশাদার' নাটকের ইতিহাস। বলা বাহুল্য, এ নাটক সব সময় পেশাদার ছিল না। গেরাসিম স্তেপানোবিচ্ লেবেদিয়েফ্-এর ১৭৯৫-এর বিচ্ছিন্ন ও ব্যক্তিগত চেষ্টার পর কলকাতার বড়োলোকদের প্রমোদশালার থিয়েটার চলে ১৮৩১ থেকে; ঠাকুরবাড়ির নাট্যচর্চা একদিকে এই বড়োলোকের বাড়ির থিয়েটারের ধারা বহন করেছে, কিন্তু অন্যদিকে রুচি ও সৌন্দর্যে সেই ধারা থেকে উত্তীর্ণ হয়েছে ১৮৬৮-তে বাগবাজার অ্যামেচার সম্প্রদায়ের স্থাপনায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যুবকদের দল বেঁধে অভিনয়ের ধারা শুরু হল। তা একটি 'আধা-পেশাদার' ভিত্তি পেল ১৮৭২ সালে জাতীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর। আধা-পেশাদার বলছি এই কারণে যে, তখনো এই থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত অভিনেতা ও অন্যান্যদের অভিনয়ই জীবিকার একমাত্র বা মুখ্য অবলম্বন হয়ে ওঠে নি। কিন্তু ১৮৭৬-এর পর ভুবনমোহন নিয়োগী, কেদারনাথ চৌধুরী ইত্যাদি বাঙালি 'লেসি' বা 'সাব-লেসি'-র পর অবাঙালি মূলধন-সরবরাহকারী প্রতাপ জহুরী, গোপীচাঁদ শেঠী, গুরমুখ রায় প্রভৃতিরা এই একই ভূমিকা নিয়ে (আসলে থিয়েটারের মালিক হয়ে) গিরিশচন্দ্র প্রভৃতিকে বেতনভুক অভিনেতা-পরিচালক-নাট্যকার নিযুক্ত করার পর থেকে অবস্থাটা পরিবর্তিত হয়। অন্যত্রও আমরা বলেছি,[১] যে এর ফলে যা 'জাতীয়' নাট্যমঞ্চরূপে শুরু হয়েছিল তা ক্রমশ 'পেশাদার' বা ব্যবসায়িক নাট্যমঞ্চের রূপ নেয়। আর্থিক লাভ-লোকসানই তার মূল প্রেরণাশক্তি হয়ে ওঠে। এমন নয় যে এই ব্যবসায়িক থিয়েটার দেশপ্রেম, সমাজসংস্কার, মানবিক সংকট ইত্যাদিকে অবজ্ঞা বা উপেক্ষা করে চলেছে। প্রায়ই দেখা যাবে যে,

ভক্তিরস, দেশপ্রেম, মদ্যপান-সংকট ইত্যাদি তার নাটকের উচ্ছ্বসিত বা অতিনাটকীয় বিষয় হিসেবে দেখা দিয়েছে। কিন্তু একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে যে এই বিষয়গুলি নাটকে এসেছে ঝাঁকে ঝাঁকে, চারপাশের সামাজিক-রাজনৈতিক-ধর্মীয় আন্দোলনের চাপে মরশুমি বা আবেগের বশবর্তী হয়ে। গত শতাব্দীর আশির বছরগুলিতে হিন্দু পুনরুত্থানবাদের সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের (১৮৪৪–১৯১২) 'চৈতন্যলীলা' (১৮৮৪) ইত্যাদি ভক্তিরসের নাটক, বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের চাপে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের (১৮৬৩–১৯২৬) 'বঙ্গের প্রতাপ আদিত্য' (১৯০৬) থেকে শুরু করে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের (১৮৬৩–১৯১৩) 'নূরজাহান' (১৯০৭), 'মেবার পতন' (১৯০৮) ইত্যাদির কথা নিশ্চয়ই মনে পড়বে। এই-সব নাট্যকাররা, বা রঙ্গমঞ্চের অন্যান্যরা দেশ ও সমাজের নানা প্রশ্ন নিয়ে আবেগমথিত হয়েই নাটক লিখেছেন বা প্রযোজনা করেছেন, এ কথাও সব সময় মিথ্যা নয়। কিন্তু এও অধিকাংশত সত্য যে, ১৯৪৪ পর্যন্ত ব্যবসায়িক মঞ্চে লাভ-লোকসানের শর্ত মেনেই নাটকের বিষয় গৃহীত বা বর্জিত হয়েছে। তার মধ্যেই ১৯২১-এর পর শিশিরকুমার মস্তিষ্ক ও কল্পনার খেলা দেখিয়ে একসময় ফুরিয়ে গেছেন, তারই মধ্যে কাজ করেছেন যোগেশ চৌধুরী (১৮৮৬–১৯৪১), শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৯২–১৯৬১) বা মন্মথ রায় (১৮৯৯–১৯৮৮), বা রবীন্দ্রনাথ মৈত্র (১৯০৩–১৯৩২)।

এই মূল ধারায় পাশাপাশি যে একটি-দুটি ধারা তৈরি হয়েছিল, তা কখনো ছিল সময়বদ্ধ, কখনো এমন দুর্বল ও অনুকরণধর্মী যে, কখনোই ব্যবসায়িক থিয়েটারের অস্তিত্বকে আঘাত করতে পারে নি। মুকুন্দ দাসের (১৮৭৮–১৯৩৪) দেশপ্রেম ও সমাজসচেতন যাত্রাপালাগুলি গ্রামাঞ্চলে অসাধারণ জনপ্রিয় হয়, উদ্দীপনাপূর্ণ বা ব্যথা-ব্যঙ্গময় তাঁর গানের রেশ লোকস্মৃতিতে দীর্ঘ দিন জেগেও থাকে, কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের উত্তেজনার পর তাঁর যাত্রা কোনো স্থায়ী উত্তরাধিকার সৃষ্টি করতে পারে না। আজ আমরা যাকে 'গণনাট্য' বলে জানি, তার পূর্বসূত্র মুকুন্দদাসে নিশ্চয়ই আছে। যদিও তা ছিল ব্যক্তিত্বপ্রধান এবং মুকুন্দদাসের পিছনে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতাদের রাজনৈতিক সমর্থন থাকলেও কোনো রাজনৈতিক দলের সংগঠনের ভিত্তি সেখানে ছিল না। গ্রাম ও শহরের বাকি নাট্যচর্চা ছিল নেহাতই প্রতিধ্বনিপ্রতিম— অর্থাৎ শহরের ব্যবসায়িক নাট্যমঞ্চে যে-সব নাটক অভিনীত হত সেগুলিকেই অন্যত্র ক্ষণস্থায়ী মঞ্চে বা মণ্ডপে আরো অপটুভাবে অভিনয় করা হত, কখনো শহর থেকে অভিনেতা-অভিনেত্রী নিয়ে গিয়ে। এমন-কি, বাংলার লোকনাট্যধারা থেকে বিবর্তিত হয়ে এসেছে যে যাত্রা, তাও মঞ্চের নাটক থেকে ঋণগ্রহণ করতে করতে সে নাটকেরই প্রতিচ্ছায়া হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ১৯১৩-র পর যাত্রাতে সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছিলেন সম্ভবত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়— তাঁর অতিরিক্ত আবেগ-উচ্ছ্বাসপূর্ণ কাব্যিক ও নাটকীয় সংলাপের দ্বারা— যার সূত্র তিনি পেয়েছিলেন ইংল্যাণ্ডে থাকার সময় হেনরি আর্ভিং-এর অভিনীত নাটকগুলি থেকে।[২] ফলে যাত্রাও শহরের ব্যবসায়িক মঞ্চের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে নি। জোড়াসাঁকোর বাড়িতে ও পরে শান্তিনিকেতনের পটভূমিকায় অভিনীত রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলিকে অনেকে 'সমান্তরাল' 'থিয়েটার' ইত্যাদি আখ্যা দেন। কিন্তু নিরপেক্ষ পুনর্বিচারে এ কথা বলতেই হবে যে, তারও আবেদন ও তাৎপর্য কলকাতা ও শান্তিনিকেতনের একটি ছোটো রসিক-সম্প্রদায়ের মধ্যেই ছিল সীমাবদ্ধ। তা সমকালীন ব্যবসায়িক থিয়েটারকে বিন্দুমাত্র প্রভাবিত করে নি, তেমনই গ্রামেগঞ্জে অজস্র সংগঠিত বা লোকনাট্যের মঞ্চায়নকেও কোনো পাল্টা আদল উপহার দিতে পারে নি। আবার পরবর্তীকালে গণনাট্যের কাছেও সাক্ষাৎ অনুপ্রেরণা হয়ে উঠতে পারে নি। পরবর্তীকালে এই-সব অভিনয়ের বিবরণ, সমালোচনা ইত্যাদি পড়ে আমরা নিশ্চয়ই তাঁর নাটক ও সে নাটকের উপস্থাপনা সম্বন্ধে কিছু উপলব্ধি অর্জন করেছি, কিন্তু পরবর্তীকালে বহুরূপী ইত্যাদি সম্প্রদায়ের সার্থক রবীন্দ্রনাটক-প্রযোজনায় রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব নাট্যচর্চার প্রভাব বা স্বীকৃতি খুব বেশি নয়। আমাদের মতে রবীন্দ্রনাটক যেখানে যথার্থ একটি মৌলিক ও গৌরবময় পৃথক ধারার সৃষ্টি করেছে সে তাঁর গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য। এই নাট্যগুলির গুণেই এখনো রবীন্দ্রনাথ সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং সবচেয়ে বহুলভাবে অভিনীত ভারতীয় নাট্যকার। যাঁরা

'রবীন্দ্রনাথের নাটক হয় না কেন' বলে অভিযোগ বা দুঃখ জানান তাঁরা (রবীন্দ্রনাথের এই নাটকগুলিকে) বাতিল-হওয়া কতকগুলি তাত্ত্বিক কারণে নাটকের মধ্যে ফেলেন না।

দুই

১৯৪৪-এর ২৪ অক্টোবর ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের দ্বারা বিজন ভট্টাচার্য (১৯১৭-৭৮)-এর 'নবান্ন' অভিনয়ের পর বাংলা নাটকের ইতিহাসকে পেশাদার মঞ্চ থেকে সরিয়ে এনে বইয়ে দেওয়া হল অব্যবসায়িক অপেশাদার নাট্যপ্রয়াসের খাতে। নাটকের বিষয় প্রকরণ লক্ষ্য নাট্যসংগঠন, নাট্যকার অভিনেতা নাট্যকর্মী ইত্যাদির সামাজিক, শ্রেণী ও পেশাগত চরিত্র— কোনো কিছুই আর আগের মতো রইল না। ফলে যিনি ১৯৪১-এর পরবর্তীকালে বাংলা নাটকের ইতিহাস লিখবেন, তাঁকে এক সম্পূর্ণ নূতন অভিজ্ঞতার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। ব্যবসায়িক রঙ্গমঞ্চের জনপ্রিয় অনেক নাট্যকার— শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মন্মথ রায়, মহেন্দ্র গুপ্ত (১৯১০-৮৪), বিধায়ক ভট্টাচার্য (১৯০৭-৮৬)— যাঁরা ১৯৪১-এর পরেও অনেক নাটক লিখবেন এবং তার কিছু হয়তো পেশাদার মঞ্চে বা শৌখিন অভিনয়ে জনপ্রিয়ও হবে— তাঁদের কথা এই নতুন নাটকের ইতিহাসকারকে প্রায় সম্পূর্ণ ভুলে থাকতে হবে। কারণ তাৎপর্যপূর্ণ বাংলা নাটকের যে-মূলধারার সঙ্গে তাঁরা যুক্ত ছিলেন তা আর মূল ধারা রইল না। গণনাট্যের নাট্যচেষ্টা থেকে শুরু হল বাংলা নাটকের নতুন মেইন স্ট্রিম। উপরের এই-সব নাট্যকারের কারো কারো নাটক দু-একবার নিশ্চয়ই গণনাট্য বা পরবর্তী গ্রুপ থিয়েটারে অভিনীত হয়েছে, যেমন মন্মথ রায়ের 'ধর্মঘট' বহুরূপী অভিনয় করেছে ১৯৫৩-তে, 'অমৃত অতীত' অভিনয় করেছে গন্ধর্ব ১৯৬০ নাগাদ, কিন্তু এঁরা পরবর্তী নাট্যচর্চায় নাটকের মুখ্য সরবরাহকারী রইলেন না আর, অন্য এক দল নাট্যকার এসে সেই ভূমিকা ছিনিয়ে নিল। শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এমন-কি, ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের সভাপতিও হয়েছিলেন, কিন্তু সেই অর্থে গণনাট্যের নাট্যকার হন নি। একমাত্র তুলসী লাহিড়ীই ব্যবসায়িক নাট্যমঞ্চ থেকে তাঁর নাটককে গণনাট্যে প্রবাহিত করে দিয়েছিলেন। তাঁর ক্ষেত্রে এক ধরনের কার্যকর গোত্রান্তর ঘটেছিল।

দ্বিতীয়ত, নাটক এবার হল সমসময়-সচেতন, নিজের সামাজিক ও ঐতিহাসিক অবস্থানকে বোঝবার একটা রাজনৈতিক শিক্ষাক্রম, এবং এই সমাজে যাদের অবস্থান নিছক বঞ্চনার মধ্যে, তাদের বঞ্চনা পীড়ন এবং তার ফলে তাদের ক্ষয়, মৃত্যু এবং সংগ্রামী পুনরুজ্জীবন দেখানোর একটা রাজনৈতিক অস্ত্র বটে। এই রাজনীতি ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির রাজনীতি। কমিউনিস্ট সাংস্কৃতিক 'ফ্রন্ট' সংগঠনই ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ। এবং কমিউনিস্ট পার্টির দর্শন শুধু নয়, তার মূল নিয়ন্ত্রণ এবং সংগঠনও এর পিছনে কার্যকর। সুতরাং আগেকার পেশাদার নাটকের সংগঠন থেকে এর পটভূমিকাটি সম্পূর্ণই আলাদা। ব্যবসায়িক মঞ্চে ব্যক্তিগত মালিকানা বা দলপতি-প্রাধান্যের (শিশিরকুমারের ক্ষেত্রে যেমন হয়েছিল) হিসেবে লাভ লোকসানের বৈষয়িক দিকটা বিশেষ গুরুত্ব পায়, যদিও এ কথা বলা যাবে না যে শুধু লাভ করার অন্ধ লোভেই ব্যবসায়িক মঞ্চের সমস্ত নাটক হয়েছে। কিন্তু তার অবস্থান প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বেশ দূরে। গণনাট্যে যেখানে প্রায় প্রত্যেকেই রাজনৈতিক কর্মী— মঞ্চে এবং মঞ্চের বাইরেও, ব্যবসায়িক মঞ্চে তা হওয়ার উপায় ছিল না। বস্তুতপক্ষে এমন হয়তো বলা যায় যে, গত শতাব্দীতে ১৮৭৬-এর নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইনের ফলে রাজনীতিকে পরিহার করার প্রবণতা থেকেই ব্যবসায়িকতা ত্বরান্বিত হয়েছিল। আর এ রাজনীতি গত শতাব্দীর— এমন-কি, ১৯৩০-এর 'কারাগার' 'গৈরিক পতাকা'র মতো ইতিহাস-পুরাণের ছদ্মবেশ খোঁজে না, তা 'তখন'-এর বদলে 'এখন'-কে সামনে তুলে ধরে কারা শোষণ করছে, কারা শোষিত হচ্ছে, শোষণের স্থানীয় দেশগত এবং আন্তর্জাতিক জালজটিল প্রেক্ষাপটটি পরিষ্কার করে দেয়। নিছক পুরাণভিত্তিক ভক্তিরস, ইতিহাসভিত্তিক রোমান্স বা অতিনাটকীয়তা কিংবা প্রহসনের নিরর্থক

লঘুতাকে এ নাটক সতর্কভাবে এড়িয়ে চলে।

তৃতীয়ত, নতুন নাট্যসংগঠন মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালি তরুণ-তরুণীর সংগঠন। কেউ বেকার, কেউ বা অন্যত্র কাজকর্মে পুরো সময়ে যুক্ত— নাটক কারোই পুরো সময়ের জীবিকা নয়। নাটক থেকে অর্থ সম্মান প্রতিষ্ঠা উপার্জন কারো উপস্থিত লক্ষ্য নয়।

ফলে, নতুন নাটকের চরিত্র যা দাঁড়াল তা হল, এ নাটকের অভিনয় নিয়মিত নয়, নৈমিত্তিক বা উপলক্ষনির্ভর। চতুর্থত, বৃহস্পতিবার ও শনিবার সন্ধ্যায় একটি করে, এবং রবিবার ম্যাটিনি নিয়ে দুটি— সপ্তাহে মোট চারটি 'শো'— এবং ছুটির দিনে আরো দুটি, সেইসঙ্গে শিবরাত্রিতে সারারাত তিনি-চারটি নাটকের অভিনয়— ১৯৪৪-এর পরবর্তী নাটক সেদিকে চলবারই চেষ্টা করে নি, করা তার পক্ষে সম্ভবও ছিল না। পার্টি সংগঠন বা কৃষক সংগঠনের ডাকে, বা নানা প্রতিষ্ঠানের আহ্বানে, কখনো পিপল্‌স রিলিফ কমিটির সাহায্যার্থে— তার অভিনয় হয়েছে। সে অভিনয়ের লক্ষ্য ছিল না ব্যক্তি বা নাট্যসংগঠনের ভরণপোষণ কিংবা পুষ্টি। লক্ষ্য ছিল নাটকের বহির্বর্তী কিছু— চাঁদা তোলা, মধ্যবিত্ত মানুষ, কৃষক বা শ্রমিককে রাজনৈতিক শিক্ষা দান, বা জনসাধারণকে উদ্‌বুদ্ধ করা।

এ থেকেই তৈরি হল নতুন নাটকের সংগঠনগত পঞ্চম বৈশিষ্ট্য। এ নাটক কিছুটা ভ্রাম্যমাণ। ব্যবসায়িক মঞ্চ সে অর্থে ভ্রাম্যমাণ ছিল না, হতে পারে নি। সেট সজ্জা, সাজ সরঞ্জাম, বাদ্যভাণ্ড, আলোর যন্ত্রপাতি— এ-সব নিয়ে চলিষ্ণু হওয়া তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু গণনাট্যের নাটক বহু পরিক্রমা করেছে। শহরে, গ্রামে, দূর প্রদেশে বা অন্য মহানগরে। পরে গ্রুপ থিয়েটারও খানিকটা সচল ছিল।[৩]

এই-সব কারণে ১৯৪৪-এর পর ব্যবসায়িক মঞ্চের নাটক হল পার্শ্বিক বা প্রান্তীয় অস্তিত্বের নাটক, আর গণনাট্য ও পরবর্তী গ্রুপ থিয়েটারে আশ্রিত নাটক এসে কেন্দ্রীয় জায়গাটি দখল করল। শুধু তাই নয়, নতুন নাটকের বিষয়, প্রকরণ, লক্ষ্য ও সমাজতাত্ত্বিক চরিত্রও আর এক রইল না।

তিন

যে-সব নাট্যকার পূর্বতন ধারার সঙ্গে যুক্ত রইলেন, বা ব্যবসায়িক মঞ্চের দিকে তাকিয়েই নাটক লিখতে লাগলেন তাঁরা হলেন শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মন্মথ রায়, মহেন্দ্র গুপ্ত, বিধায়ক ভট্টাচার্য, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮–১৯৭১), প্রমথনাথ বিশী (১৯০১–৮৫), মনোজ বসু, জলধর চট্টোপাধ্যায় (১২৯৭ ?–১৩৭১), বনফুল ১৮৯৯–১৯৭৯ প্রভৃতি। এঁরা কেউ কেউ স্বাধীনতার আগে স্বদেশপ্রেমমূলক নাটক লিখেছেন, কেউ প্রহসন রচনা করেছেন, কেউ প্রবল আবেগতাড়িত নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতময় উত্তেজনা ও ক্যাথারসিস গড়ে তুলতে উদ্যোগী ছিলেন, কেউ বা প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিত্বের জীবন-সংঘাতকে নাট্যরূপ দিয়েছেন। কিন্তু এঁরা কেউ কোনো বিকল্প নাট্যচর্চা বা নাট্য-আন্দোলনের প্রত্যাশা করেন নি, বা তার উদ্যোগ নেন নি। এঁদের নাটক মঞ্চে প্রায়ই জনপ্রিয় হয়েছে, ১৯৩৮-এ প্রকাশিত শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'সিরাজদ্দৌলা' এখনো রেকর্ডে-বন্ধ অবস্থায় প্রবল দেশাত্মবোধক চিত্ততরঙ্গ সৃষ্টি করে। কিন্তু এ কথা আমাদের মানতেই হবে যে, ১৯৪৪-এর পর বাংলা নাটকের যে প্রয়াস ও পরিবেশনা আমাদের দৃষ্টিপাতের কেন্দ্র দখল করে নিল, এঁরা সেই কেন্দ্রে ছিলেন না। তার অর্থ এই নয় যে, এঁরা একেবারে মুছে গিয়েছিলেন। শৌখিন অভিনয়ে, অফিস পাড়ার নাট্যচর্চায় এঁরা দীর্ঘদিন জনপ্রিয় ছিলেন, এখনো কারো কারো কোনো কোনো নাটকের জনপ্রিয়তা অপরিম্লান। তবু একটি বা দুটি চরিত্রকে প্রাধান্য দেওয়া সেই-সব নাটক— যাতে বড়ো বা উচ্চাকাঙ্ক্ষী অভিনেত্রী বা অভিনেতার ব্যক্তিগত অভিনয় ক্ষমতা দেখানোর সুযোগ থাকত, যাতে আধ পাগলা অতিনাটকীয় চরিত্র, অভাবিত সমাপতন

(coincidence) স্পষ্টতই কল্পিত সমস্যা ও সংকটের প্রাচুর্য ছিল, এবং নাটকীয় চরিত্রগুলিও মধ্যবিত্ত স্তরের নিচে নামে নি, অধিকাংশ ক্ষেত্রে, যেখানে ঐতিহাসিক নয় সেখানে উচ্চ মধ্যবিত্ত তলাতেই থেমে থেকেছে। ফলে ভারতবর্ষের দরিদ্র ও বঞ্চিত মানুষ কদাচিৎ সে-সব নাটকে মর্যাদাপূর্ণ প্রবেশপত্র লাভ করেছে। এই-সব নাটক যেহেতু নতুন নাট্যক্রিয়ার অগ্রগতি বা ধারাবাহিকতার অন্তর্ভুক্ত হয় নি, বরং একটি প্রাক্তন ধারার অবশেষ হয়ে আছে, সে কারণে এগুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা এই প্রবন্ধে বাহুল্য মনে করি। এমন হতেই পারে যে, কোনো কোনো সময়ে, সমাজের কোনো কোনো স্তরে এঁদের কোনো কোনো নাটকের পুনরাবিষ্কার বা পুনরুজ্জীবন ঘটবে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে এঁদের নাটক বাংলার প্রগতিশীল নাট্যক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত কখনোই করা হবে না। তাই রবীন্দ্র-পরবর্তী নাট্যধারার বিবরণে এই-সব নাট্যকারের নাট্যকীর্তির আলোচনা আমাদের মতে অপ্রাসঙ্গিক।[৪] নাট্যসাহিত্যের ব্যাপক ইতিহাসে অবশ্যই তাঁদের কাজ যথাযোগ্য স্বীকৃতি পাবে।

চার

ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের নাট্যকর্ম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্যের নাটক দিয়ে আরম্ভ হয় নি। এবং নতুন নাটকের মূল প্রেরণা কোনো মঞ্চে বৈষয়িক ও অন্যান্য সাফল্যলাভের হাতছানি নয়, সে প্রেরণা বা প্রবর্তনা হল যুদ্ধ। দুর্ভিক্ষও এই যুদ্ধে (দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ) প্রতিপক্ষ দুটি ভাগ হয়ে যায় ফ্যাসিস্ট ও ফ্যাসিবিরোধী শিবিরে, এবং সাম্যবাদী সোবিয়েতের সমর্থনে দেশবিদেশের কমিউনিস্ট পার্টিও তাদের ফ্রন্টগুলিকে নিয়ে ফ্যাসিবিরোধী রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলে। তাদে শান্তিবাদী বুদ্ধিজীবীদেরও পার্শ্বিক নেতৃত্ব ছিল। ১৯৩৫-এ রোমাঁ রোলাঁর সভাপতিত্বে 'ওয়র্লড কংগ্রেস আগেনস্ট ফ্যাসিজম্ অ্যাণ্ড ওয়র' (আমস্টারডাম, প্যারি নগরে 'ইনটারন্যাশনাল কনফারেন্স অব রাইটার্স' থেকে ই.এম. ফর্স্টারের উদ্যোগে লণ্ডনে ইংরেজ ও ভারতীয় লেখকদের সংগঠন প্রগ্রেসিভ রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশন তৈরি হল। ১৯৩৫-এ কমিউনিস্ট ইনটারন্যাশনালের সপ্তম কংগ্রেসে জর্জি দিমিত্রফ্ 'যুক্তফ্রন্ট' তৈরি করার নীতি ঘোষণা করেছিলেন। এই নীতির লক্ষ্যের মধ্যে ছিল ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যনির্মাণ, এবং "বুদ্ধিজীবী, যুব, মহিলা প্রভৃতি সংগঠন গড়া ও উপনিবেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণফ্রন্ট গড়া"...[৫] ভারতে ভারতীয় প্রগতি লেখক সঙ্ঘ (Indian Progressive Writers' Association) ইস্তাহার প্রকাশ করে ১৯৩৫-এ, কিন্তু তার প্রথম প্রকাশ্য অধিবেশন হল লখনউ-এ, ১০ এপ্রিল, ১৯৩৬, মুন্সি প্রেমচন্দের সভাপতিত্বে। তার বঙ্গীয় শাখাও স্থাপিত হল। এই বঙ্গীয় শাখা ১৯৪২ সালে ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘে রূপান্তরিত হল (২৮ মার্চ, ১৯৪২, সম্ভবত কুড়ি দিন আগে ঢাকায় সোমেন চন্দের নৃশংস হত্যার আশু প্রতিক্রিয়ায়), এবং বাংলায় পরের বছর প্রতিষ্ঠিত হয়ে তারই একটি শাখা হিসেবে গণ্য হল গণনাট্য সঙ্ঘ। তখনো সর্বভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ তৈরি হয় নি। ১৯৪১-এই অনিল ডি সিল্‌ভার নেতৃত্বে ব্যাঙ্গালোরে ও তার পরে বোম্বাইয়ে গণনাট্য সঙ্ঘের একটি শাখার প্রতিষ্ঠা হয়েছে তার পরের বছর। ১৯৪৩-এর মে মাসে বোম্বাইয়ে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির অধিবেশনের সঙ্গে গণনাট্যের নানা অঞ্চলের বিচ্ছিন্ন শাখাগুলিও একটি সর্বভারতীয় অধিবেশনে যোগ দেয় এবং মিলিতভাবে ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ গড়ে তোলে (২৫ মে)। আমরা অনেকেই হয়তো জানি যে 'গণনাট্য' বা 'পিপল্‌স থিয়েটার' কথাটির মূল উদ্ভাবক ছিলেন রোমাঁ রোলাঁ (১৮৬৬–১৯৪৪)— *Revue d'art Dramatique* পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধগুলিতে।[৬] তবে সোবিয়েত ও চীনের পিপল্‌স থিয়েটারগুলির সংগঠন ও কাজও এদেশের গণনাট্যকে প্রভাবিত করে।

গণনাট্য কর্মীদের পাশাপাশি নাট্যচেষ্টা ও সংস্কৃতিচেষ্টার একটি সমান্তরাল ও সহযোগী প্রগতিশীল ধারাও তৈরি হয়েছিল বাংলায়। সেটি ছাত্র ফেডারেশনের (প্রতিষ্ঠা ১৯৩৬) উদ্যোগে। তাদের জেলা-পরিক্রমাকারী

'কালচারাল ব্রিগেড'গুলিও নাটক অভিনয় করতে আরম্ভ করে । ১৯৪০-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সচেতন ছাত্রদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত 'ইয়ুথ কালচারাল ইনস্টিট্যুট' (YCI)-ও এইরকম আর-একটি সংগঠন, যা প্রথমে গণনাট্যকে পাশ থেকে সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী করেছে, পরে গণনাট্যেই গিয়ে মিশেছে । এঁরা প্রথম দিকে ইংরেজিতে নাটক করতেন (উদ্যোক্তারা অনেকেই ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র ছিলেন বলে), পরে বাংলা নাটকও অভিনয় করেন ।

গণনাট্যের এই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পটভূমিকাই সৃষ্টি করল তার নতুন নাট্যকার, আগেকার সমস্ত বাংলা নাটক ও অভিনয়ের উত্তরাধিকারকে প্রত্যাখ্যান করে । প্রগতি লেখক সঙ্ঘের ম্যানিফেস্টোতে যে বিশ্বাস প্রকাশ করা হয়েছিল যে "the new literature of India must deal with the basic problems of hunger and poverty, social backwardness and political subjection" [৭] — তা স্বাভাবিকভাবেই নতুন নাটকেরও উপজীব্য হয়ে উঠল।

গণনাট্যের প্রথম যুগে গৌণ নাট্যকার হিসেবে অনেকেই এগিয়ে এসেছিলেন,[৮] কিন্তু প্রধান নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য (১৯১৯–৭৮) । নাট্যকার হিসেবে বিজন ভট্টাচার্যই আন্দোলনের সৃষ্টি করেন । তাঁর নিজের কথায়—

'দেশব্যাপী সেই অবিন্যস্ত ভয়ংকর দিনে একদিকে যেমন অসহায় বুভুক্ষু মানুষ পথে প্রান্তরে কাতার দিয়ে মরছে, তেমনি চলছে অন্যদিকে স্বাধীন ভারতের জীবনায়ন— বহ্নিমান আগস্ট আন্দোলনের দিনগুলোতে যে জীবন মৃত্যুহীন ।

জাতীয় জীবনের এই আলো-আঁধারি সন্ধিক্ষণে প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ এক সাংস্কৃতিক আন্দোলন আরম্ভ করেন । পঠন পাঠন ও জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছাড়াও নাটকের মাধ্যমে দেশের ও দশের কথা প্রচার করবার উপযোগিতার বিষয় এই সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর কর্মীদের তখনই বিশেষভাবে উদ্‌বুদ্ধ করে । বলা বাহুল্য, আমিও সেই সংঘের একজন উদ্যোগী সভ্য হিসাবে সর্বপ্রথম 'আগুন' পরে 'জবানবন্দী' এবং তারপরে 'নবান্ন' নাটক রচনা করি ।'[৯]

বিজন ভট্টাচার্যের রচিত নাটিকা ও নাটকগুলি এই রকম : 'আগুন' (১৯৪৩), 'জবানবন্দী' (১৯৪৩), 'নবান্ন' (১৯৪৪), 'অবরোধ' (১৩৫৪ বঙ্গাব্দ), 'কলঙ্ক' (১৯৫১ ?), 'জীয়নকন্যা' (১৯৪৮), 'গোত্রান্তর' (১৩৬৬), 'ছায়াপথ' (১৯৬২), 'মরা চাঁদ' (১৯৬৮), 'গর্ভবতী জননী' (১৯৬৯), 'দেবী গর্জন' (১৯৬৯), 'চলো সাগরে' (১৯৭০), 'আজ বসন্ত' ।

অনেক পরে গণনাট্যের নাটক বলতে যে-একটি চেনা ছক তৈরি হয়ে যায়, কৃষক ও শ্রমিকের সৎ ও আদর্শবাদী পক্ষ একদিকে, এবং জমিদার-জোতদার-মহাজন ও কারখানার মালিক-ম্যানেজার-দালালের অত্যাচারী শয়তান পক্ষ আরেকদিকে— তার সূত্রের জন্য বিজন ভট্টাচার্যের নাটককে দায়ী করা চলে, কিন্তু তার তরল ও সরলবুদ্ধি রূপগুলির জন্য তিনি দায়ী নন । বিজনের নাটকে জীবনকে দেখার ক্ষেত্রে ফাঁকি নেই, তাঁর সংলাপ অসাধারণ বাস্তব ও বিশ্বাস্য, তাঁর তৈরি ঘটনা ও সেই ঘটনায় আক্রান্ত চরিত্র— সবই প্রখরভাবে বাস্তব বলেই প্রতিভাত হবে । অন্তত 'নবান্ন'-তে বিজনের জীবন-অভিজ্ঞতা ও নাট্যপ্রতিভা দুই এসে একটি শীর্ষবিন্দুতে মিলিত হয়েছে । মূলে মেদিনীপুরের ঝড়প্লাবন ও বন্যার একটি বাস্তব স্মৃতি ছিল বলে প্রথম দু-একটি দৃশ্য নাটকীয় মনে হতে পারে, কিন্তু এই নাটকীয়তা সময়পটভূমিকে কখনোই অতিক্রম করে অবাস্তব হয়ে পড়ে না ।

'নবান্ন' নাটকের অভিনয় ও প্রযোজনা বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে ইতিহাস হয়ে আছে । কিন্তু এই নাটকের বিশেষ সংগঠন ও প্রকরণের তাৎপর্য সমকালের বিজ্ঞ ও বোদ্ধা সমালোচকেরা যে বুঝতে পারেন নি, সে কথা শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়[১০] আমাদের ধরিয়ে দিয়েছেন । শুধু সেকালের কেন, একালের সমালোচকেরাও অভ্যস্ত ও প্রাচীন নাট্যসংস্কারের বাইরে এসে 'নবান্ন'-এর 'এপিসোডাল' অথচ মহাকাব্যপ্রতিম বিস্তার পায়, কৃষক, মহাজন,

মধ্যবিত্তের নানা ভাঁজ, গ্রাম, নগর ইত্যাদির বিপুল পরিসরকে ধরবার চেষ্টা করে এবং সফল হয়— তা বুঝতে পারেন নি ।[১১] দুর্ভিক্ষ ও পারিবারিক দুর্গতির তাড়নায় সমাদ্দার পরিবারের গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় এসে ভিখারির দলে ভর্তি হওয়া, ব্যবসায়ীর লাভের পণ্য হিসেবে শুধু চাল ডাল নয়, নারীদেহেরও অন্তর্ভুক্তি, শহুরে মধ্যবিত্তের আত্ম-সুখ-সন্ধানী অহংকার, প্রতিযোগিতা-পরায়ণতা ও অমানবিক উদাসীনতা, হাসপাতালে অনাহার ব্যাধিতে আক্রান্ত রোগীর ভিড়ে ডাক্তারদের অসহায়তা, এবং শেষকালে সমাদ্দারদের গ্রামে ফিরে গিয়ে সুশস্যের ও সমবায়ের কারণে ভাঙা জীবনে জোড়া দেওয়ার সম্ভাবনা— শিথিল এক কাহিনীর সূত্রে এসেছে অজস্র বাস্তব ছবি, জীবন্ত বিশ্বাস্য ভাষায় । এ নাটকের প্রথম দিকে বেশ-কিছু নাটকীয় ঘটনা আছে, কিন্তু শেষদিকে নাটকীয় ঘাত-সংঘাতের জায়গায় এসেছে মৃদু নাটকীয় সংঘাত ও ব্যঙ্গময় চিত্রপরম্পরা, আর নাটকের একেবারে শেষে জনতার যৌথ ক্রিয়াকলাপে[১২] লেগেছে উৎসব ও 'কার্নিভালে'র মেজাজ । এ নাটক আমাদের নাট্যিকতার ধারণারই বিস্তার ঘটিয়েছে ।

'আগুন', 'জবানবন্দী' ও 'নবান্ন' মূলত একই নাটক । যেন একটি নাটক সম্পূর্ণ হওয়ার তিনটি পর্যায় । দুর্ভিক্ষ থেকে এই তিনটি নাটকের জন্ম, কিন্তু শোষণের বিরুদ্ধে দরিদ্র ও গ্রামীণ জনতার প্রতিরোধ 'নবান্ন'-তেই তার সম্পূর্ণ ছবি অর্জন করেছে ।

গ্রামীণ লোকজীবন সম্বন্ধে বিজন ভট্টাচার্যের গভীর অভিজ্ঞতা, এবং গ্রামসমাজের অন্তেবাসী ও পার্শ্বিক জনগোষ্ঠীর সঙ্গেও তাঁর পরিচয়ের ঘনত্ব প্রকাশিত হয়েছে 'জীয়নকন্যা' নাটকে । কিন্তু তাঁর অন্যান্য নাটকের মতোই ও নাটকেও শুধু বিচিত্র জীবনচ্ছবি নয়, তার মধ্য দিয়ে একটি মানবিক বাণীও উচ্চারিত হয়েছে । নন্দনপুরের বেদেদের সর্দার প্রবীরের কুমারী মেয়ে উলূপী যখন সর্পদংশনে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে তখন শুধু হিন্দু বেদের দল নয়, মুসলমান বেদে বদর আলিও তাকে বাঁচানোর মিলিত চেষ্টায় যোগ দেয়, এবং সফল হয় । বদর আলিই এ নাটকের মূল কথাটি বলে—

> 'আমরা যদি সকলে আজ নিজ নিজ শিক্ষামত মন্ত্রগুলো সব গলার মিল দিয়া আওড়াই, তখন এই বেমিলের ভিতর ভিতর একটা মিল হয়তো লাগতে পারে, যেখানে মূল ধন্বন্তরী মন্ত্রটায় একটা নাড়া লাগাতে পারে ।'

বিজন ভট্টাচার্যের পরবর্তী নাটকগুলির মধ্যে গ্রামীণতা ও নাগরিকতার একটি স্পষ্ট বিভাজন লক্ষ করা যায় । আবার প্রায় প্রত্যেকটি নাটকে একটি বিশেষ কথা তাঁকে বলতে হয় । 'অবরোধ'-এ নগর-পটভূমিকায় ট্রেড ইউনিয়নের রাজনীতির আবর্তে হঠাৎ গজানন দারোয়ানের আবেগময় হৃদয়-পরিবর্তনের deus ex-machina তাঁকে নাটকের পরিসমাপ্তি টানতে সাহায্য করেছে । এখানে বিজন ভট্টাচার্য তাঁর স্বভাবসিদ্ধ আবেগে বদ্ধ । 'মরা চাঁদ' নাটকে ব্যক্তিগত দুঃখবেদনার ছোটো বৃত্ত ভেঙে অন্ধ বাউল পবনকে তিনি নিয়ে আসেন বৃহত্তর রাজনৈতিক বিশ্বাসে, সে 'নতুন করে বাঁচা আর বাঁচানোর গান' গাওয়া আরম্ভ করে । 'গোত্রান্তর'-এ আসে মধ্যবিত্তের শ্রমিকের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার সূত্র— উদ্বাস্তু হয়ে বস্তিতে এসে পৌঁছে শুধু শারীরিকভাবে নয়, শ্রমিক যুবকের সঙ্গে শিক্ষক হরেন্দ্রের মেয়ে গৌরীর ভালোবাসার সম্পর্ক স্বীকার করে নেওয়ার মধ্যে মানসিকভাবে, তাদের বস্তি রক্ষার সংগ্রামে সঙ্গী হওয়ার মধ্যে । হরেন্দ্র নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া শেষ করে, স্ত্রী শংকরীর প্রতিবোধের গণ্ডি পেরিয়ে নিজেকেই বলে "পিছু হটি নাই, পিছু হটবও না । ঠিক আছে । না, ঠিক আছে ।" এ নাটকে গ্রাম নগরে এসে পৌঁছে সংগ্রামী দরিদ্র নাগরিকতার সঙ্গে নিজেকে জড়ায় । 'গর্ভবতী জননী'তে আবার গ্রামকে পাই আমরা, পাই গ্রামেও প্রান্তিক গোষ্ঠী বেদেদের কাহিনী, কিন্তু সংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস থেকে নাট্যকার তাদের উত্তীর্ণ করে আনেন নতুন প্রত্যয়ে । 'দেবীগর্জন'-এ বীরভূমের বাউরি সাঁওতালদের নিয়ে আসেন বিচ্ছিন্নতা থেকে ঐক্যে, গোষ্ঠী থেকে শ্রেণীর বোধে, বিভ্রান্তি থেকে চেতনায় । ধর্মগোলার ধান ধর্মঠাকুরের জন্য নয়, অনাহারী মানুষের প্রাথমিক দাবি

তার উপর। নগরের পরিত্যক্ত মানুষদের— ভিক্ষুকদের— এক মমতাপূর্ণ ছবি পাই 'ছায়াপথ'-এ। এই সম্ভবত একটিমাত্র নাটক বিজন ভট্টাচার্যের, যাতে কোনো বড়ো উত্তরণ নেই বিশ্বাসের। শুধু নাটকের শেষে একটি ভুখামিছিল দেখিয়ে অর্থাৎ স্পেক্‌টাক্‌লের সাহায্য নিয়ে, নাট্যকার একটি আশ্বাস রচনা করতে চান ("এ মহামিছিলে যোগ দিলে হয়তো গোপালের* সন্ধান পাওয়া যাবে")— কিন্তু তা এই ছিন্নভিন্ন, মৃত্যু, কামনা ও ঈর্ষার নিরালোক পরিবেশকে মুছে নিতে পারে না।

বিজন ভট্টাচার্যের নাটকে গণনাট্যের ধার শেষ পর্যন্ত অব্যাহত থাকলেও পরবর্তী নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে তাঁর নাটক তেমনভাবে গৃহীত হয় নি তা আমরা লক্ষ্য করি, যদিও তাঁর নিজের দল 'ক্যালকাটা থিয়েটার' এবং পরে খুব সাম্প্রতিককালে পুত্র নবারুণ নাট্যগোষ্ঠী কবচকুণ্ডল তাঁর নাটক অভিনয় করেছে। তবু এ কথা বোধ হয় বলা যাবে যে, 'নবান্ন'-এর উজ্জ্বল উত্তরাধিকার ছাড়াও বিজন ভট্টাচার্যের নাটকে জীবনের অতিশয় ব্যাপক এক ক্যানভাস উপস্থিত, গ্রাম ও নগরের ব্যক্তি, শ্রেণী ও সমাজস্তরের এক বহুবিচিত্র ছবি সে-সবের বিশ্বাস্য প্রতিবেশ ও ভাষা নিয়ে তৈরি হয়েছে। কখনো তার মধ্যে আছে নাটকীয়তার একটু অতিরিক্ত মাত্রা, আবার আছে লোকায়ত গীতিকাধর্মী কাব্যিকতা 'আন বসন্ত' বা 'চলো সাগরে'-তে যেমন।

গণনাট্যধারায় আর যে-নাট্যকারের কথা উল্লেখ করতে হবে, তিনি দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-৯০)। 'নবান্ন'-এর মতো তাঁর 'দীপশিখা'-ও (১৯৪৩) যুদ্ধ ও মন্বন্তরের পটভূমিকাকে গ্রহণ করেছে, কিন্তু এ নাটকে তাঁর আশ্রয় নগরজীবন, কলকাতা। তাঁর নাটকের ফর্মে কলকাতার আন্দোলনের টুকরো টুকরো ছবিও ফুটে উঠেছে— কিন্তু কোনো প্রবল দুঃখের নাটকীয় কাহিনী তৈরি করতে পারে নি। এর আগের বছর লেখা 'অন্তরাল'-এ ছিল অবৈধ সন্তানের ব্যক্তিগত ও সামাজিক সমস্যা— যার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শ্রমিক-মালিকের বিরোধের কাহিনী। এ দুটি নাটক নাট্যকারের মার্কসীয় বিশ্বাসে উত্তরণের বিভিন্ন পর্যায়ের সাক্ষ্য বহন করছে। গণনাট্য সঙ্ঘ অভিনয় করে তাঁর 'তরঙ্গ' (১৯৪০) নাটক— কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁর নাটক গণনাট্যের 'নয়া শিবির' (১৯৪৭ ?), 'কেউ দায়ী নয়' (১৯৬১) ইত্যাদি আঞ্চলিক শাখাগুলিতে অভিনীত হলেও গ্রুপ থিয়েটারের স্থায়ী রসদ হয়ে উঠতে পারে নি। বাংলা দেশের অঙ্গবিচ্ছেদের দুঃখকে নিয়ে লেখা তাঁর 'বাস্তুভিটা' (১৯৪৭) বাস্তু ছাড়ার কষ্টকে তুলে ধরেছে, 'নয়া শিবির' নতুন পরিবেশে বসত-নির্মাণের সংগ্রামকে চিহ্নিত করেছে। 'পূর্ণগ্রাস', 'মশাল', 'মোকাবিলা', 'জীবনস্রোত', 'দুরন্ত পদ্মা' ও বেশ-কিছু একাঙ্ক দিগিন্দ্রচন্দ্রকে গণনাট্যধারার এক শক্তিশালী নাট্যকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে, কিন্তু গণনাট্য গ্রুপ থিয়েটারের বিচ্ছেদে যে-সব নাট্যকার অবহেলিত হয়েছেন, তার মধ্যে বিজন ভট্টাচার্যের সঙ্গে দিগিন্দ্রচন্দ্রও আছেন।

বলতে পারি, প্রাচীনতর তুলসী লাহিড়ী (১৮৯৭–১৯৫৯), যিনি পেশাদার মঞ্চ থেকে পলাতক সৈনিক (তাঁর 'মায়ের দাবী' রঙমহলে অভিনীত হয়েছে ১৯৪১ সালে) এবং গণনাট্য হয়ে গ্রুপ থিয়েটারে পৌঁছে যান, তাঁর নাটকও গণনাট্য থেকে গ্রুপ থিয়েটারে প্রবাহিত হয়। তাঁর 'পথিক' (১৯৫০) কয়লাখনির মানুষদের উপর মালিকদের অমানবিকতা এবং তাদের জীবনে মানুষেরই চাপিয়ে দেওয়া মৃত্যু ও বিচ্ছেদের ট্র্যাজেডিকে নিয়ে। তাতে একটি বামপন্থী বুদ্ধিজীবীর চরিত্র এসেছে, কিন্তু সে খানিকটা বায়বীয় থেকে গেছে— তত্ত্ব ও শারীরিকতা —দুদিক থেকেই। তুলসী লাহিড়ীর পূর্ববর্তী মন্বন্তরভিত্তিক নাটক 'দুঃখীর ইমান' শিশিরকুমার ভাদুড়ীকে গণনাট্যের অভিমুখী করেছিল, কিন্তু দিনাজপুরের উপভাষার বাধা এ নাটককে জনপ্রিয় বা সফল হতে দেয় নি। তাঁর 'পথিক' এবং 'ছেঁড়া তার' অবশ্য বহুরূপী সম্প্রদায় সার্থকভাবে অভিনয় করেছেন। 'বাংলার মাটি' (১৯৫৩) আবার সমসাময়িক অন্যান্য নাট্যকারদের মতোই দেশভাগের বেদনাকে ধরতে চেয়েছে। নাট্যকার জানিয়েছেন, 'এটা

*নাটকে গোপাল আগেই গাড়ি চাপা পড়ে মারা গেছে।

ভাঙা বাংলার বর্তমান ভাঙা মনের কাহিনী ।' শেষ নাটক 'লক্ষ্মীপ্রিয়ার সংসার' (১৯৫৯)-এর করুণ আখ্যান তুলসী লাহিড়ীকে গণনাট্যধারার সঙ্গে চিরস্থায়ীভাবে যুক্ত করে রেখেছে । তাঁর 'বাংলার মাটি', 'নাট্যকার', 'নায়ক', 'ভিত্তি', 'চৌর্যানন্দ' ইত্যাদি নাটক রূপকার সম্প্রদায়ে সবিতাব্রত দত্তের প্রযোজনায় অভিনীত হয়েছিল । ঋত্বিক ঘটক-এর 'দলিল' (১৯৫১–৫২) গণনাট্য ধারার একটি উল্লেখযোগ্য নাটক, তা উদ্বাস্তুদের ভয়াবহ দুর্গতি এবং নতুন জাতীয় সরকারের বিপুল উদাসীনতাকে একই সঙ্গে, খানিকটা ঋত্বিকের স্বভাবসিদ্ধ আবেগময় নাটকীয়তার সঙ্গে তুলে ধরেছে । এর প্লট শিথিল, বিচিত্র চরিত্রের ভিড়, খানিকটা 'নবান্নে'র মতোই চিত্রমালা-সজ্জিত । স্বাধীনতা-পরবর্তী কলকাতার মিছিল প্রতিবাদ ইত্যাদিতে সংক্ষুব্ধ ছবির সঙ্গে শ্রেণীগত মূলোৎপাটনের কারুণ্য মিশিয়ে ঋত্বিক এ নাটক রচনা করেছিলেন, গণনাট্যের নানা শাখায়, এমন-কি কেন্দ্রীয় দলেও দীর্ঘদিন এ নাটকটির অভিনয় হয়েছে । 'সাঁকো' এবং একাঙ্ক 'জ্বালা' ঋত্বিকের আবেগবহুল নাটকীয়তাপ্রীতির নিদর্শন ।

ছিন্নমূল মানুষের জীবনের দুর্গতি ও শহর কলকাতার নিষ্ঠুরতা, লোভ ও কামনার আক্রমণে তার অবক্ষয় ও আশাহীন ধ্বংসের উপাখ্যান নিয়ে সলিল সেন 'নতুন ইহুদী' (১৯৫৩) নাটকটি লিখে এক সময় গণনাট্যেরই বিস্তার ঘটিয়েছিলেন । তাঁর 'মৌ চোর' (১৯৫৭) সুন্দরবনের মধুসংগ্রহকারীদের দুঃসাহসী অভিযান, দারিদ্র্যময় ক্লিষ্ট জীবন এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন অথচ সংগ্রামী অস্তিত্বের একটি চিত্তাকর্ষক ছবি । কিন্তু সলিল সেনের পরবর্তী নাটকগুলিতে ('ডাউন ট্রেন' ১৯৫৯, 'দিশারী' ১৯৫৯) তাঁর পেশাদার রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে যোগ ঘনিষ্ঠ হয় এবং গণনাট্যসংস্কৃতি মূলত এই সম্ভাবনায় নাট্যকারকে হারাতে বাধ্য হয় । কিন্তু শেষ নাটক 'দর্পণ'-এও তাঁর গণনাট্যধারার সঙ্গে বিশ্বাসের যোগ লক্ষ করা যায় । এ নাটকে স্বল্পবিত্ত ও দরিদ্র মানুষের স্বাধীনতা নামক বৃহৎ অলীক আদর্শ এবং মমতাহীন কর্কশ বাস্তবের সমন্বয় সাধনের ব্যর্থ চেষ্টার ইতিবৃত্ত পাই । স্বাধীনতা নিয়ে আসে নতুন শহিদের দল, পুলিশের গুলিতে মৃত শহিদের সম্প্রদায় । নায়ক মধু তারই একজন ।

বীরু মুখোপাধ্যায়-এর 'রাহুমুক্ত' (১৯৫৪) যাত্রা গণনাট্যের একটি সার্থক প্রযোজনা হিসেবে আজও স্মরণীয় । এই যাত্রাটি পশ্চিমবাংলার স্টেজবদ্ধ নাট্যচর্চাকে একটি মুক্তির পথ দেখিয়েছিল, রাজা-রানী-অত্যাচার-বিদ্রোহের একটা কল্পিত ঐতিহাসিক আখ্যান সৃষ্টি করে গণনাট্য ধারাকে নাট্যরূপ-প্রকরণের দিক থেকেও সম্প্রসারিত করতে চেয়েছিল । দুঃখের কথা এই যে, গণনাট্য বা পরবর্তী গ্রুপ থিয়েটারের শিল্পীরা যাত্রার দিকে আকৃষ্ট হন নি, অন্তত আদর্শগত কারণে হন নি, হয়েছেন বৈষয়িক উচ্চাকাঙ্ক্ষার কারণে । 'সংক্রান্তি' (১৯৪৮), 'সাহিত্যিক' (১৯৬০), 'বিশে জুন' (১৯৬২), 'এতটুকু বাসা' (১৯৬৪), 'বন্দর', 'স্বপ্নশেষ' (অনুবাদ, ১৯৬৩), 'চারপ্রহর' তাঁর অন্যান্য উল্লেখ্য নাট্যরচনা ।

পাঁচ

এইখানে একটি পরিসর খুঁজে নিয়ে আমরা গ্রুপ থিয়েটার নামক ঘটনাটির কথা একটু বলে নিতে চাই । আমরা জানি উপরের নাট্যকারদের নাট্যকর্মের মধ্যেই গণনাট্যধারার বিলুপ্তি ঘটে নি, তা পরবর্তীকালে অব্যাহত ছিল, এবং আমাদের মতে গ্রুপ থিয়েটারও এক হিসেবে গণনাট্য ধারার সম্প্রসারণ । তা ছাড়া উৎপল দত্ত, চিররঞ্জন দাস, পরবর্তী মোহিত চট্টোপাধ্যায়, মনোজ মিত্র, প্রভৃতির নাটকে গণনাট্যধারার নতুন উজ্জীবনই ঘটেছে বলা চলে । তবু গণনাট্যকে কিছুটা আড়ালে ফেলে, অন্তত কলকাতার মধ্যবিত্ত শিক্ষিত দর্শকের কাছে তাকে গৌণ করে দিয়ে গ্রুপ থিয়েটার নামে যে নাট্যপ্রণালীর উদ্ভব ঘটল তার কথা একটু বলে নেওয়া দরকার । ১৯৪৮ থেকে ১৯৬৬-র মধ্যে তার জন্ম ও পরিপূর্ণ বিকাশই লক্ষ করি আমরা ।

এই গ্রুপ থিয়েটারের জন্ম হওয়ার যে-সব কারণ ছিল, তার মধ্যে সব চেয়ে বড়ো কারণটি রাজনৈতিক ।

১৯৪৮ সালের ২৬ মার্চ ভারতে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনি ঘোষিত হল এবং তার একটি পরিণাম হিসেবে গণনাট্য কর্মের উপরেও সন্দেহ এবং রাজরোষ নেমে এল। হয়তো কেউ কেউ এর মধ্যে গণনাট্যের সীমাবদ্ধ লক্ষ্য এবং শ্রেণীসংগ্রামভিত্তিক নাট্যক্রিয়ার বৈচিত্র্যহীনতায় অস্বস্তি বোধ করছিলেন। ফলে ১৯৪৮ সালের ১ মে তারিখে শম্ভু মিত্র, গণনাট্যের শ্রেষ্ঠ নির্মাণ যে পরিচালক-অভিনেতা, তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন বহুরূপী সম্প্রদায়। তাঁর সঙ্গে রইলেন তৃপ্তি মিত্র, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, অমর গাঙ্গুলি, মহম্মদ জ্যাকেরিয়া, শোভেন মজুমদার।

বহুরূপীর জন্মের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম বাংলায় গ্রুপ থিয়েটারের জন্ম হল। ক্রমে গণনাট্য সঙ্ঘেরই নানা শাখা ও সদস্যদের উদ্যোগে তৈরি হল শিল্পায়ন (১৯৪৮), নাট্যচক্র (বিজন ভট্টাচার্যের উদ্যোগে, ১৯৫০), ক্যালকাটা থিয়েটার (এটিও বিজন ভট্টাচার্যের উদ্যোগে, ১৯৫১, পরে এর পুনরুজ্জীবন ১৯৫৯-এ), অশনিচক্র (দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৫১), অনুশীলন (মমতাজ আমেদ, উৎপল দত্ত, শোভা সেন প্রভৃতি ১৯৫১), শিল্পী মন (১৯৫২), লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ (উৎপল দত্ত, ১৯৫৩), রূপকার (সবিতাব্রত দত্ত, ১৯৫৫), অনুশীলন সম্প্রদায় (১৯৫৫), শৌভনিক (১৯৫৭), গন্ধর্ব (১৯৫৭), চতুরঙ্গ (১৯৫৮), থিয়েটার ইউনিট (১৯৫৮), চতুর্মুখ (১৯৫৮), নান্দীকার (১৯৬০), মাস থিয়েটার্স (১৯৬০), রূপান্তরী (১৯৬১), চলাচল (১৯৬৩) থেকে আমাদের সময়পর্বের শেষ বছর ১৯৬৬-তে থিয়েটার ওয়ার্কশপ, নক্ষত্র পর্যন্ত।

এই গ্রুপ থিয়েটারের দলগুলি মূলত গণনাট্যধারার অন্তর্গত। বহুরূপী প্রথম নাটক প্রয়োজনার জন্য 'নবান্ন'-কেই নির্বাচন করে, এ কথা আমরা জানতে পারি,[১৩] পরে তাঁদের নাটক 'পথিক' (১৯৪৯), 'উলুখাগড়া' (১৯৫০), 'ছেঁড়া তার' (১৯৫০), 'বিভাব' (১৯৫১) — সবই গণনাট্য ধারার নাটক। তবে মনে রাখতে হবে, ১৯৫১ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির উপর সরকারি নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার হয় এবং গণনাট্যের দলগুলি আবার পুনর্গঠিত হতে শুরু করে। কিন্তু নবপ্রতিষ্ঠিত গ্রুপ থিয়েটারের দলগুলিরও সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটতেই থাকে, কারণ রাজনৈতিক কার্যক্রমের বাইরে এসে অনেকেই হয়তো একটু কাজের স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছিলেন, গণনাট্যে প্রত্যাবর্তনের পালা শুরু হয় নি আর। গণনাট্যের সহযোগী দল ক্রান্তি শিল্পী সঙ্ঘ (১৯৪৬) কাজ করে চলেছিল।

কিন্তু উপরের দলগুলির উদ্ভবও আমাদের নাট্যচর্চার সমাজতত্ত্বের দিক থেকে চিত্তাকর্ষক। সমস্ত দলের উদ্ভব কোনো সামজিক clean slate থেকে হয় নি, হওয়া সম্ভবও ছিল না। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরানো দলগুলি ভেঙে, সমমনোভাবসম্পন্ন সদস্যরা নতুন নতুন ভাবে যূথবদ্ধ হয়েছেন, তারই ফলে নতুন দলগুলির জন্ম হয়েছে।[১৪] এরাও গণনাট্য সংগঠনে ফিরে যায় নি কেউ, কিন্তু মতাদর্শের দিক থেকে গণনাট্যের পাশাপাশি থেকেছে, বামপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশীদার হয়েছে। অর্থাৎ কমিউনিস্ট পার্টি বা ছাত্র ফেডারেশনের ডাকে নানা অনুষ্ঠান উপলক্ষে নাটক করেছে, নাটকের জন্য প্রাপ্য অর্থের দাবি কখনো কমবেশি সংকুচিত করেছে। এরাই গণনাট্যসংস্কৃতির ব্যাপক ক্ষেত্রের অন্তর্ভূত।

অন্য দিকে, গণনাট্যের ধারার একটু বাইরেও থেকে যায় কিছু দল। যাঁরা হয়তো বামপন্থী রাজনীতি অপছন্দ করতেন বা অন্যভাবে নিজেদের একটু দূরে রাখার চেষ্টা করেছেন। এঁদের মূল উৎস ছিল 'শৌখিন' নাট্যকর্মের ধারা। কোনো 'কমিটেড' কার্যক্রম নয়, রাজনৈতিক মতাদর্শ নয়, নানা ধরনের নাটক যথাসাধ্য ভালোভাবে করার ইচ্ছে, বা ব্যক্তিগত নাট্যসৃষ্টিকে স্বাধীনভাবে রূপদানের ইচ্ছে, তাঁদের সংগঠন-নির্মাণে উৎসাহিত করে। এমন দলগুলির মধ্যে সর্বাগ্রে নাম করতে হয় তরুণ রায়-পরিচালিত থিয়েটার সেন্টার-এর (১৯৫৪), তার পরে পার্থপ্রতিম চৌধুরীর সুন্দরম্ (১৯৫৭)। সুন্দরম-এর এই চরিত্র পরে মনোজ মিত্রের পরিচালনায় এসে আমূল পরিবর্তিত হয়েছে। এইরকম আরো দল লোকমঞ্চ (১৯৫৭), লোকতীর্থ (১৯৫৭), রঙ্গশ্রী (রমেন লাহিড়ী, ১৯৫৮), রূপচক্র (১৯৫৮), অহীন্দ্রম (১৯৫৯) ইত্যাদি। এঁরা নাট্যরচনারও একটি পৃথক ধারা বজায় রাখেন এবং গ্রুপ থিয়েটার 'আন্দোলন'-এর মধ্যে মতাদর্শগত একটি দূরত্বে অবস্থান করেন।

ছয়

এই পটভূমিকা নির্মাণে আবার আমরা নাট্যরচনার দিকে দৃষ্টি ফেরাতে পারি। গণনাট্যধারাই এ সময়ে নাট্যরচনার মধ্যে, বিশেষত প্রধান নাট্যকারদের মধ্যে প্রবল ছিল। ষাটের বছরগুলির গোড়া থেকেই এ ক্ষেত্রে উৎপল দত্তের অবিসংবাদিত প্রাধান্য দেখা যায়, কী নাট্যরচনায়, কী তার বিশাল ও নিখুঁত প্রযোজনায়। তাঁর প্রথম দিককার নাটক 'ছায়ানট' (১৯৫৮) চলচ্চিত্র প্রযোজনার লঘু ও উদ্ভট কর্মকাণ্ড বিষয়ে একটি প্রহসন বলা চলে। কিন্তু গণনাট্য ধারায় তাঁর বিস্ফোরক যোগদান ঘটে ১৯৫৯-এ 'অঙ্গার'নাটকে, যেখানে কয়লাখনির শ্রমিকদের উপর শোষণ ও মালিকের স্বার্থে তাদের খনিগর্ভে জলাঞ্জলি প্রযোজনার মধ্য দিয়ে এক বিশাল মর্মন্তুদ চেহারা পায়। এর পর 'ফেরারী ফৌজ'-এ সন্ত্রাসবাদীদের বীরত্ব ও দ্বন্দ্ব চিত্তাকর্ষক রূপ পায়। এ ছাড়াও এ পর্বে তাঁর 'ঘুম নেই' (১৯৬১) এবং 'রাতের অতিথি' উল্লেখযোগ্য। আমাদের সময়খণ্ডের মধ্যে প্রথম দুটি নাটকই বিশেষভাবে স্মরণীয়। তবে উৎপল দত্তের নাটকে কখনো কখনো বিদেশী সূত্র থাকে, থাকে কিছু ঐতিহাসিক সরলীকরণ। তাঁর নাটক মূলত স্টেজের জন্য লেখা, প্রয়োজনীয়তার শক্তি যতটা ফোটে, মুদ্রিত নাটকে তা ফোটে না। জোছন দস্তিদার রূপান্তরীর জন্য লেখেন 'বিংশোত্তরী' (১৯৬১), 'দুই মহল' (১৯৬২), 'কর্ণিক', 'স্বর্ণগ্রন্থি' (১৯৬৪)। অজিত গঙ্গোপাধ্যায় প্রথমে আরম্ভ করেন রূপান্তরণ দিয়ে— তাঁর নির্বোধ (দোস্তোয়ভস্কির 'দ ইডিয়ট'), 'থানা থেকে আসছি' (প্রিস্টলির 'দি ইনসপেক্টার কল্‌স'), শকুন্তলা রায় ('হেডা গাবলার', ইবসেন), 'আকাশবিহঙ্গী' ('দ সি গাল', চেকফ্‌) বিভিন্ন নাট্যদল সাগ্রহে প্রযোজনা করেছে। তাঁর মৌলিক নাটকের মধ্যে 'নচিকেতা' ও 'প্রমত্ত প্রহসন' উল্লেখ করবার মতো। অমর গঙ্গোপাধ্যায়ের 'দ্বান্দ্বিক', শেখর চট্টোপাধ্যায়ের 'ফরিয়াদ' ও 'জন্মভূমি', জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়ের 'এরেনা' এই পর্বে খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা পায়। সুনীল দত্তের 'জতুগৃহ' (১৯৫৬), 'হরিপদ মাস্টার' (দ্বি সং, ১৯৫৮), 'বর্ণপরিচয়' (১৯৬১), 'খর নদীর স্রোতে' (১৯৬৩), 'দোলা' (১৯৬৬), গণনাট্যধারাকে যোগ্য সমর্থন দেয়, যেমন দেয় উমানাথ ভট্টাচার্যের 'জল' ও 'ধনপতি গ্রেপ্তার'। এর আগে তাঁর করা গোর্কির 'লোয়ার ডেপ্‌থ্‌স'-এর অনুবাদ 'নীচের মহল' লিটল থিয়েটার গ্রুপে উৎপল দত্তের প্রযোজনায় সার্থক রূপ লাভ করেছিল। মনোরঞ্জন বিশ্বাসের 'আবাদ' নাটকটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬৬-তে। এই নাটকে পূর্ববর্তী 'আমার মাটি'তে নাট্যকার পশ্চিমবাংলার কৃষক জীবনের কিংবা পরবর্তী 'ভাসান'-এ. শোষণ ও সংগ্রামেব ছবিটি খুব ঘনিষ্ঠ নৈকট্য থেকে লক্ষ্য করেছিলেন। অধিকাংশ সরলীকৃত ও দূর থেকে কল্পনায় দেখা চাষী-জোতদারের সংগ্রামের ছবি থেকে মনোরঞ্জন বিশ্বাসের নাটক তার বিশ্বাস্য অকৃত্রিম জীবন ও সংলাপের দ্বারা পৃথক হয়ে যায়, নাট্যকারকে গণনাট্যপন্থার এক বিশিষ্ট স্রষ্টারূপে চিহ্নিত করে।

যদি ১৯৯০ পর্যন্ত ইতিহাসকে ধরি, তা হলে শক্তিশালী নাট্যকার মনোজ মিত্র (১৯৩৮-) এবং মোহিত চট্টোপাধ্যায়কে গণনাট্যধারার নাট্যকার হিসেবেই সম্মানিত আসন দিতে হয়। কিন্তু দুজনের আরম্ভ কিঞ্চিৎ ভিন্ন ধারায়। মনোজের প্রথম নাটক একটি একাঙ্ক— 'মৃত্যুর চোখে জল' (১৯৫৯), প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক 'মোরগের ডাক' (১৯৬০)। এই বহুলপ্রসূ নাট্যকার আমাদের কালসীমা পর্যন্ত অনেকগুলি একাঙ্ক ও পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনা করেছেন। তাঁর এ সময়কার অন্য পূর্ণাঙ্গ নাটকগুলি হল 'নীলকণ্ঠের বিষ' (১৯৬১), 'মহাত্মা' (১৯৬২), 'নীলা' (১৯৬৩), 'অবসন্ন প্রজাপতি' (১৯৬৪), 'বেকার বিদ্যালঙ্কার'(১৯৬৪), 'আরক্ত গোলাপ' (১৯৬৫), 'সিংহদ্বার' (১৯৬৬), 'জন্ম মৃত্যু ভবিষ্যৎ' (১৯৬৬)।

প্রথম নাটকে মনোজ ব্যক্তির স্বার্থপরতা ও বিচ্ছিন্নতাকে লক্ষ্য করেন, কিন্তু তাঁর অদম্য কৌতুকদৃষ্টি এ নাটকে আচ্ছন্ন থাকে না। কিন্তু 'নীলকণ্ঠের বিষ'-এ আবার কৌতুকের মাত্রা কম, একটি মহৎ ও মানবিক পাদ্রির ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডি। এ নাটকটি মনোজের সমস্ত নাটকের মধ্যেই বেশ খানিকটা নিঃসঙ্গ অবস্থান করে। আর

অন্য নাটকগুলিতে মনোজ প্রহসন, ক্রাইম, ব্যক্তিপরিচয়ের গণ্ডগোল ইত্যাদি দিয়ে হুল্লোড়ময় কৌতুক সৃষ্টি করেন। ১৯৭২-এর 'চাক ভাঙা মধু'র মনোজ মিত্রকে এখনো পাই না আমরা, যদিও কিছু একাঙ্ক মধ্যবিত্ত সংসারের হাসি-অশ্রু ও আর্তি উঁকি দিয়ে যায়।[১৫]

মোহিত চট্টোপাধ্যায়ও গণনাট্যস্রোতে এসেছেন পরীক্ষামূলককতার পর্যায় পার হয়ে। আমাদের সময়পর্বে চলেছে তাঁর অবলম্বনধর্মী 'কিমিতিবাদী' নাটক রচনা ও গন্ধর্ব নাট্যগোষ্ঠীতে তার অভিনয় তাঁর 'কণ্ঠনালীতে সূর্য' (১৯৬৩), 'নীল রঙের ঘোড়া' (১৯৬৪), 'গন্ধরাজের হাততালি' (১৯৬৫), 'মৃত্যুসংবাদ' (১৯৬৫), 'চন্দ্রলোকে অগ্নিকাণ্ড'(১৯৬৬), এই কটিই আমাদের কালখণ্ডের অন্তর্ভূত। 'কণ্ঠনালীতে সূর্য'-এ মানবিক বেদনা প্রতীকিতার দ্বারা কিছুটা আচ্ছন্ন আর 'চন্দ্রলোকে অগ্নিকাণ্ড' 'নীল রঙের ঘোড়া' ইত্যাদি মূল বিদেশী নাটকের দুটি আখ্যানকে কিম্ভূত বা 'অ্যাবসার্ড' (!) রূপ দিয়েছে। মোহিতের এই সময়কার অ্যাবসার্ডের ধারণার মধ্যে ইয়োরোপের অ্যাবসার্ড নাটকের প্রচ্ছন্ন লজিক খুঁজে পাওয়া যায় না; তা নেহাতই খামখেয়ালিপনাময় চরিত্র ও ঘটনার শোভাযাত্রা।

নাট্যকার বাদল সরকারকে আমরা গণনাট্যধারার এক নূতন বিস্তার বলতে পারি। কিন্তু সে ১৯৭১-এর পরবর্তী বাদল সরকার। আমাদের কালে বাদল সরকার শৌখিন সহাস্য নাট্যকর্ম থেকে ক্রমশ মধ্যবিত্তের অস্তিত্ববিষয়ক প্রশ্নের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন, তাঁর নাটক করে প্রসন্ন সময়ক্ষেপকে ক্রমশ ভারাক্রান্ত করছে সমাজ ও মানবিক পৃথিবী সম্বন্ধে বেদনাময় জিজ্ঞাসা। ১৯৫৬ থেকে, ১৯৬২-এর মধ্যে বিদেশী চিত্র বা নাট্যকাহিনীর ছায়ায় রচনা করেন 'সলিউশন এক্স্', 'রাম শ্যাম যদু' (১৯৬২), 'বড় পিসীমা' (১৯৬১)। মৌলিক 'কবিকাহিনী' ও 'শনিবার' একাঙ্ক। এর সবগুলিতেই হাস্যকৌতুকের উজ্জ্বল উপস্থিতি, তবে 'শনিবার'-এ ফর্মের মামুলি বাঁধন ভাঙার চেষ্টা বেশ সার্থক। 'সারা রাত্তির' (রচনা ১৯৬৩)-এ কাব্যিক শৈলীতে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, প্রেম ও পারস্পরিকতার ভিত্তি সন্ধান, 'যদি আর একবার' (রচনা ১৯৬৫) "হাল্কা মেজাজের নাটক" কিন্তু ছড়া ধরনের সংলাপ রচনায় উপভোগ্য। তবে ১৯৬২-তে লেখা তাঁর 'এবং ইন্দ্রজিৎ'-ই (প্রকাশ ১৯৬৫) আমাদের কালপর্বে তাঁর শ্রেষ্ঠ এবং স্মরণীয় নাটক। এই নাটক থেকে উনিশশো ষাটে প্রযোজনা শুধু নয়, বাংলা নাটকেরও একটি সর্বভারতীয় গ্রহিষ্ণুতা তৈরি হয় এবং ভারতীয় নাট্যরচনার রেনেসাঁসে এ নাটকের ভূমিকা অবশ্যই স্বীকৃতি পাবে। তবু প্রায় ত্রিশ বৎসরের ব্যবধানে এ নাটকের কাব্য একটু কাঁচা এবং মূল সমস্যাটি একটু সহজ আবেগনির্ভর বলে মনে হয়। এতে অ্যাবসার্ড দর্শনের ছায়া আছে, কিন্তু জনৈক সমালোচক যে একে "নিখুঁত অ্যাবসার্ডধর্মী নাটক"[১৬] বলে রায় দিয়েছেন তা আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। এর 'সেন্টিমেন্টালিটি' একে ব্যঙ্গহাস্যময় অ্যাবসার্ড নাটকের অনাত্মীয় করে তোলে।

সাত

গ্রুপ থিয়েটারের মধ্যেও নানা ভাঁজ ও বিভঙ্গ ছিল সে কথা আমরা আগেই ইঙ্গিতে বলেছি। কিন্তু গণনাট্য থেকে গ্রুপ থিয়েটার পৃথক হয়ে যাওয়ার পটভূমিকাটি আর-একটু স্পষ্ট করা প্রয়োজন মনে করি। এটা ঠিকই যে ১৯৪৮-এর আগেই গণনাট্য সঙ্ঘে মতাদর্শগত বিরোধ শুরু হয়েছিল, হয়তো ব্যক্তিগত ভুলবোঝাবুঝিও তার সঙ্গে যুক্ত ছিল। বহুরূপী সংস্থার ইতিহাসকারের বিবৃতিতে পাই—"শিল্প-আদর্শ সংঘনীতির ব্যবধান যখন বৃদ্ধি পাচ্ছে সেখানে (অর্থাৎ গণনাট্য সঙ্ঘে— প. স.), তারই মধ্যে ৪৮-এর ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে এক সভায় একজন 'মহর্ষিকে তুচ্ছ করে' কিছু বলায় শম্ভু মিত্রের মনে হয়, গণনাট্য সংঘে সক্রিয়ভাবে আর কিছু করা যাবে না"[১৭] কারণ যাই হোক, বহুরূপীর শ্লোগান তৈরি হল—"ভালো ক'রে ভালো নাটক" করতে হবে। তাঁদের প্রথম প্রচারপত্রে এই ভালো নাটকের পরিচয় আর একটু বিশদ আকারে পাই—

"আমরা ভালো নাটক অভিনয় করতে চাই, যে নাটকে সামাজিক দায়িত্বজ্ঞানের প্রকাশ ও মহত্তর জীবনগঠনের প্রয়াস আছে ।

"দেশের ঐতিহ্যের ভাণ্ডারে যে সমস্ত সাহিত্যসম্পদ আছে, তার মধ্যে নাটকগুলির ও গল্প-উপন্যাসাদির প্রয়োজনমতো নাট্যরূপ দিয়ে সেগুলিকে অভিনয় ক'রে জনপ্রিয় করে তোলাও আমাদের কর্তব্য মনে করি ।"[১৮]

ফলে বহুরূপীর নাট্যভাণ্ডারে এল এক ব্যাপ্তি—তাতে পরে দেশীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত হল বিদেশী নাটকেরও ঐতিহ্য— ক্লাসিক অভিনয়ের সুযোগ তৈরি করে নেওয়া । তার রোপার্টরিতে এলেন রবীন্দ্রনাথ 'চার অধ্যায়'-এর নাট্যরূপে (১৯৫১) 'রক্তকরবী' (১৯৫৪) ও 'ডাকঘর' (১৯৫৭)-এ, 'মুক্তধারা' (১৯৫৯), 'বিসর্জন' (১৯৬১), 'রাজা' (১৯৬৪), এলেন ইবসেন ('দশচক্র', ১৯৫২), ইউজিন ও'নিল ('স্বপ্ন', ১৯৫৩), টেড উইলিস ('এই তো দুনিয়া', ১৯৫৩), চেকফ ('সেদিন বঙ্গলক্ষ্মী ব্যাঙ্কে', ১৯৫৪), সোফোক্লেস ('রাজা অয়দিপাউস', ১৯৬৪) ইত্যাদি । এই বহুচারিতা বহুরূপীর যে আত্মবিস্তারের পরিচয় দেয় গণনাট্য সঙ্ঘে নিশ্চয়ই তা সম্ভব ছিল না, কারণ গণনাট্য সঙ্ঘের লক্ষ্য প্রকাশ্যতই অনেক ব্যবহারিক ও সীমাবদ্ধ; তা শোষিত মানুষের জীবনকে দেখাতে, বিশ্লেষণ ও পরিবর্তন করতে চায়,তা সাম্যবাদী মতাদর্শের সংগঠনের সাংস্কৃতিক বাহু মাত্র । তৎকালীন শাসকদের কাছে এ দুয়ের যোগসূত্র প্রচ্ছন্ন ছিল না বলেই ১৯৪৯-এ একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে (Express Letter No.511(13) Pr. s/100/49, dated 17 June, 1949) তাঁরা গণনাট্যের নাটক, নাচ ও গান ইত্যাদির অভিনয়ের লক্ষ্য যে Communist Propaganda তা বুঝে নিয়েছিলেন এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের পত্রপাঠ সে-সব অনুষ্ঠান বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন ১৮৭৬-এর নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন প্রয়োগ করে ।[১৯]

গ্রুপ থিয়েটারগুলির মধ্যে যেগুলি গণনাট্য ভেঙে তৈরি হল, সেগুলি কিছুটা বা কেউ কেউ গণনাট্যধারার নাটকের পাশাপাশি এই মহৎ নাট্য-ঐতিহ্যের নাটকও করতে উদ্যোগী হল, কিছুটা নাট্যশিল্পে তাদের অধিকার বিস্তারের আকাঙক্ষায়, ফর্মে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ঝোঁক থেকে । ফলে এই সময়ে অনুবাদ-রূপান্তরের পরিমাণ প্রায় বিস্ফোরণের পর্যায়ে পৌঁছে গেল। বহুরূপীর 'দশচক্র' থেকে 'রাজা অয়দিপাউস', লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপের 'দ রাশিয়ানস' (সিমোনফ, ১৯৫৩), 'নীচের মহল' (গোর্কি), 'ভি. আই. পি.', গন্ধর্ব-এর 'সূর্যলগ্ন' (লেডি গ্রেগরি), 'মধুচক্র' (বার্নার্ড শ, ১৯৬৩), 'থানা থেকে আসছি' (জে.বি. প্রিস্টলি), অনিরুদ্ধ (জঁ পোল সার্ত্রে), শৌভনিক-এর 'মা' (গোর্কি, ১৯৫৭), 'গোস্টস' (ইবসেন, ১৯৫৯), 'ওথেলো' (১৯৬৪), 'মার্চেন্ট অব ভেনিস' (১৯৬৪), নান্দীকার 'নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্র' (পিরানদেল্লো, ১৯৬২), 'মঞ্জরী আমের মঞ্জরী' (চেকফ, ১৯৬৪), থিয়েটার ওয়ার্কশপ 'ললিতা' (সার্ত্র, ১৯৬৬) । এই তালিকা দীর্ঘ এবং প্রায় অনন্ত । এই ১৯৯২ পর্যন্তও গ্রুপ থিয়েটারগুলি তাদের প্রার্থিত নাটকের দৈন্য পূরণ করছে বিদেশী, কখনো অন্যভাষী ভারতীয় নাটকের রূপান্তর বা অনুবাদ দিয়ে । এ থেকে আমরা বুঝতে পারি, কী গণনাট্য, কী 'নবনাট্য' বা 'সৎ নাট্য'(বহুরূপী বিভিন্ন সময়ে পরের দুটি বিশেষার্থক পরিভাষা প্রচার করেছিল), কোনো আন্দোলনই যথেষ্ট পরিমাণে ভালো নাটক তৈরি করতে পারে নি, যা দিয়ে তাদের সর্বগ্রাসী ক্ষুধা অব্যাহতভাবে মেটানো সম্ভব । তা হয়তো প্রত্যাশিতও নয় । বরং পৃথিবীর নাট্য-ঐতিহ্যের সঙ্গে এই যোগস্থাপন একদিক থেকে বাঙালি দর্শকদের প্রাপ্তবয়স্ক হতে সাহায্য করেছে ।

শম্ভু মিত্র (১৯১৫-) নিজে নাটক লিখেছেন কয়েকটি । তার মধ্যে শ্রীসঞ্জীব ছদ্মনামে লেখা 'উলুখাগড়া' (১৯৫০) গণনাট্য-ধারার নাটক, বহুরূপী সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেছে । তাঁর 'বিভাব' (১৯৫১) একাঙ্কটিতে মাইমের পদ্ধতি মিশিয়ে কেবল অভিনয়নির্ভর নাট্যনির্যাস চমৎকার উপস্থাপিত হয়েছিল । অমিত মৈত্রের সহযোগে রচিত 'কাঞ্চনরঙ্গ'ও (১৯৬১) শৌখিন অভিনয়ে বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছে । 'ঘূর্ণি নামে একটি দীর্ঘ নাটকে মধ্যবিত্ত নাগরিক অবক্ষয়ের এক আশ্বাসহীন ছবি আছে, কিন্তু তা কদাচিৎ অভিনীত হয়েছে । তৃপ্তি মিত্র আমাদের কালসীমায়

'বলি' (১৯৬০) নামে একটি একাঙ্ক প্রকাশ করেছেন, কিন্তু তাঁর পরিণত নাটকের জন্য আমাদের আরো অপেক্ষা করতে হবে

আট

গণনাট্য-ধারার বাইরে থেকে কিছু মানুষ নাট্যগোষ্ঠী তৈরি করেছিলেন। 'অরাজনৈতিক' একটি আবহ ছিল তাঁদের নাট্যচেষ্টার পিছনে, পরে, অন্তত তরুণ রায়ের থিয়েটার সেন্টারের ক্ষেত্রে তা বাম-বিরোধী রাজনৈতিক বক্তব্যেরও একটি ক্ষুদ্র ও অস্থায়ী কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। এঁরা অনেকেই মূলত 'শৌখিন' নাট্যধারার ফসল, ফলে এঁদের নাট্যকর্মে পাঁচমিশেলি লক্ষণ ফুটে ওঠে, কেউ কেউ যৎসামান্য পরীক্ষা-নিরীক্ষাও চালান। কিন্তু গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলন যাকে বলে, তার সঙ্গে এঁদের যোগ খুব গভীর বা ঘনিষ্ঠ ছিল না। রাজনীতির, বিশেষত বামপন্থী রাজনীতির সম্পর্ক এঁরা এড়িয়ে চলতেন। শম্ভু মিত্র রাজনীতিভিত্তিক শ্রেণীসমস্যানির্ভর নাটক থেকে ব্যক্তিমানবের সমস্যা-সংকটে পৌঁছে গিয়েছিলেন, বামপন্থাকে বর্জনও করেছিলেন; তবু শম্ভু মিত্রকে গ্রুপ থিয়েটার যে গুরুর সম্মান দিয়েছে তর্কবিতর্ক আক্ষেপ দ্বন্দ্ব অতিক্রম করে, এবং বিপরীত দিকে এক সময় তাঁর কাছ থেকে সহৃদয় উপদেশ-পরামর্শ পেয়েছে— সেই সহজ সম্পর্ক এই 'অরাজনৈতিক' নাট্যকর্মীদের সঙ্গে গ্রুপ থিয়েটার গড়ে ওঠে নি। যদিও সৌজন্যের সম্পর্ক নিশ্চয়ই ছিল।

যদি নাট্যকারদের কথা বলি, এই দলে সর্বাগ্রে আসেন তরুণ রায় (১৯২৮-৯০)। ধনঞ্জয় বৈরাগী ছদ্মনামে তাঁর 'ধৃতরাষ্ট্র' (১৯৫৭), 'রুপোলি চাঁদ' (১৯৫৮), 'একপেয়ালা কফি' (১৯৬০), 'আর হবে না দেরী' (১৯৬১), 'আগন্তুক' ইত্যাদির মধ্যে যে নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের সমস্যা সংকটকে কিঞ্চিৎ অন্ত্য উনিশ শতকীয় নাটকীয়তার মধ্যে ধরবার চেষ্টা করেছে, কখনো ক্রাইম কাহিনীকেও নাট্যীকৃত করেছে। 'সৈনিক' (১৯৬৩), চীন-ভারত যুদ্ধে উন্মথিত দেশপ্রেমের নাটক। প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র 'শহরতলী'তে বস্তির বাস্তব ছবি থেকে প্রহসন 'অম্লমধুর' আর 'প্রজাপতি'তে পৌঁছে যান এই ব্যক্তিগত প্রকাশবৈচিত্র্যের তাগিদেই। সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দীর কাছেও নাটক তাঁর আত্মবিকাশের অন্যতম বাহন, এবং কিছুটা তাঁর বুদ্ধিচর্চা ও শিল্পসন্ধানের প্রকোষ্ঠ। তাঁর 'সমান্তরাল' (১৯৬০), 'ছারপোকা' (১৯৬১), 'সকাল-সন্ধ্যার নাটক' এই ভিতর-বাহিরের সন্ধানকে প্রকট করে। শ্রীনন্দী সার্ত্র, ইয়েনেস্কো, স্ট্রিণ্ডবার্গ, অলবি প্রভৃতির নাটক অনুবাদ ও রূপান্তরের দ্বারা বাঙালি দর্শকদের সঙ্গে এই-সব নাট্যকর্মের পরিচয় ঘটান। তাঁর মৌলিক নাটক 'বসন্তমোহিনী', 'পেণ্টভটাস', 'অলিঙ্গসুন্দর' ও 'সামুদ্রিক চতুষ্পদী' এই কালপর্বে রচিত, নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষাতে নিযুক্ত হয়েছে।

কিরণ মৈত্রের 'বারো ঘণ্টা' (১৯৫৮) নিম্ন মধ্যবিত্ত জীবনের নাটকীয় ও আশ্বাসহীন কারুণ্যের আতিশয্য দিয়ে একসময় জনপ্রিয় হয়েছিল। 'বারো ঘণ্টার পরে'-তে এই জনপ্রিয়তা পুনরাবৃত্ত হয় নি। 'চোরাবালি' ও 'তৃষ্ণা'-তে আবেগসিক্ত নাট্যিকতা, আর 'নাটক নয়' ও 'যা হচ্ছে তাই'-এ কিছুটা কৃত্রিম কৌতুক। ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় "নিজে কোনও রাজনীতিদলীয় লোক" নন [২০] এই ঘোষণা করে নিজেকে স্ব-তন্ত্ররূপে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর 'কেরানীর জীবন' (১৯৫২), 'চোর' (১৯৫৮), 'স্ট্রীট বেগার' (১৯৫৯) অভিজ্ঞতার নানা দিক সন্ধান করে, কিন্তু কেরানীর জীবনের আবেগ ও হতাশাময় ছবিই তাঁর প্রাথমিক জনপ্রিয়তার মূলে। রমেন লাহিড়ীর 'অপরাজিত' (১৯৫৮), 'শততম রজনীর অভিনয়' (১৯৬১), 'পরোয়ানা' (১৯৬২), 'পান্থশালা' (১৯৬২), 'ঢেউ' (১৯৬৪) ইত্যাদি নাটকও নাট্যকারের বৈচিত্র্য-সন্ধানের সাক্ষ্য। 'ডাইভোর্স' (১৯৬২), 'পাহাড়ী ফুল' (১৯৬৩), 'বৌদির বিয়ে', 'ক্যাম্প থ্রি', 'প্রাইভেট এমপ্লয়মেন্ট একসচেঞ্জ' ইত্যাদি নাটকের নাট্যকার শৈলেশ গুহ নিয়োগী বা পিকলু নিয়োগীও কখনো কৌতুক, কখনো কারুণ্যপূর্ণ নাটকীয়তার অন্বেষণ করেন। জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়

'গেটম্যান' (১৯৬৩), 'বায়েন' (১৯৬৫)— দুটি সমাগতভাবে পার্শ্বিক অবস্থানের চরিত্রকে নিয়ে নাট্যরচনা করেছেন, 'মুছেও যা মোছে না'-তে (১৯৬৫) আবার পৌঁচেছেন অতিনাটকীয়তায় । পার্থপ্রতিম চৌধুরী 'ফিঙ্গার প্রিন্ট', 'চার দেয়ালের গল্প', 'কৃষ্ণচূড়ার মৃত্যু', 'শব্দরূপ ধাতুরূপ' ইত্যাদি নাটক লিখে তাঁর নিজের নাট্যদল সুন্দরম্‌কে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন । রতনকুমার ঘোষ 'সম্রাট', 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' (১৯৬৫), 'ফেরা'— এই ত্রয়ী এবং অন্যান্য বহু নাটকের নাট্যকার । ফর্ম নিয়ে তিনি কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন এবং আইডিয়ার পশ্চাদ্ধাবন নাটকে তাঁর প্রিয় ব্যসন ।

এই-সব নাট্যকার প্রায় সকলেই পরিচালক এবং অভিনেতা ছিলেন । ফলে এঁদের নাটকের সংলাপ মোটামুটি স্বচ্ছন্দ । কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে ঘটনা ও চরিত্রের সম্ভাব্যতা বিশ্বাস্যতার ভিতটি দুর্বল ।

দু-একজন নাট্যকার, মূলত সাহিত্যের রূপকর্ম হিসেবে নাট্যরচনা করেছেন । বাংলা গ্রুপ থিয়েটারের সচল নাট্যকর্মের সঙ্গে এঁদের নাটকের কোনো ধারাবাহিক ও প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না । বুদ্ধদেব বসুর (১৯০৮-৭৪) 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' (১৯৬৬)-তে কাব্যনাট্যের নতুন সম্ভাবনা উম্মোচিত হলো, কিন্তু রবীন্দ্রনাটকের বাইরে অন্য কাব্যনাটকে উৎসাহী পরিচালক খুব বেশি এগিয়ে আসেন নি। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮-৭০) -এর 'ভাড়াটে চাই' 'বারো ভূতে' সরস নাটক হিসেবে এখনো শৌখিন অভিনয়ে জনপ্রিয় । তাঁর 'রামমোহন' (১৯৫৪) জীবনী-নাটক হিসেবে উল্লেখযোগ্য । লক্ষণীয় যে, চলচ্চিত্রে জীবন-আখ্যান জনপ্রিয় হয়েছে, কিন্তু নাটকে তা তুলনীয় উপস্থিতি লাভ করে নি । পাঁচের দশকে দিলীপ রায় 'সার্কাস' (দ্বি সং ১৯৫৫), 'দুই আর দুই', গিরিশংকর 'সমুদ্র ধ্রুপদী' (১৯৫৯)-র দুটি নাটিকা, এবং 'সাইরেন' 'শেষ সংলাপ', 'আজকের নাটক' ইত্যাদির কাব্যনাটকের একটি ছোটো সরণি তৈরি করেছিলেন । দুর্ভাগ্যত সে পথে বেশি লোক হাঁটে নি। নান্দীকার দিলীপ রায়ের 'বৃত্ত' এবং ফ্রেড জিমারম্যানের নাটক অবলম্বনে 'রাত্রি' অভিনয় করেছিল, 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' পরে থিয়েট্রন প্রযোজনা করেছে । কিন্তু রচনায় বহু কবির সক্রিয় স্বনিযুক্তি সত্ত্বেও কাব্যনাট্য বাংলা নাটকে একটি অবহেলিত অলিন্দ ।

নয়

তালিকাতে নিশ্চয়ই আরো সংযোজন সম্ভব । কিন্তু এই সত্য থেকে আমাদের পলায়ন সম্ভব নয় যে, গ্রুপ থিয়েটারের প্রথম সারির দলগুলির ক্ষুধানির্বাপণের জন্য যথেষ্ট সংখ্যক সম্ভ্রান্ত ও গ্রহণযোগ্য নাটকের সৃষ্টি হয় নি, না হয়েছে প্রচুর সংখ্যক নাট্যকারের উদ্ভব । বিজন ভট্টাচার্যের নাটক প্রায় ক্লাসিক হয়ে গিয়ে শেষ পর্যন্ত প্রায় ছাত্রপাঠ্যতায় নির্বাসিত হয়ে পড়েছে (যদিও কুমার রায় 'নবান্ন'-এর একটি নতুন প্রযোজনা উপহার দিয়েছেন ১ মে ১৯৮৯-তে), অন্যান্যরা বেঁচে আছেন মূলত শৌখিন ও অফিস ক্লাবগুলিতে । তাই বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করি, এত সব নাম, তাঁদের বহুবিধ নাট্যরচনার অভিনয় ও প্রকাশ সত্ত্বেও আমাদের সময়খণ্ড গ্রুপ থিয়েটাররের দ্বারা পুনঃ পুনঃ ব্যবহার্য বেশি নাট্যকারকে সৃষ্টি করতে পারে নি । যে-কজন পৃথক হয়ে থাকেন তাঁরা হলেন উৎপল দত্ত, বাদল সরকার, পরে মনোজ মিত্র ও মোহিত চট্টোপাধ্যায় (বাদল সরকার আমাদের কালের পরে প্রসেনিয়াম মঞ্চ বর্জন করেন তা আমরা আগেই বলেছি)। বস্তুত আমাদের পর্বে নাটকের চেয়ে প্রযোজনা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে ।

অন্য দিকে, একজন নাট্যকারকে যথার্থ আধুনিক এবং আন্তর্জাতিক মানের নাট্যকারকে, নাট্যতাত্ত্বিক পণ্ডিতদের অবিশ্বাস ও ঔদাসীন্যের ধুলোর তলা থেকে উদ্ধার করে আনে শম্ভু মিত্রের সুপরিচালনায় বহুরূপী, ১৯৫৪ সালে। তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । আমাদের এ কথাটিও একটু সংশোধন করা দরকার এই অর্থে যে, নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ তাঁর গীতিনাট্য-নৃত্যনাট্যগুলির সূত্রে বাঙালি নাট্যদর্শকদের চোখের আড়ালে কখনো ছিলেন

না, তিনি এখনো আমাদের জনপ্রিয়তম, সবচেয়ে বহুলভাবে মঞ্চারোপিত নাট্যকার । কিন্তু তাঁর কাব্যনাট্য ও গদ্যভাষায় লেখা নাটকগুলি— যেগুলি সম্বন্ধে পণ্ডিতরা দীর্ঘদিন অনাটকীয়তার [২১] অভিযোগ করেছেন— শম্ভু মিত্রের পরিচালনা ও প্রযোজনায় সেগুলি তাদের সমস্ত শক্তি নিয়ে প্রকাশিত হল— তা এই কালখণ্ডে আমাদের একটি বড়ো প্রাপ্তি ।[২২] 'রক্তকরবী' (১৯৫৪) ও 'রাজা' (১৯৬৪) এই সময়ের দুটি অবিস্মরণীয় প্রযোজনা ।

আর বাকি শূন্যতা অধিকাংশত পূরণ করেছে অনুবাদ-রূপান্তরের স্রোত । এই নাটকগুলিকে কোনো-না-কোনো ভাবে বাংলা নাটকের ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, কিন্তু তা এই মুহূর্তে আমাদের উদ্দিষ্ট নয় । কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে যে, এই অনুবাদ-রূপান্তরের মধ্য দিয়ে বাঙালি দর্শক পরিচিত হয়েছে সোফোক্লেস, শেক্‌সপিয়ার, ইবসেন, চেকফ্, ব্রেশ্‌ট, গোর্কি, সার্ত্র, বেকেট, আনুই, পিরান্‌দেল্লো, প্রিস্টলি, ইয়েনেস্কো, ওয়েস্কার, প্রভৃতি প্রধান নাট্যকারের রচনার সঙ্গে । অনুবাদ-রূপান্তরণের মাত্রা ও সার্থকতা নিয়ে সংগত প্রশ্ন উঠেছে, তা উঠবেই । কিন্তু যাঁরা নাটকের দলগুলি মৌলিক নাটক কেন করে না বলে অভিযোগ করেছেন তাঁরা পাশাপাশি এ প্রশ্ন করেন নি যে, দলগুলি অনুবাদ-রূপান্তর করতে বাধ্য হয় কেন ? বেশির ভাগ মৌলিক নাট্যকার অতিশয় দ্রুত তাদের, বিশেষত নেতৃস্থানীয় দলগুলির অব্যবহার্য হয়ে পড়েছেন— এও এক ঐতিহাসিক ঘটনা ।

আর প্রযোজনার ক্ষেত্রে একদিকে গণনাট্যের উৎস থেকে শম্ভু মিত্র, এবং অন্য দিকে শেকসপিরিয়ানা-র প্রশিক্ষণ থেকে উৎপল দত্ত— যে অভাবনীয় শৃঙ্খলা ও সংহতি ; মঞ্চবিষয়, আলোক, সংগীত, অভিনয়ের সর্বাঙ্গীণ ও যৌথ উৎকর্ষ সম্বন্ধে কঠোর দায়িত্বশীল মনোনিবেশের যে আদর্শ সৃষ্টি করেন, তা বাংলা নাটকের চেহারাই আমূল বদলে দেয় । এখন আত্মসম্ভ্রমশীল প্রতিটি দলকে ওই ভীতিপ্রদ চ্যালেঞ্জগুলির কথা মনে রেখে নাটক করতে হয় ।[২৩]

উল্লেখসূত্র

১. দ্র. ত্রিবান্দ্রম থেকে প্রকাশিত *Encycolpedia of Comparative Indian Literature* প্রথম খণ্ডে এই লেখকের নিবন্ধ "Bengali Drama, Phase I", p. 488.

২. আর্ভিং-এর বিষয়ে মুগ্ধতা দ্বিজেন্দ্রলালে স্থায়ী হয়েছিল, কিন্তু আমরা অন্যত্র দেখিয়েছি যে, রবীন্দ্রনাথ এই প্রারম্ভিক মুগ্ধতা থেকে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন । এটা তাঁর নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ হওয়ারই একটি সূত্র । দ্র. বর্তমান লেখকের 'নাটমঞ্চ নাট্যরূপ', ১৯৯০ সংস্করণ, প্রমা, পৃ. ১৬৯–৭১ ।

৩. 'কে কতটা সচল— এই নিয়ে পরবর্তীকালে গ্রুপ থিয়েটার ও থার্ড থিয়েটারের মধ্যে বিতর্ক উঠেছে । দ্রষ্টব্য, 'নাটমঞ্চ নাট্যরূপ', পৃ. ২৬৬–৬৯ ; ৩০৫ ও অন্যত্র ।

৪. ড. দর্শন চৌধুরী তাঁর 'গণনাট্য আন্দোলনের প্রথম পর্যায়' (১৯৮২, অনুষ্টুপ প্রকাশনী) গ্রন্থে ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৪ পর্যন্ত কলকাতার পেশাদার রঙ্গালয়গুলিতে যে-সব নাটক অভিনয় হয়েছে তার একটা তালিকা করেছেন (পৃ. ১৬–১৯) । সে-সবের নাট্যকার মূলত এঁরাই, তবে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের নাট্যরূপ এবং গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল'-ও অভিনীত হতে দেখি । এই তালিকার পাশাপাশি 'নবান্ন' ও গণনাট্যের নাট্যকর্মকে স্থাপন করলে দুয়ের পার্থক্য বিশেষভাবে প্রকট হয়ে ওঠে ।

৫. দ্র. সুধী প্রধান, "নব সংস্কৃতি ও গণনাট্য প্রসঙ্গ", সুনীল দত্ত -রচিত 'নাট্য আন্দোলনের ৩ বছর' গ্রন্থে (১৯৮৭ সংস্করণ, কলকাতা, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, পৃ. ১১) ।

৬. *The Peoples Theatre* নামে এই প্রবন্ধগুলির ইংরেজি অনুবাদের একটি সংকলন সুধী প্রধানের সম্পাদনায় ১৯৮০-তে প্রকাশ করেছেন জি. এ. ই. পাবলিশার্স, কলকাতা ।

৭. দর্শন চৌধুরী, পূর্বসূত্রে উদ্ধৃত, পৃ. ১৪
৮. যেমন দেবব্রত বসু, বিনয় ঘোষ, সুনীল চট্টোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য প্রভৃতি ।
৯. দ্র. "ভূমিকা", 'নবান্ন' চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৬২, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, পৃ. (৫)
১০. দ্র. " 'নবান্ন' প্রসঙ্গে", বিজন ভট্টাচার্য-কৃত 'নবান্ন'-এর প্রমা সংস্করণ, ১৯৮৪, পৃ. ৫–৭
১১. দ্র. অজিতকুমার ঘোষ, 'বাংলা নাটকের ইতিহাস', সপ্তম সংস্করণ, ১৯৮৫ । অধ্যাপক ঘোষের মন্তব্য— 'নাটকের ঘটনা সমসাময়িক অবস্থার তথ্যচিত্র হইয়াছে, শাশ্বত রসবস্তুতে পরিণত হইতে পারে নাই ।' পৃ. ৪০৮
১২. এ বিষয়ে এই লেখকের আলোচনা দ্র. 'নবান্ন', প্রমা সংস্করণ, ১৯৮৮ (দ্বিতীয় সংস্করণ), পৃ. ১৪৬–৪৯
১৩. দ্র. স্বপন মজুমদার, ১৯৮৮, 'বহুরূপী ১৯৪৮–১৯৮৮', কলকাতা, বহুরূপী, পৃ. ১৪
১৪. এক বহুরূপী থেকেই প্রায় ন-টি নাট্যগোষ্ঠীর জন্ম হয়েছে ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় । এ সম্বন্ধে অল্প আলোচনা ও মন্তব্যের জন্য দ্র. 'নাটমঞ্চ নাট্যরূপ', পৃ. ২৪৫, ২৭৩–৭৫
১৫. এ বিষয়ে আমি আমার ছাত্রী প্রীতিপ্রভা দত্তের মনোজ মিত্র বিষয়ে এম. ফিল. গবেষণাপত্র থেকে কিছু সাহায্য পেয়েছি।
১৬. অজিতকুমার ঘোষ, পূর্বসূত্র, পৃ. ৪৬৩
১৭. স্বপন মজুমদার, পূর্বসূত্র, পৃ. ১২
১৮. ওই, পৃ. ১৯
১৯. দর্শন চৌধুরী, পূর্বসূত্র, পৃ. ৯৬
২০. দ্র. অজিতকুমার ঘোষ, পূর্বসূত্র, ৪৩৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত ।
২১. 'নাটমঞ্চ নাট্যরূপ'-এর ২০৬ ও ২১৬ পৃষ্ঠায় ২৪-সংখ্যক পাদটীকা দ্রষ্টব্য ।
২২. এ বিষয়ে দ্র. 'নাটমঞ্চ নাট্যরূপ'-এর প্রবন্ধ "রবীন্দ্রনাটকের অভিনয় : সাধারণ রঙ্গালয়, গ্রুপ থিয়েটার", পৃ. ১৯৫–২১৬
২৩. দু-একটি তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন বলে শ্রীপ্রভাতকুমার দাসের কাছে আমি কৃতজ্ঞ ।

নাটক
২

অরুণকুমার বসু

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা নাটকের অর্ধশতক, গত দেড়শো বছরের বাংলা নাট্যইতিহাসের এক-তৃতীয়াংশ— সমগ্রের বিচারে তাঁর মূল্যায়নের কাল হয়তো এখনো আসে নি । আমরা এই কালের দেহলিপ্রান্তে উপবিষ্ট মাত্র । পুরো বাড়িটার তুলনায় বারান্দার অধিকার কতখানি তার সুনির্দিষ্ট হিসেব আমাদের চোখের সামনে নেই । গণনাট্য আন্দোলন শুরু হয়েছিল বিশ শতকের চল্লিশের দশক থেকে ।[১] তার পর প্রায় পঞ্চাশের দশক থেকেই গণনাট্য আন্দোলনের সমতালে নবনাট্য আন্দোলন শব্দটিও নাট্যাভিধানে ঢুকে পড়েছে, কখনো সমর্থক কখনো পরিপূরক কখনো প্রতিস্পর্ধী হয়ে । চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের দশক বাংলা ইতিহাসের এক দুর্গতির অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে । মহাযুদ্ধ মন্বন্তর সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণ-আন্দোলন দাঙ্গা দেশবিভাজন উদ্বাস্তু-সমস্যা স্বাধীনতালাভ, রাজাবদলের পর মোহভঙ্গের পালা—এই-সব নিয়ে নখরতীক্ষ্ণ সেই দশকগুলি বাংলা সাহিত্যের প্রায় সব-কটি এলাকাতেই থাবার দাগ রেখে গেছে— নাটকে তো বটেই । এই কালপর্বেই জন্ম নিয়েছিল গণনাট্য সঙ্ঘ, লিখিত ও অভিনীত হয়েছিল 'নবান্ন' ।[২] তার পর থেকেই একটি-দুটি করে গড়ে উঠেছে গ্রুপ থিয়েটারগুলি, পেশাদার ব্যবসায়ী মঞ্চগুলি সুদিনের মুখ দেখেছে, কলকাতা শহরে নাট্যাভিনয়ের সংখ্যা বেড়েছে, নাট্যঘর তৈরি হয়েছে অনেকগুলি, এসেছেন প্রতিশ্রুতিবান অভিনেতৃবর্গ ও সুপ্রতিভ নাট্যকার, নাটকের জনপ্রিয়তা বেড়েছে, চাহিদা বেড়েছে, জোগানও বেড়েছে অর্থনৈতিক নিয়মে । ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকে এই নব্বইয়ের দুই ধাপ নিয়ে, অথবা অন্যভাবে ধরলে তেরোশো সালের শেষ পঁচিশ বছর, বাংলা নাটক কী পেল, কী দিয়েছে, তার একটি তামামি-হিসেব নেওয়া যেতে পারে । বর্তমান আর সদ্য-অতিক্রান্তের সময়সীমাকে ঠিক সাল তারিখে চিহ্নিত করা যায় না । চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের দশকে বাংলা নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে পূর্বযুগের খ্যাতিমান অভিনেতৃবর্গ ও নাট্যকারদের অনেকেই হয় রঙ্গমঞ্চ থেকে ধীরে ধীরে অপসৃত হয়ে গেছেন অথবা প্রয়াত হয়েছেন, অনেকেই চলে গেছেন চলচ্চিত্রের জগতে। পেশাদার থিয়েটারগুলির কোনো-কোনোটির গৌরবের দিন শেষ হয়েছে মালিকানার পরিবর্তনে, কিংবা প্রশাসনিক রদবদলে, ভালো অভিনেতার অভাবে কিংবা দর্শকদের স্বাচ্ছন্দ্যবিধানের অব্যবস্থায় ।[৩] অন্য দিকে গড়ে উঠেছে নতুন মঞ্চ, এসেছেন নতুন কালের নতুন অভিনেতা-অভিনেত্রী এবং নাট্যকার । এদের ঘিরেই গড়ে উঠেছে নাটকের বর্তমান প্রজন্ম ।

আধুনিক কালের কোনো পর্বের নাট্যইতিহাসের উপাদান সংকলন করতে বসলে প্রথমেই একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। একদা বাংলা নাটকের ইতিহাস নামে যে-সব গবেষণা গ্রন্থ রচিত বা সংকলিত হয়েছে এবং এখনো যেগুলি সাহিত্যের ইতিহাসের ছাত্রছাত্রীদের পাঠক্রমের অংশ, সেগুলি নিতান্তই প্রকাশিত

অর্থাৎ মুদ্রিত নাট্যগ্রন্থের ইতিহাস। নাট্যাভিনয়-সংক্রান্ত তথ্য সেখানে নেই। স্বতন্ত্রভাবে মঞ্চের বা নাট্যাভিনয়ের ইতিহাসও সামান্য কিছু রচিত হয়েছে, তাও উনিশ শতক পর্যন্ত।[৪] একই সঙ্গে নাট্যগ্রন্থ-প্রকাশ ও অভিনয়ের যুগপৎ ইতিহাসই নাটকের যথার্থ ইতিহাস। পারফরমিং আর্ট-এর পারফরমেন্স বাদ দিয়ে কেবল টেক্‌স্‌ট-এর আলোচনা একালে প্রায়-মূল্যহীন বলে অনেকেই মনে করেন। তার দ্বারা নাট্যকার-বিশেষের মূল্যায়ন হতে পারে, কিন্তু বিশেষ বিশেষ নাটকগুলি প্রযোজিত ও মঞ্চস্থ হওয়ার ফলে যে দর্শক-প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, তার কোনো স্মারকচিহ্ন সে আলোচনায় থাকে না। একদা যত বাংলা নাটক মুদ্রিত হয়েছে, সেই পরিমাণ নাটক মঞ্চারোহণ করে নি। অনভিনীত নাটক কেবল মুদ্রিত গ্রন্থপঞ্জীতে তার বিক্রয়মূল্য ঘোষণা করে মাত্র। কিন্তু কেবল মুদ্রণ-গৌরবেই সেগুলি ইতিহাসের একমাত্র উপাদান হতে পারে না। একালে, অন্তত গত পঁচিশ বছরে, অসংখ্য নাট্যগোষ্ঠী অবিরত নাটক রচনায় ও অভিনয়ে নিয়োজিত রয়েছেন, কিন্তু তাঁদের প্রযোজিত সব নাটকই মুদ্রিত-প্রকাশিত হয় না। বিশিষ্ট জীবিত বা মৃত লেখকদের উপন্যাস-ছোটোগল্প নিয়মিত নাটকে রূপান্তরিত হয়ে অভিনীত হচ্ছে। সেগুলির নাট্যরূপও অপ্রকাশিত থেকে যাচ্ছে। ফলে নাট্যরচনার ইতিহাসে সেগুলির তথ্য-উপাদান সংরক্ষিত হয় না। বিভিন্ন গ্রুপ থিয়েটারের পক্ষ থেকে অনেক ছোটো বড়ো নাট্যপত্রিকা প্রকাশিত হয়। এইগুলিতেও অনেক নাটক প্রকাশিত হয়ে থাকে।[৫] নাটক মুদ্রিত হলে সে নাটক একাধিক গোষ্ঠী অভিনয়ের জন্যে বেছে নিতে পারেন। নতুবা পাণ্ডুলিপি আকারে গুহাহিত থাকলে একটি গোষ্ঠীর ভিতরই তার অভিনয় কেন্দ্রীভূত থাকে। কেবল অভিনীত নাটকের বিজ্ঞাপন বা পত্রপত্রিকার রিভিউ, আদৌ প্রকাশিত হলে, নাটকটির তথ্যপরিচয় সংকলন করা সম্ভব।

মোটের উপর এই-সব কারণে নাটকের ইতিহাসের ক্ষেত্রে সেকালে-একালে একটা প্রভেদবিভেদ ঘটে গেছে। যার অভিনয় দেখি, তার পাঠ্য মুদ্রিত রূপ দুর্লভ, যা মুদ্রিত হয় তার সব অভিনীত হয় না। বহু মঞ্চসফল অমুদ্রিত নাটক একটিমাত্র প্রযোজক-গোষ্ঠীর কুক্ষিগত হয়ে থাকুক, নাট্যকারও নিশ্চয় তা কামনা করেন না। নাট্যগোষ্ঠীর পরিচালকের স্বরচিত নিজস্ব নাটক হলেও তার ব্যাপক প্রচার বাংলা নাটকের সামগ্রিক ইতিহাসকেই সমৃদ্ধ করতে পারত। সুতরাং আমাদের অভিমত, বাংলা নাটকের ইতিহাসের উপকরণ তার প্রকাশিত ও মুদ্রিত নাটক এবং মুদ্রিত অথবা অমুদ্রিত নাটকের মঞ্চায়ন-অভিনয়-প্রযোজনা —এই উভয় ক্ষেত্র থেকেই অনুসন্ধেয়। কাজটি বিপুল, সময়সাপেক্ষও বটে, কারণ বর্তমান বাংলা নাটক নানা দিক থেকে এত সম্পন্ন ও সমৃদ্ধ হয়েছে যে, একটিমাত্র নাতিপ্রসর নিবন্ধে তার পূর্ণ পরিচয় প্রায় অসম্ভব। কলকাতা-কেন্দ্রিক অভিনয়ের সঙ্গে মফঃস্বলগুলির অভিনয় যোগ করলে তার পরিধি আরো সুবিস্তীর্ণ হবে। আলোচ্য পর্বে মফঃস্বলের একাধিক নাট্যগোষ্ঠীর অনুশীলন সৃষ্টি ও পরীক্ষার যৎসামান্য যে বিবরণ আমরা পাই, সেগুলিকে অনতিবিলম্বে পঞ্জীভুক্ত করা দরকার।[৬]

তবে বর্তমান নিবন্ধকার সেই জেলাভিত্তিক সমীক্ষায় অপারগ।

দুই

বক্ষ্যমাণ সমীক্ষায় পেশাদার অপেশাদার দুটি ধারাতেই খরস্রোত বাংলা নাটকের প্রতিভাস সংরক্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে। এই দুই পরম্পরার অভিনয়ক্ষেত্র যে পুরনো নতুন মঞ্চগুলিকে ঘিরে তৈরি হয়েছে অধ্যাপক সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর গ্রন্থে তার তালিকা দিয়েছেন।[৭] তাঁর মতে, এই সময়সীমার আর-একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে নাট্যবিভাগ স্থাপনা ও নাটকের উচ্চতর পঠনপাঠন চালু হওয়া।[৮] অভিনয়ের সঙ্গে

যুক্ত শিল্পী-অভিনেতা-কলাকুশলীদের অনেকেই এই নাট্যবিভাগে অধ্যাপনাসূত্রে সংশ্লিষ্ট থাকার ফলে সুশিক্ষিত নাট্যশিক্ষার্থীরাই বাংলা নাটকের মান ও উৎকর্ষবর্ধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে চলেছেন। এখন কী পেশাদার, কী শৌখিন বা গ্রুপ থিয়েটার অভিনয়ে, কী অফিস ক্লাবের অভিনয়োদ্যোগে রবীন্দ্রভারতীর নাট্য বিভাগ থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত এক বা একাধিক ছাত্র বা ছাত্রীর উপস্থিতি বা অংশগ্রহণ প্রায় অবধারিত। তবু এ কথা ভাবার সুযোগ নেই যে, সত্তরের দশক থেকে কলকাতার নাট্যগগনে তারকার মেলা বসে গেছে। নাট্যপ্রযোজক, শক্তিমান, জনৈক আধুনিক নাট্যকর্মী লক্ষ্য করেছিলেন যে, পঞ্চাশের দশক থেকে বাংলা অপেশাদার নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে দুটি রীতি গড়ে উঠেছিল, একটি শম্ভু মিত্রের প্রযোজনার রীতি, অন্যটি উৎপল দত্তের প্রযোজনারীতি।[৬] হয়তো কথাটির মধ্যে মূল্যায়নগত সত্যতা আছে। শম্ভু মিত্রের অভিনয়রীতি ও প্রযোজনার ক্ষেত্র ছিল পরিমার্জিত সংযত আবেগ, বুদ্ধিদীপ্ত মননধর্মী নাটক-নির্বাচন, ব্যক্তিগত ও দলগত অভিনয়ের সুষম সমন্বয়, ইঙ্গিতদ্যোতনাময় মঞ্চস্থাপত্য, সুপরিমিত আলোকসম্পাত প্রভৃতি। আর উৎপল দত্তের প্রযোজনাবৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় সংঘবদ্ধ অভিনয়ের টিম-ওয়ার্কে, উচ্চকণ্ঠ রাজনৈতিক বক্তব্যে, দৃষ্টিবিভ্রমকর মঞ্চসজ্জায়, কৌশলী আলোকসম্পাতে, পরিহাস-বিদ্রূপের শাণিত সমারোহে এবং আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে। অবশ্যই এ-সব লক্ষণ যাবতীয় নাটকের ক্ষেত্রে নির্বিচারে প্রযোজ্য বললে সরলীকরণের অভিযোগ ঘটবে। বহুরূপী বা লিটল থিয়েটারের অভিনয়রীতি ও প্রযোজনা-পদ্ধতিরও পরিবর্তন-রূপান্তর ঘটেছে। বহুরূপীর তুলনায় উৎপল দত্ত-পরিচালিত অভিনয় পদ্ধতি ও প্রযোজনার খুব একটা রূপান্তর ঘটে নি। উৎপল দত্ত কেবল প্রসেনিয়াম পদ্ধতিকেই গ্রহণ করেন নি, ব্রেশ্‌ট-এর এপিক থিয়েটারের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন, যাত্রাশৈলীকেও তাঁর নাট্য প্রযোজনায় নিজস্ব করে নিয়েছিলেন। তাই সন্ন্যাসীর তরবারি টোটা, তিতুমির এমন-কি, ম্যাকবেথকেও তিনি যাত্রায় উপস্থাপিত করেছেন—অবশ্য তাঁর বা দলের অভিনয় পরিবেশন পদ্ধতি অভিনয়রীতির উপর বিশেষ কোনো প্রভাব ফেলে নি। ষাট ও সত্তরের দশকে শৌভনিক নান্দীকার গন্ধর্ব থিয়েটার ওয়ার্কশপ রূপকার প্রভৃতি শক্তিমান গ্রুপ থিয়েটারগুলি নিজস্ব এক-এক প্রকার অভিনয়রীতি গড়ে তুলেছিল, তাও পরিচালক-বিশেষের নির্দেশনা ও শিক্ষণক্রমের আদর্শে। তাই বাদল সরকার-রচিত ও নির্দেশিত প্রযোজনার নিজস্ব একটি প্যাটার্ন আছে ; বাদল সরকারের 'বাকি ইতিহাস' বা 'ত্রিশ শতাব্দী' যখন বহুরূপী নিবেদন করে তখন সেই পদ্ধতি অনুসৃত হয় না। মনোজ মিত্রের নাটক অনেক গোষ্ঠীর দ্বারাই অভিনীত হয়, কিন্তু মনোজ মিত্রের সুন্দরম্ গোষ্ঠীর নিজস্ব একটি রীতিশৈলী আছে, যেমন ছিল ষাটের দশকে নক্ষত্র গোষ্ঠীর, কিংবা গণনাট্যের কলাকার শাখার। ষাটের দশক থেকেই গ্রুপ থিয়েটারগুলিতে অভিনয়ের ক্ষেত্রে এক জাতীয় টিম-অ্যাকটিং-এর দর্শন গড়ে উঠেছিল। এই দলগত সুনিয়ন্ত্রিত সঙ্ঘবদ্ধ অভিনয়ের রীতিটি পূর্বতন কালের পেশাদার মঞ্চাধীন একক ব্যক্তিত্বপ্রদর্শক অভিনয়ের চটক ও চমক ভাঙার ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই অপরিহার্য ছিল। সত্তর-আশির দশকে গ্রুপ থিয়েটার অভিনয়ে, শম্ভু মিত্র তৃপ্তি মিত্র উৎপল দত্তের পরবর্তী সারিতে, সবিতাব্রত দত্ত অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় কেয়া চক্রবর্তী অরুণ মুখোপাধ্যায় জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় বিভাস চক্রবর্তী নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত শাঁওলি মিত্র সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় শেখর চট্টোপাধ্যায় রবি ঘোষ সমীর মজুমদার রমাপ্রসাদ বণিক প্রভৃতি অনেক শিল্পীই ব্যক্তিগত অভিনয়ের অভিনবত্বে দর্শক-সমাদর অর্জন করেছেন, কিন্তু দলগত ঐকতানিক অভিনয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই। এই টিম-অ্যাকটিং-এর পিছনে নাট্যকর্মীদের একটি স্বতন্ত্র চেতনা কাজ করেছিল, যা শুধু নাটকের টেক্‌সট-এ পাওয়া যায় না, অথচ তাকেও ইতিহাসের উপাদান বলে মানতে হয়। জনৈক নাট্যশিল্পীর অভিমত স্মরণযোগ্য :

"সমাজসচেতনতা থেকে উঠে আসা সাংস্কৃতিক আগ্রহই থিয়েটার কর্মীদের মধ্যে জন্ম দেয় এক অদ্ভুত ডেডিকেশনের। স্বভাবতই দলের পরিচালকরাও একটু অন্যভাবে ভাবতে শুরু করলেন। সম্পদের উপযুক্ত

ব্যবহারের স্পৃহা তাদের উদ্‌বুদ্ধ করল বড়ো ধরনের প্রযোজনায় হাত দিতে । নতুন ধরনের নাটক করতে । এই ইচ্ছা, এই ভাবনা তাদের একটু একটু করে ঠেলে দেয় টিম-অ্যাকটিং-এর দিকে ।".[১০]

তিন

চল্লিশের দশক কেই বাংলা নাটক ইতিহাসের ধ্বজদণ্ড ভেঙে পৌরাণিক ভক্তিবাদের জাল কেটে ক্রমশ জীবনমুখী, সমাজসচেতন, চলমান জীবনের সহযাত্রী ও বাস্তবদর্পণ হতে শিখেছিল, অন্তত অপেশাদার নাটকের বৃহত্তর ক্ষেত্রে । ষাটের দশক থেকে বাংলা নাটকের ইতিহাস এই ঐতিহ্যেরই বিশ্বস্ত প্রহরী হয়েছে । দেশের রাজনৈতিক সামাজিক ইতিহাসও তার আনুকূল্য করেছে । তৎকালীন শাসকসম্প্রদায়ের প্রতি ক্রমবর্ধমান গণ-অসন্তোষ জনজীবনে নানা আন্দোলনের বাতাবরণ তৈরি করছিল । ১৯৫৯-এর খাদ্য-আন্দোলনে শাসকশ্রেণীর নির্দেশে আশিটি জীবনের গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রাণ-হারানোর তীব্র ক্ষোভ ও ঘৃণায়, ক্রোধ ও প্রতিরোধে দিকে দিকে গড়ে উঠছিল ইস্যুভিত্তিক রাজনৈতিক আন্দোলন ও সঙ্ঘবদ্ধ বিক্ষোভ । ১৯৬২ খ্রীস্টাব্দে দেশের এই পরিবেশ বদলে গেল চীনের সঙ্গে ভারতের সীমান্তবিষয়ক সংঘর্ষে । দীর্ঘকালের মৈত্রী-বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেল কয়েকদিনের বেসামাল গোলাবারুদের ধোঁয়ায় । সারা দেশে হঠাৎ তীব্র বাতাস বইল জাতীয়তাবাদের প্রবল গতিবেগে; স্বদেশপ্রেম নামক অব্যবহৃত শব্দটিকে সিন্দুক থেকে বের করে মেজে-ঘষে কবচ করে বুকে দোলাতে লাগল দেশবাসী । কমিউনিস্ট পার্টির উপর পড়ল প্রবল চাপ, দ্বিখণ্ডিত হল সত্তা আস্থা ও সংশয় । ১৯৬৪ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত পার্টির সপ্তম কংগ্রেসে এক পক্ষকে সংশোধনবাদী আখ্যা দিয়ে তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে অপর অংশ গড়ে তুলল মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি । সরকারের সর্বাত্মক ব্যর্থতায় ও গণতন্ত্র হরণের স্বৈরাচারিতার প্রতিবাদে গণ আন্দোলন দুর্বার হয়ে উঠতে লাগল । শাসকদলের রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী প্রবীণ নির্যাতিত কর্মী ও নেতাদের অনেকেই মোহভঙ্গের আঘাতে সাধারণ গণমুখী কর্মসূচীর ভিত্তিতে বামপন্থী দলগুলির সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হলেন । ১৯৬৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনে কুড়ি বছরের নিরবচ্ছিন্ন শাসনের অবসান ঘটাল রাজনৈতিক পরিবর্তনকামী জনসাধারণ, গড়ে উঠল প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার । এরই অব্যবহিত পরে বামপন্থী দলের একাংশে প্রবেশ করল অতিবামবিচ্যুতি, পরবর্তীকালের ইতিহাসে নকশালবাড়ি আন্দোলন নামে যা চিহ্নিত হয়েছে । ঐ আন্দোলনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে গেল উগ্র বামবিরোধিতার বিষক্রিয়া । তার পর হত্যা-খুন-জখম সংস্কৃতি-বিদ্রোহিতার দুঃস্বপ্ন ও বর্বর হত্যালীলার মধ্যে দিয়ে ষাটের দশক শেষ হয় ।

গ্রুপ থিয়েটারগুলির নাট্যপ্রয়াসে, গণনাট্য সঙ্ঘের নাট্যরচনা ও প্রযোজনার ইতিহাসে এই দশকের নাটকগুলি আলোচ্য সময়ের অভ্রান্ত দলিল হয়ে উঠতে পেরেছিল । বিপ্লবাত্মক সমাজতত্ত্বে উদ্‌বুদ্ধ সাংস্কৃতিক চেতনা থেকেই থিয়েটারকর্মীরা থিয়েটারে আত্ম নিবেদনের একটি ঐতিহ্য গড়ে তুলতে লাগলেন । অবশ্য গণনাট্য সঙ্ঘের নাটক ও প্রযোজনাই ছিল তার অন্যতম উদ্দীপন শক্তি । কিন্তু অন্য দিক থেকে রাজনৈতিক মতপার্থক্যের জন্যে, দলীয় নিষ্ঠার অভাবে ও ব্যক্তিপ্রাধান্যের মোহে গণনাট্যে ভাঙাভাঙির ভাইরাস ঢুকে পড়েছিল, সে অবশ্য অন্য ইতিহাস । রবীন্দ্র-পরবর্তী অর্ধ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা নাটকের নতুন যুগ সূচনা করেছিল গণনাট্য সঙ্ঘ, আর সেই আন্দোলনের ঐতিহ্যেই এসেছে নবনাট্য আন্দোলন, সৎ-নাটকের আন্দোলন, থার্ড থিয়েটার, মুক্তমঞ্চ, অন্য থিয়েটার ইত্যাদি শব্দাবলী । গণনাট্যের সঙ্গে রাজনৈতিক আদর্শের যত ফারাক থাক্ এ সবই গণনাট্য আন্দোলনেরই সম্প্রসারণ । গণনাট্য আন্দোলনের শিল্পীরাই দলছুট হয়ে গড়ে তুলেছিলেন, গ্রুপ থিয়েটার । গণনাট্য সঙ্ঘেই রবীন্দ্রনাটক পেয়েছিল নতুন মাত্রা চল্লিশের দশকেই এবং গণনাট্য সঙ্ঘবলয়ের নাট্যকর্মীরাই পরবর্তী দীর্ঘ চার দশকে নাম ও বেশ বদলে রবীন্দ্রনাটকের সনিষ্ঠ প্রযোজনা ঘটিয়ে চলেছেন, আজও ।

গণনাট্য সঙ্ঘের নাট্য আন্দোলনের তিনটি বিশেষত্ব ; এক— নাটকের বিষয়বস্তুতে জীবনমুখিতা যথাসম্ভব সমসাময়িক সমাজপরিবেশে শোষিত নির্যাতিত মানুষের উপর শ্রেণী-শত্রুর শোষণপ্রক্রিয়া প্রতিরোধের পদ্ধতিগত ইঙ্গিত দেওয়া । দুই— যথসম্ভব স্বল্পায়োজনে নাটকের জন্যে মঞ্চনির্মাণ সাজসজ্জা বেশবাস আলোক আবহসংগীত ইত্যাদির ব্যবহার অথচ শিল্পগুণ অক্ষুণ্ণ রাখা । তিন— শ্রমিক কৃষক মধ্যবিত্তের মাঝখানে বিনা দক্ষিণায় নাটক-পরিবেশন করা ।[১১] গণনাট্য সঙ্ঘ -প্রযোজিত জনান্তিক, নয়ানপুর, সব পেয়েছির দেশ, মা, জোয়ার, সূর্যগ্রাস, ফুলওয়ালী, কিমলিস, দাবানল, স্পার্টাকাস, মিনিস্টার, জনতার নেতা স্তালিন, রেশমি কুঠি, মানুষের ঝড়, ভাসান, দুই তরঙ্গ, হারানের নাতজামাই, ঢেউ উঠছে, অরুণোদয়ের পথে, তেলেঙ্গানা, আমার সোনার বাংলা, হিসাব নেওয়ার পালা প্রভৃতি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শাখা-কর্তৃক প্রযোজিত নাটকগুলির মধ্যে মৌলিক রাজনৈতিক বক্তব্যপ্রধান নাটক যেমন আছে তেমনি আছে দেশী-বিদেশী সাহিত্য-কাহিনীর নাট্যরূপ বিদেশী নাটকের অনুবাদ-রূপান্তর । অব্যবহিত পরবর্তী বাংলা নাটকের ইতিহাসে, এই তিনটি ধারাই সমান বেগে সচল রয়েছে । গণনাট্য সঙ্ঘ নাটক ও সংগীত দুটি শিল্পেরই পুনরুজ্জীবনের ইতিহাস-গড়ার কারিগর । তার মধ্যে গণনাট্যের কয়েকটি শাখা[১২] কেবল নাট্যশিল্পেই নিবিষ্ট ছিল । তার পর লক্ষ্য আদর্শ পদ্ধতি ও বিশ্বাসের বদল হতে হতেই শাখা থেকে প্রশাখা, তার পর নতুন চারা নতুন গাছ । গণনাট্যের নাট্যাদর্শে ছিল দলীয় শৃঙ্খলা ও ঐক্যবোধ । ক্রমশ অহং-এর অতিরেক ব্যক্তিবিশেষকে সেই স্থান থেকে বিচ্ছিন্ন করল । ক্রমশ পার্থক্য ঘটল নাট্য নির্বাচনের দৃষ্টিভঙ্গিতে, তার পর দর্শক-বিবেচনায় ঘটল পন্থাভিন্নতা, নবনাট্য আন্দোলন শব্দটি এল নাট্যনির্বাচনের আকাশে স্বেচ্ছাবিহারের স্বাধীনতায় । শহুরে মঞ্চের পরিচ্ছন্ন অনায়াসলব্ধ উপকরণ ও শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের উচ্চারিত মুগ্ধবোধ-সূত্রপাঠ গ্রুপগুলিকে একান্তভাবে নগরসর্বস্ব করে তুলল । কিন্তু যেহেতু শিল্পোত্তীর্ণতা ছিল এই পর্বের একাগ্রবর্তী শর্ত, তাই গ্রুপ থিয়েটারগুলি বাংলা নাট্যইতিহাসকে বস্তুত সমৃদ্ধই করে চলেছে । শিল্পের শর্তকে গণনাট্য সঙ্ঘও লঙ্ঘন করে নি। গণনাট্য ও গ্রুপ থিয়েটার উভয় মিলেই বাংলা নাটকের জীবৎসীমাকে ক্রমশ প্রসারিত করেছে । নতুন সমাজগঠনের স্বপ্ন তো দুই পক্ষেই সত্য ।[১৩] নাটকে হয়তো নতুন রীতির সূত্রপাত বা নতুন আঙ্গিকের প্রয়োগে গণনাট্যের চেয়ে গ্রুপ থিয়েটারের আগ্রহ বেশি । গ্রুপ থিয়েটার বিদেশী উপাদানকে আত্মস্থ করে; কিন্তু তার সূচনা কি গণনাট্যে নয়, যখন গোর্কির লোয়ার ডেপ্‌থ বা মাদার, নীচের মহল ও মা নামে কলকাতা ও পশ্চিম বাংলার গ্রামগঞ্জের বহু সহস্র মানুষকে অভিভূত করেছিল । তখনো ব্রেশ্‌ট-রীতি বা তাঁর নাটক গ্রুপ থিয়েটার-মঞ্চের সমীপবর্তী হয় নি । গণনাট্য সঙ্ঘের শিল্পী-নির্দেশকরাই বিশ্বখ্যাত রুশ নাট্য পরিচালক স্তানিস্লাভস্কির নাট্যসূত্র অনুসরণ করেছেন ষাটের দশকের গোড়া থেকে ।[১৪] গণনাট্য আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত না থাকলে গ্রুপ থিয়েটার শিল্পীরা হয়তো মার্কসবাদে দীক্ষিত ও বিদেশের গণনাট্য-আন্দোলনের বিপ্লবী নায়ক বের্টোল্‌ট ব্রেশ্‌ট্‌কে (কেউ কেউ লেখেন ব্রেখ্‌ট, কেউ ব্রেষ্‌ট) বাংলা নাটকে এত গভীরভাবে আত্মীকরণ করতে পারবেন না । পেশাদার মঞ্চ বা গ্রুপ থিয়েটারের শিল্পী কুশলীদের অনেকেরই নাট্যজীবন যেমন শুরু হয়েছিল গণনাট্য সঙ্ঘের অভিজ্ঞতায় তেমনি নাট্যকারদের অনেকেই এসেছেন গণনাট্য আন্দোলন থেকেই ।[১৫] গত পঁচিশ বছরে কেবল গণনাট্য সঙ্ঘের নাট্যায়োজনের তথ্য দিয়েই সুদীর্ঘ গ্রন্থ রচিত হতে পারে ।

চার

বাংলা নাটকের গত অর্ধশতাব্দীর ইতিহাসের অনেকখানি অংশ জুড়ে আছেন উৎপল দত্ত । গণনাট্যসঙ্ঘের একদা নাট্যকর্মী প্রথমে লিট্‌ল্ থিয়েটার গ্রুপ (১৯৫৩) বা এল টি জি এবং পরে পিপ্‌ল্‌স্ লিট্‌ল থিয়েটার (১৯৬৯) বা পি এল টি গড়ে তোলেন । শেকসপিয়ারের ইংরাজি নাট্য প্রযোজনা ও অভিনয় দিয়ে শুরু হয়েছিল তাঁর

নাট্যজীবন। পরে একেবারে মৃত্তিকা সংসর্গে লোকজীবন-কাহিনীতে নেমে এসেছেন তিনি। অবশ্য শেক্সপিয়ারের প্রতি তাঁর নাট্যজীবনের শ্রদ্ধা কখনো শিথিল হয় নি। বাংলায় অভিনয় করেছেন ওথেলো, জুলিয়াস সিজার, রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েট এবং এ মিড সামার নাইট্স ড্রিম (চৈতালি রাতের স্বপ্ন) নিজেরই অনুবাদ অবলম্বনে। লিখেছেন শেক্সপিয়ার সম্পর্কে একটি অসাধারণ গবেষণাগ্রন্থ[১৬]। স্তানিস্লাভস্কির নাট্যপ্রয়োগ সম্পর্কে তাঁর অপরিসীম জ্ঞান, ব্রেশ্ট-এর এপিক থিয়েটার সম্পর্কেও তাঁর গভীর অভিজ্ঞতা। তা ছাড়া বিদেশী নাটকের রূপান্তর-অনুবাদেও তাঁর কৃতিত্ব ঘটেছে প্রফেসর মামলব (ফ্রিডরিশ ভেলিফ), গুপ্তচর (ব্রেশ্ট), সমাধান (ব্রেশ্ট), ভি আই পি (কফম্যান ও হার্ট), ব্যারিকেড (ইয়ান পেটার্সেন) প্রভৃতি নাটকে। অসাধারণ শক্তিশালী মঞ্চাভিনেতা, যাত্রাভিনেতা, বাংলা ও হিন্দি চলচ্চিত্রে সর্বাধিক বৈচিত্র্যপ্রোজ্জ্বল চরিত্রাভিনেতা, শেক্সপিয়ার থেকে রবীন্দ্রনাথে সমান আগ্রহী, ট্রাজেডি কমেডি ফার্স প্রপাগাণ্ডা নাটকে সমান দক্ষ, প্রসেনিয়াম ব্রেশ্টীয় ও যাত্রানাট্য সব ধরনের নাট্যরীতির ক্ষেত্রেই প্রথম শ্রেণীর পরিচালকরূপে স্বীকৃত একালের অন্যতম শক্তিশালী নাট্যকারও। অসাধারণ তাঁর নাট্করচনার ক্ষমতা,[১৭] সমকালীন যে-কোনো উত্তেজক বিতর্কমূলক বিভ্রান্তিকর ঘটনা বা প্রসঙ্গকে তিনি অনায়াস-পটুত্বে নাট্যগ্রন্থি দিয়ে বেঁধে ফেলতে পারেন। ষাটের দশকে এল টি জি গ্রুপের ফেরারি ফৌজ, কল্লোল, রাইফেল তিনটি নাটকই সমকালীন ইতিহাসের ঘটনাবলীর ভাষ্যে, সুসংগঠিত সমবেত অভিনয়ে, এবং বিস্ফোরক বক্তব্যে নাট্যাবিষ্ট দর্শকদের গভীরভাবে আন্দোলিত করেছিল। সত্তরের দশকেও উৎপল দত্তের নবগঠিত লিট্ল থিয়েটার গোষ্ঠীর প্রযোজনা ও অভিনয় পদ্ধতিতে বিশেষ পরিবর্তন ঘটে নি— বরং তা বিষয়ের বৈচিত্র্যে আরো ব্যাপ্তি পেয়েছে, বক্তব্যের উগ্রতার সঙ্গে সৌন্দর্যচেতনা ও চোখধাঁধানো মঞ্চকল্পনা এনেছে নতুন মাত্রা। অন্তর্বর্তী সময়ে বিবেক নাট্যসমাজ (১৯৬৯) গঠন করে তিনি যাত্রার আঙ্গিককেও সার্থকভাবে ব্যবহার করেছেন নাট্যপ্রচারের প্রয়োজনে শোন রে মানিক, ঠিকানা ইত্যাদি নাটকে। মাঝে মাঝে গিরিশচন্দ্র মধুসূদন রবীন্দ্রনাথ বা শেক্সপিয়ারের নাটকে অভিনয় করলেও অভিনেতা-নির্দেশক উৎপল দত্তকে একান্তভাবেই নির্ভর করতে হয় নাট্যকার উৎপল দত্তের উপর। সত্তরের দশকে তিনি উপহার দিয়েছেন টোটা, এবার রাজার পালা, বর্গি এল দেশে, ব্যারিকেড, দুঃস্বপ্নের নগরী, লেনিন কোথায়, তিতুমির, চক্রান্ত, সূর্য শিকার, বাংলা ছাড়ো স্টালিন, ১৯৩৪ প্রভৃতি বজ্রনাদী নাটকগুলি। এরই পাশে মধুসূদনের অনুরাগী উৎপল উপহার দিয়েছেন টিনের তলোয়ার, দাঁড়াও পথিকবর-এর মতো উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের কলকাতার গন্ধে-ভরা সর্বজনধন্য গভীর রসের নাটক। প্রাচীন ভারতের গুপ্ত যুগ (সূর্য শিকার) থেকে স্বাধীনতাপূর্বের সন্ত্রাসবাদ (ফেরারি ফৌজ), নৌ বিদ্রোহ (কল্লোল), সন্ন্যাস বিদ্রোহ (সন্ন্যাসীর তরবারি), নকশালবাড়ি আন্দোলন (তীর), এমন-কি, অযোধ্যার বাবরি মসজিদ রাম জন্মভূমি বিষয়ক ধর্মীয় মৌলবাদ (জনতার আফিস) এই-সব প্রসঙ্গ ও তার বিশ্লেষণসূত্র উৎপল দত্ত মঞ্চে এনেছেন অতীত সমকালের কাহিনীকে, ইতিহাসের প্রতিবেদনরূপে নয়, শ্রেণীসংগ্রাম ও বিপ্লবের ভাষ্যে শোষণমুক্তির সংগ্রামের হাতিয়ার হিসেবে। গণনাট্য সঙ্ঘ ছাড়া এত প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক চেতনায় উদ্দীপ্ত, কমিটেড থিয়েটার-এর সপক্ষে উচ্চকণ্ঠ, স্পর্ধাপরায়ণ নাট্যকার এবং নাট্যদল ভারতে দ্বিতীয় নেই বললেই হয়। আশির দশক থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত রচিত তাঁর একলা চলো রে, লাল দুর্গ, দৈনিক বাজার পত্রিকা, জনতার আফিস প্রভৃতি প্রযোজনা এই নাট্যগোষ্ঠীর ঐতিহ্য ও প্রবণতার মান অক্ষুণ্ণ রেখে চলেছে। ১৯৭৪-এ অভিনীত দুঃস্বপ্নের নগরী-র বিরুদ্ধে তৎকালীন সরকার ফৌজদারি বিধির ১২৪ক ধারায় রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ এনেছিল। একালের অন্য কোনো নাটকে শ্রেণীবিশেষের প্রতি আক্রমণাত্মক বক্তব্যের জন্যে সরকারি স্তরে এত বিচলন দেখা যায় নি। সত্তরের দশকের নগর কলকাতার দুঃস্বপ্ন-লাঞ্ছিত দিনগুলির স্মৃতিও অন্য কোনো নাটকে এত জীবন্ত হয়ে ওঠে নি।[১৮]

লিট্ল থিয়েটারের কমিটমেন্ট বহুরূপীর নেই, কিন্তু প্রগতিশীল নাট্য-আন্দোলনে বহুরূপীর ভূমিকা ইতিবাচক

সংস্রব ছিন্ন করে গড়ে তোলেন নান্দীমুখ। অবশ্য অজিতেশের অচির মৃত্যু এই গোষ্ঠীর ইতিহাসেও কোনো ঐতিহ্য গড়ে তোলার সুযোগ দেয় নি। প্রযোজক-পরিচালক ছাড়াও নাট্যকার প্লেরাইট হিসেবে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় আলোচ্য পর্বের উজ্জ্বল এক ব্যক্তিত্ব।[২৯]

ছয়

শৌভনিক শেষ-পঞ্চাশ থেকে মধ্য-ষাটে কলকাতার নাট্য ইতিহাসে স্বস্থান পাকা করে নিয়েছিল মুখ্যত দুটি কারণে। প্রথমটি হল, ১৯৬০-এ কলকাতায় প্রথম মুক্তাঙ্গন তৈরি করে, দ্বিতীয়টি, দলগত নাট্যাভিনয়ের প্রভূত সম্ভাবনার দরজা খুলে দিয়ে।[৩০]

মৌলিক নাটক অনুবাদ-রূপান্তর নাটক ও রবীন্দ্রনাটক তিন ক্ষেত্রেই শৌভনিকের তালিকা দীর্ঘ।[৩১] ষাটের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে শৌভনিক নাট্যামোদীদের উপহার দিয়েছে— এবং ইন্দ্রজিৎ (বাদল সরকার), অমৃতস্য পুত্রাঃ (রতনকুমার ঘোষ), নোনা জল মিঠে মাটি (প্রফুল্ল রায়)। সত্তরের দশকের কয়েকটি মৌলিক নাটক— শেষ কণ্ঠস্বর (চিনু দাস), ছুটির ফাঁদে (সমরেশ বসু), স্থানীয় সংবাদ (শঙ্কর), এক দুই তিন (নারায়ণ সান্যাল), বি টি রোডের ধারে (সমরেশ বসু), থাকে সাধু (পার্থপ্রতিম চৌধুরী), ভাগলপুরের শরৎচন্দ্র (সন্তোষ সেন), নাটের গুরু (সমরেশ বসু), অভিশপ্ত চম্বল (শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক নাট্যীকৃত), পাতা ঝরে যায় (বুদ্ধদেব বসু), উপসংহার ও ছুটি (অচিন্ত্য সেনগুপ্ত), এরা কারা, নাজি ৭৪, ও একটি ব্যক্তিগত গল্প (বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়), কেন্দ্রবিন্দু (সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়)।

আশির দশকে শৌভনিক-প্রযোজিত মৌলিক নাটকের সংখ্যা বেড়ে গেছে। বাংলা নাটক ভাবে গঠনে চরিত্রনির্মাণে সংলাপে ও জীবনের বহুমুখী রূপায়ণে ক্রমশ পরিণত হয়ে উঠেছে। এই দশকের দর্শক-উপভোগ্য কয়েকটি নাটক —ঘুঘু (বিমল কর), ব্রজ সংবাদ, আয়না, একটি বাস্তব গল্প (বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়), ঘোমটা (মনোজ মিত্র), অবশেষে, রাম নাম কেবলম্ (সমরেশ বসু), বাবলা কাঁটা (সন্তু বসু), পরিচয় (জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়), সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ (বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়) প্রভৃতি। তখ্‌ত এ তাউস প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর কাহিনী অবলম্বনে শৌভনিক-এর সাম্প্রতিক প্রযোজনা।

অনুবাদ-রূপান্তরের ক্ষেত্রেও শৌভনিক-এর বিশিষ্টতা লক্ষ্য করেছেন নাট্যামোদীরা। শেক্‌সপিয়ারের মার্চেন্ট অফ ভেনিস্ ও ওথেলো-র অভিনয় করেছেন তাঁরা ১৯৬৪ সালে, মহাকবির চতুর্থ জন্মশতবর্ষে। আনুই-এর আন্তিগোনে (১৯৬৯), নান্দীকারের অভিনয়ের ছ-বছর আগেই এঁরা মঞ্চস্থ করেছেন। তা ছাড়া ক্যারল চ্যাপেকের হয়তো সেদিন (১৯৭২), জ্ঞানদেব অগ্নিহোত্রীর উট পাখি (১৯৭৩), এডোয়ার্ড এলবি-র মলাটের রঙ মুহূর্ত (১৯৭৩) এবং চিড়িয়াখানার গল্প (১৯৭৫), মোহন রাকেশ-এর আধে আধুরে (১৯৭৩), রমেশ মেহতা-র যা নয় তাই (১৯৭৯), অগাথা ক্রিস্টির ইঁদুর কল (১৯৮১), ফ্রেডরিক নট-এর আঁধার পেরিয়ে (১৯৯১) এঁরা উপহার দিয়েছেন।

সুন্দরম্-এর জন্ম ১৯৫৭ সালে, সেই থেকে আজ পর্যন্ত একাধিক পরিচালকের এবং বর্তমানে বিশিষ্ট নাট্যকার মনোজ মিত্রের নেতৃত্বে বাংলা নাটককে তাঁরা সম্পন্ন করে তুলেছেন। ষাটের দশকের শেষ দিকে পার্থপ্রতিম চৌধুরীর চার দেওয়ালের গল্প, কৃষ্ণচূড়ার মৃত্যু, শব্দরূপ ধাতুরূপ (প্রকাশক সিটি বুক এজেন্সি, ১৯৭৩), কাঁচা নাটকগুলিতে মানবিক আবেগের সঙ্গে মধ্যবিত্ত জীবনের বৈচিত্র্যের স্বাদ পাওয়া যায়। মনোজ মিত্রের নাটকেও সেই ঐতিহ্যেরই অনুবর্তন ঘটেছে। সত্তরের দশকের পরবাস, সাজানো বাগান, মেষ ও রাক্ষস, আশির দশকের

নৈশভোজ, শোভাযাত্রা, অলকানন্দার পুত্রকন্যা নাটকগুলির মঞ্চাবেদন আজও অক্ষুণ্ণ আছে ।[৩২]

ষাটের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে মাস থিয়েটার্স (১৯৬০)-এর নিবেদন শকুন্তলা রায় (অজিত গঙ্গোপাধ্যায়) দ্বন্দ্বজটিল জীবননাট্যের বলিষ্ঠ রূপায়ণ হিসেবে নজর কেড়েছিল । মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী নিয়ে অরুণ মুখোপাধ্যায়-কর্তৃক নাট্যায়িত হারানের নাতজামাই (প্রকাশক জাতীয় সাহিত্য পরিষদ) সত্তরের দশকে ছিল মাস থিয়েটার্সের সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রযোজনা । উৎপল দত্তের ক্রুশবিদ্ধ কুবা (ব্রেশ্‌ট সোসাইটি অফ ইণ্ডিয়া) জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় এলটিজি-র প্রযোজনাগুলিরই সমতুল্য গণ্য হয়েছিল ।

রূপকার গোষ্ঠী (১৯৫৫) গড়ে তুলেছিলেন সবিতাব্রত দত্ত । পঞ্চাশ-ষাটের দশকে তুলসী লাহিড়ীর বেশ-কয়েকটি নাটক তাঁরা মঞ্চস্থ করেন এবং অমৃতলাল বসুর ব্যাপিকা বিদায় নাটকটিকে অসাধারণ জনপ্রিয় করে তোলেন । সত্তরের দশকে তাঁদের প্রযোজনা কম, সংগঠনও দুর্বল ছিল । মধ্যবর্তী পর্বে এঁদের উল্লেখ্য প্রযোজনা মুকুন্দ দাস (বীরু মুখোপাধ্যায়), নিধুবাবুর টপ্‌পা (শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গ্রন্থালয়, ১৯৭৯), এণ্টনি কবিয়াল (বিধায়ক ভট্টাচার্য), নজরুল [৩৩] (মধু গোস্বামী), লালন ফকির (মন্মথ রায়)—এই ধরনের গীতিবহুল জীবনীমূলক নাটকের জনপ্রিয়তার পিছনে গায়ক-নট সবিতাব্রত দত্তের ভূমিকাই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ।

গন্ধর্ব (১৯৫৭) মূলত অনূদিত-রূপান্তরিত নাটকই মঞ্চস্থ করেছেন বেশি । তাঁদের প্রযোজনা থানা থেকে আসছি (অজিত গঙ্গোপাধ্যায়-রূপান্তরিত জে বি প্রিস্টলির নাটক দ্য ইনস্‌পেকটর কল্‌স, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ ১৩৬৪), মধুচক্র (উৎপল দত্ত-রূপান্তরিত বার্নার্ড শ-র মিসেস ওয়ারেন্‌স প্রফেসন), একা নয় (ম্যাকসিম গোর্কি), অনিরুদ্ধ (সার্ত্রে) সবই রূপান্তরিত নাটক । মৌলিক নাটক ফুলওয়ালি (কৃষ্ণ ধর), মজার মজা (দেবকুমার ভট্টাচার্য) এবং সাম্প্রতিক নিয়মভঙ্গ ।

প্রসিদ্ধ অভিনেতা-অভিনেত্রী শেখর চট্টোপাধ্যায় সাধনা রায়চৌধুরীর হাতে-গড়া থিয়েটার ইউনিট (১৯৫৮) তিন দশকের বেশি সময় ধরে অনুবাদ-নাটক মৌলিক নাটক রবীন্দ্রনাটক প্রযোজনা করেছেন । সত্তর দশকের ইউনিট-প্রযোজনা ফরিয়াদ ও জন্মভূমি-র নাট্যকার ছিলেন শেখর চট্টোপাধ্যায় স্বয়ং । জন্মভূমি কৃষক আন্দোলনের উপর শেখর চট্টোপাধ্যায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক, চলচ্চিত্রে বসুন্ধরা নামে রূপায়িত হয়েছিল । জজ সাহেব নাটকেও তাঁর পেশাদার গুণপনা প্রকাশ পেয়েছে । গিরিশ কারনাডের প্রসিদ্ধ তুঘলক নাটকটিকে তিনিই বাঙালি দর্শকদের কাছে পরিচিত করান । ব্রেশ্‌ট-এর বঙ্গীয় রূপকার হিসেবেও তাঁর কিছু খ্যাতি পাওনা হয় । ব্রেশ্‌ট অবলম্বনে পস্তু লাহা এবং আরতুরো উই, ডুরেন ম্যাট-এর নাটক অবলম্বনে অতিথি, ফ্রান্‌জ জাভের কোয়েৎস-এর নাটক অবলম্বনে এতটুকু বাসা, সত্তরের দশকের কয়েকটি স্মরণযোগ্য প্রযোজনা । শেক্‌সপিয়রের টেমিং অফ দ্য শ্রু-র রূপান্তর শ্রীমতী ভয়ঙ্করী আশির দশকে খ্যাতি পেয়েছিল । একাঙ্ক নাটক উপস্থাপনাতেও তাঁর কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে ।[৩৪] ১৯৮৮ সালে তিনি গড়ে তোলেন নতুন দল ইউনিট থিয়েটার নামে এবং সেই ব্যানারে কৃষ্ণাঙ্গ কবি বেঞ্জামিন মোলায়েজ-এর জীবন নিয়ে অলোক ভট্টাচার্য-রচিত আজ যুদ্ধ ঘোষণার দিন মঞ্চস্থ করেন । ১৯৮৯ সালে তাঁর অকালবিয়োগে বাংলার নাট্যজগৎ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ।

সাত

ষাটের দশকের শেষ থেকে গান্ধার গোষ্ঠীর নাট্যতালিকায় রবীন্দ্রনাটকের প্রযোজনা, মৌলিক ও রূপান্তরিত নাটক সবই পাওয়া যায় । সত্তরের দশক পর্যন্ত তাদের নিবেদন-তালিকায় উল্লেখ্য কবর থেকে বলছি (মধু গুপ্ত), নতুন তারা (অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত), তারারা শোনে না (চাণক্য সেন), পুনর্মিলন (বুদ্ধদেব বসু), অথ থানা পুলিশ কথা

(বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়), অপার্থিব (সন্তোষকুমার ঘোষ), ঘোড়া (জুলিয়াস হে), পুরনো আসর (আর্থার মিলার), কুমারসম্ভব (চাণক্য সেন), নীলাম নীলাম (আর্থার মিলার) ইত্যাদি। সম্প্রতি প্রযোজিত নাটকের মধ্যে আঙ্কলভানিয়া (চেখভ)-র রূপান্তর ভম্মা প্রশংসা পেয়েছে।

গান্ধার গোষ্ঠীর অধিকাংশ নাটকই সমাজ সচেতন, রাজনীতিমনস্ক ও বক্তব্যসজাগ। তাদের অনুবাদ-রূপান্তর নির্বাচনেও সেই সতর্কতা সক্রিয় থাকে। তাই নীলাম নীলাম নাটকে একালের মানুষের আত্মকেন্দ্রিকতা পারিবারিক বন্ধনকে কী ভাবে মূল্যহীন করে তার বিষণ্ণ রূপটি খুঁজে পাওয়া যায়। হে-র ঘোড়া নাটকে কৌতুক থাকলেও মানুষের কিছু মৌলিক দুষ্প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে আঘাত হানা হয়েছে। চাণক্য সেনের অরাজনৈতিক নাটকের ভিতর দিয়ে শাসক সম্প্রদায়ের দুর্নীতি-পোষকতা, কালোবাজারি অন্যায় অবিচার ও মূল্যবোধভ্রষ্টতার মধ্যে ব্যক্তির অসহায়তাকে তুলে ধরা হয়েছে।

শূদ্রক (১৯৭৭)-এর আশির দশকে প্রযোজিত অমিত্রাক্ষর, সমাবর্তন, ঈশাবাস্য, অসমাপ্ত ও স্বল্পসন্ততি নাটকগুলি দেবাশিস মজুমদার নামের এক প্রতিশ্রুতিময় নাট্যকারের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটায়।

থিয়েটার সেণ্টার (১৯৫৫) দীর্ঘদিন কলকাতার নাট্যআন্দোলনের সঙ্গে জড়িত এবং তাদের নিজস্ব অনতিপ্রসর মঞ্চে বহু নাট্যগোষ্ঠীকে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও প্রযোজনার সুযোগ করে দিয়েছে। এঁদের প্রধান রূপকার নাট্যকার-অভিনেতা-নির্দেশক তরুণ রায় (ধনঞ্জয় বৈরাগী নামেও পরিচিতি দিয়েছেন নাটকে) লিখিত ও অভিনীত নাটকের ভিতর আছে ষাট ও সত্তরের দশকে, পরাজিত নায়ক (করুণা প্রকাশনী), পুড়েও যা পোড়ে না, অথচ সংযুক্তা (পুস্তক বিপণি), ত্রিশূল, কেঁচো খুঁড়তে সাপ (সিটি বুক এজেন্সি), এক মুঠো আকাশ প্রভৃতি। আশির দশকের নাটক ঈশ্বর, অর্কিড, আজ কাল পরশু প্রভৃতি। অন্যান্য নাটক—দিবা রাত্রির কাব্য (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়), দৃষ্টির অক্ষর (পার্থপ্রতিম চৌধুরী), ভাসান (তথাগত চক্রবর্তী), হুসেন শাহ ও দেবী চন্দ্রগুপ্ত (বারীন্দ্রনাথ দাস), শব্দলিপি (মনোরঞ্জন দাস) প্রভৃতি। তবে সমকালীন রাজনৈতিক জীবন, গণ আন্দোলন, বিপ্লবচেতনা বা গণনাট্য আন্দোলনের কোনো প্রভাব এঁদের প্রযোজিত নাটকে দুর্লভ। তরুণ রায় -রচিত নাটক অন্য মঞ্চেও অভিনীত হয়েছে এবং তিনি কিছুকাল পেশাদার মঞ্চেও পেশাদার ভিত্তিতে পরিচালনা করেছেন। প্রয়াত তরুণ রায় সাম্প্রতিক বাংলার বিশিষ্ট নাট্যকার।

ষাটের দ্বিতীয়ার্ধে এবং সত্তরের গোড়ায় নক্ষত্র (১৯৬৬) গোষ্ঠীর কয়েকটি সাড়াতোলা প্রযোজনায় মৌলিক ও রূপান্তরিত দুই নাটকই দেখা গেছে। মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের তথাকথিত অ্যাবসার্ড বা কিমিতিবাদী নাটক চন্দ্রলোকে অগ্নিকাণ্ড, ক্যাপ্টেন হুররা, সোনার চাবি, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নানারঙের দিন, উৎপল দত্তের দেশদ্রোহী, নবেন্দু সেনের নয়ন কবীরের পালা, রিচার্ড ন্যাসের কাহিনী অবলম্বনে বৃষ্টি বৃষ্টি, অবনীন্দ্রনাথের লম্বকর্ণপালা এঁদেরই বিশিষ্ট উপস্থাপন। অনেকের মতে সার্থক ও সর্বাধিক কিমিতিবাদী নাটকের উপস্থাপনার গৌরব নক্ষত্রগোষ্ঠীরই প্রাপ্য। মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের সোক্রাতেস (পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি পত্রিকার জানুয়ারি ১৯৯২ ২য় সংখ্যায় প্রকাশিত) তাঁদের সাম্প্রতিক প্রযোজনা। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে মানুষের স্নেহ প্রেম মমতা এমন-কি, বেঁচে থাকার ইচ্ছার উপর ক্রমাগত আক্রমণ চলেছে প্রতাপান্বিত শ্রেণীর পক্ষ থেকে। তারই অনিবার্য সংঘাতকাহিনী চন্দ্রলোকে অগ্নিকাণ্ড। ক্যাপ্টেন হুররা নাটকেও একটি পথের প্রতীকে সমাজের ছোটো বড়ো ভালোমন্দের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের আয়োজন ঘটেছে। নক্ষত্র গোষ্ঠীর নির্দেশক-নট শ্যামল ঘোষের প্রেতায়িত স্বপ্ন এবং অন্য-অভিনেতা শ্যামল সেনগুপ্তের খড়ের মানুষ নাটক দুটিও উল্লেখযোগ্য রচনা।

নিউ থিয়েটার্স গ্রুপের আবির্ভাব সত্তর দশকের শেষ প্রান্তে। আশির দশকে তাদের সংগঠিত শক্তি ও অভিনয়নৈপুণ্য এনে দিয়েছে প্রতিষ্ঠা। পথচলা, সওয়াল, আশ্চর্য প্রদীপ, নিহত নিয়তি প্রভৃতি নাটকের পর

নাট্যকার দীপেন্দ্র সেনগুপ্তের গাব্বুখেলা এই পর্বের স্মরণীয় প্রযোজনা (প্রকাশক নবগ্রন্থ কুটির)। তা ছাড়া ডুব, রাজকাহিনী এই দুটিও তাদের সাম্প্রতিক সফল প্রযোজনা।

সমীক্ষণ গোষ্ঠীর তোতারাম (মোহিত চট্টোপাধ্যায়), স্বদেশী নকশা (প্রমথ চৌধুরীর রাম শ্যাম অবলম্বনে মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাট্যরূপান্তর) সত্তর দশকের দর্শকদের খুশি করেছিল। সায়ক গোষ্ঠীর যদি স্বপ্ন (ব্রেশ্‌ট-এর কাহিনী-রূপান্তর) এবং বেওকুফ (বারীন্দ্রনাথ দাস) আশির দশকের জনপ্রিয় প্রযোজনা। দুই হুজুরের গল্প (চন্দন সেন) নব্বইয়ের দশকেও সমান জনপ্রিয়। নান্দীপটের শ্বেত সন্ত্রাস ক্যারল চ্যাপেকের এই কাহিনীর নাট্যরূপ বর্তমান নব্বই শতকে সমানভাবে দর্শকদের সমাদর পেয়ে চলেছে। চারণ দলের কয়েকটি প্রযোজনাও উল্লেখনীয়, যথা—এই দশকের অভিমন্যু এবং প্রবাহ (দুটিরই নাট্যকার অলোক রায়চৌধুরী), উপনয়ন (চন্দন সেন)। অনুবাদ-রূপান্তর পর্যায়ে চারণ দল পিপিং অপেরার দ্য রেড ল্যান্টার্ন-এর সলিল রায় -রূপান্তরিত লাল লণ্ঠন ও সার্ত্রের দ্য রেসপেক্‌টেবল প্রস্টিটিউট অবলম্বনে অলোক রায়চৌধুরী-কৃত আদিত্য বর্ণ অভিনয় করে সম্মান পেয়েছেন। ষাটের দশকে গড়ে-ওঠা থিয়েটার ওয়ার্কশপ ঐ দশকে ললিতা ও ছায়ায় ছায়ায় দুটি নাটক পরিবেশন করেছিলেন, কোনোটাই মৌলিক নয়। সত্তরের দশকে তাদের সার্থকতম প্রযোজনা ১৯৭৬-এ চাকভাঙা মধু (মনোজ মিত্র)। তা ছাড়া ১৯৭১-এ রাজরক্ত (মোহিত চট্টোপাধ্যায়), ১৯৭৬-এ নরক গুলজার (মনোজ মিত্র) সবই দশক-সত্তরের প্রথম শ্রেণীর নাটক (মনোজ মিত্রের সব নাটকের প্রকাশক নবগ্রন্থ কুটির)। তক্ষক (অশোক মুখোপাধ্যায়) ও বাজপাখি (রাম মুখোপাধ্যায়) নাটক দুটির বিষয়গত অভিনবত্ব প্রশংসনীয়। অন্য থিয়েটার, থিয়েটার ওয়ার্কশপের একদা-নির্দেশক বিভাস চক্রবর্তীর গড়ে-তোলা নতুন নাট্যগোষ্ঠী। তিনি মাধব মালঞ্চী কইন্যায় (১৯৮৮) একটি বাংলাদেশী লোকগীতিকাকে রূপকথা ফ্যানটাসি ও অপেরার আঙ্গিকে মিশিয়ে শিল্পরূপ দিয়েছেন। অন্য থিয়েটার (১৯৮৫)-এর আশির দশকের প্রযোজনা ভোরিও ফো-র ট্রামপেট্‌স অ্যাণ্ড রাস্‌প বেরিজ অবলম্বনে হচ্ছে টা-কী তত উচ্চাঙ্গের না হলেও ব্রেশ্‌ট অবলম্বনে সোয়াইক গেল যুদ্ধে একটি অসামান্য প্রযোজনা। এটি ইতিপূর্বে থিয়েটার ওয়ার্কশপ-এর ব্যানারে মঞ্চস্থ হয়। থিয়েটার ওয়ার্কশপের মৌলিক নাটক প্রযোজনাও সাম্প্রতিক বাংলা নাটকের অধ্যায়ে শ্লাঘনীয়। বিভাস চক্রবর্তীর স্বরচিত একাঙ্ক ভিয়েতনাম (১৯৬৭), উৎপল দত্তের হাঁড়ি ফাটিবে (১৯৬৯), সত্যেন মিত্র -রচিত চাই হৃদয় চাই (১৯৭০), মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের মহাকালীর বাচ্ছা (১৯৭২), মনোজ মিত্রের অশ্বত্থামা (১৯৭৪), প্রেমচাঁদ-অনুপ্রাণিত লাঠি (১৯৮০), ক্ষীরোদপ্রসাদ-অনুপ্রাণিত আলিবাবা (১৯৮৯), বাদল সরকারের ত্রিংশ শতাব্দী (১৯৭৫. বহুরূপীও পূর্বে প্রযোজনা করেছে), উমানাথ ভট্টাচার্যের দিবা রাত্রি (১৯৮৪)—প্রায় সবগুলিতেই এই নাট্যগোষ্ঠীর নাট্যনির্বাচন ও প্রযোজনার খ্যাতি অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। বিভাস চক্রবর্তী অনুবাদ-রূপান্তর নাটকে অজিতেশ নান্দীকারের ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রেখেছেন এবং একাল বাংলার নাট্যপ্রযোজনার সীমা অবশ্যই বৈচিত্র্য প্রসারিত করেছেন। চেখভের দ্য বিয়ার অবলম্বনে মংলি (১৯৬৭), সঁা ও' কেসির জুনো অ্যাণ্ড দ্য পেকক অবলম্বনে ছায়ায় আলোয় (১৯৬৭), জাঁ পল সার্ত্রের লা পি রেস্পেকটুয়েজ অবলম্বনে ললিতা (১৯৬৬) থেকে তাঁর এই বিদেশী নাট্যবস্তুর বঙ্গীয় নাট্যপ্রযোজনার সূত্রপাত। পরবর্তী সময়ে ব্রেশ্‌ট-এর ইন সার্চ অফ জাস্টিস-এর রূপান্তর নাজীর বিচার (১৯৭২), লাক্‌স ইন টেনেড্রিস-এর রূপান্তর পাঁচু ও মাসি (১৯৭২), সোয়াইক ইন দ্য সেকেণ্ড ওয়ার্লড় ওয়ার-এর রূপান্তর সোয়াইক গেল যুদ্ধে (১৯৮১), টলস্টয়ের ইট ইজ দ্য কজ.অফ অল-এর রূপান্তর দ্রব্যগুণ (১৯৮০), আরনল্‌ড ওয়েস্কার-এর চিকেন স্যুপ উইথ দ্য বার্লি-র বেলা অবেলার গল্প (১৯৮৬) এবং উইলসন-এর নাট্যরূপান্তর বেড়া (১৯৯১)— প্রায় সবগুলিই যথেষ্ট পরিণত ও বয়স্ক প্রযোজনা।[৩৫]

অরুণ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে গড়ে-ওঠা চেতনা (১৯৭২) প্রখর নাট্যচেতনার অন্যতম সাম্প্রতিক

চর্চাকেন্দ্র। তাঁরই রচিত-নির্দেশিত সুরারোপিত মারীচ সংবাদ (১৯৭৩) আজও বিস্ময়কর রকমের আধুনিক মঞ্চসফল প্রযোজনা। যে ব্রেশ্‌ট কাহিনী অবলম্বনে অজিতেশ ভালোমানুষ করেছিলেন (১৯৭৪) এবং দর্শক-অভিনন্দনও পেয়েছিলেন, সেই কাহিনীকেই প্রায় অব্যবহিত পরে মঞ্চে তুললেন চেতনার পক্ষ থেকে অরুণ মুখোপাধ্যায় ভালোমানুষের পালা নামে, সমাদরেরও অভাব হয় নি। মৌলিক রূপান্তর উভয় ক্ষেত্রেই চেতনার খ্যাতি। মৌলিক রাসযাত্রা (১৯৭৫) এবং রূপান্তরিত স্পার্টাকাস (হাওয়ার্ড ফাস্ট), জগন্নাথ (লু সুনের একটি গল্পের প্রেরণায়), সমাধান এবং উলকি (দুটিই ব্রেশ্‌টীয়), অতি সাম্প্রতিক প্রযোজনা কবীর (ভীষ্ম সাহনির কাহিনী) —অরুণ মুখোপাধ্যায়কে নাট্যকার ও নির্দেশকরূপে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে।[৩৬]

থিয়েটার কমিউন চেতনার সমসাময়িক এবং এঁদের সংগঠক নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত শক্তিমান নট নাট্যকার ও নির্দেশক। উইলিয়াম সারোয়ান-এর ট্রেসিস টাইগার অবলম্বনে বিভুর বাঘ (১৯৭২), যোশেফ হেলার-এর উই বম্‌ড় ইন নিউহ্যাভেন অবলম্বনে পরবর্তী বিমান আক্রমণ (১৯৭৩), ব্রেশ্‌ট-এর ছোটোগল্প অবলম্বনে জুলিয়াস সিজারের শেষ সাতদিন (১৯৮৩) নীলকণ্ঠ সেনগুপ্তের নাট্যরূপান্তর-প্রতিভার পরিচায়ক। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাহিনী থেকে তিনি জীবিকা নাটক করেছেন (১৯৮১), মহাশ্বেতা দেবীর কাহিনী নিয়ে করেছেন মহামাস তৈল (১৯৮৬)। তাঁর নিজের লেখা নাটক কিংকিং (১৯৭৩), প্রস্তুতি (১৯৭৪)।

চার্বাক-এর প্রযোজনা অধিকাংশই মৌলিক নাটক, নাট্যকার জোছন দস্তিদার। এঁদের গদ্য-পদ্য-প্রবন্ধ (জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৯৭৬), কুমিরের কান্না (১৯৭৭), ঠ্যাঙাড়ে (১৯৭৭), আজকের স্পার্টাকাস (১৯৭৭), কর্ণিক (১৯৭৮), এ এক ইতিহাস (১৯৮০), পরিচয় (১৯৮১) ছাড়াও দুই মহল (জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ৭ম সং ১৩৭৯) পূর্বে বহুবার অভিনীত হয়েছে। নবারুণ (জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৭৫), স্বর্ণগ্রন্থি (জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৭০) এই দুটি নাটকেই অভিনয়-সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না। চার্বাকের সাম্প্রতিক দশ-বারো বছরের নাটকের মধ্যে সতী (১৯৮৭) ও বানজারা (১৯৯১) দুটি এখনো নিয়মিত মঞ্চস্থ হচ্ছে।[৩৭]

সাম্প্রতিক কালের আরো কয়েকটি নাটক থেকে হাল আমলের বাংলা নাটক ও প্রবণতার ধারণা স্পষ্ট হবে। পরিচ্ছন্ন বক্তব্য, সাবলীল অভিনয় সুগঠিত টিম এবং দলগত অভিনয়, প্রগতিশীল পজিটিভ দৃষ্টিভঙ্গি মোটামুটি একালের প্রায় সব নাটকেই দর্শক প্রত্যাশা করেন। মাঙ্গলিকের মানুষভূত (সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ), নান্দীকারের ১ থেকে ১২ (স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত), রঙরূপের ভাঙা বনেদ (সীমা মুখোপাধ্যায়), সায়নের দায়বদ্ধ (চন্দন সেন), বেসিক থিয়েটারের কন্যাদান (বিজয় তেণ্ডুলকর), নাট্যার্ঘ্য গ্রুপের খবরে প্রকাশ (সুভাষ সেনগুপ্ত), গান্ধারের তখনও বিকেল (মোহিত চট্টোপাধ্যায়), নান্দীমুখের পাপপুণ্য, কয়েকটিমাত্র উল্লিখিত হল। তা ছাড়া, চেনা মুখ (১৯৮১)-এর বাণী কাহিনী (নাট্যকার উগো বেত্তি), আগশুদ্ধি (নাট্যকার আর্থার মিলার), শরণাগত (কাহিনী সমরেশ মজুমদার), পাখি (চেখভ), বিশিষ্ট নাট্যদল হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।[৩৮] অনসম্বল গোষ্ঠীর ইহুদি স্ত্রী ও গুপ্তচর (ব্রেশ্‌ট কাহিনী), আবার দেখা হবে (মূল নাটক বোথো স্ট্রস), উত্তরাধিকার (নাট্যকার এলকুওহওয়ার) যথারীতি রূপান্তরিত নাটকের বঙ্গীয় ঐতিহ্য রক্ষা করে চলেছে।[৩৯] থিয়েট্রন-এর আবির্ভাব বস্তুত বুদ্ধদেব বসুর নাটক ও কাব্যনাট্য প্রথম পার্থ ও সংক্রান্তি (১৯৭৮), তপস্বী ও তরঙ্গিণী (১৯৭৯) দিয়ে। তার পর এঁদের নিবেদন গিরিশ কারনাডের তুঘলক (১৯৭৯), ইউরিপিদিসের মেদিয়া (১৯৮৩), শেক্‌সপিয়ারের রাজা লীয়র (১৯৮৬), ইবসেনের শাদা ঘোড়া (১৯৮৮) সবই অনুবাদ-রূপান্তরে পথ বদল করেছে।[৪০] নাট্যরঙ্গ (১৯৭২) গোষ্ঠী তিন শতকের ইতিহাসে অনেক নাটক দর্শকদের কাছে পেশ করেছেন, তবে চমক-লাগানো নাটক বা প্রযোজনা তেমন নেই, এঁরা মৌলিক নাটক আন্দোলনের পন্থী। এঁদের প্রযোজনার কয়েকটি: স্বপ্ন নয় (স্বপন সরকার), এবার বিচারের পালা (আহ্লাদ গঙ্গোপাধ্যায়), ইতিহাসের মৃত্যু (অগ্নিদূত), রাজযোটক (অগ্নিদূত), হইতে সাবধান (রাধারমণ

ঘোষ), আর সব ভস্ম (সুনীল চক্রবর্তী), বেওয়ারিশ (সুনীল চক্রবর্তী), বিবেক বিশ্বাস নিহত (পার্থ চক্রবর্তী), শিবের অসাধ্য (মনোজ মিত্র), চৌরাস্তার কুয়া (রমেন চক্রবর্তী), সত্তরের দশকের নাটক । আশির দশক থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত এঁরা নাটক করেছেন বীরসা মুণ্ডা (পার্থ চক্রবর্তী), কেনারাম বেচারাম (মনোজ মিত্র), তেঁতুল নাট্য (মনোজ মিত্র), পাঁকাল (রহমন চক্রবর্তী), অবরুদ্ধ পিসা (সুরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়), সূর্য শিকার (উৎপল দত্ত), রক্তবীজ (দেবাশিস মুখোপাধ্যায়), চোখে আঙুল দাদা (মনোজ মিত্র), একদিন স্বপ্নে (শৈলেশ গুহ নিয়োগী), বিধান (দেবাশিস মজুমদার) প্রভৃতি ।

আট

একটি পুনরুক্তি : এ কালে বাংলা নাটক যত অভিনীত হয় তার এক-চতুর্থাংশ প্রকাশিত হয় না । অন্য দিক থেকে এ কথাও বলা যায়, সব প্রকাশিত নাটকের অর্ধাংশও অভিনীত হয় কিনা সন্দেহ । অবশ্য শৌখিন নাট্য দলের অথবা অফিসপাড়ার অভিনয়ের সংবাদ সংগ্রহ অসম্ভব । জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, নবগ্রন্থ কুটির প্রভৃতি প্রকাশক সংস্থা যথেষ্ট নাটক প্রকাশ করেছেন কিন্তু তাঁদের গ্রন্থ তালিকায় প্রকাশকাল উল্লিখিত হয় না বলে তালিকা থেকে নাট্য পরিচিতি সম্পূর্ণতা পায় না । একালের প্রকাশকরা অনেকেই মাঝে মধ্যে নাট্যগ্রন্থ প্রকাশ করে থাকেন, কিন্তু তার প্রচার-বিজ্ঞাপনে কার্পণ্য ঘটে । সাহিত্য পত্রিকায় গ্রন্থপরিচয়ে প্রকাশিত নাটকের সমালোচনা কদাচিৎ প্রকাশিত হয়, অভিনীত নাটকের নিয়মিত রিভিউ দৈনিক সাপ্তাহিকে মেলে । প্রকাশিত বহু নাট্যগ্রন্থের একাধিক সংস্করণ থেকে প্রত্যয় জাগে, মুদ্রিত নাট্যগ্রন্থের অবশ্যই চাহিদা আছে । মঞ্চে জনাদৃত নাটকগুলির একটা চাহিদা অবশ্যই থাকে । বিশেষত অল্পখ্যাত গোষ্ঠী সেই-সব মঞ্চসফল নাটকের খ্যাতির সুযোগে সেগুলির পুনরভিনয়ে উৎসাহিত হন । এইভাবেই মুদ্রিত নাটকের বাজার গড়ে উঠেছে । স্বতন্ত্র নাট্যগ্রন্থ ছাড়া নাটকের পত্রপত্রিকাতেও বহু নাটক প্রকাশিত হয় । পি. এল. টি. বহুরূপী গণনাট্য সঙ্ঘ ইত্যাদি কয়েকটি নাট্যগোষ্ঠীর নিজস্ব মুখপত্র নিয়মিত-অনিয়মিত প্রকাশিত হয়ে থাকে । গ্রুপ থিয়েটার নাট্যচিন্তা ইত্যাদি পত্রিকাগুলিতে এইভাবেই নতুন নতুন নাটক প্রকাশিত হচ্ছে । নাট্য আকাদেমিও পত্রিকা বা সংকলন প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছেন । এমন-কি, এক্ষণ বা দেশ-এর সাহিত্যপত্রে, অনেক বড়ো পত্রিকার পূজা সংখ্যায় নাটক প্রকাশিত হয়ে চলেছে ।

এই দুই-আড়াই দশকের নাট্যকারদের মধ্যে নাট্য রচনার ব্যাপ্তি ও সংখ্যাধিক্যে বা জনপ্রিয় নাট্যকার রূপে সর্বাগ্রে উল্লেখ্য নামগুলি হল— উৎপল দত্ত, উমানাথ ভট্টাচার্য, কিরণ মৈত্র, গঙ্গাপদ বসু, জোছন দস্তিদার, জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থপ্রতিম চৌধুরী, বাদল সরকার, বীরু মুখোপাধ্যায়, মনোজ মিত্র, মনোরঞ্জন বিশ্বাস, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, রতনকুমার ঘোষ, রবীন্দ্র ভট্টাচার্য, শৈলেশ গুহ নিয়োগী, সলিল সেন, সুনীল দত্ত, সুশীল মুখোপাধ্যায়, স্বপন সেনগুপ্ত প্রভৃতি। এঁদের সকলের সব নাটকের পরিচয় অনেক অনুসন্ধানসাপেক্ষ । বহু নাটক গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয় নি, অভিনেতৃদলের কাছে পাণ্ডুলিপি-আকারেই সংরক্ষিত অথবা কোনো নাট্যপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

উৎপল দত্ত বর্তমান কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার, কিন্তু তাঁর নাটকে কাহিনীর কোনো সুদৃঢ় কাঠামো তাঁর অভিপ্রেত নয় । বুদ্ধিশাণিত সংলাপ, টাইপ চরিত্রসৃষ্টি, পরিহাসবোধ, বিদ্রূপতীক্ষ্ণ আক্রমণাত্মক ঘটনাভাষ্য, রাজনৈতিক বক্তব্য, সুনিরূপিত দৃশ্যবিন্যাস ও মানানসই মঞ্চসংস্থান তাঁর নাটকের বৈশিষ্ট্য । ইতিহাসকে তিনি আপন বক্তব্যের অনুকূলে ব্যবহার করতে জানেন, বিদেশী কাহিনীর রূপান্তরে তিনি সর্বদাই তার জাতীয়করণে আগ্রহী হন না । ফ্যাসিবাদকে তিনি ইতিহাসের পটভূমিতেই দেখাতে চান, তাই ইয়ান পেটার্সনের উনসেরে স্রসে

অবলম্বনে ব্যারিকেড নাটককে তিনি এদেশের সাজে সাজান নি। তাঁর ইতিহাসবোধ অত্যন্ত প্রখর, বিশ্ব ইতিহাসের গতিপ্রকৃতির খোঁজখবর রাখেন তিনি । প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস তাঁকে আকর্ষণ করে সূর্য শিকার নাটকে, আবার ফরাসি বিপ্লবের ইতিহাস তাঁকে নাট্য-উপাদান দেয় নীল শাদা লাল নাটকে, যেটি ফরাসি বিপ্লবের দুশো বৎসর উপলক্ষে আলিয়াস ফ্রাঁসিস ও পি. এল. টি.-র যৌথ উদ্যোগে প্রযোজিত হয় । সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙনের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে লিভনিয়া নামক এক কাল্পনিক সমাজতান্ত্রিক দেশ কেমন করে রুমানিয়ার মতো প্রতিক্রিয়াশীলের অভয়ারণ্যে পরিণত হয় তার বিবরণ দিয়েছেন তিনি লাল দুর্গে । গান্ধী হত্যা ও মৌলবাদের অর্ধশতক আগের ইতিহাস ধরা পড়েছে, একলা চলো রে নাটকে । তবু উনিশ শতকের বাংলা তথা কলকাতাই তাঁর প্রিয় বিষয়। টিনের তলোয়ার ও দাঁড়াও পথিকবর নাটক দুটিতে তার পরিচয় আছে । তাঁর অধীত জ্ঞান ও লব্ধ মেধা, মনন ও বৈদগ্ধ্য তাঁকে কেবল নাট্যকারই করে নি, মনীষী সমালোচকরূপেও পরিচিতি দিয়েছে । তাঁর গিরিশ মনন, শেক্‌সপিয়ারের সমাজচেতনা, স্তানিস্লাভস্কি থেকে ব্রেশ্‌ট, চায়ের ধোঁওয়া প্রভৃতি বাংলা গ্রন্থ ও ইংরেজিতে লেখা গিরিশচন্দ্র সম্পর্কিত গ্রন্থটি তার পরিচায়ক । গত এক দশকের নাট্যরচনায় উৎপল দত্তের নাট্যপ্রতিভা ঈষৎ মন্থর হয়েছে, রাজনৈতিক উপস্থাপনা নাট্যনির্মিতির শিল্পশর্ত পালনে তৎপর হয় নি । তাঁর বহু নাটক অন্যান্য গোষ্ঠীতে বহুবার অভিনীত হয়েছে । রাজনীতির তপ্ত জ্বালা-ধরানো বিষয়কে অনায়াসে তিনি তাঁর নাটকে শৃঙ্খলিত করেন । এমন-কি বিশ্বের অন্যান্য দেশের সংগ্রাম ও বিপ্লবও তাঁর হাতে সহজে নাট্যোপকরণ তুলে দেয়, এই বিষয়ে তিনিই এদেশের নাট্যকারদের কাছে পথপ্রদর্শক ।

উৎপল দত্তের নাট্যরচনার অনেকগুলিই মুদ্রিত আকারে পাওয়া যায়, কয়েক খণ্ডে তাঁর নাট্যসংকলনও প্রকাশিত হয়েছে, তবু তাঁর সমগ্র নাট্যরচনা আজও অমুদ্রিত । ষাটের দশকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে তাঁর প্রকাশিত অর্থাৎ মুদ্রিত নাটক যথাক্রমে অজেয় ভিয়েতনাম, ইতিহাসের কাঠগড়ায়, কঙ্গোর কারাগারে, সভ্য নামিক, এবার রাজার পালা, কল্লোল, ক্রুশবিদ্ধ কুবা, ঘুম নেই ও অন্যান্য নাটক, চাঁদির কৌটো, ছায়ানট, জালিয়ানওয়ালাবাগ, টিনের তলোয়ার, টোটা, তুরুপের তাস, দিল্লি চলো, নয়া জমানা, নীল রক্ত, ফেরারি ফৌজ, বৈশাখী মেঘ, ব্যারিকেড, মানুষের অধিকারে, মুক্তিদীক্ষা, মৃত্যুর অতীত, মেঘ, রাইফেল, রাতের অতিথি, লেনিনের ডাক, সন্ন্যাসীর তরবারি, সমাজতান্ত্রিক চাল, সাদা পোশাক, সীমান্ত ও সূর্যশিকার ।

উমানাথ ভট্টাচার্যের নাটকগুলি অবশ্য ১৯৫৮ থেকে ১৯৬৮-র মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে— অন্ন চাই প্রাণ চাই, ঘূর্ণী, জন্ম মৃত্যু, ঠগ, ধনপতি গ্রেপ্তার, শেষ সংবাদ । তাঁর আরো কয়েকটি নাটক অনেক গোষ্ঠীর অভিনয়-তালিকা থেকে পাওয়া যায় ।

কিরণ মৈত্রের প্রকাশিত নাটক ষাটের দশকের শেষ ভাগ থেকে মুদ্রিত হতে শুরু করেছে— অন্ধকারায়, অন্য ছায়া, অমৃতে বিষ, আলোয় ফেরা, আলোর নীচে, উৎসবের দিনে দেহ আলো, এক অঙ্কে শেষ, এদের রাখব কোথায়, এপিডেমিক, এলোপাথাড়ি, কালনেমির লঙ্কাভাগ, কেঁচে গণ্ডূষ, কোথায় গেল, গ্রহের ফের, জীবন্ত কবর, টোপর বদল হল, তৃষ্ণা, নাটক নয়, নাম নেই, পথের ঠিকানা, বারো ঘণ্টা, বারো ঘণ্টার পরে, বিশ পঞ্চাশ, যা তারা পারে নি— এইগুলি ছাড়াও তাঁর বহু নাটক নাট্যজগতে অভিনীত হয় ।

গঙ্গাপদ বসু ষাটের দশকের পূর্ববর্তী নাট্যকার, কিন্তু তাঁর নাটকগুলি প্রকাশিত হয়েছে ষাটের পরে এবং এখনো অভিনীত হয় । মুদ্রিত নাটকরূপে পাই অন্ধকারের বৃত্ত, অপমানিত, অংশীদার, ইদানীং, জীবনায়ন, নহ মাতা, প্রজাপতয়ে নমঃ, বিশ্বাসের মৃত্যু ও সত্য মারা গেছে ।

জোছন দস্তিদারের কয়েকটি মাত্র নাটক মুদ্রিত হয়েছে যথা দুই মহল, নবারুণ, গদ্য-পদ্য-প্রবন্ধ, ও স্বর্ণগ্রন্থি । কিন্তু সেই তুলনায় জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকাশিত নাট্যসংখ্যা যেমন বেশি, তেমনি তাঁর নাটকের অভিনয়ের

সংবাদ ততই ক্ষীণ। তাঁর মুদ্রিত নাট্যতালিকায় আছে— ইন্টারভিউ, গেটম্যান, গোলাপে রক্ত, চন্দ্রবিন্দু-বিসর্গ, চিতাভস্ম, জীবনটাই জুয়া, ঝিনুকে মুক্ত, দ্রৌপদী, পলাশের রং, পাথরের চোখ, ফুলেশ্বরী, বায়েন, মুছেও যা মোছে না, মৃত্যুঘণ্টা, মোমের আলো, যৌতুকে কৌতুক, রাজা বদল, লাভার্স লেন, লৌহকপাট, শঙ্খবিষ, সূর্য এনে দাও, স্বর্ণময়ূর প্রভৃতি।

পার্থপ্রতিম চৌধুরীর অভিনীত নাটকের তুলনায় মুদ্রিত নাটক সংখ্যালঘু। সেগুলির কয়েকটি— ছায়ানায়িকা, ফিঙ্গার প্রিন্ট, শব্দরূপ ধাতুরূপ ও হায়নার দাঁত। বাদল সরকারের মুদ্রিত নাটক অবশ্য সংখ্যায় অনেক এবং বহু দলেই তা অভিনীত হয়ে থাকে। তাঁর সুবিখ্যাত নাটক 'এবং ইন্দ্রজিৎ' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬২ সালে। পরবর্তীকালে প্রকাশিত নাটক যথাক্রমে— কবিকাহিনী, বড়ো পিসিমা, বল্লভপুরের রূপকথা, বাকি ইতিহাস, ভোমা, মিছিল, রাম শ্যাম যদু, সলিউশন এক্স ও সুখপাঠ্য ভারতের ইতিহাস প্রভৃতি। এ ছাড়া বাদল সরকারের স্বনির্বাচিত নাট্যসংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে। প্রলাপ, সারা রাত্তির, ত্রিংশ শতাব্দী, শেষ নেই, পাগলা ঘোড়া, যদি আর একবার, বাঘ, স্পার্টাকাস, মিছিল—এগুলির বেশ-কয়েকটি বহুরূপী পত্রিকাতেও প্রকাশিত হয়েছে।

বীরু মুখোপাধ্যায়-এর নাটক গণনাট্য ও নবনাট্য আন্দোলনে উপযুক্ত প্রেরণা সঞ্চার করেছে। একদা তাঁর রাহুমুক্ত যাত্রাভিনয় ছিল গণনাট্যের জয়যাত্রার পতাকা, পরবর্তীকালে তাঁর অনেক নাটক বিভিন্ন নাট্যগোষ্ঠীতে অভিনীত হয়েছে। তাঁর প্রকাশিত নাটকের মধ্যে পাই অদলবদল, এখানে থিয়েটার হবে, দাদা জন্মালেন, বাঘা যতীন, ভাঙা গড়া খেলা, রাহুমুক্ত, লালদিঘির ধারে, সংক্রান্তি, সাহিত্যিক সুতরাং প্রভৃতি। প্রখর সমাজসচেতনতাই নাট্যকাররূপে তাঁর মুখ্য বিশেষত্ব।

মনোজ মিত্র, বাদল সরকারের মতোই সাম্প্রতিককালের অন্যতম সফল নাট্যকার। তাঁর নাট্যরচনার পরিমাণ কম নয়, তাঁর রচিত নাটক বিভিন্ন নাট্যগোষ্ঠী সাদরে সাগ্রহে অভিনয় করে এবং মোটামুটি তাঁর নাটকে ইতিবাচক মানবিক আবেদন ও জীবনের প্রত্যক্ষ দৈনন্দিন নানা সমস্যার উপস্থাপনা ও সমাজচেতন দৃষ্টিতে সেগুলি নিরীক্ষণের সৎ প্রয়াস আছে। তাঁর টাইপ চরিত্রসৃষ্টির ক্ষমতা অসাধারণ, সংলাপে চাতুর্য বুদ্ধিদীপ্তি ও পরিহাস যোজনায় পটুত্ব উচ্চাঙ্গের, কাহিনীবিন্যাসেও তাঁর গভীর চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। ষাটের দশক থেকে নাটক লিখলেও তাঁর নাট্যপ্রতিভার বিশেষত্ব স্বাতন্ত্র্য ও গভীরতা ফুটতে শুরু করেছে তাঁর সত্তর দশকের নাটকগুলি থেকে। নানা বৈচিত্র্যে নাটকের পটভূমিকা তৈরি করা, রূপকে-রূপকথায় বর্তমান সমস্যার প্রতিভাস নির্মাণ করা, মধ্যবিত্ত জীবনমনের অভ্যন্তর সংকটগুলিকে শনাক্ত করা যেন তাঁর মুখ্যনাট্যধর্ম। শেকড়হীন বিচ্ছিন্নতা, বৈষয়িক স্বার্থপরতা, হৃদয়বৃত্তির অন্তঃসংঘাত, বিপ্লব-প্রতিবিপ্লবের টানাপোড়েন, এ-সব তাঁর নাটকে ঘুরে-ফিরে দেখা দেয়। মেষ ও রাক্ষসে রূপকথার আবরণে বর্তমান কালের রাজনৈতিক অন্তঃসারশূন্যতাকে তিনি বিদ্ধ করেন, স্নেহবিকারগ্রস্ত অপত্যহীন মাতৃত্বের অসহায় শূন্যতাবোধ- অনুকম্পায়ী কলমে আঁকেন অলকানন্দার পুত্রকন্যায়। তাঁর এ যাবৎ রচিত নাটকের সর্বশেষ প্রযোজনা শোভাযাত্রা অসাধারণ নাটক। সাজানো বাগান তাঁর বহুপ্রশংসিত নাটক। তাঁর প্রকাশিত নাটকের সংখ্যা অবশ্য কম নয়। যথা অশ্বত্থামা, কাকচরিত্র ও অন্যান্য, কিনুকাহারের থেটার, কেনারাম বেচারাম, কোথায় যাব, চাকভাঙা মধু, টাপুর টুপুর, জন্ম মৃত্যু ভবিষ্যৎ, নরক গুলজার, নীলকণ্ঠের বিষ, নেকড়ে, নৈশভোজ, পরবাস, পাহাড়ি বিছে, বাবা বদল, বেকার বিদ্যালংকার, ব্ল্যাক প্রিন্স, মেষ ও রাক্ষস, রাজদর্শন, শিবের অসাধ্যি, শুকসারী, সত্যি ভূতের গল্পো, সাজানো বাগান, সিংহদ্বার। এ ছাড়া তাঁর একটি একাঙ্ক সংকলনও আছে। ট্রাজেডি-কমেডির যুগ্ম সমাহারে শ্লেষে কৌতুকে চরিত্রে-বৈচিত্র্যে নাটকীয়তায় কৌতূহল সৃষ্টিতে নাট্য উপাদান নির্মাণ করে মনোজ মিত্র বাংলা নাটকের দীনতা ঘুচিয়েছেন।

মোহিত চট্টোপাধ্যায়ও আলোচ্য কালপর্বের প্রসিদ্ধ নাট্যপ্রতিভা এবং কিমিতিবাদী নাট্যকাররূপে পরিচিত,

যদিও তিনি বিদেশী নাটক এবং স্বদেশী কাহিনীর রূপান্তর ঘটিয়ে কয়েকটি নতুন নাট্য সৃষ্টি করেছেন। তাঁর নাটকে কবিতার ঘনীভূত নির্যাস, চিত্রনাট্যের দ্রুতগতি, রবীন্দ্রনাট্যের অনুরূপ সংকেতিত সংলাপ ও গভীর তত্ত্বস্পর্শী বক্তব্য আস্বাদ করি আমরা। তিনি বিদগ্ধ ও দেশী-বিদেশী নাট্যসাহিত্যে সুঅধীতী; অনুবাদ-রূপান্তরে তাঁর ক্লান্তিহীন কৌতূহল"[১]—তবে মৌলিক নাটকেই তাঁর সাফল্য। জীবনের অস্তিত্বের যন্ত্রণা, ব্যক্তি ও সমাজের ঘাতপ্রতিঘাত, শ্রেণী-সংঘর্ষ, আদর্শচ্যুতি, মূল্যবোধভ্রষ্টতা কোনো নাট্যকারের নাটকে আনে বিপ্লবী সংকল্প, কিন্তু মোহিতের নাটকে তা দেখা দেয় গভীর অবক্ষয়ী চেতনায় কিংবা উদ্‌ভটের ছন্নছাড়া দর্শনে। তবু মোহিতের অসংগতি ও উদ্‌ভটের মধ্যে অনিকেত দর্শন নেই, আছে সমাজমুখী ইতিবাদী দৃষ্টি ও বিশ্বাস। তাঁর বহু নাটক বহু দলে অভিনীত হয়েছে, কিন্তু পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হওয়া ছাড়া এবং একটি একাঙ্ক নাট্যসমগ্র ছাড়া তাঁর মুদ্রিত নাট্যগ্রন্থের একান্ত অসদ্‌ভাব। অথচ ষাটের দশকের শেষ ভাগ থেকে আশির দশক জুড়ে তিনি নাটক লিখেছেন তিরিশটিরও বেশি। তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটক—গন্ধরাজের হাততালি, কণ্ঠনালিতে সূর্য, ক্যাপ্টেন হুররা, চন্দ্রলোকে অগ্নিকাণ্ড, মৃত্যুসংবাদ, বমন, দ্বীপের রাজা, সিংহাসনের ক্ষয়রোগ, রাজরক্ত, তৃতীয় নয়ন প্রভৃতি।

মনোরঞ্জন বিশ্বাসের নাট্যরচনা গণনাট্যের মঞ্চরূপায়ণের নিকষে পরীক্ষিত হয়েছে। তাঁর নাটক অল্পবিস্তর অভিনীতও হয়েছে, তিনি নাটকের ক্ষেত্রে বিজন ভট্টাচার্য তুলসী লাহিড়ীর উত্তরসূরী। তাঁর আবাদ, কাছেই সমুদ্র, জননী, ঝড়ের কাছাকাছি, ভাঙা কাস্তের গান প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। রতনকুমার ঘোষও আলোচ্য পর্বের বিশিষ্ট নাট্যকার। তাঁর নাটক একাধিক নাট্যগোষ্ঠীর দ্বারা মঞ্চস্থ হয়েছে। প্রকাশিত কয়েকটি নাটক এই দশকের মঞ্চে, জম্বুদ্বীপের ইতিহাস, পিতামহদের উদ্দেশে, প্রতিবাদ, মহাকাব্য, মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, শেষ বিচার, সকালের জন্য, সমুদ্রশঙ্খ ইত্যাদি। রবীন্দ্র ভট্টার্চাযের ক্ষেত্রেও একই কথা বলা চলে—তিনি বিশেষ কোনো গোষ্ঠীর নাট্যকার নন। তাঁর অমর শহীদ গদাই, আমার জননী, উত্তম মধ্যম, এক যে ছিল রাজা, কালের মৈনাক, কেষ্টধনের কেরামতি, খাজাঞ্চিখানা, গঙ্গা তুমি বইছ কেন, চুপ সত্যি বলছি, পতঙ্গরঙ্গ, ফাঁসি মকুব হল, বিবস্ত্র স্বর্গ, বিরাশি সিক্কা, শূন্যবেদী, শুভকে ফিরিয়ে দাও, নাটকগুলির কয়েকটি বহুল-অভিনীত। রবীন্দ্র ভট্টাচার্যের কয়েকটি একাঙ্ক সংকলন আছে, সেইগুলি নাট্যামোদীদের কাছে সমাদরণীয়। নির্বাচিত একাঙ্ক সংগ্রহ গ্রন্থটি ছাড়াও আরো কয়েকটি সংকলনে অবরুদ্ধ ইতিহাস, গোলকপতির নরক যাত্রা, জীবনান্ত, দধীচি মন, পাঁঠাবলি, রক্তে রোয়া ধান, হৃদ বদলের মেলায় নামগুলি মনে আসে। শৈলেশ গুহনিয়োগী নাট্যকার হিসেবে সফল, তাঁর বহু নাটকই অনেকের দ্বারা সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়েছে, কিন্তু তাঁর নাটকে কোনো বিশিষ্ট আধুনিক চেতনা বা জীবনদর্শন বা বিশ্বাস তেমন করে বাজে নি। মোটামুটি হালকা রসের নাট্যকার তিনি। তাঁর অধিকাংশ নাটকই মুদ্রিত হয়েছে। কয়েকটির নাম অনশন ভঙ্গ, উত্তাল তরঙ্গ, উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে, কলেজ হস্টেল, ক্লান্ত রূপকার, ক্যাম্প থ্রি, গারদ, গোলপার্ক, জীবনরঙ্গ, ঝর্ণা, টেক্কা, ডাইভোর্স, পলিটিক্স, পাহাড়িফুল, প্রাইভেট এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ, ফাঁস, ফ্লু, বারুদে ফুলের গন্ধ, বিদিশা, ভগবান গ্রেপ্তার, ভূতের মুখে রামনাম, রিহার্সাল, সাচ্চা ভগবান, সমর্পণ, সেমসাইড। বৌদির বিয়ে নাটকটি পেশাদার মঞ্চেও অভিনীত হয়। তাঁর একটি রঙ্গনাট্য সংগ্রহও প্রকাশিত হয়েছে।

অন্যান্য নাট্যকারদের মধ্যে সলিল সেনের উৎসর্গ, জাতিস্মর, জীবনযাত্রা, দর্পণ, প্রতিমা, ফাঁদ, মৌচোর, সওয়াল, স্বীকৃতি, প্রভৃতি নাটক গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। সুনীল দত্ত বহু নাটকের রচয়িতা কিন্তু তাঁর নাটকের অভিনয়ের সংবাদ বেশি নেই। সুনীল মুখোপাধ্যায় সম্পর্কেও একই বক্তব্য। স্বপন সেনগুপ্তের অশুভ আঁতাত, কখন সূর্য উঠবে, কবে বসন্ত আসবে, হিরো, স্বপনকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অন্ধকারে একা, আলোর ঠিকানা, নীড়হারা পাখি, এইগুলির অভিনয় সংক্রান্ত তথ্য অপ্রতুল। সমকালীন অন্যান্য নাট্যকারদের মধ্যে পূর্বে উল্লিখিত হয় নি এমন কয়েকজন নাট্যকারের নাম চাণক্য সেন (তারারা শোনে না), রমেন লাহিড়ী (পান্থশালা মনোবিকলন), সত্য

বন্দ্যোপাধ্যায় (নির্লজ্জ, শেষ থেকে শুরু, পঙ্গপাল, নহবৎ), ভোলা ঘোষ (স্বপ্ন নয়), মিহির চট্টোপাধ্যায় (স্যানাটোরিয়াম), অতনু সর্বাধিকারী (লঘু গুরু), রাধারমণ ঘোষ (হারাধনের দশটি ছেলে), ঋত্বিক ঘটক (জ্বালা, সাঁকো), শ্যামল ঘোষ (নীলকণ্ঠের বিষ), নভেন্দু সেন (নয়ন কবীরের পালা), অমর গঙ্গোপাধ্যায় (অন্ধকারের আয়না, ভাঙন, সমাজসেবী বিজয়হরি), লোকনাথ ভট্টাচার্য (কলকাতা কলকাতা), তৃপ্তি মিত্র (বলি), সমীর মজুমদার (এখনও স্বপ্ন), শ্যামল ভট্টাচার্য (ক্ষুদিরামের মা), দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায় (অমিতাক্ষর, সমাবর্তন), দীপেন্দ্র সেনগুপ্ত (গাবব্ু খেলা), চন্দন সেন (দুই হুজুরের গপ্পো, দর্পণ সাক্ষী, অন্য পৃথিবী), বিমল বন্দ্যোপাধ্যায় (একটি অবাস্তব গল্প, একটি ব্যক্তিগত গল্প), শ্যামাকান্ত দাস (অগ্নিগর্ভ সেনা, সামনে পাহাড়, প্যারী কমিউন, আলিবাবার পাঁচালি), ইন্দ্র উপাধ্যায় (টেরোড্যাকটিল), নীতীশ সেন (বর্বর বাঁশি, অপরাজিতা), চিত্তরঞ্জন ঘোষ (দাও ফিরে সে অরণ্য, নটী বিনোদিনী, লেবেদেফ), শ্যামল সেনগুপ্ত (ধর্মাধর্ম), কুণাল মুখোপাধ্যায় (পরিচয়, অনন্যা, ভোলা ময়রা), সুনীল চক্রবর্তী (টাকার রঙ কালো, আমি মন্ত্রী হবো), শেখর চট্টোপাধ্যায় (জজ সাহেব, ফরিয়াদ, জন্মভূমি), অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় (সেতুবন্ধ, হে অসময় উত্তাল সময়, সওদাগরের নৌকা), অজিত গঙ্গোপাধ্যায় (নবস্বয়ম্বর, শকুন্তলা রায়, জগন্নাথের রথ), অসিত রায়চৌধুরী (কাঁচ ঘর), নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত (প্রস্তুতি, কিংকিং), চিররঞ্জন দাস (জুলিয়াস ফুচিক), জয়ন্ত ভট্টাচার্য (ইন্‌সপেক্‌টর এলেন, তারা তিনজন, ব্যতিক্রম), অসীম চক্রবর্তী (মুক্তির মুক্তি), বাসুদেব বসু (জোয়ার), শম্ভু মিত্র (উলুখাগড়া, ঘূর্ণি, চাঁদ বণিকের পালা), শুভঙ্কর চক্রবর্তী (আমরা কবরে যাব না, বিদ্রোহী চার্বাক, সিঞ্চিং), সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় (রাজকুমার, নামজীবন, ঘটক বিদায়), জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় (চরৈবেতি, মিনিস্টার), বিভূতি মুখোপাধ্যায় (পাকে চক্রে, নিতাই গড়গড়ির বৌ)) প্রভৃতি নাম কখনো মুদ্রিত গ্রন্থের নাট্যকাররূপে কখনো পেশাদার অভিনয়ের অথবা গ্রুপ থিয়েটারে অভিনয়ের পরিচয়লিপি থেকে পাওয়া যায় । বলা বাহুল্য এ নাম সম্পূর্ণ নয়, ভগ্নাংশ মাত্র । এঁদের মধ্যে যাঁরা স্বয়ং অভিনেতা-নির্দেশক, তাঁদের নাটকে নাট্যবোধ ও শিল্পচেতনার যে সমন্বয় ঘটবে তাতে সন্দেহ নেই । একই নাটক নির্দেশক-বিশেষে ভিন্ন আবেদন সৃষ্টি করতে পারে এ কথাও সত্যি ।

নয়

বাংলা নাটকের আধুনিক যুগ শুধু একটি রীতি বা শিল্পের বিবর্তনের উপাদানেই সমৃদ্ধ নয়, এই যুগ নাটকের একই অঙ্গে অনেক রূপের সমাহার ঘটিয়েছে । এই পর্বের নাটক রীতিমতো সমাজসচেতন, নাট্যকারগণ প্রায় সকলেই রাজনৈতিক আদর্শে অনুপ্রাণিত, প্রগতিশীল ও সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশীদার । মার্কসবাদী চিন্তাভাবনা, কমিউনিস্ট আদর্শ, বামপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলন, শোষণ-পীড়ন-অত্যাচারের বিরুদ্ধে শ্রমিক-কৃষকের সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধের সংকল্প, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিপুঞ্জের বিরুদ্ধে সর্বহারার একনায়কতন্ত্রের মতবাদ চল্লিশের দশক থেকে বাংলা নাটকের পেশাদার জগতের বাইরে স্বাধীন নাট্যচিন্তাকে প্রভাবিত করেছে । পরবর্তী পঞ্চাশ ও ষাটের দশক থেকে আজ পর্যন্ত অধিকাংশ গ্রুপ থিয়েটারই সেই চলতি হাওয়ার পন্থী । ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক বক্তব্যকে সাংস্কৃতিক বাতাবরণে সহিষ্ণু ও সহজিয়া করার জন্যেই গণনাট্য সঙ্ঘ গড়ে তোলা হয়েছিল । বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল আর. এস. পি. একই কারণে গড়ে তুলেছিল ক্রান্তি শিল্পী সঙ্ঘ । গ্রুপ থিয়েটারগুলি অবশ্য সকলেই সরাসরি রাজনীতির কথা বলে নি, কিন্তু সমাজসচেতনতা ও গণমুখিতার দায়িত্ব এড়াতে পারে নি । নিছক কলাকৈবল্যকেই প্রাধান্য দেওয়ার প্রবণতা ছিল সংযত ।

ষাটের দশক থেকে নাটকের ইতিহাসে নাটক ও রাজনৈতিক চেতনা প্রায় হাত-ধরাধরি করে চলেছে ।

গণনাট্য সঙ্ঘের সঙ্গে নানাভাবে সংশ্লিষ্ট শিল্পী ও কলাকুশলীরা গণনাট্য সঙ্ঘ থেকে বিশ্লিষ্ট হয়ে নানা গ্রুপ থিয়েটার গড়ে তুলেছেন অথবা গ্রুপ থিয়েটারে যোগ দিয়েছেন মধ্য-পঞ্চাশের দশক থেকেই, কিন্তু তাঁরা গণনাট্য সঙ্ঘের আদর্শ ও বিশ্বাসের গণ্ডি ভেঙে শিবিরান্তরে যোগ দিয়েছিলেন, এমন প্রচার সর্বাংশে সত্য নয়। রাজনৈতিক মাধ্যাকর্ষণে তঁদের অনেকেই ছিলেন মার্কসবাদী দলেরই ঘনিষ্ঠ হয়ে। কোনো কোনো গ্রুপ থিয়েটার রাজনৈতিকভাবে মার্কসবাদী পার্টির প্রভাব বলয় থেকে হয়তো দূরবর্তী থাকতে চেয়েছিল, নবনাট্য আন্দোলনকে গণনাট্য আন্দোলনের বিপরীত মঞ্চে বসাতে চেয়েছিল। দু-একটি গ্রুপ থিয়েটারের প্রযোজনা নাট্য-নির্বাচন ইত্যাদি নিয়ে মাঝে-মধ্যে তাই সংশয়ের ভ্রূও কোনো কোনো মহলে কুঞ্চিত হয়ে উঠেছে।[৪২] ব্যক্তি ও সমষ্টির গুরুত্বের প্রশ্নে এই তাত্ত্বিক বিতর্ক বহুরূপীর নাটক থেকেই পঞ্চাশের দশকে শুরু হয়। তার পর বাংলায় উদ্‌ভট বা অ্যাবসার্ড কিংবা কিমিতিবাদী নাটকের মঞ্চায়নে তা আবার প্রকট হয়ে ওঠে। ফ্যাসিবাদী দর্শনের অনুরাগী পিরানদেল্লোর নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্র (১৯৬২) এবং শের আফগান (১৯৬৬) মঞ্চস্থ করায় কোনো কোনো মহলে নান্দীকারের উদ্দেশে সমালোচনা বর্ষিত হয়েছিল বলে জানা যায়।[৪৩] গ্রুপ থিয়েটারগুলি প্রায়শই সৎ নাটক জীবনধর্মী নাটক পৃথিবীর সেরা নাটকগুলির সঙ্গে এদেশের দর্শকদের পরিচিত করার উপর জোর দিয়েছেন, কেউ কেউ সরাসরি রাজনীতি থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকারও সরব অঙ্গীকার করেছেন।[৪৪] ১৯৫৪ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত তরুণ রায়ের থিয়েটার সেন্টার কেবল 'নাট্য-আন্দোলনের প্রতি উৎসর্গিত প্রাণ' হওয়ার দিকেই তার উদ্দেশ্য সুনির্দিষ্ট রেখেছিল।[৪৫] রূপকার গোষ্ঠীর আদর্শ ছিল সমাজের বিভিন্ন স্তর-সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্যসহ আমাদের সামাজিক জীবনের সত্যনিষ্ঠ বাস্তব ছবিকে জনসমক্ষে মেলে ধরা। সুন্দরম্ গোষ্ঠী (১৯৫৭) স্পষ্টতই কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত থাকার কথা জানিয়েছিলেন। থিয়েটার ইউনিট (১৯৫৮), নান্দীকার (১৯৬০), মাস থিয়েটার্স[৪৬] (১৯৬০), থিয়েটার ওয়ার্কশপ (১৯৬৬), শতাব্দী (১৯৬৭), চেতনা (১৯৭২), থিয়েটার কমিউন (১৯৭২) প্রভৃতি যে থিয়েটার গোষ্ঠীর উল্লেখ করেছেন কলকাতার নাট্য ইতিহাসকার অধ্যাপক সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়, তাঁদের প্রায় সকলেরই নাট্য-আন্দোলনে অংশ গ্রহণের অঙ্গীকারপত্র ভাষান্তরে সমার্থবহ। জীবনধর্ম নাটক প্রযোজনা, নাটকে বস্তুনিষ্ঠতার প্রকাশ, দেশীয় নাট্যঐতিহ্যের স্বাঙ্গীকরণ, পাশ্চাত্য নাট্য সম্পদের সঙ্গে আত্মীয়তাবন্ধন—এই-সব প্রসঙ্গই তাঁদের কর্মসূচী বা ইস্তাহারে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু ব্যবহারিক অভিজ্ঞতায় সেগুলির প্রতি বিশ্বস্ততার মাত্রায় উচ্চাবচতা থাকতেই পারে, যেমন শম্ভু মিত্র লিখেছেন, "অনেক শিল্পরসবেত্তা দর্শকের মনে নবনাট্য আন্দোলনের মানে কিন্তু আলাদা। তাঁদের কাছে নবনাট্য মানে সেই নাট্য যেটা জীবন সম্পর্কে আমাদের গভীরতর বোধ এনে দেবে, সমাজের জটিল স্তরবিন্যাস সম্পর্কে আমাদের উপলব্ধির সহায়ক হবে, যেটা আমাদের বুদ্ধি ও হৃদয়কে একসঙ্গে বেঁধে মহৎভাবে বাঁচবার অনুপ্রেরণা দেবে। তাই নবনাট্য আন্দোলনের নাটককে দেখাতে হবে ব্যক্তি ও সমাজের রূপ।"[৪৭] অন্যদিকে গণনাট্য সঙ্ঘের আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ কলাকার শাখার নির্দেশক লিখেছেন, "আমি মনে করি একমাত্র বৈজ্ঞানিক সমাজবাদী দর্শকই জাগতিক ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্ক ও ধারার সঠিক ব্যাখ্যাকে সূত্রায়িত করতে পারে এবং মানুষকে সঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। তাই শিল্পাদর্শের ক্ষেত্রে একমাত্র সেই দর্শনেই আমরা প্রত্যয় ঘোষণা করি।" এবং এই ইস্তাহারপ্রগত ভাষার পরেও বলেন, "সামান্য অভিজ্ঞতার আলোকে এইটুকু বুঝেছি যে, দ্বন্দ্বমূলক এবং ঐতিহাসিক বস্তুবাদই আমার নাট্যকর্মেরও প্রধান নিক্তি। অকূল সমুদ্রে দিক্‌নির্ণয়যন্ত্রের মতো দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদকেই নাট্যপরিচালনার ক্ষেত্রে অভিধানের মতো ব্যবহার করে থাকি।"[৪৮]

অবশ্যই এ ঘোষণা দায়বদ্ধতার কিন্তু তাঁর অভিজ্ঞতা-বর্ণনায় এই দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ কেমন করে পরিচালনার দিক্‌নির্ণায়ক যন্ত্রের মতো কাজ করে তা স্পষ্ট হয় না। নাট্যরচনায় ও নাট্যনির্দেশনায় এই তথাকথিত মার্কসবাদী

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের তত্ত্ব যথার্থ শিল্পরূপ হয়ে উঠতে পারে কিনা, স্তানিস্লাভস্কির আলোচনায় তা যেমন বিশ্বস্ত হয়ে ওঠে, এঁদের আলোচনায় তা হয় না। রাজনৈতিক চেতনায় দীক্ষিত হয়েও নাট্যআন্দোলনে তন্নিষ্ঠ হওয়ার মধ্যে কিছু আত্মবঞ্চনা ও অপূরণযোগ্য শূন্যস্থান থাকে, সে কথা নাট্যকার-নির্দেশক অজিতেশ একবার সখেদে উচ্চারণ করেছিলেন।[৩৯]

অধ্যাপক পবিত্র সরকারের তথ্যজিজ্ঞাসা ও বিশ্লেষণ থেকে জানা যায়, নাট্যদলগুলির এই রাজনীতিসচেতনতা ও রাজনীতি-পরিহারের রাজনীতি একটি শিবির বিভাজন ও দলগত শ্রেণীসংঘাত তৈরি করেছিল। ১৯৬৫-র মাঝামাঝি রূপান্তরী (জোছন দস্তিদার-এর পূর্বতন গোষ্ঠী) থিয়েটার ইউনিট (শেখর চট্টোপাধ্যায়), শিল্পীমন (বিদ্যুৎ বসু), লোকসংস্কৃতি সঙ্ঘ, মাস থিয়েটার্স, লিটল থিয়েটার গ্রুপ, প্রভৃতি কয়েকটি নাট্যসংস্থা সমবেতভাবে একটি সংযুক্ত গণশিল্পী সংস্থা গড়ে তুলেছিলেন যাদের সংবিধান থেকে অধ্যাপক সরকার গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যগুলি উদ্ধার করে দিয়েছেন—

"শিল্পী ও শিল্পীসংস্থানের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে নানা প্রলোভন, উপঢৌকন ও খেতাব বিতরণ মারফত তাদেরকে জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন, প্রসাদপুষ্ট, চাটুকারে পরিণত করার ব্যাপক প্রয়াস। উপরন্তু গণনাট্য আন্দোলনের মহান ঐতিহ্যকে পদদলিত করে যে সমস্ত সুবিধাবাদী আপোষপন্থী নাট্যসংস্থা, নাট্যকার ও নাট্যকর্মী আজ গণনাট্যের পরিবর্তে 'নবনাট্য' সৃষ্টি করার উদ্যম চালাচ্ছেন, সেই-সব দল ও ব্যক্তির ব্যভিচারের বিরুদ্ধে এই সংস্থা অবিচ্ছিন্ন আদর্শগত সংগ্রাম চালিয়ে যাবে। যে সব ধারার বিরুদ্ধে আদর্শগত সংগ্রাম চালাবার আশু প্রয়োজন দেখা দিয়েছে তার কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল—

"—ঘৃণ্য সমাজবিরোধী পুরাতন নাটককে ক্ল্যাসিকাল হিসেবে পরিবেশন করে জনগণকে বিভ্রান্ত করা, যথা ব্যাপিকা বিদায়, বাবু প্রভৃতি।

—নাট্য আন্দোলনের প্রয়োজন ফুরিয়েছে এই মিথ্যা ও অভিসন্ধিমূলক প্রচারের সঙ্গে সৎ নাটক আখ্যায় অসৎ নাটকের চরিত্র গোপন।

—আধুনিক ইউরোপীয় নাটকের নামে ইউনেস্কো পিরানদেল্লো ও বেকেটের মতন সাম্রাজ্যবাদের ভাড়াটে লেখকদের জনবিরোধী ধারার আমদানি।

—জনগণের দুঃখ-দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রামের প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে কার্যত জনগণকে আত্মসমর্পণের দিকে ঠেলে দেওয়া।

—প্রতিক্রিয়াশীল পেশাদার নাট্যশালাগুলিতে সরাসরি সমাজবিরোধী ভাবধারার প্রচার।

—শ্রমিক কৃষককে নাটকের চরিত্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে না দিয়ে বর্ণহিন্দু মধ্যবিত্তের কাহিনীতে নাটককে আবদ্ধ রাখা।"[৫০]

উক্ত সংস্থার মুদ্রিত সংবিধান থেকে তুলে-আনা এই জাতীয় তিরস্করণী বাক্যগুলির অসহিষ্ণুতার প্রতি অবশ্য পরবর্তীকালে কোনো প্রতিতিরস্কার শোনা যায় নি। তা ছাড়া উল্লিখিত নাট্যদলগুলিও নিজেরা শেষ পর্যন্ত এই তথাকথিত প্রতিক্রিয়াশীল জনবিরোধী ধারাগুলির শনাক্তকরণ সম্পর্কে কৃতনিশ্চয় ছিলেন কিনা সন্দেহ।[৫১] এমন-কি অর্থসাহায্য লাভের উৎসবৃদ্ধির কারণে অনেক নাট্যসংস্থাই সেই উৎসমুখে উদ্‌বাহু হয়েছেন এ কথাও হয়তো সত্যি। বহু প্রযোজিত নাটকের প্রগতিশীলতা-প্রতিক্রিয়াশীলতার লক্ষণামূল মুদ্রাচিহ্ন নিয়েও পরস্পরবিপরীত মনোভাবের অভাব ঘটে নি।

বস্তুত নাটকের বিষয়বস্তুতে রাজনীতির সীমা নির্ধারণের কোনো মানদণ্ড নেই। রাজনীতি জীবনেরই অঙ্গ, নাটকে রাজনীতির উপস্থাপনা নাট্যকারের দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্বাস ও আদর্শের উপর নির্ভর করে। বহুরূপী রক্তকরবী

নাটক মঞ্চস্থ করে যক্ষপুরীর শ্রমিকদের যেন একটি রাজনৈতিক সংগঠনের অংশীদার করে তুলেছিলেন এবং শেষ দৃশ্যে শ্রমিকদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন লাল ঝাণ্ডা, এমন অভিযোগ উঠেছিল। রক্তকরবী ফুলের রক্তরাগের আভায় যে ভয়জাগানো মাধুর্যের ইঙ্গিত ছিল, তারই বাস্তব পূর্ণতা ঘটিয়েছিলেন পরিচালক ঐ লাল পতাকায়, কিন্তু তাকে রাজনৈতিক দলের পতাকায় প্রতীকিত করার ইঙ্গিতরূপে গ্রহণ করে সমকালীন সাপ্তাহিকে পরিচালকের উদ্দেশে কিঞ্চিৎ অ-রাজনৈতিক উষ্মা প্রকাশ করা হয়েছিল।[৫২] শিশিরকুমার ভাদুড়ী দুঃখীর ইমান নাটক প্রযোজনা করে বিশেষ একটি রাজনৈতিক দলের আদর্শের আনুকূল্য করেছেন, এমন অভিযোগ অবশ্য কেউ তোলেন নি, কিন্তু এই নাটকটিকে মঞ্চস্থ করার উদ্যোগ-উৎসে অবশ্যই গণনাট্য আন্দোলনের প্রেরণা ছিল বলে জানিয়েছেন বিজন ভট্টাচার্য।[৫৩]

বাংলা নাটকের নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে রাজনীতির প্রগল্ভ প্রবেশ ঘটেছিল স্বদেশী আন্দোলনের যুগেই। বিশুদ্ধ শিল্প-উপাসক নাট্যবিষয়কে রাজনীতি সেদিন আক্রমণ করে বিজয়ী হয়েছিল— নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইনের কোষাকুষি নিক্ষেপ করে রাজনীতিকে বহিষ্কৃত করা সম্ভব হয় নি। পরবর্তী সময়ে গণনাট্য সঙ্ঘের নাট্য-আন্দোলনে এবং গ্রুপ থিয়েটারগুলির নাট্য-নির্বাচনে রাজনৈতিক আদর্শ, শোষণপীড়নমুখী সরকারের দমন-নির্যাতনের চিত্রাঙ্কন, শ্রমিক কৃষকের সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধ আন্দোলন, যাবতীয় শ্রেণীসংগ্রামের অবসানে শ্রেণীহীন শোষণমুক্ত সমাজ-প্রতিষ্ঠার সংকল্প ঘুরে ফিরে এসে পড়েছে— কখনো শিল্পের শর্তে কখনো আরোপিত আতিশয্যে।

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা নাটকের ইতিহাসে নবান্ন অবশ্যই একটি নবযুগের প্রবর্তন করেছিল, তবে ষাট-সত্তর দশকে রাজনৈতিক চেতনাসমৃদ্ধ নাটকের দ্বারা নবযুগ-সৃষ্টির ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হয়ে এসেছিল। তবু তারই মধ্যে ষাটের দশকে কিমলিস কিংবা হারানের নাতজামাই এই দুটি নাটকে কমিউনিস্ট কর্মী ও বিপ্লবী আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ নেতৃত্বের যে-সব টুকরো ছবি আছে, তা আগের যুগেও দুর্লভ ছিল।

আলোচ্য পর্বের বাংলা নাটকে প্রত্যক্ষে ও সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনাবলীর উপস্থাপনা এবং বিশিষ্ট রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনায় অগ্রস্মরণ নাম অবশ্যই উৎপল দত্ত। তিনি এই পর্বের অন্যতম বলিষ্ঠ সফল নাট্যকার তৎসহ অভিনেতা ও নির্দেশক। তাঁর লিখিত ও মঞ্চস্থ নাটকগুলির অধিকাংশই রাজনৈতিক বক্তব্যে তীক্ষ্ণধী, আক্রমণাত্মক ও বিদ্রূপশাণিত, কখনো তা বিশ্বব্যাপ্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে উচ্চারিত হোক অথবা স্বদেশের প্রতিক্রিয়াশীল জনবিরোধী শাসক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নির্দেশিত হোক। খনিশ্রমিকদের প্রবঞ্চিত জীবন নিয়ে রচিত ও অসাধারণ সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত অঙ্গার (১৯৫৯) নাটক থেকেই এর সূচনা। তার পর সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের পটভূমিতে তৈরি করেছেন তাঁর ফেরারি ফৌজ (১৯৬১)। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ১৯৭৬-এ প্রতিষ্ঠিত সারকারিনা মঞ্চে ১৯৭৭-এ অভিনীত সমর মুখোপাধ্যায়-এর অগ্নিবন্যার নাটকের বিষয় ছিল মাস্টার সূর্য সেন, তাঁর বৈপ্লবিক জীবন ও চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের কাহিনী। কিন্তু এ নাটক নিতান্তই জীবনীমূলক পেশাদার নাটক, উৎপল দত্তের মতো রাজনৈতিক ভাষ্যমূলক নাটক হয়ে উঠতে পারে নি। নৌবিদ্রোহের জ্বলন্ত বহ্নিশিখায় ঝলসে উঠেছিল তাঁর কল্লোল (১৯৬৭), যাতে তিনি একটি প্রত্যক্ষ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী রাজনৈতিক ঘটনা বলে মনে করেছিলেন। তাঁর রাইফেল (১৯৬৯), বর্গি এল দেশে (১৯৭০), সূর্য্যশিকার (১৯৭১), ঠিকানা (১৯৭১), ব্যারিকেড (১৯৭২), দুঃস্বপ্নের নগরী (১৯৭৪), বাংলা ছাড়ো (১৯৮০) প্রতি নাটকের পিছনেই সুদূর অতীত অথবা সমকাল, কিন্তু তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক বক্তব্যে ক্ষুরধার কাহিনী। সমকালের কোনো রাজনৈতিক ঘটনাকে দ্রুত নাটকে প্রতিফলিত করে তিনি সেই ঘটনার পিছনে শ্রেণীসংগ্রামকে বিশ্লেষণ করেন, শাসক সম্প্রদায়ের জনবিরোধী ভূমিকাকে নগ্নভাবে উদ্‌ঘাটিত করেন। কাকদ্বীপের মা, মালোপাড়ার মা, চক্রান্ত, দিনবদলের পালা, একলা চলো রে, জনতার আফিম, দৈনিক বাজার পত্রিকা ইত্যাদি প্রায় সব নাটকই

কখনো সাম্প্রতিক পশ্চিমবঙ্গের উত্তেজক ঘটনাবলীকে আশ্রয় করেছে, কখনো বিশ্বরাজনীতির পটভূমিতে রাষ্ট্রবিশেষের গণজাগরণের নাট্যদৃশ্য তুলে ধরেছে। কোথাও নাট্যকার আপন বক্তব্যকে শিল্পকৈবল্যে আচ্ছন্ন করেন নি, সৎ নাটকের বাগাড়ম্বরে মার্কসবাদী বিশ্বাসকে ক্ষুণ্ন করেন নি, শ্রেণীসংঘর্ষ বিপ্লব শোষণমুক্তির দাবিকে ভিন্নতর মোহসংগীতে অভিভূত করেন নি। অসাধারণ মঞ্চনির্মিতি, মঞ্চে সম্পূর্ণ জেটি-জাহাজ প্রত্যক্ষ করে তোলা, খনিতে প্লাবন দৃশ্য, বাঁশের কেল্লা প্রভৃতি দৃশ্যপট পরিকল্পনায় চমকসৃষ্টি তাঁর নাটকগুলিকে প্রচণ্ডভাবে দর্শকতোষ করে। তেমনি তাঁর নিজের ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধিদীপ্ত উত্তেজক সংলাপ রচনার কৃতিত্বও তাঁর নাটকগুলিকে উপভোগ্য করে তোলে। যে-কোনো সমকালীন গুরুতর সমস্যা যখন নাগরিক চেতনাকে আচ্ছন্ন বা বিমূঢ় করে, তখনই তাকে অবলম্বন করে নাটক রচনার তৎপরতা ও অভিনবত্ব উৎপল দত্তের নাট্যপ্রতিভার অন্যতম লক্ষণ। সেইজন্য তাঁর নাটকে উচ্চকিত শ্লোগানের মেদাধিক্য সত্ত্বেও শিল্পনৈপুণ্যের রক্তাল্পতা ঘটে, এই বলে কোনো সমালোচক উৎপল দত্তের নাট্যনির্মিতির স্থায়ী মূল্যায়ন করে আরাম পান। কাকদ্বীপের মা, ঘুম নেই, বিচারের বাণী, লাল দুর্গ, তীর— এই-সব নাটকের মুদ্রিত পাঠ পাঠকের কাছে যেমনই প্রতিক্রিয়া জাগাক, তাঁর প্রযোজনা নির্দেশনা ও অভিনয়ে এক প্রাণবন্ত দুঃসাহসী বাক্‌স্পর্ধী ও গর্জমান হয়ে ওঠে যে, মনে হয় বাংলার অশ্রুপিচ্ছিল ভাবালুতায় স্যাঁতসেঁতে মধ্যবিত্ত নাট্যামোদী কলাকৈবল্য-নেশাগ্রস্তের কেশ আকর্ষণের জন্যে এই জাতীয় উত্তেজক বিস্ফোরক নাটকেরও গভীর প্রয়োজন আছে।

সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সঙ্গে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে রত তৃতীয় বিশ্বের মুক্তিকামী দেশগুলির বৈপ্লবিক ইতিহাসকে অতি সহজেই এদেশের মানুষের কাছে মেলে ধরার নাট্যরীতিটি উৎপল দত্তই জনপ্রিয় করেছিলেন তাঁর ক্রুশবিদ্ধ কুবা, অজেয় ভিয়েতনাম, রক্তাক্ত ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি নাট্য রচনার দ্বারা। ভিয়েতনামকে নিয়ে পরেও অনেকগুলি বাংলা নাটক লেখা হয়েছে ষাট ও সত্তরের দশকে। দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণাবিদ্বেষী নীতি, নেলসন ম্যাণ্ডেলার কারাবাস, আফ্রিকার অন্যান্য দেশের জনজাগরণ নিয়েও আশির দশকে বেশ-কয়েকটি রাজনৈতিক নাটক রচিত হয়েছে। বেঞ্জামিন মোলায়েজ-এর জীবন অবলম্বনে অলোক ভট্টাচার্যের আজ যুদ্ধ-ঘোষণার দিন। শেখর চট্টোপাধ্যায় নাটকটি ১৯৮৮-তে ইউনিটি থিয়েটারের ব্যানারে মঞ্চস্থ করেন। মোলায়েজের বিপ্লবী কবিতা বর্ণদ্বেষী প্রিটোরিয়া সরকারের বিরুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকার কালো মানুষদের কেমন করে উদ্‌বুদ্ধ করেছিল, এই নাটকে তারই প্রতিফলন ঘটেছে।

ষাট ও সত্তরের দশকের রাজনৈতিক অস্থিরতার অন্যতম বিষয় ছিল তথাপ্রচারিত নকশালবাড়ি আন্দোলন। উৎপল দত্তের তীর (১৯৬৮) নাটকে তার পরিচয় আছে। চারণ দলের কয়েকটি সাম্প্রতিক নাটকেও ঐ সময়ের রাজনৈতিক আন্দোলনের ঘটনাগত উপাদান ব্যবহৃত হয়েছে। সত্তরের দশকের গোড়ার দিকে প্রযোজিত অলোক রায়চৌধুরীর নাটক —প্রবাহ, হিমালয় থেকে ভারি, কমরেড, এই দশকের অভিমন্যু —এই-সব নাটকও বর্তমান পর্যায়ের উদাহরণরূপে বিবেচিত হবে। সশস্ত্র কৃষিবিপ্লব, বামপন্থী সংশোধনবাদের অন্তঃসারনিঃস্বতা, নকশালদের মূর্তিভাঙা অভিযান, সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে নকশাল আন্দোলনের মৌল প্র[illegible] কোথায়, এই-সব বিষয়ে চারণদলের দৃষ্টিভঙ্গি প্রাগুক্ত নাটকগুলিতে দর্শকেরা লক্ষ্য করেছেন। এর মধ্যে সবচেয়ে চমকপ্রদ নাট্যনামটি হল, ১৯৭৯ সালে চারণ দল-কর্তৃক মঞ্চস্থ অলোক রায়চৌধুরীর এই নাটকটি—নকশাল আন্দোলন— তার সজীবতা ব্যর্থতা আত্মত্যাগ এবং আত্মজিজ্ঞাসা। সম্ভবত দেড়শো বছরের বাংলা নাটকের ইতিহাসে সর্বাধিক শব্দবহুল নাট্যশিরোনাম।

তবে গণনাট্য সঙ্ঘের বা উৎপল দত্তের নাটকে যে রাজনৈতিক বক্তব্য ঐতিহাসিক বস্তুবাদী দর্শকের স্থিরপ্রাজ্ঞতার দ্বারা প্রত্যয়িত হয়, স্বল্পবিত্ত নাট্যপ্রতিভায় তা অতিসরলীকৃত হয়ে ওঠে। সদসৎ-এর লোকরঞ্জন

শিল্পের অনুরূপ দৃষ্টান্ত সমকালীন নাটকে অনেক মেলে। সাম্প্রতিক একটি নাটক স্বর্গনরক (১৯৯১) তার উদাহরণ।

রাজনীতির প্রসঙ্গেই এসে পড়ে দাঙ্গা, সাম্প্রদায়িক সমস্যা ধর্মীয় উম্মাদনার বিরুদ্ধে বাংলার নাট্যকারদের সজাগ প্রহরার কথা। অখণ্ড বাংলা দেশের দুশো বছরের সংস্কৃতি হিন্দু-মুসলমানের যৌথ সৃষ্টি, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি তাকে ছিন্নভিন্ন করেছে বারবার। তারই রক্তক্ষরা পরিণাম দেশবিভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা, জনস্ফীতি, দারিদ্র্য, বাংলা নাটকেরও বিষয়বস্তু হতে শুরু করেছে পঞ্চাশের দশক থেকেই। কিন্তু স্বাধীনতার দু-তিন দশক পরেও যে ভূমিগর্ভ থেকে সাম্প্রদায়িকতার গোখরো সাপ থেকে থেকে ছোবল হানে, বর্ণহিন্দুর অস্পৃশ্যতা-যজ্ঞে বলিদান ঘটে নিম্নহিন্দু হরিজন সম্প্রদায়ের জীবন, ধর্মের জিগিরে মৌলবাদের জান্তব মুখ থেকে লালা ঝরে স্বাস্থ্যবান মৈত্রীর অঙ্গে— বাংলা নাটকে গত দু-তিন শতক এই দিকগুলি নানাভাবে ঠাঁই পাচ্ছে। রাম জন্মভূমি বাবরি মসজিদ বিতর্ক আশির দশকের শেষ থেকে নব্বই দশকের গোড়ার বছরগুলিতে ঘুলিয়ে তুলেছে। মৌলবাদী ধর্মান্ধতা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উপর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্যে নাট্যকারদের ভূমিকা তাই বিশেষভাবে শ্রদ্ধেয়। আশির দশকে সারা ভারতে দূরদর্শনের মাধ্যমে রামায়ণ কাহিনী প্রদর্শনের দ্বারা ভারতের জাতীয় মহাকাব্যের প্রতি যতটা শ্রদ্ধাজ্ঞাপন ঘটেছে, তার চেয়ে, বেশি হয়েছে রামধুন। আর তারই ধোঁওয়া-কুণ্ডলী থেকে বড়ো হয়েছে মৌলবাদের জিন। সৌভাগ্যবশত ভারতের সব ভাষার প্রগতিশীল নাট্যকাররা সে ব্যাপারে সতর্কসজাগ আছেন। সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের বিরুদ্ধে ভীষ্ম সাহানির কয়েকটি কাহিনী গণমাধ্যমের দৌলতে সব রাজ্যের শুভবুদ্ধিকেই নাড়া দিতে পেরেছে। চেতনা-গোষ্ঠীর নাট্যকার-নির্দেশক অরুণ মুখোপাধ্যায় নব্বই-এর দশকের শুরুতেই ভীষ্ম সাহানির কবীর নাটকটিকে রূপান্তরিত করে একটি উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব পালন করেছেন। বৈদ্যনাথ খোটেল-এর মানুষের উপাখ্যান-এও ধর্মান্ধতা দাঙ্গা গোঁড়া সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে মানুষকে প্রতিষ্ঠিত করার নাটক (১৯৯২)। দেশবিভাগ ও স্বাধীনতালাভের অব্যবহিত পরে নাট্যাচার্য শিশিরকুমার শ্রীরঙ্গম মঞ্চে ১৯৪৯-এর আগস্টে পরিচয় নামে একটি নাটক মঞ্চস্থ করেছিলেন। শোনা যায় তৎকালে পূর্ববাংলা থেকে আগত অত্যাচারিত ও সর্বস্বান্ত হিন্দু উদ্বাস্তুদের মধ্যে এই নাটকের উদার অসাম্প্রদায়িকতা কোনো সান্ত্বনা জাগাতে পারে নি। কিন্তু শিশিরকুমারজন্মশতবর্ষে শৌভনিক গোষ্ঠী কৃষ্ণ কুণ্ডুর পরিচালনায় এই নাটকটির পুনরভিনয় করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রতি নাট্যকর্মীদের দায়বদ্ধতার কথা ঘোষণা করলেন। লোকায়ত সংস্থাও সম্প্রতি (১৯৯২) শেতলার দয়া ও সাকিনার গল্প নামে দুটি নাটকে সরস কৌতুকের মাধ্যমে ধর্মান্ধতা ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে গণচেতনা-উদ্‌বোধনের চেষ্টা করেছেন। একটি নাট্যপত্রিকার হাল সংখ্যার প্রতিবেদন থেকে দেখা যাচ্ছে বহু নাট্যগোষ্ঠীর নাট্য প্রযোজনাতেই এই প্রকার ধর্মান্ধতা মৌলবাদ ইত্যাদি প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে তরুণ নাট্যসমাজ শিল্পের হাতিয়ার খুঁজছেন।

এমন-কি, আশি ও নব্বই -এর দশকের পশ্চিমবঙ্গ-পরিব্যাপ্ত সাক্ষরতা আন্দোলনও বাংলা নাটককে নাট্যোপকরণ দিয়েছে। কৃষ্টিসংসদ-এর প্রযোজনা দুঃখিনী সরস্বতী (রচনা ইন্দ্রাশিস লাহিড়ী) এবং থিয়েটার অভিযান-এর প্রযোজনা আমি নিরক্ষর নই (নাট্যকার সুবিনয় দাস) নাম দুটি সমকালীন নাট্য পত্রিকার সৌজন্যেই পাওয়া।

এই আলোচনায় অনুবাদ-রূপান্তর নাটকের বিপুল আয়োজন ও ঐতিহ্যের প্রসঙ্গ স্বতন্ত্রভাবে উত্থাপিত হল না, বহু উল্লেখযোগ্য অনুবাদ-রূপান্তরিত নাটকের নামোল্লেখ হয় নি। তা ছাড়া একালের বাংলা সাহিত্যের গল্প-উপন্যাস অবলম্বনেও অনেক মঞ্চসফল নাটক তৈরি হয়েছে, যেমন পেশাদার মঞ্চে, তেমনি গ্রুপ থিয়েটারে। সেইগুলির আলাদা আলোচনা অবশ্যই প্রয়োজনীয় ছিল। আলোচ্য কালপর্বে রবীন্দ্রনাটক বাংলা পেশাদার মঞ্চ ও গ্রুপ

থিয়েটারগুলিকে কতটা সমৃদ্ধ করেছে,তাও স্বতন্ত্র আলোচনার বিষয় । এখানে সেই বিষয়টিও অনুক্ত আছে । তা ছাড়া সমকালীন বাংলা একাঙ্ক নাটক, পথনাটক, পুতুল নাটক, সংগীতমুখ্য নাটক, যাত্রানাটক—বাংলা নাটকের এই দিকগুলির উপরও আলোকপাত করা সম্ভব ছিল । সে কারণে বর্তমান প্রতিবেদনটি বাংলা নাটকের একটি উপচ্ছায়া মাত্র । এখানে নাটক নাট্যকার ও অভিনয়ের তথ্যবলীর পঞ্জীকরণ মাত্র হয়েছে— কিন্তু সাম্প্রতিক বাংলা নাটকের বিশেষ কয়েকটি প্রবণতার রেখাচিত্র তেমন করে ধরা যায় নি ।

ত থ্য সূ ত্র : নাট্যশোধ সংস্থা ; বিভিন্ন গ্রুপ থিয়েটারের স্মারক পত্রিকা ও অন্যান্য নাট্যপত্রিকা; অধ্যাপক সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'দ্য স্টোরি অফ দ্য ক্যালকাটা থিয়েটার্স ১৭৫৩-১৯৮০' এবং অধ্যাপক পবিত্র সরকারের 'নাটমঞ্চ ও নাট্যরূপ'; শ্রীপীযূষ চক্রবর্তী; শ্রীদেবাশিস রায়চৌধুরী, শ্রীসোমনাথ সিংহ, শ্রীজ্যোতি চৌধুরী; শ্রীমতী আলপনা ভট্টাচার্য ।

উল্লেখ্যসূত্র

১ প্রমা-প্রকাশিত বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটকের উপক্রমে শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় বহুরূপী পত্রিকার অক্টোবর ১৯৬৯-এর ৩৩ সংখ্যায় প্রকাশিত চিত্তরঞ্জন ঘোষের "তিনটি নাটিকা ও নবান্নের প্রথম স্মারণিক" প্রবন্ধের উদ্ধৃতি দিয়ে জানিয়েছেন, নবান্নের প্রথম অভিনয়ের সম্ভাব্য তারিখ ২৪ অক্টোবর ১৯৪৪ ।

২ "দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে ইতিমধ্যেই দুর্ভিক্ষ মহামারী, আধিদৈবিক দুর্ঘটনা এবং দেশব্যাপী স্বাধীনতা-আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়ে চূড়ান্ত একটা পরিণতির দিকে নিষ্ঠুরভাবে অগ্রসর হয়েছে । প্রত্যেকটি সমস্যা এমন বিরাট আর ব্যাপক আকারে দেখা দিয়েছে যেন মনে হচ্ছে অনর্থ যা-কিছু ঘটছে তার উপর মানুষের যেন কোনো হাত নেই । সচেতন বুদ্ধিজীবী মনও তখন সংশয় আর বিভ্রান্তির গোলকধাঁধায় ঘূর্ণায়মান । চরমতম এমনই সেই দুঃসময়ে 'জবানবন্দী'র ইঙ্গিতের সূত্রধার শহীদ মাতঙ্গিনী হাজরার দেশ মেদিনীপুর জেলার পটভূমিকায় প্রধান সমাদ্দারের নতুন জবানবন্দীতে 'নবান্ন' নাটক লিখতে বসলাম । মুমূর্ষু পরান মণ্ডলের চোখের সোনাধানের দুঃস্বপ্নই প্রধান সমাদ্দারের চোখে প্রতিভাত হয় জবাকুসুমসংকাশং রূপে । মৃত্যুকে বরণ করবার দুর্দমনীয় সংকল্প ঘোষণার মধ্য দিয়ে সে করে মৃত্যুকে অস্বীকার ।" নবান্ন নাটকের ১৯৬২ সংস্করণের বিজন ভট্টাচার্য-রচিত ভূমিকা, প্রথম প্রমা সংস্করণে (১৯৮৪) পুনমুদ্রিত ।

৩ শিশিরকুমার ভাদুড়ী বিশ্বনাথ ভাদুড়ী অহীন্দ্র চৌধুরী নরেশচন্দ্র মিত্র নির্মলেন্দু লাহিড়ী যোগেশচন্দ্র চৌধুরী তিনকড়ি চক্রবর্তী ভুমেন রায় রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় শৈলেন চৌধুরী রবি রায় নীহারবালা কঙ্কাবতী চারুশীলা প্রভা দেবী শান্তি গুপ্তা —এঁদের যুগের অবসান ঘটেছে । ছবি বিশ্বাস কমল মিত্র জহর গাঙ্গুলি চলচ্চিত্রে ঝুঁকেছেন । সন্তোষ সিংহ মহেন্দ্র গুপ্ত সরযূবালা মিহির সিংহ মিহির ভট্টাচার্য কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় তুলসী চক্রবর্তী মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য অবশ্য পঞ্চাশের দশকেও সপ্রতিভ অভিনয়গৌরব রক্ষা করে গেছেন । নাট্যভারতী কালিকা শ্রীরঙ্গম ক্রমশ বন্ধ হয়ে গেছে। স্টারে অবশ্য পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে বাণিজ্যলক্ষ্মীর কৃপা বর্ষিত হয়েছে ।

৪ আধুনিক কাল পর্যন্ত কলকাতার নাট্যাভিনয়-সম্পর্কিত তথ্যবহুল ইতিহাসের একটি শ্লাঘনীয় উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায় *The Story of the Calcutta Theatres 1753-1980* গ্রন্থে, লেখক অধ্যাপক সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় গ্রন্থটির জন্য রবীন্দ্র-পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছিলেন । প্রকাশক কে. পি. বাগচী অ্যাণ্ড কো, ১৯৮২-তে প্রকাশিত হয় ।

৫ সবচেয়ে বেশি নাটক প্রকাশিত হয়েছে বহুরূপীর নাট্য পত্রিকায়। তা ছাড়া গণনাট্য, গ্রুপ থিয়েটার, এপিক থিয়েটার, গান্ধার, স্যাস ইত্যাদি পত্রিকাতেও নাটক প্রকাশিত হয় ।

৬ "গত দশ-বারো বছরেই কেবল কলকাতার বাইরের কিছু দল কলকাতার দলগুলির সঙ্গে পাল্লা দেবার মতো দু-একটি নাটক করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বালুরঘাটের 'ত্রিতীর্থ' দলটির নাম সর্বাগ্রে মনে আসে এ প্রসঙ্গে; তবে বহরমপুর দুর্গাপুর বার্নপুর চিত্তরঞ্জন জামশেদপুর ঘাটশিলা নৈহাটি ইত্যাদি অঞ্চলের কিছু দলও নানা সময়ে উঁচু মানের অভিনয় করে বুঝিয়ে দিয়েছে যে, কলকাতার বাইরেও নাটকের নিষ্ঠাবান প্রয়াস চলছে।"— কলকাতার গ্রুপ থিয়েটার প্রবন্ধে পবিত্র সরকার, 'নাটমঞ্চ নাট্যরূপ', প্রমা প্রকাশনী, ২য় সং ১৩৯৭, পৃ. ২৫৫
পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি আয়োজিত ১৯৯০-৯১ সালের জেলা নাট্যোৎসবের বিবরণ থেকে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার নাট্যদলগুলির মোটামুটি পরিচয় পাওয়া যায়। দ্র. নাট্য আকাদেমি পত্রিকা ২য় সংখ্যা, জানুয়ারি ১৯৯২, পৃ. ২৯৮-৩০০

৭ বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগ্রহীত তথ্যে নামগুলি দাঁড়াবে এইরকম :
স্টার (১৪ অক্টোবর ১৯৯১ আগুনে ভস্মীভূত), রঙমহল, বিশ্বরূপা, রঙ্গনা, সারকারিনা, বিজন থিয়েটার, কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চ, প্রতাপ মেমোরিয়াল হল-মঞ্চ, রামমোহন লাইব্রেরি-মঞ্চ, বয়েজ ওন লাইব্রেরি মঞ্চ, মিনার্ভা, সুজাতা সদন, অ্যাকাডেমি মঞ্চ, মুক্তাঙ্গন, গিরিশ মঞ্চ, থিয়েটার সেন্টার মঞ্চ, গালিব থিয়েটার (অচল), শ্যামাপ্রসাদ মঞ্চ (অচল), বাসুদেব মঞ্চ (অচল), নেতাজি সুভাষ ইনস্টিটিউট (অচল), তপন থিয়েটার (অচল), শীষমহল (অচল), যোগেশ মাইম অ্যাকাডেমি মঞ্চ, অহীন্দ্র মঞ্চ, শিশির মঞ্চ, আশুতোষ কলেজ মঞ্চ, ক্রেমব্রাউন মঞ্চ (পরে বিধান মঞ্চ, বর্তমানে অচল) ইত্যাদি। রঙ্গনা সারকারিনা মিনার্ভা প্রভৃতি একাধিক পেশাদার মঞ্চে গ্রুপ থিয়েটারগুলি ব্যবসায়িক ভিত্তিতেই অভিনয় করেছে। আলোচ্য মঞ্চগুলির অধিকাংশই মধ্য ষাট থেকে সত্তরের দশকে তৈরি হয়েছে।

৮ "The Drama Department of the newly-founded Rabindra Bharati University has been turning out graduates and post-graduates to take up a career in the theatre, The University is also training technicians and this has definitely helped the cause of the changing theatre." —অধ্যাপক সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ২৯৭

৯ ১৯৮৭-তে নাট্যায়ন সংস্থা চার দশকের বাংলা থিয়েটার শীর্ষক একটি আলোচনা-বৈঠকের আয়োজন করেছিলেন। সেখানে প্রদত্ত অসিত মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য থেকে গৃহীত। দ্র. 'নাট্যচিন্তা', শারদ সংখ্যা, ১৯৯০, সম্পাদক রথীন চক্রবর্তী, পৃ. ২৮

১০ তদেব

১১ "শক্তিমান অভিনয় আর কোরিওগ্রাফি— এই দুটোরই পরিচালনা প্রযোজনা অন্তত গণনাট্যের প্রাণ। অবশ্যই নাটক ও তার চরিত্রগুলি হবে জীবন্ত। দর্শকের প্রতিক্রিয়া যেন মুখিয়ে ওঠে। আসর ছাড়তে পারে অতলান্ত উদ্দীপনায়। এই ভবিষ্যতের শোষণমুক্ত সমাজগঠনের আশাবাদ গণনাট্য সঙ্ঘ এবং তার নাট্যপ্রযোজনাকে প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে প্রাণবন্ত রেখেছে। নতুন নতুন শিল্পী কি পুরুষ কি মহিলা শিল্পীর এবং কল শো-র অভাব হয় নি কোনোদিন। পেশাদার শিল্পজগতের দিকে তাকিয়ে দেখুন, বিরাট সংখ্যার শিল্পী-কলাকুশলীর নবজন্ম এই গণনাট্য আন্দোলনেরই পাদপীঠে।" সজল রায়চৌধুরী, "গণনাট্য প্রযোজনার টুকরো কথা", 'গণনাট্য', ২৩ বর্ষ ৫ম সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৮৭, পৃ. ৯৪

১২ যেমন উত্তর কলকাতা শাখা, কলাকার শাখা, অনুশীলন শাখা, প্রান্তিক শাখা, কৃষ্টিসংসদ, দুর্গাপুরের সূর্য শাখা ইত্যাদি।

১৩ "মোদ্দা কথাটা এই, গণনাট্য পর্বের নির্দিষ্ট সূত্রে ঋজুতাকে কিছুটা অস্বীকার করে এবং নবনাট্য তত্ত্বের 'অনেক ভালো নাটক ভালোভাবে করা' এই সাদামাটা আবরণে না গিয়ে সোজাসুজিই রাজনৈতিক ও সামাজিক সচেতনাকে উপস্থিত করা এবং তাতে শৈল্পিক তাৎপর্য আরোপ করার উপরেই জোর দেয় গ্রুপ থিয়েটার। বাংলা থিয়েটারে

এটা একটা নতুন দিক, একটা নতুন ধরনের জোয়ারও বটে ।"— অসিত মুখোপাধ্যায়, 'নাট্যচিন্তা', শারদ সংখ্যা ১৯৯০, পৃ. ২৯

১৪ গণনাট্য সঙ্ঘের এক প্রবীণ সংগঠক-পরিচালক লিখেছেন—
"নাট্য পরিচালনা ও অভিনয়ের ক্ষেত্রে আমি স্তানিস্লাভস্কির গোঁড়া অনুগামী । যদিও অকপটে এও স্বীকার করি তাঁর শিক্ষার শতাংশের একাংশও এখনও আয়ত্ত করতে পারি নি । তবু পরিচালক হিসেবে তৈরি হবার সময়ে, অন্যান্য নাট্যবেত্তার কিছু রচনা পড়লেও স্তানিস্লাভস্কির My Life in Arts-ই আমার মনে গভীর প্রভাব ফেলেছে । তাঁর On Various Trends of Theatrical Art রচনার এক জায়গায় তিনি বলেছেন,
"After all, in life itself there are many other more beautiful, subtle and expressive means of rendering human feelings. Would it not be better to take them from life rather than from the tarnished cliches, worn threadbare by any one and everyone ?" শ্রীজীব গোস্বামী, "পরিচালনার অভিজ্ঞতা" ; 'গণনাট্য' শারদ সংকলন ১৯৮৭, পৃ. ৮৭ । উৎপল দত্ত স্তানিস্লাভস্কির মন্ত্রশিষ্য, প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, স্তানিস্লাভস্কির পথ, উৎপল দত্ত ; এপিক প্রকাশনী, ১৯৭৫ ।

১৫ তুলসী লাহিড়ী বীরু মুখোপাধ্যায় উমানাথ ভট্টাচার্য উৎপল দত্ত ঋত্বিক ঘটক শম্ভু মিত্র তৃপ্তি মিত্র সজল রায়চৌধুরী সুনীল দত্ত শেখর চট্টোপাধ্যায় বিজন ভট্টাচার্য চিররঞ্জন দাস বাসুদেব বসু রবীন্দ্র ভট্টাচার্য জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায় মনোরঞ্জন বিশ্বাস দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায় পরেশ ধর এই নামগুলি এলোমেলো ভাবে মনে পড়ছে ।

১৬ 'শেক্‌সপীয়রের সমাজচেতনা', উৎপল দত্ত, এম. সি. সরকার, কলকাতা ; ২য় সং ১৩৮৪ ।

১৭ উৎপল দত্তের নাট্যসংগ্রহ, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ (১৯৭৬–১৯৯১) :
১ম খণ্ড (১৯৭৬) : প্রফেসর মামলক, হিম্মত বাই, নয়া জমানা
২য় খণ্ড (১৯৭৮) : সূর্যশিকার, মানুষের অধিকার, বর্গি এল দেশে
৩য় খণ্ড (১৯৭৯) : ময়না তদন্ত, সমাধান ইত্যাদি
৪র্থ খণ্ড (১৯৮৪) : কুঠার, তিতুমির, কল্লোল
৫ম খণ্ড (১৯৮৭) : এবার রাজার পালা, হাঁড়ি ফাটিবে, মধুচক্র
৬ষ্ঠ খণ্ড (১৯৯১) : ঝড়, ঘুম নেই, অরণ্যের ঘুম ভাঙছে ইত্যাদি ।

১৮ অঙ্গার - পপুলার লাইব্রেরি ১৩৬৬ ; চাঁদির কৌটো - শ্রীগুরু লাইব্রেরি ১৩৬৮ ; ঘুম নেই ও অন্যান্য - জাতীয় সাহিত্য পরিষদ ১৩৬৮ ; মেঘ - কথাকলি লাইব্রেরি ১৯৬৩ ; অজেয় ভিয়েতনাম - জাতীয় সাহিত্য পরিষদ ১৯৬৭ ; কল্লোল - গ্রন্থম ১৯৬৭ ; ক্রুশবিদ্ধ কুবা - ব্রেশ্‌ট সোসাইটি, ১৯৬৮ ; ছায়ানট - জাতীয় সাহিত্য পরিষদ ১৩৭৭ ; দিল্লী চলো - পপুলার লাইব্রেরি ১৯৭৩ ; টিনের তলোয়ার - জাতীয় সাহিত্য পরিষদ ১৯৭৩ ; লেনিনের ডাক - জাতীয় সাহিত্য পরিষদ ১৯৭০ ; রাইফেল -জাতীয় সাহিত্য পরিষদ ১৩৭৬ ; সীমান্ত - এপিক প্রকাশনী ১৯৭৪ ; জালিয়ানওয়ালাবাগ - জাতীয় সাহিত্য পরিষদ ২য় সং ১৯৭৬ ; টোটা - এপিক প্রকাশনী ১৯৭৬ ; ঠিকানা - ব্রেশ্‌ট সোসাইটি ১৯৭৬ ; তুরুপের তাস - এপিক প্রকাশনী ১৯৭৬ ; ইতিহাসের কাঠগড়ায় / কঙ্গোর কারাগারে / সভ্যনামিক - জাতীয় সাহিত্য পরিষদ ১৯৭৬ ; ফেরারি ফৌজ - জাতীয় সাহিত্য পরিষদ ১৩৮০ ; নীল রক্ত -জাতীয় সাহিত্য পরিষদ ২য় সং ১৩৮২ ; নয়া জমানা - ব্রেশ্‌ট সোসাইটি ১৯৭৭ ; ব্যারিকেড - জাতীয় সাহিত্য পরিষদ ১৯৭৭ ; মানুষের অধিকারে - ব্রেশ্‌ট সোসাইটি ১৯৭৮ ; এবার রাজার পালা -জাতীয় সাহিত্য পরিষদ ১৯৭৭ ; বৈশাখী মেঘ - জাতীয় সাহিত্য পরিষদ ১৩৮৫ ; রাতের অতিথি - জাতীয় সাহিত্য পরিষদ ১৩৮২ ; সন্ন্যাসীর তরবারি - জাতীয় সাহিত্য পরিষদ ১৩৮২ ; সূর্য শিকার - জাতীয় সাহিত্য পরিষদ ১৯৭৮ ; মুক্তিদীক্ষা - জাতীয় সাহিত্য পরিষদ ১৯৭৯ ; সাদা পোষাক - জাতীয় সাহিত্য পরিষদ (?) ;

ষাটের দশকের কয়েকটি বিশিষ্ট প্রযোজনা :
রাজা অয়দিপাউস (সফোক্লেস), বাকি ইতিহাস (বাদল সরকার), বর্বর বাঁশি (নীতীশ সেন) ।

১৯ সত্তরের দশকে বহুরূপীর প্রযোজনাগুলি যথাক্রমে :
কিংবদন্তী (কুমার রায়), পাগলা ঘোড়া (বাদল সরকার), অপরাজিতা (নীতীশ সেন), চোপ আদালত চলছে (বিজয় তেণ্ডুলকার) ; টেরোড্যাকটিল (ইন্দ্র উপাধ্যায়), গণ্ডার (ইউজেন ইওনেস্কো), সুতরাং (স্টেইনবেক), বাঘ (বাদল সরকার), যদি আর একবার (বাদল সরকার), পাখি (মনোজ মিত্র), বলি (তৃপ্তি মিত্র), ওরা বিদেশী (আলবেয়ার কামু), কালবিহঙ্গ (মনোজ মিত্র), মৃচ্ছকটিক (শূদ্রক), আততায়ী (মনোজ মিত্র) ।
আশির দশকের উল্লেখযোগ্য প্রযোজনাগুলি :
গ্যালিলেও (ব্রেশ্‌ট), চক্রব্যূহ (মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য), রাজদর্শন (মনোজ মিত্র), ধর্মাধর্ম (শ্যামল সেনগুপ্ত), আগুনের পাখি (জাঁ আনুই), মিস্টার কাকাতুয়া (প্রশান্ত সেন), যযাতি (গিরিশ কারনাড), কিনু কাহারের থেটার (মনোজ মিত্র), নিন্দাপঙ্কে (জাঁ পল সার্ত্রে) ।
নব্বই-এর দশকে : শ্যামা (শিশিরকুমার দাশ) ।

২০ শম্ভু মিত্রের উলুখাগড়া, বিচার, চাঁদ বণিকের পালা, কাঞ্চনরঙ্গ (অমিত মৈত্রের সঙ্গে যৌথভাবে) নাটকগুলি তাঁর নাট্যকার-সম্ভাবনার বিস্ময়কর সাক্ষ্য । কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেন যে তিনি নাট্যকার হতে চাইলেন না তা তিনিই জানেন । তৃপ্তি মিত্রের কলমেও কিছু নাটক বেরিয়েছে —বলি, ইঁদুর ও সুতরাং (করুণা প্রকাশনী) ও তৃপ্তি মিত্রের নাটক সমগ্র ১৯৯০ তার উদাহরণ । তিনিও অভিনয়কেই তাঁর ব্রত করেছিলেন, নাট্যরচনায় আত্মনিয়োগ করলে সমকালীন বাংলা নাটক উপকৃত হত ।

২১ যেমন বলেছেন পবিত্র সরকার :
(রক্তকরবী প্রযোজনার পরে) "এমন কিছু একটা নিশ্চয় তাঁর (শ্রীশম্ভু মিত্রের) ব্যক্তিগত সামাজিক পরিবেশে ঘটে গিয়েছিল যার ফলে তিনি ক্রমশ ব্যক্তির সমস্যার দিকে আকৃষ্ট হতে থাকেন, এবং বহুজনের সমস্যা থেকে ক্রমশ একার সমস্যায় চলে আসেন । আমার এই ব্যাখ্যা ভুল হতে পারে, কিন্তু বহুরূপীর পরবর্তী প্রযোজনার তালিকা এই ব্যাখ্যাটিকে আকর্ষক ও লোভনীয় করে তোলে ।"— "কলকাতার গ্রুপ থিয়েটার", 'নাটমঞ্চ নাট্যরূপ' প্রমা প্রকাশনী, ২য় সং ১৩৯৭, পৃ. ২৫৯

২২ ১৯৬০ সালে গড়ে-ওঠা নান্দীকার প্রথম দিকে ছিল গণনাট্যেরই এক শাখা ।

২৩ অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ, ১৯৯১, পৃ. ৩৭

২৪ "মূল নাট্যকার পিরানদেল্লো-র মুসোলিনির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা এবং অবক্ষয়বাদী দর্শনের বিষয় এঁদের অজানা থাকার কথা নয় । তা সত্ত্বেও যে এঁরা নাটকটির প্রকরণগত চমক দেখে আকৃষ্ট হয়েছিলেন তাতে বোঝা যায় নাটকের বাইরের বাক্‌কৌশল দেখে তার মধ্যবর্তী ভারতীয় সমাজব্যবস্থার সঙ্গে সংগতিহীন এবং কিছুটা প্রতিক্রিয়াশীল বক্তব্য এঁদের কাছে গুরুত্ব পায় নি । ... খানিকটা ওই কারণেই ১৯৬৬-র শেষ দিকে আবার নামিয়েছিলেন পিরানদেল্লো-র 'এনরিকো কার্তো' অবলম্বনে 'শের আফগান' । এর মাঝখানে 'মঞ্জরী আমের মঞ্জরী' (আন্তন চেকফের 'দ্য চেরি অরচার্ড') এবং 'যখন একা' (আরনল্ড ওয়েস্কার-এর 'দ রুটস')-তে নান্দীকারের প্রযোজনার গৌরব বেড়েছে ।" "ত্রিশ বছরের বাংলা নাটক", পবিত্র সরকার; 'নাটমঞ্চ নাট্যরূপ' ।

২৫ "*Bhalo Manush* with Keya Chakraverti in the central character created a stir in the theatrical world. Keya Chakraverti, who has just resigned her post as a lecturer in English in the Scottish Church College in Calcutta where once she was also a student, gave a performance that was a revelation to many. She was declared the best stage artist of the year for her role in *Bhalo Manush*. With the

dramatic director Ajitesh Banerjee himself, and his professor-friend, highly talented Rudraprasad Sen Gupta in support, *Bhalo Manush* of Nandikar created a history by its long run." —অধ্যাপক সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়ের পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৩৪২

ভালো মানুষ— এর আবহসুর রচনা করেছিলেন আনন্দশঙ্কর। উদয়শঙ্করের একটি নৃত্যশৈলীও এতে প্রয়োগ করা হয়েছিল। এই নাটকে চারটি গানের সুরকার ছিলেন স্বয়ং অজিতেশ। অবশ্য আনন্দবাজার পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়েছিল, ব্রেখটীয় রীতি বা কায়দাকানুনও অতিব্যবহারের ফলে এখন আর আগের মতো দর্শকদের ক্ষণে ক্ষণে চমকিত করে না।" 'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১০ ডিসেম্বর ১৯৭৪

২৬ "এ নাটকে বাদশা আছে বেগম আছে বান্দা আছে, বাঁদী আছে, সেপাই আছে, কাজী আছে। কিন্তু কোন্ সময়ের মানুষ এরা ?... ইতিহাসের ভেতর ডুব দিয়ে এ নাটকের পাত্রপাত্রীরা ইতিহাসের মানুষ হয়ে যায় সহজেই। আবার ভেসে উঠলেই বর্তমানের মাছের ভেড়ি নিয়ে হাঙ্গামায় জড়ায়। ... পাত্রপাত্রীরা সংলাপ ভুলে গিয়ে যে যার কথা বলে ফেলে। ..." 'যুগান্তর', ২৬ অক্টোবর ১৯৭৮

২৭ "ব্যতিক্রম-এ শ্রেণীসংঘাত আছে, কিন্তু স্পষ্ট শাদাকালো চরিত্র নেই। প্রতিটি চরিত্র তাঁর শ্রেণীর স্বার্থই রক্ষা করে চলেছে, যেভাবে জগৎ চলে এবং যেভাবে সমাজের কল বা নিয়মের স্থায়িত্ব পায়। ট্রাজেডি এই যে নিজের শ্রেণীর স্বার্থ এবং ধর্মকে টপকে গিয়ে উদার এবং মানবিক হওয়ার সুযোগ পৃথিবীতে নেই। ব্যতিক্রম-এর নিপীড়িত কুলি দয়াপরবশ হয়ে সওদাগরকে জল দিতে গিয়েছিল— সেটা তার শ্রেণীর ধর্ম হওয়ার কথা নয়। সওদাগর তার শ্রেণীর স্বভাবসুলভ আতঙ্কে তাকে গুলি করল। সমাজের বিচারব্যবস্থা উদার, কিন্তু শ্রেণী-মনস্তত্ত্বকে ও পারিপার্শ্বিক প্রমাণাদিকে সে উপেক্ষা করতে পারে না। কারণ বিচার মেনে নেয় লজিককে, লজিক মেনে চলে নিয়মকে। অতএব মহান নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থার দয়া মায়া উদারতার মতন সমাজের স্বার্থোত্তর বিরল ঘটনার প্রতি সুবিচার হওয়া কঠিন।" 'আনন্দবাজার পত্রিকা', ৩১ জুলাই ১৯৮১

২৮ "ফুটবল শুধু মাত্র একটি খেলাই নয়, যুগের অস্থিরতা পরিমাপের ব্যারোমিটারই নয়, এই ফুটবল বৃহত্তর ইঙ্গিতের সহায়ও বটে।" 'সাপ্তাহিক অমৃত', ২২ জুলাই ১৯৭৭

২৯ অজিতেশ নাট্যসংগ্রহ, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত। প্রথম খণ্ডে (১৯৮৬) আছে - মঞ্জরী আমের মঞ্জরী, শের আফগান, তিন পয়সার পালা। দ্বিতীয় খণ্ডে (১৯৮৮) আছে - শরতের মেঘ, সওদাগরের নৌকা, পাপ পুণ্য, তামুক সেবনের উপকারিতা। তাঁর সেতুবন্ধ নবগ্রন্থ কুটির থেকে স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশিত হয়েছে। চেখভের সাতটি একাঙ্ক ১৯৮৯-এ প্রকাশিত।

৩০ দক্ষিণ কলকাতায় টালিগঞ্জ থানার বিপরীত স্থানে প্রথমে খোলা মাঠে স্টেজ বেঁধে ত্রিপল দিয়ে ছাউনি-ঘেরা এই মুক্তাঙ্গন ১৯৬৬ সালে অগ্নিদগ্ধ হয়। শুধু একটি গোষ্ঠী নয়, সমগ্রভাবে গ্রুপ থিয়েটারগুলিও এই ঘটনায় দারুণ ধাক্কা পায়। তাদের অনেকে পথনাটক করে ও পথ-পরিক্রমা করে অর্থসংগ্রহ করেছিল। কলকাতার নাট্যইতিহাসের আলোচ্য পঁচিশ বছরের একেবারে সূচনাপর্বে এটি স্মরণযোগ্য ঘটনা।

৩১ বাংলা সাহিত্যের কোনো গল্প-উপন্যাস অবলম্বনে নাট্যীকৃত রচনাকে মৌলিকই বলা যায় মূল উৎস বিদেশী বা অন্য ভাষার হয় বলে। অধ্যাপক সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় শৌভনিক-অভিনীত নাটক সম্পর্কে বলেছেন, "A survey of Souvanik's productions will show their extraordinary range, from ancient Sanskrit and Greek classics to modern English and Hindi plays in translation, besides Shakespeare, Tagore, D L Roy, Manmatha Roy, Badal Sircar and others." —পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮০

৩২ মনোজ মিত্রের কোথায় যাব, নেকড়ে, বাবা বদল নাটকগুলি রবীন্দ্র লাইব্রেরি থেকে, নীলকণ্ঠের বিষ জাতীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে এবং অশ্বত্থামা, কাক চরিত্র ও অন্যান্য, কিনু কাহারের থেটার, কেনারাম বেচারাম, মুক্তভাঙা মধু,

নরক গুলজার, নৈশভোজ, পরবাস, পাহাড়ি বিছে, বেকার বিদ্যালংকার, মেষ ও রাক্ষস, রাজদর্শন, শিবের অসাধ্য, শুকসারী, সত্যি ভূতের গপ্পো, সাজানো বাগান এবং মনোজ মিত্রের শ্রেষ্ঠ একাঙ্ক নবগ্রন্থ কুটির থেকে প্রকাশিত হয়েছে ।

৩৩ প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ইন্দ্রজিৎ-রচিত বিদ্রোহী নজরুল (১৯৭২) নাটকটি চারণ দলের প্রযোজনা । এটি অবশ্য সংগীতবহুল নয়, রাজনৈতিক বক্তব্যপ্রধান নাটক ।

৩৪ শেখর চট্টোপাধ্যায়ের একাঙ্ক সংকলন, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ ১৩৮১ । এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে প্রতিধ্বনি, পতঙ্গ ও চক্রব্যূহ । তা ছাড়াও ফরিয়াদ জন্মগত প্রতিপক্ষ প্রতিধ্বনি এগুলিও তাঁর চেনা একাঙ্ক নাটক । জন্মগত নাটক সম্পর্কে সাধনা রায়চৌধুরী একটি স্মৃতিচারণায় লিখেছেন—

"শেখর এল টি জিতে ছিল দীর্ঘদিন । ১৯৫৮ সাল নাগাদ এল টি জি থেকে বেরিয়ে নতুন দল গড়ার কথা ভাবছিল ও । এবং এই ভাবনা থেকেই থিয়েটার ইউনিটের জন্ম । কিন্তু শুধু দল গড়লেই তো হবে না, নাটক চাই, চাই প্রযোজনা । এসব নিয়ে ভাবনাচিন্তা চলছে, এমন সময় তরুণ রায়ের কাছ থেকে একটা প্রস্তাব এল — থিয়েটার সেন্টারে একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতায় থিয়েটার ইউনিট অংশগ্রহণ করুক । ... কী নাটক করব এটাই ছিল আমাদের জিজ্ঞাসা । হঠাৎই একদিন হৈ হৈ করে উঠল শেখর। কী, না, নাটকের প্লট পেয়ে গেছে। নাটক লেখাও হয়ে গেল রাতারাতি । জন্ম হল 'জন্মগত'-র । এই হল জন্মগত নাটকের জন্মকথা ।" সাধনা রায়চৌধুরী, "জন্মগত নাটক প্রসঙ্গে কিছু কথা"— 'নাট্যচিন্তা' শারদ ১৯৯০, পৃ. ৪০

৩৫ জংলি । ললিতা সত্যেন মিত্র-কর্তৃক রূপান্তরিত, ছায়ায় আলোয় অশোক মুখোপাধ্যায়-কর্তৃক রূপান্তরিত । সত্যেন মিত্রের মৌলিক নাটক চাই হৃদয় চাই একটি একাঙ্ক । এটি ১৯৭০-এ থিয়েটার ওয়ার্কশপ মঞ্চস্থ করে । অশোক মুখোপাধ্যায় ব্রেশ্‌ট-এর ইন সার্চ অফ জাস্টিস নাজীর বিচার নামে, লাক্‌স ইন দ্য টেনেব্রিস পাঁচু ও মাসি নামে, টলস্টয়ের ইট ইজ দ্য কজ অফ ইট অল দ্রব্যগুণ নামে, আর্নলড় ওয়েস্কারের চিকেন সুপ উইথ বার্লি বেলা অবেলার গল্প নামে, ব্রেশ্‌ট-এর সোয়াকি ইন দ্য সেকেণ্ড ওয়ার্লড ওয়ার সোয়াইক গেল যুদ্ধ নামে রূপান্তরিত করেন ।

৩৬ অবশ্য চেতনার উলকি-র নাট্যরূপ দিয়েছিলেন দেবব্রত মুখোপাধ্যায় এবং জ্যেষ্ঠপুত্র (আলেকজাণ্ডার ভাম্পিলভ) রূপান্তরিত করেন তরুণ ঘটক ।

৩৭ সতী (১৯৮৭), প্রত্যাশা (১৯৮৯) ও বানজারা (১৯৯১) এই তিনটির নাট্যকার চন্দ্রা দস্তিদার ।

৩৮ রাণী কাহিনীর রূপান্তর করেছেন প্রশান্ত দেব ; আগশুদ্ধি সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায়-কর্তৃক রূপান্তরিত ; পাখি অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় রূপান্তরিত করেছিলেন । শরণাগত কাহিনীর নাট্যরূপ দিয়েছেন এই দলের শক্তিমান নির্দেশক ও নট রমাপ্রসাদ বণিক । এঁদের আর-একটি নাট্যরূপান্তর টেনেসি উইলিয়াম-এর এ স্ট্রিট কার নেম্‌ড ডিজায়ার অবলম্বনে ইচ্ছে গাড়ি । রূপান্তর ইন্দ্রাশিস লাহিড়ীর ।

৩৯ ইহুদি স্ত্রী ও গুপ্তচর নাট্য রূপান্তরিত হয়েছে পবিত্র সরকার ও সোহাগ সেনের দ্বারা ; আবার দেখা হবে অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের রূপান্তর । এঁদের উত্তরাধিকার ও পার্টি এই দুটি মারাঠী নাটকের বাংলায় নাট্যরূপ দিয়েছেন উজ্জ্বল সেনগুপ্ত ।

৪০ মেদেয়া-র নাট্যরূপ অভিজিৎ সেনের, শাদা ঘোড়া, রাজা লীয়র ও তুঘলকের নাট্যরূপ দিয়েছেন নির্দেশক-অভিনেতা সলিল বন্দ্যোপাধ্যায় ।

৪১ যেমন প্রেমচাঁদের কাহিনী অবলম্বনে লাঠি, প্রমথ চৌধুরীর কাহিনী অবলম্বনে স্বদেশী নকশা, পরশুরামের কাহিনী অবলম্বনে যশোমতী ইত্যাদি । কিছুকাল পূর্বে একটি আলোচনা সভায় মোহিত চট্টোপাধ্যায় আমাদের নাট্যসাহিত্যের সমৃদ্ধির অনুকূলে দুটি আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছিলেন, কবিদের দিয়ে নাটক রচনায় উদ্দীপ্ত করা এবং দেশের কথাসাহিত্য থেকে নাটকের উপকরণ সংগ্রহ করা । তাঁর ভাষায়, "কবিরা নাটক লিখলে নাটকে একটা নতুন মাত্রা আসে,

নাটকের মধ্যে একটা ভিন্নতা আসে। একটা নতুন হাওয়া বইতে শুরু করে।" তিনি আরো বলেন যে, প্রতিষ্ঠিত বা পরিচিত কথাসাহিত্যিকদের গল্প-উপন্যাসগুলিকে নাট্যরূপ দিয়ে মঞ্চস্থ করলে "কথাসাহিত্যিকদের সঙ্গে আমাদের একটা ঘনিষ্ঠতা, একটা র‍্যাপোর্ট তৈরি হতে পারত। এই র‍্যাপোর্ট এই ঘনিষ্ঠতার পথ ধরেই হয়তো তাঁরা অনেক ভালো লেখা লিখতে পারতেন। আমাদের মৌলিক নাটকের যে অভাবের কথা আমরা বলি, সে অভাব এঁদের মাধ্যমেই খানিকটা পূরণ হতে পারত।" —'নাট্যচিন্তা' শারদ সংখ্যা ১৯৯০, পৃ. ২১

৪২ "নবনাট্য বলতে তখন কেবল বোঝাত পার্টি-নিয়ন্ত্রিত গণনাট্য সঙ্ঘের আন্দোলনবদ্ধ ও সম্পূর্ণ রাজনৈতিক লক্ষ্যকেন্দ্রিক নাটক থেকে আলাদা হয়ে নানা ধরনের দেশী বিদেশী নাটক ও অভিনয়গত পরীক্ষানিরীক্ষার ধারাটিকে। ... এ সময় উৎপল দত্ত স্যামুয়েল বেকেট-এর ওয়েটিং ফর গোদো-র অনুবাদ করেন এবং গণনাট্যেরই একটি শাখা তা অভিনয় করেন এই যুক্তিতেই সম্ভবত যে, এটি পৃথিবীর নাট্যসাহিত্যের একটি বড়ো কীর্তি, সুতরাং এর সঙ্গে বাঙালি দর্শকদের পরিচয় হওয়া দরকার। ... কিন্তু ওয়েটিং ফর গোদো নিয়ে কিছু তত্ত্বগত তর্কবিতর্ক শুরু হয়। সকলেই জানেন বেকেটের নাটক থেকে ইয়োরোপের নাট্যসাহিত্যে অ্যাবসার্ড বা কিমিতিবাদী (মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের পরিভাষা) নাটকের ধারা আরম্ভ হয়।এই অ্যাবসার্ড নাটকগুলিতে সাধারণভাবে সমষ্টির বিরুদ্ধে ব্যক্তিকে প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করানো হয় এবং সমষ্টির চাপে ও 'অত্যাচারে' ব্যক্তির সংকট, ক্ষয় ও ধ্বংস বা ব্যক্তিত্ব বিনষ্ট হয়ে যান্ত্রিক সমষ্টি-ধর্ম অর্জন দেখানো হয়।... কমিউনিস্ট পার্টি ও মার্ক্সবাদে বিশ্বাসী বামপন্থী মহলে ব্যক্তিসংকটের উপর অতিরিক্ত ঝোঁক দেওয়া, সমষ্টিকে নির্বোধ, আবেগ ও মমতাহীন করে দেখানো, এবং সাধারণভাবে আশ্বাসহীন ও নৈরাশ্যবাদী এই সব নাটকের প্রতিকূল এই সমালোচনা শুরু হয়। নাটককে যাঁরা সমাজ পরিবর্তনের অস্ত্র বলে মনে করেন তাঁদের পক্ষে এই সমালোচনা করা স্বাভাবিক ও সংগত।" —পবিত্র সরকার, "ত্রিশ বছরের বাংলা নাটক" প্রবন্ধে 'নাটমঞ্চ ও নাট্যরূপ', পৃ. ১৩৯

৪৩ "মূল নাট্যকার পিরানদেল্লোর মুসোলিনীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা এবং অবক্ষয়বাদী দর্শনের বিষয় এঁদের (অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত) অজানা থাকার কথা নয়। তা সত্ত্বেও যে এঁরা নাটকটির প্রকরণগত চমক দেখে আকৃষ্ট হয়েছিলেন তাতে বোঝা যায় নাটকের বাইরের কারুকৌশল দেখে তার মধ্যবর্তী ভারতীয় সমাজব্যবস্থার সঙ্গে সংগতিহীন এবং কিছুটা প্রতিক্রিয়াশীল বক্তব্য এঁদের কাছে গুরুত্ব পায় নি।" —পবিত্র সরকার, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৫

৪৪ বহুরূপীই প্রথম সৎ থিয়েটারের কথা বলেছিল। দ্রষ্টব্য সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়ের পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৩৬৭

৪৫ পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৩৭৩ ; ঐ গ্রন্থের ৩৭৪ পৃষ্ঠায় রূপকার গোষ্ঠীর ও গন্ধর্ব গোষ্ঠীরও আদর্শ উদ্ধৃত হয়েছে।

৪৬ জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত মাস থিয়েটার্স-এর পরিচিতি প্রসঙ্গে সুশীল মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, এই দলটি নিজেদের অরাজনৈতিক সংস্থা বলে দাবি করে (ঐ, পৃ. ৩৮৫)। আবার গণনাট্য সঙ্ঘের জনৈক নাট্যকর্মী অন্যত্র লিখেছেন, "প্রখ্যাত অভিনেতা ও পরিচালক জ্ঞানেশ মুখার্জি মার্কসবাদী তত্ত্ব জানেন না বা নাটক পরিচালনা এবং অভিনয়ের ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করেন না, একথা আর যেই বলুক আমার পক্ষে ভাবাটা একটা গর্হিত অপরাধ।" —'গণনাট্য' শারদীয় সংখ্যা, ১৯৮৭, পৃ. ৮৬

৪৭ শম্ভু মিত্র, 'প্রসঙ্গ নাট্য', পৃ. ১৩১

৪৮ "নাট্য পরিচালনা অভিজ্ঞতার পুঁজি", বাসুদেব বসু, 'গণনাট্য', শারদীয় ১৯৮৭, পৃ. ৮৪-৮৫

৪৯ "আমরা যারা গ্রুপ থিয়েটারে কাজ করি তাদের মধ্যে যারা মাঝারি শ্রেণীর এবং অধিকাংশের দলে, তারা চাকরিবাকরি করে সংশ্লিষ্ট কাজটিকে কাল্পনিক আন্দোলনের ছাপ দিয়ে শুদ্ধিকরণ করে প্রগতিশীলতা দাবি করি। আমরা গ্রামে যাই না, অবশ্যই গ্রামে যাবার একটা শৌখিন তাগিদ ভেতরে আছে, জনগণের যে বড়ো কষ্ট, তারা যে শিক্ষিত পরিশীলিত সংস্কৃতি থেকে অনেক দূরে অন্ধকারে বসবাস করছে এজন্য আমাদের হৃদয়বেদনার মধ্যে কোনো

জ্ঞান নেই। কিন্তু মধ্যবিত্ত বিদ্বান লোকেরা কাঁচা টাকা আর পাকা নামের প্রত্যাশী, গ্রামে গিয়ে হবেটা কী?" —উৎসের দিকে ফেরা, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ (১৯৯১), পৃ. ১৩

৫০ পবিত্র সরকার, পৃ. ২৬১-৬২

৫১ তদেব, পৃ. ২৬৩

৫২ তদেব, পৃ. ২৫৯

৫৩ "নবান্নের যুগচেতনা সম্পর্কে অবহিত না থাকলে শিশিরকুমার কখনই তদানীন্তনকালে দুঃখীর ইমান মঞ্চস্থ করতে ব্রতী হতেন না। এই নাট্য প্রযোজনার মূলে দীনদুঃখীর ইমান সম্পর্কে শিশিরকুমারের প্রত্যক্ষ সমাজসচেতনতার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।" —"শিশিরকুমার ও যুগনেতা", 'বহুরূপী' ৭২ সংখ্যা (১৯৮৯), পৃ. ১৪০

প্রবন্ধ

১

'সভ্যতার সংকট'-এর পরে পঁচিশ বছর

শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়

১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ১ বৈশাখ, ১৯৪১ সালের ১৪ এপ্রিল রবীন্দ্রনাথের অশীতিবর্ষপূর্তি জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হল শান্তিনিকেতনে। এই উপলক্ষে কবি লিখিত ভাষণ 'সভ্যতার সংকট' প্রস্তুত করলেন। জন্মোৎসব উপলক্ষে কবির শেষ ভাষণ, তাঁর জীবনের শেষ প্রবন্ধ। প্রচলিত সংজ্ঞা অনুযায়ী নিছক প্রবন্ধ বললে একে যথার্থ মর্যাদা দেওয়া হয় না। এ যেন ত্রিকালদর্শী প্রাজ্ঞপুরুষের দীর্ঘ জীবন-অভিজ্ঞতার নির্যাস, মানবসভ্যতার এক গভীর সংকটের স্বরূপ নির্ণয় এবং তা থেকে উত্তরণের পরম আশ্বাসবাণী। শেষ করলেন ঋষিবাক্য উচ্চারণে,

অধর্মেনৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি।

তার পর গীত হল এই উপলক্ষেই রচিত 'ঐ মহামানব আসে'—যা পরে প্রবন্ধের উপসংহারে সংযোজিত হয়েছিল প্রবন্ধের অঙ্গরূপেই। প্রসঙ্গ, উপস্থাপনা, উপসংহার সব মিলে রবীন্দ্রনাথের এই শেষ প্রবন্ধটি বাংলা সাহিত্যের এক অনন্য সম্পদ হয়ে রয়েছে। এই ঐতিহ্য সম্বল করে পরবর্তীকালের বাংলা প্রবন্ধসাহিত্য যাত্রা শুরু করেছে। পরবর্তী পঞ্চাশ বছরে বৈচিত্র্যের বিস্তার ঘটেছে নিঃসন্দেহে। তবে মানের ঊর্ধ্বায়ণ ঘটেছে কিনা তা আলোচনাসাপেক্ষ।

পরবর্তী পঞ্চাশ বছরে যাঁরা বাংলাসাহিত্যে এসেছেন, তাঁদের মধ্যে, বিশেষত প্রথমপর্বের একটি অংশ নিশ্চিতভাবে রবীন্দ্রঅনুগামী, তবে সকলেই রবীন্দ্রধারার অনুবর্তী নন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১-১৯৫১)-কে রবীন্দ্রনাথ 'বাংলাদেশে সরস্বতীর বরপুত্রের আসনে সর্বাগ্রে আহ্বান' করেছিলেন। অবনীন্দ্রনাথের যে-সব রচনাকে যথার্থ প্রবন্ধরূপে গ্রহণ করা যায় সেগুলি রচিত হয়েছে ১৯৪১ সালের পূর্বে। 'ভারত শিল্প' প্রকাশিত হয়েছে ১৯০৯ সালে, 'বাংলার ব্রত' ১৯১৯ সালে। এমন-কি 'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী' (১৯৪১)-র বক্তৃতাগুলি ১৯২১-১৯২৯ সালে প্রদত্ত এবং ১৩২৮-১৩৩৩ বঙ্গাব্দে সাময়িকপত্রে প্রকাশিত, আর 'ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ' (১৯৪৭)-এর প্রবন্ধগুলি সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়েছে ১৩২১ বঙ্গাব্দে। এই প্রবন্ধগুলি ইংরেজি এবং ফরাসি ভাষায় অনূদিত হয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবার পর বাংলায় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হতে ১৯৪৭ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল। 'ভারতশিল্পে মূর্তি' (১৯৪৭)-ও সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল ৩৪ বছর আগে। 'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী' পরবর্তীকালে অবনীন্দ্রনাথ-কৃত সংক্ষিপ্ত রূপ 'শিল্পায়ন' (১৯৫৪)-নামে প্রকাশিত হয়। ভূমিকায় অবনীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'যাত্রীতে-যাত্রীতে পথ চলতে-চলতে' কথার মতো করে গাঁথা হয়েছিল এই সমস্ত প্রবন্ধ...নানা অবান্তর কথা এবং একই কথা ঘুরিয়ে-ফুরিয়ে বলায় অনর্থক ভারগ্রস্ত

ও দীর্ঘ হয়ে গিয়েছিল অনেকগুলো প্রসঙ্গ...পড়বার সময় আমারই ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে, পাঠকদের তো হবেই। ... সুতরাং কিছু অদল-বদল করতে হল পুরাতন লেখার মধ্যে, নতুন চিন্তাও কিছু-কিছু...যোজনা করে দিতে হয়েছে ।... কাঁচি নির্ভয়ে চালিয়েছি, আসলটুকু যাতে নষ্ট না হয় এইভাবে সংক্ষেপ করেছি বক্তব্য।' অর্থাৎ 'শিল্পায়ন'-এ যথার্থ প্রবন্ধরচনার প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছিল। 'বাংলার ব্রত'-ও প্রথম প্রকাশের ২৪ বছর পরে ১৯৪৩ সালে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশিত হয়েছিল। নানা সময়ে নানা উপলক্ষ শিল্প বিষয়ে অবনীন্দ্রনাথের ভাবনা এবং বক্তব্য এই গ্রন্থ কয়খানির মধ্যে সংক্ষিপ্ত হয়েছে। অধিকাংশ রচনাই সাময়িক পত্রে মুদ্রিত হয়েছে অনেক কাল আগে। তবে কোনো লেখক কোন্ লেখা কবে লিখেছেন সেটা তাঁর দিক দিয়ে যেমন জরুরি, সে রচনা কবে গ্রন্থাকারে বৃহত্তর পাঠক-সমাজের কাছে সহজলভ্য হয়েছে পাঠকের দিক দিয়ে সেটাও কম জরুরি নয়। কারণ বৃহত্তর পাঠকসমাজ সহজে যখন পড়তে পারেন তখন থেকেই তো লেখকের রচনার প্রতিক্রিয়া বা প্রভাবের সূচনা। ইতিহাসে তার গুরুত্ব কখনোই কম নয়। তা ছাড়া লেখক সময়ের ব্যবধানে তাঁর রচনার কতটুকু স্বীকার করেন, কতটুকু রাখেন, কতটা বর্জন করেন, কতটা পালটান তারও একটা সুযোগ ঘটিয়ে দেয় সাময়িক পত্র থেকে গ্রন্থে উত্তরণের উপলক্ষ। এই কারণে 'ভারতশিল্প' (১৯০৯) এবং 'বাংলার ব্রত' (১৯১৯) ছাড়া অন্য কয়খানা গ্রন্থ আমাদের কালপর্বে আলোচ্য। শিল্প বিষয়ে বাংলা ভাষায় খুব বেশি আলোচনা হয় নি, অবনীন্দ্রনাথ যে অধিকার বলে ভারতশিল্প প্রসঙ্গে আলোচনা করতে পারেন, তেমন যোগ্যতাই বা কার ছিল। অবনীন্দ্রশিষ্য নন্দলাল বসু (১৮৮৩-১৯৬৬)-র 'শিল্পকথা' প্রকাশিত হয় ১৯৪৪ সালে—তারও অধিকাংশ রচনা মৌখিক আলাপ-আলোচনা বা প্রশ্নোত্তরের ভিত্তিতে রচিত, একটি রচনার প্রথম প্রকাশন ১৯৩৬। 'ভূমিকা'য় নন্দলাল লিখেছিলেন, 'আমি সাহিত্যিক নই। ভাষার শিল্প আমার জানা নেই।' যদিও বাচনভঙ্গিতে অবনীন্দ্রনাথের প্রভাব একেবারে অনুপস্থিত নয়। নন্দলালের অপর গ্রন্থ 'শিল্পচর্চা' প্রকাশিত হয় ১৯৫৬ সালে। অবনীন্দ্রনাথের শিল্পবিষয়ক রচনার চেয়ে তাঁর স্মৃতিকথামূলক রচনাগুলিই অবনীন্দ্রনাথকে যথার্থ বাণীশিল্পীর প্রতিষ্ঠা দিয়েছে । স্মৃতিকথামূলক রচনা নিশ্চয়ই প্রবন্ধ হিসেবে স্বীকার্য নয় । তবুও তাঁর ঘরোয়া (১৯৪১), জোড়াসাঁকোর ধারে (১৯৪৪) বা আপন কথা (১৯৪৬), যার অনেকখানিই মুখে মুখে বলা, বাংলা গদ্যে এমন কিছু প্রভাব রেখে গেছে, যার অনুল্লেখ সংগত নয়। বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় একদা অবনীন্দ্রনাথের ভাষা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'অবনীন্দ্রনাথের সাহিত্য-রচনা আর তাঁর ছবি রচনা, এই দুয়েরই সবচেয়ে বড়ো আকর্ষণ ভঙ্গি — দেখাবার জন্য দেখানো, বলবার জন্য বলা।' এবং এই কারণেই লীলা মজুমদারের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বাধা হয় না যে, 'অবনীন্দ্রনাথ যেমন কারও অনুকরণ করেন নি, তেমনি অবনীন্দ্রনাথেরও কোনো উল্লেখযোগ্য অনুকরণ হয় নি । কেবলমাত্র তাঁর রবিকাকার 'সে' পড়লে একটা সাদৃশ্যের কথা মনে হয় ।' 'সে'-র প্রকাশ ১৯৩৭ সালে । অবনীন্দ্রনাথের ভাষার অনুকরণ হয় নি বটে, তবে এই বৈঠকি ঢঙের আভাস ছিল 'সবুজপত্র' গোষ্ঠীর অনেকের রচনায় । তবে সেখানে ঢঙটাই বৈঠকি, বিষয়টা বৌদ্ধিক, যাকে বলে ইনটালেকচুয়াল।

'সবুজপত্র গোষ্ঠীর প্রধান প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬)-র অন্তত তিনটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে আমাদের কালপর্বে। তাঁর একশো চোদ্দো পৃষ্ঠার 'আত্মকথা' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৪৬ সালে। এখানে তাঁর বিলাত যাত্রা (১৮৯৩) পর্যন্ত স্মৃতিকথা লিপিবদ্ধ হয়েছিল, পরবর্তীকালের খানিক স্মৃতিকথা দুটি পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। স্মৃতিকথা প্রবন্ধসাহিত্য-বহির্ভূত। তবু প্রমথ চৌধুরীর স্মৃতিকথায় খানিক প্রবন্ধের মেজাজ দুর্লক্ষ্য নয় । প্রমথ চৌধুরীর 'হিন্দু সংগীত' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৪৫ সালে, আরেকখানি অতি ক্ষুদ্র পুস্তিকা 'প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান' তাঁর মৃত্যুর পর ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত হয়, এই সামান্য রচনার ভিত্তিতে প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধসাহিত্যের বিচার সম্ভবও নয় সংগতও নয় । তবে 'সবুজপত্র' গোষ্ঠীর প্রসঙ্গে এই ভূমিকাটুকু একেবারে

অবান্তর নয় ।

'সবুজপত্র' গোষ্ঠীর অন্যতম লেখক অতুলচন্দ্র গুপ্ত (১৮৮৪-১৯৬১)-র রচনার পরিমাণ তাঁর যোগ্যতার তুলনায় নিতান্তই সামান্য। অতুলচন্দ্র গুপ্তর শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'কাব্যজিজ্ঞাসা' ১৯২৬ সালে সবুজপত্রে বেরয়, গ্রন্থাকারে বেরয় তার দু বছর পরে। এই একটিমাত্র অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র গ্রন্থেই প্রাবন্ধিক হিসেবে অতুলচন্দ্রের প্রতিষ্ঠা । ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত 'ইতিহাসের মুক্তি'র দুটি প্রবন্ধ ১৯১৭ এবং ১৯২৭ সালে রচিত । অন্য দুটি প্রবন্ধ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৫৫ সালে প্রদত্ত অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বক্তৃতা । গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয়েছিল এই ভাবে 'বাংলার নবীন ঐতিহাসিকগণকে একজন সাধারণ ইতিহাস-পাঠকের এই অনধিকার চর্চা উৎসর্গ করিলাম ।' কিন্তু 'ইতিহাস' প্রবন্ধের শেষ বাক্যটি তাঁর অধিকারের যথার্থ পরিচয় বহন করে । সেখানে তিনি বলেছেন, 'ইতিহাস জীবনের সৃষ্টিলীলার দর্শক । এ লীলার কলাকৌশল বুঝলেই সৃষ্টির ক্ষমতা আসে না, যেমন কাব্য বুঝলেই কবি হওয়া যায় না । তা যদি হত তবে মমসেন ইতিহাসের পুঁথি না লিখে একটা রাজ্য স্থাপন করতেন, আর ব্রাড়লির হাতে আর একখানা হ্যামলেট লেখা হত ।' অতুলচন্দ্র কবুল করেছিলেন 'কাব্য বুঝলেই কবি হওয়া যায় না ।' এ যেন তাঁর আত্মসমীক্ষা । 'কাব্যজিজ্ঞাসা'র মতো অসাধারণ গ্রন্থ লিখেও তিনি কাব্য রচনার চেষ্টা করেন নি । কিন্তু 'সবুজপত্র' গোষ্ঠীর সকলেই তেমন ছিলেন না । অধিকাংশ প্রাবন্ধিক একাধারে প্রাবন্ধিক এবং কবি বা কথাসাহিত্যিক । স্বয়ং প্রমথ চৌধুরী তার ব্যতিক্রম নন । ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৬১) তাঁর অন্তঃশীলা (১৯৩৫) আবর্ত (১৯৩৭) মোহানা (১৯৪৩) এই উপন্যাসত্রয়ীর সূত্রে বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন । অন্নদাশঙ্কর রায় (জ. ১৯০৪)-এর ছয় খণ্ডের 'সত্যাসত্য' তাঁকে উপন্যাসের ক্ষেত্রে একদা যথেষ্ট খ্যাতি দিয়েছিল । অতুলচন্দ্র ছাড়া সবুজপত্রের আর যিনি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের অনুরোধসত্ত্বেও উপন্যাসের ক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন না তিনি সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় । তবে 'সবুজপত্র' গোষ্ঠীর লেখকসমাজ কবিতাই লিখুন আর উপন্যাসই রচনা করুন, তাঁদের সকল রচনাই হৃদয়গ্রাহীর চেয়ে মস্তিষ্কস্পর্শী অনেক বেশি । সেখানে তাঁরা আপন বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রেখেছেন । সবুজপত্র বাংলা গদ্যে চলতি ভাষা প্রচলনে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিল ঠিকই । তবে গদ্যের একটি বিশেষ ভঙ্গি প্রচলনেই এই গোষ্ঠীর ঐতিহাসিক ভূমিকা সীমাবদ্ধ নয়, বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যে বৌদ্ধিক চর্চার যথার্থ অনুশীলনও ঘটেছে এই গোষ্ঠীর লেখনীতে । প্রমথ চৌধুরী সফল ব্যারিস্টার না হলেও পেশায় ছিলেন আইনজীবী । অতুলচন্দ্র ছিলেন সফল আইনজীবী । অন্নদাশঙ্কর আই. সি. এস.-এর সূত্রে আইনচর্চার সঙ্গেই জড়িত ছিলেন দীর্ঘকাল । ধূর্জটিপ্রসাদ এবং সুনীতিকুমার আইনের চর্চায় ছিলেন না বটে, তবে অর্থনীতি এবং ভাষাতত্ত্বের সূত্রে এঁদেরও জীবনের অনেকখানি কেটেছে মস্তিষ্কচর্চায় । মস্তিষ্কচর্চার এই অনুশীলন বাংলা প্রবন্ধকে কিছুটা নিশ্চয়ই প্রভাবিত করেছে । বাংলা প্রবন্ধ এই সূত্রেই আবেগ থেকে বৌদ্ধিক স্তরে উত্তীর্ণ হয়েছে । রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ আপন স্বকীয়তায় উজ্জ্বল, তবে তাঁর প্রবন্ধে যুক্তির চেয়ে নিখুঁত দৃষ্টান্ত বা সমান্তরাল কাহিনী উপস্থাপন পাঠকের তর্ক প্রবৃত্তিকে স্তব্ধ করত অনায়াসে । পরবর্তী কালের প্রাবন্ধিকরা এ পদ্ধতিতে পাঠকমনকে আপন পথে টানতে পারেন নি । ইতিমধ্যে যুক্তির প্রত্যাশা বেড়ে গেছে পাঠকচিত্তে । সেই আবেগবর্জিত বিশ্লেষণ-দৃষ্টি ধূর্জটিপ্রসাদের উপন্যাসে বিশেষ ছাপ ফেলেছে । সে কথা রবীন্দ্রনাথ তাঁকে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন । আলোচ্য কালপর্বের পূর্বে প্রকাশিত 'আমরা ও তাঁহারা' (১৯৩১) এবং 'চিন্তয়সি' (১৯৩৩) দুটি প্রবন্ধ গ্রন্থই তাঁর উপন্যাসেরই সমগোত্রীয় । সংলাপের আকারে প্রবন্ধগুচ্ছ 'আমরা ও তাঁহারা'-য় খানিকটা সেকালের বিদগ্ধ বৈঠকখানার পরিশীলিত কথোপকথনের মেজাজ ভাষা আর প্রসঙ্গ । ধূর্জটিপ্রসাদের 'মনে এলো' (১৯৫৬) এবং 'ঝিলিমিলি' (১৯৬৫) ধূর্জটিপ্রসাদের গ্রন্থপ্রীতির পরিচয় বহন করে । যদিও তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত 'ঝিলিমিলি'র জন্য লিখিত মুখবন্ধে ধূর্জটিপ্রসাদ বলেছিলেন, 'মনে এলো নিতান্ত পুস্তকাশ্রিত ... ঝিলিমিলিতে ... বই পড়ার অনেক

পরের কথা ... স্থান পেয়েছে ।' তাঁর অপর প্রবন্ধ সংকলন 'বক্তব্য' (১৯৫৭) অনেক বেশি সযত্ন প্রবন্ধ সমষ্টি। এ সংকলনে তাঁর পঁচিশ বছরের মধ্যে লেখাগুলি তিনটি মোটা সূত্রে সাজানো - ইতিহাস, রবীন্দ্রনাথ এবং অথ কাব্যজিজ্ঞাসা । রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত ভাবনাগুলিও সমাজতত্ত্বকে ঘিরে । অপর দুটি প্রসঙ্গে তো ধূর্জটিপ্রসাদের মার্কসবাদী ঝোঁক বেশ স্পষ্ট । যদিও মার্কসবাদী প্রাবন্ধিকদের মধ্যে ধূর্জটিপ্রসাদের ব্যক্তিগত ঝোঁক বা স্বাতন্ত্র্য বোধ তাঁকে ভিড় থেকে একটু সরিয়ে রেখেছিল । সবুজপত্র গোষ্ঠীর কোনও প্রাবন্ধিক স্পষ্টত কোনও রাজনৈতিক মতাদর্শে দীক্ষা গ্রহণ করেন নি ঠিকই তবে ধূর্জটিপ্রসাদ, অতুলচন্দ্র, সুনীতিকুমার, এমন-কি অন্নদাশঙ্কর কেউই রাজনৈতিক মতাদর্শের ব্যাপারে গোঁড়ামি দেখান নি, বরং উদার মানবিক দৃষ্টি নিয়ে এঁরা এঁদের কর্মক্ষেত্রে প্রগতিধারারই ঘনিষ্ঠ হয়েছেন । সবুজপত্রের যুক্তিসমৃদ্ধ উদার দৃষ্টি তাঁদের জীবনের এই ভূমিকার পিছনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে মনে হয় । অন্নদাশঙ্করকে তো টলস্টয়পন্থী বলা যেতে পারে । তাঁর চিন্তা টলস্টয় গান্ধীর অনুকূলেই সঞ্চারিত । অন্নদাশঙ্করের 'ইশারা' (১৯৪২)-য় ১৯২৯ থেকে ১৯৪১ সালের মধ্যে রচিত ছয়টি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে এবং পরবর্তী সংস্করণে আরেকটি পুরোনো রচনা (১৯৩৪) সংযোজিত হয় । 'বিনুর বই' (১৯৪৪) যদিও কতকগুলি ছোটো ছোটো প্রবন্ধের সংকলন তবে লেখকের মতে 'এটি একটি টানা গোটা রচনা ।' এই 'বিনুর কাহিনী'র প্রথম আবির্ভাব ঘটে 'জীবনশিল্পী' (১৯৪১)-তে । 'জীয়নকাঠি' (১৯৪৯)-তে 'সংকটকালে সাহিত্যিকের কর্তব্য কী' এই প্রশ্নের উত্তর মাথায় রেখে ১৯২৮ থেকে ১৯৪৭ সালের মধ্যে লেখা বারোটি প্রবন্ধের সংকলন । ১৯৪৯ সাল থেকে ১৯৫৭ সালের মধ্যে অন্নদাশঙ্করের খানচারেক প্রবন্ধগ্রন্থে প্রায় আশিটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছিল যেগুলি ১৯২৮ থেকে ১৯৫৩ সালের মধ্যে রচিত । প্রবন্ধগ্রন্থগুলির নাম 'দেশকালপাত্র' (১৯৪৯), 'প্রত্যয়' (১৯৫১), 'আধুনিকতা' (১৯৫৩), 'কণ্ঠস্বর' (১৯৫৭) এ-সব প্রবন্ধে অন্নদাশঙ্কর বারে বারেই সাহিত্যের খাস দরবার ছেড়ে মানবতাবাদী ব্যক্তিত্ব এবং সমসাময়িক বিশ্ব সমস্যা সম্পৃক্ত প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন । তবে ধূর্জটিপ্রসাদ ব্যক্তিক উষ্ণতা রেখেও যতখানি তত্ত্বালোচনা করেছেন বা অতুলচন্দ্র যে প্রাঞ্জল ব্যাখ্যাতার ভূমিকা নিয়েছেন, অন্নদাশঙ্করের প্রবন্ধে সে তত্ত্বালোচনা বা ব্যাখ্যা লভ্য নয় । যদিও অন্নদাশঙ্করের ভাষায় আবেগ এবং বুদ্ধির সমন্বয় পাঠককে টেনে রাখে নিঃসন্দেহে । তত্ত্বের আলোচনার পরিবর্তে তথ্যসমৃদ্ধ প্রবন্ধ লিখলেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৯০-১৯৭৭) । তাঁর প্রবন্ধের ভিত্তি ভ্রমণ এবং পঠনসূত্রে প্রাপ্ত বিভিন্ন দেশ আর প্রাচীন ইতিহাস এবং সাহিত্য । সুনীতিকুমারের মূল অন্বিষ্ট সাহিত্য এবং সংস্কৃতি । এবং তাঁর অধিকাংশ প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য নতুন তথ্যের বিশ্লেষণ । বাঙালি পাঠককে তিনি দেশবিদেশের উপাখ্যান পরিবেশন করলেন 'বৈদেশিকী' (১৯৪৩) গ্রন্থে । এ-সব বিদেশী উপাখ্যান বাংলা ভাষায় আর কখনো আলোচিত হয়নি । বিদেশী উপাখ্যান নিয়ে যেমন আলোচনা করেছেন, তেমনি অনুসন্ধান করেছেন দেশীয় সংস্কৃতির উৎস । সেই সূত্রে দ্রাবিড়, কিরাতজন, কোল সংস্কৃতি নিয়ে তিনি বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা করে 'আর্যামি'র সংকীর্ণতা ভাঙতে চেয়েছিলেন । একই দৃষ্টি প্রসারিত হয়েছে আফ্রিকা বা মঙ্গোলিয়ার প্রতি । মানবসংস্কৃতির প্রতি এই শ্রদ্ধা সুনীতিকুমারের প্রবন্ধে ক্রমে বিকশিত হয়ে উঠেছিল— 'ভারত-সংস্কৃতি' (১৯৪৪) গ্রন্থে তার সূচনা 'সাংস্কৃতিকী' (প্রথম খণ্ড : ১৯৬২, দ্বিতীয় খণ্ড : ১৯৪৫, তৃতীয় খণ্ড : ;)-র নানা প্রবন্ধে তারই সমৃদ্ধি । এ ছাড়া সুনীতিকুমারের আরেক ধরনের প্রবন্ধের সূত্র তাঁর পরিব্রাজক চরিত্র, এগুলি প্রাথমিকভাবে ভ্রমণবৃত্তান্ত হলেও নিছকভ্রমণের ডায়েরি নয় । তাঁর 'ইউরোপ ১৯৩৮' (প্রথম খণ্ড : ১৯৪৪, দ্বিতীয় খণ্ড : ১৯৪৫), 'পথ-চলতি (প্রথম খণ্ড : ১৯৬২, দ্বিতীয় খণ্ড : ১৯৬৪) বা 'রবীন্দ্র-সংগমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যামদেশ' (১৯৬৫, প্রথম প্রকাশ : 'দ্বীপময় ভারত', ১৯৪০) শুধু রচনানৈপুণ্যেই নয় তথ্যসম্ভারেও পাঠকচিত্তকে তৃপ্ত করে । 'ইউরোপ ১৯৩৮' এবং 'পথ-চলতি' যে তিনি প্রমথ চৌধুরীকে উৎসর্গ করেছিলেন তা অনেকাংশে প্রবন্ধসাহিত্যের সূত্রে

গুরুস্মরণ । সুনীতিকুমারকে রবীন্দ্রনাথ 'ভাষাচার্য' সম্বোধন করেছিলেন । 'ভারতের ভাষা ও ভাষা-সমস্যা' (১৯৪৪) নামে তিনি যে গ্রন্থ রচনা করলেন তা ভাষাতত্ত্বের আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এ যেন ভাষাতাত্ত্বিকের বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিতে এক জাতীয় সমস্যার পর্যালোচনা । মানবতাবাদী সুনীতিকুমারের দেশচেতনার পরিচয় বহন করে এই প্রবন্ধগুলি । রবীন্দ্রনাথ সুনীতিকুমারের দৃষ্টি-শক্তি এবং সংগ্রহবৃত্তির প্রশংসা করতেন । মানুষের সাংস্কৃতিক স্বরূপ নির্ণয়ই ছিল সুনীতিকুমারের লক্ষ্য । এই অনুসন্ধিৎসা তিনি পেয়েছিলেন ভাষাতত্ত্ব পর্যালোচনার সূত্রে এবং রবীন্দ্র-সান্নিধ্যে । তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ভাষা এবং প্রমথ চৌধুরীর যুক্তিবাদের প্রভাব । বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে সুনীতিকুমার যে বিষয়বৈচিত্র্যের অবতারণা করেন তার সমকক্ষতা দুর্লভ । এইভাবেই বাংলা প্রবন্ধ রচনাবৈগুণ্যের শোভনতার পাশাপাশি বিষয়সম্পদেও সমৃদ্ধ হয়ে উঠল ।

বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে সাহিত্যবিষয়ক আলোচনাই পরিমাণে বেশি । এবং সেটাই স্বাভাবিক । এই সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধধারায় দার্শনিকতার সঙ্গে কিছুটা আধ্যাত্মিকতার মিশ্রণও ছিল । যদিও আধ্যাত্মিকতার সঠিক সংজ্ঞা নির্ণয় সহজ নয় । ঈশ্বর অস্তিত্ব বা ঈশ্বর ভক্তির ভিত্তিই এইজাতীয় আলোচনায় দেখা যায় । একদা নিছক অধ্যাত্মদর্শন নিয়ে বহু প্রবন্ধ রচনা করেছেন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৬৮-১৯৪২) । কিন্তু এ-জাতীয় রচনার পাঠক-সংখ্যা নিতান্ত সীমিত । নলিনীকান্ত গুপ্ত (১৮৮৯-১৯৮৪) নিজে অধ্যাত্মবাদী হয়েও বাংলা প্রবন্ধে বিশুদ্ধ সাহিত্যতত্ত্ব আলোচনায় একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন । তাঁর 'সাহিত্যিকা' আলোচ্য কালপর্বের পূর্বে প্রকাশিত । ১৯৪২ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ' আর 'শিল্পকথা' ১৯৪৮ সালে । রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে নলিনীকান্ত লিখতে শুরু করেন কবির সপ্ততিতম জন্মবর্ষ উপলক্ষে । আর রবীন্দ্র-জন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে রচিত কয়েকটি প্রবন্ধ 'রবীন্দ্রনাথ'-এর পরবর্তী সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত হয় । রবীন্দ্রপ্রসঙ্গে নলিনীকান্তের প্রবন্ধাবলীতে খুব-একটা নতুন কথা হয়তো নেই, তবে অজিতকুমার চক্রবর্তীর ধারা এই প্রবন্ধসমূহে অনেকাংশে অনুসৃত । নলিনীকান্তের সাহিত্য প্রেক্ষাপট য়ুরোপীয় সাহিত্য পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল । তার প্রভূত দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় তাঁর পরবর্তী প্রবন্ধসমূহে, যার অনেকগুলি 'কবিমনীষী'র বিভিন্ন পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল । নলিনীকান্ত যে যথার্থই সাহিত্যের ছাত্র ও বোদ্ধা, এই পর্যায়ের প্রবন্ধে তা স্পষ্ট হয় । নলিনীকান্ত সাহিত্য, বিশেষত কাব্যের নানা দিক নিয়েই আলোচনার চেষ্টা করেছেন, তাঁর অধ্যয়নের বিস্তৃতিও বিস্ময়কর । কিন্তু তাঁর দর্শনভাবনা, যোগসাধনা এবং ভক্তির বন্দনা তাঁর প্রবন্ধকে সাধারণ পাঠকের কাছে সহজগ্রাহ্য করে তোলে নি । যা করেছে পরবর্তীকালের অপর এক দর্শনের ছাত্র প্রাবন্ধিককে । শশিভূষণ দাশগুপ্ত (১৯১১-১৯৬৪) তাঁর 'শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ' (১৯৫২) গ্রন্থে দর্শন এবং সাহিত্যের যে সার্থক সমন্বয় করেছেন, তা বাংলা সাহিত্যে বিরল ।

দর্শন এবং সাহিত্যের সমন্বয় প্রবন্ধ সাহিত্যে দুর্লভ না হলেও রবীন্দ্রোত্তর বাংলা প্রবন্ধ অপর একটি বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল । সে হল বিজ্ঞানচেতনাসম্পন্ন প্রবন্ধসাহিত্য । সবুজপত্র গোষ্ঠীর লেখককুল এনেছিলেন যুক্তিবাদ, আর বাংলাসাহিত্যে বিজ্ঞানচেতনার ধারা অক্ষয়কুমার দত্ত এবং রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর সূত্রে রাজশেখর বসু (১৮৮০-১৯৬০)-র হাতে এক নূতন তাৎপর্য অর্জন করে । এই ধারায় জগদানন্দ রায় (১৮৬৯-১৯৩৩) এবং গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য (১৮৯৫-১৯৮১)-র নাম মনে রেখেও বলতে হয় যে এঁরা প্রধানত কিশোর পাঠকের কথা মনে রেখেই বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ রচনা করেছেন । রাজশেখরই বোধহয় প্রথম নিষ্ঠাবান বিজ্ঞানের ছাত্র যিনি নিজের সমস্ত শক্তি সাহিত্যের উদ্দেশ্যে নিবেদন করেন । রাজশেখরের অব্যবহিত পূর্বে আরেকজন বিজ্ঞানের ছাত্র বাংলা গদ্যকে সমৃদ্ধ করেছেন, তিনি যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি (১৮৫৯-১৯৫৬) । উদ্ভিদবিদ্যার ছাত্র যোগেশচন্দ্র বৃত্তিতে বিজ্ঞানের অধ্যাপক হয়েও জ্যোতির্বিজ্ঞান থেকে শুরু করে বর্ণসংস্কার পর্যন্ত নানা বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করেন ।

যোগেশচন্দ্র ছিলেন নিরঙ্কুশভাবে বিজ্ঞানভাবনায় উদ্‌বুদ্ধ । রাজশেখর সেখানে 'পরশুরাম' ছদ্মনামের আড়ালে রসরচনা থেকে শুরু করে অভিধান, রামায়ণ-মহাভারতের সারানুবাদসহ সমাজচেতনা-সম্পন্ন প্রবন্ধ রচনা করে বাংলা সাহিত্যকে নানা দিক দিয়ে সমৃদ্ধ করে গেছেন । রাজশেখরের প্রবন্ধের পরিমাণ খুব বেশি নয়, কিন্তু বিষয় নির্বাচন, প্রচ্ছন্ন নৈর্ব্যক্তিকতা এবং প্রাঞ্জলতায় তার গুরুত্ব কোনো অংশে কম নয় । রাজশেখরের প্রথম প্রবন্ধগ্রন্থ 'লঘুগুরু' প্রকাশিত হয় ১৯৩৯ সালে । তৃতীয় সংস্করণে (১৯৬২) যে সাতটি প্রবন্ধ নতুন সংযোজিত হয় তার বিষয়-বৈচিত্র্যই প্রমাণ করে লেখকের বিস্ময়কর বিচিত্র বিষয়ে আগ্রহ । তিনি নিজের সম্বন্ধেই যেন বলেছেন, 'পুরাতন টাইম টেবল ... বা শুকনো ফুল মরা প্রজাপতি এসব সংগ্রহ বদভ্যাস অতি ।' ভাগ্যে এ বদভ্যাস তাঁর ছিল । তাঁর 'বিচিন্তা' (১৯৫৬) এবং 'চলচ্চিন্তা' (১৯৫৮) গ্রন্থের সূচীপত্র তাঁর সাহিত্য এবং সমাজসচেতনতার পরিচায়ক । এমন বিজ্ঞানমানস সমাজসচেতন প্রাঞ্জল প্রবন্ধ বাংলাসাহিত্যের বিশিষ্ট সম্পদ । শুধু পরশুরামই বাংলা রসরচনায় অননুসৃত নন, প্রবন্ধে রাজশেখরও বাংলা গদ্যে প্রায় দ্বিতীয়রহিত । অপর যে বিজ্ঞানের ছাত্র বাংলা প্রবন্ধে এসেছিলেন তিনি নির্মলকুমার বসু (১৯০১-১৯৭২) । বিজ্ঞানসাধনায় তাঁর আপন ক্ষেত্রে সুস্থির থেকেও তিনি বাঙালি পাঠকচিত্তকে সমাজবিজ্ঞান সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু করে তুলেছিলেন, তাঁর 'হিন্দু সমাজের গড়ন' (১৯৪৯)-এর পাঠক তার সাক্ষ্য দেবে । বিষয়ের উপর যথার্থ অধিকার এবং বাংলা ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা থাকলে বাংলা প্রবন্ধের মান যত সমৃদ্ধ করা যায় নির্মলকুমারের প্রবন্ধ তার ধারণা দেয় । বাংলায় গান্ধীবাদ প্রসঙ্গে আলোচনাতেও নির্মলকুমার বিশেষ দক্ষ ছিলেন । সমাজ-বিজ্ঞানের দৃষ্টি থেকে 'হিন্দুসমাজের গড়ন'-এর কিছু পরেই বেরিয়েছিল নীহাররঞ্জন রায়ের 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' (১৯৪৯) ; যদুনাথ সরকার চেয়েছিলেন এ গ্রন্থের একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ, যাতে প্রবন্ধের ধর্ম অক্ষুণ্ণ থাকে । পরে বাঙ্গালীর ইতিহাসের যে সংক্ষিপ্ত সংস্করণ তৈরি হয়, যদুনাথ তার চেয়েও সংক্ষিপ্ততর আয়তন চেয়েছিলেন । হরিদাস মুখোপাধ্যায়ের 'বিনয় সরকারের বৈঠকে' (১৯৪২) বিচিত্রবিষয়ক আলোচনার সমাহার। সমাজবিজ্ঞানের ছাত্রদের কাছে এ গ্রন্থের উপযোগিতা অনস্বীকার্য ।

বাংলা প্রবন্ধ যে বিষয়বৈচিত্র্যে ক্রমেই সমৃদ্ধ হয়ে উঠছিল তার কারণ এ কালে বিচিত্র জ্ঞানচর্চার আগ্রহ দেখা দিল, যার সূচনা হয়েছিল তিরিশের যুগ থেকে— সাহিত্য শিল্প অতিক্রম করে দর্শন, দর্শন ছেড়ে সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস, প্রাচীন সংস্কৃতি, সবশেষে এল বিজ্ঞান । এই বিচিত্র জ্ঞানচর্চার পাশাপাশি এসেছে বাংলা গদ্যের সমৃদ্ধি এবং বাংলা ভাষার প্রতি নব অর্জিত আগ্রহ, রবীন্দ্রনাথের সূত্রে যা ছিল খুবই স্বাভাবিক এবং তার সাহায্যে এগিয়ে এল কয়েকটি সাময়িক পত্রিকা, যেখানে নিছক গল্প কবিতার বাইরে মননশীল বিচিত্র জ্ঞানের প্রবন্ধ যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে ছাপা হতে থাকল এবং ধীরে ধীরে পাঠকগোষ্ঠী তৈরি হয়ে উঠতে থাকল । 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা' তো ছিলই । আমাদের কালপর্বে 'প্রবাসী'-র সম্পাদনাভার রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (১৮৬৫-১৯৪৩)-এর হাত থেকে তাঁর পরবর্তীদের হাতে আসায় পত্রিকাটির পূর্ব গৌরব কিছু পরিমাণে ব্যাহত হয়েছে । এ কালের অন্তত তিনটি সাময়িক পত্রিকা বাংলা প্রবন্ধ প্রকাশের ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়তা করেছিল— পরিচয়, বিশ্বভারতী পত্রিকা এবং চতুরঙ্গ । আর কয়েকটি স্বল্পায়ু পত্রিকা 'অরণি' এবং 'অগ্রণী' অথবা বিষ্ণু দে -প্রবর্তিত সম্পাদিত 'সাহিত্য পত্র' এবং বিশুদ্ধ প্রবন্ধ পত্রিকা 'সমকালীন'-এর কথাও এইসূত্রে মনে পড়তে পারে । এই পত্রিকা সমূহের পৃষ্ঠায় এখনো যে-সব প্রবন্ধ যোগ্য প্রকাশকের প্রতীক্ষায় রয়েছে সেগুলি গ্রন্থাকারে পাঠকের কাছে পৌঁছলে বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যের দিগন্ত বহুদূর প্রসারিত হবে মনে হয় । বিশ্বভারতীর 'বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ'-এর গ্রন্থমালা বাংলাভাষায় জ্ঞানচর্চার সূত্রে প্রবন্ধসাহিত্যকেই সমৃদ্ধ করেছে । 'বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ' গ্রন্থমালায় সাহিত্য, দর্শন, ধর্ম ছাড়াও ইতিহাস,

অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব এবং বিজ্ঞান বিষয়ে গ্রন্থ রচিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের জন্য গ্রন্থরচনা করতে অনুরুদ্ধ হয়ে অনেক বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি বাংলা ভাষায় প্রবন্ধ লিখতে উৎসাহিত হয়েছেন, সার্থক প্রাবন্ধিক রূপে প্রতিষ্ঠাও লাভ করেছেন। বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালার বাইরে এ কালে যে-সব বিচিত্র বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে সেগুলির বিচারে বাঙালি মনীষার একটা ধারণা পাওয়া যেতে পারে। এইসূত্রে ক্ষিতিমোহন সেন (১৮৮০-১৯৬০), সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত (১৮৮৭-১৯৫২), সুশীলকুমার দে (১৮৯০-১৯৬৮), কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০), প্রবোধচন্দ্র বাগচী (১৮৯৮-১৯৫৬), প্রবোধচন্দ্র সেন (১৮৯৭-১৯৮৬), চিন্তাহরণ চক্রবর্তী (১৯০০-১৯৭২) প্রমুখ প্রাবন্ধিকদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এঁদের মধ্যে সুশীলকুমার দে বাংলায় প্রবন্ধ লিখেছেন খুবই কম। কাজী আবদুল ওদুদের 'কবিগুরু গ্যেটে' (১৯৪৩) জীবনীগ্রন্থ মাত্র নয়, 'শাশ্বত বঙ্গ' (১৯৪৯) বা 'বাংলার জাগরণ' (১৯৫৬) বাঙালি মননশীলতার এক বিশিষ্ট স্বাক্ষর। ক্ষিতিমোহন সেন, প্রবোধচন্দ্র বাগচী এবং চিন্তাহরণ চক্রবর্তীর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রচনা বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহভুক্ত হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য প্রবোধচন্দ্র সেনের 'বাংলার ইতিহাস সাধনা' (১৯৫৩) এবং চিন্তাহরণ চক্রবর্তীর 'হিন্দুর আচার-অনুষ্ঠান' (১৯৭০)-এর মতো অভিনব গ্রন্থ পরিকল্পনা। 'হিন্দুর আচার-অনুষ্ঠান'-এর বেশ-কয়েকটি রচনা আমাদের কালপর্বে প্রকাশিত।

বাংলার বিচিত্রবিদ্যার চর্চা একালে যথেষ্ট বেড়েছে ঠিকই, তথাপি বাংলা প্রবন্ধের একটা বড়ো অংশ রবীন্দ্রসাহিত্যের চর্চাতেই নিযুক্ত। এবং সেই চর্চা রবীন্দ্র-তিরোধানের পর বৃদ্ধি পেলেও রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষে, মানে না হলেও পরিমাণে, এক নতুন মাত্রা অর্জন করে। অজিতকুমার চক্রবর্তীর গ্রন্থ দুটিকে রবীন্দ্রচর্চার প্রথম পর্বের প্রয়াস বলতে হয়। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৯২-১৯৮৬)-এর 'রবীন্দ্রজীবনী'-র প্রথম উদ্যোগও রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায়। যদিও তার বহু সংযোজন সংশোধন এবং পুনর্বিন্যাস ঘটে রবীন্দ্র-তিরোধানের পর। নীহাররঞ্জন রায় (১৯০৩-১৯৮১)-এর 'রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা' এই পর্বে সংশোধিত হয়েছিল। এই গ্রন্থ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রবিরশ্মি'-ধারায় রচিত। প্রমথনাথ বিশী (১৯০১-১৯৮৫)-র 'রবীন্দ্রকাব্য নির্ঝর' (১৯৪৬), 'রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহ' (১৯৪৭-৪৮) এবং 'রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ' (১৯৪৮-৫১) ছাত্রদের উপযোগী রবীন্দ্রচর্চাতেই সীমাবদ্ধ। সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত (জ.১৯০৪) বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্রের সাহিত্য প্রসঙ্গে তিনটি পৃথক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন এই কালপর্বের আগে। মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২) মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯২-১৯৭০)-ও রবীন্দ্র-সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধ গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছেন। তবে এই-সব রবীন্দ্রচর্চার সমাদর সাধারণ পাঠকের কাছে যতখানি হয়েছে তার চেয়ে বেশি কাজে লেগেছে পরীক্ষার্থী সম্প্রদায়ের প্রয়োজনে। বরং ক্ষিতিমোহন সেনের 'বলাকা কাব্য পরিক্রমা' (১৯৫২) বা প্রবোধচন্দ্র সেন (১৮৯৭-১৯৮৬) -এর 'ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ' (১৯৪৫) একটু স্বতন্ত্র স্বাদের আলোচনা। এবং প্রমথনাথ বিশীর 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন', মৈত্রেয়ী দেবীর 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ', প্রতিমা দেবীর 'নির্বাণ', সীতা দেবীর 'পুণ্যস্মৃতি', অমল হোমের 'পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ' বা রানী চন্দ এবং নির্মলকুমারী মহলানবিশের স্মৃতিমূলক রচনাগুলি শুধু সুখপাঠ্যই নয়, স্মৃতিকথা হিসেবে এগুলির মর্যাদা সাহিত্যে দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে, উপরন্তু রবীন্দ্রজীবনীর নানা উপকরণও এই-সব স্মৃতিচারণার সূত্রে সাধারণ পাঠক এবং অনুসন্ধিৎসু গবেষকদের আয়ত্তে এসেছে। তবে স্মৃতিকথা প্রবন্ধসাহিত্যের গুণমণ্ডিত কিনা সে প্রশ্ন নিশ্চয়ই উঠতে পারে। সাধারণভাবে প্রবন্ধের আয়তন এবং আয়োজন স্মৃতিকথায় থাকে না। প্রবন্ধের পরিচয় শুধু আয়তনেই নয়, তার মননশীলতায়। এবং সেই বিচারে সজনীকান্ত দাস (১৯০০-১৯৬২)-এর 'রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য' (১৯৬০) স্মৃতিচারণার সুখপরিবেশ অতিক্রম করে তথ্যসম্ভারে এবং বিশ্লেষণে এক অতি জরুরি গ্রন্থে পরিণত হয়েছে। বস্তুত রবীন্দ্রনাথ যে-সব স্মৃতিচারণার কেন্দ্রবিন্দুতে সে-সকল গ্রন্থ সেই কারণেই

উল্লেখযোগ্য এবং অবশ্যপাঠ্য হয়ে থাকবে । অথচ এই কালপর্বে বেশ কয়েকজন প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকের আত্মস্মৃতিমূলক রচনা প্রকাশিত হয়েছে । তার অনেকগুলিই রচনানৈপুণ্য এবং উপকরণবৈভব সত্ত্বেও সাহিত্যে স্থান করে নিতে পারে নি মুখ্যত স্মৃতিচারণকর্তাদের আত্মকেন্দ্রিকতার আতিশয্যের কারণে । তবে ব্যতিক্রমও আছে, যেমন অমিয়নাথ সান্যালের 'স্মৃতির অতলে' । রবীন্দ্রচর্চার সূত্রে স্বভাবতই রবীন্দ্রজন্ম-শতবর্ষপূর্তির প্রসঙ্গ এসে পড়ে । এই উপলক্ষে বেশ-কয়েকটি সংগ্রহযোগ্য রবীন্দ্রচর্চা-বিষয়ক প্রবন্ধসংকলন প্রকাশিত হয়েছিল যা এ কালের প্রাবন্ধিকবর্গের শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধার্ঘ্য বলে বিবেচিত হতে পারে । এদিক দিয়ে কবির জীবদ্দশায় তাঁর সপ্ততিতম জন্মোৎসবকালে রচিত প্রবন্ধসমূহের চেয়ে জন্মশতবর্ষের নিবেদিত প্রবন্ধসমূহ অনেক বেশি উচ্চমানসম্পন্ন । এই প্রবন্ধসংকলনগুলির মধ্যে সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা এবং 'রবীন্দ্রায়ণ'-এর দুটি খণ্ড বিশেষভাবে স্মরণীয় । দুটি সংকলনই পুলিনবিহারী সেন (১৯০৮-১৯৮৪)-এর পরিকল্পনাজাত । শ্রীগোপাল হালদার-সম্পাদিত 'রবীন্দ্রনাথ'-এর প্রবন্ধগুলিও পাঠকবর্গের কাছে প্রয়োজনীয় বলে স্বীকৃতিলাভ করেছিল ।

দীনেশচন্দ্র সেন (১৮৬৬-১৯৩৯)-এর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' (১৮৯৬) একদা বাংলাসাহিত্যের স্বীকৃত ইতিহাসের মর্যাদালাভ করেছিল । কিন্তু কালে প্রমাণিত হয়েছে যে সে ইতিহাস আংশিক, অসম্পূর্ণ এবং অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রচিত । আমাদের আলোচ্য কালপর্বে বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস রচনার নতুন উদ্যোগ দেখা যায় । ১৯২৬ সালে ইংরেজিতে প্রকাশিত হয়েছিল সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বাংলাভাষার উদ্ভব এবং ইতিহাস—ও.ডি.বি.এল. । এরই প্রেরণায় বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস রচনায় উদ্যোগ দেখা দিল । এই ইতিহাস রচনার কাজে এগিয়ে এলেন সুনীতিকুমারের যোগ্যতম ছাত্র সুকুমার সেন (১৯০০-৯০) । তাঁর 'বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস' প্রকাশ শুরু হল ১৯৪০ সালে । 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' রচিত হবার পর হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'হাজার বৎসরের পুরান বাংলাভাষার বৌদ্ধগান ও দোহা' (১৯১৬) এবং বসন্তরঞ্জন রায়ের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' (১৯১৬) প্রকাশিত হবার ফলে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস নতুন করে রচনা করার প্রয়োজন দেখা দিল । বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন যুগের বিশদ উপকরণ সংগ্রহের কাজ পরম আগ্রহের সঙ্গে শুরু হল । স্বভাবতই এ কাজের প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ । আমাদের আলোচ্য কালপর্বে ঝোঁক পড়ল উনিশ শতকের নানা উপাদান এবং তথ্য সংগ্রহে । প্রধান উদ্যোগী হলেন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯১-১৯৫২), সজনীকান্ত দাস (১৯০০-১৯৬২) এবং যোগেশচন্দ্র বাগল (১৯০৩-১৯৭২) । ব্রজেন্দ্রনাথের প্রবর্তনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত সাহিত্যসাধক চরিতমালা (১৯৩৯ সাল থেকে প্রকাশ শুরু)-য় উনিশ শতকের সাহিত্যসেবীদের জীবনীর উপকরণ সংগৃহীত হতে থাকলে ওই শতকের সাহিত্য-গবেষণা-কার্যে বিশেষ সহায়তা পাওয়া গেল । এ ছাড়া ব্রজেন্দ্রনাথের 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' (তিন খণ্ড : ১৯৩২-১৯৩৫), 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' (১৯৩৩) এবং 'বাংলা সাময়িকপত্র' (দুই খণ্ড : ১৯৩৬, ১৯৫১) উনিশ শতকীয় বাংলা সমাজ সংস্কৃতি এবং সাহিত্য গবেষণার ক্ষেত্রে অপরিহার্য সহায়ক উপাদান হিসেবে স্বীকৃতিলাভ করল । ব্রজেন্দ্রনাথ প্রবন্ধরচনাসূত্রেই সাহিত্যে প্রবেশ করেন । পরে, বিশেষত যদুনাথ সরকারের পরামর্শে, নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার, দুষ্প্রাপ্য সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ, সাহিত্যসেবী এবং সংস্কৃতিক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গের জীবনীর অজ্ঞাত উপকরণ সংগ্রহ এবং গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়নের কাজে অসাধারণ নিষ্ঠা প্রদর্শন করেন । বাংলা প্রবন্ধের ক্ষেত্রে এক নতুন ধারা প্রবর্তন করেন ব্রজেন্দ্রনাথ । ব্রজেন্দ্রনাথকে উনিশশতক সম্পর্কিত সহস্রাধিক গবেষণা প্রবন্ধের উৎসবিন্দু বলা যেতে পারে । ব্রজেন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালায় 'বঙ্গীয় নাট্যশালা' (১৯৪৪), 'বাংলাসাময়িক সাহিত্য : ১৮১৮-১৮৬৭' (১৯৪৫), 'বঙ্গসাহিত্যে নারী' (১৯৫৯) এবং 'সাময়িকপত্র-সম্পাদনে বঙ্গনারী' (১৯৫১) লিখেছিলেন । ব্রজেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সহযোগী সজনীকান্ত ব্রজেন্দ্রনাথের প্ররোচনায় ১৯৪৬ সালে 'বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস (গদ্যের প্রথম যুগ)' প্রকাশ করেন । একটি বিশেষ যুগের

সাহিত্যের ইতিহাস হিসেবে গ্রন্থটি বিশেষ মর্যাদা দাবি করতে পারে। বাংলা সাহিত্যের দুই ইতিহাস-রচয়িতা সুকুমার সেন এবং সজনীকান্ত দাস এক সাবলীল, নিরাড়ম্বর অথচ লক্ষ্যভেদী গদ্য রচনায় দক্ষ। সচেতনভাবে অবহিত না হয়েও বাংলা প্রবন্ধসাহিত্য এই দুই গদ্যরীতির কাছে নানাভাবে ঋণগ্রহণ করেছে। যোগেশচন্দ্র বাগলের ভাষায় এই প্রসাদগুণ না থাকলেও তিনিও ব্রজেন্দ্রনাথের সুযোগ্য উত্তরাধিকারী। সাহিত্যসাধকচরিতামালা এবং বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহভুক্ত গ্রন্থ ভিন্ন তাঁর 'মুক্তির সন্ধানে ভারত' (১৯৪০), 'ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা' (১৯৪১), 'জাতীয়তার নবমন্ত্র বা হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত' (১৯৪৫), 'জাতিবৈর' (১৯৪৬), 'বাংলার নব্যসংস্কৃতি' (১৯৫৮) এবং 'কলিকাতার সংস্কৃতিকেন্দ্র' (১৯৫৯) গবেষকদের কাছে আজও অবশ্যসংগৃহীতব্য গ্রন্থ।

যোগেশচন্দ্রের রচনাতেই দেখা যায় সাহিত্য অতিক্রম করে প্রতিষ্ঠান এবং রাজনৈতিক প্রসঙ্গ প্রাধান্য পেয়েছে। একালে উনিশশতক নিয়ে আগ্রহ ক্রমে স্বাধীনতা আন্দোলনের নানা পর্ব এবং স্তর সম্পর্কে স্মৃতিচারণ এবং বিশ্লেষণে সম্প্রসারিত হয়। বিদেশী শাসনমুক্তির পর এ জাতীয় রচনায় স্বভাবতই লেখক এবং পাঠক উভয়পক্ষের আগ্রহ বেড়েছে। প্রত্যক্ষত প্রবন্ধসাহিত্যকে সমৃদ্ধ না করলেও এই ধরনের রচনার সংখ্যা বৃদ্ধি এই কালপর্বের একটি স্বাভাবিক প্রবণতার সাক্ষ্য বহন করছে। বিদেশী শাসনমুক্তির আগে এবং পরে রচনাসমূহ সংগত কারণেই ভিন্ন জাতের এবং ভিন্ন স্বাদের হবে। উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নির্বাসিতের আত্মকথা' (১৯৩১)-র ধরনের কৌতুকরস সমাকীর্ণ রচনা পরবর্তীকালে একান্তই দুর্লভ হয়ে পড়ে। বাঙালি গবেষক প্রধানত স্বদেশীযুগ নিয়েই আগ্রহী হয়েছেন বেশি। গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরীর 'শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলার স্বদেশী যুগ' (১৯৫৩) বা হরিদাস মুখোপাধ্যায়ের 'উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ' (১৯৬১) তথ্যসম্ভারে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ। নরহরি কবিরাজের 'স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা' বা প্রমোদ সেনগুপ্তের 'ভারতীয় মহাবিদ্রোহ' (১৮৫৭-১৯৫৭) ইতিহাসের বিচারে উল্লেখযোগ্য। যাঁরা নানাভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের 'বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি' (১৯৫৬) স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস সম্বন্ধে আগ্রহী পাঠকের কাছে বিশেষ মর্যাদা পেয়েছে। বীণা দাসের স্মৃতিকথা 'শৃঙ্খল ঝংকার' (১৯৪৮) রচনাগুণে পাঠকসমাজে সমাদৃত হয়েছিল। তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় (১৮৯৬-) -এর 'পলাশির যুদ্ধ' (১৯৫৩) টেকস্ট বুকও নয়, গল্পও নয়, ইতিহাসের পটভূমিকায় রসচিত্র অঙ্কনের প্রয়াস।

আলোচ্য কালপর্বে কেবল স্বাধীনতা আন্দোলনের পর্যালোচনা নয়, আরেকটি বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শও বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যের অনেকখানি জুড়ে ছিল। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার পর থেকেই বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ বা মার্ক্সবাদ নিয়ে বাঙালি চিত্তে আগ্রহের সূচনা হয়। হুমায়ুন কবির 'মার্ক্সবাদ' (১৯৫১) ঠিক সেই সূত্রে রচিত হয় নি। হুমায়ুন কবির মূল জার্মান ভাষায় কার্ল মার্ক্স-এর 'ক্যাপিটাল' পড়বার দাবিতেই 'মার্ক্সবাদ' সম্বন্ধে বাংলায় আলোচনায় উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। ধূর্জটিপ্রসাদের রচনা মনে রেখেই বলা যেতে পারে যে বাংলাভাষায় মার্ক্সবাদী মননশীলতাজাত প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে পথিকৃৎ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮০-১৯৬১)। তাঁর তিন খণ্ডে প্রকাশিত 'ভারতীয় সমাজপদ্ধতি' সম্পূর্ণ হয়েছে ১৯৪৬ সালে। ভূপেন্দ্রনাথের অনন্যসাধারণ মেধা এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি সত্ত্বেও তিনি সক্রিয় রাজনীতি থেকে যেমন, তাত্ত্বিক আলোচনার ক্ষেত্রেও তেমনি কিঞ্চিৎ স্বাতন্ত্র্য-জনিত দূরত্বে প্রতিষ্ঠিত। বাংলা সাহিত্যে মার্ক্সবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে প্রবন্ধ রচনায় সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য নাম নীরেন্দ্রনাথ রায় (১৮৯৬-১৯৬৬)। 'পরিচয়' পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা নীরেন্দ্রনাথ মার্ক্সবাদী ধারায় আসেন অনেক পরে। 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর ছয়টি প্রবন্ধ নিয়ে বেরোয় 'সাহিত্য-বীক্ষা' (১৯৫৫), যার পরবর্তী সংস্করণে আরো বাইশটি প্রবন্ধ এবং তেরোটি সমালোচনা সংযোজিত হয়। বাংলা সাহিত্যে মার্ক্সবাদী আলোচনা যথেষ্ট সমৃদ্ধ। এ ধারায় অনেক ক্ষমতাবান লেখক শামিল হয়েছেন। তবে বাংলায় মার্ক্সবাদী আলোচনার সূচনা

পর্বে নীরেন্দ্রনাথের ভূমিকা একটু বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। দেবীপদ ভট্টাচার্যের ভাষায় 'অধ্যাপক নীরেন্দ্রনাথ রায়কে ভাবলে স্বতঃই রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের 'শচীশ' চরিত্রের কথা মনে আসে।' একদা গান্ধী-প্রবর্তিত চরখা এবং অসহযোগ আন্দোলনের একনিষ্ঠ কর্মী, পরবর্তী কালে সহপাঠী সুভাষচন্দ্র-কর্তৃক প্রভাবিত, আবার অপরবন্ধু দিলীপকুমার রায়ের সান্নিধ্যে শ্রীঅরবিন্দের আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট এই সদা প্রশ্নাকুল সন্ধানী পুরুষ অবশেষে পৌঁছান মার্ক্সবাদে। 'কোনো স্বার্থ, উচ্চাশা বা সুবিধাবাদের খাতিরে কিছুই তিনি গ্রহণ করেন নি। তিনি পথ খুঁজতে বার হয়েছিলেন।' এই পথসন্ধানে 'চিন্তারিক্ত বিহ্বলআবেগের দাসত্ব' ছিল তাঁর প্রকৃতিবিরুদ্ধ। যুক্তিসম্বল মানুষটি এই বিচিত্র পথ পরিক্রমা শেষে যেখানে এসে উপনীত হলেন, সেখানে তাঁকে আবেগ বা গোঁড়ামি স্পর্শ করে নি। 'কর্ম, ভাবনা, তর্ক, মতান্তরের আলোচনা'র পথে তিনি যে মানুষের আশ্চর্য পরিচয় বহন করে গেছেন, পরবর্তী মার্ক্সবাদী তত্ত্বালোচনা তা যথাযোগ্যভাবে অনুসরণ করতে পারলে মার্ক্সবাদী গোষ্ঠী অনেক বেশি সমৃদ্ধ হত। অক্টোবর বিপ্লবের আট বছরের মধ্যে যিনি 'নব্য রুশিয়া' নামে বাংলাগ্রন্থ রচনা করেছিলেন, সেই সরোজ আচার্য (১৯০৮-১৯৬৮) সাংবাদিকতাতেই অধিক মনোনিবেশ করেছিলেন। ফলে তাঁর প্রবন্ধের আয়তন দৈনিক সংবাদপত্রের মাপে দেখা দিত এবং এই বিষয়বৈচিত্র্যও ছিল অনিবার্য। তিনি মার্ক্সবাদী যুক্তিসম্পন্ন প্রবন্ধ যেমন লিখেছেন, তেমন তাঁর রচনায় রম্যরচনার আভাসও দুর্লক্ষ্য নয়। আসলে সাংবাদিক সরোজ আচার্য তাঁর প্রাবন্ধিক সত্তাকে অনেকখানি ঢেকে দিয়েছিল। এই ধারার অপর অসামান্য ধীশক্তিসম্পন্ন লেখক শ্রীগোপাল হালদার (জ.১৯০২)। তাঁর 'সংস্কৃতির রূপান্তর' (১৯৪১) 'বাংলা ভাষায় মার্ক্সীয় সাহিত্যের একখানি অনন্য ক্লাসিক।' এই আড়াইশো পৃষ্ঠার গ্রন্থে শ্রীহালদার দেখিয়েছেন, 'সংস্কৃতির অর্থ শুধুমাত্র সংস্কারের পুনরাবর্তন নয়, সংস্কারের ঐতিহাসিক বিবর্তন।' এবং জে.বি.এস. হলডেনের যে উক্তি তিনি ভূমিকায় উদ্ধৃত করেছেন, এ মার্কসিস্ট মাস্ট নট বি টু অ্যাফ্রেড অব মেকিং মিসটেক্স্ (একজন মার্কসবাদী-র পক্ষে ভুল করতে ভীত হবার কথা নয়), তার দৃষ্টান্ত রয়েছে গ্রন্থের উৎসর্গে, যেখানে মার্কসবাদী গোপাল হালদার 'পরলোকগত' 'পিতৃদেব সীতাকান্ত হালদার মহাশয়ের চরণোদ্দেশে' বইটি উৎসর্গ করেছেন। পরলোকের উল্লেখকে মার্কসবাদ-বিরোধী সংস্কারের অনুবৃত্তি বলা হবে অথবা দেশজ প্রচলিত ঐতিহ্যের স্বীকরণের দৃষ্টান্ত মনে করা হবে তা নিয়ে তর্ক থাকতে পারে। ভূমিকায় যে 'ভুল'-এর প্রসঙ্গ তিনি তুলেছিলেন তা যে তাঁর ক্ষেত্রেও অব্যাহত ছিল, তা উৎসর্গপত্রেই দেখা যায়। তবে তার জন্য ভীত হওয়া বা পিছিয়ে যাওয়া মার্কসবাদী চরিত্রের পরিচায়ক নয় গোপালবাবুর দীর্ঘ জীবনের মার্কসীয় সততা তা প্রমাণ করেছে। তাঁর 'সংস্কৃতির রূপান্তর' শুধু ক্লাসিকই নয়, বাঙালি সংস্কৃতির স্বরূপ নির্ণয়ে এক জরুরি গ্রন্থ। এই ধারাতেই তিনি লিখেছেন 'বাঙালী সংস্কৃতির রূপ' (১৯৪৭), 'বাঙালী সংস্কৃতি প্রসঙ্গ' (১৯৫৬) এবং 'বাঙলা সাহিত্য ও মানবস্বীকৃতি' (১৯৫৬)। শ্রীগোপাল হালদার ভাষাতত্ত্বের গবেষণা, উপন্যাস রচনা করেও সক্রিয়ভাবে রাজনৈতিক কর্মী। এবং রাজনীতি তাঁর সাহিত্যিক সত্তাকে আচ্ছন্ন করতে পারে নি, তা শুধু তাঁর উপন্যাসই সাক্ষ্য দেয় না, কয়েকটি লঘু প্রবন্ধের সংকলনও তার প্রমাণ। 'বাজে লেখা' (১৯৪২, পরবর্তী সংস্করণে 'স্বপ্ন ও সত্য', ১৯৫১), 'আড্ডা' (১৯৫৬), 'বন চাঁড়ালের কড়চা' (১৯৬০) পাঠককে যেমন আনন্দ দেয়, তেমনি ভাবতে শেখায়। অনিল কাঞ্জিলাল এগুলি সম্বন্ধে লিখেছিলেন, 'এ হালের রম্য রচনা নয়। অনেকদিন ধরে দস্তুরমতো সেচ-সার প্রয়োগে মন আবাদ না করলে মননে এমন ফসল জন্মে না। এ লেখার মেজাজ, এর স্টাইল, লেখকের নিজস্ব। নিজে যিনি ভাবতে পারেন, বলবার কথা তাঁরই থাকে। বলবার কথা নিজের মতো করে সবাই বলতে পারে না।... 'বাজে লেখা'র মতো লেখা গোপালবাবু আর লেখেন নি, হয়তো এমন লেখার কালও চলে গিয়েছে।' এ রচনাগুলিকে নিছক রম্যরচনা বলতে গোপালবাবুরও আপত্তি ছিল। 'যে সাহিত্যে কমলাকান্ত ও পঞ্চভূত সর্বপরিচিত সে সাহিত্যে 'বেল লেতরস্'

কথাটার এরূপ অপপ্রয়োগ অমার্জিত ও অমার্জনীয় । আমি হয়তো এই বিশেষ ধরনের লেখাকে 'লঘু রচনা' বলব ! রবীন্দ্রনাথ ইংরাজী পার্সোনাল এসে-র বাংলা নাম দিতে চেয়েছিলেন 'অ-বন্ধ' ।' একথা গোপালবাবু 'আড্ডা'র কৈফিয়তে লিখেছিলেন ।

তিরিশের যুগে এ দেশে যে-সব যুবক স্পেনের গৃহযুদ্ধ এবং য়ুরোপের ফ্যাসিবাদের প্রক্রিয়ায়, মার্ক্সবাদের দিকে ঝুঁকেছিলেন বিনয় ঘোষ (১৯১৭-১৯৮০) তাঁদের একজন । প্রথম থেকেই র‍্যালফ্ ফক্স, স্টিফেন স্পেণ্ডার, ক্রিস্টোফার কড়ওয়েল এবং সেসিল ডেল্যুইসের অনুরাগী পাঠক । লেখা শুরু করেন অগ্রণী (১৯৩৯) এবং অরণি (১৯৪১)-তে । ১৯৪১-৪২ সালে প্রকাশিত হয়েছে দুইখণ্ডে 'সোভিয়েট সভ্যতা' । ১৯৪৭ সালে 'ভারত সোভিয়েট মধ্য এশিয়া' থেকেই নিজের দেশের সংস্কৃতির ধারাবাহিক তথ্য অনুসন্ধান শুরু হল । ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত হল 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি'— সাংবাদিক এবং গবেষকের এক অভিনব সমন্বয় ঘটল পরিব্রাজকের লেখনীতে । ১৯৫৭-১৯৫৯ সালের মধ্যে তিনখণ্ডে লিখলেন 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ'— ঠিক জীবনী নয়, বিদ্যাসাগরকে কেন্দ্র করে উনিশ শতকের মধ্যবিত্ত বাঙালি মানসিকতার স্বরূপ নির্ণয়ের প্রয়াস । যার বিস্তার দেখা গেল 'সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র'-এর চারখণ্ডে (১৯৬২-১৯৬৮) । শ্রীগোপাল হালদারের ধারাতেই বিনয় ঘোষ বাঙালি সংস্কৃতিকে নানা দিক দিয়ে বিচার করতে চেয়েছেন । বারে বারে মত পালটেছেন । সমকালের বিশ্ব রাজনীতির দ্রুত পরিবর্তনশীল প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত রাখেন নি । তবে তাঁর হৃদয় এবং বুদ্ধির দ্বন্দ্ব তাঁকে বারে বারেই সমালোচনার সম্মুখীন করেছে । প্রাবন্ধিক বিনয় ঘোষের বৈশিষ্ট্য তথ্য সংগ্রহে বিস্ময়কর শ্রম স্বীকার, আবার সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে তাঁর অস্থিরতা পাঠকের চিত্তে কিঞ্চিৎ ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে । বিনয় ঘোষ প্রবন্ধের ক্ষেত্রে পাঠকের প্রসন্নতা প্রত্যাশা করেন নি, বিতর্ক দাবি করেছিলেন, সেখানেই তাঁর যথার্থ ভূমিকা ।

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত থেকে বিনয় ঘোষ যখন মার্ক্সবাদী চিন্তাধারায় মননশীল বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করতে সচেষ্ট, তখন কিন্তু অপর ধারাটিই প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক কর্ম থেকে দূরত্ব রক্ষা করে যাঁরা পরিশীলিত বুদ্ধিদীপ্ত নানা প্রসঙ্গে বিচরণ করতে চাইছেন পাঠক সমাজের সেই অংশের কাছে বিশেষভাবে সমাদৃত । এঁরা নানা উপলক্ষে প্রগতিধারায় শামিল হয়েছেন, বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪) একদা ফ্যাসিবিরোধী লেখক সংঘে সক্রিয় ছিলেন । প্রত্যক্ষ রাজনীতিবিদ্ মার্ক্সবাদী বন্ধুও ছিল কারো কারো, যেমন মানবেন্দ্রনাথ রায় ছিলেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬০)-র ঘনিষ্ঠ জন । বিষ্ণু দে (১৯০১-১৯৮২) তো মার্ক্সবাদী বলেই পরিচিত ছিলেন । সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, এমন-কি জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪) এবং অমলেন্দু বসু (১৯০৭-১৯৯১)-এঁরা প্রত্যেকেই ছাত্রজীবনে ইংরেজি সাহিত্যে নিষ্ঠার সঙ্গে মনোনিবেশ করেছিলেন । তথাপি এঁদের প্রবন্ধে ইংরেজি বা য়ুরোপীয় সাহিত্যের প্রতি পক্ষপাতিত্বের চেয়ে যেটি অধিকতর লক্ষণীয়, তা হল ইংরেজি প্রবন্ধের শৃঙ্খলা এবং পরিমিতিবোধ ছিল এঁদের প্রত্যেকের রচনায় । এদিক দিয়ে এঁদের হাতে বাংলা সাহিত্য বিপুলভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে । আর এঁদের সূত্রে বাংলা ভাষার সাহিত্য সৌভাগ্য অর্জন করেছে অন্য আর-একভাবে । এঁদের মতো ইংরেজিনবিশ ব্যক্তি মাতৃভাষায় যে আগ্রহ এবং দক্ষতা দেখালেন, তা বাংলা-সাহিত্যের পক্ষে এক পরম লাভ । ইংরেজি জানা যে মাতৃভাষার প্রতি ঔদাসীন্যের ভিত্তি নয়, তা প্রমাণ করলেন এঁরা । বুদ্ধদেব ভাষা বা ভাবনার দিক দিয়ে রবীন্দ্র-অনুকূল থেকেও যে একটি নিজস্ব চিন্তা এবং বাচনভঙ্গি নির্মাণ করতে পেরেছিলেন তার অনেকখানিই তাঁর ইংরেজি সাহিত্য অধ্যয়নসূত্রে প্রাপ্ত । বুদ্ধদেবের প্রবন্ধের অনেকখানিই রবীন্দ্র-সাহিত্য আলোচনা এবং সেখানে তিনি সশ্রদ্ধচিত্ত । চমক সৃষ্টির জন্য তর্ক তুলেছেন বটে, তবে সেই

চমক পাঠককে তৃপ্তিই দিয়েছে, তার ভাবনা পরিবর্তনে সাহায্য করে নি। তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ : কথা-সাহিত্য' (১৯৫৫) এবং 'সঙ্গ : নিঃসঙ্গতা : রবীন্দ্রনাথ' (১৯৬২)-এর প্রবন্ধগুলিতে সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্য নিয়ে আলোচনার একটা পরিকল্পনার আভাস পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের কবিতা, প্রবন্ধ, ছোটোগল্প, উপন্যাস প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব নানা উপলক্ষে তাঁর চিন্তাভাবনা প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করেছেন। আবার 'সাহিত্যচর্চা'য় রবীন্দ্রনাথের উত্তরসাধকদের প্রসঙ্গে যে অভিমত প্রকাশ করেছেন তা বারে বারে স্মরণযোগ্য, 'রবীন্দ্রনাথের প্রভাবের কথাটা আজকের দিনে যে আর না-তুললেও চলে, সেটাই বাংলা কবিতার পরিণতির চিহ্ন, এবং রবীন্দ্রনাথেরও 'ভক্তিবন্ধন থেকে পরিত্রাণে'র প্রমাণ। বাংলাসাহিত্যে আদিগন্ত ব্যাপ্ত হয়ে আছেন, তিনি বাংলাভাষার রক্তে-মাংসে মিশে আছেন, তাঁর কাছে ঋণী হবার জন্য এমন-কি তাঁকে অধ্যয়নেরও আর প্রয়োজন নেই তেমন, সেই স্বতঃসিদ্ধ বলেই ধরা যেতে পারে — শুধু আজকের দিনে নয়, যুগে যুগে বাংলা ভাষার যে-কোনো লেখকেরই পক্ষে।' এ কথা লিখছেন তিনি ১৯৫২ সালে। বুদ্ধদেব তাঁর 'কালের পুতুল'-এ নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ দাশ, অমিয় চক্রবর্তী প্রমুখ রবীন্দ্রোত্তর কবিগোষ্ঠী সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। বুদ্ধদেবের বিশ্লেষণে সামাজিক পটভূমিকার প্রসঙ্গ প্রায় অনুপস্থিত। তাঁর ব্যক্তিগত সাহিত্যবোধ এবং সাহিত্যরুচিই তাঁর প্রধান অবলম্বন।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬০) বয়সে বুদ্ধদেবের অগ্রবর্তী হলেও প্রবন্ধ সাহিত্যে বোধ হয় বুদ্ধদেবের পরবর্তী। সাহিত্যে বুদ্ধদেব কবিতা ছাড়াও উপন্যাস নাটক সব ক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন, প্রবন্ধেও তাঁর প্রতিষ্ঠা দীর্ঘকালের। সুধীন্দ্রনাথ সে বিচারে কবিতার বাইরে যখন 'কুলায় ও কালপুরুষ' (১৯৫৭) প্রকাশ করলেন তার মুখবন্ধে লিখেলেন, 'আমার দর্শন যে সাহিত্যভিত্তিক তারই স্বীকৃতি হিসাবে প্রথম নটা প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে... পরবর্তী রচনাবলী কেবল নানা বয়সী নয়, প্রায় প্রত্যেকটায় এ-রকম অনেক কথা আছে যাতে আমি সম্প্রতি বীতশ্রদ্ধ। কিন্তু নূতন ভিটা বানানোর সময় যেমন আমার নেই, তেমনই আজকালকার বাজারে মাল-মসলা নেহাৎ বাড়ন্ত... সৌভাগ্যক্রমে আমার নীড় সংকীর্ণ ও শতছিদ্র, এবং তাই অসীম ও চিরন্তন আকাশই আমার একমাত্র ভরসা। কারণ সেখানে কালপুরুষও 'ত্রিশঙ্কু'।' সুধীন্দ্রনাথের প্রবন্ধেরও প্রধান প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ। সুধীন্দ্রনাথের গদ্যে তৎসম প্রত্যয়ের সাহায্যে নতুন শব্দসৃষ্টিতে বাংলা শব্দ-সম্ভার সমৃদ্ধ হয়েছে। সুধীন্দ্রনাথের প্রবন্ধসূত্রে হয়তো একদা কোনো গবেষকের হাতে তার বিশদ বিবরণ পাওয়া যাবে। বিষ্ণু দের প্রবন্ধের পরিমাণ অপেক্ষাকৃতভাবে কম হলেও, তিনি মার্কসবাদের সাযুজ্যে সমাজসচেতন। যদিও বিষ্ণু দে-র প্রবন্ধে ইংরেজি সাহিত্যে অভিনিবেশের স্বাক্ষর সর্বাধিক। জীবনানন্দ দাশ বাংলা সাহিত্যে কবি হিসেবেই পরিচিত। তবে তাঁর 'কবিতার কথা' (১৯৫৫)-র প্রথম রচনার সূচনা বাক্যটি, 'সকলেই কবি নয় কেউ কেউ কবি' বাংলা সাহিত্যে উদ্ধৃতিযোগ্য বাক্য হয়ে রয়েছে। অমলেন্দু বসু ইংরেজি সাহিত্য অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনায় দীর্ঘকাল যুক্ত থাকা সত্ত্বেও বাংলাচর্চার সময় বাংলাসাহিত্য সম্বন্ধে যে শ্রদ্ধাপোষণ করেছেন তা স্মরণীয়। বুদ্ধদেবের সমসাময়িক এই সাহিত্যবোধসম্পন্ন মানুষটি প্রবন্ধসাহিত্যেই নিজেকে নিযুক্ত রেখেছিলেন। চতুরঙ্গ, অনুক্ত প্রভৃতি সাময়িক-পত্রিকায় ১৯৫৪ থেকে ১৯৬৪ সালের মধ্যে প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধ ১৯৭২ সালে 'সাহিত্যচিন্তা' নামে সংকলিত হয়। এই প্রবন্ধগুলিতে তিনি সমালোচনা প্রসঙ্গে বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য করেছেন। বুদ্ধদেব বসু-সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-বিষ্ণু দে-অমলেন্দু বসু-র সমগোত্রীয় অপর প্রাবন্ধিক ঠিক ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র হিসেবে বাংলা সাহিত্যে প্রবেশ করেন নি। আবু সয়ীদ আইয়ুব এসেছিলেন পদার্থবিদ্যা এবং দর্শনের পথ বেয়ে। আইয়ুব বাংলাপ্রবন্ধক্ষেত্রে বিশেষ স্বাক্ষর রেখেছেন তাঁর মতের স্পষ্টতায় এবং যুক্তির তীক্ষ্ণতায়। গ্রন্থবিচারে আইয়ুব পরবর্তী কালে আলোচ্য মনে হয়।

বুদ্ধদেব বসু তাঁর প্রবন্ধসংকলনে 'দ্বিতীয়খণ্ডে একটি অনুল্লিখিত উপবিভাগ আছে, তাতে প্রথম ছয়টি প্রবন্ধ রম্যরচনা পর্যায় থেকে, এবং পরবর্তী পাঁচটি আমার বিবিধ ভ্রমণবিবরণ থেকে সংকলিত—। এমন বলেছেন। রম্যরচনা প্রবন্ধপদবাচ্য কিনা এই বিতর্কের সূত্রেই বুদ্ধদেব বসুর উক্তি উদ্ধৃত করা হল। শ্রীগোপাল হালদার কমলাকান্ত এবং পঞ্চভূতের ঐতিহ্যসম্পন্ন বাংলা সাহিত্যে 'রম্য রচনা' এই নামের প্রয়োগে খুশি হন নি বটে, তবু 'রম্যরচনা' বলে একটি শাখা সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এই ধারায় কমলাকান্ত বা পঞ্চভূতের প্রত্যক্ষ অনুসৃতি নেই বটে, তবু এই ধারাটি বাংলায় ক্রমপুষ্টিলাভ করেছে বোধহয় পাঠকসমাজের তাগিদে। এই ধারার সূচনা বলা যায় বুদ্ধদেব বসুর 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি'তে (১৯৩২)। 'যাযাবর' (বিনয় মুখোপাধ্যায়)-র 'দৃষ্টিপাত' (১৯৪৬)-এ বাঙালি পাঠক রম্যরচনার ক্ষেত্রে এক নতুন স্বাদে অভ্যস্ত হল। তার পর 'রঞ্জন' (নিরঞ্জন মজুমদার)-এর 'শীতে উপেক্ষিতা'য় সেই ধারার যাত্রা অব্যাহত রইল। 'দৃষ্টিপাতে'র যুদ্ধকালীন ভারতবর্ষ এবং ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রথম পর্যায়ের আলোচনা-বৈঠকের প্রেক্ষাপট ছিল আর 'শীতে উপেক্ষিতা'র পশ্চাৎপটে ছিল ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসে গান্ধীহত্যার শোচনীয় ঘটনা। তবে 'দৃষ্টিপাত' বা 'শীতে উপেক্ষিতা'র আবির্ভাব খানিকটা ধূমকেতু সদৃশ। এ ধারা পরবর্তীকালে অনুসৃত হয় নি। সৈয়দ মুজতবা আলি (১৯০৪-১৯৭৪)-র লেখনীতে রম্যরচনা এক নতুন মাত্রা অর্জন কল। তাঁর রম্যরচনার অনেকগুলিই একদিকে যেমন বাস্তবতার মাটিতে প্রোথিত অপর দিকে তেমনি গল্পের আয়োজন ও দুর্লক্ষ্য নয়, তবে এগুলিতে পরিবেশিত অনাবিল কৌতুক রসই পাঠকচিত্তকে প্রধানত আকৃষ্ট করে। বাস্তব ঘটনার সূত্রটুকু বাড়তি পাওনামাত্র। মুজতবা আলির রম্যরচনার সাফল্য অনেকেই এ পথে আসতে প্রলুব্ধ করেছে। যদিও তাতে বাংলাসাহিত্য খুব বেশি লাভবান হয়েছে মনে হয় না, বরং এইসূত্রে প্রবন্ধসাহিত্যে তারল্যের অনুপ্রবেশে বাঙালি পাঠকের আলস্যই প্রশ্রয় পেয়েছে বেশি।

শৈশবকালের একটি মামুলি কৌতুককর প্রশ্নেই ফিরে আসতে হচ্ছে উপসংহারে। একদা পাঠকের বোধশক্তির উপর সংশয় প্রকাশ করতে জিজ্ঞাসা করা হত, 'সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়ে সীতা কার বাপ ?' এখন যদি প্রশ্ন ওঠে যে প্রবন্ধ কাকে বলে, তবে সে প্রশ্ন সেই অতিপরিচিত প্রশ্নের সমগোত্রীয় বলেই মনে হবে। স্মৃতিকথা জীবনী, ভ্রমণসাহিত্য প্রবন্ধ নয়, কিন্তু কেন নয় তার কোনো স্পষ্ট যুক্তি নেই। প্রবন্ধের পরিচয় কি শুধু আয়তনে এবং শিরোনাম ধারণে ? প্রবন্ধের বিচার কি শুধু বিষয়প্রাধান্যে ? একটানা দীর্ঘ রচনা কি তবে প্রবন্ধরূপে বিবেচিত হবার যোগ্য হবে না অথবা স্পষ্ট শিরোনাম-চিহ্নিত না হলে কি প্রবন্ধ তার জাতিচ্যুত হবে ? প্রবন্ধের সংযম এবং গাম্ভীর্য নিশ্চয়ই প্রত্যাশিত, সেই বিচারে গম্ভীর ('সিরিয়াস' শব্দের এই হিন্দি তর্জমাকেই মানতে হল) সংহত গদ্যরচনাকেই প্রবন্ধসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। তার বিষয় স্মৃতিচারণ, জীবনী, ইতিহাস, ভ্রমণ বা বিজ্ঞান যাই হোক-না-কেন। রবীন্দ্রনাথের 'পঞ্চভূত'-এর একটি চরিত্র 'প্রবন্ধ লেখকের বন্ধু' হতে চান নি, কারণ 'একে তো বন্ধু অর্থেই বন্ধন, তাহার উপরে প্রবন্ধ বন্ধন হইলে ফাঁসের উপরে ফাঁস।' তবে কালিদাসের ঋতুসংহারেও 'প্রবন্ধ' শব্দটির ব্যবহার আছে অন্য প্রসঙ্গে প্রবন্ধের সংযত রূপটিই তার মূলধন তাতে সন্দেহ নেই। আর সাহিত্যপদবাচ্য হতে গেলে তদুপরি প্রসাদগুণ প্রত্যাশিত।

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা প্রবন্ধসাহিত্য রবীন্দ্রঐতিহ্যকে অবলম্বন করেই অগ্রসর হচ্ছে। তার প্রমাণ আছে শ্রীগোপাল হালদারের 'সংস্কৃতির রূপান্তর' -এর অন্তিম বাক্যে। সেখানে বলা হচ্ছে, 'লেনিনগ্রাদ চূর্ণ যদি হয় হউক চূর্ণ হইবে না তাহার এক অক্টোবর' দিনের উদগীত বাণী। বর্বরের হাতে বারে বারে সভ্যতা মার খাইয়াছে, কিন্তু

বর্বরতা জয়ী হয় নাই কখনো। সংস্কৃতির সেই বিজয় অভিযান থামিবে না, থামিবে না মানবপ্রকৃতির এই স্বরাজ সাধনা' —তার পর উচ্চারিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথেরই সভ্যতার সংকটের সেই পরম বিশ্বাসবচন, 'আর একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎমর্যাদা ফিরে পাবার পথে।' এই উচ্চারণে এবং ঘোষণাতেই বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যের মানব ইতিহাসে আস্থা এবং আত্মপ্রত্যয়ের স্পষ্ট স্বাক্ষর।

প্রবন্ধ
২

বিজিতকুমার দত্ত

'রবীন্দ্রনাথ বড়ো বেশি স্পষ্ট, বড়ো বেশি বিস্তারিত, বড়োই বক্তৃতাবাগীশ, যে-কারণে অনেক সময়েই দেখতে পাচ্ছি তাঁর আবেগ উপযুক্ত দেহ খুঁজে পাচ্ছে না', বলেছেন অরুণকুমার সরকার। নেহাৎ ঘোষণা হয়ে দাঁড়াচ্ছে যা বাণী হিসেবে চমৎকার কিন্তু কিছুতেই এখনকার পাঠকের মনের মতো কবিতা নয়। উদাহরণ দেবার প্রয়োজন নেই। আইয়ুব নিজেই সমগ্র রবীন্দ্ররচনাভাণ্ডার মন্থন ক'রে অনেক সময় চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন কোন্‌গুলি কবিতা আর কোন্‌গুলি নয়। অরুণকুমার সরকার তাঁর বিবেচনামতো স্পষ্ট করেই রবীন্দ্ররচনার ত্রুটিগুলি উল্লেখ করেছেন। কবিতা-অকবিতা সম্পর্কেও বেশ পরিষ্কার করে তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করেছেন এই প্রয়াত কবি। অবশ্য গত পঁচিশ বছর ধরে রবীন্দ্রকবিতা সমালোচনায় এই ধরনের মন্তব্য মাঝে মাঝে শোনা গিয়েছে। এ কিছু অস্বাভাবিক নয়। জীবনানন্দ দাশ তাঁর 'কবিতার কথা'-য় আধুনিক কাব্যের লক্ষণ দেখেছিলেন— সংক্ষিপ্ততা, সময়চেতনা, ইতিহাসবোধ— এবং নিজে তিনি যেভাবে কবিতা নির্মাণ আর সৃষ্টি করেছেন, তাতেও সরাসরি রবীন্দ্ররচনার প্রতি বিরূপতা না থাকলেও আধুনিক কবিতা যে উত্তর-রৈবিক ভুবনে স্থিত হতে যাচ্ছে তার ইঙ্গিত ছিল। আবু সয়ীদ আইয়ুব জীবনানন্দের কবিতার উন্মেষপর্বের সাক্ষী ছিলেন। তিনি সেই সময়ের কবিকণ্ঠের যে স্বরবদল ঘটছিল তা ভালোভাবেই লক্ষ করেছিলেন। পরিচয়ের আড্ডায় তিনি এক ধরনের রবীন্দ্রবিরূপতা (যা কোনো ক্রমেই রবীন্দ্র-বিরোধিতা নয়) দেখেছিলেন। এলিয়ট, পাউণ্ড, ইয়েটস তখন বাংলার কবিদের ভজাচ্ছিলেন। আর সেই সূত্রেই কিনা জানি না, রিলকে-র‍্যাবোঁ-মালার্মে-ভেরলেনও বাংলা কবিতায় ঢেউ তুলছিলেন। রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টতই বিচলিত হয়েছিলেন। তিনি আধুনিক কবিতা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছিলেন কোথায় তার ভঙ্গিসর্বস্বতা, কোথায় তার কৃত্রিমতা।

দেশকালপাত্রের পরিবর্তনের সঙ্গে অন্বিত বাংলাসাহিত্য। সাহিত্যসৃষ্টিতে যখন পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে তখন বাংলা প্রবন্ধেও তার রঙ রূপ ফুটে উঠবে— এটাই স্বাভাবিক। আর এই পরিবর্তনকে কেউ বা সাগ্রহে বরণ করবেন, কেউ বা পরিত্যাগ করবেন 'ফ্যাড' বলে। মধ্যবর্তী আর এক গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটতে পারে যাঁরা দুই প্রান্তকে মেলাবার চেষ্টায় অস্থির হয়ে উঠবেন। টি. এস. এলিয়ট, শেলি, বায়রন, এমন-কি মিলটনের কবিতাকেও বিশেষ প্রশ্রয় দেন নি। এঁদের কবিতায় তিনি সংহতির অভাব লক্ষ করেছিলেন। অন্য দিকে তিনি তুলে আনলেন মেটাফিজিক্যাল কবিগোষ্ঠীকে আর চকিত হলেন হপকিন্স। ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলি যেমন তাঁর প্রবন্ধে উপেক্ষিত হলেন তেমনি নন্দিত হলেন কিট্‌স। অরুণকুমারের প্রবন্ধও এই জাতীয়। তবে উষ্মার ঝাঁঝ একটু বেশি। অরুণকুমারের কাছে বরেণ্য তখন প্রধানত জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু। অরুণকুমার আধুনিক কবিতার দুটি লক্ষণ দেখিয়েছিলেন 'রবীন্দ্রনাথের কবিতায় যে দুটি গুণের অল্পতা, অসদ্‌ভাব নয়।' আমাদের মর্মপীড়ার কারণ, আইয়ুব বেছে বেছে ঠিক সেই দুটি গুণকেই আধুনিক কবিতার পরম দুর্লক্ষণ বলে চিহ্নিত

করেছেন; কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন বোদলেয়ার এবং মালার্মেকে । আইয়ুব এ অভিযোগ করেছিলেন ঠিকই । বোদলেয়ারের অসুখের কথা জানিয়েছিলেন তিনি । সেই অসুখের প্রতিফলন বোদলেয়ারের কবিতায় দুঃখ এবং অমঙ্গলবোধকে টেনে এনেছে । এই অসুখের মধ্যেই (শারীরিক এবং মানসিক) একালের মানুষ খুঁজে পায় নিজেকে —দেশকালপাত্রকে । —এ কথাই অরুণকুমার জানিয়েছিলেন । আধুনিক মানুষ জানে 'সে কোনো দিব্যজীব নয়', সে চেতনার অধিকারী । কিন্তু তা সে পেয়েছে আকস্মিকভাবে, 'জড় প্রকৃতির উদ্দেশ্যহীন অন্ধ নিয়মে' । মানুষ জন্তু, 'হাতিয়ার নির্মাতা জন্তু' । মানুষ বুদ্ধিমান, যুক্তিসম্পন্ন, সচেতন কিন্তু প্রবৃত্তির তাগিদে তার মধ্যে চলেছে স্নায়ুযুদ্ধ আর তারই ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ায় সে চালিত হচ্ছে । দায়ে পড়ে মানুষ মেনে নিয়েছে তার এই জীবনযাপন । 'ঈশ্বরে আস্থা নেই তার, ভয়ঙ্কর যুদ্ধ এবং মারণাস্ত্রের ক্রমবৃদ্ধি দেখে মানুষেরই উপর আস্থা হারিয়েছে । আধুনিক মানুষ তাই বোদলেয়ারের কবিতা ভালোবাসবে । আধুনিক জীবনের প্রতি ভালোবাসা নয় 'আধুনিক জীবন যে ঘৃণা করতে পারছে' সে কারণেই তার বোদলেয়ারের কাছে আত্মসমর্পণ । রবীন্দ্ররচনায় ঘৃণাবোধের এই তীব্রতা নেই । এক সময়ে সার্ত্র, কামু আমাদের চিন্তাকে কিছুটা আলোড়িত করেছিল । নিঃসঙ্গ মানুষের আর্ত চেহারা দেখে আমরা চঞ্চল হয়েছিলাম । কামুর অ্যাবসার্ড তখন আমাদের মনোজগতে বাসা বাঁধতে চেয়েছিল । এই অ্যাবসার্ড বা শূন্যতাবোধ থেকে পরিত্রাণের পথ রবীন্দ্ররচনায় আমরা পাই না । কামুর ক্যালিগুলার প্রচণ্ডদাপে এবং বিধ্বংসী চরিত্রে বাংলার কবি-সাহিত্যিকরা বাংলার মুখ দেখতে পেয়েছিলেন । বাংলা প্রবন্ধে সমাজের এই অস্থিরতা অনিবার্যভাবেই দেখা দিতে লাগল ।

আবু সয়ীদ আইয়ুব বাঙালির এই ধারণাকে মেনে নিতে পারেন নি । তাঁর লেখায় ফুটে উঠল রবীন্দ্রনাথ অফুরান আর তার 'অন্ত নাই' । আইয়ুব 'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে অনন্তের কথা বলেন নি । তাঁর মনোযোগ আধুনিকতার ঘোলা দৃষ্টির দিকে । আধুনিকদের সংশয় সন্দেহকে আইয়ুব অগ্রাহ্য করলেন তাঁর গ্রন্থে । আইয়ুব এই প্রশ্নটিই তুলে আনেন, যদি রবীন্দ্রনাথ অচলই হয়ে থাকেন তবে রবীন্দ্রসংগীত আমাদের এমন করে উতলা করে কেন, অথবা রবীন্দ্ররচনা আমাদের আকুল করে কেন ? অরুণকুমারের বক্তব্যকে তিনি নিতান্তই সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে উদ্ভূত বলে মনে করেন । বলা বাহুল্য, আইয়ুব খুঁজতে থাকেন রবীন্দ্ররচনায় (কাব্যে) অমঙ্গলবোধ আর দুঃখের অনুভূতি কেমনভাবে উঠে আসে এবং কেমনভাবেই বা তা রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেন । আইয়ুব তাঁর প্রবন্ধমালায় রবীন্দ্রনাথের ভাবনার ক্রমোন্মোচন লক্ষ করেন । এমন সব পঙ্ক্তি উদ্ধার করেন যা আধুনিক মানুষকে বুঝিয়ে দেয় তার ভুলটা কোথায় । তিনি কিছুটা ক্ষুব্ধ চিত্তে বলেন রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রা' কাব্যের "সন্ধ্যা" কবিতাটি কেন অনেকের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় ? রবীন্দ্রনাথ যখন বাইরের জগতে দৃষ্টি ফেলেছেন 'পৃথিবীর এবং পৃথিবীর মানুষের দিকে তাকিয়ে দেখেন, তখন তাঁর ব্যাকুল হৃদয়ের নিরাশ্রয় শূন্যতা আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে' । আইয়ুব মনে করেন "সন্ধ্যা", শূন্য ক্লান্ত হৃদয়ের সার্থক প্রকাশ । এই কবিতাতেই রবীন্দ্রনাথ দুঃখকে, অমঙ্গলকে দেখেছেন 'কত ক্লেশ, কত যুদ্ধ কত মৃত্যু, নাহি তব শেষ' । এই পৃথিবীকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'নিঃসঙ্গিনী', আর কবির একটি ব্যথিত প্রশ্ন আইয়ুব শুনতে পান 'আরো কোথা ? আরো কত দূর ?' তিনি লক্ষ করেছেন 'বলাকা'র নাম কবিতায়ও প্রায় অনুরূপ চরণ উঠে আসে । কিন্তু 'সন্ধ্যা'র ব্যাকুল প্রশ্ন 'জাগায় শুধু নৈরাশ্য আর বিষাদ' যা বলাকায় নেই । এমনি করেই আইয়ুব এগিয়ে যান । এবং তিনি এই সিদ্ধান্তে আসেন যে রবীন্দ্রকবিতার শেষ পর্যায়ে অমঙ্গলবোধ আর দুঃখের অনুভূতি বারে বারে বিস্তৃত হতে থাকে । তিনি আধুনিক কাব্যরসিকদের প্রতি কখনো কখনো উত্তেজিত ভাষায় কিছু বলতে চান । আধুনিক কবির রবীন্দ্র- দ্রোহ বুদ্ধিকে তিনি ব্যঙ্গ আর শ্লেষে ক্ষতবিক্ষত করতে উদ্যত হন । তিনি রবীন্দ্রনাথের দুঃখ এবং অমঙ্গলবোধ সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করতে করতে আধুনিকদের সাহিত্যবুদ্ধি যাচাই করেন । তিনি স্মরণ করিয়ে দেন সাহিত্যিকের নান্দনিক দায়িত্ববোধের কথা । আধুনিক কবি শব্দসচেতন । রবীন্দ্রকাব্যভাষা সম্পর্কেও আধুনিকদের কিঞ্চিৎ অভিযোগ আছে । আইয়ুব জবাবে তারাপদ রায়ের উদ্ধৃতি দিয়ে

('চৌমাথার ভিড় থেকে ফুসলিয়ে ভুলিয়ে-ভালিয়ে একটি শব্দকে ধরে কোনোভাবে ঘরে নিয়ে আসা') বলেন এ তো বালকদের শব্দ নিয়ে খেলা। 'হাল-ফ্যাশনের কবিতা লিখতে বা পড়তে অনেক বিদ্যাবুদ্ধি লাগে, তদুপরি অনেক পরিশ্রম। তাই খেলাটা যে উঁচুদরের বা বিদগ্ধজনোচিত সে-কথা কবুল করতেই হবে। তবু খেলা'। এই 'তবু'-র উত্তর অবশ্য এই সময়ের আলোচকদের কাছে জরুরি ছিল। আইয়ুব যতটা হাল্কাভাবে বা অসহিষ্ণু হয়ে এই মন্তব্য করেছেন আধুনিকরা তাতে তৃপ্ত হবেন না নিশ্চয়ই। আইয়ুবের প্রবন্ধে আমরা লক্ষ করি আধুনিক সমালোচকদের রবীন্দ্রবিরোধিতার (ঘৃণা, শূন্যতাবোধ ইত্যাদি) উপাদানের প্রতি মনোযোগ। অমঙ্গল চিন্তা সেই সূত্রেই এসেছিল তাঁর প্রবন্ধে। কিন্তু আইয়ুব ভুলে যান না শেষ পর্যায়ের রবীন্দ্ররচনায় 'নতুন এক কবি-পুরুষের পরিচয় লাভ ঘটেছে'। 'বীথিকা'র "দুর্ভাগিনী" কবিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রশ্নকাতরতার মধ্যে তিনি খুঁজে পান এক 'সীমাহীন নৈরাশ্যে'র। আধুনিকতার পরতে পরতে যদি দুঃখ আর অমঙ্গল জড়িয়ে থাকে তবে রবীন্দ্রনাথ তাকে খুঁজেছেন তাঁর বাণীর আভায়। এ কথা ঠিক, রবীন্দ্রনাথের জীবনের অন্তিম দশকে সর্বব্যাপী পাপ ও দুঃখ বার বার হানা দিয়েছে। সত্য শিব সুন্দরের পরমতা বিষয়ে রবীন্দ্রচিত্তে সংশয় জেগেছে এবং আমাদের মনে হতে পারে মঙ্গলময় বিধাতার অস্তিত্ব 'বীতশ্রদ্ধ জীবন ও জগৎ সম্পর্কে সর্বতোভাবে নিরাশ, নিরুৎসাহ ও নিরানন্দ' করে তুলেছে। আইয়ুবের উত্তর 'না'। রবীন্দ্রনাথ সার্বিক বিপর্যয়ের মধ্যেও দেখতে পান 'নক্ষত্রের ইঙ্গিত'। রবীন্দ্রনাথের এ দেখার আবেদন আমাদের চিন্তাকে আকুল করে তোলে এবং আমরা নিশ্চিন্ত হই 'এ জগৎ স্বপ্ন নয়, দুঃস্বপ্ন নয়, কাফ্‌কার উপন্যাস নয়'। আইয়ুবের শেষ কয়েকটি শব্দে ধাক্কা খাই। আধুনিক জিজ্ঞাসাকে কেন চাবুক মেরেছেন ? আইয়ুব তাঁর বোধ আর বোধিতে তাঁর প্রবন্ধকে উঁচু সুরে বেঁধেছিলেন এখানে যেন তিনি কিছুটা ভদ্রতাকে পরিহার করলেন। আইয়ুব বিদ্বান, অসামান্য তাঁর বিদ্যার পরিধি। মননে তিনি স্পর্শ করেন দার্শনিক চিন্তাকে। আর রবীন্দ্রনাথকে স্পর্শ করেন মননে এবং হৃদয়ে। রবীন্দ্রসাহিত্য তাঁর জীবনের পাথেয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সখা। বই লেখেন 'পান্থজনের সখা' নামে। রবীন্দ্রনাটক আর গান থেকে তুলে আনেন তিনি বিস্ময়কর ভাবরাজি। একদা অজিতকুমার চক্রবর্তী যেমন করে রবীন্দ্রনাথকে পেয়েছিলেন, অথবা সতীশচন্দ্র রায় যেমন করে 'গুরুদেব'কে নম্র প্রণাম জানিয়েছেন, আইয়ুবের দর্শনমন এবং বোধের কাছে রবীন্দ্রনাথ তেমনি সখা হয়ে ওঠেন। কিন্তু অজিতকুমার চক্রবর্তী বা সতীশচন্দ্র রায়ের মতো প্রথম দর্শনের বিহ্বলতা আইয়ুব ফুটিয়ে তোলেন, আর যুক্তি শৃঙ্খলার এক নূতন মাপকাঠি তিনি ব্যবহার করেন এই বইতে।

আইয়ুবের ভাষায়, "পরম পান্থকে 'পান্থজনের সখা' বলতে অন্যতম ইঙ্গিত কি এই নয় যে রবীন্দ্রনাথের মতো যাঁরা মনে-প্রাণে পান্থজন তাঁদেরই সখা তিনি ?" আধুনিকদের দিকে লক্ষ রেখে তিনি বলেন "শুধু রূপের পরোৎকর্ষে কোনো কবির রচনা মহত্ত্বের শিরোপা লাভ করতে পারে না। যেমন কোনো কোনো সুন্দরীকে দেখে আমাদের মনে ক্ষোভ জাগে— "এমন অপরিমেয় যার দেহের রূপ তার ব্যক্তিত্বের স্বরূপ এত ছোটো মাপের কেন ?" 'পান্থজনের সখা'য় আইয়ুব ফিরে ফিরেই ধর্মচিন্তার প্রসঙ্গ আনেন। এখানে আমরা এমন একজন প্রাবন্ধিককে পাই যিনি নাস্তিকও নন, আস্তিকও নন। রবীন্দ্রভাবনায় অনেক সমালোচকই বিরোধের মধ্যে সমন্বয়প্রয়াসের প্রবণতা লক্ষ করেছেন। যেমন সত্যেন্দ্রনাথ রায় প্রচুর দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করে বিষয়টিকে স্পষ্ট করেছেন। আইয়ুব সেই ধারারও প্রাবন্ধিক নন। ধর্মের উদ্ভব, তার জটজটিলতা, টানটোনের রূপরেখা আঁকেন আইয়ুব। অনেক সময় মনে হয় আইয়ুব রবীন্দ্র-আলোচনার সূত্রে নিজের বিবেকের সঙ্গেই বোঝাপড়া করছেন। তাঁর অর্জিত জ্ঞান এবং সমকালীন জীবনযাপনের দ্বন্দ্বের নিরসন করতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন তিনি। আর এই দুইয়ের মধ্যবিন্দুতে রয়েছেন রবীন্দ্রনাথ।

আইয়ুব রবীন্দ্রনাথের ভাষা-ছন্দ সম্বন্ধে অনবহিত নন। তিনি রবীন্দ্রনাথের রচনার ইশারা ভঙ্গি কৌশলকে ঠিকই স্পর্শ করেন। কিন্তু তাঁর অন্বিষ্ট রবীন্দ্রভাবনার উদ্ভব বিকাশ এবং পরিণাম। আর শঙ্খ ঘোষ মনোযোগী

হন রবীন্দ্ররচনার দেহ ও আত্মার বিশ্লেষণে । আইয়ুবের রচনায় সমকালীন বুদ্ধিজীবীর রবীন্দ্রভাবনাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে বিশেষ একটি দিক থেকে (অমঙ্গলবোধ এবং দুঃখবোধ) । শঙ্খ যখন রবীন্দ্র-নাটকের বিশ্লেষণ করেন তখন তাঁর দৃষ্টি থাকে নাটকের শিল্পরূপের দিকে । 'কালের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাটক' গ্রন্থে শঙ্খ নাটকের করণকৌশল বিচারে রবীন্দ্রনাটকের দলছুট চরিত্রের রহস্য মেলে ধরেছেন । সনাতন বাংলা নাটকে লৌকিক নাটকের ঋণগ্রহণ ব্যাপারটি সম্পর্কে শঙ্খ বলেন সেখানে ছিল প্রমোদের টান আর রবীন্দ্রনাট্যে এ ঋণগ্রহণ আত্মআবিষ্কারের পথ । গিরিশচন্দ্র এবং সনাতন নাট্যকাররা যখন নাট্যশিল্পের সমৃদ্ধিতে শেকস্‌পিয়রের দিকে বার বার তাকান তখনো রবীন্দ্রনাথ দেশীয় ঐতিহ্যের মধ্যে নাটকের কারুকর্মকে স্থাপন করতে চেয়েছেন । ১৯৬৬ সালেই শঙ্খ বলেছেন, 'এক লাইনের এক কবিতায় লিখেছিলেন স্পেনীয় কবি হিমেনেথ, "ডানা আর শিকড় : শিকড়ের ডানা হোক, ডানার শিকড়" । কালস্বভাবের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যে পালটে নিচ্ছিলেন তাঁর নাট্যরীতি, সে রীতিও সব সময়ে ভিতরে রেখে দিয়েছিল এই দাবি : শিকড়ের ডানা হোক, ডানার শিকড় । একই তাৎপর্যের বোধ আমাদের মধ্যে নিয়ে এল লোকপুরাণের সজীব স্পর্শ । শঙ্খর 'নাট্যমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধ পড়ে বুঝতে পারি একালের নাট্যপ্রিয় মানুষ রবীন্দ্রনাথ থেকে দূরে সরে গিয়ে রবীন্দ্রসান্নিধ্যে থেকে ব্যবধান গড়ে তুলতে চান । বাংলার গ্রুপ থিয়েটারের উদ্যোগে এই সময়ে বেরটল্‌ট ব্রেখট জনপ্রিয় হয়েছিলেন । শঙ্খ ব্রেখ্‌টীয় নাট্যাদর্শ বিশ্লেষণ করে দেখিয়ে দেন রবীন্দ্রনাট্যপ্রকরণ ব্রেখটের প্রকরণের উলটো । রবীন্দ্রনাটকে অভিনয়, গান, নাচ আলাদা হয়ে যায় না । অভিনয়ের বিন্দুতে এসে এ-সবের মাত্রা ঘন হয়ে একে অপরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, ঢেউ তোলে আর কান্নাহাসির দোল দোলে । শঙ্খ রবীন্দ্রনাট্যকর্মকেই জরুরি মনে করেন এখনকার নাটকের শৃঙ্খলমুক্তি ঘটাতে । অভিনয় কলায় সজীবতা আসতে পারে রবীন্দ্রনাটকের উত্তাপে । ডাকঘর, মুক্তধারা, রক্তকরবী ইত্যাদি নাটকে তিনি আর-একটি জিজ্ঞাসা আমাদের সামনে তুলে ধরেন ।

রবীন্দ্রনাট্য আলোচনা ইতিপূর্বে অনেক হয়েছে । মূলত সে আলোচনা অ্যাকাডেমিক । শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য রবীন্দ্রনাটকের অ্যাকাডেমিক গণ্ডির মধ্য থেকে ভিন্নতর দৃষ্টিকোণের প্রয়োজনীয়তা বুঝেছিলেন । শঙ্খ অ্যাকাডেমিক পদ্ধতি বর্জন করেছেন । বাংলা সমালোচনামূলক প্রবন্ধে শঙ্খ রবীন্দ্রনাটকের মর্মে পৌঁছতে চান, আর নাটক যে যৌথ রচনা এ সম্বন্ধে তিনি সচেতন । ভালো লাগে, শঙ্খ ব্রেখ্‌টের নাট্যশিল্পের গুণগ্রাহী হলেও, বাংলা নাটকের মুক্তির পথ যে সে পথে নয় এ কথা যখন জোর দিয়ে বলেন । 'নটীর পূজা' অভিনয় সম্বন্ধে শঙ্খ বলেন 'নৃত্যনাট্যের এই নৃত্য তো কেবল নাচ নয়, সে হল অভিনয়েরই একটা ছন্দোময় প্রকাশ, অভিনয়ে তার লিরিক রীতিরই প্রত্যাশিত ফল । এরই মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ চাইছিলেন তার অভিনয়ে মুক্তি, একদিকে আতিশয্য আর অন্য দিকে স্বাভাবিকতার জাল থেকে সরিয়ে নিতে পারে ভিতরকার যে মুক্তি' । শঙ্খ লক্ষ করেছেন রবীন্দ্রনাথ ছেলেবেলা থেকে যে-সব গানে মুগ্ধ হয়েছেন, তৃপ্তি পেয়েছেন তা স্মৃতিতে সঞ্চিত ছিল । ঠিক সময়ে সে-সব জড়িয়ে গেল শিল্পপ্রয়াসে । এভাবে দেখলে বুঝতে অসুবিধে হয় না রবীন্দ্রনাট্য প্রকরণের জটিল অথচ সুষম বিন্যাসকে । রবিবাবুর গান থেকে রবীন্দ্রসংগীতের উত্তরণ (?) আপাতদৃষ্টিতে অভিনব কিছু নয় । তবু একটু কথা থাকে । আসলে আর পাঁচজনের সঙ্গে মিলিয়ে 'রবিবাবুর গান' আর যেখানে রবীন্দ্রনাথের গান বিশিষ্ট, নিজের মহিমায় উজ্জ্বল সেখানে সে গান রবীন্দ্রসংগীত । ইন্দিরা দেবী, ধূর্জটিপ্রসাদ রবীন্দ্রসংগীত বিশ্লেষণ করে প্রবন্ধ লিখেছেন, অনেক তথ্যও আমরা পেয়েছি তাঁদের কাছ থেকে । রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তাঁর গান সম্বন্ধে কিছু কিছু বলেছেন । আর সংগীতের রহস্য রবীন্দ্রনাথকে কী অপরিসীম কৌতূহলী করেছিল তার প্রমাণ তো কেবল তাঁর সংগীতবিষয়ক প্রবন্ধগুলিই নয়, সাহিত্যবিচারমূলক প্রবন্ধগুলিও । ধূর্জটিপ্রসাদ লক্ষ করেছিলেন রবীন্দ্রসংগীতে জীবনধর্মের পরিচয়, লোকায়ত সুরের প্রবল টান । জীবনেরই সৃষ্টিতে সে সংগীতের সার্থকতা । জীবনযাপনের সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে দিয়েই রবীন্দ্র-কথা ও সুর দীপ্ত হয়ে ওঠে । গানের কথায় ও সুরে যে

করণকৌশল তারও রহস্য এইখানে । শঙ্খ রবীন্দ্রসংগীতে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা আর টানটোনের দিকগুলি পরিস্ফুট করেন । রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'এ আমির আবরণ স্খলিত হয়ে যাক/ চৈতন্যের শুভ্র জ্যোতি/ভেদ করি কুহেলিকা/ সত্যের অমৃতরূপ করুক প্রকাশ ।/সর্বমানুষের মাঝে/ এক চিরমানবের আনন্দকিরণ/চিত্তে মোর হোক বিকিরিত' । শঙ্খ রবীন্দ্রসংগীতে খুঁজে পান অপার ভালোবাসার বোধ— যে বোধ নিত্যদিনের সঙ্গে জড়িয়েও তার বাইরে, তেমন রবীন্দ্রসংগীতে মুক্তির টানটি কী করে ক্রমান্বয়ে সৃষ্টির পর্যায়ে পৌঁছে যায় তাও লক্ষ করেন তিনি । রবীন্দ্রসংগীতের আলোচনায় যুক্তিক্রমের সঙ্গে শঙ্খর ব্যক্তিগত ভালোবাসাও যুক্ত হয়ে যায় 'এ আমির আবরণ' গ্রন্থে । কয়েকটি প্রবন্ধে শঙ্খ রবীন্দ্রসংগীতের নানা মাত্রাকে উদ্ভাসিত করেন । এখানে আইয়ুবের সঙ্গে শঙ্খর যোগ । আবার অমিলও ফুটে ওঠে যেখানে শঙ্খ নিজেকে সরিয়ে রেখে গানের ভিত্তিভূমিতেই দাঁড়িয়ে যান যখন । মাঝে মাঝে রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই তিনি কথা বলেন । শঙ্খ বলেন 'আত্মআবরণ মোচনের প্রবল বেদনায় মথিত হয়ে উঠে এই গানগুলি যেমন, "আজ যেমন করে গাইছে আকাশ তেমনি করে গাও", দাবি করে আমাদের সমস্ত সত্তা, আর তখন মনে হয় এর চেয়ে, বড়ো মন্থন, এর চেয়ে বড়ো প্যাশন বা বাসনার তাপ আর যেন নেই আমাদের অভিজ্ঞতায়' । পূজা নয়, নয় প্রেম— শঙ্খ একে বলতে চান রবীন্দ্রসংগীতর তৃতীয় স্তর— ভালোবাসার গান । শান্তিদেব ঘোষ, কিরণশশী দে, প্রফুল্লকুমার দাস রবীন্দ্রসংগীতের আলোচনা করেছেন । সে-সব আলোচনার গুরুত্ব কম নয় । মূলত এঁদের আলোচনা অবজেকটিভ । কিন্তু শঙ্খ যখন বলেন 'রবীন্দ্রনাথের কাছে ভালোবাসা তিন শব্দের যোগ : তুমি আমি আর গান— তোমার আমার বিরহের অন্তরালে কেবলি তার সেতু বেঁধে যায় যে-গান, প্রেমের নয় শুধু, ভালোবাসার গান' । — তখন উপলব্ধিই সেখানে মুখ্য । একটু অস্বস্তিও বোধ করি এই কারণে যে শঙ্খ যেন নিজেকে বড়ো বেশি জড়িয়ে ফেলেন তার ভালোলাগার গাণ্ডিতে ।

প্রবোধচন্দ্র সেন 'ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ' বইতে ছন্দ-চর্চায় মাঝে মাঝে রবীন্দ্রসংগীতকেও দৃষ্টান্ত হিসেবে গ্রহণ করেছেন । এ তো স্বাভাবিক । রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর গানকে কাব্য বলে উল্লেখ করেছেন । শঙ্খ বিষয়টির গুরুত্ব বুঝে একটি প্রবন্ধের পরিসরে ছবি ও গানের আলোচনা করেন । তিনিও ছন্দের ঐশ্বর্য খোঁজেন রবীন্দ্রগীতিতে, রবীন্দ্রনাথই যাকে বলেছেন 'ধরেছি ছন্দোবন্ধনে' । ছান্দসিকের বিজ্ঞানমনস্কতার পরিচয় এই প্রবন্ধটিতে আছে । আর আছে সৃষ্টির করণ-কৌশলের সঙ্গে ভালোবাসার গানের গূঢ় সম্বন্ধটি । শঙ্খ স্মরণ করিয়ে দেন, একদা গীতবিতান দ্বিতীয় সংস্করণকে রবীন্দ্রনাথ কাব্যগ্রন্থ হিসেবেই সাজিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন । আমরা বলতে পারি 'এর ছন্দও আমাদের আকর্ষণ করবে তার সামর্থ্যে, তার বৈচিত্র্যে, কথার ভিতর থেকে আপনিই তার সুর বার করে আনবার সহজ আনন্দে' ।

এই বইতেই আইয়ুবের সঙ্গে শঙ্খ ঘোষের বিতর্ক স্থান পেয়েছে । আইয়ুব বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি পর্ব 'একটু কাঁচা বয়সের, একটু নবযুবতী-স্বভাবের মানুষ' । আইয়ুবের ধারণা রবীন্দ্রনাথ এই পর্বে রূপসী প্রকৃতিতে মগ্ন, 'ভ্রান্ত রূপান্ধ সুদর্শনার মতোই তিনি জীবনকে কেবল "পরম মধুর সুন্দর ও শুভ রূপে" দেখেন । শঙ্খ তা মানেন না । তাঁর সিদ্ধান্ত রবীন্দ্রনাথের 'সমস্ত বিরোধ-সাদৃশ্য তাঁর রচনায় পৌঁছে যায় এক অন্তিম সামঞ্জস্যে, সমগ্রের এক ডিজাইনে' । আইয়ুব তাঁর উপলব্ধিতে যাকে পান শঙ্খের ভাষায় হয়তো বা তা 'আপাতবিরোধ', কিন্তু প্রশ্ন উঠবে, সত্যিই কি তা 'আপাত' ? 'নানা রবীন্দ্রনাথে'র কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন । গানেও কি তার আভাস নেই ? আইয়ুব, বোধ করি, সেইরকম নানা ঢেউ থেকে একটিকে বেছে নিয়েছিলেন । এই ঢেউয়ের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা নেই । বসুন্ধরা যখন গভীর টানে মুচড়ে ওঠেন তখন তার বেদনা সাগরকূলে ভাঙতে থাকে পরতে পরতে । শঙ্খ সেই অদৃশ্য টানের উৎস সন্ধান করেন, আর আইয়ুব দেখেন ঢেউয়ের চূড়ার পর চূড়া ।

আইয়ুবের সঙ্গে শঙ্খর বিরোধ বোধ করি দার্শনিকের সঙ্গে কবির বিরোধ ? বিষয়টিকে কিভাবে বলা যাবে ? আধুনিক কবির উদ্দীপনা অথবা যন্ত্রণা দার্শনিকের চিত্তে ভিন্ন রূপ নেয় । চরাচরের বেদনার, উল্লাসের একটা

সামান্য রূপ আছে, আর আছে তার বিশিষ্ট রূপ। দুজনেই এই সামান্য ও বিশেষ-কে চেনেন, জানেন। কিন্তু তার প্রকাশ আলাদা। আইয়ুব আধুনিকতার মূলে পাপ আর অমঙ্গলের সূচনা দেখেছেন। শঙ্খর মনে হয়েছে আইয়ুব সরলীকরণের দিকে গিয়েছেন। সেজন্যে শঙ্খর কাছে জরুরি হয়ে উঠল আধুনিকতার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন। তাঁর 'নির্মাণ আর সৃষ্টি' গ্রন্থে শঙ্খ ফ্রয়েড, ব্রেত, এলিয়ট, পাউণ্ড, লোয়েল, ইয়েটস— যাঁদের কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন— তাঁদেরই একটু গভীরভাবে বুঝে নিতে চান। রবীন্দ্রনাথ লোয়েলের জুতোর দোকানের যে ব্যাখ্যা করেছেন শঙ্খ তা অগ্রাহ্য করেছেন। শঙ্খ বলেন জুতোর দোকানের পরিবেশে jamming বা screening বা plopping এর মতো শব্দগুচ্ছ এক সামাজিক তাৎপর্য নিয়ে আসে, আর 'শেষ পর্যন্ত যখন শুনি দোকানদার যেন রক্ত ঝরাচ্ছে, 'it bleeds red slippers', তখন চটিজুতোর কবিতাটি ছোটো একটি দৃশ্য হয়েই থাকে না কেবল, তা তখন হয়ে ওঠে যুগেরই কোনো আর্ত ধ্বনি'। বাংলা প্রবন্ধে মননের ধারাটি কোন্ মুখী হয়ে উঠছে শঙ্খর বক্তব্যে তা ফুটে ওঠে। রবীন্দ্রযুগের অবসান নয়, আধুনিক কবি কাব্য ব্যাখ্যায় নূতন সূত্র সংগ্রহ করছেন। শব্দ বা শব্দগুচ্ছের প্রতি মনোযোগ— তার লক্ষণ। তারাপদ রায়ের ভুলিয়ে-ভালিয়ে টেনে আনা শব্দের কথা আমরা এখানে পাই।

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য 'শাশ্বতভাবে আধুনিক' বলতে বিজ্ঞানীর নিরাসক্তি দাবি করেছিলেন। একদা একটি ভালো প্রবন্ধে নলিনীকান্ত গুপ্তও আধুনিক কবিদের নানা প্রলোভনে দিগ্‌ভ্রান্ত হবার কথা বলেছিলেন। শঙ্খ বলেন নিরাসক্ত আর নৈর্ব্যক্তিক সমার্থক নয়। শঙ্খর মনে হয়েছে নিরাসক্ত শব্দটাই কবিকে ছলনা করেছে। শঙ্খ কি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'কাব্যের মুক্তি' প্রবন্ধটি স্মরণ করছেন? আধুনিক কবিতা জটিল। 'কবিতার মুহূর্ত' এর সঙ্গে জড়িয়ে যায় নানা অনুষঙ্গে। দৃশ্য, বস্তু, ভাব তাদেরই ন্যায়ে উদ্ভাসিত হতে থাকে কবিচিত্তে। নৈর্ব্যক্তিক কবি তাকেই রূপ দেন। এলিয়টের 'অবজেকটিভ কোরিলেটিভ্‌স' ব্যাপারটাও এখানে উঠে আসে। একটি বস্তুতে কবি যে বিভিন্ন মাত্রা দেখতে পান তা কোনোটা বস্তুর খুব কাছাকাছি, আমাদের বুদ্ধি-অনুভূতির লাগোয়া। আবার কোনোটা দূর নক্ষত্রের মতো। এ-সবের সামঞ্জস্য কিভাবে করেন কবি? শঙ্খর ভাষায় 'চকিতে চকিতে ঈঙ্গিতের কোনো স্ফুরণের মধ্য দিয়ে তার যাওয়া-আসা চলতে থাকে ব্যক্তি থেকে সমাজে, প্রকৃতি থেকে চেতনায়, অতীত থেকে আগামীতে'। কবিতার ভাষা হবে এই চেতনা, যাওয়া-আসা, ব্যক্তি থেকে সমাজের চলাচলের ভাষা। এই ভাষা প্রতীককেন্দ্রিত ভাষা, বিষ্ণু দে'র কথায় এই ভাষা প্রতীকোৎসারী। এই ভাষাই নিজের মধ্যে বিশ্বকে পায়। নৈর্ব্যক্তিকতার মানে হল এই। আধুনিক কবি কথা বলতে চান প্রতিমার ভাষায়। এই প্রতিমায় ভর থাকে অভিজ্ঞতা ও চিন্তার সারবত্তা আর কল্পনা-আভা। রবীন্দ্রকাব্যে অভিজ্ঞতা, চিন্তার সারবত্তা এবং কল্পনার আভা— সবই আছে কিন্তু তাঁর ভাষা ঈষৎ বিস্তারী। জীবনানন্দ যাকে বলেছেন সংক্ষিপ্ততা, তার অভাব যেন রবীন্দ্ররচনায়। কিন্তু সত্যিই কি তাই? রবীন্দ্রকাব্যে সংহত রয়েছে ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দের কাব্যভাবনা এবং কাব্যরীতি। আধুনিক শিল্পসৃষ্টির ভাষা তৈরি হয় তাঁর শেষ পর্বের কাব্যে। এমন-কি আইয়ুবও রবীন্দ্রনাথকে শনাক্ত করতে পারেন নি— এরকমই মনে হয় শঙ্খর লেখা পড়ে। রবীন্দ্রনাথের ছবির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের লেখা মিলিয়ে (বিশেষ করে 'প্রান্তিক') শঙ্খ যখন বলেন দুঃখ এবং অমঙ্গলবোধ নয়, রবীন্দ্রনাথের শেষ পনেরো বছরের কবিতায় এক দ্বন্দ্বময় রবীন্দ্রনাথকে পাই। ছবিতে কবিতায় নিজের সঙ্গে নিজেরই দ্বন্দ্বের চেহারাটি ফুটে ওঠে তখন। রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা সম্বন্ধে যে-সব আলোচনা পাই তার মধ্যে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণের পরিচয় আছে। শিবনারায়ণ রায় একভাবে দেখেন রবীন্দ্রচিত্রকে আর সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রসাহিত্যের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেন রবীন্দ্রচিত্রকলাকে। শঙ্খও সাহিত্যের সঙ্গে মেলান চিত্রকে। কিন্তু তাঁর অন্বিষ্ট রবীন্দ্রনাথের চিত্তে নূতন করে যে সংকট দেখা দিল সেই সংকট থেকে পরিত্রাণের প্রয়াসরূপে চিত্রকলার ভূমিকা। কল্লোল কালিকলম প্রগতি আর বিচিত্রার আসর একসময়ে যে তাপ-উত্তাপ সৃষ্টি করেছিল রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে তা রবীন্দ্রনাথকে কতটা আলোড়িত করেছিল?

সেই আঁচে রবীন্দ্রনাথ কিভাবে নূতন মূর্তি তৈরি করেছিলেন তার ইতিহাস ব্যক্ত করেছেন শঙ্খ 'নির্মাণ আর সৃষ্টি'তে। এবং শঙ্খ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে যান—রবীন্দ্ররচনা আধুনিক জীবনযাপনেরই প্রতিচ্ছবি। তিনি বলেছেন, রক্তকরবীর প্রাসঙ্গিকতা আজও কোথায়। গোরা-শচীশ-নিখিলেশের মধ্যে তিনি খুঁজে পান চলমান সময়ের 'জটিল চেতনার চিহ্ন'। শঙ্খর প্রবন্ধে আমরা রবীন্দ্ররচনার পূর্বাপর চিন্তা, ভাবনা, অনুভব ইত্যাদির প্রদক্ষিণ দেখতে পাই। তথ্যের ঘন সন্নিবেশ আমরা লক্ষ করি তাঁর রচনায় কিন্তু তথ্যের ভার নেই এই-সব প্রবন্ধে। তাঁর বলার কথাকে তিনি এমন ভাবে সাজিয়েছেন যে রবীন্দ্ররচনার ছোটো পঙ্‌ক্তি বা একটি শব্দ যেন আলোর দ্যুতি ছড়িয়ে দেয়। এইভাবেই তিনি পৌঁছে যান তটস্থ থেকে রবীন্দ্রচিত্তের গহনে এবং বলতে পারেন 'হয়ে-থাকার (Being) চেয়ে অনেক বড়ো হয়ে-ওঠার (Becoming) বোধ, ঐতিহাসিক কাল আর পারমিক কালকে একসূত্রে বেঁধে নিয়ে সেই আধুনিকতার দিকেই এইভাবে চলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, পর্ব থেকে পর্বে।

দুই

রবীন্দ্রনাথের সত্তর সছর পূর্তি উপলক্ষে 'জয়ন্তী-উৎসর্গ' (১৯৩১) সংকলন গ্রন্থে মাত্র তেইশ বছর বয়সের বুদ্ধদেব বসু রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতা সম্পর্কে একটি প্রবন্ধে বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথেব প্রেমকবিতায় প্যাশনের বড়ো অভাব। 'মানসী' থেকে 'ক্ষণিকা' এবং তারও পরের অনেক কাব্যগ্রন্থে প্রেমকবিতা বলে যেগুলি চিহ্নিত সে-সবে 'বুক টিপটিপ' করা প্রেমের শিহরণ নেই। কিন্তু বুদ্ধদেব বসু ঐ প্রবন্ধেই 'পূরবী'-'মহুয়া'র এমন কিছু কবিতা নির্বাচন করে নিয়েছিলেন যেখানে আমরা পাই প্রেমের দীপ্তশিখা, আগ্নেয় রূপ।

বুদ্ধদেব বসুর রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে প্রৌঢ় চিন্তার প্রকাশ ১৯৬৬ সালে প্রকাশিত 'কবি রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে (১৯৬২ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণের পাঁচটি প্রবন্ধ)। রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষের পরের বছরেই বুদ্ধদেব বসুর ভাষণ নানা দিক থেকে আমাদের আলোড়িত করেছিল। প্রবন্ধের ভাষা—ভাষণ বলেই—শ্রোতার তাৎক্ষণিক সাড়া দেওয়ার কথা মনে রেখে তৈরি হয়েছিল। যতটা সম্ভব দূরত্ব রেখে রবীন্দ্রনাথকে তিনি উপস্থিত করেছেন এই গ্রন্থে। 'কালের পুতুলে'র আতিশয্যকে পরিহার করেছেন তাঁর বিশ্লেষণে। প্রথম প্রবন্ধটি পড়তে গিয়েই আমরা সচেতন হয়ে উঠি। সাধারণ, অতি সাধারণ কবিতা লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ, যেমন 'পুরাতন ভৃত্য'। রবীন্দ্রনাথ অজস্র লিখেছেন, সেই হেতু এমন কিছু কবিতা আছে যা কবিতা হিসেবে উৎকৃষ্ট নয়— নিছক সংবাদ মাত্র। বুদ্ধদেব বসু 'অভিসার' কবিতাটিকেও প্রায় বাতিল করে দেন। অনেক সময় রবীন্দ্রনাথ 'শব্দব্যসনে'র প্রলোভন এড়াতে পারেন নি। বুদ্ধদেব বসু রবীন্দ্রনাথের অতিলেখনকে পছন্দ করেন নি। কিন্তু এও তিনি বোঝেন, সমগ্র জাতির 'মানসিক দারিদ্র্য' ঘোচাবার ভার রবীন্দ্রনাথকে নিতে হয়েছিল। এজন্যে রবীন্দ্রকবিতায় আছে 'আতিশয্য ও উচ্চারণের সার্থকতা'। তিনি বলেন, রবীন্দ্রকবিতার সংকলন গ্রন্থ 'সঞ্চয়িতা' 'জনগণ প্রিয়', আর 'চয়নিকা' যেন রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ করবার পক্ষে এক বাধা।

বুদ্ধদেব অবশ্যই রবীন্দ্রনাথকে বিশ্লেষণ করেছেন কবিরূপেই। যেখানে তাঁর অভিজ্ঞতা 'কুঁড়ির ভিতরে গন্ধের মতো ব্যাকুল, তাঁর সেই গোপন জীবনের কাহিনী'। বুদ্ধদেবের কাছে ভেসে ওঠে রবীন্দ্ররচনা নাটক রূপে। যেখানে প্রেম, বিরহ ও পুনর্মিলনের কান্নাহাসি। এই নাটকের নান্দীপাঠ 'সন্ধ্যাসংগীত', যবনিকা উত্তোলন 'মানসী'তে আর সকল দ্বন্দ্বের অবসান 'গীতাঞ্জলিতে'। এই দৃষ্টিকোণ থেকে 'সোনার তরী'র "মানসসুন্দরী" এবং "নিরুদ্দেশ যাত্রা"র তুলনামূলক আলোচনা করে দেখিয়েছেন কবিতা দুটির অন্তরঙ্গ সাদৃশ্য— ভাব ও ভাবনায়, এমন-কি প্রকাশরীতিতেও। কবিতা হিসেবে "নিরুদ্দেশ যাত্রা"ই যে শ্রেষ্ঠ বুদ্ধদেব তা জোর দিয়েই বলেন। যতদূর বুঝি এখানেও জীবনানন্দের আধুনিক কবিতার সংক্ষিপ্ততার প্রসঙ্গটি বুদ্ধদেবের মননে ক্রিয়া করেছে।

বলা বাহুল্য বুদ্ধদেব ইউরোপীয় কবিকুলকে স্মরণ করেন (আইয়ুব শঙ্খ এবং সমকালীন সমালোচকবৃন্দ বারে বারে পাশ্চাত্য কবি–দার্শনিক–চিন্তাবিদ্‌দের টেনে আনেন রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে জানতে, বোধ করি তাঁর নির্দিষ্ট স্থানটি নির্বাচন করতেও) । বুদ্ধদেব রবীন্দ্রনাথের 'বিদেশিনী'কে শনাক্ত করতে চান । আমাদের মনে পড়বে নীরদচন্দ্র চৌধুরীর বিদেশিনীর ব্যাখ্যা ('আত্মঘাতী রবীন্দ্রনাথ') । বুদ্ধদেব বলেন নির্জ্ঞানের অন্ধকারই কবিতার উৎস । এই নির্জ্ঞান মনের 'অপরিচিতাই' বিদেশিনী, অথবা 'বিদেশিনী' শব্দে রবীন্দ্রনাথের ইউরোপ-যাত্রার স্মৃতি কাজ করেছে ? লোহিতসাগরে দেখা কোনো সূর্যাস্তের বর্ণচ্ছটা ? অথবা প্রাচ্য–পাশ্চাত্য মেলবন্ধনের স্বীকৃতি ? এ-সব প্রশ্নে আমরা বুঝতে পারি সামর্থ্যকে কতদূর বিস্তার করতে চান বুদ্ধদেব । খুব সতর্কতার সঙ্গে বুদ্ধদেব শব্দব্যবহারের (এখন আর 'শব্দব্যসনের আসক্তি' নয়) তাৎপর্য খোঁজেন তিনি ।

'নিরুদ্দেশ যাত্রা' 'মানসসুন্দরী'তে দীর্ঘনিশ্বাস পতনের কথা বলেন শঙ্খ । 'গীতাঞ্জলি'তে 'মিলনের মুহূর্ত অপেক্ষাকৃত বিরল', 'মিলন নয়, বিরহ; নিশ্চিতি নয় আশা; সাফল্য নয়, প্রতিশ্রুতি' । বুদ্ধদেব গীতাঞ্জলির কবিতাকে গানের দিক থেকে আলোচনা করেন নি । প্রমথনাথ বিশীর 'রবীন্দ্রসরণী'তে গীতাঞ্জলির বিশ্লেষণও অনুরূপ । এই প্রসঙ্গে প্রমথনাথ বিশীর রবীন্দ্রসরণীর প্রবন্ধগুলি অ্যাকাডেমিক সমালোচনার পরিচ্ছন্ন এবং গভীর জিজ্ঞাসার পরিচয়বহ— এই কথা মনে রাখতে হবে ।

তিন

ভিক্‌টোরিয়া ওকাম্পোর রবীন্দ্র-অনুরাগ আশ্চর্য মৃদু সৌরভ ছড়িয়ে দিয়েছিল রবীন্দ্রনাথের জীবনে । কিছুদিনের সেই মুহূর্তগুলি রবীন্দ্রজীবনীতে উজ্জ্বল হয়ে আছে । শঙ্খ ঘোষ 'ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ' অনুবাদগ্রন্থটি প্রকাশ করে রবীন্দ্রজীবনীর এই অধ্যায়টির নানা রহস্য, পুলক, রোমাঞ্চের সংবাদ দিলেন । শঙ্খর গ্রন্থ ওকাম্পো ও রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কটি সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহলী করে তুলল । ওকাম্পোর দেওয়া 'চৌকি'র কথা রবীন্দ্রনাথের 'শেষ লেখা'য় উঠে আসে । কেতকী কুশারী ডাইসন এই কৌতূহল মেটাতে পরিশ্রমী গবেষকের ভূমিকা নিলেন । 'রবীন্দ্রনাথ ও ভিক্‌টোরিয়া ওকাম্পোর সন্ধানে' বইটি তিনি প্রকাশ করলেন । এ বই ভিন্ন স্বাদের । জ্ঞানচর্চা ও রসচর্চাকে একই পাত্রে তিনি স্থাপন করলেন । একে আমরা প্রবন্ধের বই বলতে পারি না । এই বইতে কাদম্বরী দেবীকে লেখা চিঠিটি যেন 'উওমেনস লিব' আন্দোলনের অস্ত্র । কেতকী কবি এবং নারী । গৌরী আইয়ুব দত্ত কেতকীর তীব্র সমালোচনা করেছিলেন । কেতকী বলেছেন, divine quest unholy curiosity পরিত্যাজ্য । রবীন্দ্রনাথ, ভিক্‌টোরিয়া, এলমহার্স্ট— এঁরা মানুষ । 'গুরুবাদী সংস্কৃতিতে এই শিক্ষার অবশ্যই প্রয়োজন আছে । মহৎ ব্যক্তিদের মানুষ ব'লে চিনতে জানতে শিখলে তবেই তাঁদের প্রকৃত মানবিক মহত্ত্বের আদল পাওয়া যায় এবং নিজেদের জীবনে তাঁদের প্রাসঙ্গিক করে তোলা যায় । আমাদের নিজেদের স্বার্থেই যাঁরা বড় তাঁদের কাছে টানতে হয়' । বস্তুত কেতকীর এই ভাষ্য গত পঁচিশ বছরের বাংলা প্রবন্ধের একটা বিশেষ প্রবণতা । কেতকী নিশ্চয়ই অবহিত যে গুরুবাদকে পরিত্যাগ করা যত সহজ মানুষরূপে দেখা তত সহজ নয় । কেননা প্রথমটি তো সহজ, নিজের কোনো দায়দায়িত্ব নেই । কিন্তু দ্বিতীয় পর্যায়ের সমস্ত দায়িত্বই প্রাবন্ধিকের । রবীন্দ্র-সমালোচনার যিনি দায়িত্ব নেবেন তাঁকে তা অর্জন করতে হবে সমগ্র রবীন্দ্ররচনার নিবিড় পাঠে । বিপদ দেখা দিচ্ছে এখনই । প্রতাপনারায়ণ বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের কিছু গল্প, নাটক বিদেশী গল্প নাটকের হুবহু অনুবাদ, এই অভিযোগ উত্থাপন করেছেন । প্রতাপনারায়ণের অভিযোগের উত্তর শঙ্খ ঘোষ উপযুক্তভাবেই দিয়েছেন ।

ওকাম্পোর সান্নিধ্য যেমন রবীন্দ্ররচনায় এবং রবীন্দ্রজীবনে ফুটন্ত, ফলন্ত হয়ে উঠেছিল, তেমনি আমাদের বিষণ্ণ করে তোলে রবীন্দ্রনাথেরই অনবধানতায় একটি দম্পতির করুণ-মধুর কাহিনী । শিশিরকুমার দাশ এবং

শ্যামাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'শাশ্বত মৌচাক' গ্রন্থটি সেই স্বল্পজ্ঞাত কাহিনীটির পূর্ণাঙ্গ রূপ । শিশিরকুমার ভূমিকায় বলেছেন, 'একসময়ে রবীন্দ্রনাথ সেনোবিয়া-হুয়ান রামোনের জীবনকে এমনইভাবে আচ্ছন্ন করেছিলেন যে সেনোবিয়া রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন তিনি তাঁদের নিত্যআধ্যাত্মিক সহচর ' । আশ্চর্যের বিষয় এই যে প্রবল আগ্রহ ও ঔৎসুক্য সত্ত্বেও সেনোবিয়া ও হুয়ান রামোনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ-পরিচয় হয় নি । সেনোবিয়া রবীন্দ্রনাথকে আবেগবিহ্বল ভাষায় চিঠি লিখেছিলেন । আন্তরিকতার স্পর্শে ভরপুর সে চিঠি । রবীন্দ্রনাথ বুঝতেই পারেন নি এই দম্পতির ব্যাকুলতাকে । শিশিরকুমার এবং শ্যামল এই বইতে এই অশ্রুসজল কাহিনী রচনা করেছেন । রবীন্দ্রনাথকে কাছে পাবার আশায় সেনোবিয়া-হুয়ান রামোন যখন প্রস্তুত তখন তাঁদের বলতে হয় 'তবু রাজার দুলাল গেল চলি মোর / ঘরের সমুখ পথে—/ মোর বক্ষের মণি না ফেলিয়া দিয়া রহিব বলো কী মতে' । নোবেল প্রাইজ পাবার পর রবীন্দ্রনাথের বিদেশযাত্রার চরিত্রটাই যেন পালটে গিয়েছিল । রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে এসেছেন অনেকে । তিনিও মিশেছেন অনেকের সঙ্গে কিন্তু কবি-ঔপন্যাসিক-নাট্যকার কয়জন ? রবীন্দ্রনাথ তখন ভারতের চিত্তদূত যতটা ততটা স্রষ্টা নন । সেনোবিয়া হুয়ান রামোন তাঁকে পাবেন কী করে । এখানে হুয়ান রামোন হিমেনেথের প্রশান্ত হৃদয়ের উচ্চারণ লক্ষ করি 'পৃথিবীর সমুদ্রে আজ মিশে আছে রবীন্দ্রনাথের সেই ভস্ম । তা হলে, সেই ভস্ম কেন আসবে না আমার হাতে ? এই হাতই একদিন সাহায্য করেছিল তাঁর বিরাট হৃদয়ের স্পন্দনকে রূপ দিতে আমাদের এসপানিঅনায়' । এই বইয়ের দুজন লেখকই জানিয়েছেন স্পেনে এখনো রবীন্দ্রনাথের প্রতি ভালোবাসা কত গভীর ।

গীতাঞ্জলির সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ অতি উৎসাহে একের পর এক অনুবাদে হাত দিয়েছেন । অমিয় চক্রবর্তী, সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে লেখা চিঠিতে সে সময়ের অনুবাদ সম্বন্ধে উত্তাপ-উত্তেজনার স্পর্শ পাই । কিন্তু অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা চিঠিতে দেখি তিনি নিজেই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন এ অনুবাদ কতটা সার্থক হয়েছে । ভালো অনুবাদের জন্য তিনি অস্থির হচ্ছেন ।

ইয়েটস, এজরা পাউণ্ডের রবীন্দ্রনাথের অনুবাদগ্রন্থের যথার্থতা সম্বন্ধে মন্তব্য কবিকে কতটা বিস্মিত করেছিল তার বিশদ বিবরণ আমাদের কাছে নেই । অবশ্য সৌরীন্দ্র মিত্র তাঁর 'খ্যাতি-অখ্যাতির নেপথ্যে' গ্রন্থে সে সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন । বইটিতে তথ্যসমাবেশ প্রচুর । অনেক তথ্য না দিলেও চলত । মোটামুটি তিনি যা বলতে চেয়েছেন তা হল ইয়েটস রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ঈর্ষাকাতর হয়ে পড়েছিলেন । তিনি বলেছেন ইয়েটসের কবিস্বভাবের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের স্বভাবের মিল নেই অতএব রবীন্দ্রনাথের বিদেশে খ্যাতি এবং অখ্যাতির পুনর্বিবেচনা করা উচিত । তিনি বলেছেন, ইংলণ্ড ছাড়া অন্যত্র যে রবীন্দ্রনাথ বিপুল খ্যাতি পাচ্ছেন তার সঙ্গেও বিষয়টি জড়িয়ে আছে । রাজনীতির টানাপোড়েনটিও এই প্রসঙ্গে বিবেচ্য । জালিয়ানওয়ালাবাগ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নাইটহুড ত্যাগ উপনিবেশবাদীদের কিছুটা ক্ষুব্ধ করেছিল সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই । কিন্তু সৌরীন্দ্রবাবুর গবেষণার পর কিছু কথা থেকে যায় যা আমরা রবীন্দ্রনাথের স্বীকারোক্তিতে পাই ।

বুদ্ধদেব বসু তো রবীন্দ্রনাথের 'দি কালেক্‌টেড পোয়েমস্‌ অ্যাণ্ড প্লেজ অব রবীন্দ্রনাথ টেগোর' গ্রন্থটির নামকরণ সম্বন্ধেই প্রশ্ন তুলেছেন । বুদ্ধদেব বলেছেন রবীন্দ্রনাথের [illegible] ও কলোচ্ছ্বাসী প্রতিভা', এ প্রতিভা অনুবাদের মতো দীন কর্মের ঊর্ধ্বে ; তবু তিনি গীতাঞ্জলির অনুবাদকে প্রায় দৈব ঘটনা বলেই উল্লেখ করেছেন অবশ্য তিনি টমসনকে মেনেছেন । টমসনের উক্তি উদ্ধার করে—An insult to the original---বুদ্ধদেব বসু বেশ-কিছু অনুবাদের দুর্বলতা দেখিয়েছেন, কঠোর মন্তব্য করেছেন 'অনেক রচনাই মূলের অনুকৃতি নয়, বিকৃতি' । গত পঁচিশ বছরে বাংলা প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের অনুবাদপ্রসঙ্গ নিয়ে যে-সব আলোচনা বেরিয়েছে তার একটা ফল সদ্যই পাওয়া গেছে । তা হল রবীন্দ্ররচনার অনুবাদ নূতন করে শুরু করতে হবে । অভাব সম্বন্ধে আমরা সচেতন হয়েছি বটে, কিন্তু কাজে ততটা অগ্রসর হতে পারি নি। রাদিচের অনুবাদ দেখেও এ কথা বলা যায় ।

বাংলা প্রবন্ধ নিয়ে শশিভূষণ দাশগুপ্ত একসময়ে আলোচনা করেছিলেন তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের একদিক' গ্রন্থে। প্রবন্ধের নানা শাখায় বাঙালির প্রতিভা এবং মনন কতভাবে স্ফূর্তি পেয়েছে শশিভূষণ তা দেখিয়েছিলেন। বাংলা জীবনী সাহিত্যের সমৃদ্ধির সংবাদ সে বইতে আছে। রবীন্দ্রনাথের জীবনী লিখেছিলেন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 'রবীন্দ্র-জীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক' (চার খণ্ডে)। বলা বাহুল্য জীবনীলেখকের দায়িত্ব ইতিহাসবিদের মতো —তথ্যসংগ্রহে ও তথ্যবিন্যাসে। এই সংগ্রহ আর বিন্যাসের করণকৌশলে লেখকের একটি ডিজাইন থাকে। জীবনীপাঠে আমরা যেন রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রবেশ করতে পারি, সে দায়িত্বও প্রভাতকুমার অঙ্গীকার করেছিলেন। সব মিলিয়ে দেশকালের পটভূমিকায় প্রভাতকুমারের রবীন্দ্রজীবনীতে পরিশ্রম, নিষ্ঠা এবং মননের পরিচয় পাই। প্রভাতকুমারের বই ভ্যালুলোডেড। সেই কারণে জীবনীগ্রন্থটিতে প্রভাতকুমারের নিজস্ব মতামতও জায়গা পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথকে তিনি খুব কাছে থেকে পেয়েছিলেন। তবু লেখায় তিনি দূরত্ব বজায় রেখে রবীন্দ্রনাথের কর্মজীবন এবং সাহিত্যজীবনের নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করেছেন। এই দুইয়ের মধ্যে সেতুবন্ধটি কোথায় তা আবিষ্কারে তিনি প্রয়াসী হয়েছেন। প্রভাতকুমারের পর আমরা পেলাম প্রশান্তকুমার পালের 'রবিজীবনী'। রবি-জীবনীর ভূমিকায় প্রশান্তকুমার পাল লিখেছেন 'রবীন্দ্রজীবন-বর্ণনায় এখানে আমি একটি বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করেছি; জানি না আর-কোনো জীবনীকার এই পথ গ্রহণ করেছেন কি না। এখানে "পূর্বকথা" অংশে ঠাকুর-বংশের দেশ-কালের পরিচয় দেবার পর "জীবনকথা" বর্ণিত হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের জীবনের প্রতিটি বৎসরের কালসীমায় এক-একটি অধ্যায়কে বিন্যস্ত করে। প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে "প্রামাণিক তথ্য" অভিধায় একাধিক পরিশিষ্ট যোগ করে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি ও দেশ-কাল সম্বন্ধে বিবরণ দেবার চেষ্টা করেছি।' প্রভাতকুমার দেশ-কালকে পরিশিষ্টে স্থান দেন নি। দেশ-কালকে জড়িয়ে রবীন্দ্রনাথের ক্রম অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রশান্তকুমারের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রভাতকুমারের দৃষ্টিকোণের এ পার্থক্যটি লক্ষণীয়। এ পার্থক্য মৌলিক। প্রশান্তকুমার প্রচুর নূতন তথ্য পেয়েছেন এবং সেগুলির কিছুই বাদ দেন নি। জীবনীরচনার একটি পদ্ধতি হল 'টু পুট এভরিথিং ইন'। প্রশান্তকুমার তাকেই মান্য করেছেন। একটি মাত্র প্রসঙ্গ এখানে উল্লেখ করব। রবীন্দ্রনাথর 'ক্ষণিকা' হালকা চালে গভীর কথার কাব্যগ্রন্থ। এ বইতে এমন কবিতা বেশ-কিছু আছে যেখানে এই হালকা চালটি নেই। ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথই ধূমপানের মৌতাত যে এ কাব্যগ্রন্থে লভ্য সে কথা বলেছিলেন লোকেন্দ্রনাথ পালিতকে। কিন্তু এমন কেন হল ? সব কবিতায় সেই মেজাজটি নেই কেন ? লোকেন্দ্রনাথ ক্ষণিকার কিছু কবিতা ছাপাবার জন্য কলকাতায় নিয়ে এলেন। তার পর বই ছাপতে বেশ দেরি হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা করে আছেন। কিন্তু তিনি বসেও নেই। এক-একবার তাগাদা দেন আর নূতন লেখা পাঠিয়ে দেন ক্ষণিকাতে দেবার জন্য। বুঝতে পারছি 'ক্ষণিকা'র মুডে তিনি তখন আর নেই। বই যখন ছেপে বেরোল তখন ক্ষণিকার বেশ-কিছু কবিতা আর সিগারেটের ধোঁয়ায় শেষ করবার মতো নয়। প্রশান্তকুমার ক্ষণিকা প্রকাশের বিলম্বের প্রতিটি দিনের ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করেছেন। এই পরিশ্রম আমাদের মনোযোগ কেড়ে নেয়। এমন অনেক তথ্য আমরা পাই যা রবীন্দ্রজীবনকথায় অপরিহার্য ছিল। প্রশান্তকুমার পালের গ্রন্থ রবীন্দ্রপরিচয় গ্রন্থমালায় সংযোজিত হবার সামর্থ্য অর্জন করেছে— এই কথা জোর দিয়েই বলতে পারি। কিন্তু প্রভাতকুমারের গ্রন্থের বিকল্প এই গ্রন্থকে যদি কেউ ভাবেন তবে তা হবে ভ্রান্ত বিবেচনা। মূলত রবীন্দ্রনাথের জীবনীকে অবলম্বন করে লেখা হয়েছিল নেপাল মজুমদারের 'ভারতের জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ' বইটি— রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাভাবনার ইতিহাস। প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করেছেন নেপাল মজুমদার বিভিন্ন সূত্র থেকে। রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত পত্র-পত্রিকা এবং চিঠিপত্রের ব্যবহারেও পরিশ্রম ও নিষ্ঠার নিদর্শন পাই এতে, ছয়টি খণ্ডে সমাপ্ত এই গ্রন্থে নেপালবাবু কেবল তথ্যই সংগ্রহ করেন নি, বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে তিনি রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক ভাবনার সঙ্গে তাঁর বিশিষ্টতার সন্ধান করেছেন। মার্কস্‌বাদী দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রন্থখানি রচিত। এ কথা অস্বীকার করবার উপায়

নেই যে নেপালবাবু এতে রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদকে উদ্‌ভাসিত করতে চেয়েছেন ।

নিত্যপ্রিয় ঘোষ রবীন্দ্রর্চচার প্রচলিত ছকের বাইরে থাকতে ভালোবাসেন । তাঁর 'স্বভাবত স্বতন্ত্র রবীন্দ্রনাথ' (১৩৮৮), 'ডাকঘরের হরকরা' (১৯৮৫), 'মুক্ত একক রবীন্দ্রনাথ' (১৯৮৩) তিনটি গ্রন্থই এতকাল পর্যন্ত রবীন্দ্রর্চচায় যে 'মিথ' গড়ে উঠেছিল তাকে ভাঙবার প্রয়াস । প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রপরিচয়ে যে-সব তথ্য জুগিয়েছিলেন, নিত্যপ্রিয় নূতন তথ্য সংগ্রহ করে এবং কখনো কখনো সেই তথ্যের উপর ভর করে নূতন সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন । তিনি অনেক তথ্যেরই পুনর্বিবেচনা করেছেন । তাঁর মনে হয়েছে অনেক তথ্য যা রবীন্দ্রনাথের প্রতিকূল তা অনালোচিত রয়ে গেছে । রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ পাওয়ার জন্য যাঁরা আনুকূল্য করেছিলেন তাঁদের মধ্যে নূতন নাম সংযোজন করেছেন । রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি অনুবাদগ্রন্থ । তৎসত্ত্বেও এ বই বিবেচনার জন্য নোবেল কমিটির সদস্যবৃন্দ কেন বিবেচনা করলেন— নিত্যপ্রিয়র এই জিজ্ঞাসা । নিত্যপ্রিয় মনে করেন সুইডেনের যুবরাজের আগ্রহের জন্যই রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন । বলা বাহুল্য এই সিদ্ধান্ত আমাদের ধাক্কা দেয় । আমাদের মনে এই প্রশ্ন জাগতে থাকে তা হলে নোবেল প্রাইজ পাওয়ার আগেই লণ্ডনে বসে কবি-সাহিত্যিক-প্রকাশকদের গীতাঞ্জলি সম্বন্ধে উৎসাহের মূল্য কী ? নিত্যপ্রিয় আমাদের অভ্যস্ত চিন্তায় ঘা দিয়েছেন । গীতাঞ্জলির সাহিত্যমূল্য নির্ধারণেও নিত্যপ্রিয় যেন কিছুটা কুণ্ঠিত । অবশ্য এ বিষয়ে তাঁর ভিন্ন মত থাকতেই পারে ।

রবীন্দ্রবিদূষণের ইতিহাস প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে । আদিত্য ওহদেদারও এ বিষয়ে বই লিখেছেন । কিন্তু বিদুষণকে আমরা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনি নি । ঈর্ষাকাতর মানুষের ঢিল ছোঁড়া বলেই মনে করেছি । নিত্যপ্রিয় আমাদের এই অভ্যস্ত চিন্তাকে অগ্রাহ্য করেছেন । তিনি সমালোচনা মানেই রবীন্দ্রবিরোধিতা বলবেন না । বস্তুত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, দ্বিজেন্দ্রলাল, রায়, মোহিতলাল মজুমদার রবীন্দ্রসাহিত্য সম্পর্কে যে-সব প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন তা যে সবই অসার এমন মনে করবার কারণ নেই । Empson তাঁর *Seven Types of Ambiguity* বইটির দ্বিতীয় সংস্করণে বিরুদ্ধ সমালোচনা সাদরে ঠাঁই দিয়েছিলেন । আমাদের গুরুবাদী দেশে সমালোচনা এ কারণে শাখাপ্রশাখায় বিস্তারিত হতে পারে নি । এমন-কি টমসনের বই পড়ে রবীন্দ্রনাথ, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কেউ-ই খুশি হন নি । এমন কথা কখনোই বলব না বিরুদ্ধবাদী সমালোচনা মানেই গ্রহণযোগ্য, কিন্তু যদি এটা ফ্যাডে পরিণত না হয় তবে তাকে মান্য করতেই হবে । সমকালীন চিন্তাবিদ্‌দের রাগবিরাগের কাহিনীকে নিত্যপ্রিয় দক্ষতার সঙ্গে বিচার করেছেন । বিপিনচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সকলেই রবীন্দ্রপ্রতিভায় নিঃসংশয় ছিলেন । রবীন্দ্রনাথ নাইটহুড ত্যাগ করলে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি বলেছিলেন 'এই তোমার যোগ্য কথা' । বলা বাহুল্য রবীন্দ্রসমালোচনার নানা দিক আছে । নিত্যপ্রিয় তাকেই খুঁচিয়ে তুলেছেন । রাজনৈতিক সংকীর্ণতারও যে রবীন্দ্রনাথ শিকার হয়েছিলেন নিত্যপ্রিয় সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন । রবীন্দ্রনাথের চীন-জাপান ভ্রমণ সবই কি লাল কার্পেটের সংবর্ধনা ? নিত্যপ্রিয় দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ সেদিন কী মানসিক সংকটে ভুগেছিলেন । 'কোন্‌ সুরে আজ বাঁধিবে যন্ত্র' প্রবন্ধে নিত্যপ্রিয় বিপ্লবী আন্দোলনে রবীন্দ্রভূমিকার কথা বলেছেন । বিপ্লবীর কর্মে রবীন্দ্রনাথ উৎসাহী ছিলেন না, কিন্তু তাঁর রচনায় বিপ্লবীরা পেয়েছেন সান্ত্বনা এবং প্রেরণা । সন্দীপ, ইন্দ্রনাথকে তিনি সৃষ্টি করেছেন । আবার তিনিই সাম্রাজ্যবাদী বীভৎসতার বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠ । নিত্যপ্রিয় প্রবন্ধটি শেষ করেন এইভাবে 'রবীন্দ্রনাথ দাবি করলেন, ভারত সরকারের এই "ফ্যাসিস্ট" (আন্দামান জেলে উপনিবেশবাদের বর্বরতা) নীতি সংবরণ করতে হবে । বিপ্লবীদের উদ্‌বুদ্ধ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর গান দিয়ে, কবিতা দিয়ে, বক্তৃতা দিয়ে । রবীন্দ্রনাথকেও উদ্‌বুদ্ধ করলেন বিপ্লবীরা তাঁদের আত্মত্যাগ দিয়ে, সহিষ্ণুতা দিয়ে, নিঃশঙ্ক কর্মের মধ্য দিয়ে' । নিত্যপ্রিয় 'ঘরে বাইরে'র অমূল্যর নাম উচ্চারণ করতে পারতেন । এইখানে নিত্যপ্রিয় ধরা দেন আমাদের কাছে । নিত্যপ্রিয় ভান করেন না, অহমিকাতেও ভোগেন না— সত্যকে পেতে

চান এই মাত্র । এইখানে নিত্যপ্রিয় গবেষণ-কর্মী থেকে স্বভাবত স্বতন্ত্র ।

চার

একদা শিবনারায়ণ রায় রবীন্দ্র সমালোচনায় বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিলেন 'দেশ' পত্রিকায় । রবীন্দ্রচিত্রকলা প্রসঙ্গে শিবনারায়ণ রায়ের মন্তব্যে দেশবাসী ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন । সত্যিই কি তাই ? রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘকালের নিরুদ্ধ বাসনার প্রকাশ রূপে রবীন্দ্রচিত্রকলাকে চিহ্নিত করেছিলেন শিবনারায়ণ । তাঁর মতে ভদ্রতার মুখোস ছিঁড়ে রবীন্দ্রনাথ স্বরূপে প্রকাশিত হলেন তাঁর চিত্রকলাচর্চায় । রবীন্দ্রনাথের ছবিতে কালো রঙের ব্যবহার, মুখের বিকৃতি, রঙে ভয়জাগানো পরিবেশ, এক জাতীয় আতঙ্ক । শিবনারায়ণের কাছে মনে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ সেদিন অভ্যস্ত পথ থেকে সরে গেলেন । রবীন্দ্রচিত্র নিয়ে তার পর থেকে যাঁরাই আলোচনা করেছেন তাঁরা চিত্রের ঐ প্রসঙ্গগুলিকেই টেনেছেন । ব্যতিক্রমী আলোচনা সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বই 'রবীন্দ্রচিত্রকলা : রবীন্দ্রসাহিত্যের পটভূমিকা' (১৯৮২) । সোমেন্দ্রনাথের ধারণায় রবীন্দ্রনাথের গান, কবিতা, প্রবন্ধ, সাহিত্য, নৃত্য এবং চিত্র যাই হোক-না কেন, তা শিল্পীর গভীর আকৃতির প্রকাশ । একের সঙ্গে অন্যের গূঢ় যোগটি সোমেন্দ্রনাথ তাঁর বিশ্লেষণে ফুটিয়ে তোলেন । তিনি লক্ষ করেছেন চিত্রে সংগীতের ধ্যান, সাহিত্যের আকৃতি । শিবনারায়ণ বলেছিলেন 'এদের (রবীন্দ্রনাথের ছবি) আবহাওয়া ভিজে, ভয় দেখানো, বন্য বললেও বুঝি ভুল হয় না,— শ্বাসরোধী, সূর্যবিহীন । দালি কিংবা আরনট কিংবা মাঝবয়েসী পিকাসোর সচেতন (আর সেই কারণে স্ব-বিরোধী) ছবিগুলির চাইতেও এরা একান্ত এবং মারাত্মক সুররেয়ালিস্ত' । এক্সপ্রেশনিজম বা ইমপ্রেশনিজমকে সোমেন্দ্রনাথ মেনে নেন, কিন্তু রবীন্দ্রচিত্রকলায় সুররিয়ালিজমের কোনো ছাপই নেই— এ কথা বলেন সোমেন্দ্রনাথ । কোথায় শিবনারায়ণ আর কোথায় সোমেন্দ্রনাথ !

রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছোটোগল্পকে বড়ো বেশি মমতার চোখে দেখতেন । তাঁর কাব্যে বাস্তবতার অভাবের নালিশ উঠলেই তিনি বিনয়ের সঙ্গে ছোটোগল্পগুলির দিকে ইঙ্গিত করতেন । অবশ্য হরপ্রসাদ মিত্রের রবীন্দ্রছোটোগল্পের বিশ্লেষণ অনেককেই চকিত করেছিল । শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাঁর 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা'তে ছোটোগল্পের আলোচনাকে গুরুত্ব দিয়েছেন ।

এ সময়ে ক্ষেত্র গুপ্ত লিখলেন 'রবীন্দ্র-গল্প : অন্য রবীন্দ্রনাথ' বইটি । ক্ষেত্র গুপ্ত রবীন্দ্রনাথের প্রত্যেকটি গল্পের পৃথক বিশ্লেষণ করেছেন । বাংলা কবিতা বিশ্লেষণে যেমন আমরা একটি কবিতার অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণের সূচনা দেখেছিলাম, ক্ষেত্র গুপ্তও সেই পদ্ধতি মেনেছেন । ক্ষেত্র গুপ্ত রবীন্দ্রনাথের ছোটো গল্পের সমাজবাস্তবতার সন্ধান করেছেন । গল্পের উপাদানগুলির বিন্যাসগত তাৎপর্য আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন । দ্বিতীয় আর-একটি বৈশিষ্ট্য তাঁর লেখায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে— বাংলা সমালোচনায় স্টাইলিসটিক্সের ব্যবহার । তাঁর পদ্ধতি গাণিতিক । সেজন্যে তাঁর লেখায় পাই সারণি, বর্গীকরণ, বৃত্তের ব্যবহার । ছোটো গল্পের চরিত্র, ঘটনা, প্রবণতা, বিষয়ের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য গল্পের আদি-মধ্য-অন্ত বিশ্লেষণ করেন ঐ গাণিতিক প্রকরণে । এই বিশ্লেষণের ভাষাকেও তিনি গাণিতিক করে তুলতে চেষ্টা করেন । এতে সাফল্য তিনি পেয়েছেন নিশ্চয়ই, কিন্তু কোথাও কোথাও বোঝার দিক থেকে ব্যাপারটি শৃঙ্খলাহীন হয়ে পড়েছে । অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের জন্যই কিনা জানি না ক্ষেত্র গুপ্তকে কখনো কখনো গুরুর আসনে বসে আছেন দেখতে পাই । ক্ষেত্র লক্ষ করেন ছোটোগল্পের 'আমি' গল্পের বাইরের মানুষ নয়, সেও চরিত্র হয়ে গল্পের সঙ্গে জড়িয়ে যায় । 'তিন সঙ্গী'র "ল্যাবরেটরি" গল্পে ক্ষেত্র খুঁজে পান ম্যাসোসিজম । রবীন্দ্রনাথের 'সে' বইটিতে কৌতুক, ব্যঙ্গ, উদ্ভটত্ব, কল্পবিজ্ঞান, সমাজমনস্কতা ক্ষেত্রর মনোযোগী বিশ্লেষণে অভিনবত্ব পেয়েছে ।

তপোব্রত ঘোষের 'রবীন্দ্র-ছোটগল্পের শিল্পরূপ' (১৯৯০) ভিন্ন স্বাদের। তপোব্রত "নষ্টনীড়" এবং "মেঘ ও রৌদ্র" গল্প দুটিকে বাদ দিয়েছেন। 'নষ্টনীড়' এক সময়ে উপন্যাস বলেই বিবেচিত হয়েছিল। কিন্তু "মেঘ ও রৌদ্র" বাদ দেওয়ার যুক্তি খুব বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে নি। তপোব্রত বলেন "মেঘ ও রৌদ্রে"র শিল্পসম্ভাবনাটিকে রবীন্দ্রনাথ নষ্ট করেছেন। গল্পের মাঝখানে তপোব্রত অবাঞ্ছিত বিষয়ের অবতারণা লক্ষ করেছেন। আমাদের তা মনে হয় না। একটি শহুরে মানুষ গ্রামের ভিতরে ঢুকে পড়ে যে বিপর্যয়কে ডেকে আনল এবং একটি প্রতিবাদী সত্তা কিভাবে সেই মানুষটির মধ্যে জেগে উঠল তারই নিটোল কাহিনী এটি। 'সে' তপোব্রতের লেখায় স্থান পায় নি। আলোচনা থাকলে ভালো হত। তপোব্রতর অম্বিষ্ট রবীন্দ্রগল্পের শিল্পরীতি। প্রায় উপেক্ষিত "একটি ক্ষুদ্র পুরাতন গল্প"টিকে তপোব্রত রূপক জাতীয় বলে চিহ্নিত করেছেন। ক্ষেত্র গুপ্তও তাই বলেছেন। কিন্তু তপোব্রতর বিশ্লেষণ অর্ন্তদৃষ্টির পরিচয় দেয়। এই গল্পে কথকের ভূমিকা গুরুতর। পুরাতন অথচ চিরন্তন এই গল্পের করণকৌশল তপোব্রতের ভাষায় সুন্দরভাবে বিশ্লেষিত। কাদাখোঁচা পৃথিবীকে দেখছে 'আদ্যোপান্ত জীর্ণ' আর কাঠঠোকরা 'সতেজ শোভন' অরণ্যকে বলছে 'অন্তঃসারহীন'। ওদিকে বসন্তের কোকিলের ডাক। এই বৈপরীত্যের অবতারণার মধ্যেই গল্পটির 'ক্ষুদ্রত্ব' ডিঙিয়ে গভীর অর্থবহ হয়ে উঠেছে। তপোব্রত কিছু গল্পকে বলেছেন মুখ লুকিয়ে-থাকা গল্প। এদের দিকে কেউ তাকায় না। "জীবিত ও মৃত" গল্পে অতিপ্রাকৃতের দাবি তপোব্রত স্বীকার করেন নি। তাঁর মন্তব্য 'প্রাণের সম্পর্কের প্রতি সুগভীর আকর্ষণই এখানে এমন-কি প্রাণের বিনিময়েই জন্মলাভ করেছে। কাদম্বিনীর নিঃসঙ্গতা নয়, কাদম্বিনীর অপরাহত ভালোবাসার শক্তিই এই গল্পের মূল কথা'। তপোব্রত প্রতাপনারায়ণ বিশ্বাসের রবীন্দ্রনাথের 'চুরিবিদ্যা'র অপবাদ খণ্ডন করেছেন। ইতিপূর্বে আলোচিত এমন অনেক বিদেশী গল্পের সঙ্গে রবীন্দ্রগল্পের তুলনা করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গল্পের টানটোন, মোচড় এবং অভিপ্রায় যে তুলনীয় গল্পগুলি থেকে ভিন্ন জাতীয় সে কথাও তিনি বলেছেন। তপোব্রত আলোচনাসূত্রে বেশ-কিছু তথ্য সংগ্রহ করে দিয়েছেন যা আমরা জানতাম না। যেমন, সুখরঞ্জন রায়ের "আলোকপন্থা ও কথাসাহিত্যের ধারা" প্রবন্ধটি কত জনের পরিচিত ?

পাঁচ

১৯৫০ থেকে ১৯৬০ পর্যন্ত সাবেকি রচনা যেমন অব্যাহত ছিল তেমনি এই সময়েই শিল্পসংস্কৃতির ক্ষেত্রে এমন কিছু পরিবর্তন ঘটল যা সাবেকি রচনার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জস্বরূপ। বাংলা কবিতা জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে আবিষ্কার করল। কৃত্তিবাস, শতভিষা গোষ্ঠী স্বতন্ত্র কাব্যশৈলী, কাব্যভাষা নির্মাণে ব্যাকুল হয়ে উঠল। তাঁদের ব্যাকুলতা জাগিয়েছিলেন মুখ্যত ঐ তিন কবি। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় স্পষ্টতই বললেন বাংলা কবিতা রবীন্দ্রনাথ থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। বাংলা কবিতার কাব্যভাষা রবীন্দ্রকাব্যভাষা থেকে ভিন্ন জগতে বিচরণ করছে। মুখ্যত, জীবনানন্দই এখানে তাঁদের ধ্যেয়। সিগনেট প্রেসের দিলীপকুমার গুপ্ত আধুনিক কবি এবং তরুণ আধুনিক কবির বই প্রকাশ করে উৎসাহ দিলেন এই নবীন ভাবনার। সুন্দর প্রচ্ছদ, ঝকঝকে ছাপা কবির সৃষ্টিকে যেন নূতন মর্যাদা দিল। সিগনেট প্রেস বুলেটিন বার করে সাহিত্যচর্চার পোষকতা করল। কফি হাউসে, ওয়াই.এম.সি.এ.-র কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে কবিতাপাঠের স্মৃতি কেই বা ভুলতে পারে ? ১৯৬১ সালে রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষপূর্তির জোয়ারে বাংলা কবিতা নূতন সাজে এল বাংলা সাহিত্যে। সিনেমায় গতানুগতিকতা ভাঙলেন সত্যজিৎ রায় 'পথের পাঁচালি' দিয়ে। সমরেশ বসু উপন্যাসের ক্ষেত্রে বিস্ফোরণ ঘটালেন 'বিবর' প্রকাশ করে। সাগরময় ঘোষ কালের পুতুল চিনতে ভুল করলেন না। তিনি 'দেশে' টানতে লাগলেন নবীন প্রতিভাকে। শম্ভু মিত্রের 'রক্তকরবী'র অভিনয় নাট্যজগতে অভিনব পদসঞ্চারের কথাও আমাদের মনে রাখতে হবে। কমল

মজুমদার অনেক কবিসাহিত্যিকের গুরুস্থানীয় হয়ে উঠলেন। লিটল ম্যাগাজিনও ছড়িয়ে পড়ল যত্রতত্র। হাংরি জেনারেশন, বিট কবিরাও কিছুদিন সোরগোল তুলেছিল এই সময়ে। বাংলা সাহিত্যক্ষেত্র উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল সেদিন।

বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের গায়ে এই আঁচ কতটা লেগেছিল ? প্রবীণ যাঁরা তাঁরা যে খুব বিচলিত হয়েছিলেন এমন নয়। অ্যাকাডেমিক আলোচনায় অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকবৃন্দের প্রয়াস লক্ষণীয়। নীহাররঞ্জন রায়ের 'বাঙালির ইতিহাস' প্রকাশিত হলে বিদগ্ধমহল খুশি হয়েছিলেন। শশিভূষণ দাশগুপ্ত বৈষ্ণব-শাক্ত দর্শনের গভীরে পৌঁছে গিয়েছিলেন। সুকুমার সেন 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' চার খণ্ডে সমাপ্ত করেছেন। ভারতবিদ্যার সঙ্গে বাংলাবিদ্যার সংযোগ সূত্র আবিষ্কারে তিনি তখন মগ্ন। প্রবোধচন্দ্র সেন ছন্দোচর্চায় অক্লান্ত। প্রমথনাথ বিশী বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ গবেষণায় অ্যাকাডেমিক হয়েও মুক্তচিন্তাকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিচ্ছেন। তখন দেশের রাজনৈতিক পট দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছিল। কংগ্রেসের আধিপত্য যখন মনে হয়েছিল অবিসংবাদী তখন বামপন্থী আন্দোলন ধীরে ধীরে দানা বেঁধে উঠতে থাকে। কমিউনিস্ট মতাদর্শের পত্রিকা 'পরিচয়'-এ সে ইতিহাস আছে। নানা প্রবন্ধে বামপন্থার সারবত্তা দেখানো, বোঝানো, ব্যাখ্যাত হচ্ছিল। নকশাল আন্দোলন, যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন মার্কসবাদী চিন্তাধারাকে জনগণের কাছাকাছি নিয়ে এসেছিল। এমনও দেখা গেছে যাঁরা মার্কসবাদে বিশ্বাস করেন না তাঁদের রচনাতেও মার্কসের উন্মেষ ঘটতে লাগল। সাহিত্য বিচারে সমাজবিজ্ঞানের গুরুতর প্রভাব পড়তে লাগল। সাহিত্যবিচারে নান্দনিক জিজ্ঞাসার ভোল পালটাতে লাগল। বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান শাখাও সমাজবিজ্ঞানের গুরুত্ব বুঝে সমাজচিন্তাকে পৃথক করার কথা ভাবতে লাগল। আমাদের প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এখন সমাজবিজ্ঞান একটি পৃথক বিদ্যারূপে স্বীকৃত। এই চিন্তাধারার সূত্রপাত ষাটের দশকেই। কমিউনিস্ট পার্টি দ্বিধাবিভক্ত হবার পর 'নন্দন' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। রাজনীতির দৃষ্টিকোণ সকল বিদ্যার উপরই বিশেষ গুরুত্ব পেতে লাগল। আমাদের প্রবন্ধসাহিত্যও বিষয়নির্বাচনে, বিশ্লেষণে এই প্রভাবকে আত্মসাৎ করতে উদ্যত হল। রবীন্দ্রনাথ রইলেন কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে আর আমাদের ভজায় না এরকম চিন্তা স্ফুট-অস্ফুটভাবে প্রবন্ধে গুঞ্জরিত হতে থাকল। আমরা শিবনারায়ণ রায়ের এই সময়ের কিছু বক্তব্য উদ্ধার করি। তিনি বলেন, 'এ যুগের চিন্তায়, ব্যবহারে, শিল্পকল্পনায় যে ব্যাপক শুভনাস্তিক্য দেখা দিয়েছে, তাতে দুঃখ পেলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই'। স্পষ্টভাবে তিনি বলেন, 'এই রূপান্তরের অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথের কল্পনাকে আলোড়িত করে নি'। অথবা, 'রিল্‌কের জর্নালের পাতায় পাতায় যে গ্লানির স্বাক্ষর, কাফ্‌কার উপন্যাসে যে নিরাশ্বাস আতঙ্কের কাহিনী, জয়েস-হাক্‌সলির নায়কদের যে অনতিক্রম্য নৈঃসঙ্গ্য— আশ্চর্য, এঁদের সমসাময়িক মহাকবির কল্পনাতে তার সামান্যতম ছায়াটুকুও পড়ে নি।' তাঁর শেষ বক্তব্য 'প্রাক্তন স্বর্গের নিষ্পাপ নিশ্চিতিতে আর আমাদের ফেরার উপায় নেই'। আমরা বলি, ফিরতে আমরা পারব না ঠিকই, কিন্তু 'নিষ্পাপ নিশ্চিতি'র আকাঙ্ক্ষাও আমরা করব না ?

এই অসহিষ্ণুতা প্রবন্ধ সাহিত্যে উঠে আসতে লাগল। বুদ্ধদেব বসু মেনে নিয়েছেন কবিতায় থাকে বিবাদী সংবাদী সুর আর নরেশ গুহ বলেছেন, কবিতায় 'বিষয়' কাকে বলে তা তিনি জানেন না। তা হলে কবিতা কী ? 'যে যে শব্দ, চিত্রকল্প বা প্রতীক ছান্দসিক শৃঙ্খলার সমন্বয়ে যে পর্যায়ক্রমে রচনাতে প্রয়োগ করা হয় সেই সবের ফলাফল অনুধাবনের উপরই তো রচনাটির ক্রিয়া নির্ভরশীল'— দামী কথা এবং আধুনিকদের কথা। আমরা দেখতে পাচ্ছি শব্দ, চিত্রকল্প, প্রতীক ছন্দ মিলের শৃঙ্খলাকেই কবিতা বলা হবে। বস্তুত অমরেন্দ্র চক্রবর্তী 'কবিতা-পরিচয়' কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশ করে কবিতার জগতে কিছু উত্তাপ সৃষ্টি করেছিলেন। প্রথম সংকলনটি প্রকাশিত হয় ১৩৭৩ সালে। অমরেন্দ্রবাবু একটি অভিনব প্রস্তাব করলেন। একটি প্রসিদ্ধ কবিতা বুদ্ধিজীবীর, কবির, সাহিত্যিকের কেমন লাগল তা তিনি আগ্রহভরে তাঁর সংকলনে স্থান দিলেন। একই কবিতার আলোচনা দুজন, তিনজন করলেন। কারও সঙ্গেই কারও মতের মিল নেই। যাঁর কাছে যেমনভাবে কবিতাটি সাড়া জাগিয়েছে

তিনি তেমনভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন। জীবনানন্দের 'গোধূলিসন্ধির নৃত্য' কবিতাটি নিয়ে আলোচনা করলেন নরেশ গুহ, অরুণকুমার সরকার আর সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। রবীন্দ্রকবিতা 'প্রথম দিনের সূর্য' শঙ্খ, আবু সয়ীদ আইয়ুব আলোচনা করলেন। বাদ প্রতিবাদ উঠল। 'কবিতা-পরিচয়ে' নানা বিতর্কের মধ্য দিয়ে এটাই প্রমাণিত হল যে কবিতা আসলে যে যেমন অর্থ টেনে নেয় সেরকমই কবিতাটি। লক্ষ করতে হবে যেহেতু একটি কবিতাই বিবেচ্য, সেই হেতু শব্দ, পঙ্‌ক্তি ইত্যাদির অনুপুঙ্খ বিচার হতে লাগল এ আলোচনায়। আমরা সেদিন কতকগুলি ছোটো-বড়ো পরিচ্ছন্ন প্রবন্ধ পেয়েছিলাম। অরুণ মিত্র, অরুণকুমার সরকার, আবু সয়ীদ আইয়ুব, নরেশ গুহ, শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, অশ্রুকুমার সিকদার, বিনয় মজুমদার, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, অমিতাভ দাশগুপ্ত, জ্যোতির্ময় দত্ত, অম্লান দত্ত, দীপ্তি ত্রিপাঠী, আলোক সরকার, অরুণ সেন, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সুতপা ভট্টাচার্য, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কবিতার পরিচয় গ্রহণ করেছিলেন নিজের নিজের বোধে, জিজ্ঞাসায়, অনুভবে। একে ঠিক আন্দোলন বলব না, গোষ্ঠীগত উৎসাহও বলব না। তাঁরা চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা কবিতার 'শব্দ, ছন্দ, কাঠামো, স্বরভঙ্গি' কেমনভাবে পালটাল। 'সূক্ষ্ম, বক্র, জটিল, রহস্য ও বিচ্ছুরণময়' হয়ে উঠছে আধুনিক কবিতা। সকলেই নিজস্ব.অভিজ্ঞতা থেকে কবিতাকে বুঝতে চেয়েছিলেন। আর তারই ফলে পেলাম কবিতাকে কবির থেকে আলাদা করে দেখবার তত্ত্ব। কিন্তু সত্যিই আলাদা করা যায়? এ প্রশ্নে কবিতা-পরিচয় নিরুত্তর। টি.এস.এলিয়ট কবিতাপাঠে অধিকারীভেদ মেনেছিলেন। কবিতা-পরিচয়ের লেখকদের অধিকারের সীমাকে আমরা ছুঁতে পারি।

এই রকমই প্রয়াস ছিল শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্যের 'রবীন্দ্রকবিতা শতক' গ্রন্থটির পরিকল্পনায়। রবীন্দ্রনাথের এক-একটি কবিতাকে তন্ন তন্ন করে বিশ্লেষণের প্রয়াস ছিল এই গ্রন্থে। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রবি-রশ্মি' জাতীয় গ্রন্থ এটি নয়। প্রথম খণ্ডের (রবীন্দ্রকবিতা শতক) 'স্বর্গপথে'র বিশ্লেষণ থেকেই তা বুঝতে পারি। এই কবিতাটিই কিভাবে 'দুঃসময়' কবিতায় রূপান্তরিত হয়ে যায় সেই জটিল সূক্ষ্ম ভাবনাটি জগদীশচন্দ্রের ধ্যানের বিষয় ছিল।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত কবি— এই স্বীকৃত কথাটি স্মরণ করছি এইজন্যে যে তিনি প্রবন্ধকে কবিতা থেকে আলাদা কোনো সৃষ্টিকর্ম বলে মনে করেন না। তিনি বলেন, 'প্রবন্ধ রচনা, লিরিকের মতোই, কোনো একটি মুহূর্তের দ্বারা উদ্‌বুদ্ধ' ('শিল্পিত স্বভাব', ১৯৬৯)। যদিচ গদ্যরচনায় 'বৃহত্তর, পটভূমির সঙ্গে সন্ধিস্থাপন' করতে হয়। কবিতার মুহূর্ত আর প্রবন্ধের মুহূর্তকে এভাবে মেলবন্ধন করতে গিয়ে অলোকরঞ্জন যে ভাষা নির্মাণ করেন তা মননধর্মী হয়েও অনুভববেদ্য। এবং তার পরিণাম কিছুটা দ্বিধাগ্রস্তও বটে। অলোকরঞ্জনের চিন্তা এমন জায়গায় পৌঁছে যায় যেখানে পাঠকের শ্রমসাধ্য ভ্রমণও প্রায় অসাধ্য। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত একসময়ে পাঠককে একবার বিপাকে নিক্ষেপ করেছিলেন তাঁর গদ্যচর্চার ক্ষেত্রে। অলোকরঞ্জন সেরকম না হলেও পাঠকের কাছে তাঁর দাবি বড়ো বেশি। অলোকরঞ্জন কবিতার মতো মিতবাক হতে গিয়ে এমন সব শব্দ গঠন করেন যার সঙ্গে আমাদের সচরাচর পরিচিতি নেই। তবুও, একবার তাঁর মনন এবং অনুভবকে স্পর্শ করতে পারলে আমরা পেয়ে যাব এক বিস্ময়ের প্রাপ্তিকে। অলোকরঞ্জনের ভাস্কর্যধর্মী (তিনি লিরিক বললেও) ভাষার রূপরেখা আমাদের বিচলিত করে সত্য, কিন্তু কবির ধ্যানকে ধীরে ধীরে আমরা স্পর্শ করতে পারি। অলোকরঞ্জন নান্দনিক মানদণ্ডকেই গ্রাহ্য করেন। সমকালীন তাপ-উত্তাপে তিনি উত্তেজিত হন না। আসলে অলোকরঞ্জন যৌবন-বাউল। মনের মানুষটিকে চিনে নেবার দায়িত্ব তাঁর। আবার এও ঠিক কবিতা, চিত্র, উপন্যাস, প্রবন্ধ সব-কিছুর মধ্যেই তিনি বর্তমানের জিজ্ঞাসাকে বিস্তৃত করে দেন তাঁর নিজস্ব প্রকরণে। আধুনিক মনের বিশ্বপরিক্রমা অলোকরঞ্জনের প্রবন্ধের পরতে পরতে। "প্রাচী ও রিলকের গুণ" ('স্থির বিষয়ের দিকে', ১৩৮৩) প্রবন্ধটিতে একদিকে যেমন রিলকে উদ্ভাসিত হতে থাকেন অলোকরঞ্জনের বোধে, তেমনি বাংলা কবিতা সেই উদ্ভাসন কিভাবে আলোকিত করে তাও তিনি বিশ্লেষণ করেন। তিনি যখন বলেন, 'নিজের বিবর থেকে বেরিয়ে এসে বিষয়ের ভিতরে আত্মবিলোপক্ষমতা। বহির্বিশ্বকে

শিল্পের অনুগত করতে গিয়ে অন্তর-বাহির একটি সৌষম্য— এই হয়ে উঠলো তাঁর নন্দনতত্ত্বের প্রধান সূত্র'। —তখন আমরা বলতে পারি অলোকরঞ্জন একালের জিজ্ঞাসাকেই পরিস্ফুট করলেন। সুধীন্দ্রনাথের 'কাব্যের মুক্তি' প্রবন্ধটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। অলোকরঞ্জনের নানা প্রবন্ধে জীবনানন্দ দাশ প্রসঙ্গ এসেছে। সম্প্রতি তিনি তাঁর জীবনানন্দ সমীক্ষা প্রকাশ করেছেন। পাশ্চাত্যের বিভিন্ন কবি বিশেষত ইয়েটসের কবিতার সঙ্গে জীবনানন্দের তুলনা পড়ে আমরা কবিতার প্রেক্ষাপটের দিগন্তকে বিস্তৃতভাবে পাই। জীবনানন্দের কবিতার স্বভাবে কালাশ্রিত ও কালোত্তীর্ণতার রূপরেখাকে প্রত্যক্ষ করেছেন এই বইতে। অলোকরঞ্জন তৃপ্তি পান কবিদের একই সভায় দেখতে। বেদনাময়, আনন্দময় হবে সেই অবস্থান।

ছয়

বুদ্ধদেব বসু 'কালের পুতুলে' আধুনিক কবিদের বরণ করে নিয়েছিলেন। কালের রঙ বদলের সূচনাটিকে তিনি ধরে রেখেছেন সে বইতে। ১৯৫৪ সালে জীবনানন্দের হঠাৎ মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ বুদ্ধিজীবীরা এক গভীর যন্ত্রণায় কাতর হয়েছিলেন। 'ময়ূখ' সংকলনে সে ইতিহাস ধরা আছে। অম্বুজ বসু প্রকাশ করলেন 'একটি নক্ষত্র আসে' (১৯৫৮)। দীপ্তি ত্রিপাঠী তাঁর 'আধুনিক বাংলা কাব্য' গ্রন্থে আধুনিক কবিদের পূর্ববর্তী কবিতা থেকে গোত্রান্তরের স্বরূপটি আবিষ্কার করলেন। আধুনিক কবিতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিধিতে ঢুকে পড়ল সেদিন। শিবনারায়ণ রায় রবীন্দ্রপ্রসঙ্গে আধুনিকতার যে স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছিলেন জীবনানন্দ চর্চায় এবং আধুনিক অন্যান্য কবিদের কবিতা আলোচনায় সে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ নানা প্রবন্ধে ফুটে উঠেছিল কিছু আগেই। শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় অপেক্ষাকৃত তরুণ বয়সে লিখলেন 'প্রসঙ্গ : জীবনানন্দ' (১৯৮৩)। তিনি লিখলেন 'কবিতা কাব্যজীবন জুড়ে তাঁর মানবিক বিবর্তনের মূল সূত্রগুলো সঠিকভাবে শনাক্ত ক'রে, তাঁর অভিমত বা বক্তব্যকে সামাজিক ভিত্তিভূমির প্রেক্ষিতে বিচার করতে পারেন তিনি। যে-কোনো সৎসাহিত্যের সঙ্গে আমাদের অবিচ্ছেদ্য যোগ থাকে। যে-কোনো সৃষ্টিশীল উদ্যমের উৎস সামাজিক প্রতিবেশ, স্রষ্টার সামাজিক অবস্থান। সম্পর্কটা অনেক সময়ে সম্পর্ক হয় না ব'লে নজর এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু কোনো শিল্পকীর্তি সম্বন্ধে সর্বাঙ্গীণ ধারণা তৈরি হবার জন্যে তার সৃষ্টি-কালের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি খেয়াল রাখা জরুরি'। শিবাজীর বক্তব্য নূতন নয়। মার্কসবাদী সাহিত্যবিচারে এ দাবি বরাবরই উঠেছে। কিন্তু শিবাজী যখন 'আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক' কাজগুলি ব্যবহার করেন তখন ধরে নিতেই হয় বাংলা প্রবন্ধে সাহিত্যবিচারের সেই দাবিকেই জোরের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছেন। শিবাজী অবশ্য অবহিত যে এইরকম বিচারে যান্ত্রিকতা ঢুকে পড়তে পারে। অস্বীকার করে লাভ নেই শিবাজীর আশঙ্কা অমূলক নয়। জীবনানন্দের কবিতায় সমাজজিজ্ঞাসা ? আধুনিক কবিতা বিচারে একসময়ে ইমেজ (কত নামে অভিহিত এই শব্দটি বাংলায়— চিত্রকল্প, প্রতিমা, বাকপ্রতিমা, উপমা) ছন্দ এবং ভাষার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছিল। শিবাজী জীবনানন্দের কবিতা চর্চায় অন্যদিকে মুখ ফেরালেন। ঊনবিংশ শতাব্দ থেকে ভারতবর্ষে যে আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ঘটেছিল খুব সংক্ষেপে শিবাজী সে ইতিহাস বিবৃত করেছেন। এই পরিবর্তনে বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের উদ্ভব এবং মধ্যবিত্তের দ্বন্দ্ব-সংঘাত কী চেহারা নিয়েছিল শিবাজীর বিশ্লেষণে তা স্ফুট হয়ে উঠল (এ সম্বন্ধে মিশ্রের *The Indian Middle Class* গ্রন্থটি স্মরণীয়)। জীবনানন্দচর্চায় এই ইতিহাস খুবই জরুরি বলে মনে হয়েছে শিবাজীর। আমাদের মনে পড়ছে আয়ান ওয়াটের ইংরেজি উপন্যাসের উদ্ভব ও বিকাশ গ্রন্থটির কথা। বইটির প্রথম খণ্ড সমাজপরিবর্তনের ইতিহাস। কবিতা আলোচনায় শিবাজী সেই পন্থাই অনুসরণ করেন। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র "বোধ" কবিতায় তিনি আবিষ্কার করেন মধ্যবিত্ত শ্রেণী কেন মনে করেছেন '—তবু কেন এমন একাকী ? — তবু আমি একাকী'। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সূচনা থেকে জীবনানন্দের কাল পর্যন্ত সমাজ পরিবর্তনের চরিত্রটি ধরা পড়েছে এই একাকিত্বের বোধে। সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত আর গ্রাম-শহরের অসম সংযোগে

কলকাতাকেন্দ্রিক নাগরিক জীবনের প্রতিফলন জীবনানন্দের কবিতায় । পুঁজিবাদের আগ্রাসন, কোথাও নামমাত্র মজুরিতে শ্রমিকদের শ্রমদানে বাধ্য করে উৎপন্ন দ্রব্যের আত্মসাৎকরণ এ-সবের আতঙ্ক-জাগানো রূপ জীবনানন্দের কবিতায় । জীবনানন্দের উপন্যাসেও শিবাজী একই মনোভাবের প্রতিফলন দেখতে পান । আমাদের ভালো লাগে এই দেখে যে শিবাজী একটি স্থির বিন্দুতে থেকে তাঁর বিশ্লেষণকে এগিয়ে নিয়ে যান । শিবাজীর দ্বিতীয় গ্রন্থ 'গোপাল-রাখাল দ্বন্দ্ব সমাস : উপনিবেশবাদ ও বাংলা শিশু সাহিত্য' (মে, ১৯৯১) পরিশ্রমী রচনা । প্রথম গ্রন্থের বিচারশৈলীর কিছু পরিবর্তন দ্বিতীয় গ্রন্থে লক্ষ করি । মার্কসীয় চিন্তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দেরিদা, ফুকো-র প্রকরণ । গঠনবাদী এবং উত্তর গঠনবাদী সমালোচনার স্বরূপটিও শিবাজীর লেখায় ধরা পড়ে । উনবিংশ শতাব্দের মনীষা আমাদের প্রশংসা, শ্রদ্ধা, ভক্তি লাভ করেছে । শিবাজী কিন্তু এ বিষয়ে নির্মোহ । তথ্য দৃষ্টান্তসহ শিবাজী আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় উপনিবেশবাদের নয়নভোলানো অনুদানকে আঘাত করেছেন। আমাদের মনীষীবৃন্দ যে উপনিবেশবাদের শোষণের কখনো কখনো প্রতিনিধিত্ব করেছেন এমন কথা শিবাজী বলেছেন । তিনি স্কুল বুক সোসাইটি থেকে বিদ্যাসাগর পর্যন্ত শিশুশিক্ষার কাঠামোটিকে মোটামুটিভাবে সাম্রাজ্যবাদী চিন্তাধারারই বিকাশ মনে করেন । মিল-বেন্থামের চিন্তাধারা বিস্তৃত হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দের বাংলা শিক্ষাব্যবস্থায় । শিবাজী বেন্থামের অপরাধীদের শোধনাগারের অভিনব পদ্ধতি ব্যাখ্যা করে তার মূলে সাম্রাজ্যবাদী কূটকৌশল আবিষ্কার করেন । অপরাধীদের নৃশংস শাস্তিদানের ভয়াবহ চিত্র আঁকেন শিবাজী । এবং শিশুশিক্ষার মধ্যে সূক্ষ্মভাবে সেই ভয়াবহতাই অনুপ্রবেশ করেছে, শিবাজীর সিদ্ধান্ত এইরকম ।

যাই হোক, এই বইতে শিবাজীর দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের 'ঠাকুরমার ঝুলি'র 'বুদ্ধু ভুতুম' গল্পটির বিশ্লেষণ বাংলা প্রবন্ধে নূতন দিগন্ত খুলে দেয় । শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর রূপকথা প্রবন্ধে রূপকথার ভিত্তিতে বাস্তবতার অস্তিত্ব স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন । উপন্যাসের উদ্ভবের মূলে রূপকথার গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে ('বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা') তিনি বলেছিলেন 'উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগের উৎপীড়নমূলক নিরোধই রূপকথার সূতিকাগার' । শিবাজীর মনে পড়েছিল কি না জানি না, আমরা বুঝি শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই ইঙ্গিতটিই যেন শিবাজীর প্রবন্ধে শাখা-প্রশাখায় প্রসারিত হয়েছে । শিবাজী বলেন 'ওজনের হেরফেরে বা উপাদানের বিন্যাসগত বদলের ফলে সম্ভাব্য-পাঠের সংখ্যা যেমন বাড়ে তেমনি বদল ঘটে ব্যাখ্যার রাজনৈতিক মাত্রার । একটা পাঠ যে-ভাবে রূপ নিয়েছে, গড়ে উঠেছে এবং সেই গঠনকে, গড়ে-ওঠার প্রক্রিয়াকে যে-ছবিতে দেখা হচ্ছে, তার কোনোটাই ইতিহাস-নিঃসম্পর্কিত পক্ষপাতশূন্য হতে পারে না' । শিবাজী তাঁর তাত্ত্বিক চিন্তা প্রয়োগ করেছেন রূপকথার আলোচনাতে । 'ঠাকুরমার ঝুলি' প্রকাশিত হবার পর রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হয়েছিলেন রচনার সারল্যে । শিবাজী বলেন 'কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যখন মনে করেন তার প্রাচীন সারল্য শুধু অনুপম নয়, "চিরন্তন", আবহমান কাল ধরে বাঙালির মনে যে খাঁটি জিনিসটি সঞ্চিত হয়ে আছে তার এক নিদর্শন, নানা চাপ-প্রতিচাপে বিধ্বস্ত ভদ্রলোকের জন্য তা প্রতিষেধকের মতো, তখন সেই মুগ্ধতার একটি রাজনৈতিক মাত্রাও থাকে' । শিবাজী সন্দেহ করেন রবীন্দ্রনাথের মতো জাতীয়তাবাদীদের 'নিম্নবর্গীয় জীবনযাত্রার জরিপ' একপেশে, 'তাতে তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হওয়া কখনোই সম্ভব ছিল না' । শিবাজী খুঁজে পান শিশু সাহিত্যে গোপাল-রাখালের দ্বন্দ্ব । একজন সৎ অন্য জন অসৎ । রাখাল অবশ্য গোপালের জায়গায় উঠে আসতে পারে । কিন্তু এই দুইয়ের জগৎ ভিন্ন এবং দ্বান্দ্বিক । তেমনি বুদ্ধুভুতুম গল্পের এক কোটিতে বুদ্ধুভুতুম অন্য কোটিতে তাদের পাঁচ ভাই । দুই কোটির দ্বন্দ্বের চেহারাটা শিবাজী সবিস্তারে তাঁর প্রবন্ধে বিস্তৃত করছেন । অবশ্য আমাদের প্রশ্ন থেকেই যায় শিশুরা এবং বয়স্ক শিশুরা (রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন আমাদের মনের দুটি ভাগ —এক ভাগে আছে প্রৌঢ় বুদ্ধি অন্যভাগে আছে শিশুর আগ্রহ কৌতূহল । প্রথম ভাগ চায় ভাব আর অর্থ, দ্বিতীয় ভাগ চায় ছন্দ আর ধ্বনি) কি শিবাজীর মতো ঠাকুরমার ঝুলি পড়ে সাড়া দেবে ? কিংবা দ্বান্দ্বিক চেহারাটি বুঝে নেবে ? আর্নল্ড কেটেল এমন-কিছু রোমান্সের কথা বলেছেন যে-

সবের উচ্চারণে এবং গল্পের আকর্ষণে শ্রমজীবী সম্প্রদায় সারাদিনের খাটুনি ভুলে যায় । শোষক মালিক, জোতদার তাই চান । এ বড়ো কূট ব্যাখ্যা। কেটেলের মতো শিবাজীও কি একই কথা বলেন ?

আধুনিক কবিতা প্রসঙ্গে ফিরে আসি । রবীন্দ্রনাথ আধুনিকদের বুঝতে চেয়েছিলেন তাঁর মতো করে । আধুনিকতা এবং আধুনিক কবি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কিছুটা অস্বস্তি বোধ করেছিলেন সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই । বিষ্ণু দে-র ঘোড়সওয়ার কবিতা বুঝতে না পেরে তিনি বিব্রত । বিষ্ণু দে-র চোরাবালি পড়ে রবীন্দ্রনাথ উচ্ছ্বসিত । যদিও 'সংশয়'-মুক্ত হতে পারেন নি । কিন্তু বিষ্ণু দে-র দুরূহতা একালের সমালোচকদের কাছে পালাবদলের চিহ্নকেই ইঙ্গিত করে । সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়ের যৌথ রচনা 'বিষ্ণু দে : কালে, কালান্তরে (আগস্ট, ১৯৮২) । "ঘোড়সওয়ার" কবিতাটি প্রসঙ্গে রবীন্দ্রমন্তব্যকে স্মরণে রেখেই বোধ করি এঁরা দীর্ঘ আলোচনা করলেন । কবির অসুস্থতার ছাপ এই কবিতায় । তার পর এসেছে একে একে যুং প্রসঙ্গ, Wilhelm-এর চীনা কবিতার অনুবাদ, আদিবাসীদের ফার্টিলিটি কাল্ট এবং ময়মনসিংহের রাজা শশীকান্তের চোরাবালিতে ডোবার ঘটনা । বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত উক্তি কবিতা বুঝতে হলে কবিকে জানতে হবে, এই দুই লেখকের কবিতাবিশ্লেষণ সেই কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় । বিষ্ণু দে-র সমরোত্তর জীবনের চাপ থেকে বেরিয়ে আসবার বাসনা ফুটে উঠেছে এই কবিতায় প্রতীকের পর প্রতীক ব্যবহারে । বিষ্ণু দে বলেছেন 'অবশ্য, একথা মানতেই হবে যে রবীন্দ্র পরবর্তী কালে আমাদের জীবন আরো কুৎসিত এবং জট পাকানো আর নিঃসঙ্গ তরুণ হৃদয়ের অরণ্য হয়ে পড়েছে— ব্রেখ্‌টের ভাষায়— শহর শহরতলির পচা আগাছার জঙ্গলে আর বন্ধ দগ্ধ গ্রামে গ্রামে' । বিষ্ণু দে আশ্বাস পান রবীন্দ্রনাথে এবং 'মার্কস্‌এ' যাঁর ভাবনা চিন্তা আমাদের প্রাক প্রজ্ঞার সন্ধানে মস্ত সহায় ('সেকাল থেকে একাল', ১৯৯০) । সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পার্থপ্রতিম দুজনেই কবিতাবিচারে কাব্যভাষায় উল্লিখিত বিশেষ্য, বিশেষণ, অব্যয়, নির্দেশক প্রত্যয় প্রায় প্রতিটি পদেই খুঁজে পাচ্ছেন কবিতার দানা । ডেভিড লজ তাঁর "Jane Eyre and Fire " প্রবন্ধে উপন্যাসটিতে ফায়ার কথাটি কতবার ব্যবহৃত হয়েছে তার হিসেব নেন । স্পারজিয়ন শেকস্‌পিয়রের নাটকে এইরকম প্রতীক, চিত্রকল্পের সন্ধান করেছেন । এক শ্রেণীর চিত্রকল্প বা শব্দ বার বার কেন ব্যবহৃত হচ্ছে তার শুলুকসন্ধান করে তাঁরা কবির অভিপ্রায় বোঝবার চেষ্টা করেছেন । এই দুজন লেখক বিষ্ণু দে-র কবিতা সম্বন্ধে বলেন 'তত্ত্ববিশ্বের জলহাওয়াতেই তাঁর কবিতা বেড়ে ওঠে— এই কবিতা প্রাথমিকভাবে কবিতা হিসাবে বিবেচ্য, তারপর নানা স্তরে উপভোগ্যতা, দেশ-কালের জটিল প্রেক্ষাপটে তাঁরই মনের বিকাশে, বিষয়-রূপের দ্বন্দ্বাত্মক ঐক্যে তাঁরই কবিতা হয়ে ওঠে বাংলাদেশের যন্ত্রণাদীর্ণ বিশ শতকের রূপক বা প্রতীক' । আমরা আবার স্মরণ করব 'কবিতা-পরিচয়ে'র আলোচনাগুলিকে । সেই ধারারই অনুবৃত্তি এই দুই লেখকের বক্তব্যে ।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বিষ্ণু দে-র কবিতায় পেয়েছিলেন প্রকৃতির ইশারা । নদী ও জল, মেঘ ও পর্বত, সমুদ্র ও আকাশ, রাত্রি ও দিন ঘন ঘন উঠে আসে বিষ্ণু দে-র কবিতায় । অরুণ সেনও লক্ষ করেন 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার', 'আলেখ্য' এবং 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ' গ্রন্থে সংকলিত কবিতায় আছে প্রকৃতি—'কিন্তু প্রকৃতি ইতিমধ্যেই ধীরে ধীরে পরোক্ষপ্রতিমা নয়, ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ বিষয় হয়ে উঠেছে তাঁর কবিতায় । কিংবা কয়েকটি প্রতিমা পুনরাবৃত্তিতে হয়ে উঠেছে প্রতীকোপম' । আরো বিস্তৃত করে বললেন তিনি বিষ্ণু দে-র অনুভূতি ভাবনার মুক্তি ঘটে 'প্রতিমাপুঞ্জের অনুসরণে' (অরুণ সেন, বিষ্ণু দে, "এ ব্রতযাত্রায়", নববর্ষ ১৩৯০) । অরুণ সেন বিষ্ণু দে-র কাব্যসৃষ্টির প্রবাহকে বলেছেন ব্রতযাত্রা, কখনো অভিযান । কাল থেকে কালান্তরে পৌঁছানোই এ যাত্রার লক্ষ্য । দ্বন্দ্ব আছে, আছে উত্তরণ । একালের সমালোচনামূলক প্রবন্ধের ভাষা অরুণ সেনের মধ্যেও পাই, তিনি যখন বলেন 'অনুভূতির ব্যক্তিসর্বস্বতা' বর্জিত হয়ে 'দেশকালজড়ানে নৈর্ব্যক্তিকতায়' পৌঁছে যায় বিষ্ণু দে-র কবিতা ।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য 'কবি জীবনানন্দ দাশ' (১৯৭৫) প্রকাশ করে জীবনানন্দের কবিতার অন্তঃসার উদ্‌ঘাটন করলেন।"গোধূলি সন্ধির নৃত্য" কবিতাটি তাঁর কাছে দিব্যকল্পনার সৃষ্টি বলে মনে হয়েছিল। তাঁর ভাষায়' "গোধূলি সন্ধি"র স্তব্ধতার নৃত্যে মানবীয় সভ্যতা ও সমাজ ভেঙে দেবার বিপ্লব-ধ্বনি শুনতে পেয়েই আমি "গোধূলি সন্ধির নৃত্য"কে রবীন্দ্রনাথের "বলাকা"র মতো একটি মহৎ কবিতা বলে মনে করেছি। প্রথম মহাযুদ্ধের প্রাক্‌কালে রবীন্দ্রনাথের "বলাকা"র Vision আর চীন-বিপ্লবের প্রাক্‌কালে জীবনানন্দের "গোধূলি সন্ধির নৃত্য"র Vision'। সঞ্জয় ভট্টাচার্যের বিশিষ্ট কবিভাবনা এবং রাজনৈতিক বিবেক এই গ্রন্থে যুগপৎ উৎসারিত হয়েছে। বইটি কিঞ্চিৎ অগোছালো, মন্তব্যগুলি তীরের মতো ছুটে এসেছে কিন্তু সর্বদা সেগুলি অব্যর্থ নয়। জীবনানন্দ সম্বন্ধে সঞ্জয় ভট্টাচার্য আবেগপ্রবণ। এই আবেগ আমাদের চিত্তগহনে মর্মরিত হয়।

জীবনানন্দের কবিতায় রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন 'চিত্ররূপময়তা'। বলা বাহুল্য, এই রবীন্দ্ররচনাটি সমালোচকদের লেখায় নানা মাত্রায় ঘুরে ফিরে এসেছে। এখানে বলে নিই দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিশ্রমী তথ্যসংগ্রহ গ্রন্থ 'জীবনানন্দ দাশ বিকাশ-প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত' (১৯৮৬)-এর কথা। বাংলা সাহিত্যের গবেষণাকর্মের গৌরব বলতে পারি বইটিকে। জীবনানন্দ দাশের সম্পর্কে আকর গ্রন্থের মর্যাদা পাবে বইটি। জীবনানন্দের উপন্যাস বেশ-কয়েকটি প্রকাশিত হয়েছে 'প্রতিক্ষণ' প্রকাশনা থেকে। সেই-সব উপন্যাসের মূল্যায়ন করেছেন সুমিতা চক্রবর্তী। 'সমর সেনের কবিতা'র বিচার করেছেন ইরাবান রায়। সমর সেনের গদ্যকবিতার সমাদর এতদিন পর্যন্ত অপেক্ষিত ছিল। সেই অভাব পূরণ করেছেন ইরাবান। আমাদের সাহিত্যচর্চায় বিদেশের ঋণগ্রহণ অবশ্যই আছে। বিদেশী গল্প, উপন্যাস, কবিতা বাঙালিকে মুগ্ধ করেছে বরাবর। অনুবাদে সে ঋণশোধ করেছি আমরা। রবীন্দ্রনাথ বিদেশের সাহিত্যের কিছু পরিচয় কয়েকটি প্রবন্ধে দিয়েছিলেন। বাংলা প্রবন্ধে বিদেশী সাহিত্যভাবনা একটা বড়ো স্থান করে নিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু উপনিষদের যত উদ্ধৃতি দিয়েছেন বিদেশী লেখকের তত দেন নি। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে উদ্ধৃতির বাহুল্য থাকে না। কিন্তু এখনকার প্রাবন্ধিক অনেক সময়েই পূর্বপক্ষ (বিদেশী ভাবনাচিন্তা) প্রদক্ষিণ করতে বড়ো ভালোবাসেন। এতে আমাদের 'বিশ্বপরিচয়' ঘটে। বাংলা কবিতার ধ্বনিপ্রতিধ্বনিতে বিদেশের কবির অনুরণন শুনে আমরা মুগ্ধ হই। একালের প্রাবন্ধিকেরা অল্পবিস্তর ইংরেজি সাহিত্যপাঠে আগ্রহী। ক্লাসিক, রোম্যান্টিক কথা দুটির মতো বহু ইংরেজি ফরাসি শিল্প-পরিভাষা আমাদের প্রবন্ধে জ্ঞাতে অজ্ঞাতে ঢুকে পড়ে। মাঝে মাঝে অবশ্য 'গুণ হয়ে দোষ হল বিদ্যার বিদ্যায়'।— ভারতচন্দ্রের এই বাণী আমাদের স্মরণে হানা দেয়। 'পশ্চিমে আজি খুলিয়াছে দ্বার' এ যে কত বড়ো সত্য তা আজকের বুদ্ধিজীবীর মানসিক প্রবণতা লক্ষ করলেই বোঝা যাবে। আমাদের প্রাবন্ধিকেরাও অনেক ক্ষেত্রে পশ্চিমের যাত্রী।

আধুনিক প্রবন্ধের যে আলোচনা করেছি তাঁদের লেখায় ফুটে ওঠে আকাশভরা তারার মতো বিদেশী তারকাবৃন্দ। এইটেই স্বাভাবিক। দুই বড়ো শিবির (হায় এখন বোধ হয় একটাই শিবির) এর খোঁজখবর জীবিকার তাগিদে বেঁচে বর্তে থাকবার জন্য নিতে হয়। শিল্প সংস্কৃতিই বা বাদ যাবে কেন ? একটা দৃষ্টান্ত দিই। অশ্রুকুমার সিকদার প্রতিষ্ঠিত প্রাবন্ধিক। তাঁর সুচিন্তিত, সুপরিকল্পিত বই 'আধুনিক কবিতার দিগ্বলয়' (১৩৮১)। রোম্যান্টিকতার গূঢ় তাৎপর্য তিনি ব্যাখ্যা করেছেন এই বইতে। কিন্তু মাত্র নয় পৃষ্ঠার একটি প্রবন্ধে ('মুখবন্ধ' বলা যায়) আমরা বিশেষজ্ঞ যাঁদের নাম পাই তাঁরা হলেন 'ব্লেক, রিলকে, মালার্মে, ইয়েটস,. কীটস, ক্লীনথ ব্রুকস, এলিজাবেথান-মেটাফিজিক্যাল (সাহিত্যের প্রবণতা) অগস্টান লেখকবৃন্দ, জর্জ স্টিনার, কারমোড. আলভারেজ, হ্যারলড ব্রুস, মোর্স পেকহ্যাম, এডমণ্ড উইলসন, জয়স, র‍্যাঁবো, হিউম, পাউণ্ড, এলিয়ট (টি. এস.), লুই আরাগঁ, জর্মান রোম্যান্টিক ভাবুক, গীনসবার্গ, অকটাভিও পাজ, বার্নস, ট্রিলিং, বোদলেয়র, নেরুদা, গ্রেভস, ডাইলান টমাস, উইলিয়ম বারোজ, ডি. কুইন্সি, রীড'। এই প্রবণতা কিন্তু প্রবন্ধের কেবল সাহিত্যবিচারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, অন্যান্য বিষয় নিয়ে যখন খুব সিরিয়াস প্রবন্ধ রচিত হচ্ছে সেখানেও বিদেশ আত্যন্তিকভাবেই আদৃত। এ কথা

ঠিক, বিশ্ব এখন আমাদের নাগালের মধ্যে, অন্য কোনো ক্ষেত্রে বিদেশের প্রতিস্পর্ধী হয়ে উঠতে না পারলেও শিল্পসংস্কৃতির ক্ষেত্রে আমরা বিশ্বনাগরিক, এই সান্ত্বনাটুকু আমাদের থাক্। এমন নয় যে অশ্রুকুমার সিকদারের বিশ্লেষণ তীক্ষ্ণ নয়। তিনি প্রথম পাঁচটি প্রবন্ধে আধুনিক কবিতার বিশ্লেষণে নিপুণ। জীবনানন্দ থেকে সুভাষ মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত যে কবিবৃন্দের আলোচনা তিনি করেছেন সেখানেও দক্ষতার পরিচয় পাই। একটি কথা বলে নেওয়া দরকার। গ্রন্থ সম্পাদনা এক নতুন বিদ্যা যা একালে নিষ্ঠাভরে করছেন কেউ কেউ আবার করছেন না অনেকে। সনিষ্ঠ সম্পাদনা সাহিত্যের কত বড়ো সম্পদ তার প্রমাণ আছে সুবীর রায়চৌধুরীর কাজে। এ যেন প্রবন্ধ রচনার চেয়েও অনেক জরুরি, অনেক উপকারী সাহিত্যকৃতি। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর' বাংলা উপন্যাসবিচারের ক্ষেত্রে নূতনত্বের সাড়া দিল। সরোজবাবু অবশ্য বাংলা উপন্যাসের ধারাবাহিক আলোচনা করেন নি। অন্যান্য প্রাবন্ধিকেরা বাংলার স্মরণীয় ঔপন্যাসিকদের বহু গ্রন্থ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন সে কথা এখানে স্মরণ করি। রবীন্দ্র গুপ্ত মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস বিশ্লেষণ করেছেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তো বহু আলোচিত ঔপন্যাসিক। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু তুলনামূলকভাবে কিছুটা প্রাবন্ধিকদের দৃষ্টির বাইরে থেকে গেছেন। 'পথের পাঁচালী' সিনেমার সাফল্যের পরে বিভূতিভূষণ একটু বেশি করে পাদপ্রদীপের আলোয় এলেন। যাই হোক, অশ্রুকুমার বাংলা উপন্যাসে আধুনিকতার লক্ষণগুলি উদ্ধার করবার প্রয়াস পেয়েছেন। ধূর্জটিপ্রসাদের 'ত্রয়ী' উপন্যাসের আলোচনায় সাংগীতিক রীতির প্রভাব নিয়ে অশ্রুবাবু বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। প্রসঙ্গটি সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় উত্থাপন করেছিলেন আগেই। নবনীতা দেবসেনের কাম্যু আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুলনাচের ইতিকথা' এবং 'প্লেগে'র তুলনামূলক আলোচনা ভালো প্রবন্ধের নিদর্শন। লক্ষ করলে দেখা যাবে প্রাবন্ধিকেরা কাফ্‌কা থেকে কাম্যুর চিন্তাধারার বিকাশ বাংলা উপন্যাসে কতটা বিস্তৃত হল সেইদিকে বিশেষ নজর দিয়েছেন।

অশ্রুকুমার সিকদারের সম্প্রতি প্রকাশিত 'নবীন যদুর বংশ' (১৯৯১, বইমেলা)। 'সব কিছু ভেঙে পড়ছে, লণ্ডনব্রিজ, দরদালান, যাবতীয় মানবিক মূল্যবোধ। তৃতীয় বিশ্বের দেশগলির মানুষ শোষণে বিধ্বস্ত, অপরিসীম দারিদ্র্য ও ক্ষুধায় অস্তিত্ব বিপন্ন তাদের। এই সব সংকট ভাঙন, বিপন্নতার ভাবনার দ্বারা অনুপ্রাণিত বিংশ শতাব্দীর কিছু সাহিত্যের নমুনা এই সংকলনের প্রবন্ধগুলিতে' ধরা পড়েছে। বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধগুলির ঐক্যসূত্র 'সংকটের ভাবনা'। এ বই যখন প্রকাশিত হচ্ছে তখন এই শতাব্দের গোড়ায় যে আশা সঞ্চার করেছিল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে, শতাব্দের প্রায় শেষে সে আশা সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ত হল। অশ্রুকুমারের বইতে ইলিয়া এরেনবুর্গের এবং সলঝেনেৎসিনের স্ট্যালিনশাসনতন্ত্রের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা বর্ণিত হয়েছে। ডস্টয়ভস্কি জার শাসনতন্ত্রের নিষ্ঠুর অত্যাচারের শিকার হয়েছিলেন, আর সলঝেনেৎসিনের কারাবাসের নির্মম অভিজ্ঞতা তারই অনুরূপ। ল্যাটিন আমেরিকার ডিক্‌টেটারদের নারকীয় নির্যাতন এতদিনে ফুটে উঠছে ঐ দেশেরই বুদ্ধিজীবীদের উৎসাহে। এই অত্যাচার নির্যাতনের আর-এক চেহারা আমাদের দেশে। সব মিলিয়ে গোটা বিশ্বে যে সংকট তৈরি হয়েছে অশ্রুবাবু সাহিত্যপাঠে তার পরিচয় মেলে ধরেছেন।

আধুনিক কবিতা বলতে আমরা এখন উত্তর-রৈবিক পর্ব বুঝি। আবার ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের আবির্ভাব থেকে যে বাংলা সাহিত্যের জন্ম তাকেও আধুনিক কাল বলি। আধুনিকতার এই স্বরূপবদল নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ নেই। যাঁরা ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দের কবি-ঔপন্যাসিকদের সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন তাঁদের অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত। বস্তুত বাংলা প্রবন্ধের সিংহভাগই ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিধির মধ্যে। নিরুদ্‌বেজিত, বিধিবিধান-শাসিত সে আলোচনার মূল্য নিশ্চয়ই আছে। সমকালীন বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে অনেকেরই এ-সব আলোচনা সম্পর্কে কিঞ্চিৎ নিস্পৃহতার ভাব লক্ষ করা যায়। অনেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত বটে তবুও পূর্ববর্তী আলোচকদের প্রতি তাঁদের কিছুটা উপেক্ষা লক্ষ করি। মজার ব্যাপার এই যে, এ-সব লেখাকে

তাঁরা যতই উপেক্ষা করুন-না কেন তাঁদের অনেকের লেখাতেই ভোল পালটানো সেই-সব লেখার প্রতিধ্বনি শোনা যায় ।

ভবতোষ দত্ত বাংলা কবিতায় দুই রীতির বিস্তৃত আলোচনা করেছিলেন । বঙ্কিমচন্দ্রের কবিতার বিভাজনের কথা তিনি নিশ্চয়ই মনে রেখেছিলেন । তাঁর 'চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্রে'র গ্রন্থের কথা এখানে মনে পড়বে । যাই হোক, এই দুই রীতি কোথায় স্পষ্টতই পৃথক হয়ে রয়েছে, কোথায় মিলে গেছে সে বিশ্লেষণ পাই তাঁর 'কাব্যবাণী' (১৯৬৬) গ্রন্থে । বিহারীলাল থেকে মোহিতলাল মজুমদারের কবিতার বিস্তৃত আলোচনা এই গ্রন্থে লভ্য । ইতিপূর্বে তারাপদ মুখোপাধ্যায় 'আধুনিক বাংলা কাব্যে' যে আলোচনার সূত্রপাত করেছিলেন, ভবতোষবাবুর কাব্যচর্চা তারই সম্প্রসারিত রূপ । মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত তারাপদবাবুর প্রবন্ধগুলিতে গভীর নিষ্ঠা ও তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণের পরিচয় পাওয়া যায় । শিবচন্দ্র লাহিড়ীর মানসীপ্রতিমা এবং বাংলা কাব্যে উপমালোক অ্যাকাডেমিক আলোচনা হয়েও কবিতা বিশ্লেষণে বিশেষ সহায়-গ্রন্থ । শশিভূষণ দাশগুপ্তের যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের আলোচনাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় । ভূদেব চৌধুরীর রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের প্রেক্ষিতটি ধরা আছে তাঁর কিছুদিন আগে প্রকাশিত বইটিতে ।

সত্যেন্দ্রনাথ রায় দর্শনের জগতে বিচরণ করতে পারতেন অনায়াসে । কিন্তু তিনি বেছে নিলেন সাহিত্য । সাহিত্যচর্চায় দার্শনিক জিজ্ঞাসাকে তিনি অবশ্য বিস্তৃত করে দেন । তাঁর লেখায় যুক্তিপরম্পরা সুবিন্যস্ত ; তিনি যুক্তিবাদী বলে সাহিত্যসমস্যার বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চান । রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা, সমাজজিজ্ঞাসার সংকলন কর্মে ব্রতী হয়ে তিনি যে দীর্ঘ ভূমিকা করেন সেখানে দেখতে পাই তাঁর অধ্যয়নের ব্যাপক ক্ষেত্র এবং বিশ্লেষণের তীক্ষ্ণতা । বাংলাভাষায় কাব্যজিজ্ঞাসা জাতীয় গ্রন্থের অভাব । সত্যেন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-মীমাংসার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন তাঁর 'সাহিত্যসমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ' (১৩৮১) গ্রন্থে । কথায় কথায় আমরা 'মৌলিক গ্রন্থ' প্রকাশিত হল বলে থাকি । সত্যেন্দ্রনাথের এ বই নিঃসন্দেহে মৌলিক । বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনার প্রকৃতি রোমাণ্টিক, কোথাও কোথাও তিনি দ্বিধাগ্রস্ত, আবার দীনবন্ধু মিত্রের 'কবিত্ব' আলোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যের মর্ম উদ্‌ঘাটনে অব্যর্থ এ সব প্রসঙ্গ গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে বিশ্লেষিত । রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যজিজ্ঞাসায় আনন্দবাদের নূতন ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন । রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যজিজ্ঞাসায় আনন্দবাদও যে মানবসম্পর্কিত এই তত্ত্বটি সত্যেন্দ্রনাথ উদ্‌ঘাটন করেন । অ্যাকাডেমিক সমালোচনার দুর্বল এবং চর্বিতচর্বণের মধ্য থেকে খুঁজে নিতে হয় সত্যেন্দ্রনাথের প্রবন্ধ । বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের অ্যাকাডেমিক পদ্ধতির এই মূল্যবান আলোচনা সতর্ক প্রহরীর কাজ করতে পারে ।

সাত

বাংলা প্রবন্ধ পাঠকের অভিরুচি অনুযায়ী চলে ? না কি পাঠক তৈরিও করে ? দুটি প্রশ্নই আপাতদৃষ্টিতে কিঞ্চিৎ বোকাটে ধরনের । সবই তো সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে যুক্ত । শিল্প-সংস্কৃতির পরিবেশটাই তৈরি হয়ে যায় সমাজের সংকট আর উত্তরণের টানাপোড়েনে । তবু বলব এখন এমন বাঙালি মধ্যবিত্ত পাঠক তৈরি হয়েছেন যাঁরা সমাজ-জিজ্ঞাসাটাকেই মুখ্যভাবে দেখতে চান প্রবন্ধে। এখন তো বিস্মৃত-বিখ্যাত গল্প-উপন্যাস লেখকদের রচনাবলী প্রকাশের যুগ । এই সময়ে ধূর্জটিপ্রসাদের সমগ্র রচনাবলীর প্রকাশ ঘটে যায় কেমন করে ? গল্প উপন্যাস তিনিও লিখেছেন, কিন্তু ওজনে এবং সংখ্যায় প্রবন্ধেরই গুরুত্ব । তার মানে ধূর্জটিপ্রসাদকে জানবার, বোঝবার একটা মণ্ডল তৈরি হয়েছে । ধূর্জটিপ্রসাদ ১৩৬৩ সালে লিখেছিলেন যে তিনি যখন 'আমরা ও তাঁহারা' প্রকাশ করেন (১৯৩১) তখনই বুঝতে পেরেছিলেন অর্থশাস্ত্র ও সমাজতত্ত্বে Social distance প্রত্যয়টির আলোচনা শুরু হয়েছে । চিন্তাবিদরা জেনেছিলেন 'সমাজ ভেঙেছে' এবং টুকরো টুকরো ছোটো ছোটো দল বা উপদল

তৈরি হচ্ছে। সেই সময় থেকেই বুদ্ধিজীবীরা মার্কসবাদ সম্পর্কে সচেতন। শ্রেণীবিভাগের মধ্যেই দ্বন্দ্ব ও ভাঙনের শুরু মার্কসবাদীরা এই বিশ্বাসে অটল রইলেন। বিরুদ্ধবাদীরাও কিন্তু Social distance-কে উপেক্ষা করতে পারলেন না। ধূর্জটিপ্রসাদ বলেছেন সেই চিন্তাধারা Sociology of Knowledge নামে 'ক্রম-বর্ধমান' জ্ঞানে পরিণত। তাই তাঁর বিষয়বস্তু হল 'সামাজিক দূরত্ব; এর শাস্ত্রাংশ হল জ্ঞান-বিজ্ঞানের চিন্তাধারার সমাজতত্ত্ব'।

মার্কসবাদ বাংলা শিল্প-সংস্কৃতির বিদ্যাচর্চায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ধূর্জটিপ্রসাদের সময় থেকেই। 'পরিচয়ে'র আড্ডায় সেদিন তরুণ মার্কসবাদী নীরেন্দ্রনাথ রায়, সুশোভন সরকার, বিষ্ণু দে প্রমুখদের দেখতে পাই। এলিটিস্টদের সঙ্গে বাক্‌যুদ্ধে এই তরুণ তুর্কিরা আমাদের রুচির বদল ঘটিয়েছিলেন ঐ পরিচয় গোষ্ঠীর মধ্যেই জিপ্পার গ্রুপ হিসাবে। কংগ্রেসের মধ্যেও তরুণ একদল সমাজবাদী জিজ্ঞাসায় কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলেন। জওহরলাল নেহরু লিখেছিলেন ' Socialism is the only panacea of all evils in society. মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্তালিনের পঠনপাঠন তখন ক্রমবর্ধমান। ধূর্জটিপ্রসাদ 'তাঁহারা'দের সূত্রে বলেছেন সাহিত্যে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব সাহিত্যকে বিনষ্ট করে, স্ট্যালিনপুরস্কারপ্রাপ্ত বইগুলিই তার দৃষ্টান্ত। ধূর্জটিপ্রসাদ স্বীকার করেছেন একাগ্রতা, সততা, কর্মতৎপরতা সৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও আধুনিক সাহিত্য কিছুটা নিষ্প্রাণ। এ কথাটাই প্রমাণিত হল 'নবীন যদুর বংশ' গ্রন্থে। স্ট্যালিনের সাহিত্যতত্ত্বকে— তল (Structure) উপরিতল (Superstructure)— মার্কসবাদীরা ধ্রুব বলে গ্রহণ করেছিলেন সেদিন। গত পঁচিশ বছরের মার্কসবাদী আলোচনাতেও তার প্রসারের খামতি নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও মার্কসবাদী আলোচনারও রঙ বদলালো। আগে বলেছি নকশাল আন্দোলন, যুক্তফ্রণ্ট সরকার গঠন আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব সব-কিছু জট পাকিয়ে দিচ্ছে আমাদের চিন্তারাজ্যে। ধূর্জটিপ্রসাদের 'আমরা ও তাঁহারা'র দুই থাক এখন অচল। মধ্যবিত্তের এখন নানা থাক। এক থাক থেকে অন্য থাকে যাতায়াত অবশ্য রয়ে গেল। কে জানে সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাস্তার সংস্কৃতির জনক মানুষরাও মধ্যবিত্ত কি না? সুমন্ত বাংলায় প্রবন্ধ লিখেছেন কম। কিন্তু তাঁর ইংরেজি গ্রন্থ পার্লার কালচার এবং স্ট্রিট কালচার ইতিমধ্যেই ঝড় তুলেছে। মার্কসবাদের শোষণের বিরুদ্ধে মানুষের মুক্তিতত্ত্বকে ভিত্তিভূমি করে সাব-অলটার্ন তত্ত্বের সূচনা। সেই তত্ত্ব এখন জোর কদমে চলেছে। নিম্নবর্গের সংস্কৃতিতে নৃতাত্ত্বিক উপাদান, যৌথ জীবনযাপন, খাদ্যের সন্ধানে ইতস্তত ভ্রমণ, তাদের আশা-নিরাশা নিয়ে একের পর এক ইংরেজিতে লিখিত প্রবন্ধের সংকলন প্রকাশিত হচ্ছে। রঞ্জিত গুহ এর প্রবক্তা। ওদিকে ইতালির কমিউনিস্ট নেতা গ্রামসি আমাদের বুদ্ধিজীবীদের জ্ঞানের সীমায় এসে গেছেন। আগে যে লিটল ম্যাগাজিনের কথা বলেছি, বারোমাস, অনুষ্টুপ, বিভাব, প্রমা, এক্ষণ, প্রতিক্ষণ, গাঙ্গেয়, কোরক (নামের তালিকা যদৃচ্ছা বাড়ানো যেতে পারে) ইত্যাদি পত্রিকায় মধ্যবিত্তের এই নূতন ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। যাঁরা ইংরেজিতে লিখতে অভ্যস্ত (খানিকটা মধুসূদনীয় স্বপ্নও আছে না কি তাঁদের ভাবনায়?) তঁদের মধ্যে কেউ কেউ বাংলায়ও এ-সব দুরূহ প্রসঙ্গের প্রবন্ধ লিখছেন। অনুষ্টুপ কাগজ তো মার্কসবাদী সংখ্যা বার করলেন বুদ্ধিজীবীদের লেখা নিয়ে যদিও সে লেখা পূর্ববর্তীদের লেখার তুলনায় নীরেস। কিছুকাল আগে 'এক্ষণ'এর কার্ল মার্কস সংখ্যা সাড়া জাগিয়েছিল অনেকেরই মনে পড়বে।

শিবনারায়ণের কথা আগে বলেছি। কমিউনিস্ট-বিরোধী মার্কসবাদী তাঁর 'মৌমাছিতন্ত্র' প্রবন্ধে ('গণতন্ত্র সংস্কৃতি ও অবক্ষয়', ১৯৮১) তিনি পূর্ববর্তী চিন্তানায়কদের একের পর এক চাবকেছেন। রুশো, বঙ্কিমচন্দ্র, অরবিন্দ, সুভাষচন্দ্র তাঁর রোষ থেকে রেহাই পান নি। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের অবদান সম্বন্ধে তিনি সচেতন, রবীন্দ্রনাথও তাঁর ব্যঙ্গের লক্ষ্য হন সময়ে সময়ে। ফাসিজম্ আর কমিউনিজম্ শিবনারায়ণের কাছে এক। দুইই মানুষের ব্যক্তিত্বকে বিলোপ করে। গ্লাসনস্ত পৈরেস্ত্রৈকার আগে লিখিত হয়েছিল তাঁর প্রবন্ধ। শিবনারায়ণ রায় প্রমিথিয়ুসের মুক্তি চান ব্যক্তির স্বনির্ভর, স্বইচ্ছা ও স্ববুদ্ধির উপর। শিবনারায়ণ রায় গান্ধীবাদেও বিশ্বাসী নন। শিবনারায়ণ রায়ের মতো মৌমাছিতন্ত্রকে ঘৃণা সকলেই করবেন, কিন্তু তিনি যে ব্যক্তির কথা বলেছেন সে ব্যক্তি

তো কিছুকাল পরে কামুর ক্যালিগুলা-তে পরিণত হতে পারে । এখানে সমাজের উত্তর কী । বর্তমানের ভূমিকায় দেখলে ব্যক্তির ভূমিকা কী হবে ? কী করে তিনি মেলাবেন, মেলাবেন তিনি । শিবনারায়ণ ব্রেখটের বচন উদ্ধার করেছেন 'ব্যক্তির মোটে দুটো চোখ, পার্টি সহস্রাক্ষ; ব্যক্তি শুধু একটা শহর দেখতে পায়, পার্টির নজর সাতরাজ্যে ছড়ানো । ব্যক্তির হাতে সীমাবদ্ধ সময়, পার্টি অফুরন্ত সময়ের মালিক । ব্যক্তির মৃত্যু আছে, পার্টিকে কেউ মারতে পারে না । কেননা পার্টি হচ্ছে জনসাধারণের সম্মুখ-প্রহরী, সংগ্রামে তাদের নেতা' । শিবনারায়ণের এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' নাটকের কথা মনে পড়লে খুশি হতাম । শিবনারায়ণ পার্টিবিহীন যে ব্যক্তির মুক্তির কথা বলছেন সে পরিবেশ কবে তৈরি হবে ? এও কি একধরনের ইউটোপিয়া নয় ? অমিয় বাগচী সমাজতন্ত্রবাদের শোচনীয় ব্যর্থতা বিশ্লেষণ করে অনুষ্টুপ পত্রিকায় যে প্রবন্ধটি লিখেছেন তাতে তিনি সত্যিই সোভিয়েট বিপ্লবের গোড়ায় গলদ সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করেছেন । শিবনারায়ণের মতো পার্টির ভূমিকা সম্বন্ধে তিনি হতাশও নন ।

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের "আশা নিরাশার সংলাপ" প্রবন্ধ (এঁর এখনো কোনো প্রবন্ধের বই প্রকাশিত হয় নি ।) হালকা চালে লেখা কিন্তু কালের রোগনির্ধারণের প্রায় নির্ভুল মাপকাঠি । রামকৃষ্ণ চটুল ভাষা ব্যবহার করেন, এমন শব্দ তাঁর প্রবন্ধে পাওয়া যায় যা প্রায় slang-এর পর্যায়ে পড়ে । রামকৃষ্ণের পঞ্চভূতের আসরে কেউ আশাবাদী, কেউ সবজান্তা, কেউ জিজ্ঞাসু, কেউ বাচাল, কেউ সংশয়ী । এরা সবাই মধ্যবিত্ত । ধূর্জটিপ্রসাদের দুই থাক এখন পাঁচ থাকে পরিণত । বুদ্ধিজীবীর এই হালহকিকতের নিপুণ বিশ্লেষণ করেছেন রামকৃষ্ণ । রামকৃষ্ণ সমাজতন্ত্রের গতিপ্রকৃতির বিপর্যয়কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন । যারা সোভিয়েট রাশিয়াকে হাতের মুঠোয় রেখে নির্ভরতা চেয়েছিলেন, তাদের শোচনীয় অবস্থায় রামকৃষ্ণও আলোড়িত । গান্ধীবাদ আর পুঁজিবাদ-এর উল্লাসের চিত্র তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন । রামকৃষ্ণ অবশ্য কোনো তাত্ত্বিক আলোচনায় যান নি । তাঁর অন্বিষ্ট মানুষ । সমাজের গর্ভে যে মানুষের জন্ম সেই মানুষের কথাই বলেছেন তিনি । রামকৃষ্ণ কর্মযোগের কথা বলেন— যাকে গীতায় পাওয়া যাবে না । তাঁর ভাষায় 'আমাদের কর্ম ঘোরতর সকাম । পরের কাজ করে নিজের জীবন ধন্য করা— দিনযাপনের গ্লানি থেকে মানুষের মুক্তি— এই ফলের আশা তো প্রতি পদেই থাকছে... উন্নতি আর বিকাশেরও কোনো সীমা নেই' । রামকৃষ্ণ অন্ধতা ও অযুক্তির যুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চান । বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি তাঁর অন্বিষ্ট । ধর্মান্ধতার মূলে এই অযুক্তি আর সংস্কারের টান । রামকৃষ্ণ একালের বুদ্ধিজীবীদের রামায়ণী কথা অথবা কৃষ্ণায়ন সম্বন্ধে বিচারবিমূঢ়তা লক্ষ করেন । এঁদের চিন্তাধারার ফল কী ? রামকৃষ্ণ একটি প্রবন্ধে উত্তর দিয়েছেন 'ফলম্ শূন্যম্' । রামকৃষ্ণ বেশ-কিছুদিন ধরে লিখছেন । ডি. ডি. কোসাম্বির অনুগামী এই প্রাবন্ধিক । তাঁর লেখায় গবেষণার সঙ্গে মিশে আছে মানবতাবোধ । মার্কসবাদে বিশ্বাসী কিন্তু কোনো গোঁড়ামির দ্বারা আক্রান্ত নন । সব-কিছুকে সহজভাবে দেখা তাঁর অভ্যাস । সাম্প্রতিক জ্ঞানচর্চার পথটিকে রামকৃষ্ণ চেনেন। ফ্যাশন বা ফ্যাডকে সযত্নে পরিহার করেন তিনি। তাঁর মতে দেরিদা, ফুকো ইত্যাদি এদেশে অচল । "ওরে বর্ণচোরা ঠাকুর এল, অথবা পূর্বোত্তর-গঠনমূলবাদ ও সাহিত্য-সমালোচনা" প্রবন্ধে পাশ্চাত্যে নূতন নূতন পরীক্ষানিরীক্ষায় বিগলিত কিছু বুদ্ধিজীবীকে প্রচণ্ড আঘাত হেনেছেন তিনি । চিহ্নার্থতত্ত্ব (সেমিওটিক্‌স), বস্তুরূপতত্ত্ব (ফেনোমেনোলজি), গ্রহণতত্ত্ব (রিসেপশন থিয়োরি), প্রেরণতত্ত্ব (হের্মোনউটিক্‌স), নারীবাদ (ফেমিনিজম), উত্তর গঠনমূলকবাদ, গঠনমূলকবাদ— এ-সবের উপর তাঁর অম্লমধুর কটাক্ষ উপভোগ্য ভাষায় বিবৃত হয়েছে ঐ প্রবন্ধে । সাহিত্য চিন্তাতেই নয় সর্ববিষয়ে পশ্চিমের যাত্রীদের রামকৃষ্ণ আক্রমণ করেছেন, এক কথায় বলা চলে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। রামকৃষ্ণের সিদ্ধান্ত 'যারা কখনও মন দিয়ে আরিস্তোতল-এর "পোএটিক্স" ও তার ইবনে সিনা (আভিসেন্না)— ভাষ্য পড়ে নি, ভরতের "নাট্যশাস্ত্র"র সঙ্গে "চরক"-সুশ্রুত-সংহিতার যোগের খবর রাখে না —সাহিত্যতত্ত্ব নিয়ে তাদের কথা বলা সাজে না'। বাংলা প্রবন্ধে সমকালীন ভাবনা এবং ধ্রুপদী সাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ— একই সঙ্গে মিলেছে রামকৃষ্ণের লেখায় ।

অম্লান দত্ত অর্থনীতিবিদ । তিনি বাংলায় ছোটো ছোটো প্রবন্ধ লিখেছেন বেশ-কিছু । তাঁকেও ভাবতে হয়েছে 'ইতিহাসের যে খাড়াই ধরে মানুষ চলেছে' (শিবনারায়ণ রায়) তাঁদের কথা । বর্তমানের সংকট সম্বন্ধে তিনি উদ্‌বেজিত । 'দ্বন্দ্ব ও উত্তরণ' (১৮৮৯) বইতে যে প্রবন্ধদুটি আছে তাতে সাম্প্রতিক কালের চিত্রচরিত্র স্পর্শ করেছেন তিনি । ইতিহাসবোধ এবং বিবর্তনের রূপরেখা সম্বন্ধে তিনি সচেতন । তিনি রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীবাদে অনেকটাই নির্ভর করেন । দ্বন্দ্বের চেহারা স্বরূপ নির্ণয় করেই তিনি থেমে যান না, উত্তরণের ইশারা ইঙ্গিতও তাঁর প্রবন্ধে মেলে । বলা বাহুল্য তিনিও ব্যক্তির মুক্তিতে বিশ্বাসী । অম্লান দত্তের লেখা পাণ্ডিত্যভারমুক্ত । ঝকঝকে ভাষা আয়ত্ত করেছেন তিনি । সহজ সরল ভাষায় দুরূহ বিষয়কে তিনি অনায়াসে আমাদের গোচরে এনে দিতে পারেন । আমরা তাঁর মতের সঙ্গে মিলি আর না মিলি এ কথা বলব অম্লান দত্ত অযথা বিতর্কে যান না, রাগ পোষণ করেন না । দৃঢ় প্রত্যয়ে তিনি তাঁর লক্ষ্যে পৌছে যান । অর্থনীতি অম্লান দত্তের বিষয়, তিনি অর্থনীতিকে আশ্রয় করেই মানববিদ্যার বিভিন্ন শাখার সঙ্গে এর সম্বন্ধনির্ণয়ে বেশি মনোযোগী । প্রাবন্ধিকেরা কেউ বলছেন একাল একটা বিষম সংকটের আবর্তে, অম্লান তাকেই বলেছেন দ্বন্দ্ব ও উত্তরণ । মানুষের মঙ্গল-অমঙ্গল, উন্নতি-অবনতির ধারণাই তাঁদের অন্বিষ্ট । বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ এই নিয়ে ভেবেছেন । রামেন্দ্রসুন্দরের প্রবন্ধে তারই রূপরেখা অঙ্কিত হয়েছিল । একালের প্রাবন্ধিককেও একালের পরিভাষায় সেই দ্বন্দ্ব আর উত্তরণের কথা ভাবতে হয়েছে । এর প্রাথমিক প্রয়াস বিজ্ঞানচর্চার বিস্তার । কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ বসুর হাজার চেষ্টাতেও এ ব্যাপারে বাংলা ভাষায় খুব বেশি অগ্রসর হওয়া যায় নি । 'বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ' সিরিজের লেখকবৃন্দ কিছু চেষ্টা করেছিলেন । অর্থনীতিবিদ ভবতোষ দত্ত একসময়ে অর্থশাস্ত্রের চর্চা করেছিলেন । প্রণব বর্ধন, অশোক রুদ্র, অমর্ত্য সেনের বই সম্প্রতি বেরিয়েছে । আমাদের কৌতূহল কিছুটা নিবৃত্ত হয় বটে এই-সব প্রকাশনায়, কিন্তু এ প্রচেষ্টাও কতদূর সাফল্য পাবে সে বিষয়ে সন্দেহ আছে । অমর্ত্য সেনের বইটি তাঁরই ইংরেজি লেখার অনুবাদ । তিনি নিজে কিছু পরিভাষা তৈরি করে দিয়েছেন। এঁদের প্রবন্ধে সমকালীন সংকটের প্রত্যক্ষ আলোচনা নেই (থাকবার কথাও নয়) ; সমকালীন পাঠক কিছু তাত্ত্বিক সমস্যার মুখোমুখি হলে তার চরিত্র কিভাবে অনুধাবন করবেন সে ব্যাপারে বুঝতে পারবেন বইগুলি পড়ে ।

অধ্যাপক সৌরীন ভটাচার্য অর্থনীতি বিজ্ঞানের সঙ্গে সমাজবিজ্ঞানকে যুক্ত করেন । তিনি কিছু প্রবন্ধে তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন । তাঁর প্রবন্ধে দার্শনিক জিজ্ঞাসার প্রাধান্য । ন্যায়শাস্ত্রকে তিনি কঠোরভাবে অনুসরণ করেছেন তাঁর প্রবন্ধমালায় । বিষয়ের তাৎপর্য, বিষয়টির ঐতিহাসিক বিবর্তন, এই বির্বতনে পক্ষবিপক্ষের সমর্থন অথবা প্রতিবাদ— এ-সবই সৌরীনবাবু ধীরভাবে বিচার করেছেন । তাঁর প্রবন্ধের ভাষা আঁটসাঁট । প্রায় গাণিতিক পদ্ধতিতে সৌরীনবাবু বিষয়ের অবতারণা করেন, বিষয়ের মূলে পৌছে যান তার পরে এবং ধীরে ধীরে তাঁর সিদ্ধান্তে উপনীত হন । বলা বাহুল্য, সৌরীনবাবু প্রবন্ধে দীক্ষিত ব্যক্তি যত সহজে প্রবেশ করতে পারবেন, অদীক্ষিত মানুষ তত সহজ পারবেন না । সৌরীনবাবু অদীক্ষিত মানুষের কাছে কিছু দাবি করেন নিশ্চয়ই । আমাদের মতো মানুষকে সৌরীনের প্রবন্ধ বারে বারে পড়তে হয় । এবং বলতে দ্বিধা নেই সেই পড়ার প্রাপ্তি কিছু কম নয় । "সমাজতান্ত্রিক আধুনিকীকরণ : কিছু পদ্ধতিগত প্রশ্ন" প্রবন্ধে সৌরীন বলেছেন, ' "বিজ্ঞান" বলতেই একটা ধারাবাঁধা আঁটোসাঁটো চেহারা আমাদের মনে আসে । সে জায়গায় একটু চিন্তাটাকে খুলে দেবার জন্যে যদি মনে মনে আমরা তৈরি হতে পারি, তা হলে "বিজ্ঞান-আবিষ্কার" নিয়েও আর অত মাতামাতি না করলেও চলবে । বর্তমান আলোচনায় এরকম খানিকটা খোলা মেজাজ আমদানি করার জন্য ঐ বৈচিত্র্য, ভিন্নতা ও রকমফেরের কথা বলছিলাম । সমাজতন্ত্র-ধনতন্ত্র, সাম্যবাদ-পুঁজিবাদ ইত্যাদি প্রসঙ্গে এই মেজাজ নিতান্ত জরুরি, কারণ তা না হলে যে-আবহাওয়া তৈরি হয়ে আছে তাতে সেখানে কয়েকটা জরুরি প্রসঙ্গে সমালোচনার জন্য তুলতেই পারা যাচ্ছে না ।' সৌরীনের এই মন্তব্য থেকে বোঝা যায় তিনি অ্যাকাডেমিক প্রকরণকে অবলম্বন করেই সেই পদ্ধতিকে অতিক্রম করতে

চান । খোলা হাওয়ায় আলোচনার বাসনা জানাচ্ছেন তিনি । বোঝা যায় আমাদের অর্থনীতি সমাজনীতি আলোচনায় বাইরের চাপ ভেতরের চাপে পিষ্ট হতে থাকে এখন । রাজনীতির চোরাবালিতে বক্তব্য বেঁকে যায় । খোলা মনে আলোচনা মানেই বিদ্যাচর্চার বিভিন্ন ডিসিপ্লিনের সঙ্গে মিলে মিশে যাবার বাসনা । তাতে সংকট বা সমস্যার বিভিন্ন রূপরেখাকে বোঝার সুবিধে । আসলে আমাদের বিজ্ঞান (অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি ইত্যাদি) আলোচনায় এই দৃষ্টিভঙ্গি জরুরি । তত্ত্বচিন্তা আর তার প্রয়োগের মধ্যে মানবিক মূল্যবোধ জড়িয়ে আছে সে আলোচনাই মুখ্য স্থান পাবার কথা । সমাজের গর্ভ থেকে যে ছোটোবড়ো বৃক্ষ উঠে পড়ল তাদের শেকড়বাকড়গুলির সন্ধান নেওয়া একান্ত প্রয়োজন । এখন জিজ্ঞাসু লেখকবৃন্দ সেদিকে মনোযোগী হয়েছেন এমন বলা যায় । হিতেশরঞ্জন সান্যাল এইরকম আলোচনায় বিশেষ মনোযোগী ছিলেন । বাঙালির সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা, সাফল্য আর ব্যর্থতা তাঁর অন্বিষ্ট । মধ্যযুগের বৈষ্ণব ভাবনার উদ্ভব ও বিকাশ বাঙালির সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে । চৈতন্যকে কেন্দ্র করে সে সংস্কৃতির স্ফূর্তি ঘটেছিল । চৈতন্যের পাঁচশো বছর জন্মবার্ষিকীতে এ নিয়ে কিছু উৎসাহ সঞ্চারিত হয়েছিল । হিতেশরঞ্জনের 'বাঙ্গালা কীর্তনের ইতিহাস' (১৯৮৯) তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় । চৈতন্যপ্রবর্তিত কীর্তনকথার ইতিহাস রচনা করেছিলেন হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় । সুকুমার সেন কীর্তনের উদ্ভব ও বিকাশ এবং পরিণতির ঐতিহাসিক বিবরণ দিয়েছেন তাঁর নানা প্রবন্ধে এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে । কিন্তু হিতেশরঞ্জন কীর্তনকে সমাজের পটভূমিকায় দেখেছেন । বাঙালির সম্মিলিত হবার প্রয়াস, বাঙালির গোষ্ঠীচেতনার নানা রঙ নানা রূপের সন্ধান করেছেন তিনি এই বইতে । হিতেশরঞ্জন গান্ধীবাদী । সহিষ্ণুতা, সেবাধর্ম, যৌথপ্রয়াস তিনি দেখেছেন কীর্তন আন্দোলনে । কীর্তন গ্রামীণ সংস্কৃতির দান । শহরবাসী কীর্তন সম্বন্ধে বীতরাগ । হিতেশরঞ্জন বলেছেন, 'আত্মনির্ভরশীল গ্রামীণ সমাজর আশ্রয়ে' কীর্তনের উদ্ভব ; তিনি কীর্তনের অবলুপ্তিতে খেদ করে বলেছেন 'দেশের চিত্তভূমিতে রসসিঞ্চন করিবার ও মননশক্তিকে জাগ্রত রাখিবার জন্য অন্য কোন সর্বজনীন আয়োজন এখনও হয়নি।' মার্কস্‌বাদী চিন্তাবিদ্‌রা কী বলবেন জানি না, হিতেশরঞ্জন কিন্তু কীর্তনের পরিমণ্ডল আবার গড়ে উঠুক এমন একটা আশা করে গেছেন । আগে বলেছি বাংলা মধ্যযুগের শিল্পসংস্কৃতি সম্বন্ধে আমাদের আগ্রহ যেন কিছুটা কমে আসছে । আসলে সে সংস্কৃতির আলোচনা করার জন্য যে বিশেষজ্ঞতার প্রয়োজন তা অনেকের নেই । ভালো সংস্কৃত ও আরবি-ফার্সী এবং কখনো কখনো পর্তুগীজ, ফ্রেঞ্চ এমন-কি ডাচ ভাষা জানার প্রয়োজন তো একজনের পক্ষে আয়ত্তে আনা কঠিন । সেজন্যে প্রবন্ধের বই অনেক বেরোয় কিন্তু সেগুলি ভাসাভাসা, দায়সারা গোছের কাজ ।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতো প্রাবন্ধিক কই ? সুকুমার সেনের মতো ? যত দিন যাচ্ছে ততই যেন আমরা দেশের পুরনো ভিতটাকে আর চিনতে পারছি না । সত্যজিৎ চৌধুরীর উৎসাহে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর প্রবন্ধ সংগ্রহের প্রকাশের মূল্য এইখানে । আমাদের প্রাবন্ধিকদের আদর্শ হতে পারে শাস্ত্রীর রচনাবলী । সুখের কথা বিস্মৃতপ্রায় প্রবন্ধগুলি প্রকাশের তাগিদে একালের চিন্তাবিদ্‌রাই ভেবেছেন । এই সময়ে রচিত না হলেও এগুলিকে এ সময়ের চিন্তার প্রতিফলনের সঙ্গে নানাদিক থেকে অন্বিত এ কথা বলা যাবে । রমাকান্ত চক্রবর্তী বৈষ্ণব সংস্কৃতির একটি পর্বের ইতিহাস লিখেছেন ইংরেজিতে । বাঙালির সংস্কৃতির একটি বাস্তব রূপ ফুটে উঠেছে তাঁর বিশ্লেষণে । একদিক থেকে তিনি অ-বৈষ্ণব । ভক্তিধর্মকে তিনি আবেগবিহ্বলতার সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেন নি। সম্প্রতি তিনি বাংলাতে প্রবন্ধ লিখছেন । একসময়ে নিধুবাবুর জীবন ও সংগীত নিয়ে বই লিখেছিলেন রমাকান্ত । রামমোহন চর্চা আমাদের দেশে কম হয় নি । এই প্রসঙ্গে নানা নূতন তথ্যে সংবলিত দিলীপকুমার বিশ্বাসের 'রামমোহন সমীক্ষা' (১৯৮৩)-র নাম করতে পারি । দিলীপকুমার বিশ্বাসের বক্তব্য ধর্মের দেশকালোত্তীর্ণ রূপ আছে 'তার একটি সমাজবদ্ধ বা সামাজিক রূপ আছে, আর এই বিশেষ ক্ষেত্রে মানুষের ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান তার সামাজিক সত্তার মতই পরিবর্তনশীল এবং সমাজবিবর্তনের দ্বারা শাসিত' । দিলীপকুমার মার্কসবাদী নন কিন্তু

ধর্মবিশ্বাসকে সমাজের পটভূমিকায় স্থাপন করতেই হবে এই বাধ্যবাধকতাকে মানেন। অবশ্য মার্কসবাদী চিন্তানায়কবৃন্দ দিলীপকুমারের সঙ্গে সব বিষয়ে একমত হবেন না এ আমরা একটু পরেই দেখব।

আট

'মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্ত্যসীমা'— নীল আর্মস্ট্রংএর চাঁদের মাটি স্পর্শ করবার মুহূর্তে সাংবাদিকদের রবীন্দ্রনাথের এই লাইনটি মনে পড়েছিল। তথ্যকে রোজকার পাঠকের কাছে সাজাতে হচ্ছে সাহিত্যের সখ্যবন্ধনে থেকে। তৈরি হতে লাগল রিপোর্টাজ। নিউজের মধ্যে ভিউজ। বেতারভাষ্যে এল 'কাব্যি'। জনসংযোগের ভাষা বাংলা গদ্যকে কিঞ্চিৎ মোচড়াল।

সংবাদ মরশুমী ফুল। আকর্ষণ করাই তার ধর্ম। আমাদের কৌতূহল এখন আকাশছোঁয়া। এ সময়টাই হচ্ছে 'নলেজ-বুমে'র। জানানোর তপস্যায় বসেছে সংবাদপত্র। রবীন্দ্রপ্রেমী সন্তোষকুমার ঘোষ আনন্দবাজার পত্রিকায় যোগদান করার পর তিনি সংবাদকে কিঞ্চিৎ সাহিত্যগন্ধী করে তুললেন। সংবাদপত্রের সম্পাদনায় এবং সম্পাদকীয় পাতায় বিশেষজ্ঞের মতামতসহ সমকালীন দেশীয় এবং বিদেশীয় সমস্যার বিশ্লেষণ বিশেষ গুরুত্ব পেল সংবাদপত্রে। সাময়িকী বিভাগটাতেও প্রবন্ধের চেহারা নিয়ে কিছু লেখা বেরোতে লাগল। সংবাদ পরিবেশনের মানসিকতা এখন ব্যাপক ও বিচিত্র রূপ নিয়েছে। সংবাদপত্রের ভাষা এক হিসেবে গণতন্ত্রের ভাষা। দেবেশ রায়ের গবেষণামূলক সংবাদপত্রের ভাষার ইতিহাস গ্রন্থটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। বিনয় ঘোষের সংবাদপত্রের সংকলনের গদ্যভাষাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। প্রবন্ধের পরিচয় দিতে গিয়ে সংবাদপত্র টেনে আনার কারণ হল এই যে উপযুক্ত সংবাদগুলির বেশ-কিছু অংশ প্রবন্ধেরও বিষয়। যেমন পরিবেশ দূষণের সরকারি বেসরকারি নানা উদ্যোগ আয়োজনের কথা সংবাদপত্রে প্রত্যহ পাই। আর এই নিয়েই অনুষ্টুপ পত্রিকার একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হল। যাতে বৈজ্ঞানিক আলোচনার উজ্জ্বল স্বাক্ষর সমন্বিত প্রবন্ধ পাই। সংবাদপত্রে চাকরি করেছেন এমন ভালো লেখকের সংখ্যা কম নয়। এঁদের মধ্যে প্রাবন্ধিকও আছেন বেশ কয়েকজন।

সংবাদপত্রের লক্ষ্য অ্যাভারেজ পাঠক। জনপ্রিয়তা এর মূলধন। সুতরাং সিরিয়াস বিষয় অনেক সময় সংক্ষেপে ও 'সহজ' করে পরিবেশনের দিকে সম্পাদকের লক্ষ্য থাকে। এর ফলে কিছু ক্ষতিও হয়ে গেছে। যেমন পুস্তক সমালোচনা বিভাগটি। বাংলা গ্রন্থের সমালোচনা 'প্রবন্ধ' এখানে প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। নির্দিষ্ট সংখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ এ-সব রিভিউ-কে প্রবন্ধরূপে গণ্য করা বাতুলতা। কিংবা যে-সব সমস্যা নিয়ে বড়ো বড়ো প্রবন্ধ লেখা হচ্ছে তার টুকরো বিশ্লেষণকে আমরা প্রবন্ধ নাম দিতে পারি না। আমরা লঘু মন নিয়ে এ-সব প্রবন্ধ পড়ি। সংবাদপত্র জগতের একটি চমৎকার কথা আছে— এটা পাঠক 'খাবে'। পাঠক খাওয়ানোর জন্য নিমন্ত্রণ কর্তা যে আয়োজন করেন তা মনকে চাঙ্গা রাখার জন্য। অনেক রমণীয়, রম্য, লঘু এক জাতীয় লেখা প্রবন্ধের নামে বাজারে চলে গেছে, যাচ্ছে। বিচার আর প্রবন্ধ এক বস্তু নয়। কিন্তু এইভাবেই কখনো কখনো প্রবন্ধ তৈরি হয়ে যায়। এক সময়ে রম্য রচনা বলে যে প্রবন্ধ আমরা পড়েছি তা সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ আগ্রহে ছেপেছেন। বাংলা সাহিত্যের এই শাখাটি এখন কিঞ্চিৎ দুর্বল হয়ে পড়েছে। দৃষ্টিপাত, শীতে উপেক্ষিতা, দেশে বিদেশে, বিচিত্র উপল জাতীয় রচনার সাক্ষাৎ এখন কোটিকে গোটিক। সাগরময় ঘোষের সম্পাদনায় 'পরম রমণীয়' অথবা কল্যাণকুমার দাশগুপ্তের উদ্যোগে সংকলিত' হালকা মেঘের মেলা'য় যে-সব লঘু প্রবন্ধ পাই সেরকম প্রবন্ধের সাক্ষাৎ কদাচিৎ মেলে। এই প্রসঙ্গে শঙ্খ ঘোষের 'ঘুমিয়ে পড়া এলবাম' (১৯৮৬)-এ কিছু বিদেশী মানুষের চকিত চিত্র পাওয়া যায়। এই মানুষগুলির পরিচয়সূত্রে মাঝে মাঝে শঙ্খ জীবনযাপনের গভীর জিজ্ঞাসায় ডুবে যান। সেই জিজ্ঞাসা আমাদের তৃপ্তি দেয়। ভবতোষ দত্ত তাঁর 'আটদশক' আর 'সাত সতেরো' গ্রন্থ দুটিতে স্মৃতিরোমন্থন করেছেন, তাঁর কালের কথা বলেছেন, একালের সমস্যাও উত্থাপন করেছেন। তাঁর কোনো প্রবন্ধে

সমাজজিজ্ঞাসার সঙ্গে মিলেছে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার স্মৃতি। ভবতোষবাবুর রসিকতা বোধ আমাদের মধ্যে জাগায় এক পরম আনন্দ। প্রমথনাথ বিশী এক জাতীয় হাস্যরসকে বলেছিলেন স্মিত রস। ভবতোষবাবুর লেখায় সেই রসের ঝরনা।

সংবাদপত্রের প্রসঙ্গে আমাদের নিখিলকুমার সরকারের 'কেয়াবাৎ মেয়ে' (১৯৮৮) বা 'মেটিয়াবরুজের নবাব' (১৯৯১) গ্রন্থদুটির কথা মনে পড়বে। নিখিলবাবু বলেছেন 'এ বই ('কেয়াবাৎ মেয়ে') অবশ্যই নারী-প্রগতির ধারাবাহিক ইতিহাস নায়। গত দুই শতাব্দের কয়েকটি খণ্ডচিত্র। সবগুলো মিলিয়ে দেখলে সেকালের ভাবলোকের একটি আভাস মিলে এই যা'। নিখিলবাবু কালীঘাটের পট, সেকালের চিত্রীর আঁকা ছবি, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানকে আশ্রয় করে সে সময়ের নারীর ভূমিকা নির্ধারণ করতে চেয়েছেন। তিনি ঊনবিংশ শতাব্দের বুদ্ধিজীবীর মুখোশটি সরিয়ে যথার্থ চেহারাটিকে অনাবৃত করেছেন এই গ্রন্থে। সচিত্র এই গ্রন্থটিতে কিছু দুষ্প্রাপ্য ছবি দিয়ে তিনি গ্রন্থটির মর্যাদা বাড়িয়েছেন। সাংবাদিকের মতোই তিনি তথ্যের পর তথ্য সাজিয়েছেন, বিশেষ কোনো মন্তব্য তিনি করেন নি। যে ছবিটা এ বইতে ফুটে ওঠে তা হল কলকাতার ভদ্র নাগরিক জীবনের সমারোহের তলায় যে নির্যাতন, ব্যভিচার, ধর্মের নামে বজ্জাতি চলছিল তার চালচিত্র।

নয়

সাব-অলটার্ন শব্দটির অর্থের পরিবর্তন অক্সফোর্ড অভিধানে ধরা আছে। সমরবিভাগের নিম্নস্থানীয় কর্মচারী হচ্ছেন সাব-অলটার্ন। আমরা বাংলায় তাকেই নিম্নবর্গ বলে অভিহিত করেছি। এই নিম্নবর্গের প্রসঙ্গ আগে একবার বলেছি। ইতিহাসচর্চায় (অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক ইত্যাদি) কথাটি বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। অশীন দাশগুপ্ত তো তাঁর বক্তৃতায় 'ইতিহাস ও সাহিত্যে' (১৯৮৯) এই বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। ইরফান হাবিব এই গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত নন। এ বিষয়ে পরে আর একটু বলবার আছে।

নিম্নবর্গের দিনযাপনের ইতিহাস সংগ্রহ করা একটি দুরূহ কর্ম। আমাদের বাংলার ইতিহাসে নিম্নবর্গের কথা খুব কমই আছে। ক্ষেত্র অনুসন্ধান করে নিম্নবর্গের পরিচয় দিয়েছেন সাম্প্রতিক কালে সুধীর চক্রবর্তী। তিনি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তার ক্ষেত্র অনুসন্ধানের ফলাফল প্রকাশ করেছেন, এখনো করছেন। তাঁর গবেষণগ্রন্থ 'সাহেবধনী সম্প্রদায় তাদের গান' (১৯৮৫) তাঁরই ভাষায় 'history from below'। এই বইতে পাব এক সম্প্রদায়ের 'অস্তিত্ব ও সংগ্রাম, প্রতিবাদ ও পলায়ন, ধর্মগত শ্রেণীবিন্যাসের উলটো ছক, কবচ-তাবিচ মন্ত্র-তন্ত্র আর সহজ প্রজননতত্ত্ব'। গত পঁচিশ বছরে লোকসংস্কৃতির প্রতি যে আগ্রহ দেখা দিয়েছে সুধীরবাবু ঠিক তার দ্বারা উৎসাহিত নন। তিনি বাঙালির জীবনযাপন, পরিবার সমাজের গড়ন আবিষ্কার করতে চান সম্প্রদায়ের ইতিহাসের মধ্যে। মুসলমান অধ্যুষিত গ্রামে গিয়ে তিনি একঘর হিন্দু পরিবারের অস্তিত্বের খবর পান। সেই পরিবারের একজন মৃতব্যক্তিকে দাহের ব্যবস্থা করেন মুসলমানেরাই, তাঁরাই কাঁধ দেন। আর্থসামাজিক প্রয়োজনেই মানুষে মানুষে মেলবন্ধন। ধর্ম সেখানে প্রতিবন্ধক হয় না। সাম্প্রদায়িক ভাবনাকে নিয়ে বহু প্রবন্ধ লেখা হয়েছে। বহু সেমিনার করা হয়েছে কিন্তু সুধীরবাবুর এই দৃষ্টান্তমূলক প্রবন্ধটি অনেক বেশি জোরালো।

সুধীর চক্রবর্তী দেখেন কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীর আর্থসামাজিক রূপ। শতচ্ছিন্ন জীবনযাপনেও নিজেদের ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখার প্রচেষ্টার করুণ চিত্র রচনা করেন সুধীর। আসলে কালীঘাটের পট যেদিন যামিনী রায়ের চিত্রে মর্যাদা পেল সেদিন এলিট বাঙালি এই চিত্রকলাকে বরণ করে নিল। প্রবন্ধপাঠকেরা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন, দেশলাই বাক্সের মতো ফ্ল্যাটে এখন যে চিত্র শোভা পায় তা ড্রয়িং রুমের কালীঘাটের পট। সাব-অলটার্ন প্রাবন্ধিকবৃন্দ কালীঘাটের পটে দেখতে পান জীবনের ছন্দ, কৌতুকবোধ, জীবনযাত্রার সুস্থ স্বাভাবিক গতিচ্ছন্দ।

শিল্পচর্চায় শিল্পীর জীবনযাপন এঁদের প্রবন্ধে উঠে আসে । সেখানে. দেখতে পাব বর্তমান বিশ্বজুড়ে যে সংকটের ভাবনাকে তাঁরা আবিষ্কার করেছেন তাঁরা পাশাপাশি লোকজীবনের মানসিকতায় পান এক ধরনের গভীর প্রীতি । এই প্রীতিই বঙ্কিমচন্দ্র-কথিত সুখের মূল ।

নিখিল সরকার জাপানের চিত্রকলা এবং জাপানী বিশেষজ্ঞের প্রসঙ্গে বলেছেন 'জাপানের সামাজিক-অর্থনৈতিক নকশা তখন তছনছ হয়ে গেছে (অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দ) । নতুন টৌকিওতে ছিন্নমূল মানুষের ভিড় । পুরানো সম্ভ্রান্তরা বিপন্ন । সহরে নব্যধনীদের আধিপত্য । দ্রুত মূল্যবোধ বদলে যাচ্ছে । ধনিক-বণিক নাগরিকেরা বিলাসিতায় মত্ত । সেই চলমান অসার জগতের ছবিই সেদিন ধরতে চেয়েছিলেন টৌকিওর শিল্পীরা । সে-সব ছবিতে লেখা হয়ে আছে নবীন নগরে নবযুগের নায়ক-নায়িকা সংবাদ' । এবং তাদের ভোগলালসার নির্লজ্জ নির্মম ইতিহাস । লেখকের সিদ্ধান্ত (শান্ত দত্ত, 'কালীঘাট পটস অ্যাণ্ড উকিও-ই প্রিণ্টস') একশো বছর পরে কলকাতায় প্রায় একই জীবনের প্রবাহ । এবং কালীঘাটের পটে যেন টৌকিওরই ছবি । এ-সব ছবিতে অমাবস্যার গান । এ ছবির রূপসীদের পরিচয় একটাই, 'পণ্যা' । নিখিল সরকারের এই অভিমত বোধ করি মার্কসবাদীরা এখন ভেবে দেখবেন।

ধনঞ্জয় দাশ তাঁর 'মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক' (প্রথম খণ্ড, ১৯৭৫) পর পর তিনটি খণ্ডে প্রকাশ করেন তখন লেখাগুলি আগের আগের পর্বের হলেও এই সময় তার মূল্য আরো বেড়ে যায় । ধনঞ্জয় দাশের বইটির চতুর্থ খণ্ড 'বস্তুবাদী সাহিত্যবিচার ও অন্য মত' (১৯৭৬) কিছুদিনের মধ্যেই বেরিয়ে যায় । ধনঞ্জয় দাশ বুঝেছিলেন মার্কসবাদ সমীক্ষা এই সময়ে জরুরি । বস্তুত যুক্তফ্রন্ট তো মার্কসবাদ তত্ত্বেরই ফলিত রূপ (এমন মনে হয়েছিল অনেকের) । যাই হোক, প্রধানত বিতর্কের বিষয়টি দাঁড়িয়েছিল মার্কসবাদের অনুসরণে রচিত সাহিত্য নান্দনিক তত্ত্বের দিক থেকে কতটা গ্রহণযোগ্য ? মার্কসবাদী সাহিত্যই কি একমাত্র সাহিত্য? 'বিশুদ্ধ রসবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর সংঘাতের স্মরণীয় ফসল' বলে চিহ্নিত করেছেন লেখাগুলিকে সম্পাদক । আবু সয়ীদের বক্তব্য ছিল 'সাহিত্যের কাজ হচ্ছে সামাজিক সত্তাকে আর্টে'র মাধ্যমে প্রতিফলিত করা— এ কথা ঠিক । কিন্তু সাহিত্য এবং শিল্পকলা মাত্রে আমরা পাই বাস্তব সত্তার রূপায়ণিক অভিব্যঞ্জনা । সমাজই একমাত্র বাস্তবসত্তা নয় । ওয়ার্ডসওয়ার্থের রহস্যঘন প্রকৃতি, চেখভ কিংবা হেনরি জেমসের কথাসাহিত্যে ব্যক্তিচেতনার যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সত্তা অভিব্যক্ত—রসের বিচারে এদের বাস্তবতাও অগ্রাহ্য নয়' । নীরেন্দ্রনাথ রায়ের স্পষ্ট জবাব 'আত্মেতর সামাজিক বাস্তবতার প্রতিফলন— এই সূত্রানুযায়ী, মার্কসীয় পদ্ধতিতে বিচার করিলে সাহিত্যের অর্থাৎ কবিতা, নাটক, উপন্যাস প্রভৃতির মূল্যবিচার অনেকখানি নির্ভরযোগ্য হয়ে ওঠে' । সেই বিতর্কের ঝড়ঝপটা কিন্তু এখনো চলছে । ধনঞ্জয় দাশই অনুষ্টুপ (১৯৯১) পত্রিকার 'বাংলার সংস্কৃতিতে মার্কসবাদী চেতনার ধারা' বিশেষ সংখ্যাটি সম্পাদনা করেছেন । এখনকার প্রাবন্ধিকদের সামনে মার্কসবাদের আলোচনা আরো জটিল সূক্ষ্ম কূট বিষয় । আগেই বলেছি পূর্ববর্তী বিতর্কের তুলনায় অনুষ্টুপের লেখকবৃন্দের রচনা কিঞ্চিৎ নীরেস ।

ইতালির কমিউনিস্ট নেতা গ্রামসি কোনো কোনো বাংলা প্রবন্ধে ধরা পড়েছেন। অশোক সেন, সুনীল সেনগুপ্ত গ্রামসির Socialist Hegemony তত্ত্বকে ভারতীয় প্রেক্ষাপটে স্থাপন করতে চাইছেন । গ্রামসি মার্কস, লেনিনের বিরোধী নন । কিন্তু গ্রামসি একটু অগ্রসর হয়ে বলেন একমাত্র সর্বহারা শ্রেণীর কৃষক-মজুর প্রকল্পের পরিবর্তন রূপায়ণের মধ্যেই আমাদের বদ্ধ থাকলে চলবে না । সমাজে শ্রেণী নয়— এমন কিছু প্রতিষ্ঠান, দল, উপদল, মতবাদ আছে যাদের মধ্যে বিপ্লবী চিন্তার অভাব নেই । প্রগতির সঙ্গে অগ্রগতির অদ্ভুত অবস্থান সেখানে । গ্রামসি বলেন এদের সম্বন্ধে বিশেষভাবে ভাবতে হবে । উদাহরণ দিয়ে বলা যেতে পারে, হিন্দু সমাজে বিশেষ বিশেষ জাতের বন্ধন আছে । জাতের বন্ধন সমাজে কতকগুলি দল-উপদলের সৃষ্টি করেছে । 'হরিজন' আখ্যা দিয়ে এদের সমস্যার সমাধান হবে না । এদের নৃতাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক জীবন এবং এদের ঘৃণা আর

ভালোবাসার স্বরূপটি পুরোপুরি বুঝতে হবে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের পুরো ইতিহাস জানতে হবে। বিশ্লেষণ করতে হবে। গ্রামসির এই চিন্তা নিঃসন্দেহে বুদ্ধিজীবীদের অনুধাবন করার বিষয়। সুখের বিষয় বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা এই সম্পর্কে ইংরেজি-বাংলা উভয় ভাষাতেই প্রবন্ধ লিখছেন। সম্প্রতি প্রকাশিত জয়া মিত্রের প্রবন্ধে "এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা" (প্রতিক্ষণ, শারদীয় ১৩৯৯) নিম্নবর্ণের এই ইতিহাস বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিতে চমৎকার বিশ্লেষিত হয়েছে।

দশ

মার্কসবাদ আমাদের ইতিহাসচিন্তায়ও প্রসারিত। যদুনাথ সরকার, রমেশচন্দ্র মজুমদার, হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী, ইউ. এন. ঘোষাল, কালিদাস নাগ, অতুলচন্দ্র গুপ্ত যাঁরা বাংলায় কম-বেশি লিখেছেন সে পর্ব বোধ করি পার হয়ে গেল। এঁদের সকলেই গিবন, র‍্যাঙ্কে, অ্যাকটনকে জানতেন। তাঁদের ঐতিহাসিক বিবরণ মনোযোগ দিয়ে পড়েছেন এবং র‍্যাঙ্কে, অ্যাকটনের ইতিহাস তত্ত্ব সম্বন্ধেও অভিজ্ঞ ছিলেন। কলিংউড ইতিহাসচর্চার যে দর্শন আবিষ্কার করতে চেয়েছিলেন তাঁর বইতে (*The Philosophy of History*) ইতিহাস রচনার পদ্ধতি-প্রকরণের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়, তাতে আমরা দেখতে পাই কী করে তথ্যের বিন্যাসে এবং তত্ত্বনিষ্কাশনে ব্যক্তিগত এবং রাষ্ট্রনীতির চাপ কাজ করে। বঙ্কিমচন্দ্রও ইংরেজসৃষ্ট ভারতের ইতিহাসকে মিথ্যা বলে অগ্রাহ্য করেছিলেন। প্রবোধচন্দ্র সেন 'বাংলার ইতিহাস সাধনা' গ্রন্থে বাঙালির ইতিহাসচর্চার সংক্ষিপ্ত অথচ তাৎপর্যময় বিবরণ দিয়েছেন। আমরা গত পঁচিশ বছরে এবং তার কিছু আগে থেকেই ইতিহাসচর্চায় নূতন পদ্ধতি গ্রহণের আগ্রহ দেখি। দ্বান্দ্বিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে ইতিহাস এগিয়ে চলেছে— এই মতবাদকে গ্রহণ করার প্রবণতা এখন লক্ষ করি। ডি. ডি. কোশাম্বির গ্রন্থ একালের ঐতিহাসিকদের নজর কেড়েছে। জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে রমিলা থাপার, আর. এস. শর্মা, বিপান চন্দ্র নতুন গোষ্ঠী তৈরি করলেন ঐতিহাসিক ভাবনার ক্ষেত্রে। অন্য দিকে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃত্বে বামমতবাদ-ঘেঁষা ইতিহাসচর্চা শুরু হল। এ-সবের প্রচণ্ড প্রভাব বাংলার ইতিহাসচর্চায় এসে পড়ল। এর সঙ্গে যুক্ত হল History from below মতবাদ। ই. এইচ. কার তাঁর 'হোয়াট ইজ হিস্টরি' গ্রন্থে একটি চমৎকার মন্তব্য করেছিলেন এই বলে যে একদা কোনো ইতিহাস গ্রন্থে যে ঘটনা বা তথ্য পাদটীকায় স্থান পেয়েছিল, পরবর্তী কোনো ঐতিহাসিকের গ্রন্থে সেই তথ্যই প্রধান বিষয়ের মর্যাদা পেয়ে গেল। কোশাম্বি, রমিলা থাপার প্রমুখ ঐতিহাসিক আলোচনায় নৃতত্ত্ব, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যতত্ত্বকে বিশেষ গুরুত্ব দেন। প্রজনন সংক্রান্ত প্রাচীন ধ্যানধারণাকে কোশাম্বি নৃতত্ত্বের গভীর জ্ঞান নিয়ে পরীক্ষা করেন ভারতবিদ্যার উম্মোচনের ক্ষেত্রে। রমিলা থাপার লক্ষ করেন সামন্ততন্ত্র, ধনতন্ত্রের বিকাশকে। ইরফান হাবিব মোগল যুগের ভূমিব্যবস্থা ও কৃষকের জীবনযাপনকে আবিষ্কার করেন বামপন্থী মনোভাব নিয়ে।

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলায় ভারতের ইতিহাসচর্চায় মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গির আশ্রয় নিয়েছিলেন। এবং প্রগতিশীল চিন্তা করতেন বলেই তিনি অতীত ভারতের সম্বন্ধে আমাদের সংস্কারকে আঘাত করেছেন, এবং সুযোগসন্ধানী সমাজবেত্তাদের আঘাত করেছেন সত্য ইতিহাস উদ্‌ঘাটন করে।

ইরফান হাবিবের অনুগামী গৌতম ভদ্র। গৌতম ভদ্র মার্কসবাদী চিন্তার পটভূমিকায় লিখেছেন 'মুঘল যুগে কৃষি অর্থনীতি ও কৃষক বিদ্রোহ' (১৯৮৩)। লেখাগুলি 'এক্ষণ' এবং 'অন্য অর্থ' পত্রিকায় যখন প্রকাশিত হয় তখনই ইতিহাসচর্চার নূতন রূপটি ধরা পড়ল বাঙালির কাছে। গৌতম এ সময়ের ইতিহাসচর্চায় অসমতা এবং অসম্পূর্ণতা লক্ষ করেছেন। তিনি নূতন তথ্য সংগ্রহ করেছেন। আর প্রাপ্ত তথ্যকে নূতনভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। এইভাবেই তাঁর বই তৈরি হয়। তিনি ফারসি-জানা মানুষ। ফলে মুঘল যুগ সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞানচর্চা বেশ গভীরে পৌঁছে যায়। তিনি এক সময়ে 'সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোস্যাল সায়েন্স'-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই সংস্থাটি

জ্ঞানচর্চায় বাংলার বুদ্ধিজীবীদের একসময়ে টেনে নিয়েছিল । সোস্যাল সায়েন্সের পরিধিকে এই সংস্থা নূতন নূতন মাত্রায় সমৃদ্ধ করেছিল । তিনি তাঁর নিজস্ব পদ্ধতিতে গবেষণা করেছেন ; শোষক আর শোষিত এই টানাপোড়েন লক্ষ করেছেন মুঘল ইতিহাসে ; ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাস ব্যাখ্যা এবং মার্কসের ভারত ইতিহাসচর্চার সূত্রগুলির অনুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন । এইভাবে গৌতম মার্কসের 'এশিয়াটিক সমাজে'র তাৎপর্য আবিষ্কার করেন । মার্কস বলেছিলেন এশিয়ার সমাজব্যবস্থা স্থাণু, আর সাম্রাজ্যবাদ সামন্ততন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য ভারতের ইতিহাসের সামন্ততন্ত্রের প্রশংসা করেছিলেন । পরে নিজেদের প্রয়োজনেই যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিপ্লব ঘটিয়ে (যা মার্কসের প্রশংসা পেয়েছিল) সেই ব্যবস্থার মূলে আঘাত হেনেছিলেন । গৌতম বলেছেন ভারতের কৃষিব্যবস্থা সবটাই স্থাণু ছিল না । অন্তত গ্রামের উৎপন্ন দ্রব্য যে শহরে চলে আসত এবং ব্যবসাবাণিজ্যে গ্রামেও একটা ভূমিকা ছিল গৌতম তথ্য দিয়ে তা প্রমাণ করেছেন । গ্রামের শিল্প ও কৃষির মধ্যে যে ঐক্যবন্ধন ছিল মার্কসের এই মতের গুরুত্ব দিয়েছেন গৌতম । অনেক আগে প্রকাশিত তপন রায়চৌধুরীর 'বেঙ্গল আণ্ডার আকবর অ্যাণ্ড জাহাঙ্গীর' বইটির সমালোচনা করেছেন গৌতম । ভারতের কৃষক বিদ্রোহের চরিত্রঅঙ্কনে দক্ষ গৌতম । গৌতম ভারতের দুর্ভিক্ষের যে বিবরণ দিয়েছেন তা তাঁর বইয়ের ভূমিকা বলা যেতে পারে । জায়গীরদার, পাটোয়ার, সম্রাট, সুলতানদের শোষণের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়েছেন তিনি। আর এই নির্মম শোষণের পরিণাম ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ । আমলাতন্ত্রের কূটকৌশল সম্বন্ধেও তিনি অবহিত । হুকুম তামিল করাবার এই যন্ত্রটির রন্ধ্রে রন্ধ্রে শনির প্রবেশ । গৌতম ইতিহাসে উপেক্ষিত জনগণের কথাই বলতে চেয়েছেন । বলা বাহুল্য এলিটিস্ট মনোভাবকে গৌতম তীব্র আঘাত হেনেছেন তাঁর বইতে । মার্কসীয় অর্থনীতি ও সমাজজিজ্ঞাসা গ্রন্থটির পরিকল্পনায় জড়িয়ে আছে । বাংলা ভাষায় মধ্যযুগের ইতিহাসচর্চায় এরকম বই আমরা আগে পাই নি ।

ইদানীং গৌতম তাঁর বিদ্যাচর্চাকে সমাজচর্চার আরো জটিল রহস্যের দিকে প্রসারিত করছেন । সাব-অলটার্ন তত্ত্ব এবং গ্রামসির তত্ত্বকে তিনি সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন 'নারকেলবেড়ের জঙ্গ : তিতুমীর' (১৩৯৬) প্রবন্ধে । গৌতম বলেছেন সামন্ততান্ত্রিক সমাজ নিম্নবর্গের মানুষের জীবনযাপনের নানা ক্ষেত্রে উচ্চকোটির মানুষ নিরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করে । নানা প্রতিষ্ঠান 'নানা চিন্তা অনুষ্ঠান' আর নৈতিক আচরণের মাধ্যমে, প্রথার নিগড়ে উচ্চকোটি নিয়ন্ত্রণের সূত্রগুলি নিজেদের হাতে রাখার চেষ্টা করে । গ্রামসির সোস্যাল হেজিমোনির প্রসঙ্গই ছিল এই । মার্কসীয় শ্রেণীসংগ্রামের ব্যাপার নয়— গৌতম বলেন 'এই পর্যায়ে লড়াই স্তরভিত্তিক ক্ষমতা বনাম সম্প্রদায়ভিত্তিক ক্ষমতার বিরোধ ত' বটেই আবার নূতন গড়ে ওঠা সম্প্রদায়ও নিজের মধ্যে ধরে রাখে স্তরভিত্তিক ক্ষমতার নানা ধারণা । গৌতম অত্যন্ত কঠোর ভাষায় বলেন 'উপনিবেশের শাসন সৃষ্টি করে এক ত্রিশঙ্কুর জগৎ, যেখানে সবই উল্টো । তাই "উদারনীতিবাদ" আর "যুক্তিবাদে" সিদ্ধ "ভারত-পথিক" রামমোহন তাঁর সব তীক্ষ্ণ সমালোচনা আর দ্বিধাদ্বন্দ্ব নিয়েও ইংরেজ শাসনেই ভারতের ভবিষ্যৎ দেখেন, ইংরেজ সুবিচারে তাঁর আস্থা অটুট থাকে ।' গৌতমের বক্তব্য সোজা ও সরল । কিন্তু গৌতম যে রামমোহনের 'তীক্ষ্ণ সমালোচনা' এবং 'দ্বিধা দ্বন্দ্ব' লক্ষ করেছিলেন তার কি কোনো মূল্য নেই । আমাদের অনেকের রামমোহনের প্রতি শ্রদ্ধার কারণ এই কারণেই ।

বিনয় চৌধুরী চমৎকার ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ এবং তথ্যসহযোগে বিচার করেছেন ধর্মসম্পৃক্ত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের, বিদ্রোহের কারণ, উদ্ভব, বিকাশ ও ব্যর্থতার সূত্রগুলি । 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় 'ধর্ম ও পূর্বভারতে কৃষক আন্দোলন' প্রবন্ধমালায় গবেষণার বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন বিনয় চৌধুরী । বিনয়বাবু স্তরভিত্তিক ও সম্প্রদায়গত ব্যাপার লক্ষ করেছিলেন । কিন্তু গৌতম ভদ্রের মতো তীক্ষ্ণকণ্ঠ তিনি নন । গৌতমের রচনায় তরুণের বিদ্রোহ, বিনয়বাবুর রচনায় প্রৌঢ়মনের ধীরতা । কিভাবে এক-একটি সম্প্রদায় ধর্মকে কেন্দ্র করে দল গড়ে এবং ধর্মের উপর আঘাত এলে বিষয়টি গণ্ডি অতিক্রম করে রাজনৈতিক মাত্রা পেয়ে যায় বিনয়বাবুর বিশ্লেষণে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে । আমরা বুঝি ইতিহাসচর্চায় নিম্নবর্গীয় মানুষের জীবনযাপন, বিশ্বাস, প্রথা-সংস্কার, ধর্ম ইত্যাদি কতটা জরুরি হয়ে ওঠে

ইতিহাসবিদের কাছে ।

এই সূত্রেই রণবীর চক্রবর্তীর 'প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে' (১৩৯৮) বইটির উল্লেখ করতে হয় । কখনো কখনো ভারতের জনজীবনের চিত্র ঐতিহাসিকবৃন্দ আলোচনা করেছেন ধর্মশাস্ত্র অবলম্বনে । দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের লোকায়ত দর্শন ও লোকায়ত জীবনচর্যার আলোচনায় প্রাচীন ভারতের জনগণের একটি রূপ ফুটে উঠেছিল । অর্থনীতির সঙ্গে ইতিহাসের গূঢ় এবং প্রত্যক্ষ যোগসূত্রটি এখন ইতিহাসবিদদের অন্যতম চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে । নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ এক সময়ে বাংলার অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দের শিল্পব্যবস্থার আলোচনা করেছিলেন । সে বই ইংরেজিতে লেখা । ইতিহাস আলোচনায় অর্থনীতির গুরুত্ব একালের বিদ্যাচর্চারই বিশেষ প্রবণতা । এর ফলে ইতিহাসচর্চায় একটি নিরূপিত দৃষ্টিকোণ তৈরি হয় । রণবীর তাঁর গ্রন্থে কোনো মৌলিক সিদ্ধান্তে পৌছান নি । প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক জীবনের একটি সামগ্রিক চিত্র উপস্থিত করাই তাঁর উদ্দেশ্য । রণবীরের ইতিহাসচর্চার আদর্শ ইরফান হাবিবের কাছাকাছি । রণবীর প্রাচীন ভারতীয় অর্থনৈতিক জীবনে 'গতিময়তা' এবং পরিবর্তনশীলতা লক্ষ করেছেন যা কৃষি ও শিল্প, গ্রাম ও নগরায়নের পাশাপাশি একে অপরের নির্ভরশীলতায়, কখনো কখনো মৃদুমন্দ বিরোধকে গ্রহণ করে অগ্রসর হয়েছে । রণবীরের ভাষায় 'কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, নগরায়ন সব দিক দিয়েই আদি মধ্যযুগ এবং সৃজনশীল ও উৎপাদনশীল পর্ব, যার প্রভাব মধ্যযুগের রাজনীতি সমাজ ও অর্থনীতির উপর বর্তেছিল ।' এখন আমরা গৌতম ভদ্রের সিদ্ধান্ত ও রণবীরের জোরালো মতকে বিচার করতে পারি । গৌতম মার্কসের 'স্থাণু' এশিয়াটিক সমাজকে স্বীকার করেন নি । রণবীর তো অর্থনীতিতে সচলতাকেই লক্ষ করেছেন । অবশ্য বই দুটি পরিপূরক হিসাবে আমরা দেখতে পারি না । রণবীরের উদ্দেশ্য সন্ধান, গৌতমের উদ্দেশ্য বিদ্রোহের প্রেক্ষাপটে মুঘল যুগের কৃষকের ভূমিকা ।

অথচ সমকালীন ইতিহাসচর্চার এই প্রবণতা থেকে অমলেশ ত্রিপাঠী নিজেকে বেশ খানিকটা দূরে দূরে সরিয়ে রেখে লিখলেন 'স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস' (১৮৮৫-১৯৪৭) বইটি । বইটির প্রকাশ (১৩৯৭), এর আগে 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হচ্ছিল । সে সময়েই কিছু বাদ-প্রতিবাদের সৃষ্টি হয়েছিল । অমলেশবাবু সে বিতর্কে যোগ দেন নি । গ্রন্থের ভূমিকায় সেই বিতর্ককে স্মরণে রেখে কিছু মন্তব্য করেছেন । কেমব্রিজ ইতিহাসের ভারতীয় সংগ্রামের ইতিহাসকে তিনি নাকচ করে দিয়েছেন । সাব-অলটার্নদের সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য, নঞর্থক ইতিহাস রচনায় তাঁরা আগ্রহী। সাব-অলটার্নদের মতামত 'জাতীয় সংগ্রাম ঔপনিবেশিকতাবাদ ও ভারতীয় জনগণের সংগ্রাম নয়, বিদেশী ও স্বদেশী এলিটদের সঙ্গে নিম্নবর্গের সংগ্রাম'।— এই বক্তব্যে অমলেশবাবু অনেক ফাঁকফুকর দেখতে পান । তিনি মনে করেন, অনেকক্ষেত্রে নিম্নবর্গ এলিটের সংগ্রামের মধ্যেই নিজেদের আশা-আকাঙ্ক্ষা খুঁজে পেয়েছে । নিম্নবর্গীয় ইতিহাস রচনায় স্ট্রাকচারলিস্ট পদ্ধতি কখনো কখনো বাঁশবনে ডোম কানা হয়ে যায় । অমলেশবাবুর স্পষ্ট মত 'আমার বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা পুরাতন জাতীয়তাবাদীর কংগ্রেস ভজনা এবং কেমব্রিজ গোষ্ঠী নিম্নবর্গীয় ঐতিহাসিক গোষ্ঠী, যান্ত্রিক মার্কসবাদী বা তার শোধিত সংস্করণের কংগ্রেস নিন্দা উভয় পক্ষই পরিহার করেছে' । অমলেশবাবুর ভাষ্যেই বলা যায় তিনি 'এম্পিরিসিস্ট' । সংখ্যাতত্ত্বের উপর অনেকটা নির্ভর করেন তিনি । নিম্নবর্গীয়েরা যে সংস্কৃতিকে উপেক্ষা করেন, অমলেশবাবু সেই High Culture-কে অবিশ্বাস করেন না । বরং তার আলেখ্য তাঁর গ্রন্থে মর্যাদার সঙ্গে স্থান পায় । কংগ্রেসের ইতিহাস মানে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস । তিনি ১৯৪৭ পর্যন্ত কংগ্রেসকে বিভিন্ন মতবাদের প্ল্যাটফর্ম বলেই চিহ্নিত করেছেন । আদর্শগত বিরোধ থাকলেও সকলেই চেয়েছিলেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদ । অমলেশবাবুর গ্রন্থের সঙ্গে সুমিত সরকারের 'মডার্ন ইণ্ডিয়া' বইটির তুলনা করা সমীচীন হবে না, বোধ হয় । তবে সুমিতের বইয়ের সঙ্গে অমলেশ ত্রিপাঠীর রচনার মৌল পার্থক্য হল সুমিত সরকারি ও বেসরকারি তথ্য সংগ্রহ করে জনগণের অস্থিরতা, বিপর্যস্ত মানসিকতার উপর বেশি গুরুত্ব দেন । সুমিত ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা,

শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রাম এবং তাদের সংগঠনের কথাকে খুঁটিয়ে বিচার করেন। বিশেষভাবে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে (পূর্ববঙ্গের প্রসঙ্গ বিশেষভাবে) ছোটোখাটো উত্থানের প্রসঙ্গ টেনে আনেন তাঁর লেখায়। রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' বইয়ের দাঙ্গার উদ্‌ভবের ইতিহাস ও বিশ্লেষণ যে অলীক নয় পূর্ববঙ্গে বার বার দাঙ্গার বিবরণ দিয়ে সুমিত সে কথা প্রমাণ করেছেন। এলিটদের রচনানীতিতে যে হঠকারিতা, চাটুকারিতা, স্বার্থপরতা ছিল সুমিত তা পরতে পরতে খুলে দেখান। অমলেশবাবুও এ-সব প্রসঙ্গ এনেছেন। অমলেশবাবু গান্ধী-নেতৃত্বের বেশি মনোযোগী। সুমিত সরকার গান্ধীজীর নেতৃত্বকে খাটো করেন নি। সুমিত দেখিয়েছেন গান্ধীর নেতৃত্বে সারা ভারত কী প্রচণ্ডভাবে বিস্ফোরিত হয়েছিল। সুমিত চা-বাগানের শ্রমিকদের গান্ধীর পদতলে আশ্রয় নেবার ঘটনাটিকে প্রায় প্রতীকের মর্যাদা দিয়েছেন। অমলেশবাবু গান্ধীজীর সাফল্য-অসাফল্যের বিশ্লেষণ করেছেন। গান্ধীজীর অহিংসা আর সত্যাগ্রহ ত্রিপাঠীর কাছে একটি বিরাট অবদান বলে মনে হয়েছে। গান্ধী 'একাই পথ চলতে চেয়েছিলেন। গলগথার পথ। তার শেষে মৃত্যু। কিন্তু পুনরুত্থানও। সেই মহৎ মৃত্যু দেশকে প্রচণ্ড আঘাত দিয়ে মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে সচেতন করে দিয়েছিল। ঐক্য তিনি দিতে পারেন নি কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতার মহান ধর্ম প্রতিষ্ঠা করে গেছেন'। সাব-অলটার্ন ঐতিহাসিক এর কী জবাব দেবেন ? অমলেশ ত্রিপাঠীর ভাষার শিল্পশ্রী লক্ষণীয়। মাঝে মাঝে তাঁর কলম ধরেন ভাবুক শিল্পী।

সব্যসাচী ভট্টাচার্যের 'ঔপনিবেশিক ভারতের অর্থনীতি' (১৩৯৬)। সব্যসাচীর গ্রন্থটি সাধারণের কাছে ইতিহাসের জিজ্ঞাসাকে পৌঁছে দেবার প্রচেষ্টা। সব্যসাচী সেই কারণে অ্যাকাডেমিক আলোচনার ছকে থাকেন না। আটপৌরে ভাষায় তিনি একটি বিশেষ সময়ের ইতিহাসকে ধরতে চেয়েছেন। বাংলা ভাষায় এই জাতীয় ইতিহাসচর্চার প্রবন্ধ অত্যন্ত মূল্যবান। অর্থনৈতিক ইতিহাসকে সর্বসাধারণের স্বাদু করে তোলা দুরূহ ব্যাপার। আমাদের ভালো লাগে ১৯৪৭ সালে উপনিবেশবাদের কিভাবে অবসান হল তার সব্যসাচী-কৃত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ। দেশীয় পুঁজিপতি এবং ইংলণ্ডের অর্থনৈতিক উন্নয়ন-অবনয়ন সেইসঙ্গে কৃষক মজুর মধ্যবিত্তের মানসিকতা এমন একটা বাতাবরণ তৈরি করেছিল যার ফলে সাম্রাজ্যবাদের বিদায় অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল। গভীর বেদনার সঙ্গে সব্যসাচী বঙ্কিমচন্দ্রের হাসিম শেখ আর রামা কৈবর্তের প্রশ্ন তুলেছেন। সে প্রশ্ন : তাদের কি উন্নতি হল স্বাধীনতাপ্রাপ্তিতে? সব্যসাচীর উত্তর : 'প্রায় একশ বৎসর আগেকার এই বঙ্কিম উক্তি মনে করিয়ে দেয় সেই অপর উদ্দিষ্ট, সেই অপূর্ণ প্রত্যাশা। সেই দিক দিয়ে বিচার করলে ১৯৪৭ একটা অসমাপ্ত বাক্যে একটা যতিচিহ্ন মাত্র। এখনও সামনে অসমাপ্ত সংগ্রাম'। বাক্যটি থমথমে। প্রতিজ্ঞার বজ্রমুষ্টি।

এগারো

বাংলাভাষায় 'লোকসাহিত্য' শব্দটি কে প্রথম প্রয়োগ করেছিলেন তা খুঁজে বের করা গবেষণা সাপেক্ষ। তবে রবীন্দ্রনাথের 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থটি বাংলার লোকসংস্কৃতি এবং লোকসাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধের ক্ষেত্রে আজও আমাদের আদর্শ হয়ে রয়েছে বলে মনে করি। লোকসাহিত্য গবেষণা এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকাভুক্ত হয়ে বেশ প্রচারলাভ করেছে। সরকারি আনুকূল্যও লোকজীবন সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহলী করে তুলেছে। দীনেশচন্দ্র সেন ইংরেজিতে বড়ো প্রবন্ধের বইও প্রকাশ করেছিলেন। সুকুমার সেনের 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে' লোকসাহিত্যের পরিচয় ভালোভাবেই ছিল। আশুতোষ ভট্টাচার্য লোকসাহিত্য, লোকসংগীত, লোকনাট্যের বিশদ পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি দেশে বিদেশে ছৌ (ছো) নাচের দল নিয়ে শিক্ষিত মানুষের কাছে লোকসংস্কৃতিকে পৌঁছে দিয়েছিলেন। তিনি লোকসংস্কৃতির ব্যাপক প্রচারের এবং গবেষণার জন্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। পরে এ ব্যাপারে বাঙালির আগ্রহ আরো বেড়ে যায়। বেশ-কিছু প্রতিষ্ঠান এখন লোকসংস্কৃতিচর্চায় ক্ষেত্রসমীক্ষা এবং আনুষঙ্গিক নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছেন। লোকসংস্কৃতি-বিষয়ক প্রবন্ধ বিশ্ববিদ্যালয় এবং এই-সব

প্রতিষ্ঠানের গবেষকবৃন্দ তৈরি করছেন।

এখানেও মাঝে মাঝে বিদেশী পাণ্ডিত্য আমাদের কলম চেপে ধরে। রবীন্দ্রনাথ, দীনেশচন্দ্র, রামেন্দ্রসুন্দর, সুকুমার সেনের প্রবন্ধে এ ব্যাপার ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ে লোকসংস্কৃতিচর্চা ঢুকে পড়ার ফলে আমরা 'পাণ্ডিত্যপূর্ণ' রচনার নিদর্শনও পেয়ে যাই। এ-সব লেখার অনেকগুলিই অসার এবং তরল। লেভি স্ট্রাউস থেকে বাতকিন পর্যন্ত— সকলেরই গবেষণা বাংলার প্রাবন্ধিকেরা আত্মসাৎ করতে চাইছেন। 'ফোকলোর' কথাটির প্রকৃত বাংলা কী হবে এ নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। লোকসংস্কৃতি, লোকযান, লোককৃতি ইত্যাদি নানা নামে শব্দটি বাংলাতে পরিচিত। নামকরণের ব্যাপারে সুধীর করণ একদা এগিয়ে এসেছিলেন।

আজীবন লোকসংস্কৃতির চর্চা করেছেন যিনি, বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বিশেষ' পদ্ধতির সঙ্গে যাঁর কোনো পরিচয় ছিল না লোকসংস্কৃতির প্রবন্ধের পরিচয়ে তাঁর নাম প্রথমে মনে আসছে। তিনি হলেন হেমাঙ্গ বিশ্বাস। তাঁর 'লোকসঙ্গীত সমীক্ষা বাংলা ও আসাম' (১৩৮৫) স্মরণীয় প্রবন্ধের বই। হেমাঙ্গ বিশ্বাস লোকসংগীতের উপাদান-উপকরণ সংগ্রহ করেছেন পরিশ্রমী গবেষকের মতো। যেহেতু তিনি 'আমি তোমাদেরই লোক', সেই হেতু তাঁর সংগ্রহকে নির্ভরযোগ্য বলে আমরা স্বীকার করে থাকি। অনেক ক্ষেত্রেই সংগৃহীত উপাদান-উপকরণের সত্যমিথ্যা যাচাই করা দুরূহ। হেমাঙ্গ বিশ্বাস তা জানতেন এবং সংগ্রহের ব্যাপারে তিনি সাবধানও হয়েছিলেন। হেমাঙ্গ বিশ্বাস গণনাট্য আন্দোলনের অন্যতম কর্মী। বামপন্থী সংস্কৃতির আন্দোলনে তিনি প্রথম সারির মানুষ। হেমাঙ্গ বিশ্বাস ভদ্রজনের লোকায়ত জীবনযাপনের কথাকাহিনীর প্রতি অবজ্ঞাকে ভালো চোখে দেখেন নি। আবার বাজারচলিত লোকসংস্কৃতির গবেষকদের প্রতি তাঁর অনাস্থাও প্রকাশ পেয়েছে। আধুনিক রুচির তোষণের জন্য লোকসংস্কৃতির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের তিনি বিরোধিতা করেছেন। বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর প্রতি হেমাঙ্গ বিশ্বাস যেন আস্থা হারিয়েছেন। তিনি বলেছেন ' "আধুনিক রুচি ও রসবোধ" অনুযায়ী লোকসাহিত্য ও সংগীত পরিবেশন করার কথা বলা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত মারাত্মক'। অতঃপর হেমাঙ্গ বিশ্বাস পল্লী পরিক্রমা করেছেন। সে পরিক্রমায় পাণ্ডিত্য বা গবেষণার ভড়ং নেই। তিনি লোকসংগীতে লোকায়ত জীবনের পরিচয় গ্রহণ করে খুশি হয়েছেন। এই তৃপ্তির ছাপ পাই তাঁর গ্রন্থে। সুজিৎ চৌধুরীকে দীক্ষিত গবেষক বলতে সংকোচ হয়। তিনি শ্রীহট্টের মানুষ। পূর্ব ভারতের নানা আদিবাসী, 'অন্ত্যজ'-শ্রেণীর সঙ্গে তাঁর পরিচয়। সে অঞ্চলের লোকবিশ্বাস, কিংবদন্তীর প্রতি তাঁর অপরিসীম টান। নানা সূত্রেই তিনি তাঁদের কাছাকাছি এসেছেন। তাঁরই সমীক্ষা তিনি করেছেন 'প্রাচীন ভারতে মাতৃপ্রাধান্য : কিংবদন্তীর পুনর্বিচার' (মে ১৯৯০) গ্রন্থে। মোট চারটি প্রবন্ধে তিনি মাতৃতান্ত্রিক সমাজের পরিচয় উদ্‌ঘাটিত করেছেন। ১৯৬৩ সালে ফ্রেজারের 'গোল্ডেন বাও' বেরিয়েছিল। এই বইটি তাঁর চিন্তাকে প্রভাবিত করেছে। তিনি বলেছেন যখন লোকজীবনের কিংবদন্তী, জাদুবিদ্যা, ফেটিশিজম, টোটেম টাবু ইত্যাদির সঙ্গে তিনি পরিচিত হচ্ছিলেন তখন তাঁর লোকবিদ্যার জটিল জ্ঞান খুবই সামান্য ছিল। প্রবন্ধ লেখার সময় তিনি অবশ্য এই বিদ্যাকে আয়ত্তে এনেছিলেন। তাঁর সাবিত্রী-সত্যবান : কিংবদন্তীর পুনর্বিচার, কার্তিকেয় : প্রতিহত দেবসেনাপতি, বৃহন্নলা : উৎস ও পটভূমি, প্রাচীন ভারতের মাতৃগোত্র— প্রবন্ধগুলি গভীর চিন্তাপ্রসূত। প্রবন্ধের নামগুলি দেখেই বোঝা যায় সুজিৎবাবু মহাকাব্যে উল্লিখিত চরিত্রগুলির উৎসমূলে পৌঁছতে চেয়েছেন লোকায়ত ভাবনার পটভূমিতে। এবং আদিম (?) মাতৃভাবনা কী সূক্ষ্মভাবে এ-সব চরিত্রের মধ্যে জড়িয়ে মড়িয়ে আছে তার সন্ধানে তৎপর সুজিৎবাবু। একটা সামান্য উদাহরণ দিই— ফ্রেজার বলেছেন ওসিরিসের উৎসব মিশরে পালিত হত কৃষক যখন বীজবপন করবে, ঠিক তার আগে। আর সাবিত্রীব্রতের সময় নির্ধারণও লক্ষণীয়। শালিধানের বীজ বপনের সময় জ্যৈষ্ঠমাস। 'শস্যের প্রাণশক্তির পুনরুজ্জীবন ঘটানোর জন্য' অনুষ্ঠানটি জ্যৈষ্ঠ মাসেই অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ফার্টিলিটি কাল্টের এই এক দৃষ্টান্ত। সুজিৎবাবু ডি. ডি. কোশাম্বিকে মান্য করেছেন, দীনেশ সরকারের থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিয়েছেন আর নির্ভর করেছেন দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের 'লোকায়ত দর্শন'

গ্রন্থটির উপর। এই প্রসঙ্গে সুকুমার সেনের 'রামকথার প্রাক্ ইতিহাস' (১৯৭৭) বইটির কথা মনে পড়ে। কৃষ্ণ লিজেণ্ড সম্পর্কেও তিনি লোকায়ত জীবনের নানা বিশ্বাসকে টেনে এনেছেন। তুলনামূলক লোকবিদ্যার চর্চা বাংলাতে তিনিই প্রথম করেন। তাঁর বিষ্ণু-কৃষ্ণ-কথা, কি এ যক্ষ, লঙ্কাহ্রদ-হ্রদে চণ্ডী কমলেকামিনী, মহাদেবী নিত্যা, হরি-হর, সাদা-কালো দেবতা ও তিন কালী, ধর্মঠাকুরের ইতিহাস, সীতাকথা কি প্রাচীনতর ?— ইত্যাদি প্রবন্ধে বৈদিক-সংস্কৃত ভাবনার সঙ্গে লোকায়ত ভাবনা কিভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে তার ইতিহাস। প্রবন্ধগুলি সংকলিত হয়েছে 'প্রবন্ধাবলী' (১৯৮৪) গ্রন্থে।

এখনকার গবেষকবৃন্দের কেউ কেউ লোকসংস্কৃতি বিচারে পারদর্শী। ক্ষেত্র পরিক্রমা করে উপাদান সংগ্রহ করার কাজে অনেকে দক্ষ। বিদেশে এই ধরনের কাজকর্মের সঙ্গেও তাঁরা পরিচিত হয়েছেন। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে লোকসংস্কৃতি বিভাগ খোলা হয়েছে। আমাদের প্রত্যাশা হয়তো এতে কিছু পূরণ হল। সুধীর করণ একদা একাই বাংলার পশ্চিম প্রান্তের লোকজীবন নিয়ে গবেষণা শুরু করেছিলেন। সে কাজ এখনো অসমাপ্ত।

বারো

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার কাজ শুরু হয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দেই। বিংশ শতাব্দে সুকুমার সেন এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে। এখনো তাঁর ইতিবৃত্ত রচনাকর্ম শেষ হয় নি। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিকল্পনা ব্যাপক। পূর্ববর্তী গবেষকদের রচনাকর্মের বিস্তৃত পরিচয় তাঁর গ্রন্থে লভ্য। তিনি ইতিহাস রচনার সঙ্গে সঙ্গে কবিসাহিত্যিকবৃন্দের রচনাকর্মের বিশ্লেষণও করেছেন। সামাজিক ইতিহাসের সঙ্গে সাহিত্যের ইতিহাসের গূঢ় যোগসূত্রটির সন্ধান অসিতকুমারের অন্যতম লক্ষ্য। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত অনেকটা যেন কেমব্রিজ হিস্টরি *অফ লিটারেচারের অনুসরণে রচিত*।

বাংলা ভাষার বৈয়াকরণ পদ্ধতিতে বিচার-বিশ্লেষণের কাজ ঊনবিংশ শতাব্দেই দেখা দিয়েছিল। বিদ্যাসাগরের উদ্যোগ আমাদের মনে পড়বে। রবীন্দ্রনাথের 'বাংলা শব্দতত্ত্ব' আর 'বাংলাভাষা পরিচয়' তো আমাদের দিগ্‌দর্শনী। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'বাংলা ভাষার উদ্ভব ও বিকাশ' গ্রন্থে এবং পরবর্তী কালে বাংলা ব্যাকরণ গ্রন্থে বাংলা ভাষায় ঐতিহাসিক বিবর্তনের সমগ্ররূপটি ধরে দিয়েছিলেন। 'বাঙলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা' গ্রন্থেও তিনি বিষয়টিকে সরল ভাষায় উত্থাপন করেছিলেন।

কিন্তু ভাষাবিজ্ঞানে নোঅম চমস্কির নাম বাঙালি বুদ্ধিজীবী মহলকে আলোড়িত করল। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রথমে চমস্কির ভাষাচর্চার প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না, পরে ও. ডি. বি. এল.-এর তৃতীয় খণ্ডে আধুনিক জেনারেটিভ গ্রামারের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে সুনীতিবাবু তার মূল্য স্বীকার করেছেন। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীরা ঐতিহাসিক প্রকরণটিকে জীর্ণ বলে মনে করেন। পবিত্র সরকার আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের কিছু বাংলা প্রতিশব্দ তৈরি করেছেন। নূতনভাবে তিনি ভাষাচর্চা শুরুও করেছেন। সুকুমার সেন বুঝতে পেরেছিলেন খাঁটি চলতি *ভাষার ব্যাকরণ লেখা হয় নি। তাঁর 'ভাষার ইতিবৃত্তে' তিনি সেই ব্যাকরণের একটি কাঠামো দাঁড় করিয়েছিলেন। পবিত্র সরকার এই ব্যাকরণের বৈশিষ্ট্য* এবং স্বরূপ নিয়ে একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখেছেন বাংলা আকাদেমির পত্রিকায়। নূতন বাংলা ব্যাকরণ রচনার রূপরেখা এই প্রবন্ধে পাওয়া যাবে। ভবিষ্যতের বাংলা ব্যাকরণ রচনার আদর্শ বলে প্রবন্ধটি গৃহীত হবার যোগ্য। এক পবিত্র সরকার নন, এক ভাষাবিজ্ঞানের চর্চায় তরুণতর অনেকেই এসেছেন— উদয়নারায়ণ সিংহ,, প্রবাল দাশগুপ্ত, মৃণাল নাথ, উদয়কুমার চক্রবর্তী ভাষা এবং ব্যাকরণের নানা সমস্যা নিয়ে লিখছেন বাংলায়।

তেরো

এই লেখায় বহু প্রবন্ধকারের নাম করতে পারি নি। অনেক ভালো প্রবন্ধই আমার নজর এড়িয়ে গেছে হয়তো। মার্কসবাদ, সাব অলটার্ন, স্ট্রাকচারলিজম, ইত্যাদি নিয়ে আমরা যখন উদ্‌বেজিত তখনো ধ্রুবচিন্তা নিয়ে কোনো কোনো গবেষক দু-একটি বই রচনা করেছেন যা আমাদের দৃষ্টি কেড়ে নেয়। শঙ্করীপ্রসাদ বসু প্রকাশ করেছেন সাত খণ্ডে 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ' (১৯৭৫, প্রথম খণ্ড)। এই বইটিতে একাধারে বিবেকানন্দের আবির্ভাব বিকাশ ও পরিণামের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ পাওয়া যাবে। এই গ্রন্থ সমকালীন ভারতবর্ষের সমাজ জীবন, বিশেষ করে মানস-উন্নয়নের বিস্তৃত আলেখ্য। বাংলার স্বদেশচর্চার উৎস নির্ণয়ে বিবেকানন্দ এবং রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্যোগ আয়োজনকে শঙ্করীবাবু উপযুক্ত পটভূমিকায় স্থাপন করে বিচার করেছেন। শঙ্করীপ্রসাদ বসুর ইতিহাস গ্রন্থটির তথ্যসম্ভার গবেষকদের ঈর্ষার বস্তু। ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে শঙ্করীবাবুর সঙ্গে সকলে হয়তো একমত হবেন না। আমাদের মনে হয় কখনো কখনো শঙ্করীপ্রসাদ কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিবেকানন্দের কর্মচিন্তাকে এমন গুরুত্ব দিয়েছেন যে, যার মধ্যে কিছুটা আবেগ সক্রিয় হয়ে উঠেছে। গুরুত্ব প্রদানে কিঞ্চিৎ পক্ষপাত লক্ষ করি তাঁর লেখায়।

এই প্রসঙ্গেই ভূদেব চৌধুরীর 'রবীন্দ্র উপন্যাস : ইতিহাসের প্রেক্ষিতে' (১৯৮৪) বইটির কথা মনে আসে। ইতিহাস অর্থাৎ সমাজের ইতিহাস। কালের পরিবর্তনে সমাজের ভাঙাগড়ায় যে মানুষ ফুটে ওঠে সেই ফুটে ওঠা ফুলগুলিকে ভূদেব চৌধুরীর রচনায় পাই। ভূদেব চৌধুরীর 'লিপির শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ' বইটিও এই সময়ের রচনা (১৯৭৩)। বলা বাহুল্য অবনীন্দ্রনাথের গদ্য বাংলা গদ্যের সম্পদ। সম্পদ এই কারণে যে তিনি ভাষা দিয়ে ছবি আঁকেন, ভাষাতেই নির্মাণ করেন ধ্বনির জগৎ। তাই ছবি আর ধ্বনি মিলে অবনীন্দ্রনাথের সাহিত্যপ্রবাহ। বেশ পরে একেবারে শেষের দিকে ছড়ার পদ্যে গদ্যে তিনি এমন একটি ভাষা গড়ে তুলেছিলেন যেখানে দেখতে পাই সব-কিছুই মিলে গেছে। রবীন্দ্রনাথের নাতনি বলেছিল তোমার গদ্যে রঙ ধরে পদ্যের। অবনীন্দ্রনাথের লেখায় সেই রঙের মায়া, আনন্দের উতরোল। আর বাগীশ্বরী বক্তৃতামালায় দেখা দেয় আবেগ অনুভূতি মিলিয়ে এমন এক গদ্য সৃষ্টি হয়েছে যা আমাদের সেই আবেগের স্পর্শে অভিভূত করে। উপমার পর উপমা নির্মাণ করেন তিনি গদ্যে। ঠিকই বলেছিলেন বুড়ো আংলা, ওবিন ঠাকুর 'ছবি লেখে'। ভূদেব চৌধুরী অবনীন্দ্রভাষার কারুকর্ম একের পর এক গ্রন্থ আশ্রয় করে বিশ্লেষণ করেছেন।

অবনীন্দ্রনাথের কথাই যখন উঠল তখন শঙ্খ ঘোষের 'কল্পনার হিস্টিরিয়া' (১৯৮৪)-র কথা আমাদের মনে পড়বে নিশ্চয়ই। শঙ্খ অবনীন্দ্র-জীবনীকে ছুঁয়ে যান। রানী চন্দ আর জসীমউদ্দীনকে অবনীন্দ্রনাথের বলা এবং তাঁদের অবনীন্দ্রনাথকে বলা থেকে শঙ্খ তাঁর লেখার চাবিকাঠি মাঝে মাঝে পেয়ে যান। শঙ্খ অবনীন্দ্রনাথের জগতের মধ্যে রূপরঙ যেমন পেয়েছেন তেমনি দেখেছেন কল্পনার এক উদ্দাম চেহারা যা উদ্ভট, হাস্যকর অথচ সামাজিক। অবনীন্দ্রনাথের হাত ধরেই তিনি অগ্রসর হন। এবং বলেন অবনীন্দ্র কথকতা ধরনের রচনাতে আমরা পাই সামাজিক প্রবণতা। অবনীন্দ্রনাথের হাস্যরসেও আছে এই গণসচেতনতা। 'নিজের সংকট থেকে বা সামাজিক পেষণের প্রবলতা থেকে মুক্তির একটা পরোক্ষ উপায় করা সম্ভব হয়তো বা। তাই এই হাসির জগৎ একই সঙ্গে হয়ে ওঠে আত্মরক্ষা আর আক্রমণের পথ, পলায়ন আর সংযোগের উপায়'। অবনীন্দ্র দেখা দিলেন নূতন বেশে 'চাঁইবুড়োর পোশাকে।' বিষয় এবং রচনাশৈলীর উৎসে পৌঁছে যেতে পারেন শঙ্খ। সুকুমার রায় অথবা রবীন্দ্রনাথের ছড়া অথবা উদ্ভট রচনার আলোচনায় শঙ্খর মননের দীপ্তি বিকিরিত হয়।

চোদ্দ

গণনাট্য-নবনাট্য-মুক্ত অঙ্গন-, প্রসেনিয়াম-পথনাটক-গ্রুপ থিয়েটার-থার্ড থিয়েটার-বুদ্ধিজীবীদের অত্যন্ত আদরের বস্তু । উত্তর কলকাতা এ-সবকে বেশি প্রশয় দেয় নি । সেখানে পারিবারিক-সামাজিক নাটকের পঞ্চাশ থেকে পাঁচশো রজনী অভিনীত হচ্ছে । মঞ্চের অভাবে 'দক্ষিণ পাড়ার ছেলেরা' মাঝে মাঝে 'উত্তর পাড়ার মেয়েদের' সীমায় পৌঁছে যায় বটে । কিন্তু আলাপ পর্যন্ত । শেষ পর্যন্ত কিছু জমে ওঠে না । সংস্কৃতির স্থানান্তর যেমন ঘটল রূপান্তরও সেইসঙ্গে ঘটল । কলামন্দির, রবীন্দ্রসদন, অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস, শিশির মঞ্চ নন্দনে মঞ্চগৃহগুলি সরব হয়ে উঠেছে এখন । গ্রুপ থিয়েটারের রমরমা না হোক কিন্তু না মরলে স্বভাব যায় না । উত্তর কলকাতা সময়ের সঙ্গে তাল রেখে ধীর গতিতে খাপ খাইয়ে নিচ্ছিল । এখনকার মঞ্চগৃহও প্রায়ই থাকে 'হাউস ফুল' বুদ্ধিজীবীর কাছে কদর বেশি । বস্তুত অভিনয় এখন এত অনায়াস এবং এত শিল্পনন্দন হয়ে উঠেছে যে বাংলা অভিনয় সম্বন্ধে আমাদের প্রত্যাশার অন্ত নেই । কিন্তু তুলনামূলকভাবে মৌলিকনাটক লেখা স্বল্প, নাট্যগবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনাও সীমিত । আমাদের পূর্ববর্তী নাট্যচর্চাকে এখানে স্মরণ করছি না । অজিতকুমার ঘোষ, দেবনারায়ণ গুপ্ত নাট্যসাহিত্য, অভিনয়, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের জীবনকথা নিয়ে কিছু প্রবন্ধ রচনা করেছেন বটে কিন্তু তা প্রয়োজনের তুলনায় সামান্য । বহুরূপী, গন্ধর্ব, গ্রুপ থিয়েটার পত্রিকায় কিছু প্রবন্ধ লেখা হয় বটে কিন্তু বর্তমানের সংকট সমস্যার গভীর আলোচনা এখানে পাই না । আসলে নাটকের ইতিহাস লেখা হয়, মঞ্চের ইতিহাসও আমরা পাই কিন্তু এ দুইয়ের মধ্যে যে অন্তর্গূঢ় যোগ তা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার আগ্রহ কোথায় ? কোনো নাটকে গানের ব্যবহার বেশি কেন এর উত্তর হয়তো পাওয়া যাবে সুকণ্ঠ বা সুকণ্ঠী গায়কগায়িকার জোগান ভালো আছে বলে । নাটক যখন অভিনয় হয় তখন নাট্যকারের ভূমিকা যে যৎসামান্য সে কথা পরিচালকরা বলেছেন । পরিচালকরা কী চান ? আসলে এ-সবের উত্তর পাব তাঁর কাছ থেকেই যিনি একাধারে নট, লেখক এবং অভিনেতা । উৎপল দত্ত এমন কতকগুলি প্রবন্ধ লিখেছেন যার মধ্যে এ-সবের উত্তর তো পাওয়া যাবেই, তার চাইতে বেশি পাওয়া যাবে তাঁর ভাবনার দ্যুতি এবং সমীক্ষার মনোরম বিশ্লেষণ । তাঁর অসামান্য প্রবন্ধের বই শেকস্‌পিয়র চর্চা । প্রবন্ধের ফর্মটাকেও তিনি পালটে দিয়েছেন । গুরুশিষ্য সংবাদ আকারে নয়, অভিনেতা, নাট্যকার, প্রয়োজনের বৈঠকের মেজাজে তিনি প্রবন্ধের অবতারণা করেন । আবার বৈঠকটিকে ধীরে ধীরে তৈরি করে দেন খুদে একটি রঙ্গমঞ্চে । এই রঙ্গমঞ্চে পরিচালকই মুখ্য— প্রধান চরিত্র, কিন্তু সংলাপ এলোমেলো নয়, ধীরে ধীরে ক্রাইসিসের দিকে যায় এবং নিয়ম মেনে চূড়ো থেকে নেমে আসে । আমাদের শেকস্‌পিয়র আর ইবসেন পড়া এবং দেখা যে কত মামুলি ধরনের উৎপল ক্ষোভের সঙ্গে তা উল্লেখ করেন "শেকস্‌পিয়র ও ইবসেন" ('চায়ের ধোঁয়া', ১৯৬৪) প্রবন্ধে । এই অল্পবুদ্ধির জ্ঞানচর্চা আমাদের শিল্পবোধের বড়ো বাধা । শেকস্‌পিয়রের নাটক অবজেকটিভ আর ইবসেনের নাটক সাবজেকটিভ— এই জাতীয় ভণ্ড উক্তিকে উৎপল দত্ত কশাঘাত করেন । এই দুইজনের যথার্থ স্থান কী উৎপল তা বুঝিয়ে দেন । জনপ্রিয়তা নাটকের সাফল্যের মাপ । বলা বাহুল্য নিছক সাহিত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে জনপ্রিয়তাকে কিঞ্চিৎ অবজ্ঞার চোখেই দেখা হয় । 'বেস্ট-সেলার' যে 'বেস্ট বুক' নয় এ তো আমরা জানি । নাক উঁচু করে বলি জনপ্রিয় গ্রন্থ মিডল ব্রাউ বা লো ব্রাউ-এর রুচির তোষণ করে । নাট্যকারও বিব্রত বোধ করেন এই জনপ্রিয়তার মাত্রা সম্পর্কে । তিনি কিন্তু জনপ্রিয় নাটক লিখতে গিয়েও দর্শকলোভন কোনো দৃশ্য বা চরিত্র সৃষ্টি করতে চান না । বেধে যায় বিরোধ নাট্যকার আর পরিচালকের মধ্যে । এই বিরোধের অবতারণা করেছেন উৎপল দত্ত "জনপ্রিয়তা ও আলমগীর" প্রবন্ধে । প্রবন্ধটিতে চিরাচরিত সাহিত্যবুদ্ধিকে তীব্র আক্রমণ করেছেন উৎপল দত্ত । বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার এবং পরিচালক (এ বিষয়ে উৎপলবাবুর জ্ঞানের পরিধি আমাদের দিশেহারা করে দেয়) জনপ্রিয়তার মূল্য দিয়েছেন । ভালো

লাগে, যখন দেখি উৎপলবাবু জনপ্রিয়তা বলতে বোম্বাই মার্কা ছবি বা অপসংস্কৃতির পোষকতা মনে করেন নি। পরে 'জপেন দা জপেন যা' (১৯৮৪) বইতে অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সূত্রগুলি উৎপলবাবু সবিস্তারে বলেছেন। উৎপলবাবু মনে করেন জনপ্রিয়তার আকর্ষণেই নাটক মেলোড্রামা হয়ে যায় না। প্রয়োজনে অবশ্য মেলোড্রামাকেও উৎপলবাবু গ্রহণ করতে রাজী। 'আলমগীর' নাটকের জনপ্রিয় অংশগুলি অনুপুঙ্খ বিচার করে ঔরংজেবের সংলাপে হিন্দুধর্মের গোঁড়ামির যে দৃষ্টান্ত আমরা পাই তার কথা বলে তিনি ক্ষীরোদপ্রসাদের প্রগতিশীলতার পরিচয় দেন।

গ্রুপ থিয়েটারের বিভিন্ন দল গণনাট্য ও রক্তকরবীর সাফল্যের পর অভিনয়ে নূতনত্ব এনেছিল (দ্রষ্টব্য কুমার রায়ের 'তিলোত্তমা শিল্প')। প্রাকরণিক ও প্রয়োগগতকৌশল বাংলা অভিনয়কলা এক চূড়ান্ত শিখর স্পর্শ করেছিল। যাত্রাপালাতেও পরিবর্তন আসছিল। বহু নামীদামী অভিনেতা-অভিনেত্রী মঞ্চ সিনেমা ছেড়ে যাত্রাদলে এসেছিলেন। জপেন দা (উৎপল দত্ত) এই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর প্রবন্ধ নির্মাণ করেছিলেন। মধ্যবিত্ত মানসিকতার দোলাচলবৃত্তির নিদর্শন পাই অভিনেতা-অভিনেত্রীদের এই পালাবদলে। বামপন্থী চিন্তাধারাও আছড়ে পড়েছিল রঙ্গমঞ্চে। জপেনদা এই প্রয়াসকে বিশ্লেষণ করেছেন, বামপন্থী নাট্যপ্রয়াসকে সব সময় তিনি স্বাগত জানান নি। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বামপন্থী মনোভাবকে উৎপলবাবু শ্লেষবিদ্ধ করেছেন। উৎপলবাবুর মতে রবীন্দ্রনাটকে দ্বিধাগ্রস্ততার পরিচয় আছে। কিন্তু সেইসঙ্গে জপেনদা জপ করেন রবীন্দ্রনাটকের অসামান্যতাকে। জপেন দার বিশ্লেষণে উঠে আসে 'রক্তকরবী' নাটকের আশ্চর্য ব্যাখ্যা। জপেন দা রক্তকরবী নাটকে পান সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ঘৃণা আর বৈপ্লবিক চিন্তা। অবশ্যই তিনি এখানে মার্কসীয় মতামতের দ্বারা অনুপ্রাণিত। উৎপলবাবু রঞ্জন চরিত্রটিকে বৈপ্লবিক আখ্যা দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের পক্ষ নিয়ে জপেন দা বলেন 'কি তোরা বলবি যা রবীন্দ্রনাথ আগেই বলেন নি? তোদের রাজনীতিটাকে রক্তকরবীতে তিনি আদ্যোপান্ত উপস্থিত করেছেন কিন্তু বাংলায়; মধুর বাংলায়— তোদের মতন আধা ইংরিজি আড়ষ্ট খটমট ভাষায় নয়'। উৎপল দত্ত কোন্ বিশেষ সময়ে এই কথা বলেন? যখন বিদেশী নাটকের অনুবাদে বাংলার মঞ্চ প্রচুর প্রশংসা পাচ্ছে। উৎপলবাবুর 'গিরিশ মানস' (১৯৮৩) একটি বিস্ফোরক বই। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত এই বক্তৃতামালা সেদিন বাঙালি শ্রোতাকে বিচলিত এবং বিব্রত করেছিল। এ ব্যাপারে প্রচুর বিতর্ক হয়েছে। উৎপলবাবু গিরিশ নাটকের প্রশংসায় খুব বেশি উৎসাহ দেখিয়েছিলেন সেদিন। কেউ কেউ অবাক হয়ে গিয়েছিলেন একজন মার্কসিস্ট কী করে পৌরাণিক নাট্যরচয়িতাকে প্রশংসা করেন? বুদ্ধিজীবীরা গিরিশ ঘোষের নাটককে সাহিত্য হিসাবে বিশেষ মূল্য দেন না। উৎপলবাবু গিরিশ ঘোষের পুনরুজ্জীবন চাইলেন। কিন্তু সত্যিই কি তিনি পুনরুজ্জীবন ঘটাতে পেরেছেন? যে যান্ত্রিকতাকে জপেন দা ধিক্কার দিয়েছিলেন উৎপলবাবুও কি সেই যান্ত্রিক সমালোচনা পদ্ধতিই এখানে গ্রহণ করেন নি? 'ধর্মের পতাকা এবং রণধ্বনি' বৈপ্লবিক আন্দোলনের উপায় হয়েছে সন্দেহ নেই, গিরিশচন্দ্র তাকে ব্যবহারও করেছেন, এও ঠিক, কিন্তু আজকে আমরা বুঝতে পারি এ বিপ্লব কত দুর্বল, কত আত্মঘাতী। উৎপলবাবু এই বইতে নিজের আবেগের কাছে বন্দী। উৎপলবাবুর রচনায় উত্তাপ বেশি। তিনি ভদ্রলোকের মুখোশ ছিঁড়ে দিতে চান তাঁর ভাষণে, লেখায়। প্রবন্ধগুলিতে যে উত্তাপ ছড়িয়ে আছে সেখানে প্রাণের শিখাকে দেখতে পাই আমরা। এখানে তাঁর প্রবন্ধের সাফল্য। উৎপল দত্তই নাট্যচিন্তায় প্রতিবাদ-প্রতিরোধের ভাষা গড়ে তুলেছেন। সর্বদা যে তিনি সিদ্ধ এমন নয় কিন্তু যেখানে তিনি লক্ষ্যভ্রষ্ট সেখানেও তিনি গতানুগতিকতার ঊর্ধ্বে।

পনেরো

গত পঁচিশ বছরের বাংলা প্রবন্ধে আধুনিক মনস্কতার পরিচয় নিয়েছি। কিন্তু বিষয়টির জট যে কঠিন এ বোঝা গেল 'গাঙ্গেয়' পত্রিকার কবিতা-বিষয়ক আলোচনায়। পঁচিশ বছর নয়, তার আগে থেকেই এই বিষয়ে নানা

প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল । শশিভূষণ দাশগুপ্ত মোহিতলাল মজুমদার, নজরুল ইসলাম এবং যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তকেই আধুনিক কবি বলে চিহ্নিত করেছিলেন । এখন অমিতাভ গুপ্ত বলছেন শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আধুনিক কথাটি বুঝতেই পারেন নি । তিনি রবীন্দ্রনাথকে 'ইতিহাসের একটি অঙ্গীকার' বলে গ্রহণ করেন । বুদ্ধদেব ১৯৩৮ সালে বলেছিলেন রবীন্দ্রযুগ শেষ হয়ে গেছে । অমিতাভ তা মানেন না । সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় 'তিনজোড়া পায়ের লাথিতে রবীন্দ্ররচনাবলী লুটায় পাপোশে' বলে যে উচ্চারণ করেছিলেন— অমিতাভ সে কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন ('আলোচনা চক্র, সংকলন ১, ১৯৮৭') । তাঁর মনে হয়েছে 'অবক্ষয়ী আধুনিকরা ১৯৫১ সালে 'শতভিষা' পত্রিকায় মিলিত হলেন এবং দুবছর পরে এঁদেরই উদ্যোগে 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার জন্ম । কৃত্তিবাস 'ঝকঝকে ভাষায়' 'লক্ষণবিহীন' সমালোচনা প্রকাশ করেছে । শঙ্খ ঘোষ কৃত্তিবাসের 'কালোপাহাড়ী' এবং 'তেজী বিদ্রোহে'র কথা বলেছিলেন । অলোকরঞ্জন বলেছিলেন কৃত্তিবাসে মিলিত হয়েছিল 'লক্ষ্মীছাড়ার দল — শুরু করে দিয়েছিলাম অতাত্ত্বিক কবিতা লিখতে', আর শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন 'পুরনো আঙ্গিক ও বাচনভঙ্গী ছিঁড়েখুঁড়ে গেছে' । এ-সব উচ্চারণের মধ্যেই অমিতাভ গুপ্ত 'অবক্ষয়' লক্ষ করেছেন । তাঁর মতে আধুনিক কবি যৌনবিকৃতিমূলক কবিতা রচনায় উৎসাহী । কৃত্তিবাসগোষ্ঠী তিরিশের আধুনিকতা এবং চল্লিশের প্রগতিমুখিতাকে প্রতিহত করতে চেয়েছিল । কমিউনিজমের বিরোধিতা করেছেন কেউ কেউ । অমিতাভ গুপ্ত বাংলা কবিতায় সুস্থ স্বাভাবিক রূপ দেখার প্রত্যাশা করেন । একেই বলা যাক উত্তর আধুনিক কবিতা । অমিতাভবাবুর রাগের কারণ বোঝা কঠিন । তিনি যে-সব অভিযোগ করেছেন সেগুলিকে যদি সত্য বলে মেনেও নিই তা হলেও বলব সে সত্যকে প্রতিবাদ করেছেন শতভিষা, কৃত্তিবাসগোষ্ঠীর কবিরাই । রবীন্দ্রনাথ বা কবিতার স্বরূপ সম্বন্ধে এঁরা যা বলেছিলেন তা জমি দখলের লড়াই । এলিয়ট বলেছিলেন প্রত্যেক লেখকই তাঁর নিজের পাঠকগোষ্ঠী তৈরি করেন । শতভিষা কৃত্তিবাস তাই করেছিল । তেজী বিদ্রোহ না থাকলে নূতনের জন্ম হবে কী করে? তা ছাড়া সংস্কৃত কবিতা থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত অমিতাভ কবিতা-অকবিতার যে ঝাড়াই বাছাই করেছেন তাও কি খুব কবিজনোচিত? এতদ্‌সত্ত্বেও বাংলা কবিতায় উত্তর আধুনিক কবিগোষ্ঠী যদি কিছু নূতন প্রবণতা, নূতন মানসিকতার জন্ম দিতে পারে তবে বাঙালি পাঠক তাকে সাদরে বরণ করে নেবে ।

ষোলো

অর্থনীতিবিদ্ অশোক মিত্রের কথা আগে বলি নি । তাঁর মূল্যবান প্রবন্ধ গ্রন্থ 'সারূপ্যের সন্ধানে' ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত হয়েছিল । আমরা তাঁর মনকে পাই 'কলকাতা প্রতিদিন' (১৩৯০) গ্রন্থে । বইটি তাঁর *Calcutta Diary*-র বাংলা অনুবাদ । সাময়িক পত্রিকায় লেখা প্রবন্ধগুলিতে সমকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির উদ্‌ঘাটন আছে । স্বৈরতন্ত্র আমাদের জীবনযাপনকে যেভাবে সর্বনাশের পথে নিয়ে যাচ্ছে তার ইতিবৃত্ত এই গ্রন্থে লভ্য । অর্থনৈতিক সংকট মানেই সমাজের সংকট । সেই সংকট তৈরি করেছে যারা, অশোক মিত্র তাদের স্বরূপ অনাবৃত করেছেন তাঁর প্রবন্ধমালায় ।

এই সংকটের ছায়া আমাদের প্রাবন্ধিকদের চিন্তাকে আলোড়িত করছে । গত পঁচিশ বছরের প্রবন্ধে মানুষের লাঞ্ছনা এবং অপচয় নিয়ে বুদ্ধিজীবীরা ভেবেছেন । সাহস করে অশোক মিত্র শিবে গুণ্ডার কাহিনী লিখেছিলেন । সমাজের দুষ্ট ক্ষতকে তিনি বরাবরই তাঁর প্রবন্ধে মেলে ধরেন । মধ্যবিত্ত জীবনের সুখদুঃখপূর্ণ জীবন নিয়ে প্রতিদিনের কলকাতার সঙ্গে মিশে আছি আমরা । সব-কিছু সত্ত্বেও আমরা বেঁচে আছি । মানুষের ধর্মকে মানি বলেই আমাদের বাঁচার প্রেরণা আর সেই প্রেরণা থেকেই আমাদের লেখার জন্ম । প্রবন্ধসাহিত্যও তার ব্যতিক্রম নয় । সমকালীন সংকট এবং তার থেকে পরিত্রাণের, মুক্তির সন্ধানে আমাদের চিন্তা সর্বদা নিবেদিত । আবার

ঐতিহ্যকে যথার্থভাবে বুঝে নেবার আগ্রহও আমাদের উৎসাহিত করে । আমাদের বিচারে, বিশ্লেষণে, ভাবনায় স্বপ্নে, ভালোবাসায় যে বোধ উপচে পড়ে তাই প্রবন্ধের অন্যতম উপজীব্য । এই-সব প্রবন্ধের উৎস মানুষ ।

পু ন শ্চ

আমরা কবিতা থেকে মিছিলে এসেছি । আমাদের লেখায় তার বন্দনা । রবীন্দ্রবন্দনা কি আমাদের কাল থেকে সরে গেল । রবীন্দ্রনাথ কি বেঁচে থাকবেন কেবলমাত্র উৎসব-অনুষ্ঠানে । যে রবীন্দ্রনাথ শিশুতীর্থ লিখেছেন? যে রবীন্দ্রনাথ মানুষের ধর্ম আর বিশ্বপরিচয় লেখেন । জীবনানন্দ দাশ উত্তর-রৈবিক কবিতায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অমিলের কথা বলেছেন অনেকবার অতঃপর তাঁর কথা 'কিন্তু তবুও বাংলার মাটিতে রবীন্দ্রনাথের যুগে এসে যাঁরা ভাবাবেন ও রোম্যান্টিসিজমকে সংহত করে কবিতার ভিতরে তীর্থিকের মতো তপঃশক্তি অথবা হোরেসের রীতি অথবা নিজেদের হৃদয়ের ঈষদঙ্কুরিত অন্য এক সংহতি আনতে চায় তারা তাকিয়ে দেখে উপরে-নিচে সম্মুখে রবীন্দ্রকাব্যের অনপনেয় ছায়ায় তাদের স্বাবলম্বনের বিবর্তন চলছে' । রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পঞ্চাশ বছর পরেও জীবনানন্দের এই উক্তি সত্য—কঠিন সত্য । আমরা বোধ হয় যথার্থ রবীন্দ্রযুগে প্রবেশ করেছি আমাদের মননে, অনুভবে, প্রীতিতে বাংলা প্রবন্ধ সেই কথাই বলে ।

সম্পাদকীয় সংযোজন :

এই প্রবন্ধের লেখক বিজিতকুমার দত্ত বর্তমান পর্বের সুপরিচিত প্রবন্ধকার । তাঁর আলোচনার বিষয় প্রধানত বাংলা সাহিত্য । পূর্ববর্তী পর্বের লেখক শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্ররচনাবলী সম্পাদনাসূত্রে রবীন্দ্ররচনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নানা তথ্য নিয়ে বহু প্রবন্ধ লিখেছেন।

বর্তমান সংকলন-গ্রন্থের অন্যান্য লেখক সকলেই সাহিত্যালোচনার বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সুখ্যাত প্রবন্ধকার। কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত বর্ষীয়ান কবি কিন্তু দীর্ঘকাল ধরেই তিনি রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক পর্বের কবিদের কাব্য ও কাব্যশৈলী নিয়ে প্রবন্ধ লিখে আসছেন । রবীন্দ্রোত্তর কবিতা এবং উপন্যাস নিয়ে সুমিতা চক্রবর্তী বই এবং বহু প্রবন্ধ লিখেছেন । গোপিকানাথ রায়চৌধুরী এবং সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাস-পর্যালোচনায় বিশেষজ্ঞ । উপন্যাসের শিল্পরীতি নিয়ে গোপিকানাথের লেখাগুলি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে । সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাসের দেশকাল এবং লেখক মানস বিশ্লেষণে নিপুণ । উজ্জ্বলকুমার মজুমদারের প্রবন্ধের বিষয় ছোটোগল্প ও উপন্যাস—পাশ্চাত্য সাহিত্য থেকে তুলনামূলক তথ্য আহরণে সমৃদ্ধ । সমরেশ মজুমদার ছোটোগল্প নিয়ে গবেষণা করেছেন । পবিত্র সরকারের পরিক্রমাক্ষেত্র ব্যাপক । বাংলা নাটক সম্পর্কে ইনি প্রামাণিক বই ও প্রবন্ধ লিখেছেন আবার আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান প্রণালী অবলম্বন করে লিখিত তাঁর প্রবন্ধ নতুনভাবে বাংলা ভাষারহস্যকে উজ্জীবিত করেছে । অরুণকুমার বসুর প্রবন্ধের বিষয় সংগীত ও সাহিত্য, তা ছাড়া সাহিত্যের নানা দিক নিয়েও তিনি লিখে থাকেন । তুষার চট্টোপাধ্যায় বহু প্রবন্ধ লিখেছেন লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতি নিয়ে । তাঁর আলোচনার বিশেষত্ব বিজ্ঞান হিসাবে লোকসংস্কৃতির চর্চা । ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, নজরুল ইসলাম সম্পর্কে প্রামাণ্য বই লিখেছেন । তেমনি সনজীদা খাতুন গায়িকা হিসাবে সুপরিচিত হলেও সংগীত ও সাহিত্যের যোগাযোগের নতুন দিক দেখিয়েছেন তাঁর 'ধ্বনি থেকে কবিতা' বইতে । সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাধারণত রবীন্দ্রসাহিত্যের ভাববিশ্লেষণ করে প্রবন্ধ লিখে থাকেন । তবে চিত্রকলা ও সাহিত্যের যোগ দেখিয়ে যে প্রবন্ধ তিনি লেখেন, তাতেই তাঁর অভিনবত্ব । রবীন্দ্রচর্চার দ্বিতীয় পর্বের লেখক গৌতম ভট্টাচার্য যে-কটি প্রবন্ধ লিখেছেন সে সবই রবীন্দ্র-পরবর্তী সাহিত্যান্দোলন-সম্পৃক্ত তথ্যমূলক আলোচনা ।

এই লেখকরা — দু-একজনকে বাদ দিলে কেউ সৃষ্টিধর্মী রচনার লেখকরূপে পরিচিত নন । তাঁদের প্রবন্ধের সাহায্যেই ব্যাপক এবং গভীর নানা তথ্য ও ভাব বিশ্লেষণের দ্বারা বাংলা সাহিত্যসমালোচনার বিস্তার ঘটছে ।

লোকসাহিত্যচর্চা

লোকসংস্কৃতি— রবীন্দ্রস্মরণ ও ইতিহাসের অন্বেষা

তুষার চট্টোপাধ্যায়

> "মনে হচ্ছিল এ সমস্ত যেন ছেলেবেলাকার রূপকথার জগৎ... এমন মনে করা যেতেও পারে আমি সেই রাজপুত্র একটা অসম্ভবের প্রত্যাশায় সন্ধ্যারাজ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি— এই ছোটো নদীটি সেই তেরো নদীর মধ্যে একটা নদী, এখনো সাত সমুদ্র বাকি আছে — এখনো অনেক দূর, অনেক ঘটনা, অনেক অন্বেষণ বাকি—"[১]

শতবর্ষপূর্বে 'ছিন্নপত্রে'র স্বগত উচ্চারণে (১৮৯১) রবীন্দ্রমানসের যে লোকসংস্কৃতি-সংলগ্নতা ব্যক্ত হয়েছে, রবীন্দ্রমহাপ্রয়াণের অর্ধশতবর্ষপূর্তির লগ্নে তা বিশেষ স্মরণযোগ্য। বিশেষ অর্থে বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চার অন্যতম প্রধান পথিকৃৎ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রোত্তর বিগত পঞ্চাশ বৎসরের লোকসংস্কৃতিচর্চার অনুশীলনের প্রারম্ভে তাই লোকসংস্কৃতিচর্চায় রবীন্দ্রপ্রতিভার স্বরূপ উন্মোচনের প্রয়োজনীয়তা একান্ত অনিবার্য।

রবীন্দ্রনাথ আশৈশব ছিলেন লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতির অনুরাগী। লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতিচর্চা রবীন্দ্রনাথের কাছে ছিল সমাজ ও ইতিহাসের মূল্যবান উপকরণ ও স্বদেশপ্রেমের অনিবার্য অঙ্গ। মূলত কাব্যরসের আকর্ষণে লোকসাহিত্যের আলোচনায় মগ্ন হলেও রবীন্দ্রনাথ ছেলেভুলানো ছড়া, কবি সংগীত ও গ্রাম্য সাহিত্যের আলোচনায় লোকসাহিত্যের বহুবিধ তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করেছেন এবং বৃক্ষের উপমায় লোকসাহিত্য (Folk literature) ও শিল্পসাহিত্যের (Art literature) "মধ্যে একটা অবিচ্ছিন্ন আভ্যন্তরিক যোগ আছে" বলে বর্ণনা করেছেন।[২] রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য আলোচনায় বৃক্ষের উপমায় মাটিতে প্রোথিত মূল বা শিকড়কে লোকসাহিত্য এবং ঊর্ধ্বাকাশে বিকশিত পত্র-পল্লব ও পুষ্পের শোভাকে উচ্চ বা শিল্প সাহিত্যের সঙ্গে তুলনা করেই ক্ষান্ত হন নি, বাংলা সাহিত্যের বিশ্লেষণে প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যের সঙ্গে লোকসাহিত্যের আলোচনাকেও সমগুরুত্বে যুক্ত করেছেন। সচেতন পাঠকের দৃষ্টিতে এ তথ্য বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয় যে, একই বছর রবীন্দ্রনাথের— 'প্রাচীন সাহিত্য' (১৯০৭), 'আধুনিক সাহিত্য' (১৯০৭) এবং 'লোকসাহিত্য' (১৯০৭) গ্রন্থত্রয়ের প্রকাশ ঘটে। লিখিত ধারায় প্রাচীন ও আধুনিক উচ্চ সাহিত্যের বিচার-বিশ্লেষণের সঙ্গে, অলিখিত মৌখিক ধারার (Unwritten Oral literature) লোকসাহিত্যের বিচার-বিশ্লেষণ যুক্ত না হলে যে কোনো দেশের সাহিত্য-পরিক্রমা পূর্ণ হয় না, তিনটি গ্রন্থের সমকালীন প্রকাশ যেন সেই তাৎপর্যেরই ঐতিহাসিক ইঙ্গিত।

রবীন্দ্রনাথ আত্মআবিষ্কার ও আত্মজাগরণের জন্য পূর্বাপর লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতি চর্চার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণে (১৩১২ এবং ১৩১৬) রবীন্দ্রনাথ বিশেষ ভাবে বিদ্যায়তনিক চারি-দেওয়ালের বাইরে যে বৃহত্তর দেশ পড়ে আছে তার মহত্ত্ব ভোলা উচিত নয় বলে বলেছেন। তিনি নানা ভাবে বলেছেন— বাংলাদেশের সাহিত্য, ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব, লোকধর্ম লোকবিবরণ প্রভৃতি যাবতীয় জ্ঞাতব্য বস্তু অনুসন্ধান ও আলোচনার বিষয়। পুঁথি ছেড়ে সজীব মানুষকে প্রত্যক্ষ পড়ার চেষ্টা করাতে যথার্থ শিক্ষা। দেশের

কাব্যে-গানে-ছড়ায়, প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষে, কীটদষ্ট পুঁথির পাতায়, জীর্ণ কাঁথায়, গ্রাম্য পালাপার্বণে, ব্রতকথায়,পল্লীর কৃষি কুটীরে স্বদেশকে অনুসন্ধান করার জন্য রবীন্দ্রনাথ "জ্ঞানের আদি নিকেতন" লোকসংস্কৃতির উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে ছাত্রদের আহ্বান জানিয়েছেন।[৪] জাতীয় সম্পদ স্বরূপ লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতির অনুসন্ধানের আহ্বান জানিয়েই রবীন্দ্রনাথ ক্ষান্ত হন নি, তিনি নিজে গ্রামসমাজ ও লোকজীবনের গভীরে প্রবেশ করে লৌকিক ঐতিহ্যের প্রবহমান ধারায় সমাজ ও জাতীয় জীবনের স্বরূপ অনুধাবনে সক্রিয় হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ লোকসাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে পর্যালোচনা করেছেন এবং লৌকিক ভাষা, লৌকিক ছন্দ, লোকশিল্প, লোকসংগীত, লোকনৃত্য, লোকনাট্য, লোকধর্ম-সংস্কার, লৌকিক উৎসব অনুষ্ঠান প্রভৃতি লোকসংস্কৃতির প্রায় সমুদয় বিষয়ে বিভিন্ন রূপ আলোচনা করেছেন। তিনি যেমন শিলাইদহ—শান্তিনিকেতন—শ্রীনিকেতনের কার্যধারায় লোকসংস্কৃতির বহু ব্যাপক সৃষ্টিশীল প্রয়োগ করেছেন, তেমনই লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতির ব্যাপক সৃষ্টিশীল ব্যবহার করেছেন নিজস্ব সাহিত্য-শিল্পের বহু বিচিত্র সৃজনশীলতায়। এদিক থেকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ইয়েটস, এলিয়ট, পাউণ্ড, ব্রেশট, মাচোদা, লোরকা প্রভৃতির কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়। আধুনিক নাগরিকতার বিদগ্ধ মানসিকতার প্রতিভূ হয়েও এঁরা যেভাবে লোক ঐতিহ্যকে নিজেদের রচনায় ব্যবহার করেছেন, রবীন্দ্রনাথও প্রায় অনুরূপ ভাবে লোকসংস্কৃতির ভুবনকে নিজের সৃষ্টির জগতে পূর্বাপর অনুরণিত করেছেন নান্দনিক চেতনায়। লোকসংস্কৃতির সহৃদয় আতিথেয়তায় রবীন্দ্রনাথ শুধুমাত্র নিজস্ব সৃষ্টি ও কল্পনার বাতাবরণকেই সমৃদ্ধ করেন নি, সেইসঙ্গে সম্ভবত নিজস্ব "জীবন দেবতা" প্রত্যয়টিও গড়ে তুলেছেন লোকায়ত বাউলের "মনের মানুষ"-এর সজীব সংলগ্নতায়।[৫] তাই বলা যায় সমগ্র রবীন্দ্রকর্মপ্রবাহে লোকসংস্কৃতির স্থান মুখ্য না হলেও একান্ত উপেক্ষণীয় নয়। অনেকে ভুলবশত রবীন্দ্রপ্রতিভার মূল্যায়নে লোকসংস্কৃতির ভূমিকাকে উপেক্ষা করেছেন অথবা রবীন্দ্রনাথের লোকসংস্কৃতি প্রীতিকে ভ্রান্তিবশত একান্ত রোম্যান্টিক ভাবাবেগসর্বস্ব বলে মনে করেছেন। বিষয়গত শৃঙ্খলা বা পেশাগত বৈজ্ঞানিক সুনির্দিষ্টতা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয় পূর্বাপর লোকসংস্কৃতি পর্যালোচনা করেন নি। কিন্তু তাই বলে তাঁর লোকসংস্কৃতি চর্চা কেবলমাত্র রোম্যান্টিক ভাবাবেগসর্বস্ব জাতীয়তাবোধে বা রসসর্বস্বতায় আপ্লুত ছিল এবং বিষয়টির বস্তুসসম্মত বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষায় তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ উদাসীন এমন কথা বলা যায় না। বৈজ্ঞানিক মন্যতাহীন রসানুগত্যে রবীন্দ্রনাথের লোকসংস্কৃতি প্রয়াস নিমজ্জিত—এরকম ধারণা বহুল প্রচলনে প্রায় প্রবচন সিদ্ধি লাভ করলেও তা প্রতিবাদের অপেক্ষা রাখে।

লোকসংস্কৃতি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের কোনো তত্ত্বগত বৈজ্ঞানিক আসক্তি ছিল কিনা তা সুস্পষ্টরূপে বলা না গেলেও, তাঁর লোকসাহিত্য-লোকসংস্কৃতি সম্পর্কিত আলোচনা ও প্রাসঙ্গিক মন্তব্যসমূহ এই তথ্য সুপ্রতিষ্ঠিত করে যে, তিনি কম-বেশি আধুনিক লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী ছিলেন। প্রধানত রসমাধুর্যের দ্বারা আকৃষ্ট হলেও লোকসংস্কৃতি-বিষয়ক প্রয়াসে রবীন্দ্রনাথ যে বহু ক্ষেত্রে আধুনিক বৈজ্ঞানিক মন্যতার পরিচয় দিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এমন-কি, লোকসংস্কৃতির functional বা ব্যবহারিক মূল্য এবং applied aspect বা প্রয়োগগত ফলিত মূল্য সম্পর্কেও তিনি ছিলেন সদা সচেতন। প্রকৃতপক্ষে বৈজ্ঞানিক নিষ্ঠা ও রসানুসন্ধান রবীন্দ্র-লোকসংস্কৃতি প্রয়াসে পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়, পরস্পরাশ্রয়ী। রবীন্দ্রনাথ মুখ্যত লোকসাহিত্যের রসগত আলোচনায় মগ্ন থেকেছেন এবং নানাবিধ কারণে লোকসংস্কৃতির পূর্ণাঙ্গ আলোচনায় প্রয়োজনীয় শ্রম ও সময় নিয়োগে সক্ষম হন নি। তা থেকে এ কথা প্রমাণিত হয় না যে লোকসংস্কৃতি নৃতত্ত্ব— সমাজতত্ত্বগত পূর্ণাঙ্গ পর্যালোচনার উপযোগিতা সম্বন্ধে তিনি অনবহিত বা অবিশ্বাসী ছিলেন। বিপরীত ক্রমে রবীন্দ্রনাথের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মন্তব্যাদি ও আলোচনা সমূহের অন্তঃসাক্ষ্য অনুসরণে বোঝা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ সীমাবদ্ধ প্রয়াস ও মিতায়িত পরিসরেও বার বার লোকসংস্কৃতির নৃ-সমাজবিজ্ঞান-ঘনিষ্ঠ চেতনার অভিমুখীন হয়েছেন এবং আধুনিক লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞানের বহুমুখী প্রবর্তনা তাঁর রচনায় বিকীর্ণ হয়ে রয়েছে।[৬] রবীন্দ্রনাথ পূর্বাপর পাশ্চাত্য মোহ পরিত্যাগ করে জাতীয়

ঐতিহ্যের লৌকিক ভিত্তিভূমি থেকে দেশের আত্মাকে আবিষ্কার করার পক্ষপাতী ছিলেন এবং ক্ষেত্রানুসন্ধান সহ লোকসংস্কৃতির পঠন-পাঠন ও গবেষণার প্রসারে ছিলেন সতত সচেষ্ট ।

দুই

রবীন্দ্রনাথের লোকসংস্কৃতি প্রয়াস এবং রবীন্দ্রোত্তর লোকসংস্কৃতি চর্চার গতিপ্রকৃতি অনুশীলন সাধারণভাবে আন্তর্জাতিক এবং বিশেষভাবে বঙ্গভারতীয় লোকসংস্কৃতিচর্চার পটভূমিতেই করা বিধেয় । ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংল্যাণ্ডে Folk lore শব্দটি চয়ন করা হলেও (১৮৪৬) অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই লোকসংস্কৃতি চর্চার সূত্রপাত হয় । এদিক থেকে সুইডিশ সংস্কৃতিবিদ লিনিয়স্ জার্মান পণ্ডিত গ্রীম ভ্রাতৃদ্বয় এবং হার্ডারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । সপ্তদশ শতাব্দী থেকেই অতীতের পুনর্জাগরণ প্রচেষ্টার অঙ্গ হিসেবে দেশে-দেশে লোকসংস্কৃতিচর্চার সচেতন প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় । প্রথম দিকে লোকসংস্কৃতি চর্চা বিশেষভাবে অতীত অনুশীলনে রোম্যাণ্টিক অনুভূতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল । পরবর্তীকালে লোকসংস্কৃতি চর্চায় অতীত অনুশীলন, ইতিহাস পুনর্গঠন, জাতিতত্ত্বগত পরিচয় পাঠ, নৃ-সমাজতত্ত্বগত পর্যবেক্ষণ, মনস্তাত্ত্বিক ও নন্দনতাত্ত্বিক অন্বেষা, আঙ্গিক সংস্থানগত মতবাদ প্রভৃতি প্রাধান্য লাভ করে । শতাধিক বৎসরের পথপরিক্রমায় লোকসংস্কৃতি বিশিষ্ট বিদ্যা হিসাবে বিকশিত হয় । বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকেই লোকসংস্কৃতি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বকীয় শিক্ষাগত শৃঙ্খলায় কম-বেশি সুপ্রতিষ্ঠিত হয় । পাশ্চাত্য দেশে লোকসংস্কৃতি চর্চা প্রাধান্য বিস্তার করার বহু পরবর্তী পর্যায়ে বঙ্গভারতীয় উপমহাদেশে আধুনিক অর্থে লোকসংস্কৃতি চর্চা প্রসারিত হয় । আমাদের দেশে আধুনিক অর্থে লোকসংস্কৃতি চর্চার সচেতন সূত্রপাত ঘটে প্রধানত পাশ্চাত্য মনীষীদের দ্বারা । বিবর্তনের স্তরানুসারে বাংলায় লোকসংস্কৃতি চর্চার ইতিহাসকে প্রধানত পাঁচটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায় । এই পর্যায়গুলি বিশেষভাবে সংগঠিত হয়েছে এবং সুনির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করেছে— এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা (১৭৮৪), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠা (১৮৯৪), ভারতের স্বাধীনতা লাভ (১৯৪৭) এবং কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বতন্ত্র লোকসংস্কৃতি বিভাগ প্রতিষ্ঠার (১৯৯০) ঐতিহাসিক ঘটনার পটভূমিকায় । লোকসংস্কৃতি চর্চার ঐতিহাসিক বস্তুগত পটভূমিকায় বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চা কালপরিচয়গত ধারা ও যুগবৈশিষ্ট্যগত স্বরূপ নিম্নলিখিত ভাবে পাঠ করা যায় :*

স্তর	কালসীমা	পর্বনাম
প্রথম	১৭৭২—১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দ	ব্যক্তিগত প্রয়াসের পর্ব
দ্বিতীয়	১৭৮৪—১৮৯৩	বিদেশী প্রচেষ্টাজাত সংহতির পর্ব
তৃতীয়	১৮৯৪—১৯৪৬	স্বদেশানুরাগমূলক জাতীয় উদ্যোগের পর্ব
চতুর্থ	১৯৪৭—১৯৮৯	জ্ঞাতিবিদ্যাশ্রয়ী বিদ্যায়তনিক পর্ব
পঞ্চম	১৯৯০—পরবর্তী	লোকসংস্কৃতি-বিজ্ঞান নির্ভর স্বকীয় শিক্ষাগত শৃঙ্খলায় পর্ব ।

বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চার প্রথম পর্ব ব্যক্তিগত প্রয়াসের পর্ব । ব্যক্তিগতভাবে ওয়ারেন হেস্টিংসের লিখিত একটি পত্রের সূত্রে (মার্চ ২৬, ১৭৭২) দেশীয় লোকসংস্কৃতির সংগ্রহ ও আলোচনার সচেতনতা লক্ষ করা যায় । এই পর্বে লোকসংস্কৃতির চর্চা প্রধানত প্রসারিত হয় বিদেশী পর্যটক, মিশনারি সরকারি প্রশাসক প্রভৃতি ব্যক্তিগত অনুরাগীবৃন্দের প্রচেষ্টায় । তাই লোকসংস্কৃতি চর্চার উন্মেষ পর্যায়কে ব্যক্তিগত প্রয়াসের পর্ব বলা যায় । পরবর্তী পর্যায়ে প্রাচ্যবিদ্যা ও ভারতবিদ্যা চর্চার অনুষঙ্গে ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা হয় এবং

লোকসংস্কৃতি চর্চার ব্যক্তিগত প্রয়াস প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে প্রধানত বিদেশী মনীষীদের প্রচেষ্টায় । তাই বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চার ইতিহাসের দ্বিতীয় স্তরকে বিদেশী প্রচেষ্টাজাত সংহতির পর্ব বলা যায় । বাংলার লোকসংস্কৃতি চর্চার ইতিহাসের তৃতীয় পর্ব স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিকায় বিকশিত জাতীয় উদ্যোগের পর্ব। এই পর্বের প্রাতিষ্ঠানিক আত্মপ্রকাশ ঘটে ইংরেজবিরোধী স্বাধীনতা-সংগ্রামের জাতীয়তাবাদী প্রচেষ্টায় ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠায় । বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিকায় লোকসংস্কৃতি চর্চার ইতিহাসে তৃতীয় পর্বের উদ্‌বোধন ঘটে, যা স্বদেশানুরাগমূলক জাতীয় উদ্যোগের পর্ব হিসাবে চিহ্নিত হয় । ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীনতা লাভের ঘটনা শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নয় সাংস্কৃতিক কর্মপ্রচেষ্টার ক্ষেত্রেও নব-নব অঙ্গীকার বহন করে আনে । স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী লোকসংস্কৃতি চর্চায় ঐতিহ্যগর্বজাত জাতীয়তাবাদী ভাবাবেগের ছিল প্রাধান্য । স্বাধীনতা-পরবর্তী কালে লোকসংস্কৃতি চর্চায় বিদ্যায়তনিক প্রচেষ্টা বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে । এই পর্বে লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্যের শিক্ষাগত অনুশীলন প্রচেষ্টা মুখ্যত বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, সংগীত, শিল্পকলা প্রভৃতি জাতিবিদ্যামূলক বিষয়ের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায় । এই পর্বে আশুতোষ ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা পাঠক্রমে লোকসাহিত্য বিশেষ পত্রের অন্তর্ভুক্তি (১৯৬০-৬২ খ্রী.) বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা । স্বাধীনতা-পরবর্তী প্রাথমিক পর্যায়ে বিদ্যায়তনিক স্তরে লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতি পঠন-পাঠন ও গবেষণাদি অনুষ্ঠিত হয়েছে বিভিন্ন জ্ঞাতিবিদ্যার অনুষঙ্গে; তাই লোকসংস্কৃতির চতুর্থ পর্বকে জাতিবিদ্যাশ্রয়ী বিদ্যায়তনিক পর্ব বলা যায় । জাতিবিদ্যাশ্রয়ী লোকসংস্কৃতির বিদ্যায়তনিক কার্যক্রম ক্রমশ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, উত্তর বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিস্তার লাভ করে । পরবর্তী পর্যায়ে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বতন্ত্র লোকসংস্কৃতি বিভাগ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে (জানুয়ারি ১৫,১৯৯০) বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চার ইতিহাসে সৃষ্টি হয় এক নতুন অধ্যায়, যা লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞান-নির্ভর স্বকীয় শিক্ষাগত শৃঙ্খলার পর্ব হিসাবে উল্লেখযোগ্য ।

তিন

বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চার পূর্বাপর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, রবীন্দ্রনাথের লোকসংস্কৃতি-বিষয়ক প্রয়াস প্রধানত স্বদেশানুরাগমূলক জাতীয় উদ্যোগের পটভূমিকায় ছিল সুবিস্তৃত । স্বদেশী চিন্তা ও স্বদেশী অন্বেষা-নির্ভর এই যুগ ছিল লোকসংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে স্বর্ণযুগ ; যা ছিল মূলত Constructive Nationalism বা Militant Nationalism -ভাবধারায় অনুপ্রাণিত জাতীয় উদ্যোগের পর্ব । বলা যায় বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চায় স্বদেশানুরাগমূলক জাতীয় উদ্যোগের পর্বের অন্যতম প্রধান উদ্‌গাতা ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণও ঘটে এই পর্বের কালসীমায় (১৯৪১) দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় । এই পর্বে রবীন্দ্রনাথের জীবন-সায়াহ্নে বিশ্বব্যাপী ফ্যাসিবাদ-বিরোধী আন্দোলন প্রসারিত হয় এবং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সে আন্দোলনে যুক্ত হন বিশ্বমানবতার স্বপক্ষে ।[৭] এই আন্দোলনের পটভূমিকায় জীবনের প্রান্তসীমায় উপনীত রবীন্দ্রনাথ ফ্যাসিবিরোধী 'মহৎ ঘৃণা' ও 'ক্রোধ' অবলম্বনে নূতন প্রত্যয়ে সরব হয়ে ওঠেন । রম্যাঁ রল্যাঁ ফ্রান্সে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সক্রিয় সংগ্রামের জন্য গঠন করেছিলেন 'peoples theatre' । ফ্যাসিবাদ ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আতঙ্ক থেকে স্পেন, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে গঠিত হয়েছিল 'পিপলস্ থিয়েটার' । ভারতবর্ষেও সেই আন্দোলনের প্রভাবে গঠিত হয়েছিল "Indian Progressive Writer's Association" । ১৯৩৬ সালে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের সময় থেকে সর্বভারতীয় স্তরে যুদ্ধ ও ফ্যাসিস্ট-বিরোধী আন্দোলন প্রসার লাভ করে । ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলনের পথে ভারতবর্ষে সংগঠিত হয় গণনাট্য ও প্রগতি লেখক শিল্পী আন্দোলন । এই আন্দোলনকে আশ্রয় করে রাজনীতি-

সচেতন যে সাংস্কৃতিক আন্দোলন তৎকালে আত্মপ্রকাশ করে বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব বিশেষ লক্ষ্য করা যায় ।

দেশের লৌকিক ঐতিহ্য ও লোকসংস্কৃতির পুনরুদ্ধার ও ব্যবহার ছিল গণসংস্কৃতি আন্দোলনের অন্যতম বিশেষ লক্ষ্য ; যার সূত্রপাত হয়েছিল স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিকায় হিন্দুমেলা— স্বদেশী মেলা (১৮৬৭) —বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের (১৯০৫) জোয়ারে । ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে স্বদেশী আন্দোলন তথা রাজনৈতিক আন্দোলনে জাতীয়তাবাদের অবস্থান থেকে সমাজতান্ত্রিক বস্তুবাদের প্রসার গণমুখী নূতন সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পথ প্রশস্ত করেছে—যেখানে অধিকতর ব্যাপকতায় ব্যবহৃত হয়েছে লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্য । এইভাবে দেশাত্মবোধক স্বদেশী সংগীত ও স্বদেশী যাত্রার যুগের সৃষ্টি হয়েছে গণসংগীত ও গণনাট্য অন্দোলন এবং গণআন্দোলনের স্বার্থে ব্যবহৃত হয়েছে লোকসংস্কৃতির নানাবিধ উপাদান ও শিল্পীসমাজ । অবশ্য লোকসংস্কৃতির প্রতিশ্রুতিনির্ভর গণসংস্কৃতির আন্দোলনে ক্রমশ পাশ্চাত্যসংস্কৃতির প্রভাব এবং অন্যবিধ নানাপ্রকার প্রভাব সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং লোকসংস্কৃতি হয় বহুলাংশে নেপথ্যচারী । কিন্তু তৎসত্ত্বেও নিশ্চয় বলা যায় যে, বাংলায় মার্কসবাদ-সচেতন গণনাট্য বা প্রগতি লেখক সঙ্ঘের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ঐতিহাসিক ভূমিকা অনস্বীকার্য এবং বাংলার লোকসংস্কৃতির স্বপক্ষে তার ইতিবাচক ভূমিকার সুদূরপ্রসারী প্রভাবের প্রসঙ্গ অবশ্যমান্য । রাজনীতি-সচেতন গণনাট্য ও গণসংস্কৃতি আন্দোলনে বাস্তব জীবনের প্রতিবিম্ব এবং লোকসমাজ ও লোকসংস্কৃতির প্রতিধ্বনি যেমন সত্য, তেমন এ কথা সত্য যে গণসংস্কৃতি আন্দোলন কোনোক্রমেই লোকসংস্কৃতির প্রতিরূপ বা লোকসংস্কৃতির সমগোত্রীয় হয় নি; হওয়া সম্ভবপরও ছিল না । কারণ— "রূপশৈলীগত বা আঙ্গিক প্রকরণগত দিক থেকে লৌকিক বৈশিষ্ট্যের বহুল ব্যবহার থাকলেও গণসংস্কৃতি ভিন্ন প্রকারের সংস্কৃতি, যথার্থ অর্থে লোকসংস্কৃতি নয় ।"[৮] গণসংস্কৃতি ও লোকসংস্কৃতি অভিন্ন না হলেও বিগত পঞ্চাশ বছরের গণনাট্য এবং প্রগতি লেখক ও শিল্পী আন্দোলনের প্রাসঙ্গিকতা বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চার ইতিহাসে উপেক্ষার বিষয় নয় । সামগ্রিক বিচারে দেখা যায় দেশাত্মবোধক ও রাজনীতি-সচেতন সাংস্কৃতিক কর্মে লোকসংস্কৃতি চর্চার সচেতন ধারায় একপ্রান্তে আছে হিন্দুমেলা —স্বদেশী মেলা (১৮৬৭) এবং অন্যপ্রান্তে আছে বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলন (১৯৫৩) ; আর এই উভয় প্রান্তের মধ্যবর্তী স্তরে ব্যাপ্ত হয়ে আছে প্রগতি লেখক সঙ্ঘ (১৯৩৬), ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ (১৯৪২), ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ (১৯৪৩), ক্রান্তিশিল্পী সঙ্ঘ (১৯৪০ ?) প্রভৃতির সাংস্কৃতিক প্রয়াস । স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে লোকসংস্কৃতি চর্চা ক্রমশ সাংস্কৃতিক আন্দোলনের গণ্ডি অতিক্রম করে বিদ্যাচর্চার অনিবার্য অঙ্গ হয়ে ওঠে ।

বিগত পঞ্চাশ বৎসরের বিশেষত স্বাধীনতা-উত্তর লোকসংস্কৃতি চর্চার ইতিহাসের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য শিক্ষাগত শৃঙ্খলা-নির্ভর বৈজ্ঞানিক মন্যতার প্রাধান্য । খুব স্বাভাবিক কারণেই স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে লোকসংস্কৃতি চর্চায় স্বদেশানুরাগের ভাবাবেগ হ্রাস পায় এবং জাতীয়তাবাদী অনুরাগের স্থলে লোকসংস্কৃতি চর্চায় সূচিত হয় বিদ্যায়তনিক প্রচেষ্টা এবং শিক্ষাগত শৃঙ্খলা-নির্ভর সজ্ঞান অন্বেষা । সজ্ঞান সচেতনতায় লোকসংস্কৃতি অনুশীলনের অন্যতম প্রধান জাতীয় পথিকৃৎ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । রবীন্দ্রনাথ যেমন লোকসংস্কৃতি চর্চাকে দেশচেতনা এবং স্বদেশ প্রীতির অঙ্গ হিসাবে বিবেচনা করেছেন, তেমনি লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রকে "জ্ঞানের আদি নিকেতন" এবং "জনশিক্ষার নিম্নভূমিবর্তী উপত্যকা" হিসাবে গণ্য করেছেন । তিনি জাতীয় শিক্ষাকে পূর্ণ ও সজীব করার জন্য লোকসংস্কৃতি শিক্ষা ও চর্চার উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছেন । এদিক থেকে "ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ" ও স্বরচিত "তথ্য সংগ্রহ" এবং "শান্তিনিকেতন আশ্রমের শিক্ষানীতি" বিশেষ উল্লেখযোগ্য ।[৯] রবীন্দ্রনাথের লোকসংস্কৃতি চর্চার সক্রিয়তা তাঁর শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের বহুমুখী কর্মধারায় এবং শান্তিনিকেতনে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের 'লোকসাহিত্য' পড়ানোর ঘটনায়, বিশেষ ভাবে প্রত্যক্ষ করা যায় । শান্তিনিকেতন পত্রিকায় আশ্রম সংবাদ— এর সূত্রে জানা যায় যে রবীন্দ্রনাথ 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থটি নিয়মিত পড়াতেন এবং ছেলেভুলানো ছড়ার

তুলনামূলক আলোচনার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতেন। রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' কাব্য পড়ানোর বিশেষ ক্লাস নোট যিনি নিতেন, সেই প্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্তই রবীন্দ্রনাথের লোকসাহিত্য পড়ানোর তথ্য পরিবেশন করেছেন একটি পত্রে

"স্নেহের তুষার,

তোমার প্রশ্নের উত্তরে জানাচ্ছি যে 'বলাকা পড়ানোর পর ক্লাশে গুরুদেব 'ছেলেভুলানো ছড়া'র প্রবন্ধটি পড়ান। যতদূর মনে পড়ে ঐ প্রবন্ধ পড়ানোর সময়ে তিনি বিদেশে লোকসাহিত্য লোকসংস্কৃতি চর্চা ও পঠন-পাঠনের কথা বলেন। আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি ছড়ার তুলনামূলক আলোচনার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং এই প্রসঙ্গে সকলকে অগ্রণী হতে আহ্বান জানান। আলোচনার সময়ে তিনি ছড়া ছাড়াও লোকসাহিত্যের ও লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপকরণ সংগ্রহের কথা বলেন। তিনি এই ব্যাপারে নিজের সংগ্রহ— প্রচেষ্টার কথার উল্লেখ করেন। তুমি "শান্তিনিকেতন" পত্রিকার "আশ্রম সংবাদ" অনুসন্ধান করলে এ সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাবে বলে মনে করি।...

প্রীতি ও শুভেচ্ছা জেনো
প্রদ্যেত কুমার সেনগুপ্ত
"প্রদ্যোত দা"[১০]

মোটের উপর বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেমন লোকসংস্কৃতির উপাদানাদি সংগ্রহ ও সংকলন করেছেন, তেমন লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে মননসিদ্ধ আলোচনা ও পঠন-পাঠনের পথও প্রস্তুত করেছেন। তাই বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চার ইতিহাসে স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে যে জাতিবিদ্যাশ্রয়ী বিদ্যায়তনিক পর্বের প্রসার, তার প্রস্তুতি-পর্ব শুরু হয়েছিল স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেরই ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায়। স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চায় যে বিদ্যায়তনিক পর্বের উদ্‌বোধন ঘটে তার সূচনা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের প্রচেষ্টাই সংগঠিত হতে দেখা যায়— সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বালাবার পূর্বে সলতে পাকানো ইতিহাসের ন্যায়।

রবীন্দ্রনাথের প্রেরণা, দীনেশচন্দ্র সেনের প্রচেষ্টা এবং স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমাবধি লোকসাহিত্য বিষয়ে বিশেষ চর্চা শুরু হয়। প্রথম বাংলা এম. এ. পরীক্ষার (১৯২০) পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিল "ময়নামতীর গান"। লোকসাহিত্যের উপাদান সংগ্রহে সংগ্রাহক নিয়োগ, প্রকাশনা, গবেষণা ও পঠন-পাঠনের ব্যবস্থায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা স্মরণীয়। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের ধারাকে অনুসরণ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যায়তনিক স্তরে লোকসাহিত্য চর্চায় নূতন প্রাণাবেগ সৃষ্টি করেন আশুতোষ ভট্টাচার্য। স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে প্রধানত ড. ভট্টাচার্যের উদ্যোগে লোকসাহিত্যের বিদ্যায়তনিক পর্ব ষ্টতা লাভ করে। বিদ্যায়তনিক পর্বে বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চার ইতিহাসে তিনটি ধারা বা স্তর লক্ষ্য করা যায় :

১. জাতিবিদ্যানুসারী বিচ্ছিন্ন ধারা
২. জাতিবিদ্যানুসারী বিশেষ ধারা
৩. শিক্ষাগত শৃঙ্খলা-নির্ভর স্বকীয় ধারা

প্রাথমিক পর্যায়ে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে লোকসাহিত্য বা লোকসংস্কৃতির বিষয়াদি "বিচ্ছিন্ন ভাবে" পঠিত হত। পরবর্তী পর্যায়ে অন্য বিষয়ের অন্তর্গত বিষয় হিসাবে লোকসাহিত্য বা লোকসংস্কৃতি "বিশেষপত্ররূপে" অন্তর্ভুক্ত হয়। আরো পরবর্তীকালে এই দুইধারার সুপরিণতি ঘটে লোকসংস্কৃতিবিদ্যার স্বতন্ত্র শিক্ষাগত শৃঙ্খলা-নির্ভর স্বকীয় বিষয়গত স্বীকৃতির মধ্যে। আশুতোষ ভট্টাচার্যের প্রচেষ্টায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে "লোকসাহিত্য" বিষয়টি

অন্যতম ঐচ্ছিক বিষয় বা "বিশেষপত্র" হিসাবে বাংলা স্নাতকোত্তর বিভাগে পাঠ্য হয় (১৯৬০—৬২)। লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতিবিদ্যা প্রসারের ক্ষেত্রে অজিতকুমার ঘোষ, হরিপদ চক্রবর্তী, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবতোষ দত্ত, নীলরতন সেন প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে স্মর্তব্য। মূলত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে পরবর্তীকালে রবীন্দ্রভারতী ও কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এম. এ. পাঠক্রমে "লোকসাহিত্যের" স্থলে "লোকসংস্কৃতি" পাঠ্য বিষয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয়। সাম্প্রতিককালে এ বিষয়ে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচেষ্টাও স্মরণীয়। ক্রমশ অন্য বিদ্যা-নিরপেক্ষ বিষয় হিসাবে লোকসংস্কৃতির স্বতন্ত্র মর্যাদার প্রশ্নটি প্রাধান্য লাভ করে। আশুতোষ ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনাচক্রে (১৯৭২) স্নাতকোত্তর স্তরে লোকসংস্কৃতির পূর্ণাঙ্গ পাঠক্রম ও স্বতন্ত্র লোকসংস্কৃতি বিভাগ প্রতিষ্ঠার এক যুগোপযোগী প্রস্তাব উত্থাপিত ও গৃহীত হয়। স্বতন্ত্র লোকসংস্কৃতি বিদ্যার প্রতিষ্ঠায় প্রস্তাবটি নিঃসন্দেহে এক ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন দলিল যা নিম্নরূপ—

> "কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের সুবর্ণ-জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত বর্তমান আলোচনাচক্রে শিক্ষাগত শৃঙ্খলায় লোকসাহিত্য— লোকসংস্কৃতি পঠন-পাঠনের বর্তমান ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রস্তাব করছে যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃত্বে "ফোকলোর" তথা লোকসংস্কৃতিকে স্নাতকোত্তর স্তরে একটি পূর্ণাঙ্গ পাঠ্য বিষয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হোক এবং লোকসংস্কৃতি অনুশীলনের স্বতন্ত্র বিভাগ গঠন করা হোক।"[১১]

পরবর্তী পর্যায়ে ঐ প্রস্তাবের ধারা অনুসরণ করে 'বাংলার লোকসাহিত্য' গ্রন্থের চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশের কালে (১৯৭৩) স্বতন্ত্র লোকসংস্কৃতি বিদ্যার বিভাগের প্রস্তাবটি আশুতোষ ভট্টাচার্য বিশেষভাবে সমর্থন করে বলেন যে— "এই কথা মনে হইতেছে যে স্নাতকোত্তর বিভাগে একটি মাত্র ঐচ্ছিক পত্রদ্বারা এই বিষয়ের যথার্থ মর্যাদা রক্ষা পাইতেছে না। প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়েই বাংলার লোকশ্রুতি (Flok lore) বিষয়ে একটি আনুপূর্বিক স্বয়ংসম্পূর্ণ বিভাগ থাকা একান্ত আবশ্যক।"[১২] স্বতন্ত্র লোকসংস্কৃতিবিভাগ প্রতিষ্ঠার এই প্রচেষ্টা পরবর্তী পর্যায়ে ফলবতী হয় মূলত কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃত্বে। লোকসাহিত্য বিষয়টিকে সরকারিভাবে প্রতিষ্ঠা দিতে সাহায্য করেন তৎকালীন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র এবং কল্যাণীর প্রাক্তন উপাচার্য কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত। প্রধানত কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচেষ্টাতেই সামগ্রিক ভাবে "লোককৃতি" বা ফোকলোর বিষয় হিসাবে অগ্রাধিকার লাভ করে। স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গে "দশম আন্তর্জাতিক নৃতত্ত্ব কংগ্রেসের" অঙ্গ হিসাবে "আন্তর্জাতিক লোকসংস্কৃতি সম্মেলন"-এর অনুষ্ঠান (১৯৭৮) ভারতীয় লোকসংস্কৃতি চর্চার ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। আন্তর্জাতিক লোকসংস্কৃতি সম্মেলনের কয়েক বৎসরের মধ্যেই কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে "Instiute of Folklore" প্রতিষ্ঠিত হয় (১৯৮২)। ১৯৯০ সালের জানুয়ারি মাসে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে প্রথম পূর্ণাঙ্গ স্বতন্ত্র লোকসংস্কৃতি বিভাগের প্রতিষ্ঠা হয় কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে।

চার

বাংলা লোকসংস্কৃতিচর্চার পূর্বাপর ইতিহাস পর্যালোচনায় এই সত্য উপলব্ধ হয় যে, বিদ্যায়তনিক প্রযত্নে লোককৃতি বা Folklore-এর বৈজ্ঞানিক পরিমণ্ডলে লোকসংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্র প্রসারিত হওয়ার পশ্চাতে আছে নানা প্রকার

ব্যক্তিগত প্রয়াসের সক্রিয়তা। এ তথ্য সুবিদিত সে, রবীন্দ্র-সমকালীন ও রবীন্দ্রোত্তর লোকসংস্কৃতিচর্চার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন— রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, বিনয় সরকার, হরিদাস পালিত, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, দীনেশচন্দ্র সেন, দীনেন্দ্রকুমার রায়, শরৎচন্দ্র রায়, শিবরতন মিত্র, চন্দ্রনাথ দে, কালিদাস দত্ত, নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী, গুরুসদয় দত্ত প্রভৃতি। এঁদের লোকসংস্কৃতি-বিষয়ক চর্চায় রবীন্দ্র-প্রদর্শিত জাতীয় সম্পদ পুনরুদ্ধারের প্রয়াসই মুখ্য স্থান গ্রহণ করে। জাতীয়তাবাদী চেতনার পাশাপাশি লোককৃতির ব্যাপ্ত পরিমণ্ডলে লোকসংস্কৃতি অনুশীলনের ক্ষেত্রটি সুস্পষ্ট রূপ লাভ করে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে। আধুনিক অর্থে লোকসংস্কৃতি চর্চার পূর্বসূরী হিসাবে আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুশীলকুমার দে, নীহাররঞ্জন রায়, গোপাল হালদার প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁদের বিভিন্ন রচনায় বঙ্গদেশ, বাংলার জনজাতি, আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং বাংলা সংস্কৃতির নানা প্রসঙ্গ বিভিন্নভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে যা বাংলার লোকসংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রকে করেছে পরিপুষ্ট।

ভাষাবিজ্ঞানী হিসাবে প্রখ্যাত হলেও আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সংস্কৃতি প্রসঙ্গে বিশেষত বাংলা সংস্কৃতি প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। ভাষাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি জ্ঞানের ব্যাপক পরিধি থেকে তিনি বঙ্গ-ভারতীয় সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। তাঁর সংস্কৃতি-সম্পর্কিত আলোচনার মধ্যে— 'ভারত সংস্কৃতি', 'ভারতের ভাষা ও ভাষা সমস্যা', 'সাংস্কৃতিকী' (চার খণ্ড), 'সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস', 'বাঙ্গালীর সংস্কৃতি' প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সুনীতিকুমার বিশেষ ভাবে ভারত সংস্কৃতি ও ভারতীয় সভ্যতা-ঐতিহ্যে আর্য ও অনার্য মিশ্র বা সমন্বিত রূপের কথা বিশেষভাবে ব্যক্ত করেছেন এবং ভারত সংস্কৃতির সঙ্গে বঙ্গ সংস্কৃতির সংযোগ সূত্রটি নির্দেশ করেছেন। তিনি *Kiratajanakriti, Indianism and the Indian Synthesis* এবং *Religious and Cultural Integration of India* প্রভৃতি গ্রন্থে বিশেষভাবে বঙ্গভারতীয় সংস্কৃতির আর্য-অনার্য সমন্বিত রূপ ও লোকায়ত ভিত্তির প্রতি বিশেষভাবে আলোকপাত করেছেন। প্রাক্‌বৈদিক জীবনবোধ এবং গ্রামীণ সংস্কারই যে বাংলা সংস্কৃতির নিজস্ব ভাব-ভাবনার ভিত্তি এই তত্ত্ব তিনি বিশেষভাবে প্রকাশ করেছেন। সুপ্রাচীন কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত বিচিত্র ভাব-সম্পদ যে আমাদের দেশীয় সংস্কৃতির বৈচিত্র্যকে বিকশিত করেছে সে কথাও বিশেষভাবে তিনি বর্ণনা করেছেন। সুনীতিকুমার "জাতি সংস্কৃতি ও সাহিত্য" এবং "ইতিহাস ও সংস্কৃতি" প্রবন্ধে বিশেষভাবে পল্লীকেন্দ্রিক বাংলা সংস্কৃতির লৌকিক বৈশিষ্ট্য উদ্‌ঘাটন করেছেন এবং বাংলা সংস্কৃতির নিজস্ব রূপকে প্রধানত প্রত্যক্ষ করেছেন— বাংলার গৃহ-স্থাপত্যে, কুটীর শিল্পে, উৎসব-অনুষ্ঠানে, লোকশিল্প লোকনৃত্য প্রভৃতির পরম্পরাগত ধারায়। তিনি একদিকে লোকায়ত দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলা ভাষা ও বাঙালি জাতির প্রকৃত রূপ বিশ্লেষণ করেছেন এবং অন্যদিকে লোকসংস্কৃতির মাধ্যমেই যে আমাদের জাতীয় জীবনের যথার্থ পরিচয় উদ্‌ঘাটন সম্ভব, সেই তথ্য নির্দেশ করে বলেছেন— "উৎপত্তি ও বিকাশের দিক দিয়া, লৌকিক দেবতা লোকধর্ম ও লোকযানের আলোচনা সবেমাত্র আরম্ভ হইয়াছে। এগুলির মধ্যে আমাদের সৃজ্যমান বাঙ্গালী জাতির সংস্কৃতির এবং আধুনিক বাঙ্গালী গ্রামীণ সংস্কৃতির অনেক রহস্য লুক্কায়িত রহিয়াছে।" [১৩]

বিগত পঞ্চাশ বৎসরের বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চার ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য নাম সুশীলকুমার দে। সুশীলকুমার দে-র 'বাংলা প্রবাদ' গ্রন্থটি বাংলা প্রবাদ চর্চার ইতিহাসে অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। সুপণ্ডিত সুশীলকুমার দে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য, ভাষাতত্ত্ব ও সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ হলেও বিশেষভাবে লোকসংস্কৃতির অনুরাগী ছিলেন। উইলিয়াম মর্টন ও রেভারেণ্ড জেমস লঙের প্রবাদ সংকলন অবলম্বন করে সুশীলকুমার তাঁর কাজ শুরু করেছিলেন। প্রধানত প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্য গ্রন্থ থেকে এবং প্রবাদের সংকলন গ্রন্থসমূহ থেকে উপাদান নিয়ে তিনি 'বাংলা প্রবাদ' গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে, দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে এবং পরিবর্তিত তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দে।

তৃতীয় সংস্করণটি সম্পাদনা করেন ভবতোষ দত্ত ও তুষার চট্টোপাধ্যায় । এই সংস্করণে সংযোজন অংশে উত্তর বঙ্গ, পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গ ও বাংলা দেশের অতিরিক্ত ১৫০০ প্রবাদ সংকলিত হয়েছে । মূল বাংলার প্রবাদ গ্রন্থ সংকলনে সুশীলকুমার W.G. Smith -সম্পাদিত *Oxford Dictionary of English Proverbs* গ্রন্থকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করলেও গ্রন্থ সংকলন ও সম্পাদনায় তিনি বিশেষ স্বকীয়তার পরিচয় দিয়েছেন । এই গ্রন্থের ভূমিকাটি বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে বিশেষত প্রবাদের সাহিত্যগত মূল্যবিচারের ক্ষেত্রে বিশেষ মূল্যবান । গ্রন্থের শেষাংশে যুক্ত প্রবাদ ও প্রবচনের প্রমাণপঞ্জী এবং প্রয়োজনীয় শব্দের সূচী অংশদুটিও বিশেষ সহায়ক । মূলত পাশ্চাত্য সাহিত্য ও সংস্কৃত সাহিত্যে বিদগ্ধ পণ্ডিত হিসাবে স্বীকৃত সুশীলকুমার দে "বাংলা প্রবাদ" বিষয়ক একটি মাত্র গ্রন্থে লোকসংস্কৃতি চর্চার যে নূতন পথের দিক নির্দেশ করেছেন তা বিস্ময়কর ।

'বাঙ্গালীর ইতিহাস' গ্রন্থের জন্য স্বনামধন্য নীহাররঞ্জন রায় বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ নাম । দেশ বিভাগের দুই বৎসরের মধ্যে প্রকাশিত হয় 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' যা অখণ্ড বাংলার রাষ্ট্র, সমাজ ও সংস্কৃতির ইতিহাসের এক অমূল্য গ্রন্থ । আচার্য যদুনাথ সরকারের ভাষায় বলা যায়— "এই গ্রন্থ বাঙ্গালীর লোক-ইতিহাস" । রমেশচন্দ্র মজুমদার -সম্পাদিত 'বাংলা দেশের ইতিহাস', সুকুমার সেন -রচিত 'প্রাচীন বাঙলা ও বাঙালী' এবং 'মধ্যযুগের বাঙলা ও বাঙালী', 'বঙ্গভূমিকা' গ্রন্থত্রয় এবং প্রবোধচন্দ্র সেনের আলোচনাদির কথা স্মরণে রেখেও বলা যায় নীহাররঞ্জন রায়ের "বাঙ্গালীর ইতিহাস' এক অনন্য রচনা, যা বাংলার লোকসংস্কৃতি চর্চার এক মূল্যবান আকর গ্রন্থ । 'কৃষ্টি কালচার সংস্কৃতি' গ্রন্থে এবং "ইতিহাস রচনার সাম্প্রতিক একটি পদ্ধতি" প্রবন্ধে লেখক বিশেষভাবে ইতিহাস রচনায় ক্রনিকল স্তর অতিক্রম করে সরেজমিন গবেষণায় দেশ-কাল ধৃত মানবগোষ্ঠীর সামগ্রিক পরিচয় উদ্‌ঘাটনের কথা বিশেষভাবে ব্যক্ত করেছেন । সরাসরি Folklore বা লোককৃতি সম্পর্কে আলোচনা না করলেও কালচার, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির অর্থ সন্ধান এবং প্রস্তাবনা নিবন্ধে নীহাররঞ্জন রায় বিশেষভাবে সংস্কৃতির তত্ত্বগত রূপ ব্যাখ্যা করেছেন এবং সংস্কৃতির মধ্যে চিত্তোৎকর্ষ ধ্যানধারণার পাশাপাশি লোকায়ত জীবনের পরিব্যাপ্ত কর্মসাধনার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন । বৈদিক কৃষ্টি শব্দের মূলানুসরণের সূত্রে তিনি যে বিশেষভাবে দেশ, দেশের মানুষ এবং জনজাতির জীবনধারার বাস্তবতায় কৃষ্টি ও সংস্কৃতির প্রসারিত অর্থের সন্ধান করেছেন তা বহুলাংশে লোকসংস্কৃতির তত্ত্বানুভূতির অনুকূল । সংস্কৃতিকে ব্যবহারিক জীবনচর্যা ও মানসচর্চার ব্যাপক পরিকল্পনায় গ্রহণ করে নীহাররঞ্জন রায় রচনা করেছেন 'প্রাচীন বাংলার দৈনন্দিন জীবন' গ্রন্থটি । এই ক্ষুদ্রাকৃতি গ্রন্থে লেখক বিশেষভাবে তত্ত্বগত ইতিহাসের লিপিবদ্ধ রূপের বাইরে দৈনন্দিন জীবনের চলমান রূপের মধ্যে বাংলার সংস্কৃতিকে অনুধাবন করেছেন । দশম আন্তর্জাতিক নৃতত্ত্ব ও জাতিতত্ত্ব কংগ্রেসের 'লোকসংস্কৃতি শাখা'র উদ্‌বোধনী ভাষণে (১৯৭৮) নীহাররঞ্জন রায় ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে লোকসংস্কৃতি ও লিটল ট্র্যাডিশনের কথা বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করেন । এই প্রসঙ্গে তিনি ভারতীয় ইতিহাসের ক্ষেত্রে শাস্ত্রাচার এবং দেশাচার, লোকাচারের প্রতি বিশেষ ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন । পরবর্তীকালে প্রকাশিত "জাতীয় সংহতি ও বিচ্ছিন্নতাবাদ" প্রবন্ধে নীহাররঞ্জন রায় দেশাচার, লোকাচার, আঞ্চলিক সত্ত্ব, কমিউনিটি অব্ কালচার, লিটল ট্র্যাডিশনস্, কমিউনাল ওনারশিপ প্রভৃতি প্রসঙ্গ বিশেষভাবে পর্যালোচনা করেছেন । "কর্ষণ সংস্কার : কৃষ্টি সংস্কৃতি" প্রবন্ধে তিনি যেভাবে বলেছেন— সংস্কৃতি জীবনে পরিব্যাপ্ত । প্রজনন ক্রিয়া থেকে আরম্ভ করে আমৃত্যু মানুষ যত কর্মে লিপ্ত হয়, সমস্তই কর্ষণ কর্ম তথা সংস্কৃতি কর্ম, তা প্রকৃতপক্ষে মেটিরিয়াল ও ফর্মালাইজড় ফোকলোরের সামগ্রিক চেতনাকেই নির্দেশ করে । সমাজ ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে নীহাররঞ্জন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে লোকসংস্কৃতি বিষয়ে যে আলোক-সম্পাত করেছেন তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । লোকসংস্কৃতির বিদ্যায়তনিক পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন উৎসাহী । জানা যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের পাঠক্রমে লোকশিল্পের অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে এবং কলাবিভাগের অধ্যক্ষ (ডিন) হিসাবে

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে লোকসাহিত্য বিশেষ পত্র পঠন-পাঠনের ব্যবস্থার নীহাররঞ্জন বিশেষ উদ্যোগ করেছিলেন। বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চার ইতিহাসে নীহাররঞ্জন রায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বিগত পঞ্চাশ বছরের বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চার ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব গোপাল হালদার। বাংলার সংস্কৃতি জগতে 'সংস্কৃতির রূপান্তর' গ্রন্থের জন্য তাঁর খ্যাতি সর্বজনবিদিত। সংস্কৃতি-সম্পর্কিত তাঁর বিস্তৃত আলোচনা গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে। ১৯২৭-২৮ সালে গোপীচন্দ্রের উপাখ্যান বিষয়ে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে গবেষণার সূত্রে তাঁর সমাজ ও সংস্কৃতি ভাবনার শুরু। পরবর্তীকালে বিশেষভাবে লোকশব্দ ও লোকজীবন অনুযায়ী ভাষাতত্ত্বের গবেষণায় তিনি আত্মনিয়োগ করেন। এই সময় থেকেই ভারত সংস্কৃতি ও দেশজ সংস্কৃতি সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত হয়। এই সময় গোপাল হালদার মার্কসীয় চেতনায় অনুপ্রাণিত হয়ে সংস্কৃতি ভাবনায় নবতর জিজ্ঞাসায় 'সংস্কৃতির রূপান্তর' গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে তিনি বিশ্বসংস্কৃতির অবতারণা করেন এবং সংস্কৃতির বস্তুগত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেন। সংস্কৃতির তত্ত্বরূপ বিশ্লেষণ, ইতিহাসের ধারায় বঙ্গভারতীয় সংস্কৃতির রূপনির্ণয় এবং সংস্কৃতির রূপান্তরের প্রক্রিয়া অনুসন্ধান এই গ্রন্থের মূল বিষয়। প্রাসঙ্গিক ভাবে ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা বিশ্লেষণে লেখক বাংলার সংস্কৃতির রূপ ও বৈচিত্র্য এবং লৌকিক বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি স্পষ্টতই "বাংলার কালচার" এবং "বাংলার সংস্কৃতি"কে যথাক্রমে "বাবু কালচার" ও "লোককৃষ্টি" হিসাবে নির্দেশ করেছেন এবং বাংলার নিজস্ব জনসংস্কৃতির লোকায়ত ভিত্তিমূলের দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বাংলার লোকসাহিত্য, সংগীত, নৃত্য, শিল্পকলা, ধর্ম, লৌকিক দেবদেবী, লোক উৎসব-অনুষ্ঠান, খাদ্যদ্রব্য প্রভৃতি সমগ্র বিষয় সম্পর্কে বিশ্লেষণধর্মী গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। পরবর্তীকালে অনুরূপ বিষয়ে তাঁর আর দুটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয় 'বাঙালী সংস্কৃতির রূপ' (১৯৪৭) এবং 'বাঙালী সংস্কৃতি প্রসঙ্গ' (১৯৫৬)। এই গ্রন্থদ্বয়ের অনেক রচনা সমসাময়িকতার দ্বারা সীমাবদ্ধ হলেও এর বেশ-কয়েকটি রচনায় বাংলা জনজাতি, ভাষা ও সংস্কৃতির প্রকৃতি বিশ্লেষিত হয়েছে এবং বিশেষভাবে লোকসংস্কৃতির ও লোকসাহিত্যের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোকপাত করা হয়েছে।'বাঙালী সংস্কৃতি প্রসঙ্গ' গ্রন্থে বাংলা সাহিত্যের পটভূমি-বিষয়ক আলোচনায় গোপাল হালদার বিশেষভাবে লোকজীবন ও লোকসংস্কৃতির প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন এবং বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে উচ্চ বর্গ ও নিম্নবর্গের সংস্কৃতি বা লৌকিক ও পৌরাণিক সংস্কৃতির "আপস রফা" তথা সংঘাত ও সমন্বয়ের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেছেন। তিনি স্পষ্টতই বলেছেন— দু-বাংলার অখণ্ড সম্পদ লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতি। বাংলা লোকসাহিত্যের সম্ভাব্যতা-বিষয়ক আলোচনায় তিনি স্পষ্টতই বলেছেন— "বাংলার জাতীয় সংস্কৃতির অর্থ এই লোকসংস্কৃতি, আর জাতীয় সাহিত্যের অর্থ এই লোক-সাহিত্য"।[১৪] স্বল্পায়তনে তিনি যেমন লোকসাহিত্যের জন্ম নক্ষত্র নিরূপণ করেছেন, তেমন সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে লোকসাহিত্যের ও সংস্কৃতির করেছেন মূল্যায়ন। আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি যেমন আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অসংগতির (পাশ্চাত্য মোহ ও লৌকিক ঐতিহ্য বিস্মরণ) প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন তেমন লৌকিক ঐতিহ্য ও আধুনিক জীবন দর্শনের সমন্বয়ে বাঙালির জাতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির মুক্তির পথ নির্দেশ করেছেন। পরবর্তীকালে তুষার চট্টোপাধ্যায়ের 'লোকসংস্কৃতির তত্ত্বরূপ ও স্বরূপ সন্ধান' গ্রন্থের বিষয়বস্তুর সূত্রে ভূমিকায় (১৯৮৫) গোপাল হালদার লোকসংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে বিশেষ আলোচনা করেছেন এবং বিশেষভাবে লোকসংস্কৃতিবিদ্যার বৈজ্ঞানিক পঠন-পাঠন ও প্রয়োজনীয়তার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। মোটের উপর সংস্কৃতির সাধারণ তত্ত্ব আলোচনা এবং বাঙালি সংস্কৃতির প্রকৃতি ও লোকসংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনায় গোপাল হালদার বহু অনালোচিত দিকে নূতন আলোকসম্পাত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে লোকসংস্কৃতির সুবিস্তৃত ও সুগভীর আলোচনায় এবং মার্কসবাদী দৃষ্টিতে লোকসংস্কৃতির মূল্যায়নের প্রসঙ্গে গোপাল হালদারের অগ্রণী ভূমিকা ভোলার নয়। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে পরবর্তীকালে

প্রকাশিত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'মার্কসীয় দৃষ্টিতে লোকসংস্কৃতি' (১৯৮৬) গ্রন্থটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এই গ্রন্থে লোকসাহিত্য ও লোককথাই মূল আলোচ্য বিষয়, লোকসংস্কৃতি নয় । লেখক আলোচনা প্রসঙ্গে 'ফোকলোর' বা 'লোককথা'কে পূর্বাপর সমগোত্রীয় রূপে উল্লেখ ও ব্যাখ্যা করেছেন এবং বিভিন্ন অধ্যায়ে লোকসাহিত্য ও লোককথারই পর্যালোচনা করেছেন, সমগ্র লোকসংস্কৃতির প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ করেন নি । গ্রন্থের নামটি বিভ্রান্তিকর হলেও লেখকের আলোচনাগুলি বিশেষ মূল্যবান । সবশেষে বলা যায় মার্কসবাদী দৃষ্টিতে লোকসংস্কৃতির মূল্যায়নে গোপাল হালদারের পরবর্তী কালে সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের প্রচেষ্টা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এই প্রসঙ্গে অরুণ রায়ের নামও স্মরণীয় ।

একালের বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চার ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট নাম— বিনয় ঘোষ । প্রত্যক্ষভাবে নৃতত্ত্বের ছাত্র না হলেও বিগত পঞ্চাশ বছরের বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চার ইতিহাসে নৃ-সমাজবিজ্ঞানগত দৃষ্টিকোণ থেকে নূতন পথ প্রদর্শন করেছেন বিনয় ঘোষ । কমিউনিস্ট পার্টির ও গণনাট্য আন্দোলনের প্রত্যক্ষ কর্মী হিসাবে বিনয় ঘোষ সুপরিচিত ছিলেন গ্রামবাংলা ও দেশজ সংস্কৃতির সঙ্গে । স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে দেশজ সংস্কৃতি তথা লোকসংস্কৃতি চর্চায় তিনি বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করেন । স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে সরেজমিন ক্ষেত্র গবেষণা ও সমাজবিজ্ঞানসম্মত অনুশীলন রীতি প্রয়োগ করে বিনয় ঘোষ একক প্রচেষ্টায় রচনা করেন বিপুলায়তন মূল্যবান গ্রন্থ 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' ।[১৫] ১৯৫১ থেকে ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের কালসীমায় তিনি ক্ষেত্রানুসন্ধান পরিচালনা করেন, যা "কালপেঁচার বঙ্গদর্শন" নামে 'যুগান্তর' পত্রিকায় তিন বৎসর ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয় । বিনয় ঘোষর 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' পরবর্তীকালে চার খণ্ডে [১৬] প্রকাশিত হয়, যা বাংলার আঞ্চলিক ও লোকসংস্কৃতি পর্যালোচনার আকর গ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত হয় । বিনয় ঘোষের পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি আপাতদৃষ্টিতে একান্তভাবে লোকসংস্কৃতি চর্চার সঙ্গে সম্পর্কিত বলে মনে হলেও, এটি মূলত লোকজীবন ও আঞ্চলিক সংস্কৃতি-নির্ভর মূল্যবান আকর গ্রন্থ । কারণ এই শ্রেণীর সংস্কৃতিবলয়ভুক্ত আঞ্চলিক ইতিহাস ও সমাজ কাঠামোর পর্যালোচনা লোকসংস্কৃতি অনুশীলনেরই অন্তর্ভুক্ত বিষয় । এই গ্রন্থাবলী একদিকে যেমন পল্লীপরিক্রমানির্ভর তথ্যবহুল আঞ্চলিক ইতিহাস, তেমন অন্য দিকে বাংলার জনজাতির লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে সমীক্ষা-নির্ভর মূল্যবান গবেষণাগ্রন্থ । লেখকের বহু মতামত সম্পর্কে দ্বিমতের অবকাশ থাকলেও তাঁর রচনাকে নিঃসন্দেহে বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চার অমূল্য সম্পদ হিসাবে গণ্য করা যায় । বিনয় ঘোষের অপর একটি মূল্যবান গ্রন্থ 'বাংলা লোকসংস্কৃতির সমাজ তত্ত্ব' । এই গ্রন্থে বিনয় ঘোষ বাংলার লোকশিল্প ও শিল্পীজীবন, বাংলার লোকধর্ম ও উৎসব-পার্বণ সম্পর্কে বিস্তৃত গবেষণামূলক আলোচনা করেছেন । এই গ্রন্থে তিনি বিশেষভাবে রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লোকসংস্কৃতি-বিষয়ক কর্মের মূল্যবান মূল্যায়ন করেছেন । সর্বোপরি বিনয় ঘোষ এই গ্রন্থে লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন তত্ত্বগত প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন । বিশেষত সাংস্কৃতিক প্রসারণ, ঐতিহ্য, অঞ্চলগত ও বৃত্তিগত স্তরন্যাস, সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণ, সামাজিক মানসিক ব্যবধান প্রভৃতি বিষয়ে সুগভীর আলোকপাত করেছেন । আলোচনা প্রসঙ্গে বিনয় ঘোষ যেভাবে দরবারি সংস্কৃতি, শহুরে সংস্কৃতি, বারজন সংস্কৃতি ও লোকসংস্কৃতির পার্থক্য নিরূপণ করেছেন তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । মোটের উপর বিনয় ঘোষের লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত দৃঢ় বলে মনে হয় । প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে বিদ্যায়তনের সঙ্গে যুক্ত না থাকলেও বিনয় ঘোষ স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে বাংলার লোকসংস্কৃতি চর্চায় শিক্ষাগত শৃঙ্খলা-নির্ভর মনন চর্চার সুদৃঢ় পথ প্রশস্ত করেন ।

রবীন্দ্রোত্তর লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাসে নূতন প্রাণাবেগ সঞ্চার করেন আশুতোষ ভট্টাচার্য । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রচেষ্টায় দীর্ঘকাল পূর্বে লোকসাহিত্যের গুরুত্ব শিক্ষিত সমাজে উপস্থাপিত হলে তাঁর ক্ষেত্রটি বহু প্রসারিত ছিল না । আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের ধারাকে অনুসরণ করে বিদ্যায়তনিক স্তরে লোকসাহিত্য চর্চায় নূতন ধারার প্রসারণ ঘটান আশুতোষ ভট্টাচার্য । প্রাথমিক কর্মজীবনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কালে আশুতোষ ভট্টাচার্য

বিশেষভাবে সুশীলকুমার দে, মহম্মদ শহীদুল্লাহ এবং জসীমউদ্দীনের সান্নিধ্যে আসেন । লোকসংস্কৃতি-প্রেমিক এই তিন জন গবেষকের সান্নিধ্য তাঁকে লোকসাহিত্য চর্চায় বিশেষ অনুপ্রাণিত করে বলে জানা যায় । পরবর্তীকালে আশুতোষ ঢাকা পরিত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গে আসেন এবং অ্যানথ্রপলজিক্যাল সার্ভে অফ্ ইণ্ডিয়ায় ভেরিয়ার এলুইনের গবেষণা-সহযোগী রূপে কর্মে নিযুক্ত হন । ভেরিয়ার এলুইনের প্রত্যক্ষ প্রেরণায় তিনি "শৌখিন বিলাস"-এর পথ পরিত্যাগ করে লোকসংস্কৃতি চর্চায় আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীর সঙ্গে পরিচিত হন এবং কালক্রমে লোকসাহিত্যে গবেষক হিসাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করেন। জানা যায় ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে শান্তিনিকেতনে যে সাহিত্য মেলা অনুষ্ঠিত হয় সেখানে আশুতোষ বাংলার লোকসাহিত্যে প্রতিবেশী উপজাতির দান সম্পর্কে একটি ভাষণ দেন । পরে অন্নদাশঙ্কর রায় ও অজিত দত্তের প্রেরণায় তিনি বাংলার লোকসাহিত্য -বিষয়ক একখানি আনুপূর্বিক গ্রন্থ রচনায় অগ্রসর হন । 'বাংলার লোকসাহিত্য' গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে । পরবর্তীকালে আশুতোষ বাংলার লোকসাহিত্য গ্রন্থটিকে সুপরিকল্পিত ভাবে ছটি খণ্ডে বিভক্ত ও প্রকাশ করেন । বাংলা লোকসাহিত্যের প্রথম খণ্ডটি মূলত লোকসাহিত্য-সম্পর্কিত সাধারণ আলোচনামূলক গ্রন্থ । এই গ্রন্থে তিনি বিশেষভাবে লোকসাহিত্যের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি, লোকসাহিত্যের বিষয়বস্তু, লোকসাহিত্য ও শিল্পসাহিত্য, লোকসাহিত্যের অনুশীলন ও লোকসাহিত্যের সংগ্রহ, বিচার ও ভবিষ্যৎ বিষয়ে মূল্যবান আলোচনা করেছেন । ভূমিকা অংশের এই মূল আলোচনার পাশাপাশি বিভিন্ন অধ্যায়ে তিনি ছড়া, গীতি, গীতিকা, কথা, ধাঁধা, প্রবাদ, পুরাকাহিনী, ইতিকথা প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করেন । অল্প সময়ের মধ্যে এই গ্রন্থের চারটি সংস্করণ প্রকাশিত হয় । বিভিন্ন সংস্করণে ভূমিকা অংশে যেমন নূতন আলোচনা যুক্ত হয়েছে তেমন পরিশিষ্টে সংযোজিত হয়েছে নানা বিষয় যার মধ্যে লোকনাট্য, লোকসাহিত্য ও আধুনিক বাংলা সাহিত্য, বাংলা লোকগীতির সুরবিচার (সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী -লিখিত) প্রভৃতি প্রধান । কালক্রমে কঠোর পরিশ্রম করে আশুতোষ বাংলার লোকসাহিত্য গ্রন্থটিকে ছটি খণ্ডে প্রকাশ করেন— প্রথম খণ্ড আলোচনা, দ্বিতীয় খণ্ড ছড়া, তৃতীয় খণ্ড গীত ও নৃত্য, চতুর্থ খণ্ড লোককথা, পঞ্চম খণ্ড ধাঁধা এবং ষষ্ঠ খণ্ড প্রবাদ । একক প্রচেষ্টায় ও ছাত্রছাত্রীদের সহায়তায় আশুতোষ লোকসাহিত্যের সামগ্রিক আলোচনা পূর্ণ করেন । লোকসাহিত্যের ছটি খণ্ডের পাশাপাশি তিনি চারটি খণ্ডে সম্পাদনা ও প্রকাশ করেন 'বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর', বাংলা লোকসংগীতের বৃহৎ কোষগ্রন্থ । লোকসাহিত্য চর্চার পাশাপাশি আশুতোষ বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন পুরুলিয়ার ছউ নৃত্য বিষয়ে । প্রধানত তাঁরই প্রচেষ্টায় পুরুলিয়ার ছউ নৃত্য ভারত ও বহির্বিশ্বে প্রচারিত হয় । ছউ নৃত্য আলোচনার সূত্রে তিনি সাধারণভাবে বাংলার লোকনৃত্য-বিষয়ক আলোচনায় উদ্যোগী হন এবং দুই খণ্ডে "বাংলার লোকনৃত্য" বিষয়ে গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা করেন। ক্ষেত্র গবেষণা-নির্ভর তাঁর রচিত 'বাংলার লোকশ্রুতি' গ্রন্থটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ন্যাশানাল বুক ট্রাস্ট থেকে প্রকাশিত ইংরেজি ও বাংলায় বাংলার লোকসংস্কৃতি -বিষয়ক গ্রন্থ দুটিও তাঁর লোকসাহিত্য গবেষণার বিশিষ্ট পরিচয় বহন করে । এই প্রসঙ্গে তাঁর ইংরেজিতে রচিত বিবিধ প্রবন্ধ এবং বিশেষত *The Sun and the Serpent lore of Bengal* গ্রন্থটির কথা বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য । শুধু গবেষণা বা গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা নয়, একালের লোকসংস্কৃতি চর্চায় আশুতোষের সর্বশ্রেষ্ঠ দান বিদ্যায়তনিক স্তরে বিশেষভাবে লোকসাহিত্য পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করা । আধুনিক লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞানের তত্ত্ব ও পদ্ধতি-বিদ্যাগত দৃষ্টিকোণ থেকে আশুতোষ ভট্টাচার্যের আলোচনা ও মতপদ্ধতি সম্পর্কে ক্ষেত্রবিশেষে দ্বিমতের অবকাশ থাকলেও সামগ্রিক ভাবে বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চার ইতিহাসে তাঁর দান অবিস্মরণীয় ।

বাংলা গীতিকা সংগ্রহ ও আলোচনার প্রসঙ্গে একালের উল্লেখযোগ্য নাম— ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক । বাংলা গীতিকা ও ইতিকথা চর্চার ক্ষেত্রে — জর্জ গ্রীয়ার্সন, শিবচন্দ্র শীল, বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য, নলিনীকান্ত ভট্টশালী, দীনেশচন্দ্র সেন, বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, চন্দ্রকুমার দে, পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য, আশুতোষ চৌধুরী প্রভৃতির ভূমিকা স্মরণে রেখেও

একালের ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিকের প্রচেষ্টা বিশেষভাবে আলোচনার দাবি রাখে। তিনি সাত খণ্ডে 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা' প্রকাশ করেছেন। তাঁর সংগ্রহে বগুড়া ও রংপুর অঞ্চলের পালাগুলি স্থান পায় নি। তাঁর সম্পাদিত পূর্ববঙ্গগীতিকার পালাগুলির পাঠ দীনেশচন্দ্র সেন -সম্পাদিত সংস্করণ থেকে বহুলাংশে ভিন্ন। দীনেশচন্দ্র সেনের জীবিত অবস্থায় তিনি দীনেশচন্দ্রের সংস্করণগুলির অসংগতি প্রসঙ্গে তাঁর দৃষ্টি অকর্ষণ করেন বলে জানা যায়। পরবর্তীকালে তিনি নিজেই উদ্যোগী হয়ে সংগ্রহ ও সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর প্রকাশনায় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও সংগ্রহের দ্বারা তিনি, দীনেশচন্দ্র সেনের সম্পাদিত পালাগুলির অসম্পূর্ণতা ও সামঞ্জস্যহীনতা সংশোধনে প্রয়াসী হন। বয়াতী ও গায়েনদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যেমে— সুর, তাল, ছন্দ, ব্যাখ্যা, পাঠান্তর, অর্থ প্রভৃতি বিষয়ে তিনি বিশেষভাবে নূতন আলোকপাত করেছেন। ক্ষিতীশচন্দ্রের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-নির্ভর ও শ্রমনিষ্ঠ পূর্ববঙ্গগীতিকার সংকলনসমূহ বাংলা গীতিকাচর্চার উল্লেখযোগ্য দিক। ত্রিশ বৎসরের কঠিন শ্রমে নিজে সংগ্রহ করে নিবেদিত- প্রাণ লোকসংস্কৃতির গবেষক চিত্তরঞ্জন দেব বাংলা গীতিকার নূতন সম্ভার পরিবেশন করেছেন— 'বাংলার-লোক-গীত-কথা' গ্রন্থে। এই গ্রন্থে নয়টি পূর্ণাঙ্গ পালা সংকলিত হয়েছে। লেখক প্রথমে পালার গদ্যকাহিনী বন্দনা করে পালা কাব্য পরিবেশন করেছেন এবং সবশেষে যুক্ত করেছেন সংক্ষিপ্ত আলোচনা। এই সংগ্রহ বাংলার গীতিকার ভাণ্ডারকে নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধ করেছে।'ময়মনসিংহ গীতিকা'র একটি বিশেষ সংকলন সম্পাদনা করেছেন সুখময় মুখোপাধ্যায়। মূলত ছাত্রসংস্করণ হলেও গ্রন্থের ভূমিকাংশটি মূল্যবান। গীতিকাচর্চার আলোচনায় প্রসঙ্গত পশ্চিমবঙ্গের লোকগাথা সংগ্রহের একজন সাম্প্রতিক কর্মী মুহম্মদ আয়ুব হোসেনের নাম উল্লেখ করা যায়। সাম্প্রতিক কালে লোককথা-সম্পর্কিত আলোচনার উল্লেখযোগ্য নাম সুধীরচন্দ্র রায়। প্রসঙ্গত রূপকথা চর্চা সম্পর্কে মলয় বসুর গ্রন্থ এবং বাংলা গাথাকাব্য বিষয়ে বহ্নিকুমারী ভট্টাচার্যের গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য।

বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চায় কামিনীকুমার রায়ের নানা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কামিনীকুমার রায় বাংলার লোকদেবতা ও লোকাচার বিষয়ে একটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করলেও তাঁর প্রধান কৃতিত্ব লোকভাষা সংক্রান্ত আলোচনা। কঠোর পরিশ্রম ও যত্ন সহকারে তিনি 'লৌকিক শব্দকোষ' প্রকাশ করেন। 'লৌকিক শব্দকোষ' শুধুমাত্র সমগ্র বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের মৌখিক ভাষার অভিধান নয়, তা লোকসংস্কৃতি-বিষয়ক একটি মূল্যবান গ্রন্থ। 'লৌকিক শব্দকোষ' প্রথমে এক খণ্ডে প্রকাশিত হয়, পরে গ্রন্থটিকে দুটি খণ্ডে সুবিন্যস্ত করে প্রকাশ করা হয়। জানা যায় ১৯২৯ সালে এম.এ. পাস করে লেখক গবেষণার কাজে প্রবৃত্ত হন। দীর্ঘ পরিশ্রমে তিনি লোকসমাজের বিচিত্র আচার-অনুষ্ঠানের তথ্য এবং মৌখিক ভাষার শব্দ সংগ্রহ করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। পরিমার্জিত পরিবর্ধিত সংস্করণের প্রথম খণ্ডে দশটি অধ্যায়ে দশটি বিষয় সংশ্লিষ্ট দশহাজারের উপর আঞ্চলিক শব্দ সংকলিত হয়। দ্বিতীয় খণ্ডে নয়টি অধ্যায়ে প্রায় পনেরো হাজার শব্দ সংগৃহীত ও আলোচিত হয়েছে। গবেষক বাঙালি জীবনের বিভিন্ন পর্যায় বা দিক্ অবলম্বন করে শব্দগুলিকে সংগ্রথিত করেছেন এবং প্রায় প্রতিটি শব্দের সঙ্গে তার পরিচয়, সংশ্লিষ্ট আচার-অনুষ্ঠান, লোকবিশ্বাস, লোকসংস্কার ইত্যাদির বিবরণ প্রদান করেছেন। একক প্রচেষ্টায় এরূপ কাজ সুকঠিন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, লোকভাষার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে পরবর্তীকালে বিশেষভাবে আলোকপাত করে আলোচনা করেছেন ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক, সুধীরকুমার করণ, পরেশচন্দ্র মজুমদার ও পবিত্র সরকার। আঞ্চলিক ও লৌকিক ভাষার অভিধান সম্পাদনা ও সংকলনে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও ক্ষুদিরাম দাসের সাম্প্রতিক প্রয়াস অত্যন্ত সময়োপযোগী ও উৎসাহব্যঞ্জক ঘটনা।

বাংলার লোকধর্ম ও লোকায়ত ধর্ম-সম্প্রদায়-বিষয়ক আলোচনা বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চার একটি বিশিষ্ট দিক। এই দিকটি প্রসঙ্গে শতাধিক বৎসর পূর্বে বিশেষ আলোকপাত করেন অক্ষয়কুমার দত্ত। অক্ষয়কুমার দত্ত 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' গ্রন্থে (প্রথম ভাগ ১৮৭০/দ্বিতীয় ভাগ ১৮৮৩) বিভিন্ন ভারতীয় উপাসক সম্প্রদায়ের, বিশেষত লোকায়ত ধর্মসম্প্রদায়সমূহের উৎপত্তি বিস্তার ও ধর্মবিশ্বাসের প্রকৃতি বর্ণনা ও বিচার

করেছেন। লোকায়ত ধর্মসম্প্রদায় -বিষয়ক এই মূল্যবান গ্রন্থের দুটি সংস্করণ সাম্প্রতিক কালে প্রকাশিত হয়েছে। প্রথমটি বিনয় ঘোষ -সম্পাদিত পাঠভবন সংস্করণ (১৩৭৬) এবং দ্বিতীয়টি বারিদবরণ ঘোষ -সম্পাদিত করুণা প্রকাশনী সংস্করণ (১৩৯৪)। মূল গ্রন্থ অক্ষুণ্ণ রাখলেও বিনয় ঘোষ মহাশয় মূল গ্রন্থের অক্ষয়কুমার দত্ত -লিখিত দীর্ঘ উপক্রমণিকা অংশটি বর্জন করেছেন। করুণা প্রকাশনী সংস্করণে ঐ অংশটি মুদ্রিত আছে। বলা বাহুল্য অক্ষয়কুমার দত্তের এই উপক্রমণিকা আলোচনা -সমৃদ্ধ 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' গ্রন্থটি বাংলার লোকায়ত ধর্ম-সম্প্রদায়-সম্পর্কিত আলোচনার পথিকৃৎ। পরবর্তীকালে লোকায়ত ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষভাবে মধ্যযুগের সাধনার ধারা ও বাউল সম্পর্কে আলোচনা করেন ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী। তাঁর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বক্তৃতা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে 'ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা' শিরোনামায়। এই গ্রন্থে ভূমিকা লেখেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শাস্ত্রীমহাশয়ের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে লীলা বক্তৃতা পরবর্তীকালে 'বাংলার বাউল' শিরোনামায় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় (১৯৫৪)। ক্ষেত্রবিশেষে সীমাবদ্ধতা থাকলেও বাংলা লোকায়ত সাধনার ধারা -সম্পর্কিত আলোচনায় ক্ষিতিমোহন সেনের দান অনস্বীকার্য। পরবর্তীকালে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের 'বাংলার বাউল ও বাউল গান' গবেষণামূলক গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে। এই বিপুলায়তন গ্রন্থে লেখক বাউল তত্ত্ব, বাউল সাধনা, বাউল গান ও বাউল সাধকদের বিস্তৃত পরিচয় প্রদান করেছেন। ভাবাবেগের ঊর্ধ্বে ক্ষেত্রানুসন্ধানলব্ধ তথ্যাদির ভিত্তিতে বাংলার বাউল -সম্পর্কিত এই জাতীয় গ্রন্থ একান্ত বিরল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আলোচনা, ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রীর 'বাংলার বাউল' গ্রন্থ এবং শশিভূষণ দাশগুপ্তের *Obscure Religious cults* প্রভৃতির প্রসঙ্গ স্মরণে রেখেও বলা যায় যে, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের গ্রন্থটি বাংলার বাউল ও বাউল গান -সম্পর্কিত আলোচনার এক দিক নির্দেশক গ্রন্থ। পরবর্তী কালের গবেষণা ও ক্ষেত্রানুসন্ধানে প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে বর্তমান গ্রন্থের কতিপয় তত্ত্বগত অংশ সংশোধনযোগ্য বলে মনে হলেও, এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে উভয় বঙ্গে বাউল গবেষণার এক মূল্যবান সম্পদ 'বাংলার বাউল ও বাউল গান'।

সাম্প্রতিক কালে বাংলার বাউল ও অন্যান্য লোকায়ত ধর্মসম্প্রদায় সম্পর্কে নানা প্রকার গবেষণামূলক কাজ হয়েছে, যার মধ্যে রতনকুমার নন্দীর কর্তাভজা, বিমল মুখোপাধ্যায়ের সহজিয়া, সুধীর চক্রবর্তীর সাহেবধনী ও বলরাম হাড়ি, নন্দদুলাল মহান্তর মতুয়া-সম্পর্কিত গবেষণা উল্লেখযোগ্য। একালে লোকসংস্কৃতির পদ্ধতিবিদ্যাগত দিক থেকে লোকায়ত ধর্ম-সম্প্রদায় সম্পর্কে বিশেষ চর্চার সূত্রপাত ঘটেছে রতন নন্দীর কর্তাভজা ধর্ম ও সাহিত্য-বিষয়ক গবেষণার মাধ্যমে। সাহেবধনী সম্পর্কিত আলোচনায় বিশেষভাবে হাতেম আলি মোল্লার অগ্রণী ভূমিকা স্মরণযোগ্য। "গভীর নির্জন পথে"র ন্যায় সাংবাদিকতা ও রম্যতাধর্মী নানাবিধ রচনার পাশাপাশি সুধীর চক্রবর্তী বলরাম হাড়ি -সম্পর্কিত যে গবেষণাধর্মী গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং সাম্প্রতিক কালে লালন গীতি ও লোকসংগীত বিষয়ে আলোচনাদি করেছেন তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সংগীত-বিষয়ক আলোচনায় সুধীর চক্রবর্তীর স্বাভাবিক দক্ষতা অভিনন্দনযোগ্য। এই প্রসঙ্গে লালন-জীবনীগ্রন্থ রচনায় পথিকৃৎ বসন্তরঞ্জন পালের কথা এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'লালন-গীতিকা' প্রকাশের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। লালন চর্চায় চিত্তরঞ্জন দেবের কথাও ভোলার নয়। এপার বাংলায় লালন-দ্বিশতজন্মবর্ষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে "লালন শাহ ও বাংলা সাহিত্য" বিষয়ে গবেষণামূলক মূল্যবান কাজ করেছেন পলাশ মিত্র। লালন চর্চা প্রসঙ্গে এপার বাংলায় লালন-দ্বিশততম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত 'লালন স্মরণিকা' গ্রন্থ এবং লালন-তিরোভাবের শতবর্ষ উপলক্ষে 'লালন প্রয়াণ শতবর্ষ-স্মারক গ্রন্থ' প্রকাশের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। সাম্প্রতিক কালে লোকায়ত ধর্ম সাধক, ধর্ম সম্প্রদায় ও লোকায়ত পদাবলী -সম্পর্কিত গবেষণার বিশেষ প্রসার ঘটতে দেখা যায়।

লোকায়ত ধর্মসম্প্রদায়ের পাশাপাশি বাংলার লোকধর্ম, পাল-পার্বণ ও লৌকিক দেবদেবী বিষয়েও বাংলায়

অনেক আলোচনা হয়েছে । বাংলার লোকধর্ম ও পালপার্বণ -সম্পর্কিত আলোচনার ক্ষেত্রে চিন্তাহরণ চক্রবর্তীর নাম বিশিষ্ট । চিন্তাহরণ চক্রবর্তীর 'বারোমাসে তেরো পার্বণ' এবং 'হিন্দুর আচার-অনুষ্ঠান' দুটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ । ঐ দুই গ্রন্থে লেখক বৈদিক ও পৌরাণিক উৎসব ও হিন্দু আচার-অনুষ্ঠানের পাশাপাশি অনেক লৌকিক ও আঞ্চলিক উৎসব এবং লৌকিক আচার-অনুষ্ঠানের বিষয় মূল্যবান আলোচনা করেছেন । বাংলার লৌকিক দেবদেবী -সম্পর্কিত গবেষণার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য নাম গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু । গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু বাংলার গ্রামে গ্রামে ঘুরে লৌকিক দেব-দেবী সম্পর্কে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ও 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় অনেক প্রবন্ধ রচনা করেন । পরে প্রবন্ধগুলি একত্র করে 'বাংলার লৌকিক দেবতা' নামে প্রকাশিত হয় (১৯৬৬) । এই গ্রন্থে গোপেন্দ্রকৃষ্ণ তেত্রিশটি লৌকিক দেবদেবী, মূর্তি, পূজাচার, সংশ্লিষ্ট উৎসব প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন । পরবর্তী সংস্করণে সত্যপীর ও ধর্মঠাকুর সম্পর্কে দুটি নূতন রচনা সংযুক্ত হয় । সরেজমিন অনুসন্ধানে লেখক বাংলার লৌকিক দেবদেবী সম্পর্কে, যে বিপুল তথ্য সংগ্রহ করেছেন তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পরিশিষ্টে লেখক বাংলার লৌকিক দেবতার পূজাচারে ব্যবহৃত বিশেষার্থ শব্দাবলীর যে সংকলন ও জ্ঞাতব্য তথ্য পরিবেশন করেছেন তা গ্রন্থটির বিশেষ সম্পদ । বাংলার লৌকিক দেবদেবীর চরিত্র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্যাদি সর্বক্ষেত্রে সমর্থনযোগ্য না হলেও প্রত্যক্ষ ক্ষেত্র-সমীক্ষা-নির্ভর তথ্যসমৃদ্ধ বাংলার লৌকিক দেবদেবী -সম্পর্কিত বিবরণ শ্রদ্ধার যোগ্য । বাংলার লৌকিক দেবদেবীর আলোচনার সূত্রে তারাশিস মুখোপাধ্যায়ের শীতলা দেবী সম্পর্কে প্রকাশিত গ্রন্থটি ('শীতলার বিবাহবাসর ও অন্যান্য প্রবন্ধ') বিশেষ উল্লেখযোগ্য । তারাশিস মুখোপাধ্যায় মেদিনীপুর জেলার মহিষাদল থানার অন্তর্গত দক্ষিণ নারকেলদা গ্রামের শীতলা পূজার উৎসব ও পার্শ্ববর্তী অন্যান্য গ্রামে পূজানুষ্ঠানে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে ও সরেজমিন গবেষণার মাধ্যমে একান্ত তথ্যভিত্তিক আলোচনা করেছেন এই গ্রন্থে । আলোচ্য গ্রন্থে বিশেষভাবে শীতলা, ঘণ্টাকর্ণ, তারাসূর, পঞ্চানন, প্রভৃতি সম্পর্কে যেমন আলোচনা আছে তেমন আছে অনুষ্ঠান-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রথা, সংগীত ও বিশ্বাস-সংস্কারের বিশদ বিবরণ । আধুনিক পদ্ধতিবিদ্যানুসারী, সার্বিক পর্যবেক্ষণ -নির্ভর এই জাতীয় গবেষণা গ্রন্থ বাংলা ভাষায় বিরল । লেখকের অকাল মৃত্যু বাংলা লোকধর্ম-বিষয়ক গবেষণার ক্ষেত্রে অপূরণীয় ক্ষতিসাধন করেছে । লোকসংস্কৃতি অনুরাগী ইন্দুভূষণ অধিকারী অশেষ শ্রম ও প্রতিকূলতা স্বীকার করে গ্রন্থটি সম্পাদনা ও প্রকাশনা করে বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে বিশেষ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন ।

খুব বিশদভাবে না হলেও সাম্প্রতিককালে বাংলার লোকশিল্প, লোকসংগীত ও লোকনৃত্য সম্পর্কে বেশ-কিছু আলোচনা হয়েছে । এদিক থেকে বাংলার লোকশিল্প প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য আলোচনা করেছেন অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়, সুধাংশুকুমার রায়, কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, প্রভাস সেন, আশিস বসু, তারাপদ সাঁতরা, অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি । লোকনৃত্য-সম্পর্কিত আলোচনায় মণি বর্ধন, শান্তিদেব ঘোষ ও গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায়ের আলোচনা দৃষ্টি আকর্ষণ করে । লোকসংগীত-বিষয়ক আলোচনায় —হরিশচন্দ্র পাল, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, নারায়ণ চৌধুরী, কালী দাশগুপ্ত, খালেদ চৌধুরী, বুদ্ধদেব রায়, তারাপদ লাহিড়ী, দীনেন চৌধুরী, পূর্ণিমা সিংহ, সুখবিলাস বর্মা, বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও সুনীল সাহা প্রভৃতির রচনাদি উল্লেখযোগ্য । বাংলা লোকসংগীত চর্চার ক্ষেত্রে সংগীতশাস্ত্রগত দিক থেকে রাজ্যেশ্বর মিত্রের আলোচনা এবং জাতিতত্ত্বগত দিক থেকে সুকুমার রায় সুধিভূষণ ভট্টাচার্যের আলোচনার প্রসঙ্গ উল্লেখযোগ্য ।

একালের বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চায় আঞ্চলিক সমীক্ষাজাত গবেষণার বিশেষ প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায় । চারুচন্দ্র সান্যালের কথা মনে রেখেও বলা যায় সামগ্রিকভাবে লোকসংস্কৃতিগত আঞ্চলিক সমীক্ষায় একালে পথিকৃতের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন সুধীরকুমার করণ । সুধীরকুমার তাঁর 'সীমান্ত বাঙলার লোকযান' গ্রন্থে পুরুলিয়া জেলাকে ভূমি হিসবে গ্রহণ করে একটি আঞ্চলিক পরিমণ্ডলে যে লোকসংস্কৃতিগত পর্যালোচনা করেছেন তা খুবই

গুরুত্বপূর্ণ । তাঁর আলোচিত বিষয় বা মতামত সম্পর্কে ক্ষেত্রবিশেষে মতান্তরের অবকাশ থাকলেও এই গ্রন্থের সার্থকতা বিষয়ে কোনো দ্বিমতের অবকাশ নেই । সুধীর করণ প্রবাদ, লোকভাষা, লোককথা, লোক উৎসব প্রভৃতি বিষয়ে নানা প্রকার আলোচনা করেছেন । সুধীরকুমার করণের 'লোকসাহিত্যে ঈশপ' এবং 'লোকায়ত রবীন্দ্রনাথ' অন্য দুটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ । 'লোকসাহিত্যে ঈশপ' গ্রন্থে লেখক সুদীর্ঘ আলোচনা সহ ঈশপের সমগ্র লোককথার সংকলন করেছেন । 'লোকায়ত রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে রবীন্দ্রসাহিত্যে লোকসমাজের ভূমিকা, লোকসাহিত্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য, পল্লীসংগঠনে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা প্রভৃতি বিষয়ে মূল্যবান আলোচনা করেছেন । একালে পশ্চিম সীমান্তবঙ্গের লোকসংস্কৃতি জনসমক্ষে তুলে ধরার এবং লোকসংস্কৃতি -বিষয়ক গবেষণার গুরুত্বকে প্রশস্ত করার ক্ষেত্রে সুধীরকুমার করণের কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য । তাঁর পথ অনুসরণ করে আঞ্চলিক লোকসংস্কৃতি সমীক্ষায় পরবর্তীকালে যাঁরা গবেষণামূলক কাজ করেছেন তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য— বিনয় মাহাতো, বঙ্কিমচন্দ্র মাহাতো, রাধাগোবিন্দ মাহাতো, পশুপতি মাহাতো প্রভৃতি । পশ্চিমসীমান্ত বঙ্গের জনজাতি ও লোকসংস্কৃতি বিষয়ে নিরলস নিষ্ঠা ও প্রজ্ঞার সঙ্গে দীর্ঘদিনব্যাপী উল্লেখযোগ্য গবেষণামূলক কাজ করে চলেছেন মানিকলাল সিংহ । তাঁর রচিত 'পশ্চিম রাঢ় তথা বাঁকুড়া সংস্কৃতি', 'রাঢ়ের জাতি ও কৃষ্টি' (৩খণ্ড), 'রাঢ়ের মন্ত্রযান', 'কাঁসাই সভ্যতা' প্রভৃতি গ্রন্থ বাংলা আঞ্চলিক লোকসংস্কৃতি চর্চার মূল্যবান সম্পদ । এই প্রসঙ্গে অমলেন্দু মিত্রের রাঢ়ের ধর্ম সংস্কৃতি-বিষয়ক গবেষণা গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য । বাংলার আঞ্চলিক লোকসংস্কৃতি সমীক্ষার এক নিবেদিতপ্রাণ গবেষক পুলকেন্দু সিংহ । তাঁর 'লোকায়ত মুর্শিদাবাদ' এবং "মুর্শিদাবাদের সঙ্গীত ও সাহিত্য" বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ । আঞ্চলিক লোকসংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে সুবোধ বসু রায়, নমিতা মণ্ডল, শৈলেন দাস, অজিত মিত্র, মোহিত রায় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ।

সাম্প্রতিক কালে বিশেষত ষাটের দশক থেকে লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতি চর্চায় ব্যাপক উৎসাহ দেখা যায় । একালে যাঁরা লোকসংস্কৃতি বিষয়ে নানা প্রকার আলোচনাগ্রন্থাদির প্রকাশ করে চলেছেন তাঁদের মধ্যে —নির্মলেন্দু ভৌমিক, বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন দেব, শঙ্কর সেনগুপ্ত, অমল দাস, শঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায়, দুলাল চৌধুরী, সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, অসীম দাস, মানিক সরকার, শিশির মজুমদার, মানস মজুমদার, সলিল বন্দ্যোপাধ্যায়, পল্লব সেনগুপ্ত, দিব্যজ্যোতি মজুমদার, সুহৃৎ ভৌমিক, অমরকৃষ্ণ চক্রবর্তী, সনৎ মিত্র, বরুণ চক্রবর্তী, গৌরী ভট্টাচার্য, পবিত্র চক্রবর্তী, শ্রীহর্ষ মল্লিক, তুষার নিয়োগী, প্রদ্যোতকুমার মাইতি প্রভৃতি প্রধান : এঁদের মধ্যে—ছড়া, ধাঁধা ও লোকসংগীত আলোচনায় নির্মলেন্দু ভৌমিক, পথনাটিকা—সঙ বিষয়ক আলোচনায় বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, শিল্পসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতির সম্পর্ক-বিষয়ক আলোচনায় সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, লোককথার আলোচনায় দিব্যজ্যোতি মজুমদার, লোকনাট্য আলোচনায় শিশির মজুমদার, যাত্রা-বিষয়ক আলোচনায় —গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, প্রবোধবন্ধু অধিকারী, হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, মন্মথ রায়, প্রবাদ ও লোকসাহিত্য চর্চার আলোচনায় বরুণ চক্রবর্তী, লোকসংস্কৃতি চর্চার সামগ্রিক ইতিহাস প্রণয়নে পবিত্র চক্রবর্তী, লোকধর্ম ও উৎসব-বিষয়ক আলোচনায় প্রদ্যোত মাইতি ও দুলাল চৌধুরী, আদিবাসী সংস্কৃতি আলোচনায় প্রবোধ ভৌমিক, অমল দাস, পবিত্র গুপ্ত, শঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়েছেন । লোকসংস্কৃতির সাংগঠনিক প্রচেষ্টায় একালে বিশেষ সক্রিয়তার পরিচয় দিয়েছেন— প্রফুল্ল পাল, শঙ্কর সেনগুপ্ত, সনৎ মিত্র, দুলাল চৌধুরী প্রভৃতি । সাম্প্রতিক কালে এমন অনেকে আছেন যাঁরা দুটি-একটি মূল্যবান আলোচনার পর নীরব হয়ে গেছেন; আবার এমন অনেকে আছেন যাঁরা বিচিত্র বিষয়ে বিক্ষিপ্ত আলোচনায় সতত সক্রিয় থেকেছেন । বিচিত্র বিষয় পরিক্রমায় বিক্ষিপ্ত উৎসাহীগণ স্বাভাবিক ভাবেই পল্লবগ্রাহী, পর্যালোচনাধর্মী আলোচনায় স্বক্ষেত্রে সৃষ্টি বা স্বকীয়তা প্রদর্শনে সক্ষম হন নি । বিরল ব্যতিক্রমের কথা বাদ দিলে মনে হয় লোকসংস্কৃতিশাস্ত্র বা আধুনিক লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞানের

গভীরে প্রবেশ করে লোকসংস্কৃতির যথাযথ গবেষণা ও মূল্যায়নের ক্ষেত্র এখনো সংকুচিত ।

বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে বিদেশী গবেষকদের প্রসঙ্গ উপেক্ষা করা যায় না । বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চার ইতিহাসে প্রথমাবধি বিদেশী মনীষীদের প্রয়াস বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে । পরবর্তী পর্যায়ে বিগত পঞ্চাশ বৎসরে বহু বিদেশী গবেষক নানা প্রকল্পে গবেষণার জন্য বাংলায় এসেছেন এবং লোকসংস্কৃতির নানা ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন । সাম্প্রতিক কালে বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে বিদেশী গবেষকদের ভূমিকা স্মরণীয় । উইলিয়ম কেরী, ওয়ার্ড, জেমস লঙ, উইলিয়ম মর্টন, ড্যাল্টন, রিস্লে, গ্রীয়ার্সন, ম্যাক্কুলক, উইলিয়ম ক্রুক, উইলিয়ম আর্চার, স্টেলা ক্রামরিশ প্রভৃতির পথ অনুসরণ করে একালে যাঁরা বাংলা লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন দিক নিয়ে উল্লেখযোগ্য আলোচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে ভেরিয়র এলুইন, দুসান জবাভিতেল, হাইনস মোদে, এড্ ডিমক, গ্রেন হেজ, ডেভিড ম্যাককাচ্চন, র‍্যালফ্ নিকোলাস, স্ট্যানলি স্কট, ফ্রাঙ্ক কোরাম, প্রভৃতি প্রধান ।

বিদেশী প্রচেষ্টার সূত্রে প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতি চর্চার প্রসঙ্গও স্মরণীয় । অভিন্ন লৌকিক ঐতিহ্যের সূত্রে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক লোকসংস্কৃতি চর্চার ধারা বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য । একালের অন্যতম নিবেদিতপ্রাণ লোকসংস্কৃতি-গবেষক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন । পূর্ববঙ্গের অধিবাসী ও বাংলাদেশের নাগরিক হলেও দেশবিভাগ-পূর্ববর্তী কালে লোকসংস্কৃতি চর্চায় তিনি ছিলেন অগ্রণী । মূলত রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় তিনি লোকসংগীত সংগ্রহে নিমগ্ন হন । তিনি প্রত্যক্ষ ক্ষেত্র থেকে কয়েক সহস্র লোকসংগীত সংগ্রহ করেন যা 'হারামণি' গ্রন্থের বিভিন্ন খণ্ডে সংকলিত হয়েছে । 'হারামণি'র প্রথম খণ্ডটি কলকাতা থেকে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় । পরে এই খণ্ডের অপর সংস্করণ এবং অন্যান্য খণ্ডগুলি বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত হয়েছে । লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর আলোচনাও উল্লেখযোগ্য । বাংলাদেশের অন্যান্য লোকসংস্কৃতি গবেষকদের মধ্যে বিশেষভাবে —জসীমউদ্দীন, আহমদ শরীফ, আব্বাসউদ্দীন,আশরাফ সিদ্দিকী, মযহারুল ইসলাম, ওয়াকিল আহমদ, আব্দুল হাফিজ, সিরাজউদ্দীন কাশিমপুরী, রওশন ইজদানী, সামীয়ুল ইসলাম, আব্দুল সাত্তার, মোমেন চৌধুরী, হাবিবুর রহমান, মোহম্মদ সাইদুর, মোস্তাফা জামাল আব্বাসী, মনিরুজ্জামান, খগেশকিরণ তালুকদার, আলমগীর জলীল, বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । মোহম্মদ আব্দুল খালেক মহম্মদ আব্দুল জলীলের মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে লৌকিক উপাদান-বিষয়ক মূল্যবান আলোচনা গ্রন্থের কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় । লালন-গবেষণা বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতি চর্চার একটি বিশিষ্ট দিক । বিশেষ ভাবে লালন-গবেষকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আবু তালেব, আনোয়ারুল করিম, আবুল আহসান চৌধুরী, লুতফর রহমন, খোন্দকার রিয়াজুল হক প্রভৃতি । বাংলাদেশে অনেকে লোকসাহিত্য-লোকসংস্কৃতি বিষয়ে নানা প্রকার গবেষণায় রত আছেন । "বাংলা একাডেমী" বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতি চর্চায় বিশেষ ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে চলেছে এবং এ বিষয়ে সামসুজ্জামান খানের সুযোগ্য সক্রিয়তার প্রসঙ্গ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । লোকঐতিহ্যের সমগ্রতায় এপার ও ওপার বাংলার লোকসংস্কৃতি চর্চায় নানারূপ সক্রিয়তা ও সংযোগের সেতুবন্ধন হতে দেখা যায়; বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চার নিজস্ব প্রয়োজনেই এই সংযোগ অধিকতর ব্যাপ্ত হওয়া আবশ্যক ।

পাঁচ

বিগত পঞ্চাশ বছরে বাংলা লোকসংস্কৃতিচর্চার ব্যাপ্তি বিস্ময়কর । আশানুরূপ গভীরতা প্রাপ্ত না হলেও এই ব্যাপ্তির পশ্চাতে আছে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানগত, বিদ্যায়তন ও বিদ্যায়তন-নিরপেক্ষ এবং সরকারি ও বেসরকারি নানারূপ প্রয়াসের সক্রিয়তা । বাংলা লোকসংস্কৃতিচর্চার এই সক্রিয়তার স্বরূপ নিম্নলিখিত ধারা এবং উপধারা সমূহে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়—
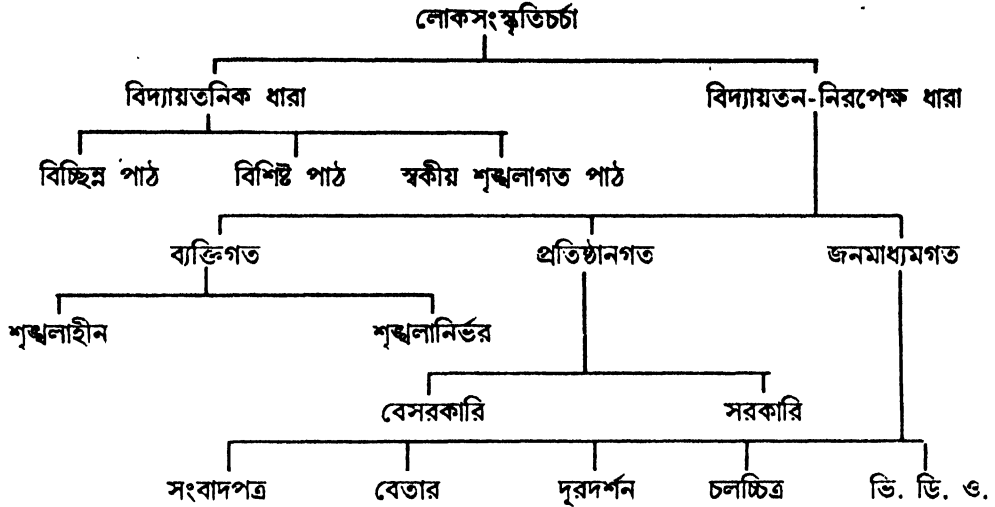
উপরে বর্ণিত বিভিন্ন ধারায় লোকসংস্কৃতি অনুশীলনের সক্রিয়তা নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করতে দেখা যায় । একালে বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চায় শিক্ষাগত শৃঙ্খলা-নির্ভর বিদ্যায়তনিক প্রয়াসের ক্রমপ্রাধান্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে । প্রবীণ ও নবীন বিভিন্ন গবেষকের নিরলস ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চার অন্যতম সম্পদ । লোকসংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানগত প্রয়াসের প্রাধান্য একালের অন্যতম বৈশিষ্ট্য । পূর্বতন গৌরবজনক ভূমিকার কথা স্মরণ করে বলা যায় "এশিয়াটিক সোসাইটি" ও "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে"র ভূমিকা বর্তমানে প্রায় ম্রিয়মাণ । জাতীয় প্রয়োজনে এ দুটি সংস্থার পুনর্জাগরণ বিশেষ প্রয়োজন । বাংলা লোকসংস্কৃতি বিষয়ে "বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন" ও "বঙ্গসংস্কৃতি মেলা"র ভূমিকা স্মরণীয় । বিগত কয়েক বৎসর লোকসংস্কৃতি ও আঞ্চলিক-সংস্কৃতি চর্চার জন্য নানারূপ প্রতিষ্ঠান গঠিত হতে দেখা যায় । এ-সব সংগঠনের আধিকাংশই ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকেন্দ্রিক তাই যেগুলি নানারূপ আর্থিক ও সাংগঠনিক সীমাবদ্ধতায় পীড়িত ও আশানুরূপ ফলপ্রদানে অসমর্থ । সাম্প্রতিক কালে প্রতিষ্ঠানগত প্রয়াসে সরকারি উদ্যোগ বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা ।[১১] কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারের নানা বিভাগ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে লোকসংস্কৃতি চর্চায় নানারূপ সহায়তা প্রদান করেছে । এই প্রসঙ্গে সেন্সাস বিভাগ থেকে অশোক মিত্র মহাশয়ের সম্পাদনায় এবং অরুণ রায় ও সুকুমার সিংহের উদ্যোগে প্রকাশিত 'পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা' আকর গ্রন্থমালার কথা বিশেষ স্মরণীয় ।[১২] সরকারি প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের কার্যক্রম বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে । এই বিভাগের উদ্যোগে ৭০-এর দশক থেকে সুনির্দিষ্ট ভাবে লোকসংস্কৃতি বিষয়ে নানারূপ কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে চলেছে । যার মধ্যে আলোচনাচক্র, কর্মশিবির, বিভিন্ন উৎসব, বার্ষিক অনুদান, প্রকাশনা, নানা নামের পুরস্কার প্রভৃতির ব্যবস্থা প্রধান । পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের বিশেষ উল্লেখযোগ্য কাজ প্রথমে "লোকবঙ্গ" ও পরে 'লোকশ্রুতি' পত্রিকার প্রকাশ এবং 'পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি' (১৯৭১), 'পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্প' (১৯৭৬), 'পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্পীদের জীবন ও জীবিকা' (১৯৮৩) প্রভৃতি মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় গ্রন্থাদির প্রকাশ ।[১৩] সরকারি কার্যক্রমের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সাম্প্রতিক কালে তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের লোকসংস্কৃতি-বিষয়ক উদ্যম বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা । অবশ্য সরকারি তথা জনসাধারণের অর্থের প্রকৃত সদ্‌ব্যবহার এবং লোকসংস্কৃতি

ও লোকশিল্পীর যথার্থ উন্নয়নের স্বার্থে সরকারি প্রতিষ্ঠানিক প্রয়াসসমূহ যথাযথ বিজ্ঞাননিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ হওয়া প্রয়োজন বলে মনে হয়। সাম্প্রতিক কালে লোকসংস্কৃতি চর্চা তথা লোকসংস্কৃতি প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে জনমাধ্যমের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বলা বাহুল্য বিষয় নিষ্ঠা ও সুপরিকল্পনার মাধ্যমে একালে আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা-নির্ভর সংবাদপত্র, বেতার, দূরদর্শন, চলচ্চিত্র, ভি.ডি.ও. প্রভৃতি জনমাধ্যমগুলি লোকসংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করতে পারে। এই সূত্রে তৃণমূলে সঞ্চারিত বিকল্প লোকমাধ্যমের প্রসঙ্গ এবং লোকসংস্কৃতিবিদ সংযোগবিজ্ঞানীর সম্মিলিত প্রয়াসের সক্রিয়তার গুরুত্ব অবশ্যস্বীকার্য।[২০]

রবীন্দ্র-প্রয়াণ-পরবর্তী বিগত পঞ্চাশ বৎসরের লোকসংস্কৃতি চর্চার বহুমুখী বিস্তার নিঃসন্দেহে বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চার ইতিহাসের এক উজ্জ্বল অধ্যায়। বিভিন্নরূপে প্রসার লাভ করলেও বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চা যে সাম্প্রতিক কালে সতত প্রার্থিত পূর্ণতা বা গভীরতা লাভ করেছে এমন দাবি অবশ্য করা যায় না। বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চায় এই সময়ের দ্বন্দ্ব মূলত শিক্ষানুসারী বিষয়নিষ্ঠ লোকসংস্কৃতি চর্চা এবং সাধারণ লোকসংস্কৃতি-অনুরাগীর দ্বন্দ্ব। তাই একদিকে যেমন দেখা যায় বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞাননির্ভর লোকসংস্কৃতি অনুশীলনের প্রচেষ্টা, তেমন অন্য দিকে দেখা যায় বৈজ্ঞানিক নিষ্ঠাহীন অগভীর তৎপরতার সক্রিয়তা। উপযুক্ত ক্ষেত্র গবেষণা এবং লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও পদ্ধতিবিদ্যা-নির্ভর মৌলিক আলোচনায় আত্মনিয়োগ না করে পল্লবগ্রাহী সুলভ প্রকাশনায় আত্মপ্রকাশের অতিরেক একালের লোকসংস্কৃতি চর্চায় অন্যতম প্রধান দুর্বলতার দিক। অদ্যাপি আবেগসর্বস্ব শৌখিন প্রয়াস, বস্তুনিরপেক্ষ কেতাবী বিদ্যাসর্বস্বতা,স্বার্থান্বেষী ব্যবসায়িক তৎপরতা এবং রাজনৈতিক অগভীর সংকীর্ণতা যে অনেক ক্ষেত্রে একালের লোকসংস্কৃতি অনুশীলনে নানারূপ প্রতিবন্ধকতার ও সীমাবদ্ধতার সৃষ্টি করছে তা অস্বীকার করা যায় না। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে এর বলিষ্ঠ ব্যতিক্রমও একান্ত দুর্লভ নয়। সাম্প্রতিক কালে দেখা যায়, যে ব্যতিক্রমের পথ ধরে লোকসংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রটি সংগ্রহ ও রসগ্রাহী আলোচনার স্তর অতিক্রম করে ক্রমশ লোককৃতিবিদ্যার (folkloristics) বৃহৎ বৈজ্ঞানিক পরিমণ্ডলে ব্যাপ্ত হচ্ছে এবং স্বনিষ্ঠ অনুশীলন–চর্চায় তা হয়ে উঠছে সুসংহত ও সুপরিণত। সীমাবদ্ধভাবে হলেও বহুমুখী জিজ্ঞাসা ও স্বকীয় শিক্ষাগত শৃঙ্খলানির্ভর অন্বেষা একালের বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রটিকে যে জীবন্ত ও সুদৃঢ় করে তুলেছে সে সত্য অস্বীকার করা যায় না। সামগ্রিক বিচারে বলা যায়, যে রবীন্দ্রোত্তর বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চায় গতিশীলতা ও মননশীলতার পরিচয় সহজলভ্য না হলেও একান্ত দুর্লভ নয়। মোটের উপর বহুমুখী প্রয়াসে একালের লোকসংস্কৃতি চর্চায় সর্বপ্রকার সীমাবদ্ধতা থেকে নিষ্ক্রমণের আর্তি সুস্পষ্ট। প্রসঙ্গত এই সত্য নির্দ্বিধায় উচ্চারণ করা যায় যে লোকসংস্কৃতি চর্চায় রবীন্দ্রপ্রভাবিত আত্মআবিষ্কারের প্রয়াস তথা জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে একালের লোকসংস্কৃতি অনুশীলন বহুলাংশে মুক্ত। রবীন্দ্রপ্রদর্শিত পথেই বিগত পঞ্চাশ বৎসরের বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চার ইতিহাস ক্রমপ্রসারিত হয়েছে। জাতীয়তাবাদী ভাবাবেগ থেকে আধুনিক লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞানের তত্ত্ব ও পদ্ধতিবিদ্যাগত পথে রবীন্দ্র-প্রয়াণের অর্ধশতাব্দী পর এই সত্য বিশেষরূপে সুপ্রতিষ্ঠ যে রবীন্দ্রপ্রতিভার প্রেরণা বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রবাহে সজীব ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার সৃষ্টির স্পন্দনে ক্রমপ্রসারিত। এই উত্তরাধিকারে যুগপৎ রবীন্দ্রানুসরণ ও রবীন্দ্র-অতিক্রমণের ইতিহাস প্রতিফলিত। দোষে গুণে বিজড়িত বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চার ইতিহাসে এই সত্যেরই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করা যায়। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চায় বিদ্যায়তনিক স্বকীয় শিক্ষাগত শৃঙ্খলা-নির্ভর বৈজ্ঞানিক মন্যতা ক্রমশ প্রাধান্য বিস্তার করবে এবং লোকসংস্কৃতি চর্চা শুধুমাত্র অতীত আশ্রয়ী রোম্যান্টিক বিলাসের সামগ্রী বা রাজনৈতিক-বাণিজ্যিক অপপ্রয়াসের বিষয় না হয়ে ব্যবহারিক কার্যকর মূল্যে ও ফলিত প্রায়োগিক মূল্যে সামাজিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠবে এই আমাদের সুদৃঢ় প্রত্যয়।

উল্লেখসূত্র

১ ছিন্নপত্রাবলী—১৯/'রবীন্দ্র-রচনাবলী', একাদশ খণ্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, ১৩৬৮, পৃ ২৯-৩০

২ 'ভারতী', ২২শ খণ্ড, ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩০৫, পৃ ১০১২

৩ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ", বৈশাখ ১৩১২, 'রবীন্দ্র-রচনাবলী', জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, একাদশ খণ্ড, ১৩৬৮, পৃ ৫৪৬-৫৪।
"বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ছাত্রসভায় রবীন্দ্রবাবুর অভিভাষণ", ভাদ্র ১৩১৬, 'বঙ্গদর্শন,' নবপর্যায় ৯ম বর্ষ, পৌষ ১৩১৬, পৃ ৪২৭-৩১

৪ তুষার চট্টোপাধ্যায়, "লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞান ও রবীন্দ্রনাথ । রবীন্দ্রনাথ ও লোকসংস্কৃতি"— আলোচনাচক্র ১৬ ও ২৬ মার্চ, ১৯৭০, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় । 'দৈনিক বসুমতী', এপ্রিল ১, ১৯৭০, পৃ ২

৫ তুষার চট্টোপাধ্যায়, "রবীন্দ্রনাথ ও লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞান", 'রবীন্দ্রভাবনা', টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৭৮, পৃ. ১০১-১০২

৬ বর্তমান লেখক -কর্তৃক বাংলার লোকসংস্কৃতি চর্চার ইতিহাসের যুগবিভাগগত প্রয়াসের সর্বশেষ রূপ / পূর্ববর্তী প্রয়াস, সুবর্ণলেখা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৪, পৃ ১৯৮-৯৯/স্বাধীনতার পঁচিশ বৎসর', পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৭৩, পৃ ৬৭

৭ নেপাল মজুমদার, 'ভারতের জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ' (১-৬ খণ্ড)

৮ তুষার চট্টোপাধ্যায়, 'লোকসংস্কৃতির তত্ত্বরূপ ও স্বরূপ সন্ধান', ১৯৮৫, পৃ ১১৮

৯ "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ছাত্রসভায় রবীন্দ্রবাবুর অভিভাষণ" 'বঙ্গদর্শন' নব পর্যায়, নবম বর্ষ, পৌষ, ১৩১৬, পৃ ৪২৭-৩১; "ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ" 'বঙ্গদর্শন' নবপর্যায় পঞ্চম বর্ষ, ১৩১২। "শান্তিনিকেতন আশ্রমের শিক্ষানীতি"; প্রভাত মুখোপাধ্যায়, শান্তিনিকেতন প্রেস, পৃ ১-৫/তথ্যসংগ্রহ, 'শান্তিনিকেতন' ; বর্ষ ১, ১৩২৬, পৃ ৩

১০ প্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্ত, তুষার চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র ; ১৭/৮/৭৫

১১ সুবর্ণলেখা, 'আধুনিক ভারতীয় ভাষাবিভাগের সুবর্ণজয়ন্তী স্মারকগ্রন্থ', বাংলা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৪, পৃ ২০২ ; তুষার চট্টোপাধ্যায়, "স্বাধীনতা-উত্তর লোকসংস্কৃতি প্রয়াস" ; 'স্বাধীনতার পঁচিশ বৎসর', তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৭৩, পৃ ৭৩-৭৪

১২ আশুতোষ ভট্টাচার্য, 'বাংলার লোকসাহিত্য' ; প্রথম খণ্ড, পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণের নিবেদন, ১৯৭৩ । যে-অর্থে জ্যাকব গ্রীমকে father of folklore বলা হয় সেই অর্থে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যকে 'লোকসাহিত্য জনক' বললে অসংগত হয় না ।

১৩ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস', ১৯৭৬, পৃ ২৬

১৪ গোপাল হালদার, 'বাঙালী সংস্কৃতি প্রসঙ্গ', ১৩৬৩, পৃ ২০৫

১৫ বিনয় ঘোষ, 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' (অখণ্ড সংস্করণ), ১৯৫৭

১৬ বিনয় ঘোষ, 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি', প্রথম খণ্ড ১৯৭৬ ; দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৭৮ ; তৃতীয় খণ্ড ১৯৮০ ; চতুর্থ খণ্ড ১৯৮৬ ।

১৭ তুষার চট্টোপাধ্যায়, "স্বাধীনতা-উত্তর লোকসংস্কৃতি প্রয়াস", 'স্বাধীনতার পঁচিশ বৎসর' তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৭৩, পৃ ৭০

১৮ অশোক মিত্র (সম্পাদক), 'পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা' (১-৫ খণ্ড), ভারতের জনগণনা ১৯৬১, 'পশ্চিমবঙ্গ' ; অনুসন্ধান, সংকলন ও গ্রন্থনা অরুণকুমার রায়, তত্ত্বাবধান সুকুমার সিংহ ।

১৯ 'পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি'— ১৬-২০ ডিসেম্বর, ১৯৭০, অনুষ্ঠিত আলোচনাচক্রের উনিশটি প্রবন্ধের সংকলন, ১৯৭১, 'পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্প', তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ -আয়োজিত আলোচনাচক্রের (১৯৭১) দশটি প্রবন্ধের সংকলন, ১৯৭৬ ; 'পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্পীদের জীবন জীবিকা', তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, মার্চ ২৫, ১৯৮৩ ।

২০ তুষার চট্টোপাধ্যায়, 'সংযোগ সংক্রমণ ও লোকসংস্কৃতি জিজ্ঞাসা/ প্রসঙ্গ লোকমাধ্যম', সম্পাদনা সঞ্জীব সরকার, ১৯৮৬, পৃ. সাত ।

বাংলাদেশের সাহিত্য
১

রফিকুল ইসলাম

বাংলাদেশের মানুষ 'বাংলাদেশের সাহিত্য' বলতে বোঝেন ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় থেকে ঢাকাকেন্দ্রিক বাংলা সাহিত্যের নতুন ধারাকে — যে সাহিত্য প্রথমে দেশ বিভাগ এবং স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে বাংলাদেশের অভ্যুত্থানের কারণে রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে কলকাতাকেন্দ্রিক বাংলা সাহিত্য থেকে ক্রমাগত স্বতন্ত্র চরিত্র লাভ করছে । বাংলাদেশের সাহিত্যের বয়স এখন পঁয়তাল্লিশ বছর, যার মধ্যে পাকিস্তানী আমল প্রায় সিকি শতাব্দী আর বাংলাদেশী কাল দুই শতকের কিছু বেশি । বাংলাদেশের সাহিত্য নিজস্ব স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য লাভ করে বাহান্নোর ভাষা আন্দোলন থেকে । বাহান্নোর একুশে ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষার জন্য বাঙালির রক্তদানের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের সাহিত্য কলকাতার সাহিত্যিক ঐতিহ্য থেকে ভিন্ন নিজস্ব পথে মোড় নেয় । বাংলাদেশের সাহিত্যের এই চারিত্রিক স্বাতন্ত্র্য নবজীবন লাভ করে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে । ঢাকাকেন্দ্রিক বাংলা সাহিত্যের অভিজ্ঞতার মৌল ভিত্তি বাহান্নোর ভাষা আন্দোলন ও একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ । এ দুটি ঘটনা সমস্ত বাংলাভাষী মানুষের জন্যে সাধারণভাবে কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের জন্যে বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ ।

দেশ বিভাগের সময় যে সাহিত্যিকদের সৃজনশীল কর্মকাণ্ডে বাংলাদেশের সাহিত্যের আরম্ভ তাঁরা কিন্তু প্রায় সকলেই চল্লিশের দশকের শুরুতে বা তারও আগে থেকে কলকাতাবাসী ছিলেন, কবিদের মধ্যে সনাতন ধারার গোলাম মোস্তাফা, জসীমউদ্দীন, শাহাদাৎ হোসেন প্রমুখ আর আধুনিক ধারার আহসান হাবীব, ফররুখ আহমদ, আবুল হোসেন, সৈয়দ আলী আহসান, সিকানদার আবু জাফর, আবদুল গণি হাজারীর কবিজীবন কলকাতায় শুরু হয় । কথাসাহিত্যিক ও নাট্যকারদের মধ্যে আবুল মনসুর আহমদ, শওকত ওসমান, আবু রুশদ, আবু জাফর শামসুদ্দীন, শামসুদ্দীন আবুল কালাম, সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহর সাহিত্যিক জীবনের সূত্রপাত কলকাতায় । দেশ বিভাগের পরে এঁরা ঢাকায় যান এবং সাহিত্যচর্চা অব্যাহত রাখেন, কাজেই দেখা যাচ্ছে যে ঢাকাকেন্দ্রিক বাংলা সাহিত্যের প্রারম্ভ পর্বের নায়কগণ কলকাতার সাহিত্যিক ঐতিহ্য নিয়েই ঢাকায় বাংলা সাহিত্যের নতুন ধারা শুরু হয় এবং বাহান্নো সালের ভাষা আন্দোলনের পূর্ব পর্যন্ত তার জের চলে ।

প্রথমেই 'কবিতা' প্রসঙ্গ । ১৯৪৫ সালে আবদুল কাদির ও রেজাউল করীমের সম্পাদনায় কলিকাতা থেকে 'কাব্য মালঞ্চ' নামে একটি ব্যতিক্রমধর্মী কবিতা-সংকলন প্রকাশিত হয় । এ সংকলনে বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন কাল থেকে সমসাময়িক কাল পর্যন্ত খ্যাতনামা মুসলমান কবিদের নির্বাচিত কবিতা স্থান পায় । সংকলনে কয়েকজন তরুণ কবির কবিতাও ছিল, কাব্য ঐতিহ্যের দিক থেকে যাঁরা ত্রিশের আধুনিক বাংলা কবিতার অনুসারী । এই কবিদের মধ্যে ছিলেন আহসান হাবীব, ফররুখ আমেদ, আবুল হোসেন ও সৈয়দ আলী আহসান । দেশ বিভাগের পূর্বেই প্রথমোক্ত তিনজনের কাব্য-সংকলন কলিকাতা থেকে প্রকাশিত হয় । পাকিস্তান আন্দোলন ফররুখ

আহমদকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল । তিনি পুঁথি সাহিত্যের ঐতিহ্য পুনরুজ্জীবনে ব্রতী ছিলেন ।

'কাব্যমালঞ্চে' সংকলিত আধুনিক কবিতাগুলি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, ভারত ছাড় আন্দোলন ও পাকিস্তান প্রস্তাবের পটভূমিকায় রচিত । কলকাতার আধুনিক মুসলিম কবিরা সে সময় পাকিস্তান আন্দোলন দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত ছিলেন । ফররুখ আহমদ পাকিস্তান আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম পুনর্জাগরণের কবি । তাঁর 'সাতসাগরের মাঝি' কবিতায় সে জাগরণের আভাস,

তবু দেখা যায় বহু দূরে হেরার রাজতোরণ ।
এখানে এখন প্রবল ক্ষুধায় মানুষ উঠেছে কেঁপে—
এখানে এখন অজস্র ধারা উঠছে দু'চোখ ছেপে ;
তবু দেখা যায় দূরে বহু দূরে হেরার রাজতোরণ ...
হেরার তোরণ মিলবে সমুখে জানি ।

আহসান হাবীবের চল্লিশ থেকে ষাটের দশকের মধ্যে প্রকাশিত প্রথম তিনটি কাব্যগ্রন্থ যথাক্রমে 'রাত্রিশেষ' (১৯৪৭), 'ছায়া হরিণ' (১৯৬২) এবং 'সারা দুপুর' (১৯৬৪) । 'রাত্রিশেষ'-এর মুখবন্ধে কবি বলেছেন : 'বাংলা কবিতা যখন সমাজসম্পৃক্ত এক নতুন সংজ্ঞায় নতুন দিগন্তে উত্তীর্ণ হচ্ছে ... নতুন কাব্য পরীক্ষার সেই দুঃসাহসী সমাবেশে যোগস্থাপন রাত্রিশেষ একেবারে অক্ষম হয়নি ।" রাত্রিশেষের কবিতাগুলিতে তিনি 'প্রহর', 'প্রান্তিক', 'প্রতিভাস', 'পদক্ষেপ' এই চার পর্যায়ে ভাগ করে শিল্পীমানসের অগ্রগমনকে নির্দেশ করতে চেয়েছেন । 'রাত্রিশেষ' থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি—

দিনগুলি মোর বিকলপক্ষ পাখির মতো
বন্ধ্যা মাটির ক্ষীণ বিন্দুতে ঘূর্ণ্যমান
—দিনগুলি

অথবা

ঝরা পালকের ভগ্নস্তূপ তবু বাঁধলাম নীড়
তবু বারবার সবুজ পাতার স্বপ্নেরা করে ভিড় ।
—এই-মন— এ মৃত্তিকা

অথবা

এখানে তোমার ছাউনি ফেলো না আজকে
এটা বালুর চর
চারদিকে এই কৌটিল্যের কণ্টকময় বন ধূসর ।

অথবা

অতঃপর সচকিত আকস্মিক বিমূঢ় বিরতি
নিরাতঙ্ক পাতালে এ-মৃত্তিকা বিশ্বাসঘাতক —দীপান্তর

পৃথিবীর ও জীবনের ব্যর্থতার জন্য খেদ আছে, মৃদু জ্বালা আছে, হতাশা ও নৈরাশ্য আছে আহসান হাবীবের কবিতায়,

প্রত্যয়ের দিন নাই, প্রতিশ্রুতি বিদ্রূপ-বিক্ষত,
আশা ও আশ্বাস নাই, প্রেম হেথা স্বভাববণিক

নির্মাংশ অস্থির পাশে ভিড় করি কুকুরের মত,
দীর্ঘদিন বাঁচি মোরা, জীবনেরে নিত্য দিয়া ধিক্ ।

—দীপান্তর

'রেড রোডে রাত্রিশেষ' গ্রন্থের নামে শেষ কবিতা প্রধান কবিতাও বটে । কবির আবেগ ও কবিতায় নিজস্ব গণ্ডি ছাড়িয়ে অগ্রসরমান,

রেড রোডের বুক থেকে,
এগিয়ে যাবে কেল্লার মাঠ পেরিয়ে
তারপর আরো এগোবে ।
গঙ্গার গভীর জলে ঘুচাব কি তার লজ্জা !
অথবা ঘাটে বাঁধা অনেক দূরের জাহাজ,
যারা পার ক'রে দেয় পলাতক অন্ধকারকে
নিরাপত্তার পাল তুলে ।

লক্ষণীয় যে, পরিচিত নৈরাশ্যের গণ্ডি পেরুতেও আহসান হাবীবের কত সংশয় । 'ছায়াহরিণ' সংকলনে কোনো মুখবন্ধ নেই, কবিতাগুলি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিন্যস্ত নয় । বরং কবির আবেগ বিনা ভূমিকায়, অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে প্রকাশ পেয়েছে কোনো কোনো কবিতায়,

আমাকে বিশাল কোনো সমুদ্রের ঢেউ হতে বলো ।
হতে পারি যদি, এই প্রতিশ্রুতি দিতে পারো—
সমুদ্রের ঢেউ
হারায় না সমুদ্রের গভীরে এবং
ফিরে আসে শৈশবের নদীর আশ্রয়ে ।

—সমুদ্র অনেক বড়

আহসান হাবীব মৃদুভাষী কবি, কখনো উচ্চকণ্ঠ নন, সংলাপের ভঙ্গিতে আবেগের প্রকাশ করেন । আরোপিত তত্ত্ব, মনন ও প্রজ্ঞায় তাঁর কবিতা ভারাক্রান্ত নয় । তাঁর কবিতার মেজাজ অনেক সময় গীতিকাব্যিক,

সোনামুখী নারকেলের শাখায় শাখায়
আর দুধ-সুপারি-বনে
এখনো কি হাওয়া বয় বঙ্গোপসাগর থেকে
বিকেলে ? সোনালি রোদ
এখনো কি মুখ দেখে জোয়ারের জলে ?

—জল পড়ে পাতা নড়ে

'রাত্রিশেষ' গ্রন্থে আহসান হাবীবের জীবন দর্শনের যে আভাস পাওয়া গিয়েছিল 'রেড রোডে রাত্রিশেষ' কবিতায়, 'সারা দুপুর' গ্রন্থে 'আলো আঁধারের দর্শন' কবিতায় তা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে,

ওরা বলে, রাত শেষ হয়ে এলো আমাদের পেছনে
আমরা বলি, সামনে তোমাদের রাত নামছে
তোমরা ফিরে এসো ।
আশা —সে ত মরীচিকা, আমরা বলি ।
ওরা বলে, আশাই জীবন, জীবনের শ্রী ।

ওরা এগিয়ে যায় স্বচ্ছন্দে,
আমরা অবাক হই ।

—আলো আঁধারের দর্শন

আহসান হাবীবের প্রথম তিনটি কাব্যে কবির আবেগ খুব আশাবাদী মনে হয় না ।

ফররুখ আহমদের চল্লিশ থেকে ষাটের দশকের মধ্যে প্রকাশিত কাব্য 'সাত সাগরের মাঝি' (১৯৪৪), 'সিরাজাম মুনীরা' (১৯৫২), 'মুহূর্তের কবিতা' (১৯৬৩), 'হাতেম তায়ী' (১৯৬৬) । ফররুখ আহমেদের 'সাত সাগরের মাঝি' ইসলামী ঐতিহ্য ও পুনর্জাগরণের কাব্য । ফররুখ আহমেদ তাঁর অভিজ্ঞতার প্রকাশ করেন কয়েকটি প্রতীকের সাহায্যে । 'সিন্দাবাদ' তাঁর একটি প্রিয় ও বহুল ব্যবহৃত প্রতীক, যে নাবিক নিত্যনতুন দরিয়ায় তরী ভাসায় নতুন জীবনের তাজা প্রাণের ঘ্রাণে,

কেটেছে রঙিন মখমল দিন, নতুন সফর আজ,
শুনছি আবার নোনা দরিয়ার ডাক,
ভাসে জোরওয়ার মউজের শিরে সফেদ চাঁদির তার,
পাহাড় —বুলন্দ ঢেউ ব'য়ে আনে নোনা দরিয়ার ডাক ;
নতুন পানিতে সফর এবার, হে মাঝি সিন্দাবাদ ।

আহসান হাবীবের কবিতার সঙ্গে ফররুখ আহমদের কবিতার মেজাজের পার্থক্য মুহূর্তে ধরা পড়ে । আরব্য উপন্যাসের হাজার রাতের কাহিনীকার শাহেরজাদী ফররুখ আহমদের প্রিয় নায়িকা, ফররুখ আহমদের রোম্যান্টিক মানস বার বার শাহেরজাদীর ঝরোকার উদ্দেশে ভেসে যায়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ মন স্বস্তি পায় কোনো মরূদ্যানে নয় বরং বাংলার চিরপরিচিত পদ্ম-বনে,

তোমাকে সুন্দর করে সে আমার প্রেম
অন্তরের ঘ্রাণ,
দিন রাত্রি ঝ'রে ঝ'রে পড়ে
দীর্ঘ পদ্মনাল বেয়ে পাপড়ির পরে ...
ভ'রে ওঠে মনের আকাশ দীর্ঘশ্বাস অপরাহ্ণ বেলা
পাপড়ির দ্বার রুধি' পদ্মের সুরভি কোথা চলেছে একেলা,
পিছে ফেলে পরিত্যক্ত পাপড়ির বাস,
ভেসে চলে মন, দূরে ভেসে চলে সুরভি প্রশ্বাস,
...জানি না কোথায়—

—ঝরোকায়

ফররুখ আহমদের রোম্যান্টিক মানস সুদূর অতীতচারী হলেও, আলেফ লায়লা, হাতেম তায়ীর জগতে স্বচ্ছন্দবিহারী হলেও, শৃংখলমুক্ত পূর্ণচিত্তের প্রতীক রূপে তিনি বাংলা দেশের ডাহুক পাখিকে গ্রহণ করেন, ডাহুকের ডাক কবির কাছে আকাশ-জমানো ঘন অরণ্যের অন্তর্লীন ব্যথাতুর গভীর সিন্ধুর অপরূপ সুর, যে সুরে আত্মা জাগ্রত হয়, স্রষ্টার ও সৃষ্টির সম্পর্কের রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয় । রাত্রির পেয়ালা পূরে উপচে পড়া ডাহুকের সুর তাই এক অফুরান সুরা,

চাঁদের দুয়ারে
যে সুরার তীব্র দাহে ভেসে চলো উত্তাল পাথারে,

প্রান্তরে তারার ঝড়ে
সেই সুর ঝ'রে পড়ে
বিবর্ণ পালক,
নিমেষে রাঙ্গায়ে যায় তোমার নিষ্প্রভ তনু বিদ্যুৎ ঝলক,
তীর-তীব্র গতি নিয়ে ছুটে যায় পাশ দিয়ে উল্কার ইশারা,
মৃত অরণ্যের শিরে সমুদ্রের নীল ঝড় তুলে যায় সাড়া
উদ্দাম চঞ্চল ;
তবু অচপল
গভীর সিন্ধুর
সুদুর্গম মূল হ'তে তোলো তুমি রাত্রিভরা সুর ।

—ডাহুক

কিন্তু ফররুখ আহমদের বিচরণ শুধু সুদূর অতীত নয়, সৃষ্টির রহস্যালোকেই নয় । কবি আরব্য উপন্যাস আর সাত সাগর থেকে প্রত্যাবর্তন করেন স্বদেশের রূঢ় বাস্তবতায় । তেতাল্লিশের মন্বন্তরের পটভূমিকায় রচিত 'লাশ' কবিতা, পথের পাশে পড়ে থাকা অনাহারে মৃত মানুষের লাশ দেখে কবির মনে হয়,

পড়ে আছে মৃত মানবতা
তারি সাথে পথে মুখ গুঁজে ।...
হে জড় সভ্যতা !
মৃত-সভ্যতার দাস স্ফীতমেদ শাসক সমাজ ?
মানুষের অভিশাপ নিয়ে যাও আজ ;
তারপর আসিলে সময়
বিশ্বময়
তোমার শৃংখলগত মাংসপিণ্ডে পদাঘাত হানি'
নিয়ে যাবে জাহান্নাম দ্বারপ্রান্তে টানি'
আজ এই উৎপীড়িত মৃত্যু-দীর্ণ নিখিলের অভিশাপ বও :
ধ্বংস হও
তুমি ধ্বংস হও ।

—লাশ

এই জড় সভ্যতার, এ মৃত সভ্যতার ধ্বংসস্তূপের ওপর ফররুখ আহমদ যে পৃথিবী গড়ে তুলতে চান তা নতুন কোনো পৃথিবী নয়, নতুন কোনো সভ্যতা নয় । এক প্রাচীন সভ্যতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা তাঁর কাম্য । সেজন্যেই হেরার রাজতোরণের উদ্দেশে সাত সাগরে কিশতী ভাসাতে হবে । হেরার গুহা থেকেই যে সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল,

কত যে আঁধার পর্দা পারায়ে ভোর হ'ল জানি না তা' ।
নারঙ্গী বনে কাঁপছে সবুজ পাতা ।
দুয়ারে তোমার সাত-সাগরের জোয়ার এনেছে ফেনা ।
হে মাঝি ! এবার তুমি পেয়ো না ভয়,
তুমিও কুড়াও হেরার পথিক-তারকার বিস্ময়,

ঝ'রুক এ ঝড়ে নারঙ্গী পাতা, তবু পাতা অগণন
ভিড় ক'রে— যেথা জাগছে আকাশে হেরার রাজ-তোরণ ।

—সাতসাগরের মাঝি

ফররুখ আহমদের 'সিরাজাম মুনীরা'য় (১৯৫২) কবির অভিজ্ঞতা ইসলামের গৌরবময় যুগকে কেন্দ্র করে আবর্তিত । সিরাজাম মুনীরায় জ্যোতির্লেখা মুক্ত ঝরোকায় তৌহিদী মশাল বহন ক'রে যে যাত্রীদল চলে গেছে সে পথেই কবির বিচরণ । ইসলামের গৌরবময় যুগ সিরাজাম মুনীরা, মুহম্মদ মুস্তাফা (সাঃ) আর ইসলামের চার খলিফা আবু বকর, ওসমান, ওমর, আলী হায়দরের জন্যই স্মরণীয় । কবি তাঁদের গৌরবময় জীবনগাথা ছন্দোবদ্ধ করেছেন । 'সিরাজাম মুনীরা'য় তিনি ইসলামের ইতিহাসের স্বর্ণযুগের গৌরবকে প্রত্যক্ষ করেছেন ।

'মুহূর্তের কবিতা'য় (১৯৬৩) ফররুখ আহমদ রূপকথা আর ইতিহাসের রাজ্য থেকে অবকাশ নিয়েছেন। এই সনেট সংকলনের অনেকগুলি সনেট পরিচিত পৃথিবী ও পারিপার্শ্ব -নির্ভর । কয়েকটি সনেটে কবি নিজেকে উন্মুক্ত করেছেন অন্তরঙ্গ আলোকে । 'শেষ কথা' সনেটে 'মুহূর্তের কবিতা'র মূল আবেগ প্রকাশ পেয়েছে,

শুধু নিমেষের রঙে এই সব গান মুহূর্তের
অতলান্ত দরিয়ায় এ সব বুদ্বুদ গোত্রহীন
কখনো উঠেছে কেঁদে, কখনো বা হয়েছে রঙিন
দু'দণ্ড খেলার ছলে স্পর্শ নিতে এই জীবনের ।

'হাতেম তায়ী'তে (১৯৬৬) ফররুখ আহমদ পুঁথির রাজ্যে বিচরণ করেছেন । তাঁর কাব্যপ্রেরণার উৎস পুঁথি সাহিত্যের ঐতিহ্য, যে ঐতিহ্যের আধুনিক রূপকার তিনি ।

ত্রিশোত্তর বাংলা কবিতায় মুসলমান কবিদের উল্লেখযোগ্য সংযোজনের মধ্যে আহসান হাবীবের 'রাত্রিশেষ' এবং ফররুখ আহমদের 'সাত সাগরের মাঝি' ছাড়া আবুল হোসেনের 'নববসন্ত' (১৯৪০) কাব্য । রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গীকৃত গ্রন্থটির নাম কবিতায় বসন্তের নয় কালবৈশাখীর আবেগ,

গত বর্ষের বসন্ত-স্মৃতি জলের লিখন হ'ল,
এল দুর্দিনে কালবৈশাখী, বর্ষের প্রান্তে বর্ষার ঝোড়ো রাত,
আকাশে বজ্রবাহিনী মেঘের বিপুল আর্তনাদ,
ঝড়ে জলে টলমল
ধূলায় লুটায় পাখীর পাখনাগুলো ;
উলঙ্গ তার বীভৎস দেহে কি করুণ ভঙ্গিমা ।
সে কি পাখীর তণিমা ?
চিনেছো কি কেউ সবুজের রেখাগুলো ?

আবুল হোসেনও ফররুখ আহমদের মতো সমুদ্র, নাবিক আর মন্বন্তর নিয়ে কবিতা লিখেছেন কিন্তু মেজাজ সম্পূর্ণ ভিন্ন, আবুল হোসেনের 'নাবিক', ফররুখ আহমদের সিন্দাবাদের মতো রূপকথার রাজ্যের নয়, এ নাবিক আধুনিক সমুদ্রচারী,

দূরে কোথা হতে ভেসে এলো বাতাসে
অচেনা অজানা কোন জাহাজের বাঁশির ধ্বনি,
কোথায় কোনখানে আছে তারা ?
সমুদ্রের জল থেকে উঠে আসছে

ম্লানজ্যোতি আইসবার্গ ভাঙনের গভীর আর্তনাদ,
দূরাগত কোন পাখীর অস্পষ্ট অসংবদ্ধ সঙ্গীতালাপ,
আর সমুদ্রতটে কোন্ আগ্নেয়গিরির
ধূম্রের কুণ্ডলী এলো ভেসে ।
নাবিক দাঁড়ায়ে আছে ব্রিজের ওপর হেলান দিয়ে ।

—নাবিক

আবুল হোসেনের 'মন্বন্তরে' আবেগ ও অনুভূতি ফররুখ আহমদের 'লাশ' কবিতার মতো তীব্র নয়, এখানে শুধু বর্ণনা,

আজ মনে পড়ে
মন্বন্তরে
আমরা এলাম এ শহরে ।
গরু নেই গোয়ালে ধান নেই খামারে
মাছ নেই নদীতে কুমোর ও কামারে
কাজ আর পায় না বসে আছে তাঁতীরা
পথে পথে ঘুরে মরে করাতীরা ।

আবুল হোসেনের 'নববসন্তে', সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে উদ্দেশ্য করে লেখা 'স্বগত' নামে একটি কবিতা আছে, যেখানে কবির এক বিশেষ অনুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়,

মরীচিকাও পলাতক আজ লু-হাওয়ায়,
যেদিকে তাকাও ধূ ধূ করে বালু আগুনতাতা
মনকে বাঁধবে নিরাপদে আজ কোন খুঁটায়,
চোরাবালিহীন শূন্যে কি যাবে নোঙর পাতা ।
যেদিকে তাকাও ধূ ধূ করে বালু আগুনতাতা ।

চল্লিশ দশকের আর-একজন প্রধান কবি সৈয়দ আলী আহসান, কিন্তু দেশ বিভাগের পূর্বে তাঁর কোনো কবিতাগ্রন্থ প্রকাশিত হয় নি । দেশ বিভাগের পর থেকে ষাটের দশকের মধ্যে তাঁর প্রকাশনা 'অনেক আকাশ' (১৩৬৬), 'একক সন্ধ্যায় বসন্ত' (১৩৬৯), 'সহসা সচকিত' (১৩৭৩), 'উচ্চারণ' (১৯৬৮) । সৈয়দ আলী আহসানের কবিতা একান্তভাবে ব্যক্তি ও আত্মনির্ভর, তাই উত্তম পুরুষের সংলাপে বহু কবিতা রচিত,

বিমূঢ় নয়নে আমি জীবনের সন্ধান জেনেছি
দ্বীপান্তর লোকালয়, স্বপ্নভ্রান্ত অনেক অতীত—
নতুন নারীর ক্ষেত্রে উরু-পুষ্ট লাঞ্ছনা চেয়েছি
মূর্চ্ছিত নদীর স্রোতে দাবানল করেছি সন্ধান ।

—নতুন স্বাদ : অনেক আকাশ

সৈয়দ আলী আহসান জীবনের যে নতুন স্বাদ অন্বেষণ করেছেন তা ইন্দ্রিয়ঘন অনুভূতির এক উত্তপ্ত চেতনা, আলী আহসানের বহু কবিতায় এই বিশেষ আবেগের পরিচর্যা পাই,

যখন তোমার উপর আমার দেহভার
অবনমিত হয়
তুমি শিহরিত হও আমাকে দেখে

তুমি একান্ত আমার
যেমন চক্ষু একান্তভাবে মুখমণ্ডলের
তুমি মৃত্যুর পথে নেমে যাবে
আমার গান থাকবে তোমার ওষ্ঠে

—তোমাকে ধরা যায় না

'অনেক আকাশ'-এর চেতনা 'একক সন্ধ্যায় বসন্ত' কাব্যে প্রকৃতিতে সমর্পিত, তবে প্রকৃতিই 'একক সন্ধ্যায় বসন্ত' কাব্যের একক নায়ক নয়, 'অনেক আকাশ'-এর রক্তিম আবেগ এখানে প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে বৈচিত্র্য লাভ করেছে ।

যখন অনেক কথা বলা শেষ হ'ল
যখন সমুদ্র-স্বাদে সকালের রোদ গ'লে গেল
যখন তরঙ্গ-দোলা একজন অশ্বারোহী যেন—
নীল আর সাদা আর সবুজের রঙ ছুঁয়ে ছুঁয়ে
প্রসারিত অতলান্ত ক্লান্তিহীন বিপুল উল্লাসে
হৃদয় নির্জন ক'রে এ মুহূর্তে আমারে ডেকেছে
তখন তোমার চিন্তা সঙ্গীহীন পাখীর ডানায়
সমুদ্রের জলে ভিজে অকস্মাৎ আমারে জাগালো

—যখন অনেক কথা বলা শেষ হ'ল

কবির নিসর্গ চেতনা এ গ্রন্থে শেষ অবধি স্বদেশচেতনায় রূপান্তরিত, সৈয়দ আলী আহসান তাঁর স্বদেশকে আবিষ্কার করেন নিসর্গ শোভার মধ্যে,

বর্ষায় বন্যায় তুমি অতলান্ত
অপরিমিত হৃদয়ের বৈকুণ্ঠ
আদিগন্ত জীবনের পরিধি
স্রোতবাহী নৌকার মতো সম্ভাষণ
গলুয়ের উপর ব'সে
    গলা ছেড়ে গান গাওয়ার মতো
কি আশ্চর্য প্রাণের প্রসার ।

—আমার পূর্ব বাংলা : এক

'সহসা সচকিত' গ্রন্থে সৈয়দ আলী আহসানের আবেগ অন্তর্মুখীন । গ্রন্থের ত্রিশটি কবিতার একটিরও কোনো নাম নেই কারণ একটি বিশেষ আবেগই স্বগতোক্তির মতো বিভিন্ন কবিতায় বিচিত্ররূপে ঘূর্ণায়মান । সৈয়দ আলী আহসানের চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ 'উচ্চারণ' (১৯৬৮) রবীন্দ্রনাথের 'লিপিকা'র মতো গদ্যের আঙ্গিকে রচিত ।

একাকী বিষণ্ন মুহূর্তে দিন-গণনাকে অবলম্বন করতে চাইনি ।
সময়ের পদাঘাত শুনে মৃত্যুর অধীরতাকে কেন প্রশ্রয় দেব ?
আমি পৃথিবীর সকল সঞ্চয়কে ভালোবেসেছি অসম্ভব
তীব্রতার সঙ্গে । এ ভালোবাসার স্বাক্ষর আমি রেখে যেতে
চাই আমার দৃষ্টির অভিসারে, আমার উচ্চারণের বন্যায় ।

—মুখবন্ধ

চল্লিশের দশকে যে কয়েকজন বাঙালি মুসলমান কবি আধুনিক কবিতাকে তাঁদের প্রকাশ মাধ্যমরূপে গ্রহণ করেন তাঁর মধ্যে সবচেয়ে মৌলিক প্রতিভাধর ছিলেন ফররুখ আহমদ ।

১৯৫০ সালে ঢাকা থেকে তরুণ কবিদের কাব্যসংকলন 'নতুন কবিতা' প্রকাশিত হয় । পাকিস্তানোত্তর কালের প্রথম কবিতা সংকলন হিসেবে 'নতুন কবিতা'র ঐতিহাসিক মূল্য বর্তমান । আশরাফ সিদ্দিকী ও আবদুর রশীদ খান -সম্পাদিত সংকলনটিতে হাবীবুর রহমান, মুফাখ্‌খারুল ইসলাম, মনোজ রায়চৌধুরী, চৌধুরী ওসমান, আশরাফ সিদ্দিকী, আবদুর রশীদ খান, মযহারুল ইসলাম, মোহাম্মদ মামুন, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, শামসুর রাহমান, আলাউদ্দিন আল আজাদ, হাসান হাফিজুর রহমান ও বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীরের কবিতা স্থান পায় । 'নতুন কবিতা'র ভূমিকায় দাবি করা হয়েছিল, "যেখানে কবি আবদুল কাদির সাহেবের 'কাব্য মালঞ্চ' শেষ সেখান থেকেই আমাদের শুরু, আর আজকের দিনে এসে সীমা নির্দেশ : সাহিত্যপথের নতুন যাত্রীদের কাব্য-সৃষ্টির খতিয়ান । সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের আজাদী উত্তর যুগের কাব্যের পথ নির্দেশ—যেহেতু 'নতুন কবিতা' পূর্ব পাকিস্তানের সর্বপ্রথম কাব্য-সংকলন । নতুন কবিতা। নতুন এবং কবিতা । নতুন অর্থে কালকের নয়— আজকের ।"

'নতুন কবিতা'র কবিতাগুলিকে এক অর্থেই কেবল নতুন বলা যেতে পারে সে হল কবিতাগুলো পাকিস্তানোত্তর কালে ঢাকায় রচিত । তবে যে অর্থে কবিতাকে নতুন বলা চলে যেমন বিষয়বস্তু, আঙ্গিক, প্রকরণ, ভাষা, সে-সব দিক থেকে বিচার করলে 'নতুন কবিতা' নতুন নয় । 'নতুন কবিতা'র তিনজন অপেক্ষাকৃত নতুন কবি শামসুর রাহমান, আলাউদ্দীন আল আজাদ আর হাসান হাফিজুর রহমানের কবিপ্রতিভার যথার্থ বিকাশ বাহান্নোর ভাষা-আন্দোলনের পর থেকে । সেদিক থেকে ঢাকাকেন্দ্রিক বাংলা সাহিত্যের যথার্থ নতুন কবিতা খুঁজতে হয় ১৯৫৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির প্রথম বার্ষিকীতে প্রকাশিত হাসান হাফিজুর রহমান -সম্পাদিত 'একুশে ফেব্রুয়ারি' সংকলনে । আমাদের ধারণা ১৯৫১ সালে প্রকাশিত 'নতুন কবিতা' ১৯৪৫ সালের 'কাব্যমালঞ্চ' সংকলনেরই সম্প্রসারণ । ঢাকাকেন্দ্রিক বাংলা সাহিত্যের অর্থাৎ বাংলাদেশের সাহিত্যের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ ১৯৫২ সালের ২১ফেব্রুয়ারি থেকে যার প্রথম দিকচিহ্ন 'একুশে ফেব্রুয়ারি' সংকলন ।

পঞ্চাশ দশকের কবিদের মধ্যে প্রধান পুরুষ শামসুর রাহমান, ষাটের দশকে তাঁর চারটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়, 'প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে', 'রৌদ্র করোটিতে', 'বিধ্বস্ত নীলিমা' এবং 'নিরালোকে দিব্যরথ' । শামসুর রাহমান নিম্নোক্ত ঘোষণা দিয়ে কবিতার রাজ্যে প্রবেশ করেন,

> শুধু দু'টুকরো শুকনো রুটির নিরিবিলি ভোজ
> অথবা প্রখর ধূ ধূ পিপাসায় আঁজলা ভরানো পানীয়ের খোঁজ
> শান্ত সোনালী আল্পনাময় অপরাহ্নের কাছে এসে রোজ
> চাইনিতো আমি। । দৈনন্দিন পৃথিবীর পথে চাইনি শুধুই
> শুকনো রুটির টক স্বাদ আর তৃষ্ণার জল ।
>
> —রূপালী স্নান

জীবনের ক্লান্ত শ্রান্ত বিবর্ণ রূপ শামসুর রাহমানের প্রথম কাব্যে ফিরে ফিরে আসে, জীবনের পরিপূর্ণতার অভাববোধ শামসুর রহমানের এ কাব্যে প্রেক্ষিত রচনা করেছে,

> এ্যাপোলো তোমার মেধাবী হাসির সোনালী ঝরণা
> শিশু পৃথিবীর ধূসর পাহাড়ে এখানো কি রবে লুপ্ত ?
> আমরা এখানে পাইনি কখনো বন্ধু তোমার
> সোনালী রূপালী গানের গভীর ঝংকার,
>
> —এ্যাপোলোর জন্যে

শামসুর রাহমানের দ্বিতীয় কাব্য 'রৌদ্র করোটিতে' প্রাণহীন পৃথিবীতে কিছু প্রাণের সঞ্চার লক্ষ্য করা যায়, যেমন 'দুঃখ' কবিতায়, যে দুঃখ যতটা বস্তুগত, ততটা হৃদয়গত নয়, এ দুঃখ আনন্দময়ও বটে,

কখনো না দেখা নীল আকাশের
মিহি বাতাসের
সুন্দর পাখির মতো আমার আশায়
হৃদয়ের নিভৃত ভাষায়
দুঃখ তার লেখে নাম ।

'রৌদ্র করোটি'তে কবি এক নতুন চেতনায় উদ্দীপ্ত, যে চেতনা দৈনন্দিন জীবনের প্রাত্যহিকতার মধ্যেও সুরের আভাস পায়, ধ্বনির ঝংকার ঝংকৃত হয়, কবি স্বপ্নের আশ্রয় নেন,

পার্কের নিঃসঙ্গ খঞ্জ চেয়েছে চাঁদের কাছে বুঝি
একটি অদ্ভুত স্বপ্ন তাই রাত্রি তাকে
দিল উপহার ।

—পার্কের নিঃসঙ্গ খঞ্জ

কবির দ্বিতীয় কাব্যে উপমাগুলো আর বিষণ্ণ নয়, উজ্জ্বল প্রাণময়, যেমন, 'উজ্জ্বল মাছের রুপালি আঁশের মতো ধ্বনি ঝরে' অথবা 'তিনটি বালক' কবিতায়, তিন জোড়া চোখ বাদামি রুটির দীপ্তি মেখে নেয়, অথবা তন্দুর তাপের আশায় ঘনিষ্ঠ হয়,

রুটির দোকান ঘেঁষে তিনটি বালক সন্তর্পণে
দাঁড়ালো শীতের ভোরে, জড়োসড়ো । তিন জোড়া চোখ
বাদামি রুটির দীপ্তি নিলো মেখে গোপন ঈর্ষায় ।
রুটিকে মায়ের স্তন ভেবে তারা, তিনটি বালক
তৃষিত আত্মাকে সঁপে সংযত লোভের দোলনায়,
অধিক ঘনিষ্ঠ হ'লো তন্দুরের তাপের আশায় ।

—তিনটি বালক

এ কাব্যে কবির হতাশা ব্যঙ্গ বিদ্রূপে পরিণত, যেমন 'মেষ' কবিতায় সমালোচনা ব্যক্তি থেকে সমষ্টিতে পরিব্যাপ্ত,

মেষরে মেষ তুই আছিস বেশ,
মনে চিন্তার নেইকো লেশ ।
ডানে বললে ঘুরিস ডানে,
বামে বললে বামে ।
হাবে ভাবে পৌঁছে যাবি
সোজা মোক্ষধামে ।

—মেষতন্ত্র

'বিধ্বস্ত নীলিমা' কাব্যে শামসুর রাহমানের বাস্তববোধ আরো তীক্ষ্ণ, আরো তীর্যক, সে বোধ ব্যক্তি থেকে সমষ্টিতে পরিব্যাপ্ত, কবিতার ভাষা এ কাব্যে চকচকে ধারালো ।

'বিধ্বস্ত নীলিমা'তে কবি তার পরিবেশকে চিত্রায়িত করেছেন আপন দৃষ্টিতে, 'সময়' এখানে ক্ষুধার্ত বাঘা সব-কিছু গোগ্রাসে গিলে ফেলে প্রত্যহ যা নতুন শিকার খোঁজে । 'পুরাণ' কবির কাছে অলিন্দের অন্ধকারে ওড়া কয়েকটি দারুণ অস্থির আতঙ্কিত চামচিকে । 'চেতনা' শিল্পকে প্রচণ্ড লাথি মেরে জীবনবোধগুলোকে অবলীলাক্রমে আঁস্তাকুড়ে ছুঁড়ে ফেলে । 'জীবন' কমা-সেমিকোলনের ভিড়ে ঢ্যাঙা এক শূন্যতা । কবি যেন এক 'বামনের দেশের'

অধিবাসী, ভ্রান্তির ডুগডুগি বাজিয়ে যেখানে জীবন কাটে,
চতুর্দিকে যে বিচিত্র চিত্রশালা দেখি রাত্রিদিন
তাতে সব ব্যঙ্গচিত্র। চোখ জুড়ে আছে কিমাকার
জীবনমথিত দৃশ্য। বিশিষ্ট প্রতিভাবানদের
আত্মার সদ্‌গতি ক'রে সম্মিলিত শৃগাল ভালুক
ফিরে আসে ময়লা গুহায়।

—বামনের দেশে

ষাটের দশকের শেষের দিকে প্রকাশিত শামসুর রাহমানের 'নিরালোকে দিব্যরথ' ও 'নিজবাসভূমি' কাব্যে শামসুর রাহমান অত্যন্ত জীবনসম্পৃক্ত কবি। ঐ দুটি গ্রন্থে বিভিন্ন কবিতায় সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনাবলী প্রাধান্য পেয়েছে, যেমন 'অধমর্ণের গান', 'পোড়া বাড়ি' (নিরালোকে দিব্যরথ), 'বর্ণমালা আমার দুঃখিনী বর্ণমালা', 'ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯', 'হরতাল' (নিজবাসভূমে) প্রভৃতি। শামসুর রাহমান পঞ্চাশের দশক থেকে নব্বই-এর দশক পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রধান কবি এবং ত্রিশোত্তর আধুনিক বাংলা কবিতার অন্যতম প্রধান পুরুষ।

আলোচ্য সময়ে হাসান হাফিজুর রহমানের কাব্য 'বিমুখ প্রান্তর' (১৯৬৩), 'অন্তিম শরের মতো' এবং 'আর্তশব্দাবলী' (১৯৬৮)। হাসান হাফিজুর রহমানের 'বিমুখ প্রান্তর' বন্ধ্যা নয়, রুক্ষ নয়, এ প্রান্তর আপাত বন্ধ্যা, আসলে সজীব,

মায়ের মুখের মতো শ্যামলিমা আয়ুষ্মতী
তুমি চিত্রার্পিতা সৃষ্টি ঈশ্বরের
আলো দাও, ধ্বনি দাও, প্রাণ দাও
অন্ন তুলে দাও মুখে।

—স্মৃতির আগুনে জ্বলে

হাসান হাফিজুর রহমানের পৃথিবী আপাতবন্ধ্যা, আপাতবিমুখ কারণ এ প্রান্তর 'বন্দিনীর প্রহসনে প্রাণহীন চিত্রার্পিতা' সর্বোপরি 'মাটি বোবা নয়, শ্যামলিমা অনুভূতিশূন্য নয়' তাদেরও অবিরাম বিক্ষুব্ধ উৎসমুখ আছে। কিন্তু 'কোলাহল তৃপ্ত দেশ, কোলাহল মগ্ন দেশ, অজান্তে সহজে চলে।' তবে স্বদেশের ঐ রূপ চিরন্তন নয়, পলিমাটি-বিধৌত দেশ আর তার মানুষের চরিত্রের অপর দিকও কবির কাছে অস্পষ্ট নয়,

নিরবধিকাল পদ্মা যমুনা বাংলারই,
যদি একরোখা, গোঁ-ধরা ষাঁড়ের
মতো কিম্বা বাঙাল চাষার মতো ঘাড় বাঁকানো।
দুর্বারে তার বাৎসরিক পলিমাটি,

—স্তব্ধ মুখ

স্বদেশের দুই রূপ, একদিকে আপাতবন্ধ্যাত্ব, ক্লেদ ও কান্নাময়, অপর দিকে সুজলা সুফলা বিঘোষিত কুশলা। এর কোন্ রূপটি সত্য ? সে জিজ্ঞাসাই মূর্ত হাসান হাফিজুর রহমানের কবিতায়। 'অন্তিম শরের মতো' কাব্যে স্বদেশ আর তার মানুষের প্রকৃত পরিচয়ের জন্য তিনি কখনো স্বদেশের ইতিহাস আবার কখনো বা তার কিংবদন্তির রাজ্যে পরিব্রাজক,

দর্পের স্তম্ভিত অতীত সত্তার পিঠে ঝুলিয়ে
স্বদেশের পরিব্রাজক আমি দক্ষিণ থেকে উত্তরে
সমুদ্র থেকে পাহাড়ে, পূর্ব থেকে পশ্চিমে

সজল থেকে উষরে— আমার স্বদেশের
একাকারে, আমার যাত্রার শেষ নেই ।

—স্বদেশের পরিব্রাজক

ইতিহাস আর কিংবদন্তি থেকে আশ্বাস হয়তো পাওয়া যায় কিন্তু স্বদেশের পরস্পরবিরোধী প্রকৃতির দ্বন্দ্বে সংশয় থেকে মুক্তির দিকনির্দেশ মেলে না । এ এক অসহনীয় পরিস্থিতি,

স্বনাম ভুলেছি আমি
কৌতুকের পাশব খেলায়
জন্ম-মৃত্যু ঘুঁটি চালি
নিতান্ত হেলায়
দিন যাপনের কালে প্রাণধারণের দেশে
বেলা বয়ে যায় ।

'বিমুখ প্রান্তর'-এর ঐ অনুভূতি 'অন্তিম শরের মতো' কাব্যেও অপসৃত নয়,

স্থূল অভেদ্য
এক অনিমেষ ক্রান্তি কাল ভেদ করে যেন আমি
কেবলই বেরিয়ে যাচ্ছি । হাওয়ার এক স্তর পেরিয়ে
আরো হাওয়ার মধ্যে ? শূন্যতার নাভিমূলের দিকে ?
উত্তেজনারহিত হননের নিঃশব্দ নৈরাজ্যে ?

—চিরাচরিত ছায়াছবি

কান্না আর হতাশার উৎস যাই হোক-না কেন হাসান হাফিজুর রহমানের কবিতায় তার পরিণতি দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ে, ক্রোধ আর ক্ষোভ ঘৃণায় খরতর হলেও পরিশেষে তা নিত্যপ্রাণের অমোঘ আদলে রূপান্তরিত 'আর্ত শব্দাবলী' কাব্যে,

মারী বন্যার প্রতিটি ছোবলে
পলিমাটি জমে নিত্য প্রাণের
অমোঘ আদলে । খরতর করে
শ্যামছায়া গূঢ় ক্রোধকে আমার
এই প্রতারক কাল চেনাবে বলে ।
আপোষবিহীন দুই হাতে শুধু
অসহ্য ঘৃণার আগুন ঢালে ।

—রথের রেখা

হাসান হাফিজুর রহমান বাংলাদেশের সাহিত্যে পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে শামসুর রাহমানের পরই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কবি ।

পঞ্চাশের দশকের অন্যতম প্রধান কবি আল মাহমুদ, কবিতায় গ্রামীণ ও লোকজ অভিজ্ঞতার আধুনিক রূপকার । গ্রামের সজীব জীবন আর ভাষা থেকে তিনি কবিতার উপাদান সংগ্রহ করেন । তাঁর প্রথম কাব্য 'লোক লোকান্তর'এর 'তিতাস' কবিতায় দেখি তিতাস নদী তাঁর প্রেরণার উৎস,

এ আমার শৈশবের নদী, এ জলের প্রহার
সারাদিন তীর ভাঙে, পাক খায়, ঘোলা স্রোতে টানে

যৌবনের প্রতীকের মতো অসংখ্য নৌকার পালে
গতির প্রবাহ হানে ।....
কি গভীর জলধারা ছড়ালো সে হৃদয়ে আমার
সোনার বৈঠার ঘায়ে পবনের নাও যেন আমি
বেয়ে নিয়ে চলি একা অলৌকিক যৌবনের দেশে ।

প্রবহমান জীবনধারা আর তার পটভূমিকায় যে প্রকৃতি তার থেকে কবিতার শব্দ, উপমা, চিত্রকল্প চয়ন করে আল মাহমুদ এক রসসিক্ত জীবনকে তুলে ধরেন । কিন্তু সে জীবন বা নিসর্গ গীতিকবিতার দূর থেকে দেখা দৃশ্যপট নয় । 'ড্রেজার বালেশ্বর' কবিতায় শান্ত প্রকৃতির বুকে যন্ত্রদানবের ধাতব লীলা কবিকে পীড়িত করে,

নিঃশব্দে যন্ত্রণা সব তিতাসের বুকচেরা পানি
যখন এগোতে থাকে অতিকায় লোহার কাছিম
ময়লা দু'হাতে ধরে কত শক্তি, বোঝে না সুখানি
ধাতব কোদাল শুধু টানে ছেঁড়ে জলের জাজিম...
দারুণ আক্রোশে ফোলে দানবের কাদাভরা পেট
তিতাসে ড্রেজার যেন ভাসমান লোহার সনেট ।

আল মাহমুদ তাঁর কবিতায় যে-সব শব্দ, উপমা ও চিত্রকল্প ব্যবহার করেন তা লোকজীবনের উষ্ণ স্পর্শে সমৃদ্ধ । যেমন 'রাস্তা' কবিতায়, 'মানুষের সাধ্যমত ঘরবাড়ি', 'চাষা হাল বলদের গন্ধে থমথমে হাওয়া', 'কিষাণের ললাটলেখার মাতা নদী', 'সবুজে বিস্তীর্ণ দুঃখের সাম্রাজ্য', 'শুটকীর গন্ধে পরিতৃপ্ত মাছির আওয়াজ' ইত্যাদি । পরিচিত জীবনকে বর্ণগন্ধময় করে পরিবেশন করতে আল মাহমুদ সিদ্ধহস্ত ।

আল মাহমুদের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'কালের কলস' । এ কাব্যে তিনি পরিচিত পরিবেশ ছেড়ে অন্যত্র যেতে চেয়েছেন কিন্তু পারেন নি,

আমরা যেখানে যাবো শুনেছি সেখানে নাকি নেই
বাঁচার মতন জল, জলস্রোত, বর্ষণ হবে না
নিষ্পাখী ভীষণ নীল দগ্ধ দেশে উদ্ভিদহীনতা
হা হা করে দিন রাত ।

—জল দেখে ভয় লাগে

আল মাহমুদের পক্ষে পরিচিত পরিমণ্ডলের বাইরে যাওয়া সম্ভব নয়, পূর্ব অভিজ্ঞতার গণ্ডির বাইরে কবির স্থিতি স্থায়ী হতে পারে না । তাই অনতিবিলম্বে তিনি পরিচিত পরিবেশে প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছে করেন,

ফিরে যেতে সাধ জাগে, যেন ফিরে যাওয়ার পিপাসা
জাগায় সুদূর স্মৃতি ; মায়ের আঁচল ধরে টেনে
দেখায় দূরের নদী,

—ফেরার পিপাসা

প্রত্যাবর্তনের সাধ অচিরেই পূর্ণ হয় । উৎকেন্দ্রিক ছিন্নমূল জীবনের গান করতে পারেন না তিনি । যে জীবনের মূল মাটির গভীরে প্রোথিত নয়, যে অভিজ্ঞতা জীবন থেকে রস আহরণ করে না, সে জীবনের কবি আল মাহমুদ নন তাই তাঁকে প্রত্যাবর্তন করতেই হয়,

আমরা কোথায় যাবো, কতদূর যেতে পারি আর
ওই তো সামনে নদী, ধানক্ষেত, পেছনে পাহাড়

বাতাসে নুনের গন্ধ, পাখির পাপড়ি উড়ে যায়
দক্ষিণ আকাশ জুড়ে সিক্ত ডানা সহস্র জোড়ায় ;
তবে কি বৃষ্টির দেশে এসে গেছি আমরা তাহলে
শান্ত তরঙ্গের মধ্যে লোকালয় খাল বিল জলে ।

—প্রত্যাবর্তন

লোকালয়, খাল, বিল, জল থেকে আল মাহমুদ কবিতা আহরণ করেন তাই সে কবিতা নিখাদ জীবনের মতোই অন্তরঙ্গ আর খাঁটি । তাঁর কবিতায় জীবনের চিত্রকল্প, তৃতীয় কাব্য 'সোনালী কাবিণ' গ্রন্থ থেকে উদাহরণ,

কতদূর এগোলো মানুষ ।
কিন্তু আমি ঘোর লাগা বর্ষণের সাথে
আজও উবু হয়ে আছি । ক্ষীরের মতন গাঢ় মাটির নরমে
কোমল ধানের চারা রুয়ে দিতে গিয়ে
ভাবলাম, এ-মৃত্তিকা প্রিয়তমা কিষাণী আমার ।
বিলের জমির মতো জলসিক্ত সুখদ লজ্জায়
যে নারী উদাম করে তার সব উর্বর আধার ।

—প্রকৃতি

কবি আল-মাহমুদের কাবিণ দেশজ ও লোকজ ঐতিহ্যের সঙ্গে । পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের মধ্যে তিনি সবচেয়ে মৌলিক ।

চল্লিশ, পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে যারা বাংলাদেশের কাব্যসাহিত্য গড়ে তুলেছেন তাঁদের প্রধান কয়েকজনের প্রথম কয়েকটি কাব্য অবলম্বনে বাংলাদেশের কবিতার যে পরিচয় দেবার চেষ্টা করা হল তাতে রবীন্দ্রপ্রয়াণের প্রথম তিন দশকের মধ্যে বাংলাদেশের কবিতা তথা ঢাকাকেন্দ্রিক বাংলা কবিতা কোন্ পথে অগ্রসর হয়েছে সে সম্বন্ধে হয়তো একটা ধারণা পাওয়া যাবে । আলোচ্য সময়ের অপরাপর উল্লেখযোগ্য কবি, আলাউদ্দিন আল আজাদ, শহীদ কাদরী, সৈয়দ শামসুল হক, ফজল সাহাবুদ্দিন, মোহম্মদ মনিরুজ্জামান, মোহাম্মদ মাহফুজল্লাহী, রফিক আজাদ, আবদুল মান্নান সৈয়দ, নির্মলেন্দু গুণ, মহাদেব সাহা প্রমুখ । বাংলাদেশের ষাটের দশকের কবিতা আলোচনা উপরোক্ত কবিদের কবিতালোচনা ছাড়া অসম্পূর্ণ । মুহম্মদ নুরুল হুদা আশির দশকে বাংলাদেশের কবিতার একটি নির্বাচিত সংকলনের সম্পাদকীয় ভূমিকায় বাংলাদেশের কবিতার নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ চিহ্নিত করেন,

ক. বাংলাদেশের কবিতা বলতে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের ভূকাঠামোতে বসবাসকারী কবিদের দ্বারা রচিত কবিতাই বোঝাব ।

খ. বিষয়গত বিচারে এ কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য : ভাষা আন্দোলনভিত্তিক, দেশজ চেতনানির্ভর, জাতীয়তাবাদী, সাম্প্রদায়িক চেতনামুক্ত ও প্রগতিবাদী ।

গ. প্রাকরণিক বিচারে এ কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য : (১) তিরিশোত্তর বাংলা কবিতার সঙ্গে সম্পৃক্ত, (২) ভাষা ব্যবহারে বাংলাদেশের আঞ্চলিক ও দেশীয় শব্দের প্রাচুর্য, (৩) আবেগবাহিত বক্তব্য প্রমাণে ঋজুরেখ সারল্য ।

মুহম্মদ নুরুল হুদার ঐ সংজ্ঞার সঙ্গে আমরা ঐতিহ্যের প্রশ্নটি যোগ করতে চাই । বাংলাদেশের কবিতার ঐতিহ্য চর্যাপদ থেকে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জীবনানন্দ দাশ পর্যন্ত বিস্তৃত । বাংলাদেশের কবিতার ঐতিহ্য বাংলা কবিতার আবহমান ধারা । বাংলাদেশের কবিতা বাংলা কবিতার এক নতুন ধারা, বাংলাদেশের কবিতা বাংলা কবিতায় নতুন

মাত্রা যোগ করেছে, বাংলা কবিতায় বৈচিত্র্য আনয়ন করেছে ।

দুই

চল্লিশ দশকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের একমাত্র কেন্দ্র ছিল কলকাতা, দেশ বিভাগের পর ঢাকা পাকিস্তানের পূর্ব বাংলা প্রদেশের রাজধানী হলে ঢাকায় বাংলা সাহিত্য চর্চার দ্বিতীয় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয় । এ সময় কলকাতা থেকে যে-সব সাহিত্যিক ঢাকায় আসেন বা এ অঞ্চল থেকেই সাহিত্য চর্চা করতেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন উল্লেখযোগ্য গল্পকার ছিলেন । জন্মতারিখ বা বয়সের ভিত্তিতে তাঁদের তালিকা এভাবে সাজানো যায়, ইবরাহীম খাঁ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আবুল মনসুর আহমেদ, মাহবুব-উল-আলম, মতিনউদ্দিন আহমদ, আবুল ফজল, আবু জাফর শামসুদ্দীন, আশরাফ-উজ-জামান, মতিন-উদ-দীন-আহমদ, বুলবুল চৌধুরী, শওকত ওসমান, আবু রুশদ, মিরজা আবদুল হাই, সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ, সরদার জায়নউদ্দীন, শাহেদ আলী, মুনীর চৌধুরী, শামসুদ্দীন আবুল কালাম, আবু ইসহাক প্রমুখ ।

গল্পকারদের মধ্যে প্রবীণ ইবরাহীম খাঁর অভিজ্ঞতার জগৎ দেশের গ্রামীণ সমাজ ও গ্রামীণ মানুষকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল, তাঁর গল্পেও তারই প্রতিফলন । তিনি গ্রামীণ চরিত্র অঙ্কনে পারদর্শী যেমনটি ঘটেছে তাঁর 'নছর প্যায়াদা', 'ওস্তাদ', 'মানুষ', প্রভৃতি গল্পে । তিনি আধুনিক ভাষায় গল্প লেখেন কিন্তু সংলাপকে সুখপাঠ্য করার জন্যে ভিন্ন ও কৌতুকপ্রদ ভাষা ব্যবহার করেন । বাংলা কথাসাহিত্যে উপেক্ষিত একটি বিশেষ সমাজের বিশেষ শ্রেণীর মানুষ থেকে বেশ-কিছু চরিত্র তিনি তাঁর গল্পে সার্থকভাবে রূপায়িত করেছেন । আবুল মনসুর আহমদের গল্পে চরিত্র ইবরাহীম খাঁর মতো দরদের সঙ্গেই সৃষ্ট হয় যেমন 'আদুভাই' গল্পে আদুভাই চরিত্রটি । কিন্তু তিনি যখন ব্যঙ্গবিদ্রূপাত্মক গল্প লেখেন, যেক্ষেত্রে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী, তখন সে-সব চরিত্র এক-একটি সামাজিক টাইপের প্রতিনিধিত্ব করে । যথা, 'হুযুর কেবলা' গল্পে ভণ্ড পীরের চরিত্রটি, পীরবাদ ইসলাম ধর্মে সমর্থিত নয় কিন্তু বাঙালি মুসলমান সমাজে পীরালি পেশা খুবই জমজমাট । আবুল মনসুর আহমদ তাঁর গল্পে এক ভণ্ড পীর কিভাবে তার মুরীদ বা শিষ্যের স্ত্রীকে বিবাহ করল তা অত্যন্ত সরসভাবে বর্ণনা করেছেন, সঙ্গে সঙ্গে আবুল মনসুর আহমদ বাঙালি মুসলমান সমাজে ধর্মের নামে প্রচলিত কিছু ভণ্ডামির স্বরূপ উন্মোচিত করেছেন । গল্পের মাধ্যমে শুধু সামাজিক ভণ্ডামি নয় সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক প্রতারণার চিত্রও অত্যন্ত কুশলতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন । প্রসঙ্গক্রমে তাঁর 'ফুড কনফারেন্স' গল্পটি স্মরণীয়, তেতাল্লিশের মন্বন্তরের পটভূমিকায় রাজনৈতিক নেতাদের দুর্ভিক্ষ বা খাদ্যসমস্যা সমাধানের প্রয়াসকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-পরিহাস করে রচিত আবুল মনসুর আহমদের 'ফুড কনফারেন্স' একটি অবিস্মরণীয় গল্প । চল্লিশের দশকের বাঙালি মুসলমান গল্পকারদের মধ্যে আবুল মনসুর আহমদ নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ, তাঁর 'আয়না' ও 'ফুড কনফারেন্স' গ্রন্থের গল্পে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-পরিহাসের মাধ্যমে সমকালীন দেশ কাল ও সমাজের এক অকৃত্রিম প্রতিচ্ছবি । শুধু বাঙালি মুসলমান সমাজই নয় বাঙালি হিন্দু সমাজকেও তিনি রেহাই দেন নি —প্রসঙ্গক্রমে তাঁর 'গো দেওতাকি দেশ' গল্পটি স্মরণীয় ।

দেশ বিভাগ, পাকিস্তান রাষ্ট্রের পত্তন, ঢাকায় পূর্ব বাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তান প্রদেশের রাজধানী স্থাপন । কলকাতা থেকে অবিভক্ত বাংলাদেশ সরকারের একাংশের ঢাকায় স্থানান্তরকরণ, ইডেন বিল্ডিংস্-এ সেক্রেটারিয়েট প্রতিষ্ঠা, সরকারি কর্মচারীর ঢাকায় আগমনকে কেন্দ্র করে দেশ বিভাগের পূর্ব পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাবিধ্বস্ত ঢাকা শহর এক নতুন জীবন লাভ করে । ঢাকায় কলকাতা থেকে আগত নতুন সরকারের মন্ত্রী, আমলা ও কেরানিকুল এবং পাইক-বরকন্দাজদের নিয়ে এক নতুন সমাজের পত্তন হয় । বিরাট রমনা হয়ে ওঠে জনবহুল ও কোলাহলমুখর । ঐ সমাজের মধ্যশ্রেণীতে অবস্থিত কেরানিকুলের আশ্রয় লাভ ঘটে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিত্যক্ত

নীলক্ষেত ও পলাশী ব্যারাকে । ঐ কেরানিদের হতাশ জীবন নিয়ে কেউ কেউ গল্প লিখেছেন, যেমন আবু জাফর শামসুদ্দীন 'এক জোড়া প্যান্ট' গল্পটি । ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তানের সেক্রেটারিয়েটের কেরানির প্রমোশন বন্ধ বেশবাসের কারণে, পাঞ্জাবী-পাজামাতে চলবে না. প্যান্ট আর হাওয়াই শার্ট প্রয়োজন ; আর এই ড্রেস করতে গিয়ে কেরানির করুণ কাহিনী আলোচ্য গল্পের উপজীব্য । আবু জাফর শামসুদ্দীন সমাজের নিম্নশ্রেণীর মানুষ নিয়ে গল্প রচনা করেছেন অধিক, এ-সব গল্পে সমাজে সাধারণ মানুষের বঞ্চনার কাহিনী সচেতনভাবে উচ্চারিত, যেমন তাঁর 'ফাঁসী' বা 'তালাক' গল্প ।

শওকত ওসমানের গল্পের বিষয়বৈচিত্র্য ব্যাপক, তাঁর 'জাল্ঘর' গল্পের নায়ক, 'লাশ কাটা ঘর' গল্পের হীরালাল ঘোষ, 'সৌদামিনী মালো' গল্পে প্রধানচরিত্র খ্রীষ্টান পাদ্রী জন, জগদীশ আরদালীর স্ত্রী সৌদামিনী আর স্বদেশী বাবু মনোরঞ্জন মালো, 'নতুন জন্ম' গল্পে গোমতী নদীর মাঝি ফরাজ আলী ও তার পুত্র বিভিন্ন সমাজের বিচিত্র মানুষের প্রতিনিধি । 'ইলেম' শওকত ওসমানের একটি অভিনব গল্প, নবলব্ধ পাকিস্তান রাষ্ট্র সম্পর্কে সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়া এ গল্পে রূপায়িত । 'ইলেম' গল্পে কর্ণফুলী শাম্পানের মাঝি জহির মিয়া, যার শখ ছিল পুত্র সমিরকে লেখাপড়া শেখানোর বা ইলেম দানের । কিন্তু কর্ণফুলী বন্দরে কাস্টমস্ জাহাজ আর রিভার পুলিশের অত্যাচারে জহির মিয়ার মনে প্রশ্ন জাগে 'ব্রিটিশ কুম্পানীর আমলে আঁরা আর কি খারাব ছিলাম ।' ফলে শুধু নবলব্ধ স্বাধীনতাই তার কাছে অর্থহীন প্রতিভাত হয় না, শিক্ষা বা ইলেম সম্পর্কে তাকে এই সিদ্ধান্তে আসতে হয় যে, 'হালার ইলেম। সুট কুট আর গুস। আরে বুট সুট মারানির পুত।... সুট পাছাৎ, গুস মুখে, এই ইলেমে হৈব কি?' বাহান্নোর একুশের পটভূমিকায় রচিত গল্পের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শওকত ওসমানের গল্প 'মৌন নয়' । বাহান্নো সালের একুশে ফেব্রুয়ারি অপরাহ্নে মাতৃভাষা বাংলাভাষার দাবিতে বাঙালি প্রাণ দিয়েছিলেন পাকিস্তানীদের গুলিতে ঢাকা নগরীতে, কিন্তু তার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় প্রথম কবিতা ও গল্প রচিত হয় চট্টগ্রামে, যথাক্রমে মাহবুব-উল-আলম চৌধুরীর 'কাঁদতে আসিনি ফাঁসীর দাবী নিয়ে এসেছি' এবং শওকত ওসমানের 'মৌন নয়' । ভাষার দাবি প্রকাশের জন্যে ঢাকায় যাদের হত্যা করা হল তাদের জন্যে চট্টগ্রাম প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের অনুভূতি কী ? একটি বাস যাচ্ছে চট্টগ্রাম থেকে হাটহাজারীর পথে কাপ্তাই-রাঙামাটির দিকে, বাসের যাত্রী কয়েকজনের আচরণ থেকে ঢাকায় গুলি ও হত্যাকাণ্ডের প্রতিক্রিয়া স্পষ্ট করেছেন শওকত ওসমান ।

'মৌন নয়' গল্পে বাসে যে দশ-বারোজন প্যাসেঞ্জার তাদের সবার দৃষ্টি একজন বৃদ্ধ সহযাত্রীর দিকে, অন্যান্য প্যাসেঞ্জারদের মধ্যে রয়েছেন একজন অফিসার, দুইজন চাষী, একজন তরুণ ছাত্র, একজন কেরানি, সবাই বোবাপ্রায়, কেউ বিড়ি ধরাচ্ছে না, কেউ কাশছে না পর্যন্ত । বাসের মাঝখানে যে বৃদ্ধ উপবিষ্ট বাসের আলোয় তার মুখ স্পষ্ট । সাদা দাড়ি— ঘন চওড়া রেখায়িত মুখ, খাড়া নাক । ঈষৎ কোটর-গত চোখের দু'পাশেও রেখার ভিড় । মাঝে দীর্ঘ নিশ্বাস গ্রহণের সময় বৃদ্ধ এক-একবার চোখ খুলছে তখন কোটরের গভীরতা উবে যায় —দীপ্তির আভাস স্বতঃই প্রকাশ পায়, নামাজ-কালীন তহরীমা বার্বার মতো বুকে দুই হাত বেঁধে আছে । অবনত মুখ । দুই গণ্ডদেশের মাঝামাঝি নাক, আলো-ছায়ার জাল বুনে রেখেছে । তাই এই মুখ মনে হয় আদিম পাহাড় চূড়ায় খোদাই কোনো দরবেশের মূর্তি । গায়ে পিরহান ঝুলে পড়েছে পা-তক, কাঁধে লাল গামছা । পায়ে সাধারণ চটি । বসে আছে সে মৌন । নিশ্বাস নিতে তার ফোকলা গালে আরো খাদ সৃষ্টি হয় । আলোছায়ার আগোছালো বিকিরণ কোনো কঙ্কাল মুখ সৃষ্টি করে । 'মৌন নয়' গল্পের শেষে বাসযাত্রীদের স্তব্ধতা ভঙ্গ হয় এবং তা করেন সেই মৌন বৃদ্ধ । বৃদ্ধের নিশ্বাস আরো দ্রুত, আরো ঘন । যেন ডুবে যাচ্ছে সে । কুঁচকে ঢলে পড়ল, পা একটু সটান প্রসারিত হল তার । হঠাৎ হাঁফ ছাড়তে গিয়ে বৃদ্ধের কণ্ঠনালী আর স্থির থাকে না । শক্ত কফ জমছে যেন গলার দু'পাশে । ফোকলা গাল বার বার ওঠানামা করে । ঠোঁট কেঁপে উঠল । অসহ্য কী যেন বুক ঠেলে ঠেলে উপরে উঠছে । চোখের দৃষ্টি অপলক, বৃদ্ধ একবার ডুকরে আর্তনাদ করে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে চুরমার হয়ে

গেল নীরবতার জগদ্দল । "কি দোষ করেছিল আমার ছেলে ? ওরা কেন তাকে গুলি করে মারল ? কি দোষ —কি দোষ করেছিল সে ? উঃ—' এই জিজ্ঞাসার চিহ্ন ভাসছে তার চোখের উপর । তখনই মুখ থুবড়ে পড়ছে বৃদ্ধ বাসের মেঝেয় । বাহান্নোর একুশের ঘটনায় স্তম্ভিত দেশবাসীর জিজ্ঞাসা 'মৌন নয়' গল্পটিতে রূপক-প্রতীকের মাধ্যমে শওকত ওসমান কুশলতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন ।

সাম্প্রদায়িক হাঙ্গা-দাঙ্গামা, দেশ বিভাগ, বিপুলসংখ্যক মানুষের দেশত্যাগ ও উদ্বাস্তু আগমনের ঘটনায় চল্লিশ দশকের শেষার্ধ ক্ষত-বিক্ষত । দেশ বিভাগের ফলে যে মানবিক ট্র্যাজেডির ঘটনা তা সবচেয়ে ভালো করে ধরা পড়েছে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' এবং হাসান হাফিজুর রহমানের 'আরো দুটি মৃত্যু' গল্পে । 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী'তে ঢাকার একটি পরিত্যক্ত বাড়ির নতুন দখলদারদের কাছে পূর্বোক্ত বাসিন্দাদের স্মৃতিবহ তুলসী গাছ সম্পর্কিত অনুভূতির প্রকাশ, "প্রতি দিনান্তে গৃহকর্ত্রী তুলসী গাছের তলে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালায়, গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করে । আজ যে তুলসীগাছের তলে ঘাস গজিয়ে উঠেছে, সে পরিত্যক্ত তুলসীগাছের তলেও প্রতি সন্ধ্যায় কেউ প্রদীপ দিত । আকাশে যখন সন্ধ্যাতারা বলিষ্ঠ একাকীত্বে উজ্জ্বল হয়ে উঠত, তখন ঘনায়মান ছায়ার মধ্যে আনত সিঁদুরের নীরব রক্তাক্ত স্পর্শে একটি শান্ত-শীতল প্রদীপ জ্বলে উঠত প্রতিদিন । ঘরে দুর্দিনের ঝড় এসেছে, হয়তো কারো জীবন-প্রদীপ নিবে গেছে, আবার হাসি-আনন্দের ফোয়ারাও ছুটেছে সুখ-সময়ে, কিন্তু এ প্রদীপ দেওয়া অনুষ্ঠান একদিনের জন্যও বন্ধ হয়নি ।" কিন্তু এই বাড়ির নতুন বাসিন্দাদেরও একদিন গৃহচ্যুত হতে হয় তখন থেকে তুলসী গাছটি শুকিয়ে যেতে থাকে কারণ সেদিন থেকে কেউ গাছটির গোড়ায় পানি দেয় নি । কাজরা গৃহকর্ত্রীর ছলছল চোখের কথাও মনে পড়ে নি, কেন পড়ে নি সে কথা তুলসী গাছের জানবার কথা নয়, মানুষেরই জানবার কথা । সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর আর-একটি মানবিক গল্প তেতাল্লিশের মন্বন্তরের পটভূমিকায় রচিত 'নয়নচারা' । দুর্ভিক্ষের তাড়নায় যে-সব ছিন্নমূল মানুষ একটু অন্নের আশায় মহানগরীর পথে ঘাটে আশ্রয় নিয়েছিল তারই একটি খণ্ডচিত্র 'নয়নচারা' । "তবে এখানে মানুষের পায়ের আওয়াজ হয় । আর এখানে শহর । মন্থর গতিতে চলা এক জোড়া পায়ের আওয়াজ ঘুরে আসচে গলি দিয়ে, এবং নদীর মত প্রশস্ত এ-রাস্তায় সে যখন একলা তখন আমু বিস্মিত হয়ে দেখলো যে লোকটির মধ্যে শয়তানের চোখ জ্বলছে, আর সে চোখ হীনতায় ক্ষুদ্রতম ও ক্রোধে রক্তবর্ণ ।... শয়তানকে দেখে বিস্ময় লাগে, বিস্ময়ে চোখ ঠিকরে যায়, ঘন অন্ধকারে তাতে আগুন ওঠে জ্বলে । তবে শুধু এই বিস্ময়ই : ভয় করেনা একটুও : বরঞ্চ সে যেন শয়তানের সাথে মুখোমুখি দেখা করবার জন্যে অপেক্ষমাণ ।" কিন্তু শহরে আমুর শুধু শয়তানের সঙ্গেই দেখা হয় না মানুষের সঙ্গেও দেখা হয় । যখন কোনো বন্ধ দরোজার সামনে দণ্ডায়মান তার ক্ষুধার্ত মূর্তি থেকে বীভৎস ও ভয়ংকর আর্তনাদ বেরিয়ে আসে আর দরজার প্রাণ কাঁপে, কোনো মেয়ে দরজা খুলে আস্তে আস্তে বলে, নাও । "কী ? কী সে নেবে ? ভাত নেবে । ভাতই কী সে চায় ? সে ভাতই চায় ? সে ভাতই চায়; এ দুনিয়ায় চাইবার হয়তো অনেক কিছু আছে কিন্তু তাদের নাম সে জানে না । হস্তভঙ্গিতে ময়লা কাপড়ের প্রান্ত মেলে ধরে সে ভাতটুকু নিলে ।" তারপর স্বাভাবিকভাবেই অন্নদাত্রীকে আমুর চেনা চেনা মনে হয়, মনে হয় এ মায়ের বাড়ি নয়নচারা গ্রামে । যে গ্রামে তারও বাড়ি ছিল । সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর আর-একটি অবিস্মরণীয় গল্প 'স্তন', একটি মাতৃহীন শিশু ও একজন নবজাত সন্তানহারা জননীর গল্প, যে মা অপরের শিশুকে নিজের বুকের দুধ দিতে চায় কিন্তু দুধ আসে না । শেষ পর্যন্ত মা কাঁটা দিয়ে তার দুই স্তনের কুশাগ্র ছেদ করলে দুধ বেরিয়ে আসে । তার স্তন থেকে দুধ ঝরে, অশ্রান্তভাবে দুধ ঝরে । তবে সে দুধের বর্ণ সাদা নয়, লাল । সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ চল্লিশ দশকের শ্রেষ্ঠ গল্পকার ।

অভাব ও ক্ষুধার পটভূমিকায় একটি অশ্চর্য গল্প মুনীর চৌধুরীর 'খড়ম' । প্রধান চরিত্র চাল ও কাফনের (কবরস্থ করার জন্যে মৃতদেহ আচ্ছাদনের কাপড়) কাপড় বিক্রেতা । পরহেজগার অর্থাৎ ধর্মকর্মে অত্যন্ত

নিয়মনিষ্ঠ। গল্পের আর একজন প্রধান চরিত্র কালা মাঝি, যার মেয়ে পথ্যের অভাবে মারা যায়, শত চেষ্টায়ও কালা মাঝি তাকে একটু ভাত খাওয়াতে পারে নি। কাফনের কাপড় বাকিতে দেন ফবু ব্যাপারী আর পেটের দায়ে তার শয্যাসঙ্গিনী হয় কালা মাঝির বউ আরফানী দশ টাকার জন্যে। গল্পের উপসংহার নিম্নরূপ,

> কোমর থেকে একটা দশ টাকার নোট বের করে ফবু ব্যপারীর সামনে রাখেন।
> পরিচিত নোটের ভাঁজে সস্নেহে হাত বুলিয়ে ফবু ব্যাপারী প্রশ্ন রাখল—
> কাফনের বাকী দিতে আইলা বুঝি বাবা।
> জ্বি
> আর কি দিউম ? কিছু চাইল ?
> না বাকী ট্যায়া দিয়া কাফনের কাপড় দেন।
> চমকে উঠল ফবু ব্যাপারী।
> কাফনের কাপড় ! কার লাই ?
> আরফানীর লাই।
> চমকে উঠেছিল শুধু এক মুহূর্তের জন্য,— তারপরই ফবু ব্যাপারী পরিচ্ছন্ন হাতে কাপড় কাটতে শুরু করে। সাদা কাপড়, প্রমাণ মাপের স্ত্রী মূর্দাকে আগাগোড়া মুড়ি দেবার জন্য যতখানি দরকার।"

মুনীর চৌধুরী বেশ-কিছু ব্যতিক্রমধর্মী গল্প লিখেছিলেন, তার পরবর্তীকালে তিনি নাটক রচনা ও অনুবাদে অধিকতর মনোযোগী হয়েছিলেন।

শাহেদ আলীর 'জিব্রাইলের ডানা' একটি উজ্জ্বল গল্প। হালিমা ও নবী, অভাবী মা ও ছেলে, কাজ না করলে যাদের খাওয়া জোটে না, সেই নবীর ইচ্ছাকে মহাকাশে ছড়িয়ে শাহেদ আলী 'জিব্রাইলের ডানা' রচনা করেছেন। "ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে নবী স্বপ্ন দেখলো, জিব্রাইল তার ঘুড়ি নিয়ে মেঘের ফাঁকে ফাঁকে আসমানের দিকে ধাওয়া করছে। এক সময় নীল আসমান দু'দিকে সরে গিয়ে পথ করে দিলো জিব্রাইলের জন্যে। মেঘের ফাঁকে ফাঁকে আবার যাত্রা শুরু হলো— আবার একটা আসমান ফাঁক হয়ে গেলো— আবার আরেকটা— ষষ্ঠ আসমান খোলার সঙ্গে সঙ্গে আগুন লেগে গেল জিব্রাইলের ডানায়, — জিব্রাইল এগোচ্ছে নবীর ঘুড়ি নিয়ে। তারপর এক সময় খুলে গেলো সপ্তম আসমানের দরজা আর তার ফাঁক দিয়ে একটা তীব্র আলোকচ্ছটা এসে ঝলসে দিল নবীর চোখ দুটোকে।" নবীর বিশ্বাস জিব্রাইল ফেরেশতা এসে নিয়ে গেছে তার ঘুড়ি— নতুন পাতা খুলবে এবার জীবনের। গল্প শেষ হয়েছে প্রখর বাস্তবতার মধ্যেই, "চোখ কচলাতে কচলাতে উঠে বসে নবী—গলে যাওয়া দেয়ালের ওপর দিয়ে সূর্যের প্রখর আলো তার নাকে মুখে এসে লাগছে।"

চল্লিশ দশকের লেখকদের মধ্যে মাহবুব-উল-আলম, সরদার জায়নউদ্দীন, শামসুদ্দীন আবুল কালাম, আবু ইসহাক প্রমুখ গ্রাম-বাংলার এবং নিম্নবিত্ত মানুষের বঞ্চনার কাহিনী গল্পে রূপায়িত করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে শামসুদ্দীন আবুল কালামের 'পথ জানা নাই' এবং 'ক্ষুধা', আবু ইসহাকের 'জোঁক', সরদার জায়নউদ্দীনের 'মা' গল্পগুলি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। চল্লিশের দশকে গল্প রচিত হয়েছিল প্রধানত গ্রামীণ পটভূমিকাতে, পঞ্চাশের দশক থেকে ঢাকা-শহরকেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত জীবন বাংলাদেশের গল্পসাহিত্যের প্রধান উপজীব্য হয়ে উঠতে থাকে। এ দশকের ছোটোগল্প শাখায় কুশলীদের নাম, আলাউদ্দিন আল আজাদ, হাসান হাফিজুর রহমান, জহির রায়হান, মূর্তজা বসীর, সৈয়দ শামসুল হক, আবদুল গাফফার চৌধুরী, রাবেয়া খাতুন, শওকত আলী প্রমুখ।

আলাউদ্দীন আল আজাদ-এর 'ছাতা' গল্পে কেরানি আমিনুদ্দিনের অভাবের সংসারের পরিচয়, সেখানে নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবন উপস্থাপিত। আবার 'কয়লা কুড়োনো দল' গল্পে সমাজের নিম্নশ্রেণীর মানুষের কথা আর 'শিষ ফোটার গান' গল্পে প্রাচীন কৃষিজীবন পাওয়া যায়। ঐ-সব গল্প থেকে বোঝা যায় যে আলাউদ্দীন আল

আজাদ শহর ও গ্রামের মধ্য ও নিম্ন উভয় শ্রেণী নিয়েই গল্প লিখেছেন । আজাদের 'বৃষ্টি' পঞ্চাশের দশকের শ্রেষ্ঠ গল্পগুলির একটি । পঞ্চাশের দাঙ্গার পটভূমিতে রচিত হাসান হাফিজুর রহমানের 'আরো দুটি মৃত্যু' বৈষয়িক, শৈল্পিক ও মানবিক যে-কোনো দৃষ্টিতেই বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ গল্পগুলির অন্যতম । দেশ বিভাগের সময় জননী জন্মভূমি স্বর্গাদপি গরীয়সী বিবেচনায় যাঁরা দেশত্যাগ করে নি এমন অনেককে পঞ্চাশের দাঙ্গায় দেশত্যাগ করতে হয়েছিল । হাসান হাফিজুর রহমানের 'আরো দুটি মৃত্যু' গল্পে রূপায়িত হয়েছে সাম্প্রদায়িক উম্মত্ততা থেকে ট্রেনযোগে দেশত্যাগী আসন্নপ্রসবা এক মা ও তার গর্ভে সন্তানের মৃত্যুকাহিনী । গল্পটির উপসংহার, "অন্ধকার, যেখানে সম্পূর্ণ একটি নারীদেহ ভেসে উঠেছে । রক্তাক্ত দেহ, মুখ হাঁ হয়ে আছে । পেট অত্যন্ত উঁচু । চোখ উল্টে গেছে বিকৃত হয়ে অসম্ভব বেদনাকে সহ্য করার অস্বাভাবিক চেষ্টায় । একটি মা । একটি মাতৃত্ব-আকাঙ্ক্ষী নারী, জীবনের জন্য শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যুঝেছে । তার ফুলে-ওঠা পেটের ভিতরে আছে একটি শিশু, একটু আগেও জীবিত ছিল সে । জন্মাতে পারলে অনেক কিছুই হয়তো করতে পারত । সুখী আগামী পৃথিবীর বুকে শ্বাস নিতে পারত অন্তত । এ জন্মকে রুখল কে ? তখুনি কি এক যন্ত্রণায় সারা বুকটা কুঁকড়ে উঠল আমার । আর কী দৃশ্য । ধ্বংসের জন্যে ঘৃণ্য । অসহ্য ।" হাসান হাফিজুর রহমানের 'আরো দুটি মৃত্যু' কেবল সাম্প্রদায়িক উম্মত্ততার শিকার এক মাতা ও সন্তানের মৃত্যুকাহিনী নয়, এ গল্প সুস্থ, স্বাভাবিক মানবিকবোধ ও বিবেকের অবক্ষয়ের কাহিনীও বটে ।

সৈয়দ শামসুল হকের 'ঘোরা' গল্পে রংপুর অঞ্চলের জোতদার ও আধিয়ার বা বর্গাদারের আর শওকত আলীর 'কপিলদাস মুর্মুর শেষ কাজ' গল্পে দিনাজপুর অঞ্চলের জোতদার মহাজন আর আধিয়ার কিষাণের সম্পর্ক উপজীব্য । প্রথম গল্পে আধিয়াররা রংপুরের ভূমিহীন মুসলমান চাষী আর দ্বিতীয় গল্পে আধিয়ার দিনাজপুরের খ্রীষ্টান সাঁওতাল । কিন্তু পরিণতিতে বর্গাদার-মহাজনের সঙ্গে সংঘাত ও সংঘর্ষ একই রকমের ।

ষাটের দশকের প্রতিভাবান গল্পলেখকদের নাম হাসান আজিজুল হক, আবদুল মান্নান সৈয়দ, জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, হাসনাত আবদুল হাই, রিজিয়া রহমান, রাহাতখান, আবদুস শাকুর, বশির আলহেলাল, রশীদ হায়দার প্রমুখ । ষাটের দশকে উদীয়মান গল্পলেখকদের মধ্যে সবচেয়ে প্রতিভাবান গল্পকার হাসান আজিজুল হক । তার গল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশের ছোটো গল্প আধুনিক যুগে প্রবেশ করে । পঞ্চাশ দশক পর্যন্ত বাংলাদেশের গল্প ছিল মূলত সরলরৈখিক । চল্লিশ-পঞ্চাশ দশকের গল্প-চরিত্র সৃষ্টি ও ঘটনা বর্ণনাত্মক ছিল, আঙ্গিক সচেতনতা ও ভাষার ক্ষেত্রেও ছিল দুর্বলতা । হাসান আজিজুল হক বাংলাদেশে গল্পের বাঁধুনিকে আঁটসাঁট করেন, ভাষাকে করে তোলেন আধুনিক এবং শাণিত । হাসান আজিজুল হকের গল্পের ভুবন সমকালীন গল্পকারদের থেকে স্বতন্ত্র, তাঁর অভিজ্ঞতার জগৎ এবং দৃষ্টিভঙ্গিও অগতানুগতিক । বাংলাদেশের সাহিত্যে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর পরে হাসান আজিজুল হকই গল্পের জন্যে নিজস্ব ভাষা আঙ্গিক সৃষ্টি করতে সমর্থ হন ।

হাসান আজিজুল হকের "আত্মজা ও একটি করবী গাছ" গল্পটি বিবেচনা করা যাক, গল্পের শুরুতে পরিবেশ বর্ণনা, "এখন নির্দয় শীতকাল, ঠাণ্ডা নামছে, হিম আর চাঁদ ফুটে আছে নারকেল গাছের মাথায় । অল্প বাতাসে একটা বড় কলার পাতা একবার বুক দেখায়, একবার পিঠ দেখায় । ওদিকে বড় গঞ্জের রাস্তার মোড়ে রাহাত খানের বাড়ীর টিনের চাল হিম ঝকঝক করে । এক সময় কানুর মায়ের কুঁড়েঘরের পৈঠায় সামনের পা তুলে দিয়ে শিয়াল ডেকে ওঠে । হঠাৎ তখন স্কুলের খেয়ার রাস্তার দু' পাশের বনবাদাড় আর ভাঙ্গা বাড়ীর ইঁটের স্তূপ থেকে হু-উ-উ চিৎকার ওঠে । ঈশেন কোণ থেকে এখন ধর ধর লে লে শব্দ আসে, অন্ধকার—ভূত অন্ধকার কেঁপে কেঁপে ওঠে, চাঁদের আলো আবার ঝিলিক দেয় টিনের চালে ।" ঐ পরিবেশে গল্পের তিনটি চরিত্র ইনাম, ফেকু আর সুহাস নৈশ পথপরিক্রমায় এক বুড়োর বাড়ি পৌঁছুলো । আগন্তুকদের মধ্যে সুহাসের চাদরে নোট খড়মড় করে তার সঙ্গে নিজের দু'টাকা যোগ করে ফেকু বুড়োকে দেয় । পাশের ঘরে তাদের পাঠিয়ে দেয়

বুড়ো, ইনাম যে টাকা দেয় নি তাকে নিজের পাশে বসিয়ে রাখে । তার পর গল্পের শেষ পর্যন্ত বুড়োই সরব, "বুড়োটা গল্প করছে, ভীষণ শীত করছে ওর গল্প করতে, চাদরটা আগাগোড়া জড়িয়েও লাভ নেই । শীত তবু মানে, শ্লেষ্মা কিছুতেই কথা বলতে দেবেনা তাকে । ... তার এখানে আসার কথা আর কিছুতেই ফুরোচ্ছে না —সারারাত ধরে সে বলছে, এখানে যখন এলাম— আমি প্রথমে একটা করবী গাছ লাগাই— তখন হু হু করে কে কেঁদে উঠল, চুড়ির শব্দ এলো, এলোমেলো শাড়ীর শব্দ আর অনুভবে নিটোল সোনারঙের দেহ— সুহাস হাসছে হি হি হি— আমি একটা করবী গাছ লাগাই বুঝলে— বলে থামলো বুড়ো, কান্না শুনল, হাসি শুনল— ফুলের জন্যে নয়, বুড়ো বলল, বিচির জন্যে, বুঝছে করবী ফুলের বিচির জন্যে । চমৎকার বিষ হয় করবী ফুলের বিচিতে ।..." বুড়োর করবী গাছ আর তার মেয়ে রুকু সমার্থক এ গল্পে । হাসান আজিজুল হক নব্বই-এর দশক পর্যন্ত বাংলাদেশের আধুনিক ছোটোগল্প লেখকদের মধ্যে প্রধান । বাংলাদেশে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ আর পঞ্চাশ থেকে ষাটের দশকে সৃষ্ট ছোটো গল্পের সংখ্যা এক দশক থেকে আর-এক দশক ক্রমশ বেড়েছে কিন্তু গল্প ক্রমে শহরের মধ্যবিত্ত জীবনভিত্তিক হয়ে পড়েছে । ঐ দিক থেকে অদ্যাবধি ব্যতিক্রম হাসান আজিজুল হকের গল্প ।

তিন

চল্লিশ পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে রচিত উপন্যাসের সংখ্যা কম নয় কিন্তু যার অধিকাংশই ন্যারেটিভ । রচয়িতাদের উপন্যাসের আঙ্গিক বা ভাষা সম্পর্কে সচেতনতার অভাব প্রকট আর অনেকগুলো উপন্যাসই বড়ো গল্পের নামান্তর। উপন্যাস আধুনিক কালের সৃষ্টি, সার্থক উপন্যাস সৃষ্টির পূর্ব শর্ত নগর সভ্যতার বিকাশ, গদ্যের উন্নত স্তর, সমাজে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতি এবং আঙ্গিক-চেতনা । ঢাকাকেন্দ্রিক বাংলা সাহিত্যে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উদ্ভবের পূর্বে ঐ-সব লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠতে দেখা যায় নি । চল্লিশের দশকে দেশ বিভাগের আগে ঢাকা ছিল একটি জেলা শহর, মফঃস্বল শহরও বলা চলে । দেশ বিভাগের পর রাতারাতি একটি জেলা শহর একটি নতুন রাষ্ট্রের প্রাদেশিক রাজধানীতে পরিণত হলেও ষাটের দশকের আগে ঢাকার নগরায়ণ শুরু হয় নি এবং শুরু হলেও পূর্ব-পশ্চিম পাকিস্তান অর্থনৈতিক বৈষম্যের জন্যে ষাটের দশকে ঢাকার নগরায়ণের গতি ছিল খুবই শ্লথ আর ঢাকাবাসীরা শহরবাসী হলেও তার একটা বড়ো অংশ ছিল বহিরাগত, মফঃস্বল বা গ্রাম-বাংলা থেকে আগত । পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ঢাকাকেন্দ্রিক যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ তার একাংশ অবিভক্ত বাংলার কলকাতা থেকে আগত হলেও মূলত সে মধ্যশ্রেণীর অব্যবহিতপূর্ব প্রজন্ম পূর্ব বাংলার কৃষকসমাজ তথা গ্রামীণ জীবনের অন্তর্গত । ঢাকা শহর দ্রুত একটি জেলা শহর থেকে প্রাদেশিক রাজধানী, প্রাদেশিক রাজধানী থেকে স্বাধীন রাষ্ট্রের রাজধানীতে উন্নীত হবার ফলে সিকি শতাব্দীর মধ্যে একটি মফঃস্বল শহর একটি মহানগরীতে পরিণত হয় । কিন্তু এই প্রক্রিয়াটি সম্ভবপর এবং সম্পন্ন হয়েছিল ঔপনিবেশিক পাকিস্তানী আমলে নয় বরং স্বাধীন বাংলাদেশ আমলে । ফলে চল্লিশ, পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে ঢাকা শহরে যেমন নগরায়ণের গতি ছিল ধীর মন্থর সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাস-সাহিত্যের বিকাশও ছিল শ্লথ ।

ঐ সীমাবদ্ধতার মধ্যে চল্লিশ ও পঞ্চাশ দশকের উল্লেখযোগ্য উপন্যাসের মধ্যে বিশিষ্ট সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'লাল সালু', শওকত ওসমানের 'জননী', এবং আবু ইসহাকের 'সূর্যদীঘলবাড়ী' । ষাটের দশকে শহীদুল্লাহ কায়সারের 'সারেং বউ' ও 'সংসপ্তক', সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'চাঁদের অমাবস্যা' এবং 'কাঁদো নদী কাঁদো'। চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকের যে তিনটি উপন্যাসকে বাংলাদেশের উপন্যাস-সাহিত্যের প্রথম পর্বের প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয়েছে অর্থাৎ 'লাল সালু', 'সূর্যদীঘল বাড়ী' এবং 'জননী', সে তিনটি উপন্যাসেরই পটভূমিকা গ্রাম-বাংলা কিন্তু এই সাদৃশ্য সত্ত্বেও উপন্যাস তিনটির প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন । সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'লাল সালু' উপন্যাসের উপাখ্যান এবং চরিত্র গ্রামীণ সমাজের হলেও উপন্যাসের ভাষা আধুনিক, পরিশীলিত এবং কখনো কখনো বিমূর্ত। উৎকেন্দ্রিক

উঞ্ছবৃত্তিধারণকারী মানুষের চিত্র, "শস্যহীন এ অঞ্চলের বাসিন্দাদের বেরিয়ে পড়বার ব্যাকুলতা ধোঁয়াটে আকাশকে পর্যন্ত সদা সন্ত্রস্ত করে রাখে। ঘরে কিছু নেই। ভাগাভাগি লুটাপুটি আর স্থানবিশেষে খুনাখুনি করে সর্ব প্রচেষ্টার শেষ। দৃষ্টি বাইরের পানে; মস্ত নদীটির ওপারে, জেলার বাইরের প্রদেশেও; হয়তো বা আরো দূরে। যারা নলি বানিয়ে ভেসে পড়ে তাদের দৃষ্টি দিগন্তে আটকায় না। জ্বালাময়ী আশা; ঘরে হা-শূন্য, মুখ-থোবড়ানো নিরাশা, বলে তাকে মাত্রাতিরিক্ত প্রখরতা। দূরে তাকিয়ে যাদের চোখে আশা জ্বলে তাদের তর সয় না। দিনমান রক্ষণের সবুর ফাঁসির সামিল। তাই তারা ছোটে ছোটে।..." তবু আশা, কত আশা। খোদাতালার ওপর প্রগাঢ় ভরসা। কিন্তু ক্ষুধার্ত চোখ বৈরীভাবাপন্ন ব্যক্তি-সুখ-উদাসীন দুনিয়ার পানে চেয়ে আরো ক্ষয়ে আসে। খোদার এলেমে বুক ভরে না, তলায় পেট শূন্য বলে। মসজিদের বাঁধানো পুকুরপাড়ে চৌকোণ পাথরের খণ্ডটার উপর বসে শীতল মাটিতে অজু বানায়, টুপিটা খুলে তার গহ্বরে ফু দিয়ে ঠাণ্ডা করে, আবার পরে। কিন্তু শান্তি পায় না। মন থেকে খাবি খায়, দিগন্তে ঝলকানো রোদের পানে চেয়ে চোখ পুড়ে যায়। এরা তাই দেশত্যাগ করে।"

'লাল সালু'তে একদিকে বাঙালি মুসলমান সমাজের একটি বিশেষ দিক উন্মোচিত। কোনো ধার্মিক ব্যক্তিত্বের প্রয়াণের পর তাঁর কবর হয়ে ওঠে ধর্মপ্রাণ মুসলমানের শ্রদ্ধার বস্তু, কবর পাকা করে বা বাঁধিয়ে দেওয়া হয়, কবরের ওপর লাল সালু কাপড়ের চাঁদোয়া টাঙিয়ে দেওয়া হয়, তখন কবর হয়ে ওঠে মাজার, ধর্মপ্রাণ মুসলমান সেই মাজার জেয়ারত বা দর্শন করতে যান। এক-একটি মাজার শরীফকে কেন্দ্র করে কিছু মানুষের আস্তানা গড়ে ওঠে, প্রয়াত ব্যক্তির কোনো আত্মীয় বা শিষ্য উত্তরাধিকারসূত্রে বংশানুক্রমে সেই মাজার শরীফের সেবায়েত বা খাদেম হয়ে থাকেন। তাদের জীবিকা নির্বাহের উৎস বা কেন্দ্র থাকে ঐ মাজার। যেমন 'লাল সালু' উপন্যাসে মহব্বতনগর গ্রামে এক লাল সালুর চাঁদোয়ার নীচে অবস্থিত মাজারকে কেন্দ্র করেই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র মজিদের অবস্থান ও সম্প্রসারণ। গ্রামের আর একটি চরিত্র খালেক ব্যাপারীর প্রতিপত্তির কারণ জমিজমার মালিকানা, এই দুটি চরিত্র উপন্যাসে এক সূত্রে বাঁধা হয়েও ভিন্ন, "রাত্রির নীরবতার মধ্যে হঠাৎ মজিদ শক্তিবোধ করে অন্তরে। মহব্বতনগর গ্রামে সে শক্তির শেকড় গেড়েছে। আর সে শক্তি শাখা-প্রশাখা মেলে সারা গ্রামকে আচ্ছন্ন করে লোকদের জীবনকে জড়িয়ে ধরেছে সবলভাবে। প্রতিপত্তিশালী খালেক বেপারী আছে বটে, কিন্তু তার শক্তিতে, মজিদের শক্তিতে প্রভেদ আছে।... জীবনস্রোতে মজিদ আর খালেক ব্যাপারী কি করে এমন খাপ খাপ মিলে গেছে যে অজান্তে, অনিচ্ছায়ও দুজনের পক্ষে উল্টোপথে যাওয়া সম্ভবপর নয়। একজনের আছে মাজার, আরেকজনের জমিজোতের— প্রতিপত্তি। সজ্ঞানে তা না জানালেও তারা একাত্ম, পথ তাদের এক।" কিন্তু একাত্মা হলেও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর প্রত্যেকটি চরিত্র ব্যতিক্রমধর্মী, 'লাল সালু'র মজিদ, 'চাঁদের অমাবস্যা'র আরেফ আলী আর 'কাঁদো নদী কাঁদো'র মুহাম্মদ মুস্তাফা প্রত্যেকে স্বতন্ত্র, অগতানুগতিক চরিত্র, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ-সৃষ্ট একটি বিশিষ্ট চরিত্র।

'লাল সালু'র মজিদের মহব্বতনগরে ঠিকানার কেন্দ্র যে মাজার, তাঁর মধ্যে যে মিথ্যা রয়েছে তা ফাঁস হয়ে গেলেই তার সব শেষ, তাই কী করে কবর হল মাজার সে রহস্য মজিদ কাউকে না এমন-কি, তার দুই স্ত্রীর একজনকে পর্যন্ত প্রকাশ করে নি। মহব্বতনগরে তার যে প্রভাব প্রতিপত্তি সবই মিথ্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত, ধর্মের নামে ভণ্ডামির চিত্র 'লাল সালু'। ইসলামে পীর পূজা বা কবর পূজার কোনো স্থান নেই কারণ তা মূর্তিপূজার সামিল, ইসলাম একেশ্বরবাদী ধর্ম সেখানে কোনো মানুষ বা সমাধি পূজা নিষিদ্ধ অথচ বাংলার ধর্মভীরু মুসলমানদের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে ধর্মব্যবসায়ীরা সে কর্মটিই করে থাকেন। 'লাল সালু' উপন্যাসে সেই ভণ্ডামির চিত্র উন্মোচিত। মজিদের আসক্তি ধর্মে নয়, লাল সালু দেখিয়ে অর্থ ও প্রতিপত্তি অর্জন, তার আসক্তি নারীতে। মহব্বতনগরে তার দোর্দণ্ড প্রতাপ, মানুষের মাথায় সে টুপি পরায়, পিতা-পুত্রকে একসঙ্গে মুসলমানী বা খৎনা করায়, স্কুলের বদলে মসজিদ ওঠায়, যে বৃদ্ধ তাকে অবজ্ঞা করেছিল তাকে বাধ্য করে আত্মহত্যায়, যে নারী অন্য পীরের কাছে

পানিপড়ার জন্যে পাঠায় তার তালাকের ব্যবস্থা করে। এগুলো হল তার ধর্মকর্ম। ব্যক্তিগত জীবনে সে স্বাস্থ্যবতী বিধবা রহিমাকে বিয়ে করে কিন্তু রহিমাতেই সে তুষ্ট নয়, আবার বিবাহ করে বাচ্চা মেয়ে জমিলাকে। প্রলুব্ধ হয় কাজের মেয়ে হাসুনির মা বা গ্রামের সবচেয়ে ধনী খালেক বেপারীর সুন্দরী স্ত্রী আমোনা বিবির সুন্দর পা দেখে। কিন্তু জমিলাই তার কাল হয়, জমিলাকে প্রথম বিবি রহিমার মতো আয়ত্তে আনতে না পেরে তাকেই প্রশ্ন করে "বিবি, কারে বিয়া করলাম। তুমি কি বরদোয়া দিছিলা নি ?" "কও বিবি কি করলাম ? আমার বুদ্ধিতে যানি কুলায় না। তোমারে জিগাই, তুমি কও।" উত্তরে মেলে রহিমার ঝামটা, জমিলার থুথু। শিলাবৃষ্টি দেখে উদ্‌বিগ্ন স্বামীকে রহিমা শুধু বলে, "ধান দিয়া কী হইব, মানুষের জান যদি না থাকে ?" মজিদের প্রকৃত পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হয় যখন গ্রামে আর-একজন পীরের আক্রমণ ঘটে, ক্রোধে সে উচ্চারণ করে "ঠগের পিছনে বেহুদা টাকা ঢালন কি বিবেক বিবেচনার কাম ?" "হেই পীরের বাচ্চা পীর শয়তানের খবর কি ?" আসলে ধর্মভীরু অজ্ঞ মানুষকে শোষণকারী সব পীরেরই ঐ এক পরিচয়।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'চাঁদের অমাবস্যা' কোনো এক গ্রামের তরুণ শিক্ষক আরেফ আলীর স্বপ্নভঙ্গের কাহিনী। "যুবক শিক্ষক জ্যান্ত মুরগী-মুখে হালকা তামাটে রঙের শেয়াল দেখেছে, বুনো বেড়ালের রক্তাক্ত মুখ দেখেছে, মানুষের দুঃখকষ্ট মহামারী হাহাকার দেখেছে, কিন্তু কখনো বিজন রাতে বাঁশঝাড়ের মধ্যে যুবতী নারীর মৃতদেহ দেখে নাই। হত্যাকাণ্ড দেখে নাই।" ঐ দেখাই তার কাল হয়, সত্যের কাছ থেকে সে পালাতে চায়, সত্য তাকে তাড়া করে তা হল, "যেন তাড়া করেছে কোনো পশু। পশুই বটে, কাদের 'দরবেশ' পশুরও অধম। সত্যি কিছু দেখেছে কি না, নাকি সবটাই কল্পনা, কেবলি দুঃস্বপ্ন তাই নিয়ে সন্দেহ দেখা দেয় তার মনে। নিজেকে হত্যাকারী বলে মনে হয় তার, সে না উপস্থিত হলে যুবতী নারীর গলা টেপারই দরকার হতো না— তবে সে সত্য থেকে কেবলি পালিয়ে বেড়ায়।... সে ভয় পায় দায়িত্ব নিতেও, সত্যের দায়িত্ব নেওয়া, কাদেরই যে হত্যাকারী এটা জেনে ফেলার দায়িত্ব বহন করা কঠিন হবে জানতো সে।" কাদের খান যখন স্বীকার করে যে সেই খুনী, তখন "শীর্ণ দেহে যুবক শিক্ষক আগুনের লেলিহান শিখায় যেন দীর্ঘকায় হয়ে ওঠে, তার রক্তহীন শুষ্ক মুখ যেন অত্যুজ্জ্বল রূপ ধারণ করে।" কাদেরের দাদার কাছে সত্য প্রকাশ করে সে যখন থানার দিকে ছোটে তখন "তার মনে হয় সে যেন জঙ্গল থেকে বেরিয়ে উন্মুক্ত স্থানে এসে দাঁড়িয়েছে, কোথাও আশ্রয় নেবার স্থান নাই বলেই মনে বিচিত্র শান্তিও। বস্তুত মন যেন শান্ত নদীর মতই একটা গন্তব্যস্থলের দিকে ভেসে যাচ্ছে। সে গন্তব্যস্থল দেখতে পায়না, সেখানে তার প্রশ্নের উত্তর আছে কি-না তা-ও সে জানেনা। তবে নদীর ধারা যেমন থামানো যায় না বা তার দিক পরিবর্তন করা যায় না, তেমনি তার পক্ষে থামা বা দিক পরিবর্তন করা সম্ভব না।"

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর তৃতীয় উপন্যাস 'কাঁদো নদী কাঁদো'তে মুহাম্মদ মুস্তাফা, চাঁদের অমাবস্যার আরেফ আলীর চেয়েও ভয়াবহ ভীতির আবর্তে নিক্ষিপ্ত, এখানে সে আতঙ্কিত মনস্তাপজনিত কারণে। তার বাগদত্তা খোদেজা তারই একটি চিঠি পেয়ে এবং অন্যত্র মুস্তাফার বিবাহ স্থির হবার সংবাদ পেয়ে শ্যাওলা আবৃত এক ক্ষুদ্র ডোবায় ডুবে আত্মহত্যা করে। মুস্তাফা প্রথমে খোদেজার মৃত্যুর কারণে তার বিবাহ কিছুদিন স্থগিত রাখে কিন্তু নিপীড়নের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত সেও গলায় দড়ি দেয়। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর উপন্যাসের আঙ্গিক দ্বিতীয় ও তৃতীয় উপন্যাসে জটিল থেকে জটিলতর। 'লাল সালু'তে উপাখ্যান জীবননির্ভর, 'চাঁদের অমাবস্যা'তে তিনি জীবনের আশ্রয় থেকে চেতনা প্রবাহের আশ্রয়ে সরে গেছেন আর 'কাঁদো নদী কাঁদো'তে পরাবাস্তববাদের রহস্যালোকে। সমালোচক আলী আনোয়ারের ভাষায়, "ব্যক্তিই প্রধান ওয়ালিউল্লাহর উপন্যাসে। ব্যক্তির চৈতন্যের আলোছায়া তার মনোযোগের কেন্দ্রভূমি দখল করে থাকে। আপাতভাবে শক্তিমান হয়েও নিয়তিপ্রধান সমাজের প্রহারে তারা বিপন্ন, ব্যক্তিক একাকীত্বে নির্বাসিত। অন্য দুটি উপন্যাসে 'চাঁদের অমাবস্যা' ও 'কাঁদো নদী কাঁদো'তে এটি আরো জোরদার হয়েছে। তাঁর নায়কের প্রদোষলিপ্ত চৈতন্যে কেবলই বিভ্রমের সৃষ্টি হয়, তারা কার্যকারণ

সূত্রাবলী যথাযথ গ্রথিত করতে পারেনা। ফলত তার বিচ্ছিন্ন অনন্বিত ব্যক্তিরা কেবলই পরাভূত হয়। এই একাকীত্ব কতটা সমাজ নির্মিত আর কতটাই বা আত্যন্তিক মানবভাগ্য সে সম্পর্কে মেট্রোপলিটান দর্শন ও সংস্কৃতি স্পৃষ্ট ওয়ালিউল্লাহ নিজেও স্পষ্ট নন।"[১]

শওকত ওসমানের 'জননী' উপন্যাসের রচনাকাল সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র 'লাল সালু' উপন্যাসের পূর্বে (১৯৪৩ সাল) কিন্তু প্রকাশকাল 'লাল সালু'র (১৯৪৮) অনেক পরে। তাই যদিও বাংলাদেশের উপন্যাস-সাহিত্য নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করা উচিত ছিল 'জননী' দিয়ে কিন্তু যেহেতু বর্তমান আলোচনা গ্রন্থের প্রকাশকালভিত্তিক সে কারণে ব্যতিক্রম করা হয় নি। শওকত ওসমানের 'জননী' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র দরিয়া বিবি, গ্রামীণ, দারিদ্র্যপীড়িত, একাধিক সন্তান আছে, বর্তমানে দ্বিতীয় স্বামীর সংসার করছে কিন্তু তবুও বিগতযৌবনা নন। যখন যে স্বামীর ঘর করেছে বিশ্বস্ততার সঙ্গেই তা করেছে। কিন্তু শহর থেকে যখন দূর সম্পর্কের দেবর ইয়াকুব এল তখন দরিয়া বিবি তার সাহায্য নিয়েছেন কিন্তু তার স্বামী আজহার ইয়াকুবের কোনো দান স্পর্শ করে নি। এই দরিয়া বিবির সংসার সংগ্রামের কাহিনী নিয়েই গড়ে উঠেছে শওকত ওসমানের 'জননী' দেশবিভাগপূর্বকালে রচিত একটি বড়ো উপন্যাস। সাতচল্লিশে দেশ বিভাগের পূর্বে পূর্ব বাংলায় জন্ম দু'জন মুসলমান সাহিত্যিক দুটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস লিখেছিলেন, কাজী আবদুল ওদুদ' 'নদীবক্ষে' এবং হুমায়ুন কবীর 'নদী ও নারী'। উপন্যাস দুটির মধ্যে 'নদী ও নারী'তে নদীমাতৃক পূর্ব বাংলার মুসলমান কৃষক সমাজের প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রামের কাহিনী যেমন সার্থকতা ও কুশলতার সঙ্গে অঙ্কন করা হয়েছে পরবর্তীকালে কোনো উপন্যাসে আর তা মেলে নি। কিন্তু কাজী আবদুল ওদুদ ও হুমায়ুন কবীর জন্মসূত্রে পূর্ব বাংলার সন্তান হলেও নাগরিকত্ব স্বত্বে পশ্চিম বাংলার ছিলেন বলে তাঁদের সাহিত্যকর্ম বাংলাদেশের সাহিত্যের অন্তর্গত ধরা হয় না। অন্যথা আমাদের আলোচনার সূত্রপাত করতে হত ঐ উপন্যাস দুটি নিয়েই।

দুর্ভিক্ষপীড়িত বাংলাদেশের গ্রামজীবনের অভাবী মানুষের জীবনসংগ্রামের কাহিনী দেশ বিভাগের অব্যবহিত পরবর্তীকালের একটি উপন্যাসে এসেছে, আবু ইসহাক -রচিত 'সূর্যদীঘল বাড়ী'। পেটের দায়ে গ্রাম ছেড়ে শহরে উদ্বাস্তুর শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতার শিকার হয়ে গ্রামে প্রত্যাবর্তন। এই পরিচিত ছক অবলম্বন করেও তার মাধ্যমে তিনি গ্রাম বাংলার অভাবী মানুষের জীবনের বাস্তবতাকে অভিনবভাবে তুলে ধরতে পেরেছেন, এখানেই তার সার্থকতা। 'সূর্যদীঘল বাড়ী'র প্রারম্ভ থেকে কিছুটা উদ্ধৃতি দিলে কিছুটা ধারণা পাওয়া যাবে, "আবার তারা ফিরে আসে। পেছনে রেখে আসে স্বামী, স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, মা-বাবা, ভাই-বোন। ভাতের লড়াইয়ে তারা হেরে গেল।" "অনেক আশা, অনেক ভরসা নিয়ে তারা গ্রাম ছেড়ে শহরের বুকে পা বাড়িয়েছিল। সেখানে মজুতদারের গুদামে চালের প্রাচুর্য, হোটেলে খাবারের সমারোহ দেখে জিভ তাদের শুকিয়ে আসে।" 'সূর্যদীঘল বাড়ী' ভাতের লড়াইয়ে হেরে যাওয়া অনাহারী মানুষের কাহিনী, যারা শহরে গিয়েছিল গ্রাম ছেড়ে ভাতের জন্যে কিন্তু মেলে নি তাই আবার প্রত্যাবর্তন গ্রামে বাঁচবার আশায়। "যারা ফিরে আসে তারা বুকভরা আশা নিয়ে ফিরে আসে বাঁচবার জন্য। অতীতের কান্না চেপে, চোখে জল মুছে তারা আসে। ছায়া সুনিবিড় একখানি বাড়ি, একখানি খড়ো ঘর তাকে হাতছানি দিয়ে ডেকেছে কতদিন, কিন্তু বৃথাই ডেকেছে।" আবু ইসহাকের গ্রাম-বাংলার মানুষ, শওকত ওসমান এবং সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর গ্রামের মানুষের চেয়ে অনেক বেশি বাস্তব যেমন 'সূর্যদীঘল বাড়ী'র প্রধান চরিত্র জয়গুণ। 'সূর্যদীঘল বাড়ী'ও শওকত ওসমানের 'জননী'র মতো নায়িকাপ্রধান। জয়গুণকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে 'সূর্যদীঘল বাড়ী' উপন্যাসের কাহিনী।

বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যে একটি বিশেষ উপেক্ষিত দিক নিয়ে উপন্যাস রচনার প্রয়াস শহীদুল্লাহ্ কায়সারের 'সারেং বৌ'। 'সারেং বৌ' উপন্যাসের বিষয়বস্তুর মধ্যে অভিনবত্ব রয়েছে, বাংলাদেশের উপকূলবর্তী অঞ্চলের বিশেষত নোয়াখালি ও চট্টগ্রামের মানুষ দুঃসাহসী নাবিকরূপে খ্যাত। ইংরেজ আমলে বিভিন্ন জাহাজ কোম্পানিতে

যে-সব নাবিক নেওয়া হত তার সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল দক্ষিণবঙ্গের মানুষ । এই-সব নাবিক ঘর সংসার স্ত্রী-সন্তান ছেড়ে দীর্ঘদিন সমুদ্রে কাটাতো তারপর কিছুদিনের জন্যে ঘরে ফিরত । সারেং অর্থাৎ স্টিমার পরিচালক, তেমনি এক সারেং-এর স্ত্রী নবীতুনকে নিয়ে গড়ে উঠেছে শহীদুল্লাহ্ কায়সারের উপন্যাস 'সারেং বৌ' । 'সারেং বৌ'তে ঔপন্যাসিক লিখেছেন, "বিচিত্র এদের জীবিকা । ওদের আছে জমি । সে জমিতে ধান হয় । ওরা চাষ করে। ওদের আছে গোয়াল । সে গোয়ালে আছে হালের বলদ দুধের গাই । তবু ওরা সমুদ্রের মানুষ । মনের তরঙ্গে চড়ে চলে যায় দূর দেশে ।" 'জননী'র নায়িকা দরিয়া বিবি, 'সূর্যদীঘল বাড়ী'র জয়গুণ আর 'সারেং বৌ'-এর নবীতুন, তিনটিই সংগ্রামী নারীর চরিত্র । যে নারীর স্বামী তিন বছরের জন্যে ঘরছাড়া সাগরবাসী সেই স্বামীর জন্যে অপেক্ষমাণ নবীতুনের চিত্র, "সারেং বৌ নবীতুন, ঢেঁকির উপর ও যেন সুসংগত এক তালের ছন্দ, নাচের ঝংকার । খলখলিয়ে হাসে ও । খলখলিয়ে নাচে ওর যৌবনপুষ্ট শরীরখানি । এর মাঝেও রসিকতা করে শরবত্তি । সাধে কি চোখ লেগেছে লুন্দর শেখের । নবীতুন বুয়া, তোর গায়ে যে জোয়ানকির ঢল । আমারই চেয়ে থাকতে ইচ্ছে করে । শুনে যেন ফূর্তি আরো বেড়ে যায় নবীতুনের । মাথাটা ঝাঁকিয়ে কোমরখানি দুলিয়ে ঢেউটির মতো ঢলকে পড়ে ঢেঁকির উপর । যুগির বানানো মোটা শাড়ীখানাও ধরে রাখতে পারেনা ওর ছলকে ঝলকে উছলে পড়া জোয়ানকি । বাঁধন মানেনা নিতম্ব দোলা । শাসন মানে না পোড়া বুকের উদ্দাম নাচন, কলকল জোয়ার। আর সেই নাচের ছন্দে দ্রুত বোল তুলে যায় ঢেঁকিতে— ঢেককুরঢুক, ঢেককুরঢুক ।" নবীতুন লুন্দর শেখের প্রলোভনে ধরা দেয় নি, অভাবের তাড়নাতেও না., প্রতীক্ষা করেছে স্বামীর জন্যে ।

শহীদুল্লাহ কায়সারের 'সংশপ্তক'-এর প্রথমার্ধ গ্রাম-বাংলাভিত্তিক, বাকুলিয়া-তালতলী-উপাখ্যান, অপরার্ধ কলকাতার চল্লিশ দশকের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের রোমন্থন । তবে 'সংশপ্তক' উপন্যাসের কুশীলবগণ বাকুলিয়া-তালতলী বা কলকাতা যেখানেই থাকুক-না কেন তারা রাজনীতি সম্পৃক্ত । 'সংশপ্তক' আসলে একটি রাজনৈতিক উপন্যাস, কখনো গ্রামের রাজনীতি কখনো শহরের । শহীদুল্লাহ কায়সার এ উপন্যাসে দেশ বিভাগের আগে ওপারের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বাঙালি মুসলমান সমাজের রাজনীতি তুলে ধরতে চেয়েছেন । উপন্যাসটি শেষ হয়েছে সংগ্রামী জনতার অবশ্যম্ভাবী বিজয়ের প্রত্যাশায় । সমালোচকদের মতে শহীদুল্লাহ্ কায়সারের 'সংশপ্তক', 'সারেং বৌ' আপেক্ষা অধিকতর শিল্পসম্মত । সমালোচক আলী আনোয়ার শহীদুল্লাহ্ কায়সারের উপন্যাস দুটির মূল্যায়ন করেছেন এভাবে, "শহীদুল্লাহ কায়সার অন্যদিকে মনে হয় গ্রামীণ সমাজের বর্ণনা করতে গিয়ে গ্রামীণ সমাজের উপযুক্ত একটি সরল ভাষার অনুসন্ধান করেছিলেন । তাঁর ভাষা আশ্চর্য সফল । অথচ যে গ্রামীণ সমাজের তিনি বর্ণনা করেন তা' কুটিল, নিষ্ঠুর ও আসক্তির সংঘাতে দীর্ণ ।... শহীদুল্লাহ্ কায়সারের ভাষা এবং যে ভয়ানক জগৎ তিনি বর্ণনা করেন তার সঙ্গে একটি বৈপরীত্য রচিত হয় । ফলে তা সমাজ সত্যকে যথাযথ প্রকাশ করেনা, একটা রোমান্টিকতার আড়াল সৃষ্ট হয় । এ সারল্য কি তার চিন্তাহীনতাদুষ্ট ? গ্রামীণ জীবন সম্পর্কে সেন্টিমেন্টাল আপ্তবাক্যের অনুবর্তন ? এর বাক্যবন্ধের দিকে একটু মনোনিবেশ করলেই এক অন্তরালবর্তী যে সামাজিক সিদ্ধান্তগুলি বেরিয়ে আসে তা কাহিনীর ভিত্তিভূমিই নষ্ট করে দেয় ।... অর্থাৎ শহীদুল্লাহ কায়সার শিল্পের অবলম্বনটি, অভিজ্ঞতা ও কর্মের সাযুজ্যটি তৈরী করতে ব্যর্থ হন ।"[২]

বাংলাদেশের তিন দশকের উপন্যাস-সাহিত্যের আলোচনা স্বল্প পরিসরে কঠিন । এ আলোচনায় নিম্নোক্ত উপন্যাসগুলিও অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত । পঞ্চাশ দশকের, রশীদ করীম 'উত্তম পুরুষ', শামসুদ্দীন আবুল কালাম 'কাশবনের কন্যা', রাজিয়া খান 'অনুকল্প, সৈয়দ শামসুল হক 'এক মহিলার ছবি' । ষাটের দশকের, শওকত ওসমান 'ক্রীতদাসের হাসি', 'সমাগম', 'রাজা উপাখ্যান', আলাউদ্দিন আল আজাদ 'কর্ণফুলি', 'ক্ষুধা ও আশা', সত্যেন সেন 'অভিশপ্ত নগরী', 'পাপের সন্তান' । জহির রায়হানের 'আরেক ফাল্গুন', 'আরো কয়েকটি মৃত্যু', 'হাজার বছর ধরে'। কিন্তু স্থান সংকুলানের জন্য তা করা গেল না ।

চার

দেশ বিভাগের পর ঢাকাকেন্দ্রিক বাংলা সাহিত্যের নাট্যশাখায় যাঁরা অবদান রাখেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন প্রবীণ নাটকার ছিলেন শাহাদাৎ হোসেন, ইব্রাহীম খান, আকবরউদ্দীন এবং আবুল ফজল। ঐ নাট্যকারেরা ইসলামী ঐতিহ্য, মুসলমানদের গ্রামীণ সামাজিক জীবন নিয়ে নাটক লিখেছেন। এ-সব নাটক বিষয়বস্তু বা আঙ্গিক অপেক্ষা নাটকের ইতিহাসের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তবে চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে নূরুল মোমেন, শওকত ওসমান, মুনীর চৌধুরী, আশমার ইবান শাইখ এবং সৈয়দ ওয়াললীউল্লাহ্ -রচিত নাটক নিয়ে প্রকৃত প্রস্তাবে বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যের বিকাশ শুরু হয়।

নূরুল মোমেনের নাটক দিয়েই বাংলাদেশের নাটকের আলোচনা শুরু করা উচিত। তাঁর 'নেমেসিস' (১৯৪৮) একটি শিল্পোত্তীর্ণ ট্রাজেডি। তেতাল্লিশের মন্বন্তরের পটভূমিকায় রচিত নাটকটিতে একটিমাত্র চরিত্র। দীর্ঘ স্বগতোক্তি ও টেলিফোন সংলাপের সাহায্যে নায়কের আদর্শবাদিতা বিসর্জন, প্রলোভনের কাছে বশ্যতা স্বীকার, অধঃপতন, বিবেকের দংশন এবং পরিণতিতে আত্মহননের মাধ্যমে নিয়তির কাছে আত্মসমর্পণ নাটকটিকে সংবেদনশীল করেছে। নূরুল মোমেন মূলত কমেডি-রচয়িতা হলেও তাঁর 'রূপান্তর', 'যদি এমন হতো', 'নয়া খান্দান', 'আলোছায়া' প্রভৃতি নাটকের তুলনায় 'নেমেসিস' অনেক উজ্জ্বল।

শওকত ওসমান মূলত কথাসাহিত্যিক হলেও চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে তাঁর বেশ-কয়েকটি নাটক ও প্রহসন প্রকাশিত হয়, যেমন 'আমলার মামলা', 'তস্কর ও লস্কর', 'কাঁকরমণি' প্রভৃতি। সমাজের অসংগতি তুলে ধরাই তাঁর ঐ-সব কমেডি বা প্রহসনের লক্ষ্য।

বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যে চল্লিশ, পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের প্রধান পুরুষ মুনীর চৌধুরী। তিনি ছিলেন মূলত একাঙ্ক-রচয়িতা, যেমন 'নওজোয়ান কবিতা মজলিস', 'রাজার জন্মদিনে', 'বেশরিয়তি', 'মানুষ', 'পলাশী ব্যারাক', 'আপনি কে ?', 'নষ্ট ছেলে', 'মিলিটারী', 'কবর', 'দণ্ড', 'দণ্ডধর', 'একতলা দোতলা', 'দণ্ডকারণ্য', 'কুপোকাৎ', 'মর্মান্তিক', 'বংশধর', 'একটি মশা', 'নেতা', 'গুণ্ডা', 'গতকাল ঈদ ছিল' প্রভৃতি। মুনীর চৌধুরীর পূর্ণাঙ্গ মৌলিক নাটক মাত্র দুইটি : 'রক্তাক্ত প্রান্তর' এবং 'চিঠি'। এ ছাড়াও তাঁর বেশ-কয়েকটি অনুবাদ নাটক রয়েছে। মুনীর চৌধুরীর 'শ্রেষ্ঠ' নাটক বাহান্নোর ভাষা-আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত 'কবর'। আঙ্গিক, বিষয়বস্তু, সংলাপ, চরিত্র-চিত্রণ এবং সমকালীন একটি রাজনৈতিক ঘটনাকে নাটকে রূপান্তরিত করে মুনীর চৌধুরী 'কবর' নাটকে তাঁর নাট্যপ্রতিভার মৌলিকতা এবং দৃষ্টিভঙ্গির স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়েছেন। সমালোচকদের মতে বাংলাদেশের নাটকের যাত্রা শুরু প্রকৃতপ্রস্তাবে মুনীর চৌধুরীর 'কবর' থেকে।

বাংলাদেশের সাহিত্যে বহুল নাটক রচনার জন্যে খ্যাত আশকার ইবান শাইখের জনপ্রিয় নাটকগুলি হল 'বিদ্রোহী পদ্মা', 'অগ্নিগিরি', 'বিরোধ', 'রক্তপথ', 'লালন ফকির', 'প্রচ্ছদপট' এবং 'অনেক তারার হাতছানি'। আশকার ইবান শাইখের নাটকের সঙ্গে সঙ্গে আনিস চৌধুরীর 'মানচিত্র' ও 'এ্যালবাম', ওবায়দুল হকের, 'এই পার্কে', 'দিগ্বিজয়ী', 'চোরাকারবারী' নাটকগুলির কথা উল্লেখ করতে হয়। তবে বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যে ষাটের দশকের নয়শো পর্যন্ত প্রকাশিত ব্যতিক্রমধর্মী নাটক হল সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'বহিপীর' (১৯৬০), 'তরঙ্গভঙ্গ' (১৯৬৪), 'সুড়ঙ্গ' (১৯৬৪), 'উজানে মৃত্যু' (১৩৭০) ফররুখ আহমদের কাব্যনাটক "নৌকেল ও হাতেম"। সাইদ আহমদের 'কালবেলা' এবং সিকানদার আবু জাফরের 'শকুন্ত উপাখ্যান' ও 'মাকড়শা'। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'তরঙ্গভঙ্গ' নাটকে অভিব্যক্তিকারের ছায়া পড়েছে এবং তা পাশ্চাত্য অ্যাবসার্ড নাটকের কাছাকাছি বলে নাট্য সমালোচক কবীর চৌধুরী মন্তব্য করেছেন।[৩]

বাংলাদেশে সংঘবদ্ধ নাট্য আন্দোলন বা গ্রুপ থিয়েটারের শুরু স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুত্থানের পর সত্তর

দশক থেকে। ১৯৪৭-৭০ বাংলাদেশে নাটক অভিনয় ছিল শৌখিন ও বাৎসরিক ব্যাপার। বাংলাদেশে কোনো পেশাদার থিয়েটার বা মঞ্চ নেই। বাংলাদেশে নিয়মিত নাট্যাভিনয় এবং দর্শনীর বিনিময়ে নাটক দেখার রেওয়াজ শুরু সত্তর দশক থেকে যদিও এখন পর্যন্ত ঢাকা বা কোথাও নিয়মিত অভিনয়ের জন্য কোনো মঞ্চ গড়ে ওঠে নি। ঐ-সব সীমাবদ্ধতা এবং বাস্তব অসুবিধা সত্ত্বেও যে বাংলাদেশে চল্লিশ-পঞ্চাশ এবং ষাটের দশকে নুরুল মোমেন, মুনীর চৌধুরী ও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র মতো নাট্যকার জন্মগ্রহণ করেছেন এবং 'নেমেসিস', 'কবর' ও 'তরঙ্গভঙ্গের' মতো অগতানুগতিক নাটক সৃষ্টি হয়েছে এটাই বিস্ময়কর।

উল্লেখসূত্র

১. আলী আনওয়ার, 'বাংলাদেশের উপন্যাস : থীম ও ফর্ম', সমকালীন বাংলা সাহিত্য, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, জুন ১৯৮৯।
২. আলী আনওয়ার, পূর্বোক্ত।
৩. কবীর চৌধুরী, 'বাংলাদেশের সাহিত্য : নাটক, বাংলাদেশের সাহিত্য', বাংলা একাডেমী ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮।

বাংলাদেশের সাহিত্য
২

সনজীদা খাতুন

রবীন্দ্রপ্রয়াণ-পরবর্তী কালে বাংলাদেশের সাহিত্যের চারিত্র্য আলোচনার জন্যে আমাকে যে-কালক্রম বেঁধে দেওয়া হয়েছে, ১৯৬৭ থেকে ১৯৯২, তার সূচনাবিন্দুটি ঐতিহাসিক গুরুত্ববহ। ১৯৬৭ সালেই তদানীন্তন কেন্দ্রীয় তথ্যমন্ত্রী খাজা সাহাবুদ্দীন ঘোষণা করেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথের রচনা এদেশের সংস্কৃতির অঙ্গ নয়। কাজেই তখন বেতার টেলিভিশন ইত্যাদি মাধ্যমে রবীন্দ্ররচনার সম্প্রচার নিষিদ্ধ হয়েছিল। খাজা সাহাবুদ্দীন ছিলেন ঢাকার নবাব বাড়ির আধা-বাঙালি স্বভাবের মানুষ। কিন্তু তাঁর সমর্থনে চল্লিশজন বাঙালি সেদিন কাগজে বিবৃতি দিয়েছিলেন। ঐ ঘটনা তাৎপর্যবহ, কারণ, উল্লিখিত একচল্লিশজনের বাইরের আর সকল বাঙালি তখন বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিলেন, সাংস্কৃতিক স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ে হয়েছিলেন অঙ্গীকারবদ্ধ।

উপরে বর্ণিত ঘটনা বলে দেয় যে, এদেশে রবীন্দ্রবিরোধী এবং রবীন্দ্র-অনুরাগী দুটি ধারাই বহমান ছিল। প্রথমটি ক্ষীণ হলেও রাষ্ট্রীয় আনুকূল্যপুষ্ট। এই ধারায় প্রধান ছিল ওপার থেকে চলে আসা মানুষ, যারা দেশবিভাগের প্রাক্‌কালীন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার তিক্ত অভিজ্ঞতা ভুলতে পারে নি। এপারের বাঙালির রবীন্দ্রপ্রীতিকে তারা ভালো মনে নিতে পারে নি। রবীন্দ্রনাথকে সাম্প্রদায়িক প্রতিপক্ষ হিসেবে ধরে বর্জন করবার পক্ষপাতী ছিল এরা। আর এই সম্প্রদায়-চেতনাকে উসকে দিয়েই সেকালের পশ্চিমা-ঘেঁষা বাঙালিদের সহায়তায় ঐ পশ্চিমা প্রভুরা প্রথমে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক আগ্রাসনের সুযোগ নিয়ে পূর্ব বাংলায় জাঁকিয়ে বসেছিলেন, পরে ক্রমে সাংস্কৃতিক প্রভুত্ব বিস্তার করে বাংলা ও বাঙালিকে সম্পূর্ণ দমন করবার যুক্তি এঁটেছিলেন।

বাহান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারিতে উর্দু একাধিপত্যকে অস্বীকার ও প্রতিরোধ করবার পর দ্বিতীয় তরঙ্গ এসেছিল ষাটের দশকে জাতির পুনর্গঠনের ছুতো নিয়ে ব্যুরো অব ন্যাশনাল রি-কনস্ট্রাকশন সংস্থাপনের ধাক্কায়। শুধু রবীন্দ্রনাথ কেন, বাঙালি তার ঐতিহ্যের কোনো সুতোই যেন ধরে রাখতে না পারে— এই ছিল তাদের লক্ষ্য। এ চেষ্টা কেবল পশ্চিমাদের নয়, সাম্প্রদায়িক এবং ধর্মান্ধ বাঙালিদের কাছ থেকে তারা এ ব্যাপারে সর্বাত্মক সহায়তা পেয়েছিল। শাসক আর তাদের সমর্থকরা কিছুকাল বাঙালির জন্যে একটি দম-বন্ধ করা পরিবেশ ঘনিয়ে তুলেছিল। কিন্তু একষট্টি সালের রবীন্দ্রশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের আয়োজনের ভিতর দিয়ে সংঘবদ্ধ হয়ে বাঁধ ভাঙবার জোর ফিরে পেয়েছিল বাঙালি। তাই সাতষট্টি সাল নাগাদ বাঙালি বিক্ষোভ এবং বিদ্রোহের আবেগে ঐক্যবদ্ধ হতে পেরেছে সহজেই।

দেশবিভাগের পর পূর্ববাংলার শিক্ষিত শ্রেণীর অধিকাংশ ওপারে চলে গিয়েছিল। শিক্ষা এবং শিক্ষকের দারিদ্র্যের সেই প্রবল সংকট সাতষট্টি সালে খানিক ঘুচেছে। গ্রাম গ্রাম থেকে আসা সাধারণ মানুষ শিক্ষার সুযোগ পেয়ে দেশের প্রচলিত সংস্কৃতির সন্নিহিত হতে শুরু করেছে। কিন্তু একটা ফারাক থেকেই গেছে। বিভাগপূর্ব কালে সংস্কৃতি যে মান স্পর্শ করেছিল, নতুন শিক্ষিত শ্রেণীর পক্ষে সেই মান অর্জন করা সম্ভব ছিল না।

অবস্থাটি এইভাবে বর্ণনা করা যায়, রাষ্ট্রের সংস্কৃতি-শকটের দুটি অশ্ব একই তালে রথটিকে চালিয়ে নিতে পারছিল না। এই অসামঞ্জস্য সেদিনকার বাস্তব সত্য। এমত অবস্থায়, নাগরিক সংস্কৃতির উপরে হিন্দু প্রাধান্যের অজুহাতে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির বিষ ছড়িয়ে শাসকশ্রেণীর তল্পীবাহকরা বাঙালি মুসলমানের ঐতিহ্য সম্পর্কে ভিন্ন তত্ত্ব খাড়া করতে শুরু করল।

যাই হোক, পাকিস্তানী শাসকদের সাংস্কৃতিক বিজয়ের চেষ্টা শেষপর্যন্ত বাঙালি প্রতিরোধ করতে পেরেছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি যেমন বাঙালিকে উদ্‌বুদ্ধ করেছিল— সাংস্কৃতিক পটভূমিও তেমনই ঐকান্তিক প্রেরণার কাজ করেছিল। সাতষট্টিসাল-পরবর্তী বাংলা সাহিত্যধারা প্রসঙ্গে এই প্রেক্ষাপটের কথা মনে রাখা দরকার।

দুই

ষাটের দশকে সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠার আগ্রহে রবীন্দ্রদ্রোহ এবং প্রচলিত মূল্যবোধ-বিরোধিতার প্রয়াসও প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিল। এই প্রসঙ্গে তরুণদের মুখপত্রে প্রকাশিত 'পণ্ডিতের গালে চাঁটি স্থাপন করুন' প্রবন্ধের কথা উল্লেখ করতে হয়। প্রচুর তৎসম শব্দের মিশাল দেওয়া জোরালো এবং চমকপ্রদ ভাষায় প্রতিষ্ঠিত পণ্ডিত, তাঁদের মতবাদ এবং সকল পুরাতন শুভবোধকে নস্যাৎ করাবার ঘোষণা দিচ্ছিলেন সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠালুব্ধ এই তরুণরা। এদের প্রধান বিচরণ ছিল কবিতাক্ষেত্রে, প্রেরণাস্থল ছিলেন ওপারের 'তিরিশোত্তর' ছাপপড়া কবিগোষ্ঠী এবং সাগরপারের আধুনিক কবিকুল। উগ্র নাগরিকতা এবং কলাকৈবল্যবাদের চর্চায় ছিল এঁদের আগ্রহ। চীৎকৃত আত্মঘোষণার ভিতর দিয়েও তাঁদের হয়ে-ওঠার প্রক্রিয়া চলমান ছিল বলে পরে অবশ্য এঁদের ভিতর থেকে বেশ-কয়েকজন কবি হিসেবে নিজেদের স্বকীয়তার পরিচয় দিতে পেরেছেন।

উল্লিখিত কবিরা নাগরিকতা এবং বিশ্বমুখিতায় তাঁদের অগ্রজ শামসুর রাহমানকেও মাত্রায় ছাড়িয়ে যাচ্ছিলেন। সাতষট্টি-সত্তর কালেও শামসুর রাহমান কবিতা রচনায় সম্পৃক্ত এবং তাঁর সাধনায় দেশ-কালচেতনার সাযুজ্য মুখ্য হয়ে কাব্যরসিকদের মর্মস্পর্শ করতে পেরেছে। তুলনায়, তাঁর উত্তরসূরী নাগরিক কবিদের সৃষ্টি সেভাবে স্বতঃগ্রাহ্য হতে পারে নি। প্রথমদিকে, এঁদের ভঙ্গিপ্রাধান্যই সম্ভবত অধিকাংশ পাঠককে ফিরিয়ে দিয়েছে। পক্ষান্তরে, শামসুর রাহমান জাতীয় দুর্যোগদিনে বিবেকের ভূমিকা স্বীকার করে তাঁর আধুনিক বিশ্বোন্মুখ নাগরিক চেতনা নিয়েই সর্বাত্মক প্রেমে বাঙালির অন্তরকে ছুঁয়েছেন। মানবতা, ভালোবাসা, সৌন্দর্যপ্রীতির স্বাভাবিক প্রবণতাকে স্বীকার করেই প্রকরণে প্রকাশে আধুনিক শামসুর রাহমান অধিক-সংখ্যক পাঠকের প্রীতি অর্জন করেছেন। শাসকদের অকথ্য অত্যাচারের প্রতিবাদে জাতির কঠিন সংগ্রাম, দেশের মানুষের দুঃসহ দুর্দিন তাঁর মনে যে-সংবেদন সৃষ্টি করেছে তার প্রকাশে বাস্তবিক পক্ষে তিনি জাতির অন্তর্গূঢ় বাণীকেই রূপ দিয়েছেন। জাতির এই প্রতিনিধিত্ব নয় শুধু, শামসুর রাহমান সহমর্মিতাগুণে তাঁর জাতিকে কবিতার বিচিত্র-গভীর জগতের রহস্যালোকেও হাত ধরে নিয়ে যেতে পেরেছেন।

বাংলাদেশের কবিতাজগতে শামসুর রাহমানের পাশে অপর যে-কবির নাম উজ্জ্বল হয়ে জেগে আছে, তিনি আল মাহমুদ। নাগরিক জীবনচেতনাকে ইনি স্থাপন করেছেন পল্লীঘনিষ্ঠ অভিজ্ঞতার পটভূমিতে। তাঁর কাব্যিক অনুভব গ্রামীণ জল-মাটির সৌরভসম্পন্ন এবং গ্রামবাংলার চিত্ররূপে ঋদ্ধ। চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে এদেশের শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন বা পটুয়া কামরুল হাসান যেমন তাঁদের পরিশীলিত শিল্পবোধের সঙ্গে লোকজ ঐতিহ্যের গন্ধমাখা চিত্ররচনায় সার্থক এবং জননন্দিত হয়েছিলেন, আল মাহমুদও সেই ধরনের প্রিয়ত্ব লাভ করেছেন। তাঁর অপর বৈশিষ্ট্য, কবিতায় আপন ধর্মীয় ঐতিহ্যের স্বাঙ্গীকরণ। সব মিলিয়ে আল মাহমুদের কাব্যধারা কাব্যরসিকদের

ভিন্নরসের আস্বাদ দিয়েছে ।

প্রচলিত মূল্যবোধে অবিশ্বাস নিয়ে বাস্তব বুদ্ধিনির্ভর স্বাতন্ত্র্যের ধ্বজা বয়ে কবিতার অঙ্গনে পদক্ষেপ করেছিলেন শহীদ কাদরী । চাঁছাছোলা গদ্যে নব্য আধুনিক প্রজন্মের সুতীক্ষ্ণ বেদনাবোধ নির্মেদ কবিতার রূপ পেয়েছিল তাঁর হাতে । স্বল্পপ্রজ এই কবির কাব্যক্ষেত্রে আবির্ভাব এবং তিরোভাবের সংকীর্ণ সময়ের ভিতরেও তাঁর কবিতায় পরিবর্তনের ছাপ পড়েছে । প্রথম কালের ধারালো অবিশ্বাসে কবি শেষকালে ভিন্ন জীবনাভিজ্ঞতাসূত্রে অন্যতর উপলব্ধিতে উপনীত হয়েছিলেন । দেশভাবনার সংক্রমণ এই বিবর্তনের মূল । তাঁর এই উত্তরণ মনে করিয়ে দেয় যে, দুই কালের মধ্যবর্তী পর্যায়ে, এদেশে ঘটে গেছে রাষ্ট্রবিপ্লব । ধ্বস্ত মূল্যবোধ নিয়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণশীল সদাজাগ্রত নাগরিক, সেই ক্রান্তির দিনগুলিতে জীবনের ক্লেদবিষয়ক বিতৃষ্ণাবোধ ছেড়ে স্বদেশ-স্বকালের অভিবাদনযোগ্য প্রিয়তমার প্রতি সংবেদনশীল হয়েছেন ।

'ভয় নেই, আমি এমন ব্যবস্থা করবো
বন বাদাড় ডিঙিয়ে
কাঁটা তার, ব্যারিকেড পার হয়ে, অনেক রণাঙ্গনের স্মৃতি নিয়ে
আর্মার্ডকারগুলো এসে দাঁড়াবে
ভায়োলিন বোঝাই করে
কেবল তোমার দোরগোড়ায় প্রিয়তমা ।'

'স্বাক্ষর' 'বক্তব্য' 'কণ্ঠস্বর' পত্রিকা পর্বের নষ্টমূল্যবোধের কবি রফিক আজাদকেও তাঁর দেশ টেনে এনেছিল নিভৃত আত্মকেন্দ্রিক শিল্পচর্চার মণ্ডল থেকে রাষ্ট্রীয় পরিমণ্ডল-চেতনায় । সূচনায় এঁরা দ্রোহ করেছিলেন চলমান কাব্যধারা এবং চিন্তাচেতনার বিরুদ্ধে । আগেই বলেছি, সে-দ্রোহ আর-সকল থেকে ফিরিয়ে আপনাদের প্রতি সর্বজনের দৃষ্টি-আকর্ষণের তাগিদে । কিছুকাল পার হলে, এক ধরনের নিশ্চিত অতীত স্বপ্নসংশ্লিষ্ট কল্পনার মহালে বিহার করতে করতে আকস্মিক প্রবল আঘাতে বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ান রফিক আজাদ । যে রাষ্ট্রবিপ্লব শহীদ কাদরীকে চকিত করে দেশের সমকালীন পরিস্থিতির সঙ্গে জড়িত করেছিল, সে-বিপ্লবে রফিক আজাদ বিচলিত হন নি ; হলেন, যখন স্বাধীন বাংলাদেশে কিছুদিনের মধ্যেই মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাপ্রদীপ্ত অন্তরে হতাশার ছায়া পড়ল । সাধারণ মানুষ এবং মধ্যবিত্ত সাধারণের বঞ্চনা অবিকার রেখে এ-স্বাধীনতা যখন ভারতবিভাগোত্তর পূর্বতন স্বাধীনতার পথেই গড়িয়ে চলল, তখনই ঘটল স্বপ্নভঙ্গ । এই জাগরণ কবির সৃষ্টির সার্থকতার পরিচয় হিসেবে না হোক, নির্বিকল্প আত্মপরায়ণতা থেকে মুক্তির নিদর্শন হিসেবেই উল্লেখ্য । উদাহরণ সংকলন বক্তব্যের সমর্থনে সহায়ক হবে ।

'যদি না মেটাতে পারো আমার সামান্য এই দাবি
তোমার সমস্ত রাজ্যে দক্ষযজ্ঞ কাণ্ড ঘটে যাবে ।
...
সর্বপরিবেশগ্রাসী হলে সামান্য ভাতের ক্ষুধা
ভয়াবহ পরিণতি নিয়ে আসে নিমন্ত্রণ করে ।

উড্ডীন পতাকাসহ খাদ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রীর গাড়ি—
আমার ক্ষুধার কাছে কিছুই ফেলনা নয় আজ ।
ভাত দে হারামজাদা, তা না হলে মানচিত্র খাবো ।'

আরো পরে, স্বাধীনতার রূপকার বঙ্গবন্ধুর নিধনে স্বাধীনতা-বিরোধী চক্রান্ত ঘোরতর আকার ধারণ করল । বাংলাদেশের স্বাধীনতা-উত্তরকালের অবাঞ্ছিত ঘটনা-পরম্পরা নিয়ে প্রবল বিক্ষোভ রূপ পেয়েছিল কয়েকজন কবির রচনায় । এঁদের ভিতরে নির্মলেন্দু গুণ, মহাদেব সাহা এবং মোহাম্মদ রফিকের উল্লেখ অনিবার্য । যদিও পরের দিকে ক্রোধের প্রতাপ 'গুণ'কে কখনো কখনো নিতান্ত রাজনৈতিক কথকের সারিতে ঠেলে দিয়েছে । দেশ-কাল-পরিস্থিতি-সচেতন হলেও প্রধানত বিশ্বনাগরিকতার আদর্শে উন্মুখ মোহাম্মদ রফিক অস্তিত্বের সংকট নিয়ে দুঃখবোধের নিমগ্ন আস্বাদনে আগ্রহী কবিদের অন্যতম ।

রাজনৈতিক চেতনার বিরুদ্ধবাদী বিশুদ্ধ কলারসিকতার প্রবক্তা আব্দুল মান্নান সৈয়দ বাংলাদেশের অপর শক্তিধর কবি । যুরোপীয় কবিতাশিল্পের আবহ বাংলা কবিতায় সংবহনের সাধনার সঙ্গে সম্প্রদায়-নিষ্ঠ শব্দচয়নে লক্ষ্য এঁর । তৎসম শব্দাকীর্ণ দেহবাদিতা দিয়ে শুরু করে পরবর্তীকালে প্রতিবাদী গোষ্ঠীপতি হিসেবে ইনি বাংলা কবিতায় পৌরুষদৃপ্ত শিল্পরূপের উপাসক । সমকালীন অপর এক কবি রুবি রহমান মান্নান সৈয়দের অপর এক বৈশিষ্ট্য নির্দেশক তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি করেছেন— 'আব্দুল মান্নান সৈয়দ নির্মাণ করেন চাঁদে-পাওয়া অভিভূত পরাবাস্তববাদ"[১]

আধুনিক কবিসুলভ যন্ত্রণাবিদ্ধ চেতনার ধারক অকালপ্রয়াত কবি আবুল হাসানের রচনায় শুদ্ধ কবিপ্রেরণার পরিচয় ছিল । এ প্রবন্ধের সীমারক্ষার জন্যে সকল কবির উল্লেখ আলোচনার পথ পরিহার করতে হবে, তবু, দেশের প্রতি সংবেদনশীল এবং দেশজ ঐতিহ্যনিষ্ঠ দুজন কবির নাম উল্লেখ করা জরুরি । এঁদের একজন মুহাম্মদ নূরুল হুদা, অপরজন রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লা ।

কবিদের মধ্যে অনেক নামের মধ্যে বাদ পড়েছে সৈয়দ শামসুল হকের নাম । মণীশ ঘটকের বিখ্যাত প্রেমের কবিতার মতো আঞ্চলিক ভাষায় লেখা এঁর একটি কবিতা সংকলন সুনাম অর্জন করেছে । তবে, এঁর কাব্যনাট্য দেশবাসী-কর্তৃক অধিকতর আদৃত হয়েছে । একাত্তরের স্বাধীনতাযুদ্ধ অবলম্বনে সংরচিত 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' বিষয় এবং আঙ্গিক উভয় দিক থেকে স্বাতন্ত্র্যদীপ্ত রচনা বলে গণ্য হয়েছে । সমিল ছন্দে লেখা নাট্যটি ছোটো ছোটো ধারালো সংলাপের বিন্যাসে প্রাণময় গতিসম্পন্ন । বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে সৈয়দ শামসুল হক মেধার পরিচয় দিয়েছেন । তাঁর লেখনী শ্রমশীল । এই শ্রম আধুনিক বিশ্বের পথে বাংলাদেশের পদক্ষেপের নিদর্শন । দেশীয় ইতিহাস থেকে বিষয় নিয়ে তিনি আরো কাব্যনাট্য লিখেছেন । আঞ্চলিক ভাষায় লেখা তাঁর নাট্যগুলি বাস্তবকে অঙ্গীকার করেও কাব্যআঙ্গিকে স্বচ্ছন্দ । প্রেমভিত্তিক কাব্যনাট্য 'ঈর্ষা'তে তাঁর দীর্ঘসংলাপ ব্যবহারের নিরীক্ষা উচ্চপ্রশংসিত হয়েছে । তিনটি চরিত্রের মুখে সাতটি সংলাপে এ-নাটকের পূর্ণরূপ গঠিত ।

তিন

মুক্তিযুদ্ধের সময়ে ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে অনেকে কলকাতার নাট্যাভিনয় দেখে নাট্যচর্চায় প্রাণিত হয়ে ফিরেছিলেন । এঁদের উদ্যমে স্বাধীনতাপূর্বকালীন নাট্যোৎসাহ নতুন গতি অর্জন করেছিল । কয়েকটি নাট্যগোষ্ঠী নিয়মিত নাট্যানুষ্ঠানের উদ্যোগ নেয় তারপর থেকে । রামেন্দু মজুমদার -সম্পাদিত 'থিয়েটার' পত্রিকার ভূমিকাও উৎসাহী নাট্যচর্চার প্রসঙ্গে স্মরণীয় । নাটক বিষয়ে আলোচনা, নাট্যচর্চার সংবাদ এবং নাটক মুদ্রণ করে এঁরা নাট্য আন্দোলনে গতি সঞ্চার করেছেন । মঞ্চাভিনয়ের প্রয়োজনে নতুন নাটক রচনার পাশাপাশি

বিদেশী নাটকের অনুবাদ এবং দেশীয়করণ শুরু হল। প্রথমে ব্রেখ্‌ট পরে শেক্‌সপীয়র তারও পরে মলিয়েরের নাট্যানুবাদের দিকে বাংলাদেশের লেখকরা বেশি হাত বাড়িয়েছেন।

সেলিম আলদীন 'শকুন্তলা'কে নবনাট্যরূপ দিয়েছেন। তাঁর 'কিত্তনখোল', 'গ্রন্থিকগণ কহে' ইত্যাদিকে বাংলাদেশের নতুন ধরনের নাটক বলা যায়। 'মুনতাসীর ফ্যানটাসী' এবং 'জণ্ডিস এবং বিবিধ বেলুন' এঁর দুটি হাস্যরসাত্মক রচনা। গ্রামবাংলার সাংস্কৃতির জীবনযাত্রা থেকে উপাদান সংগ্রহ করে সেলিম আলদীন তাঁর নাটকে নতুন মাত্রা যোজনা করতে পেরেছেন। 'কেরামত মঙ্গল' নামে রচিত নাটকে সেলিম মহাকাব্যিক বিস্তার আনতে সক্ষম হয়েছেন। এঁর 'হাত হদাই' আঞ্চলিক ভাষায় রচিত নাটক।

মমতাজউদ্দীন আহমদ, আবদুল্লাহ আল মামুন, মামুনুর রশীদ, হুমায়ুন আহমেদ প্রমুখ লেখক বাংলাদেশের নাট্যক্ষেত্রে খুব সক্রিয় রয়েছেন। আধুনিক জীবনের নানাবিধ সমস্যার মধ্যে পূর্ববর্তী জীবনধারার সঙ্গে অধুনাতন চিন্তাচেতনার অসামঞ্জস্যের প্রসঙ্গ নাট্যকারদের আকর্ষণীয় বিষয় হয়েছে। দেশীয় আঙ্গিকের প্রতি মনোযোগ এবং লোকনাট্যধারার প্রতি পক্ষপাত লক্ষ করা যাচ্ছে। মঞ্চসজ্জার ব্যাপারে বিদেশী আধুনিক প্রযুক্তিই প্রধানত অনুসৃত হলেও দেশজ প্রচলনের বিষয়ে কৌতূহল বৃদ্ধি পাচ্ছে। এইভাবে ক্রমে বাংলাদেশের একটি স্বকীয় ধারা তৈরি হয়ে উঠবে বলে আশা করা যায়।

চার

বাংলাদেশের ছোটোগল্পে আঙ্গিকের পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রবণতা কথাসাহিত্যের এই শাখাকে বেশ সমৃদ্ধ করেছে। জ্যোতিপ্রকাশ দত্তের গল্পে এর চমৎকার নিদর্শন আছে। তাঁর 'দুঃখ' গল্পের রস কাহিনীনিরপেক্ষ। দুঃখ বিষয়ে অনির্দেশ্য অথচ গভীর সত্যমূলক এক বোধ এ-গল্পের আশ্রয়, যে-বোধকে আমরা লালন করি গোপন সম্পদের মতো। কাহিনীর আশ্রয় পরিহার করা এই গল্পধারা য়ুরোপীয় আদর্শপুষ্ট হলেও এ দেশের সাহিত্যে নিঃসন্দেহে এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে।

আবদুল মান্নান সৈয়দের গল্পেও আঙ্গিকের বৈশিষ্ট্য, ভাষাব্যবহার এবং বিষয়বস্তু নির্বাচনের স্বকীয়তায় স্বাতন্ত্র্য উদ্‌ভাসিত হয়েছিল। জৈব অনুভূতির প্রবলতায় মাতৃত্বের বোধও যে তুচ্ছ হয়ে যেতে পারে— এই সত্যের উদ্‌ঘাটন হয়েছে আবদুল মান্নান সৈয়দের 'সত্যের মতো বদমাশ' গল্পে।

ছোটো গল্পের সাধনায় নিষ্ঠার সঙ্গে যুক্ত আছেন হাসান আজিজুল হক। পূর্বোক্ত দুই গল্পকার যেখানে একান্তই নাগরিক, হাসান সেখানে নাগরিক মন নিয়ে পল্লীর মানুষের জীবনকেই তাঁর অধিকাংশ গল্পের বিষয় করেছেন। আঞ্চলিক ভাষার দক্ষ ব্যবহারে তাঁর সাধারণ মানুষগুলির চরিত্রাঙ্কন সজীব হয়েছে। সমাজ, রাজনীতি, মানবচরিত্রের গতি-প্রকৃতি ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ এবং উন্মোচনের নির্বিকার স্টাইল অভ্রান্ত লক্ষ্যভেদী। ক্ষমতাধর গল্পকার হিসেবে হাসানের প্রতিষ্ঠা অবিসংবাদী।

'কপিল দাস মুর্মুর শেষ তীর' রচয়িতা শওকত আলী বাংলাদেশের অপর শক্তিমান গল্পলেখক। সাধারণ জীবনঘনিষ্ঠ রচনায় তাঁর দক্ষতা রসজ্ঞ সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। পরিশ্রমী এবং সচেতন ভাষাশিল্পী সৈয়দ শামসুল হকের গল্প গ্রন্থনার কৌশল মানবচরিত্র ও দেশ-কাল-সমাজ-বাস্তব বিষয়ে তাঁর মননশীল ভাবনা প্রতিফলিত করে। যেমন নাগরিক জীবনচিত্র, তেমনি পল্লীপরিবেশের মানবচরিত্র এবং সমাজপরিবেশ অঙ্কনে তাঁর সমান পারদর্শিতা লক্ষ করা যায়। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের নাম উল্লেখ না করলে বাংলাদেশের অত্যন্ত বলিষ্ঠ লেখনীধারী একজন গল্পকারের কথা বাদ পড়ে যায়। 'অন্য ঘরে অন্য স্বর' আর 'খোঁয়ারী' তাঁর দুটি উন্নত মানের গল্পসংকলন।

পাঁচ

উপন্যাস-সাহিত্যের ক্ষেত্রে ১৯৬৭ থেকে এ পর্যন্ত নানান প্রবণতা দেখা দিয়েছে । ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত বাংলাদেশে অতি-অল্প আলোচিত লেখক সত্যেন সেনের 'অভিশপ্ত নগরী'র প্রসঙ্গ দিয়ে শুরু করা যাক । সুপ্রাচীন ইতিহাস থেকে ইহুদি জাতির অভিশাপ-কথা অবলম্বন করে উল্লিখিত উপন্যাস প্রকাশের পরের বছর একই বিষয় নিয়ে লেখা 'পাপের সন্তান' প্রকাশ করেন সত্যেন সেন । দুটি উপন্যাসেই ধর্মের গোঁড়ামি, ক্ষমতার লড়াই এবং সেকালের জেরুজালেমের রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতির পটভূমিতে চিত্রিত মানবচরিত্রগুলির ওঠাপড়ার বিবরণ এবং তার অন্তরালশক্তির ভূমিকা দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক । পুরাকাহিনী বর্ণনার যোগ্য বিশেষ ভাষা ব্যবহারেও ঔপন্যাসিকের কৃতিত্ব সুস্পষ্ট । সত্যেন সেন নিকট অতীতের ইতিহাস অবলম্বনেও কয়েকখানি উপন্যাস লিখেছেন । পরে এই ধারার উপন্যাস রচনায় একাধিক লেখক মনোযোগী হয়েছেন । পকেটমার চরিত্র অবলম্বনে রচিত সত্যেন সেনের 'সেয়ানা' উপন্যাসে সমাজের নিষিদ্ধ জগতের কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে সাম্প্রদায়িক সমস্যা নিয়ে লেখকের কিছু গুরুত্বপূর্ণ সত্যোপলব্ধি লিপিবদ্ধ হয়েছে ।

১৯৬৮ সালে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ-র 'কাঁদো নদী কাঁদো' প্রকাশিত হয়েছিল । মানসচৈতন্য-প্রবাহে একই সঙ্গে একাধিক স্রোত-ধারার শিল্পসফল বিবরণের জন্য ওয়ালীউল্লাহ-র এই উপন্যাস স্মরণীয় । বাস্তবের অন্তরে গভীরতর বাস্তবতা স্রোতের এই জটিল সংবাদ বাংলাদেশের উপন্যাসে সেই প্রথম প্রকাশিত হয়েছে । পরে মাহমুদুল হকের এবং সেলিনা হোসেনের উপন্যাসেও এই অন্তর্গূঢ় বাস্তবতার অতিপ্রকাশ ঘটেছে । মাহমুদুল হকের শক্তি তাঁর ভাষার উপরে অসামান্য দখল, বাস্তবসমীক্ষণ-ক্ষমতা, মানবচরিত্রের পূর্বাপর সংগতিহীন আকস্মিক আচরণের নিপুণ বিবরণ ইত্যাদির উপরে প্রতিষ্ঠিত । আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'চিলেকোঠার সেপাই' উপন্যাসে প্রকৃতিস্থতা-অপ্রকৃতিস্থতার সীমারেখায় অবস্থিত একটি চরিত্রের চিন্তা এবং আচরণেও বাস্তবতার দুই রূপ আঁকা হয়েছে । অস্বাভাবিক চরিত্রের আশ্রয়ে আঁকা হলেও বাস্তবকে ঐভাবে উপস্থাপন করার ভিতরে আন্তরসত্তার প্রচ্ছন্ন গতি বিষয়ে অভিনিবিষ্ট চিন্তার পরিচয় স্পষ্ট ।

বিবিধ আঙ্গিকে মুদ্রিত-নৈপুণ্যের কৃতিত্বভাগী সৈয়দ শামসুল উপন্যাসের জগতেও বলিষ্ঠভাবে পদক্ষেপ করেছেন । তাঁর অন্যান্য অঙ্গের সাহিত্যের মতো শিল্পমাধ্যম নিয়ে এক্সপেরিমেণ্ট এ অঙ্গের রচনার সাধারণ প্রবণতা ।

বিশাল পটভূমি জুড়ে উপন্যাসের বিষয়-বিন্যাসের নিদর্শন বাংলাদেশের সাহিত্যে বেশ-কিছু আছে । আবু জাফর শামসুদ্দীনের 'পদ্মা মেঘনা যমুনা' সমাজবিবর্তনের ঘনিষ্ঠ অভিজ্ঞতার বিবরণ হিসেবে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । আবু ইসহাকের 'পদ্মার পলিদ্বীপ', রিজিয়া রহমানের 'বং থেকে বাঙলা' প্রভৃতি ঐ ধরনের উপন্যাস । সাহিত্যগুণান্বিত উপন্যাসের চেয়ে সমাজ-ইতিহাসের উপাদানভিত্তিক রূপেই এগুলো মূল্যবহ ।

বাংলাদেশের উপন্যাস শাখায় অঞ্চলনির্ভর রচনা সংখ্যায় অধিক । সংলাপে আঞ্চলিক তা আচার-ব্যবহার রচনার দ্বারা অঞ্চল-চরিত্র সৃজন চরিত্রে সজীবতা বিধানে সহায়ক হয়েছে । আবুবকর সিদ্দিকের 'জলরাক্ষস' বাংলার দক্ষিণ অঞ্চলের প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঙ্গে সংগ্রামমুখর জীবনের কঠিন বাস্তবতা পরিস্ফুটনের একটি চমৎকার উদাহরণ ।

উপন্যাসে নগরজীবন-বাস্তবতার রূপারোপে রশীদ করীমের নাম অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে । হুমায়ুন আহমেদের 'নন্দিত নরকে'র কথাও এখানে বলতে হয় । বৈচিত্র্যমণ্ডিত অভিজ্ঞতার সযত্ন পরিচর্যায় বাংলা উপন্যাসের বিষয় ব্যবহারে অভিনবত্বের পরিচয় দিয়েছেন প্রবাসী ঔপন্যাসিক দিলারা হাশেম । তাঁর লেখা 'আমলকীর মৌ' এবং 'কাকতালীয়' উপন্যাসে যথাক্রমে আধুনিক জীবনযাত্রা এবং কিছুকাল-আগের মুসলিম পারিবারিক জীবনাচরণের মিশ্রণের ছবি অঙ্কিত হয়েছে ।

রাষ্ট্রীয় জীবনবাস্তবতার অঙ্গ হিসেবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিষয় অবশ্যই উপন্যাসের উপাদান জুগিয়েছে। আবেগের বশবর্তী অসংখ্য লেখকের শিল্পসংগতিহীন রচনা অগ্রাহ্য করলেও বেশ-কিছু উজ্জ্বল রচনা স্বীকৃতি পাবার যোগ্য। এ ক্ষেত্রে সৈয়দ শামসুল হক, মাহমুদুল হক, রশীদ হায়দার, শওকত আলী, সেলিনা হোসেন, হুমায়ুন আহমেদ, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস প্রমুখ বেশ-কয়েকজনের নাম করা যায়।

ছয়

মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গ একখানি দিনপঞ্জীভিত্তিক স্মৃতিকথায় সাহিত্যিক রসসিদ্ধি পেয়েছে। গেরিলা মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে ধৃত এবং চিরতরে হারিয়ে যাওয়া সন্তানের মায়ের লেখনী থেকে 'একাত্তরের দিনগুলি' নামের ঐ রচনার জন্ম নিয়েছে। ব্যক্তিগত চরম দুর্ভাগ্যের সঙ্গে জড়িত স্বাধীনতাযুদ্ধকালীন দিনযাত্রা বিবৃত করে জাহানারা ইমাম অসাধারণ সংযম এবং সাহিত্যিক ক্ষমতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

স্মৃতিমূলক আত্মকথা রচনায় বাংলাদেশের মহিলাদের হাত অধিকতর শক্তিশালী বলে মনে হয়। আবুল ফজলের 'রেখাচিত্রে'র চেয়ে তাঁর সহধর্মিণী উমরাতুল ফজলের উপন্যাসের ঢঙে লেখা জীবন-কথা 'ঊর্মি' অনেক বেশি রসস্নিগ্ধ। যোবায়দা মির্যার 'সেই যে আমার নানারঙের দিনগুলি' ব্যক্তিজীবন প্রসঙ্গের সূত্রে কাজী নজরুল ইসলাম, জসীমউদ্দীন, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, দিলীপকুমার রায়, মোহিতলাল মজুমদার এবং লেখিকার পিতা কাজী মোতাহার হোসেনের সঙ্গে গ্রন্থকারের বাল্য-কৈশোরের দিনগুলির স্মরণঋদ্ধ। উপরি পাওনা হিসেবে এ গ্রন্থে সেকালের ঢাকার চিত্র পাওয়া গেছে। জাহানারা ইমামের 'অন্যজীবন' এবং সুফিয়া কামালের 'একালে আমাদের কাল' স্মৃতিকথা একাধারে ব্যক্তিজীবনের ইতিকথা এবং সমাজের ক্রমবিকাশের চিত্র।

সাত

সাতষট্টি-পরবর্তী প্রবন্ধ সাহিত্যের প্রসঙ্গে প্রথমেই আবদুল হকের ধারালো অথচ সরস ভাষার যুক্তিবাদী সৃষ্টির উল্লেখ করা কর্তব্য। বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিষয়ে লেখা এঁর কয়েকখানি প্রবন্ধ পাকিস্তান আমলে শিক্ষিত বাঙালিকে স্বাধীনতার চেতনায় উদবুদ্ধ করেছিল। এ ছাড়া, তাঁর 'সাহিত্য ঐতিহ্য মূল্যবোধ' গ্রন্থে বিন্যস্ত বেগম রোকেয়া এবং সৈয়দ আমীর আলীর ধর্মসংস্কারবিষয়ক পরিচ্ছন্ন বুদ্ধিনির্ভর চিন্তা বিষয়ে আলোকপাত সে-আমলের এক দুঃসাহসী প্রয়াস হিসেবে মনে রাখার যোগ্য। স্বল্প আলোচিত এই প্রাবন্ধিক মৌলিক ভাবনা এবং বিশ্লেষণ-সমৃদ্ধ বক্তব্যের সাহিত্যগুণান্বিত উপস্থাপনের জন্যে শ্রদ্ধেয়। তাঁর 'নিঃসঙ্গ চেতনা ও অন্যান্য প্রসঙ্গে' সংকলনে সাহিত্য, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানচিন্তা, রাজনীতি সূত্রে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ের তথ্যসমৃদ্ধ সুচারু আলোচনা স্থান পেয়েছে। ভাষার স্বচ্ছন্দ সহজ গতির জন্যে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর প্রবন্ধ সুখপাঠ্য। কিন্তু মতবাদের ছাঁচে ঢেলে সাহিত্যের বিচার-বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ইতি গণ্ডিবদ্ধ হয়ে পড়েন। তা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ' অবলম্বনে লেখা এঁর 'কুমুর বন্ধন' গ্রন্থ নন্দিত হয়েছে।

জীবনানন্দ দাশকে নিয়ে লেখা আব্দুল মান্নান সৈয়দের গবেষণামূলক গ্রন্থ 'শুদ্ধতম কবি' চিন্তাবিদ্‌ মহলে সমাদর পেয়েছে। বিভিন্ন প্রবন্ধে অনেক কবির কবিতার ঘনিষ্ঠ ব্যাখ্যার পথে কবি-আত্মা উম্মোচনের প্রয়াসে তাঁর বিশিষ্টতা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের গোঁড়ামি পরিহার ক'রে যুক্তিনিষ্ঠ সাহিত্যবিচারে নিবেদিত হলে এঁর সুশৃঙ্খল অধ্যয়নের ফসল বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করবে।

অপর এক কবি হুমায়ুন আজাদের লেখা 'নিঃসঙ্গ শেরপা' কবিতাসাহিত্যের ধারায় কবি শামসুর রাহমানের যথাস্থান নির্ণয়ের সনিষ্ঠা প্রয়াস। এঁর গদ্য সাহিত্যরসাশ্রিত। বিষয়নিরীক্ষায় এঁর অনুপুঙ্খ মনোযোগ সাহিত্যবিচারের

সৎ আদর্শ ।

কবিতার ভাবের ব্যঞ্জনায় বাক্‌ধ্বনির সুষমা কতটা গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়ে বর্তমান প্রবন্ধ লেখকের গবেষণাগ্রন্থ 'ধ্বনি থেকে কবিতা'র কথাও প্রবন্ধসাহিত্যের ধারা প্রসঙ্গে উল্লেখনীয় ।

প্রবন্ধের সীমিত পরিসরে সকল বিষয়ের যথোপযুক্ত আলোচনা করা সম্ভব নয়, এই ত্রুটিস্বীকার করে এ প্রবন্ধ শেষ করছি ।

উল্লেখসূত্র

১. 'সমকালীন বাংলাসাহিত্য', পৃ ২০৯

রবীন্দ্র-চর্চা
১

সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রতিভার বিচারে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য রায়টি শোনা যায় কালের মুখে, এ নিয়ে কোনো তর্ক নেই। কিন্তু যেখানে সমকালীন প্রতিভাই বিচার্য সেখানে সে রায় শোনার সৌভাগ্য ক্ষণজীবী মানুষের ঘটে না। তবে এ ক্ষেত্রে কালের এক ক্ষুদে প্রতিনিধি আমাদের সাহায্য করে কখনো কখনো। সেই প্রতিনিধিটির নাম মৃত্যু। যেন কষ্টিপাথরের মতো কাজ করে এই মৃত্যু। জীবনে যবনিকাপাতের পরেও পস্টারিটির কাছে যে প্রতিভার সৃষ্টিসম্ভারের প্রাসঙ্গিকতায় ভাটা পড়ে না তার মহার্ঘতায় বিশ্বাস করতেই হয়। এখানে প্রাসঙ্গিকতা কথাটিকে শুধু কবির বাণী বা বক্তব্যের দিক থেকেই উচ্চারণ করছি বলা বাহুল্য এমন নয়।

দীর্ঘায়ু হবার ফলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবদ্দশাতেই ধারাবাহিকভাবে আলোচিত বা সমালোচিত হয়ে এসেছেন। সে সমালোচনায় আছেন তাঁর পূর্বপ্রজন্মের মানুষ— সাহিত্যজগতের প্রখ্যাত পূর্বসূরীদেরও কেউ কেউ। তার পর তাঁর সমবয়সী বা প্রায় সমবয়সী লেখক-সমালোচক এবং তাঁর জীবনের শেষ অধ্যায়ে এসেছেন বয়ঃকনিষ্ঠের দল। নিন্দাপ্রশংসা বা রাগবিরাগের দ্বিধারা চোখে পড়েছে ত্রিস্তরে।

রবীন্দ্রজীবৎকালে শেষ পর্যায়ে তাঁর আলোচনার মঞ্চ অধিকার করেছেন যাঁরা তাঁর তিরোধানের পরবর্তী পঁচিশ বছরে তাঁরাই সে মঞ্চে অধিষ্ঠান করছেন যদিও নতুন মুখও দেখা গেছে অবশ্য। কিন্তু তবুও মৃত্যুর ভূমিকাটি উপেক্ষণীয় নয়। মৃত্যু, স্বীকার করতেই হয়, এক অবকাশ রচনা করে ফেলে দূরত্বের যা দেখার দৃষ্টিকে স্বচ্ছ হতে সাহায্য করে, বাঞ্ছিত এবং প্রয়োজনীয় পরিপ্রেক্ষিত তৈরি করে দেয়। পরিণামের পূর্ণচ্ছেদটি পড়ে যাওয়ায় জীবন ও সৃষ্টি এই প্রথম চোখের সামনে এসে দাঁড়ায় এ তাবৎ-না-পাওয়া সমগ্রতার মূর্তি নিয়ে। অনুধাবন আর বিচারে এর গুরুত্বের কোনো পরিমাপ হয় না।

১৩৪৮ বা ১৯৪১ থেকে ১৩৭৩ বা ১৯৬৬— রবীন্দ্র-চর্চার এই পঁচিশ বছরের পরিচয় নিতে বা দিতে গিয়ে প্রথমেই একটা খটকা বাধে। খটকা ঐ চর্চা শব্দটি নিয়ে। রবীন্দ্র-চর্চা তো শুধুই রবীন্দ্রসৃষ্টির লিখিত সমালোচনার অতি সংকীর্ণ গণ্ডিতেই বদ্ধ নয়। চর্চার অর্থ বিচিত্র ও ব্যাপক, এবং চর্চার জগৎটি দূরপ্রসারিত। রবীন্দ্রসাহিত্যের পঠন-পাঠন, রবীন্দ্রসংগীতের শ্রবণ এবং অনুশীলন, রবীন্দ্রনাটকের অভিনয়, রবীন্দ্রকবিতার আবৃত্তি, রবীন্দ্রচিত্ররূপের আস্বাদন, রবীন্দ্রনাথের জীবন ও কর্মের সঙ্গে পরিচয় সাধনের তৎপরতা, সমাজ ও দেশসেবার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের বিচিত্রমুখী চিন্তা— পল্লীচিন্তা, শিক্ষাচিন্তা, ধর্মচিন্তা, রাষ্ট্রচিন্তা, বিশ্বচিন্তা এবং সেই-সব ক্ষেত্রে তাঁর সম্পাদিত কর্মের স্বরূপ সন্ধান ও উপলব্ধি এবং সাধ্যমতো তার অনুসরণ এ সমস্তই রবীন্দ্র-চর্চার অন্তর্গত। এই সব-কিছুকে ধরা অসাধ্য। কোনোদিন সমালোচনার জন্য তেমন কলম ধরেন নি অথচ সারাজীবন রবীন্দ্রচিন্তায় উদ্‌বুদ্ধ এবং জীবনচর্যায় সাধ্যমতো রবীন্দ্রানুসারী এমন মানুষ আমাদের দেশে কিছু কিছু ছিলেন বা আছেন। রবীন্দ্র-চর্চার ক্ষেত্রে তাঁদের গুরুত্ব অপরিমেয় অথচ তাঁরা আমাদের আলোচনার পরিসরের

বাইরে— অথবা হয়তো ধরাছোঁয়ারই বাইরে থেকে যান । অতএব প্রথমেই স্বীকার করে নেওয়া ভালো যে এ আলোচনার পরিসরে রবীন্দ্র-চর্চার যে পরিচয়টুকু লিপিবদ্ধ হবে তা নিতান্তই আংশিক, নিতান্তই খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ। পঁচিশ বছরের রবীন্দ্রচর্চার লিখিত ও প্রকাশিত জগৎটিও নেহাত ছোটো নয় । এ নিবন্ধের সীমানায় তাকেও যথাযথভাবে ধরানো অসম্ভব । অতএব বর্জনের বাহুল্যে এবং আলোচনার দ্রুততায় এর অসংগত অঙ্গহানি অনিবার্য হয়েই উঠবে ।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর তরুণ বয়সেই দেশে লেখক হিসাবে পরিচিত এবং প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন । মধ্য বয়সে পৌঁছানোর আগেই পদ্য ও গদ্যরচনা এবং গানে স্বকীয়তার সুস্পষ্ট এবং প্রোজ্জ্বল একটি মূর্তি ফুটে উঠেছে তাঁর । কিন্তু পত্রপত্রিকায় বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত নিন্দা-প্রশংসার বহু উচ্চারণ শোনা গেলেও গুরুত্বপূর্ণ কোনো আলোচনা তাঁকে নিয়ে তেমন হয় নি । অন্তত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত কিছুই চোখে পড়ে না । বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে এ তাবৎ একান্তবাসী রবীন্দ্রনাথ যখন জনজীবনের কেন্দ্রে দাঁড়ালেন তখন থেকেই তাঁর দিকে দৃষ্টি পড়েছে দেশের মানুষের। আর নোবেল পুরস্কারে লাঞ্ছিত হয়ে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে যাবার পর থেকেই সে দৃষ্টি আরো নিবদ্ধ হয়েছে। এ পর্বটিতেও তাঁকে নিয়ে রচিত গ্রন্থের সংখ্যা যে খুব বেশি এমন নয় । কিন্তু মূল্যবান আলোচনার সূত্রপাত এই পর্বেই । আলোচনা স্বাভাবিকভাবেই প্রধানত কাব্য নিয়ে, দু-একটি নাটকও আছে, আর আছে সংগীতের এবং একটু অপ্রত্যাশিতভাবে ছন্দের আলোচনা । এর বাইরে রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি, সমাজনীতি, সাহিত্যনীতি প্রভৃতি নিয়েও আলোচনা হয়েছে । খ্যাতিমান লেখকদের মধ্যে আছেন বিনয় সরকার, অজিতকুমার চক্রবর্তী, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ, বসন্ত চট্টোপাধ্যায়, কাজী আবদুল ওদুদ, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শচীন সেন, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবোধচন্দ্র সেন, প্রমথনাথ বিশী, নীহাররঞ্জন রায় প্রভৃতি । রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণসঙ্গী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নামও এসে যায় এ প্রসঙ্গে । রবীন্দ্রনাথের সত্তর বৎসর পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত 'জয়ন্তী উৎসর্গ' রবীন্দ্র-অনুধ্যানের একটি বড়ো পরিচয় নিয়ে উপস্থিত হয়েছে । ঐ জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মূল্যবান প্রকাশনী সম্বন্ধেও একই কথা বলা যায় । 'জয়ন্তী উৎসর্গে'র লেখকগোষ্ঠীতে আছেন জগদীশচন্দ্র বসু, কামিনী রায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, রাজশেখর বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, মোহিতলাল মজুমদার, রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, রাধারাণী দেবী, বিনয় সরকার, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, গুরুসদয় দত্ত, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অতুলপ্রসাদ সেন, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথ চৌধুরী, বুদ্ধদেব বসু প্রভৃতি প্রখ্যাত ব্যক্তি ।

রবীন্দ্রজীবৎকালের আর এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বিপুল পরিশ্রমসাপেক্ষ গবেষণাকর্ম রবীন্দ্রজীবনী রচনারম্ভ । প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় কবির তিরোধানের অব্যবহিত পূর্বেই রবীন্দ্রজীবনী প্রথম খণ্ড উপস্থিত করেছেন শুধু রবীন্দ্র-অনুরাগীর কাছে নয়, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কাছে— এ কৃতিত্বের অসামান্যতা তর্কাতীত ।

কিন্তু বিখ্যাত বাইশে শ্রাবণের পরই রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে ভাবনা-চিন্তায় এবং গ্রন্থপ্রকাশে রীতিমতো বেগের সঞ্চার হল, আর জন্মশতবর্ষে দেখা দিল একেবারে জোয়ার । তিরোধান এবং জন্মশতবর্ষ দুটি উপলক্ষে অনুরাগী-চিত্তের আবেগ একটা বড়ো ভূমিকা নিয়েছে । নিছক আবেগ কখনো সুফলপ্রসূ হয় না । তাই ভূরি পরিমাণ অন্তঃসারশূন্য রচনা এ সময়ে প্রকাশিত হয়েছে যার স্থায়ী কোনো মূল্য নেই । অবশ্য প্রবল সংখ্যাধিক্যের ক্ষেত্রে এ খুবই স্বভাবিক ব্যাপার । কিন্তু যথার্থ মূল্যবান রচনার সাক্ষাৎও আমরা কম পাই না এই পর্বে । নানা দিক থেকেই এ রচনাগুলির গুরুত্ব । প্রথমত রবীন্দ্রপ্রতিভার বিচিত্র দিককে এই প্রথম স্পর্শ করা হল সমুচিত যত্নে । শুধু প্রশস্তি নয়, গভীর মনোযোগে বিচার ও বিশ্লেষণে উদ্যোগী হলেন লেখককুল । রবীন্দ্রসৃষ্টির স্বরূপ সন্ধানে যেমন একক সাধনার পরিচয় পাওয়া যায় প্রচুর তেমনি যৌথ উদ্যোগ কিছুমাত্র অপ্রতুল নয় । তাত্ত্বিক এবং নান্দনিক আলোচনার পাশাপাশি ভিন্ন ধর্মের শ্রমসাপেক্ষ গবেষণাকর্ম— পঞ্জী, অভিধান বা কোষগ্রন্থ জাতীয় রচনা

এ পর্বে প্রকাশন তালিকায় সমুপস্থিত। এবং লক্ষ করবার শহর কলকাতার বাইরেও নানা অঞ্চল থেকে এর প্রকাশ। লক্ষণীয়ের আর-একটি দিক হল রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে লেখালেখি, সংকলনের উদ্যোগ শুধু বয়স্ক পাঠককে সামনে রেখে নয়— শিশু ও কিশোরদের দিকে তাকিয়েও। লেখা বা প্রকাশনার মান সর্বত্র উন্নত না হলেও উদ্যোগটি রীতিমতো চোখে পড়ার মতো। প্রকাশনায় উন্নত মান বজায় রাখা অর্থপ্রাচুর্যের অপেক্ষা রাখে, তাই তা আশা করা অসংগত। কিন্তু প্রয়াসটি যে অভিনন্দনযোগ্য এ কথা বলতেই হবে।

আলোচ্য পর্বে যে রচনাসম্ভার আমরা পেয়েছি তার অধিকাংশই যদিও সাধারণ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত অথবা সংকলন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত তবু এর বাইরে অনেক রচনা গ্রন্থভুক্ত হয় নি, সাময়িক পত্রকে আশ্রয় করে উপস্থিত হয়েছে। তার মধ্যে এমন বহু মূল্যবান রচনা আছে যেখানে লেখকের দৃষ্টিকোণ এবং উপস্থাপনার অভিনবত্বে চমকে উঠতে হয়। এই-সব রচনা দুই মলাটের মধ্যে বই আকারে স্থায়িত্ব পেলে উত্তর কালের পাঠক নিঃসন্দেহে লাভবান হতেন। দুঃখের কথা তা হয় নি। এগুলির অধিকাংশই হারিয়ে গেছে, যাচ্ছে এবং যাবে। সচেতন অবেক্ষক ও গ্রন্থাগারিক কেউ কেউ হয়তো অভিলেখাগার ও গ্রন্থাগারে এর কিছু সংগ্রহ করে রেখেছেন। ভবিষ্যতে কোনো সন্ধানী গবেষক এগুলিকে কোনো সংকলন গ্রন্থে স্থায়িত্ব দিলে রবীন্দ্রানুরাগী পাঠক সমাজের কৃতজ্ঞতাভাজন হবেন। মনে রাখা ভালো এই-সব নিবন্ধের লেখক সকলেই যে খুব খ্যাতিমান এমন একেবারেই নয়। বস্তুত সাধারণ্যে পরিচিত নন এমন বেশ-কিছু বিদগ্ধ, রসজ্ঞ, নিভৃতনিবাসী রবীন্দ্রঅনুরাগী এদেশে আছেন যাঁদের মনোযোগী দৃষ্টিপাতের নিপুণ পর্যবেক্ষণে রবীন্দ্রসৃষ্টির কোনো অদেখা দিক উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। তথাকথিত অ্যাকাডেমিক জগতের বাইরে থাকার জন্যই এঁদের লেখায় এক ধরনের দুর্লভ টাটকা স্বাদ থাকে যা তৃপ্তি নিয়ে আসে পাঠক মনে।

১৩৪৮ থেকে ১৩৭৩ এই পঁচিশ বছরে যে বিপুল পরিমাণ রচনা প্রকাশিত হয়েছে বিষয় অনুসারে সেগুলিকে মোটামুটি কয়েকটি বিভাগে শ্রেণীবদ্ধ করা যায় এইভাবে—

১. রবীন্দ্র সাহিত্য সমালোচনা: কাব্য, নাটক, কথাসাহিত্য এবং প্রবন্ধ ও চিঠিপত্র।

   প্রবন্ধ ও চিঠিপত্রকে প্রধানত অবলম্বন করে যে আলোচনা তার উপবিভাগ এইরকম—

   ক. সাহিত্যতত্ত্ব ও ছন্দ
   খ. দর্শন ও ধর্মচিন্তা
   গ. শিক্ষাচিন্তা
   ঘ. বিজ্ঞান চিন্তা
   ঙ. সমাজ, দেশ, বিশ্বচিন্তা (অর্থনীতি, রাজনীতি এর অন্তর্ভুক্ত)
   চ. ভ্রমণসাহিত্য
   ছ. চিঠিপত্র

২. রবীন্দ্র সংগীত ও রবীন্দ্রনাথের সংগীত-চিন্তা
৩. রবীন্দ্রচিত্রকলা ও রবীন্দ্রনাথের শিল্প-চিন্তা
৪. রবীন্দ্রজীবনী (বিশ্বের বিশিষ্ট মনীষী-সংসর্গ এই বিভাগের অন্তর্গত)
৫. রবীন্দ্রস্মৃতিকথা
৬. শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতী (শিক্ষাচিন্তার ক্ষেত্রে এ প্রসঙ্গ কিছু এলেও বিষয়টি স্বতন্ত্র)

এই-সব বিভাগে আলোকপাতের পরিমাণ অবশ্যই অসমান, রচনার উৎকর্ষের তারতম্যও আছে ঢের সে কথা তো বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু সব জড়িয়ে এর বিপুলতা নজরে পড়ার মতো। স্বল্প পরিসরে এর পর্যালোচনা দুরূহ বলেই নির্বাচনে নির্মম হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

রবীন্দ্র-তিরোধানের পূর্বপর্যায়ের রবীন্দ্র সমালোচনার প্রধান অংশই ছিল রবীন্দ্রকাব্য সমালোচনা এ কথা উল্লেখ করেছি আগেই। কিন্তু সেখানে প্রকাশিত সমালোচনা গ্রন্থের সংখ্যা এবং আলোচিত কাব্যের সংখ্যা দুইই নিতান্ত কম। পরবর্তী পর্যায়ের প্রধান বিশেষত্ব এই যে এখানে সমালোচনার ব্যাপ্তি কবিতা রচনারম্ভকাল থেকে সমাপ্তিকাল পর্যন্ত। আলোচনার মধ্যে এসেছে কাব্য বিবর্তনের ধারা, কাব্যের তত্ত্ব, এবং সেইসঙ্গে কাব্যের রূপগত বৈশিষ্ট্য। এ ছাড়া দেখা যায় অভিনব নানা দৃষ্টিকোণ থেকে কবি ও কাব্যকে দেখার বিচিত্র উদ্দীপক চেষ্টা।

রবীন্দ্রকাব্যের ক্রমবিকাশকে উপজীব্য করে যে-সব গ্রন্থ লেখা হয়েছে তার মধ্যে আছে নীহাররঞ্জন রায়ের 'রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা', প্রমথনাথ বিশীর 'রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহ', উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের 'রবীন্দ্র সাহিত্য পরিক্রমা' এবং 'রবীন্দ্র কাব্য পরিক্রমা'। শেষোক্ত গ্রন্থ দুটিতে বিস্তৃতিই বোধ হয় লক্ষণীয় গুণ। 'রবীন্দ্রপ্রতিভার পরিচয়' গ্রন্থের লেখক ক্ষুদিরাম দাস সৃষ্টির গভীরে প্রবেশ করেছেন। বিশেষত শেষ পর্যায়ের রচনার বিচার ও বিশ্লেষণে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ের 'কবিগুরু' কাব্যের ক্রমাভিব্যক্তির অনুসরণ সীমাবদ্ধ পরিসরে। বেশ-কয়েকজন লেখক এক-একটি কাব্যকেই গ্রন্থের বিষয়বস্তু করেছেন। দেখা যাবে কাব্যগুলি নানা পর্যায়ের। এক 'মানসী' কাব্য নিয়েই আলোচনা করেছেন অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়। রচনাকাল রবীন্দ্রশতবর্ষ এবং তারই কাছাকাছি। অমিয়রতন মুখোপাধ্যায় নিয়েছেন 'সোনার তরী', 'পূরবী', মহুয়া', আর 'বলাকা' কাব্যকে। অশোক সেন নিয়েছেন 'কল্পনা', তপন বন্দ্যোপাধ্যায় 'পুনশ্চ'। এর মধ্যে ক্ষিতিমোহন সেনের 'বলাকা কাব্য পরিক্রমা' স্বতন্ত্র মনোযোগ আকর্ষণ করে। কাব্যের জন্মকথা যুক্ত হয়েছে ব্যাখ্যার সঙ্গে। লেখক ভারতীয় শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। তত্ত্বালোচনায় তাঁর অধিকার অবাধ। তা ছাড়া তিনি কবি-কৃত কাব্য-ব্যাখ্যা শুনেছিলেন। ফলে তার ছায়াপাতে ঋদ্ধ হয়েছে রচনাটি। শুভ্রাংশু মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্র কাব্যের পুনর্বিচার' গ্রন্থ-নামে একটু বিভ্রান্তি জাগে— আলোচনা 'মানসী' 'সোনার তরী' ও 'চিত্রা' নিয়ে। শুধু শেষ পর্যায়ের কাব্য নিয়ে কলম ধরেছেন শিশিরকুমার ঘোষ। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের নাম 'রবীন্দ্রনাথের উত্তরকাব্য'। এ আলোচনায় তত্ত্বই প্রাধান্য পেয়েছে, কাব্যের রূপবন্ধ নয়। রবীন্দ্রকাব্যে শেষপর্যায়ে যে গদ্য কবিতার আবির্ভাব তা নিয়ে মূল্যবান আলোচনা করেছেন ধীরানন্দ ঠাকুর। তাঁর 'রবীন্দ্রনাথের গদ্যকাব্য' বইটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু সরস ও সমৃদ্ধ আলোচনা। একই বিষয় নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন সুশীলকুমার গুপ্ত।

কাব্যপ্রবাহ নয়, কোনো বিশেষ কাব্যগ্রন্থ বা পর্যায়ও নয়, রবীন্দ্রকাব্যের কোনো বিশেষ দিক বা প্রসঙ্গ নিয়ে কয়েকটি বই লেখা হয়েছে। অমিয় সেনের 'প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ', ইন্দ্রজিৎ ছদ্মনামে হীরেন্দ্রনাথ দত্তের 'মানসসুন্দরী' এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। প্রমথনাথ বিশীর কাব্য সমালোচনা পূর্ব পর্যায়েই দেখা গেছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সে সমালোচনা পড়েছেন এবং যে মন্তব্য করেছেন তার সারমর্ম হল সমালোচনায় সমালোচ্য কবি ও কাব্যকে আচ্ছন্ন করে সমালোচকই মুখ্য হয়ে উঠেছেন মাঝে মাঝে। এই পর্বে প্রকাশিত 'রবীন্দ্র সরণী'তে লেখকের স্বভাবসুলভ প্রবণতা লক্ষ করা যায়। এই গ্রন্থে তাঁর আলোচ্য বলাকা-পরবর্তী রচনায় কবিত্ব ও ব্যক্তিত্ব। বুদ্ধিদীপ্ত মননের এবং সেইসঙ্গে সরস উপস্থাপনার গুণে তাঁর বিতর্কিত দ্রুত সিদ্ধান্তগুলি উপভোগ্য হয়ে ওঠে অনেক সময়। গতানুগতিক ছাত্রপাঠ্য সমালোচনায় ক্লান্ত পাঠকমনে কিছু নূতনত্বের স্বাদ নিয়ে আসে।

রবীন্দ্রকাব্য সমালোচনার ক্ষেত্রে যে লেখকের লেখায় বৈদগ্ধ্যের সঙ্গে রসবোধের মণিকাঞ্চন যোগ ঘটেছে তিনি হলেন মোহিতলাল মজুমদার। স্বয়ং কবি হওয়ায় তাঁর রচনা স্বতই অন্য মাত্রাও পেয়ে থাকে। মোহিতলালের 'কবি রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্র কাব্য' দুই খণ্ডে প্রকাশিত বিস্তৃত কাব্যালোচনা। এই প্রথম রবীন্দ্র-সংকলিত 'সঞ্চয়িতা' সমালোচনার অবলম্বন হল। এই সংগ্রহে অধিকাংশ কবিতাকেই স্পর্শ করেছেন মোহিতলাল। কাব্য সমালোচনা রসজ্ঞ পণ্ডিতের কলমে কোন্ গ্রামে পৌঁছতে পারে এ গ্রন্থ পাঠে তা হৃদয়ঙ্গম হবে সহজেই। অবশ্য এমন নয় যে সমালোচক মোহিতলাল সর্বত্র রবীন্দ্রনাথের রচনার প্রতি সুবিচার করতে পেরেছেন। আপন কাব্যরুচি ও

শ্রুতিসংস্কার কখনো কখনো নিয়ত পরিবর্তমান রবীন্দ্রকবিতার চলিষ্ণু ধারা অনুসরণে বিষম বাধা হয়ে উঠেছে। আর তখনই ঘটেছে বিপত্তি। মুহূর্তে অনুরাগী পাঠক ধরেছেন দুর্বাশা মূর্তি। অবশ্য দূর কালের পাঠকের কাছে এই বিষম ব্যাপারটিও একদিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ ও মূল্যবান। কাব্য বিবর্তনের ইতিহাসে কালের রুচির ভূমিকাটি পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয় এই-সব ঘটনায়।

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্র দর্শন' গ্রন্থটিকে অন্যত্র অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের ধর্ম ও দর্শন চিন্তা প্রসঙ্গে আলোচনার জন্য না রেখে এখানে টেনে আনছি এই কারণে যে এ গ্রন্থের উপজীব্য রবীন্দ্রকাব্যের উপর রবীন্দ্রদর্শনের প্রভাব। সেইসঙ্গে এই কারণেও যে বস্তুত গ্রন্থটি দার্শনিকের রীতিপদ্ধতি অনুসরণ করে নি। এর ভাষা ও প্রকাশভঙ্গিতেও সে চিহ্ন নেই।

এবার এক সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের গবেষণা-কর্মের উল্লেখ করব যার বিষয় ও বিচারের অনন্যতা সংশয়াতীত। জগদীশ ভট্টাচার্যের দীর্ঘ রবীন্দ্র অনুধ্যানের ফল 'কবিমানসী'। প্রথম খণ্ডটি জীবনভাষ্য, দ্বিতীয় খণ্ড কাব্যভাষ্য। রবীন্দ্রনাথের প্রেমচেতনা, সৌন্দর্যচেতনা এবং জীবনদেবতা চেতনাকে নিয়ে এক অন্তরঙ্গ জীবনকথা। তাঁর অভিনব ভাবনাসূত্র দিয়ে রবীন্দ্রজীবনের নানা ঘটনা ও সৃষ্টিকে গ্রথিত করে চলেছেন এক নির্দিষ্ট লক্ষ্যের অভিমুখে। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও সিদ্ধান্ত সকলের সমর্থন পাবে এমন প্রত্যাশা অসংগত কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জীবন ও কাব্যকে দেখা ও দেখানোতে তাঁর মৌলিকতা তর্কাতীত এ কথা না মেনে উপায় নেই।

এ পর্যন্ত আমরা যে-সব গ্রন্থ নিয়ে আলোচনা করলাম সেগুলি রবীন্দ্রকাব্যের তাত্ত্বিক দিকেরই আলোচনা। কিন্তু কাব্য শুধু বাণী নয়, তার প্রকাশ-রূপ, এক সুবিহিত মূর্তি, সংস্কৃত আলংকারিকেরা যাকে চমৎকার একটি শব্দে অভিহিত করেছেন— নির্মিতি। সংস্কৃত সাহিত্যে নির্মিতির আলোচনা তার নিজস্ব পথে বহুদূর এগোলেও বাংলা কাব্যালোচনায় তত্ত্বালোচনারই অবাঞ্ছিত একাধিপত্য বহু দিন ধরে। সুখের কথা, রবীন্দ্রকাব্যের রূপের বিচারে মনোযোগী হয়েছেন একাধিক অনুরাগী পাঠক। ১৯৬১তে সুনন্দা দত্ত যে গ্রন্থটি প্রকাশ করেন তার নাম 'রবীন্দ্র কাব্যভাষা'। বিশ্লেষণী দৃষ্টি দিয়ে রবীন্দ্রকবিতার শরীরকে দেখেছেন তিনি। অবশ্য তাঁর বিচারের ক্ষেত্র মূলত ভাষা। গ্রন্থে সংযোজিত হয়েছে রবীন্দ্র শব্দকোষের একটি সংকলন। এই কৌতূহলোদ্দীপক এবং মূল্যবান সংযোজনের জন্য পাঠকেরা কৃতজ্ঞ থাকবেন। গুণময় মান্না রবীন্দ্রকাব্যের ক্রমবিকাশে নিবদ্ধ করেছেন তাঁর দৃষ্টি। কিন্তু তাঁর পূর্বসূরীদের মতো ভাবের ক্রমবিকাশে নয়, রূপের ক্রমবিকাশে। তাঁর গ্রন্থের নাম 'রবীন্দ্র কাব্যরূপের বিবর্তনরেখা'। প্রায় ছশো পৃষ্ঠাব্যাপী বিশদ বিশ্লেষণ। ক্ষুদিরাম দাশের 'চিত্রগীতিময়ী রবীন্দ্রবাণী' কাব্য নির্মাণ কৌশল নিয়ে ব্যাপক আলোচনা নতুন পথে। এই পথ ধরেই পরবর্তীকালে দেখা দিয়েছে আরো অনেক লেখা নতুন লেখকদের কলমে, অনেক মনোযোগী অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ নিয়ে। কিন্তু সে কথা আমাদের আলোচনার পরিসরের বাইরে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের কাব্যশরীর নিয়ে রচিত গ্রন্থের প্রসঙ্গের এখানেই ইতি এবং সেইসঙ্গে রবীন্দ্রকাব্যসমালোচনার সমাপ্তি।

বাংলা সাহিত্যে নাট্যশাখাটি বেশ দুর্বল। মধুসূদন-গিরিশচন্দ্রের মতো দু-একজন নাট্যকারের প্রবল উপস্থিতি সত্ত্বেও বলতে হয় রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে বিশ্বের নাট্যসাহিত্য জগতে স্থান পাবার যোগ্যতা কেউই অর্জন করেন নি। রবীন্দ্রনাথের নাটক যাত্রা শুরু করেছে নিজের পথে, সূর্বসূরীদের পথে নয়, এবং পৌঁচেছে এমন ক্ষেত্রে যার সঙ্গে পূর্বাপর বংলা নাটকের সম্পর্ক বিশেষ খুঁজে পাওয়া যাবে না। মাঝখানে আছে বিচিত্র পালাবদল। গীতিনাটক, কাব্যনাটক, ঋতু ও তত্ত্বনাটক এবং নৃত্য নাটক। এর অধিকাংশই অরাবীন্দ্রিক বাংলা নাটকের সঙ্গে সম্পর্কহীন, একান্তই অভিনব। শুধু লঘু কমেডিগুলি খুব অনাত্মীয় নয়। স্বদেশে রবীন্দ্রনাথের নাট্যপ্রতিভা সহজ স্বীকৃতি পায় নি নাট্যজগতে তাঁর মৌলিকতা ও উৎকর্ষ সত্ত্বেও। পেলেও তা নিতান্তই কুণ্ঠিত ও কৃপণ এবং একান্তই বিলম্বিত। ভাবতে একটু অবাকই লাগে একজন বিদেশী প্রথম রবীন্দ্র-নাট্য-প্রতিভাকে জানাতে পেরেছেন

দ্বিধাহীন স্বীকৃতি । এডওয়ার্ড টমসন তাঁর *Rabindranath Poet and Dramatist* এই গ্রন্থ-নামে কবির সঙ্গে নাট্যকারকে এক নিশ্বাসে উচ্চারণ করতে কুণ্ঠিত হন নি ।

আমরা যে পর্বের সাহিত্য সমালোচনাকে উপজীব্য করেছি সেই পর্বে অবশ্য নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের স্বীকৃতিতে কুণ্ঠা কেটেছে অনেকখানি । কিন্তু তা হলেও উন্নত মানের রবীন্দ্রনাট্য-সমালোচনার অপ্রতুলতা নজর এড়ায় না । হয়তো অভিনব বলেই বিচারের সহজ ব্যবহার্য আদর্শ বা মাপকাঠি না থাকায় অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে সমালোচকের কলমকে । দুঃখের বিষয় বহু লেখাই ছাত্রসহায়ক গ্রন্থমাত্রে পর্যবসিত । তাতে সমালোচনার পরিসর আদৌ কম নয়, কিন্তু বিচার ও বিশ্লেষণের উন্নত মান, রাবীন্দ্রিক স্বাতন্ত্র্যকে ধরার কিংবা তাঁর ত্রুটি নির্দেশ করবার দক্ষতা খুব একটা চোখে পড়ে না । কোনো কোনো রচনা অবশ্যই এর ব্যতিক্রম । সেখানে আকস্মিক আলোকপাতে নাট্যকারের স্বকীয়তা উদ্ভাসিত । অথবা সেখানে বিদগ্ধ লেখক রবীন্দ্রসৃষ্টিকে দেখার একটি পরিপ্রেক্ষিত রচনা করে দিয়েছেন । এমনই একটি লেখা 'রবীন্দ্র নাট্য সাহিত্যের ভূমিকা' । লেখক সাধন ভট্টাচার্য । কাব্যের মতো নাটকের ক্ষেত্রেও সমালোচনার প্রধান দুটি ধারা । এক, রবীন্দ্র নাট্যপ্রবাহকে সমগ্রভাবে দেখার চেষ্টা এবং দুই, নাট্যবিশেষ বা পর্যায় বিশেষের উপর আলোকপাত । প্রথম পর্যায়ে পড়ে প্রমথনাথ বিশীর 'রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ' —দুটি খণ্ড । এই বিপুল গ্রন্থে গীতিনাট্য, কাব্যনাট্য নৃত্যনাট্য ঋতুনাট্য তত্ত্বনাট্য এবং লঘু রসের কমেডি বা প্রহসন সবই অন্তর্ভুক্ত । নাট্যালোচনাতেও প্রমথনাথের প্রখর দৃষ্টির স্বকীয়তা এবং নানা উদ্দীপক মন্তব্য পাঠককে সজাগ করে রাখে । প্রহসনের আলোচনা লেখকের নিজস্ব কৌতুক রসের সংমিশ্রণে সম্ভোগের সামগ্রী হয় । অশোক সেনও ব্যাপক আলোচনায় নেমেছেন যদিও সব নাটককে স্পর্শ করেন নি । তবে সাধারণ নাটকগুলির মধ্যে যেগুলিকে তিনি প্রতিনিধি স্থানীয় মনে করেছেন সেগুলি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং সেইসঙ্গে নিয়েছেন তত্ত্বনাটকগুলিকে । তাঁর প্রধান আলোকপাত এখানে । উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের 'রবীন্দ্র নাট্যপরিক্রমা' এবং আশুতোষ ভট্টাচার্যের 'রবীন্দ্র নাট্যধারা'য় আলোচনার বিস্তারই প্রধান লক্ষণীয় । একটু ভিন্ন স্বাদের লেখা জীবনকৃষ্ণ শেঠের 'রবীন্দ্রনাট্যপ্রসঙ্গ', কিংবা শান্তিকুমার দাশগুপ্তের 'রবীন্দ্রনাট্যপরিচয়' । শুধুই কাব্যনাট্য বা সাধারণ নাটক নিয়ে যে-সব গ্রন্থ লেখা হয়েছে তার মধ্যে বোধহয় প্রথম কনক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রবি-পরিক্রমা'; তার পর সুশীলকুমার গুপ্তের 'রবীন্দ্রনাট্য প্রসঙ্গ' । কনক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় গ্রন্থ 'রবীন্দ্র নাট্য সমীক্ষা' ।

রবীন্দ্রনাথের অপরিণত বয়সের রচনা হলেও সম্ভবত অতি সংহত রূপের অনন্যতায় 'মালিনী' সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে । কেউ কেউ এর মধ্যে দেখেছেন গ্রীক নাটকের ছায়া । যদিও স্বয়ং নাট্যকার জানিয়েছেন ঐ পর্বে গ্রীক নাটক ছিল তাঁর অভিজ্ঞতার বাইরে । অংশু ভট্টাচার্যের 'মালিনী' এবং নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ও সোমেন্দ্রনাথ বসুর 'মালিনী' সব জড়িয়ে এ নাটক নিয়ে তিনটি বই । অনেক বেশি আলোচনা ও আলোকপাত প্রত্যাশিত ছিল 'রক্তকরবী'কে নিয়ে । যে-কটি লেখা পাই তাদের লেখক তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ এবং বিভাস রায়চৌধুরী ।

রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের অ-সাধারণ এই নাট্য রচনা যাকে তত্ত্ব নাটক, রূপক সাংকেতিক নাটক— নানা নামে ডাকা হয়ে থাকে তার আলোচনা করেছেন বেশ কয়েকজন । কনক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রনাথের তত্ত্ব নাটক', মিহির রায়ের 'রবীন্দ্রনাথের তত্ত্ব নাটক' এবং শান্তিকুমার দাশগুপ্তের 'রবীন্দ্রনাথের রূপক নাটক' এই তিনটি বই উল্লেখযোগ্য । আগেই উল্লেখ করেছি আশোক সেন এবং প্রমথনাথ বিশী তাঁদের গ্রন্থে এ নাটকগুলিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন ।

এই শ্রেণীর নাটক বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট দান এবং বিশ্বসাহিত্যেও মূল্যবান সংযোজন এ সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই । কিন্তু দুঃখের কথা, এর বিশিষ্টতার আলোচনায় রূপক, সাংকেতিক, প্রতীক ইত্যাদি পারিভাষিক শব্দগুলি প্রয়োজনীয় স্পষ্টতায় উপস্থাপিত হয় নি । প্রথমত আলোচনা অনেক সময় বড়োই আংশিক,

বড়োই সংক্ষিপ্ত । দ্বিতীয়ত, লেখকদের মধ্যে বক্তব্যে সামঞ্জস্যের একান্ত অভাবে পাঠকের বিভ্রান্তির শঙ্কা । বস্তুত রবীন্দ্রনাথ এ জাতীয় নাটকে এ দেশে পথিকৃৎ এবং বিশ্ব নাট্যসাহিত্যেও অন্যের পদাঙ্কচারী নন; প্রতীচীর কোনো নাট্যকার তাঁর আদর্শ নন । পশ্চিমের সমধাতুর নাটকের জগতে তাঁর সৃষ্টিগুলি স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। পশ্চিমের এ জাতীয় নাটকের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনার ক্ষেত্রে এ ভাবনাকে জাগরূক রাখা দরকার, অন্যথায় রবীন্দ্রনাথের প্রতি সুবিচার না হবার শঙ্কা থাকে । এ ক্ষেত্রে তুলনাত্মক আলোচনাকে প্রাধান্য না দিয়ে বা বিভাষায় ব্যবহৃত পরিভাষা ও মানদণ্ডে একান্ত গুরুত্ব আরোপ না করে রবীন্দ্রনাথের নাট্যীয়প্রতিভার স্বাতন্ত্র্যের মধ্যেই এই পরিণামী রূপের বীজ সন্ধান করা যায় । সৃষ্টির এই শাখাটিকে স্রষ্টা মনের আত্মপ্রকাশ-প্রবণতার সঙ্গে অন্বিত করে দেখার চেষ্টা বেশি ফলবতী হবে ।

রবীন্দ্রনাটক নিয়ে ভিন্ন ধরনের অভিনন্দনযোগ্য আলোচনা হেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'সৌখীন নাট্যকলায় রবীন্দ্রনাথ' । এটি একাধিক প্রবন্ধের সংকলন । এতে আছে এ দেশে শৌখিন অভিনয়ের ধারা নিয়ে আলোচনা। নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের স্বকীয় বিশেষত্ব একটি প্রবন্ধের বিষয় । কিন্তু বিশেষ মূল্যবান প্রবন্ধ "রবীন্দ্রনাথের প্রথম অভিনয়" । যদি রবীন্দ্রনাথের অভিনয় এবং নাট্যপ্রয়োগ সংক্রান্ত আরো লেখা আমরা পেতাম তবে অনেক কৌতূহল নিবৃত্ত হত । এ কাজ তো রবীন্দ্রতিরোধানের পরবর্তী নতুন প্রজন্মের লেখকের নয় । তাঁরা এ কাজে হাত দিলেও রবীন্দ্রসমকালীন প্রত্যক্ষদর্শীর অভিজ্ঞতার গুরুত্ব আলাদা । এখানে উল্লেখ করি, বিষয়টি রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গজনের এবং সমকালীন কোনো কোনো ব্যক্তির স্মৃতিকথায় এসে উপস্থিত হয়েছে । যেমন ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর 'রবীন্দ্রস্মৃতি', সুধীরঞ্জন দাশের 'আমাদের শান্তিনিকেতন', অসিতকুমার হালদারের 'রবি-তীর্থে' এবং অবনীন্দ্রস্মৃতিভিত্তিক রানী চন্দের লেখা 'ঘরোয়া '। এ রকম টুকরো স্মৃতিকথার লেখক ও গ্রন্থের সংখ্যা কম নয়। প্রবন্ধ বা নিবন্ধ না হলেও পরবর্তী প্রজন্মের গবেষকদের কাছে এগুলি মহার্ঘ উপাদান হিসেবে সঞ্চিত আছে।

রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য একটি স্বতন্ত্র আলোচনার বিষয় । নৃত্য নিয়ে এবং সেইসঙ্গে নাট্য নিয়েও প্রতিমা দেবী একটি বই লেখেন 'নৃত্য' নামে । এর মধ্যে চিত্রাঙ্গদা, চণ্ডালিকা প্রসঙ্গ এসেছে । প্রণয়কুমার কুণ্ডুর গ্রন্থ রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য ও নৃত্য নাটককে অবলম্বন করে । এতে বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে ভাব এবং রূপের বৈশিষ্ট্য, রসের প্রকৃতি-স্বাতন্ত্র্য এবং সেইসঙ্গে আঙ্গিক ও নাট্য প্রয়োগ কৌশলের নানা কথা । শান্তিদেব ঘোষের মূল্যবান উপদেশ নির্দেশ আলোচনাকে বহুল পরিমাণে ঋদ্ধ করে তুলেছে ।

বস্তুত রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস নিয়ে বেশ-কিছু মূল্যবান কাজ হয়েছে ১৩৭৩-এর পরেই । সমাজ-অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট, রাজনৈতিক আবহ, মনস্তত্ত্ব, নরনারী সম্পর্ক ইত্যাদি ছাড়াও উপন্যাসের গঠন ও কারুকৃতি নিয়ে উন্নত মানের আলোচনা সবই এসেছে ঐ পরবর্তী পর্বে । রবীন্দ্র-তিরোধানের পর পঁচিশ বছরের মধ্যে উপন্যাস নিয়ে গ্রন্থের সংখ্যা নিতান্ত অল্প । সম্ভবত বিশ্বপতি চৌধুরীর 'কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ' প্রথম উল্লেখযোগ্য বই । এ আলোচনা একেবারেই বিস্তৃত নয় । বিচার বা বিশ্লেষণে লেখক তেমন উৎসাহী নন । বইটিকে রসজ্ঞ পাঠকের প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ বলা যেতে পারে । 'গোরা' উপন্যাসের আলোচনায় স্থানে স্থানে বৈশ্লেষিক দৃষ্টির চকিত পরিচয় মিলে যায় । পুলকেশ দে সরকারের 'রবীন্দ্র উপন্যাস' যা অনেক পরবর্তী রচনা, বিচার-বিশ্লেষণের পথ ধরেছে । মনোরঞ্জন জানার 'রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস : সাহিত্য ও সমাজ' গ্রন্থে লেখকের নিজস্ব ভাবুক মনের ছায়াপাতই প্রধান । একটি উপন্যাসকে অবলম্বন করে লেখা হয়েছে দুটি বই— রেণু মিত্রের 'ঘরে বাইরে' এবং গিরিজাপতি ভট্টাচার্যের 'নৌকাডুবির প্লট' । প্রথম গ্রন্থটিতে লেখিকার প্রচ্ছন্ন উদ্দিষ্ট বোধ হয় একটি তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা, নিছক উপন্যাসের বিচার-বিশ্লেষণ নয়। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তাঁর কথাসাহিত্যের আলোচনাতেও কাব্য ও নাটকের আলোচনা পদ্ধতি অনুসরণ করে ব্যাপক পরীক্ষার্থী সমাজের ভরসাস্থল হয়েছেন ।

এই পর্বের শ্রেষ্ঠ সমালোচনার লেখক শ্রীকমার বন্দ্যোপাধ্যায় । উপন্যাস সমালোচনার ক্ষেত্রে তিনি আর

কারো সঙ্গে তুলনীয়ই নন। তাঁর বিপুল গ্রন্থটির উপজীব্য অবশ্য শুধুই রবীন্দ্রনাথ নন কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এর বড়ো অংশ জুড়ে আছেন সে কথা উল্লেখ করা বাহুল্য হবে। 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' আমাদের সমালোচনা জগতে এক দিক্‌পরিবর্তনকারী সৃষ্টি। গভীর রসবোধ আর তীক্ষ্ণ মননের সুচারু সন্ধি। সাহিত্য সমালোচনার জগতে এমন নিপুণ বিশ্লেষণ আগে কখনো চোখে পড়ে নি। সৃষ্টির শরীরে যেন ছুরি কাঁচি চালিয়ে খণ্ড খণ্ড করে দেখা, বীক্ষণ-যন্ত্রের সামনে তার অনুপুঙ্খ উপাদানগুলিকে ধরে ধরে দেখা— অথচ এ শুধুই বিশ্লেষণের খণ্ডতায় পর্যবসিত নয়। সমালোচক সৃষ্টির রূপ-সমগ্রতায় কিংবা বলা যাক রূপের অখণ্ড সত্তায় নিবদ্ধদৃষ্টি। তাই সব বিশ্লেষণের টুকরোগুলি শেষ পর্যন্ত এক সংশ্লেষণী বৃত্তে বিধৃত। উপন্যাসের ঘটনা চরিত্র সংলাপ সব-কিছু ঠিক উপন্যাসের মতো সমালোচনাতেও একটি সুতোয় গ্রথিত হয়ে যায়। শ্রীকুমারের সমালোচনা উপন্যাসের 'আঁতের কথা টেনে বার করে' দেখায় অথচ প্রাণের স্পন্দনটিকে হারিয়ে যেতে দেয় না। সভয়ে বলি, নব্যকালের বিশ্লেষণ মনে হয় কখনো কখনো চলে অন্য পথে, লুপ্ত হয়ে যায় বৈজ্ঞানিক আর সাহিত্যিক বিশ্লেষণের মূল্যবান ভেদরেখাটি। সাহিত্যের জগতে সমগ্রের বোধ বিলুপ্ত হলে খণ্ডও যে তার মাহাত্ম্য হারায় এ কথা স্মর্তব্য।

বহু বিরল গুণে সমৃদ্ধ হলেও শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচনার শুধু একটি অসম্পূর্ণতা মনকে পীড়া দিতে থাকে। সাহিত্যবিচারে সমাজ-অর্থনৈতিক পটভূমিকার প্রসঙ্গটিকে একেবারেই বাদ দিয়ে যান তিনি। অথচ উপন্যাস হল সাহিত্যের এমন একটি শাখা যা আষ্টেপৃষ্ঠে সমকালীন সমাজজীবনের সঙ্গে বাঁধা। সব সাহিত্যসৃষ্টিই জীবনসম্ভব। তবু কাব্য এমন-কি নাটকও কিছু পরিমাণে অ্যাবস্ট্রাকশনের কারবারী, কিন্তু উপন্যাস যেন পুরোপুরি মাটি আঁকড়ে চলে সর্বাঙ্গ দিয়ে ঠিক সরীসৃপের মতো। তাই যে জীবনের সঙ্গে এর এমন অব্যবহিত সম্বন্ধ তার কথা কোথাও কিছুমাত্র না এলে আফসোস থেকেই যায়। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্যই এ সম্বন্ধে অবহিত। নিজের মুখেও তিনি উপন্যাস এবং সমাজের নিবিড় সম্বন্ধের কথা বলেছেন। কিন্তু সমালোচনাকালে লেখক নিছক সৃষ্টিরূপেই আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখেন। এই রূপেই এমন নিবদ্ধদৃষ্টি থাকেন তিনি যে, রচনাগুলির কালানুক্রমও তাঁর স্মরণে থাকে না। অবশ্য এমন অঘটন একবারই ঘটেছে। নৌকাডুবিকে চোখের বালির পূর্ববর্তী উপন্যাস হিসেবে আলোচিত হতে দেখি তাঁর গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে। অবশ্য এই চ্যুতি এক হিসাবে আদৌ অস্বাভাবিক নয়। সৃষ্টির সব ক্ষেত্রে নিয়ত প্রাগ্রসর রবীন্দ্রনাথ হঠাৎ উপন্যাস রচনায় এমন অভাবিতভাবে পশ্চাৎপদ হবেন সমালোচক ভাবতেই পারেন নি সে কথা। প্রথম সংস্করণের এই ত্রুটির ছিদ্রপথে অনন্যমনা সমালোচকের সৃষ্টিরূপমগ্নতাই লক্ষ্যগোচর হয়ে ওঠে।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের আর-একটি মহৎ গুণের কথা না বললে বক্তব্য অসম্পূর্ণ থাকে। পশ্চিমী, বিশেষ ইংরেজী সাহিত্যে সুপণ্ডিত লেখক তাঁর আলোচনায় প্রতীচ্যের সমালোচনা রীতি স্বীকরণে ঋদ্ধ, কিন্তু রচনাকে তিনি পশ্চিমী পণ্ডিতের উদ্ধৃতিতে কণ্টকিত করেন নি কোথাও। যথার্থ পণ্ডিত বলেই পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের চটুলতা পরিহার করতে পেরেছেন।

আর-একজন সফল সমালোচকের কথা দিয়ে উপন্যাস প্রসঙ্গ শেষ করি। তাঁর 'কবিতা' পত্রিকাতে বুদ্ধদেব বসু রবীন্দ্র-উপন্যাসের সমালোচনা শুরু করেন। কবিতার পাতাতেই যখন প্রথম তাঁর গোরা, ঘরে বাইরে বেরোতে আরম্ভ করে তখনই তিনি বহুজনের দৃষ্টির লক্ষ্য হয়ে উঠলেন। পরে 'রবীন্দ্রনাথ : কথাসাহিত্য' গ্রন্থের প্রকাশ। এ আলোচনায় তাঁর দেখার ভঙ্গি, বলার ভাষা আর ঢঙ একেবারে আলাদা। এখানে বলার গুণে সমালোচক-পাঠকের দূরত্ব গেছে ঘুচে। ঘুচেছে আরো এই কারণে যে কলম কথা বলেছে মুখের ভাষার সুরে। অনুভবের সজীব সরসতা কাগজ শোষণ করে নিতে পারে নি। সমালোচক আস্বাদন করেছেন এক-একটি সৃষ্টিকে নানা দিক থেকে। পাঠক বা শ্রোতাও সঙ্গী হয়ে উঠছেন তাঁর। সমালোচনা যেন সাহিত্যরস আস্বাদনের এক অদৃশ্য যৌথ আসর।

বুদ্ধদেব উপন্যাসেও দেখেছেন কবি রবীন্দ্রনাথকে। তাঁর ধারণা, মূলত কবি রবীন্দ্রনাথ কবির কলমেই লিখেছেন উপন্যাস যদিও উপন্যাসের জগৎ অনেকটাই স্বতন্ত্র। সেখানে ঘটনার জটিল জাল পাততে হয়; সে ঘটনা আবার কালের দৈর্ঘ্যকে আশ্রয় করে থাকে, উপাদান বহুলতাকে বিন্যস্ত করতে হয় নিপুণ গৃহিণীপনায় যার মধ্যে একটা হিসেবী বুদ্ধিকে সদা সক্রিয় রেখে চলতে হয়। এ কাজ বুদ্ধদেবের মতে ঠিক রবীন্দ্রনাথের মতো কবির নয়। তাই রবীন্দ্রনাথ উপন্যাস নামক বস্তুটিকে বানিয়ে নিয়েছেন নিজের মতো করে— যার মধ্যে ঘটনার জটিলতা, কাহিনীর দূরগামিতা নেই, মূলত যার আশ্রয় মানব মনের বিচিত্র গতি, বিচিত্র হাওয়া বদল। আর যৎসামান্য ঘটনাই বা ঘটনাকল্প কিছু মনের সেই হাওয়া বদলের উপলক্ষ। অর্থাৎ প্লট নয়, থীম রবীন্দ্র-উপন্যাসের উপজীব্য। তাই প্রতিভার প্রবণতা অনুযায়ী ক্ষীণতণু উপন্যাসেই রবীন্দ্রনাথের সার্থকতা। তিনি নিজের ধাতু অনুযায়ী যে বৃত্ত রচনা করেছেন উপন্যাসের আকৃতি ও প্রকৃতির বিশিষ্টতা নিয়ে তার বাইরে পা বাড়ালে তাঁর বিপদ। সেই বিপদ ঘটেছে 'নৌকাডুবি'তে। শুধু আয়তনের বিপুলতা নিয়েও 'গোরা' সার্থক বিষয়ের মহত্ত্বে ও মাহাত্ম্যে।

বুদ্ধদেব কবিত্ব আর উপন্যাসের যে দূরত্ব অনুমান বা কল্পনা করে সিদ্ধান্তে এসেছেন সে সম্পর্কে প্রশ্ন থেকে যায়। উপন্যাস নামক বস্তুটি অনড় নয়— দেশে দেশে তার কত ক্রম-উন্মোচিত বিচিত্র চেহারা, কত বিচিত্র সম্ভাবনা। কিন্তু যাই হোক, বুদ্ধদেবের সমালোচনা সম্ভোগের সামগ্রী এ সম্বন্ধে তর্ক নেই।

উপন্যাস ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের স্পষ্ট উচ্চারিত মত আমরা শুনেছি। বৃহদায়তন তথ্যভারাক্রান্ত এক ধরনের ইংরেজি নভেলকে তিনি কাঁঠালের সঙ্গে তুলনা করেছেন। প্রকৃতিরাজ্যের যে ফলটি চেহারায় খুব সুদৃশ্য নয়, ভক্ষ্যও নয় ফলাকাঙ্ক্ষী কোনো এককের। সৃষ্টির আকারের বৃহত্ত্ব বা উপাদানের বহুলতা রবীন্দ্রনাথকে নিস্পৃহ করেছে এমন ভাবা কিন্তু অসংগত। ভুললে চলবে না রবীন্দ্রনাথ মহাকাব্যগুলির পরম ভক্ত, বিশেষত মহাভারতের। আসলে উপন্যাসগুলির ভূরিপরিমাণ অণুপুঙ্খতাকে তাঁর মনে হয়েছে আবান্তর ভার— Bell-এর ভাষায় যে irrelevant details আচ্ছন্ন করে significant form-কে। তা ছাড়া জীবনাভিজ্ঞার যে মহত্ত্বে মহাকাব্যিক আয়তন সহনীয় হয় এই-সব স্বল্পবিত্ত উপন্যাসে তার কতটুকু পাই? রবীন্দ্রনাথ এই কারণেই টুর্গেনিভ-এর মতো লেখককে পছন্দ করতেন অবান্তর বর্জনে ওস্তাদ যিনি, যাঁর উপন্যাসে পাই মেদবিহীন মজ্জাসার শিল্পিত মূর্তিকে। পাঠক রবীন্দ্রনাথের এই পছন্দ-অপছন্দ লেখক রবীন্দ্রনাথকে চিনে নিতে সাহায্য করে।

রবীন্দ্রনাথের ছোটো গল্পের আলোচনায় বুদ্ধদেব সানন্দে জানিয়েছেন গীতিকবিতা এবং ছোটো গল্প যেহেতু ধাতুতে মিলে যায় তাই ছোটোগল্পকার হিসেবে রবীন্দ্র প্রতিভা সহজেই স্বপথচারী ও স্বধর্মাচারী থেকেই চূড়ান্ত সার্থকতায় পৌঁছতে পেরেছে। বুদ্ধদেব আর একটি তথ্য জানাতে ভোলেন নি, যখন ছোটো গল্প লেখায় কলম ধরেছেন রবীন্দ্রনাথ তখন ইংরেজি সাহিত্যে ছোটো গল্প তার সুস্পষ্ট চেহারা নিয়ে দেখা দেয় নি। রবীন্দ্রনাথ যে বাংলা ছোটো গল্পে পথিকৃৎ এ কথা আমরা সকলেই জানি কিন্তু বসু-উল্লিখিত ঐ তথ্যটি সম্পর্কে আমরা অবহিত থাকি না। বুদ্ধদেব গল্পগুচ্ছের সমালোচনায় শুধু রাবীন্দ্রিক গল্পের বিষয় ও রূপবৈচিত্র্যের কথাই বলেন নি, ভাষা ব্যবহারের বিচিত্র চেহারা নিয়েও মন্তব্য করেছেন। তাঁর সিদ্ধান্ত, ভাষার সঙ্গে কাহিনীর এমন অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক রবীন্দ্র কথাসাহিত্যের বাইরে অন্যত্র দুর্লভ। প্রসঙ্গত এসেছে গল্পগুচ্ছের সঙ্গে ছিন্নপত্রের সম্বন্ধের কথা। বুদ্ধদেবের সবচেয়ে মূল্যবান মন্তব্য মনে হয় এই যে কবি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গভীর সম্বন্ধে বাঁধা হলেও গল্পগুলি নিছক কাব্যধর্মী নয়, বরং অধিকাংশ গল্পই বাস্তব রসপুষ্ট আর সংঘাত-সংক্ষুব্ধ। এ-সব গল্প জুড়ে দেখা দিয়েছে বাংলার গ্রামজীবন— প্রকৃতি আর মানুষ। সেই জীবনের হৃৎস্পন্দন এ গল্পের মূলধন।

রবীন্দ্র-ছোটো গল্পের আলোচনায় আর যাঁরা কলম ধরেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। তাঁর 'রবীন্দ্রনাথের গল্প ও বাংলার সমাজ' গ্রন্থে আছে পঞ্চাশটি গল্পের আলোচনা। ভূদেব চৌধুরীর গ্রন্থের নাম যদিও 'বাংলা সাহিত্যের ছোট গল্প ও গল্পকার' তবু এ গ্রন্থ বস্তুত রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে। প্রথম ও

শেষ পরিচ্ছেদটির বিষয় শুধুই রবীন্দ্রনাথ। শেষ পরিচ্ছেদের নাম সূর্যাবর্ত। মিহির রায়ের বই 'রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ'। ইনিও বেছে নিয়েছেন নিজস্ব রুচি অনুযায়ী শ্রেষ্ঠ গল্পগুলিকে। সরস ভাষায় ও সাবলীল ভঙ্গিতে লেখা উপভোগ্য একটি সমালোচনা 'কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ'। লেখক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

বাংলাদেশের ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়েছে আনোয়ার পাশার 'রবীন্দ্র ছোটো গল্প'— প্রথম খণ্ড।

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ এবং বিপুল সংখ্যক চিঠিপত্রকে (যার বিরাট এক অংশ এখনো অপ্রকাশিত) প্রধানত অবলম্বন করে যে-সব আলোচনা হয়েছে তা তো স্বভাবতই নানা বিষয়াশ্রয়ী। আমরা কাজের সুবিধার জন্য মোটামুটি তাকে কয়েকটি উপবিভাগে ভাগ করে নিয়েছি এ কথা আগেই বলা হয়েছে।

সাহিত্যতত্ত্ব নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে মোট তিনটি গ্রন্থ। প্রবাসজীবন চৌধুরীর 'রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যাদর্শ' এবং 'রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যদর্শন'। দুটিই মূল্যবান রচনা। প্রথমটিতে সাহিত্যের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ এবং সেই সূত্র ধরেই আত্মদর্শন প্রসঙ্গ এসেছে রবীন্দ্র সাহিত্যতত্ত্বালোচনায় যা অনিবার্যভাবে আসে। দ্বিতীয় গ্রন্থখানি বিশেষভাবে রবীন্দ্র-নিবন্ধ-অবলম্বী রচনা। কিন্তু তা হলেও প্রকাশভঙ্গিতে অনুসৃত হয়েছে দার্শনিক লেখকের বৈচারিক পদ্ধতি। অমূল্য সরকারের 'রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব'কে বিশদ আলোচনা বলা যায়।

রবীন্দ্রনাথ নিজে সাহিত্যতত্ত্ব সম্বন্ধে যে প্রবন্ধগুলি লিখেছেন তার মধ্যে তাত্ত্বিকের সুবদ্ধ চিন্তাপ্রণালীর প্রকাশ ঘটে নি। বস্তুত রবীন্দ্রনাথ বিশুদ্ধ তাত্ত্বিক নন, স্রষ্টা। তাঁর সব কথাই সৃজনকালীন অভিজ্ঞতা, অনুভব ও উপলব্ধির ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে। তাই তাত্ত্বিকের বিচার তাঁর উপলব্ধির জগৎটাকে পুরোপুরি ধরতে পারে না। তা ছাড়া নানা সময়ে এক এক ভাবনার ঝোঁকে বক্তব্য ঈষৎ বিপথগামীও হয়েছে সাময়িক অনবধানতায়। ফলে বক্তব্য আগাগোড়া সুশৃঙ্খল সংগতির সূত্রে বাঁধা পড়ে নি। এই ঈষৎ অবিন্যস্ত ভাবনারাজিকে পরিচ্ছন্ন তত্ত্বের অতিনির্দিষ্ট সূত্রে ধরতে যাবার বিড়ম্বনাও আছে।

রবীন্দ্রনাথের নন্দনতত্ত্বের সঙ্গে সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের কোনো কোনো অংশের (রসবাদ) ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকলেও সে যোগ অন্যত্র ক্ষীণ। উপনিষদের আনন্দবাদের সঙ্গে বোধ হয় তার সম্বন্ধটি নিবিড়। আবার পশ্চিমের নান্দনিক দৃষ্টিকে রবীন্দ্রনাথ কোনো কোনো ক্ষেত্রে গ্রহণ বা স্বীকরণ করে নিয়েছেন। কিন্তু যাই করুন সবটাই স্রষ্টার অভিজ্ঞতার জগৎ থেকে। নন্দনতাত্ত্বিক হিসেবে রবীন্দ্রনাথের এই অবস্থিতির স্বরূপটি কিন্তু কোনো আলোচনাতেই খুব একটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি।

পরবর্তীকালে রাবীন্দ্রিক নন্দনতত্ত্ব নিয়ে ব্যাপক আলোচনার যে আয়োজন দেখা যায় এই পর্বের রচনাকে তার সূচনা বলা যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের ছন্দ-চিন্তা এবং সেইসঙ্গে রবীন্দ্রসৃষ্ট ছন্দের প্রসঙ্গ নিয়ে রীতিমতো সমৃদ্ধ আলোচনা আরম্ভ করেছিলেন প্রবোধচন্দ্র সেন রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালেই, তাঁর তিরোধানের দশ বছর আগে। প্রবোধচন্দ্রের 'ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ' এই প্রমাণ্য বইটি প্রকাশিত হয় পরে। এতে রবীন্দ্রনাথের ছন্দের আলোচনায় পটভূমি হিসেবে এসেছে অন্য কবিদের ছন্দের কথা। তুলনাত্মক বিচারে রবীন্দ্রসৃষ্টির স্বরূপ হয়েছে স্পষ্টতর। দীর্ঘ কাব্যজীবন জুড়ে ছন্দের যে বিচিত্র সাধনা তার পরিচয়ও উদ্‌ঘাটিত হয়েছে বিশদভাবে। এ ক্ষেত্রে আলোচনাকে পরিচ্ছন্ন রূপ দেবার জন্য প্রবোধচন্দ্র যথেষ্ট মনোনিয়োগ করেছেন তাঁর সৃষ্ট ও ব্যবহৃত পরিভাষার উপর।

রবীন্দ্রনাথের গদ্য রচনার অনেকখানি জুড়ে আছে তাঁর দর্শন ও ধর্ম চিন্তা। শান্তিনিকেতন প্রবন্ধ গ্রন্থগুলি —যা তাঁর আশ্রম মন্দিরের উপাসনান্তিক ভাষণের লিখিত রূপ এবং তাঁর ভাবনাজগতের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ তা নিয়ে বস্তুত কোনো আলোচনাই হয় নি। সাধারণভাবে গদ্যনিবন্ধ সমালোচনায় উৎসাহী লেখকের অভাব। তা ছাড়া অধিকারের প্রশ্ন থাকে।

সাধারণ সাহিত্যজগতের বোদ্ধা পাঠক এ গ্রন্থ পড়ে আনন্দ পান কিন্তু এ নিয়ে কলম ধরার জন্য অতিরিক্ত

গুণের দরকার। দার্শনিক বা দর্শনের পণ্ডিতেরা রবীন্দ্রনাথের অর্থাৎ কবির দর্শনে আগ্রহ বোধ করেন না বা করেন নি বহুদিন । প্রথম ব্যতিক্রম সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ । বিখ্যাত ইংরেজি গ্রন্থখানি লিখে এ ক্ষেত্রে পুরোধা পুরুষ হয়ে আছেন তিনি । বাংলায় হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রদর্শন' গ্রন্থের উল্লেখ আমরা অন্যত্র কাব্য প্রসঙ্গে করে এসেছি কেননা গ্রন্থটি মূলত সেই কাব্যেরই আলোচনা যার উপর পড়েছে রবীন্দ্রদর্শনের প্রভাব । বিশ্বভারতীর দর্শন বিভাগ থেকেই রবীন্দ্র দর্শনকে যথার্থ মর্যাদা ও গুরুত্ব দিয়ে বিচার ও বিশ্লেষণের কাজ শুরু হয়েছে আমাদের আলোচ্য পর্বের দু'বৎসর পর । কিন্তু আলোচ্য পঁচিশ বছর এদিক থেকে বন্ধ্যা । কিন্তু ধর্মচিন্তা নিয়ে একটি বই পাই । তারকনাথ ঘোষের গ্রন্থের নাম 'রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা' ।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা নিয়ে মনোযোগী মূল্যবান কাজ হয়েছে, সংখ্যাতেও কম নয় গ্রন্থগুলি, এ খুবই তৃপ্তির কথা । বেশ কয়েকটিতে নিবিষ্ট দৃষ্টি, গভীর বোধ এবং তার সঙ্গে নিপুণ বিশ্লেষণের সমন্বয় ঘটেছে । প্রতিভা গুপ্তর 'শিক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ', প্রফুল্লকুমার সরকারের 'গুরুদেবের শান্তিনিকেতন' (শিক্ষাচিন্তাই এর উপজীব্য), মোহিনীমোহন ভট্টাচার্যের 'মনীষী রবীন্দ্রনাথ' (গ্রন্থের অর্ধাংশ শিক্ষা বিষয়ক), সাধারণ আলোচনা । ভুজঙ্গভূষণ ভট্টাচার্যের 'রবীন্দ্র শিক্ষাদর্শন' এবং প্রবোধচন্দ্র সেনের 'রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা চিন্তা' এ দুটি গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখের দাবি করতে পারে শিক্ষাজগতের নানাদিকস্পর্শী বিশদ বিশ্লেষণের জন্য । সুনীলচন্দ্র সরকারের 'রবীন্দ্র শিক্ষাদর্শন' একটি প্রামাণ্য গবেষণা গ্রন্থ । এর মধ্যে জীবনের ব্যাপক চালচিত্রে দেখা হয়েছে— শিক্ষার ভূমিকাটিকে । একটা জিনিস লক্ষ করবার । রবীন্দ্র শিক্ষাচিন্তা নিয়ে যাঁরা ভেবেছেন, লিখেছেন তাঁদের অধিকাংশই শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত । আসলে এ খুবই স্বাভাবিক । রবীন্দ্র শিক্ষাচিন্তা শুধু তাত্ত্বিক চিন্তামাত্র নয়, রবীন্দ্রনাথ তার প্রয়োগক্ষেত্রে নিজেকে নিয়োজিত করেছেন আমরণ এবং শরীরী মূর্তি দেবার সাধনা করেছেন সেই চিন্তাকে । কাজেই স্থান এবং প্রতিষ্ঠান অবিচ্ছেদ্য হয়ে আছে শিক্ষাচিন্তা বা শিক্ষা-একস্‌পেরিমিন্টের সঙ্গে । এখানে উল্লেখ্য আর-একটি গবেষণা গ্রন্থ লেখা হয়েছে শান্তিনিকেতনেই ইংরেজী ভাষায় । লেখক হিমাংশুভূষণ মুখোপাধ্যায় । পরে জীবেন্দ্র দে-র একটি গবেষণা গ্রন্থও প্রকাশ পায় । রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র অনাথনাথ বসু থেকে এই লেখক পর্যন্ত অধিকাংশই বিশ্বভারতীর শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্র বিনয় ভবনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন । এই গ্রন্থগুলির বাইরে নানা গুণী লেখক অন্য প্রসঙ্গের সঙ্গে এ বিষয়ে আলো ফেলেছেন দেখতে পাই । যেমন প্রমথ চৌধুরী তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে শিক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত কিন্তু মহার্ঘ মন্তব্য করেছেন । এ ছাড়া প্রত্যক্ষ ছাত্রদের বহু স্মৃতিকথাকে আশ্রয় করে প্রকাশ পেয়েছে শিক্ষক রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র কথা যা রীতিমতো উদ্দীপক । পরম আনন্দের কথা যে রবীন্দ্রচিন্তার এই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দিকটি গবেষকদের দ্বারা উপেক্ষিত হয় নি । রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তামূলক সব নিবন্ধগুলি ভাষান্তরিত হলে এবং এই গবেষণাকর্মগুলিও ইংরেজিতে প্রকাশিত হলে বিশ্বের বৃহত্তর শিক্ষানুরাগীর কাছে রবীন্দ্র শিক্ষাচিন্তা ও বিবিধ পরীক্ষার আশ্চর্য জগৎটি উদ্‌ঘাটিত হবে । ইতিমধ্যে বহির্বঙ্গে এবং বহির্বিশ্বে রবীন্দ্র শিক্ষাদর্শন নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা শুরু হয়েছে । হয়তো অদূর ভবিষ্যতে প্রকাশিত হবে সেগুলি । যাঁরা এ কাজে রত হয়েছেন তাঁরা বাংলা ভাষার মাধ্যমেই জেনেছেন শিক্ষাবিদ ও শিক্ষক রবীন্দ্রনাথকে ।

বিজ্ঞান নানাভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে রবীন্দ্রনাথকে । রোম্যান্টিক কবি হলেও তিনি বিজ্ঞানমনস্ক । তাঁর বিবিধ রচনার মধ্যে শুধু নয়, তাঁর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ইতিবৃত্তেও এর বিচিত্র প্রমাণ মেলে । সাধ্যমতো বিজ্ঞানের বিচিত্র শাখার সঙ্গে তিনি পরিচিত রেখেছেন নিজেকে । বিজ্ঞানের বই পড়া ছিল তাঁর নিত্য অভ্যাসের অন্তর্গত । প্রবীণতার প্রান্তে এসেও ছেদ পড়ে নি এতে । বস্তুত এ কথাই বলতে হয় যে তাঁর বিশিষ্ট রোম্যান্টিক মন বিজ্ঞানের সঙ্গে সন্ধি করেই ক্ষান্ত নয়, প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক সত্য এবং বিবিধ বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন থেকে আহরণ করে নেয় সেই সম্পদ যা উপলব্ধিকে গভীর, অনভবকে প্রসারিত এবং কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করে তোলে । বিজ্ঞানের আলো আর

রোম্যান্টিক মনের আলো-আঁধারি এ দুয়ের বিরোধ সম্পর্কে বহুজনের মন-গড়া ধারণা ধ্বস্ত হয় রবীন্দ্রনাথকে দেখলে। শুধু বিজ্ঞান-বিষয়ক গদ্য লেখা নয় সৃষ্টির নানা শাখায় বিশেষ কবিতা ও গানে বিজ্ঞানচেতনা যে বর্ণালী রচনা করেছে তার তুলনা নেই।

অতএব এমন একটি উদ্দীপক বিষয় নিয়ে বেশ-কয়েকটি গ্রন্থ প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু সে প্রত্যাশা পূরণ হয় নি। অবশ্য গ্রন্থাকারে না হলেও শতবর্ষ বা অন্য উপলক্ষে প্রকাশিত সংকলন গ্রন্থে এ সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে কিছু। এ বিষয়ে রচিত গ্রন্থ মাত্র দুটি পাই— আমিয় মজুমদারের লেখা রবীন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক মানস এবং বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানচেতনা। দুজনই রবীন্দ্রজীবন ও সাহিত্যের ক্রমবিকাশের পথ ধরে আলোচনা করেছেন।

স্বদেশ, রাষ্ট্র অথবা বিশ্ব নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সব চিন্তার লক্ষ্য মানুষ— মানব সমাজ। তাঁর দেশ মৃন্ময় নয় চিন্ময় এ কথা তাঁরই মুখে আমরা শুনি পুনঃ পুনঃ এবং তাঁর স্বদেশ শেষ পর্যন্ত বিশ্বে ব্যাপ্ত এবং বিশ্বমানব তাঁর দৃষ্টির লক্ষ্য। সেখানে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, রাষ্ট্রের বেড়া নেই। তাই রবীন্দ্রমনে স্ব সমাজ বা স্বদেশ চিন্তার সঙ্গে বিশ্বচিন্তা সর্বত্র অন্বিত। তাঁর রাজনীতি সহজ জীবননীতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে পা ফেলে। এই চেতনাকে জাগরূক রেখে অধিকাংশ লেখক তাঁর স্বদেশ, সমাজ, রাজনীতি এবং বিশ্বচিন্তা নিয়ে আলোচনা করেছেন। এ বিষয় গ্রন্থের সংখ্যা খুব কম নয়। এখানে মোটামুটি কালানুক্রমিকভাবে তালিকা উপস্থিত করছি। প্রফুল্লকুমার সরকারের 'জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ', শিশির সেনগুপ্ত ও জয়ন্তকুমার ভাদুড়ীর 'বাহির বিশ্বে রবীন্দ্রনাথ', শৈলেশ বসুর 'জাতীয় জীবনে রবীন্দ্রনাথ', সুধীর করের 'জনগণের রবীন্দ্রনাথ' এবং অমল হোমের 'পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ'। তথ্যনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত হোম তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে চিঠিপত্র ও অন্যান্য দলিলের সাহায্যে রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তাকে উপস্থিত করেছেন। কিন্তু সব শেষে প্রকাশিত গ্রন্থটিকে সবচেয়ে মূল্যবান গবেষণাকর্ম হিসেবে চিহ্নিত করতে হয়। নেপাল মজুমদার তাঁর 'ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ' পর পর ছয় খণ্ডে প্রকাশ করেছেন; উপস্থিত করেছেন রবীন্দ্রচিন্তার বৃহৎ বিচিত্র জগৎকে। এই প্রথম ব্যাপক, গভীর দৃষ্টি দিয়ে তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণে রবীন্দ্রনাথের জীবনব্যাপী চিন্তা ও কর্মের মূল্যায়ন ঘটল। এ আলোচনায় দেশ কালের বিচিত্র ঘটনার অভিঘাতে রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষিত হয়েছে। সময়ের সঙ্গে চলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ কখন কোথায় পিছিয়ে পড়েছেন, কখন স্বকালের সঙ্গী, আবার কখন স্বকালের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করেছেন চেতনার অনন্যতায়— সবই দেখিয়েছেন লেখক ভূরি পরিমাণ তথ্যের সন্নিবেশ ও বিন্যাসে। এ-জাতের এক-একটি গ্রন্থ রবীন্দ্রচর্চাকে বহুদূর অগ্রসর করে দেয়।

রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণ ও ভ্রমণসাহিত্যকে নিয়ে যে কটি বই লেখা হয়েছে এই পর্বে তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের 'বিশ্বভ্রমণে রবীন্দ্রনাথ'। নির্মলকুমারী মহলানবিশের 'কবির সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে' এবং একই বছরে মৈত্রেয়ী দেবীর 'বিশ্বসভায় রবীন্দ্রনাথ' প্রকাশিত হয় শুভময় ঘোষ অনূদিত মস্কো-প্রকাশিত 'সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে বেশ-কিছু চিঠিপত্র স্থান পেয়েছে আর গ্রন্থশেষে মস্কোতে রবীন্দ্র-চিত্র প্রদর্শনী চলাকালে একজন সাংবাদিকের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎকারের এক মূল্যবান বিবরণ সংযোজিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে তাঁর সম্পাদনায় 'ছিন্নপত্র', 'পথে ও পথের প্রান্তে' এবং 'ভানুসিংহের পত্রাবলী' সহ 'পত্রধারা' নামে চিঠিপত্রের প্রকাশ শুরু হয়। অতঃপর তাঁর লেখা অজস্র চিঠি খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করে চলেছে বিশ্বভারতী চিঠিপত্র নাম দিয়ে। কিন্তু তার বাইরেও অসংখ্য পত্র আছে যা আজও অপ্রকাশিত। অসংগৃহীত চিঠিও আছে প্রচুর। চিঠি নিয়ে প্রথম গবেষণা গ্রন্থ লেখেন বীণা মুখোপাধ্যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য বিষয়টির উপর আলো ফেলেছেন প্রমথনাথ বিশী তাঁর 'রবীন্দ্র বিচিত্রা' গ্রন্থের 'রবীন্দ্রনাথ ও চিঠিপত্র' প্রবন্ধে।

রবীন্দ্রসৃষ্টির মধ্যে নানা মাধ্যমের সুযোগে প্রচার লাভ করেছে রবীন্দ্রনাথের সংগীত। একদা রবি ঠাকুরের

গান বা রবিবাবুর গান নামে যাকে চিহ্নিত করা হত এই ব্যাপক প্রচারের কারণে তা বাঙালি জীবনের অঙ্গ হয়ে উঠেছে ক্রমশ এবং নতুন নামে অভিহিত হয়েছে— রবীন্দ্রসংগীত। রবীন্দ্রনাথের ভবিষ্যৎ বাণী অন্তত দৃশ্যত সফল করে আজ বাঙালি সুখে দুঃখে রবীন্দ্রসংগীত গাইছে। এই উপলক্ষে শান্তিনিকেতনের বাইরে প্রধানত কলকাতা মহানগর এবং অন্যত্র সংগীত শিক্ষায়তন গড়ে উঠেছে অনেকগুলি। স্বভাবতই সংগীতের সম্বন্ধে আলোচনার আধিক্য প্রত্যাশিত হয়ে ওঠে এবং সেই প্রত্যাশা পূরণ করে যে-সব গ্রন্থ প্রণীত হয়েছে তাদের সংখ্যা কিছুমাত্র কম নয়। কিন্তু সংখ্যাধিক্যই নয়, রীতিমতো সমৃদ্ধ রচনা পাই বহু গুণী ও যথার্থ অধিকারীর কলমে। এঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গজন আছেন, আর আছেন পরবর্তী কালের শিল্পী, শিল্পী-অধ্যাপক ও সংগীত-অধ্যাপক ও রসবেত্তা। ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর 'রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণী সঙ্গম', সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রবীন্দ্রনাথের গান', শান্তিদেব ঘোষের 'রবীন্দ্রসংগীত', কালিদাস নাগের 'সুরের গুরু রবীন্দ্রনাথ' প্রথম পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য। 'রবীন্দ্রসংগীত' এই প্রামাণ্য গ্রন্থটিতে রবীন্দ্রনাথের সংগীত ভাবনার বিশদ উপস্থাপন ঘটেছে, সেইসঙ্গে কথা ও সুরের সমন্বয় এবং সুর সৃষ্টিতে স্বাধীন স্বপথচারিতায় রাবীন্দ্রিক সার্থকতার কথা গ্রন্থের মধ্যে আছে। পরবর্তী পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের 'সংগীতে রবীন্দ্রনাথ', নীহারবিন্দু সেনের 'রবীন্দ্র সংগীতের ক্রমপর্যায়', নারায়ণ চৌধুরীর 'সংগীত পরিক্রমা', সুবিনয় রায়ের 'রবীন্দ্র সংগীত সাধনা', প্রফুল্লকুমার দাসের 'রবীন্দ্র সংগীত প্রসঙ্গ', শুভ গুহঠাকুরতার 'রবীন্দ্র সংগীতের ধারা', কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্র সংগীতের ভূমিকা' এবং 'রবীন্দ্র সংগীতের নানা দিক'। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের আলোচনায় প্রসঙ্গত এসেছে ধ্রুপদ, ধামার, কীর্তন এবং বাউল। প্রফুল্ল দাস এবং সুবিনয় রায়ের গ্রন্থে রবীন্দ্রসংগীত-শিক্ষার্থীর অবশ্য জ্ঞাতব্য নানা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আছে। শুভ গুহঠাকুরতার রচনায় রবীন্দ্রসংগীতের ক্রমবিকাশের ধারা বিশেষভাবে আলোচিত। দুই বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থে আছে নানা প্রসঙ্গের মধ্যে গায়কী, সংগীতরুচি এবং শ্রোতার কথা। আর-একটি অতি উপভোগ্য প্রবন্ধ— "রবীন্দ্রনাথের গদ্যগান"। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী তাঁর এক প্রবন্ধগ্রন্থে বিষয়টি নিয়ে চমৎকার আলোচনা করেছেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য প্রভাত গুপ্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত গীতবিতানের রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী সংখ্যা। এতে সংগীত এবং তার সঙ্গে একান্ত সম্পৃক্ত নৃত্য ও নাটক নিয়ে আলোচনা স্থান পেয়েছে। এতে মূল্যবান একটি তালিকা আছে রবীন্দ্রসংগীতের রেকর্ডের।

সন্তোষকুমার দে এবং কল্যাণবন্ধু ভট্টাচার্য 'কবিকণ্ঠ' নাম দিয়ে এক সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এর মধ্যে রেকর্ড, টেপ এবং চলচ্চিত্রে বিধৃত ও প্রকাশিত রবীন্দ্রসংগীতের সম্পূর্ণ তালিকা এবং কবির নিজের কণ্ঠে গাওয়া গানের রেকর্ডের তালিকা মুদ্রিত হয়েছে। কাজটি অনুসন্ধিৎসু এবং গবেষকদের সহায়ক হবে।

চিত্রশিল্পী হিসেবে রবীন্দ্রনাথের প্রকাশ তাঁর শেষ জীবনে। বলা যায় জীবনের শেষ ষোলোটি বছর জুড়ে চিত্রী রবীন্দ্রনাথের তৎপরতা। আর তার ফল আড়াই হাজার ছবি। সংখ্যাটি তাঁর গানের সংখ্যাকে ছাড়িয়ে গেছে। কিন্তু শেষ জীবনের এই সৃষ্টি সাধারণ্যে খুব বেশি প্রকাশিত হয় নি। প্রদর্শনী প্রথম হয়েছে ১৯৩০ সালে বিদেশে। প্রথম প্যারিসে, পরে য়ুরোপ ও এশিয়ার নানা দেশে এবং অবশেষে ভারতে। এ দেশে প্রদর্শনীর আয়োজন তো বিরল ঘটনা। মহানগরকেন্দ্রিক সামান্য যে আয়োজন তাতে দর্শক সংখ্যা নগণ্য। প্রকাশ বা প্রচারের অতি সীমাবদ্ধতা, সাধারণ্যে ছবির বোধের নিতান্ত অভাব, কবির শেষ বয়সে খেয়াল খুশিতে আঁকা, অতএব উপেক্ষণীয় সৃষ্টি এই ভ্রান্ত ধারণা ইত্যাদি কারণে মনোযোগী দৃষ্টির দাক্ষিণ্য বিশেষ জোটে নি ছবির ভাগ্যে। দু-একটি পত্রপত্রিকায় কিছু ছবি ছাপা হয়েছে বটে কিন্তু শিল্পীর তিরোধানের পরই বিশ্বভারতীর দু খণ্ড 'চিত্রলিপি' এবং ললিত কলা একাডেমীর একটি অ্যালবামে প্রকাশিত হয় মোট আঁকা ছবির অতীব সামান্য অংশ। অনাগ্রহের আবহাওয়া কাটতে কিছু সময় লাগে। তারপর রবীন্দ্র-অন্তরঙ্গ কজনশিল্পী এবং শিল্পীরসিক সবাক হতে শুরু

করেছেন। বলা বাহুল্য, চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে প্রণীত গ্রন্থ নয় প্রবন্ধেরই প্রকাশ ঘটেছে বেশি এবং উৎকর্ষের দিক থেকেও তার গুরুত্ব। অধিকাংশ লেখা 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'য় প্রকাশিত, কিছু বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের শতবার্ষিক স্মারক গ্রন্থে মুদ্রিত বা পুনর্মুদ্রিত। নন্দলাল বসু এবং যামিনী রায় এই দুজনের লেখা বিশেষ মূল্যবান। অবনীন্দ্রনাথের প্রকীর্ণ মন্তব্য পাই স্মৃতিকথা জাতীয় লেখায় এবং চিঠিপত্রে। চিত্রীর শেষ বয়সের এই উচ্ছ্বসিত আত্মপ্রকাশকে অবনীন্দ্রনাথ আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্‌গারের সঙ্গে তুলনা করেছেন। নন্দলাল বসুর "রবীন্দ্র চিত্রকলা" এবং যামিনী রায়ের "রবীন্দ্র চিত্রকলা" প্রবন্ধ দুটি রীতিমতো গুরুত্বপূর্ণ। নন্দলাল শিল্পী-দৃষ্টির সজীবতা ও স্বাতন্ত্র্যের কথা বলেছেন। যামিনী রায় বলেছেন ছবির শক্ত শিরদাঁড়ার কথা। প্রতিমা দেবীর "গুরুদেবের ছবি" এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। শিল্পী-সমালোচক বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় এবং পৃথ্বীশ নিয়োগী যে প্রবন্ধ লেখেন (প্রথম জনের "রবীন্দ্র প্রসঙ্গ", "রবীন্দ্রনাথের ছবি ও সাহিত্য" এবং "রবীন্দ্রচিত্রকলা", দ্বিতীয় জনের "রবীন্দ্রনাথের চিত্র") সেগুলিকেই রীতিমতো সমৃদ্ধ সমালোচনা বলা যায় যা নিছক মন্তব্যের সীমাকে বহু দূর অতিক্রম ক'রে যথার্থ মূল্যায়নের স্তরে পৌঁচেছে এবং সেইসঙ্গে পাঠককে দিয়েছে দৃষ্টির দীক্ষা। অবনীন্দ্র-নন্দলালের পরবর্তী প্রজন্মের এই দুই লেখক প্রতীচ্যের নব্য শিল্পান্দোলনের সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিত এবং নব্য শিল্পসমালোচনার সঙ্গেও। বিনোদবিহারী রবীন্দ্রচিত্র সমালোচনায় নতুন মাত্রা যোগ করেছেন শিল্প ও সাহিত্যের পারস্পরিক সম্বন্ধের কথা নিয়ে এসে। রবীন্দ্রসৃষ্টির এ দুটি জগৎ যে পরস্পর বিচ্ছিন্ন কিংবা বিরোধী নয়, দুই সৃষ্টির ধারার সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিত লেখক সে কথা জানিয়েছেন প্রবল অধিকারবলে, সুদৃঢ় প্রত্যয়ে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করি, রবীন্দ্রনাথের সামান্য কিছু ছবির সঙ্গে পরিচিত এবং রবীন্দ্রসাহিত্যের সঙ্গে প্রায় পরিচয়হীন একজন বিদেশী সমালোচক যাঁর নাম উইলিয়ম আর্চার তাঁর লেখা একটি প্রবন্ধের ("The art of Unconscious") দ্রুত সিদ্ধান্ত এ সম্বন্ধে বিভ্রান্তির প্রথম উন্মেষ। তারপর কেউ কেউ তারই প্রতিধ্বনি করতে পেরেছেন অনায়াসে রবীন্দ্র চিত্রসৃষ্টির সমগ্র সম্ভার সম্বন্ধে অবহিত না থাকার ফলে অথবা প্রাসঙ্গিক রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রতি প্রয়োজনীয় মনোযোগ না দেওয়ার কারণে। বিনোদবিহারীর দায়িত্বপূর্ণ সংহত রচনা শুধু রবীন্দ্রশিল্প সমালোচনা নয়, ব্যাপক শিল্পসমালোচনার ক্ষেত্রেই এক নতুন দিগন্তের সন্ধান দিল। এ রচনার ভার এবং ধার দুইই সমান। কেননা এর পশ্চাৎপটে আছে প্রভূত অভিজ্ঞতা, গভীর উপলব্ধি আর তারই সঙ্গে তীক্ষ্ণ মনন। বিনোদবিহারী বাংলা শিল্পসমালোচনার জগতে এক স্মরণীয় ল্যাণ্ডমার্ক।

রবীন্দ্রনাথের ছবি নিয়ে যে একটি বই লেখা যেতে পারে এই ভাবনাকে প্রথম লালন করে যিনি একটি গ্রন্থ রচনা করে ফেলে অনন্যতার পরিচয় দিয়েছেন তিনি হলেন মনোরঞ্জন গুপ্ত। তাঁর 'রবীন্দ্র চিত্রকলা' বইটির প্রকাশ রবীন্দ্র তিরোধানের অব্যবহিত পরেই ১৯৪৯ সালে। এ গ্রন্থে আপন চিত্রসৃষ্টির সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কিছু কথা এবং স্রষ্টাজীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্তের সংকলন আছে। কয়েকটি চিত্র প্রকাশ করা হয়েছে গ্রন্থে। উত্তরকালের সমস্ত গবেষক এই ক্ষীণতনু গ্রন্থের লেখককে পরম শ্রদ্ধায় স্মরণ করবেন রবীন্দ্রচিত্রচর্চার অন্যতম প্রধান পথিকৃৎ হিসেবে। আর দুটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে এর পর— শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রনাথের রেখার কাব্য' এবং মৃণাল ঘোষের 'রূপদক্ষ রবীন্দ্রনাথ'।

পূর্বসূরীদের বিশেষত বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের প্রেরণায় এবং রবীন্দ্র চিত্রকলা ও সাহিত্যের প্রবল আকর্ষণে বর্তমান লেখকও এ বিষয়ে প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন 'অমৃত' পত্রিকায় দুটি এবং 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি'তে একটি। এই লেখাগুলির মধ্যে দিয়েই লেখকের পরবর্তী ব্যাপক আলোচনার সূত্রপাত।

নিছক কাব্য বা সাহিত্যের শাখা বিশেষের আলোচনার বাইরে রবীন্দ্রসাহিত্য নিয়ে নানা দিক থেকে আলোচনা করেছেন বহু গুণী লেখক। বিচিত্র বিষয়াশ্রিত এই গ্রন্থগুলি এই পর্বের গৌরব। উপায়ান্তর না থাকায় একটু এলোমেলোভাবে এখানে এগুলির উল্লেখ করতে হচ্ছে। কেননা বিন্যাসের কোনো সহজ উপায় হাতে নেই।

কালানুক্রম খানিকটা মানার চেষ্টা থাকবে। পরিসরের কথা ভেবে এগুলি সম্পর্কে মন্তব্যের লোভ সংবরণ করতে হচ্ছে। সৃষ্টিগুলি হল সরোজকুমার বসুর 'রবীন্দ্র সাহিত্যে হাস্যরস', সুকুমার সেনের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থের স্বয়ংসম্পূর্ণ তৃতীয় খণ্ড : রবীন্দ্রনাথ, শশিভূষণ দাশগুপ্তের 'ত্রয়ী', মলয়া গঙ্গোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্র সাহিত্যে প্রেম', বিমানবিহারী মজুমদারের 'রবীন্দ্র সাহিত্যে পদাবলীর স্থান', প্রমথনাথ বিশীর 'রবীন্দ্র কাব্যের পাঠান্তর', বিনায়ক সান্যালের 'রবিতীর্থ', হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কবির কথা', খগেন্দ্রনাথ মিত্রের 'রবীন্দ্র শিশু সাহিত্য পরিক্রমা', শশিভূষণ দাশগুপ্তের 'উপনিষদের পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ', আদিত্য ওহদেদারের 'রবীন্দ্র সাহিত্য সমালোচনার ধারা', সন্তোষকুমার দে-র 'রবিবাসরে রবীন্দ্রনাথ', সুখময় মুখোপাধ্যায়ের 'বাংলা সাহিত্যে নবরাগ', সজনীকান্ত দাসের 'রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য', সুকুমার সেনের 'পরিজন পরিবেশে রবীন্দ্র-বিকাশ', বুদ্ধদেব বসুর 'সঙ্গ, নিঃসঙ্গতা ও রবীন্দ্রনাথ', হরপ্রসাদ মিত্রের 'রবীন্দ্রসাহিত্য পাঠ', মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর 'রবিপরিক্রমা' (ঢাকা), হীরেন্দ্রনাথ দত্তের 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর', শীতাংশু মৈত্রের 'রবীন্দ্রনাথ ও পাশ্চাত্য', সুধাকর চট্টোপাধ্যায়ের 'ভারতীয় সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ', সুধীর চক্রবর্তীর 'রবীন্দ্রনাথ মনন ও শিল্প', বিমলকুমার দত্তের 'রবীন্দ্রসাহিত্যে গ্রন্থাগার', অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রবিতান'। অধিকাংশ গ্রন্থই রবীন্দ্রশতবর্ষের পরবর্তী রচনা। যে বইগুলির উল্লেখ করা হল তার বিষয় বৈচিত্র্য লক্ষ করার মতো। রবীন্দ্রশতবার্ষিকী প্রচুর গ্রন্থের প্রেরণা অথবা উপলক্ষ হয়েছে।

উপলক্ষের কথা যখন উঠল, তখন প্রসঙ্গটিকে সেরে নেওয়া যাক আর-এক জাতের প্রকাশনার উল্লেখ করে— বহু জনের রচনা নিয়ে সম্পাদিত গ্রন্থ বা সংকলন গ্রন্থ। নিঃসন্দেহে বলা যায় সংকলনগুলি পাঠককে নানাভাবে লাভবান করেছে। এরই কল্যাণে আমরা এত বিচিত্র বিষয়ের আলোচনা পেয়েছি এবং পেয়েছি অনেক লেখকের কাছ থেকে। ফেলে আসা যুগের স্বর্গত লেখকদের মূল্যবান রচনার পুনর্মুদ্রণ ঘটেছে এই উপলক্ষে। এটিও মস্ত লাভ। যাঁরা গ্রন্থ লেখার উৎসাহ বোধ করবেন না কখনো অথচ রবীন্দ্রসাহিত্যবেত্তা এমন লেখকদের লেখা পাওয়া গেল এই উপলক্ষ-ভিত্তিক সংকলনের সূত্রেই। সম্পাদিত গ্রন্থগুলির সংখ্যা কম নয়, সুতরাং নির্বাচন ছাড়া গত্যন্তর নেই। এতে অবিচারের আশঙ্কাও আছে এ কথা সবিনয়ে স্বীকার করে নিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করি।

সম্পাদিত গ্রন্থগুলির মধ্যে আছে পুলিনবিহারী সেনের সম্পাদনায় রবীন্দ্রায়ণ দুই খণ্ড, প্রবোধচন্দ্র সেনের রবীন্দ্রনাথ : বিশ্বভারতীর শ্রদ্ধাঞ্জলি, গোপাল হালদারের রবীন্দ্রনাথ, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রস্মারক গ্রন্থ, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের রবি-প্রদক্ষিণ, হরপ্রসাদ মিত্রের রবীন্দ্র-চর্চা, দেবীপদ ভট্টাচার্যের রবীন্দ্রনাথ, নীলরতন সেনের রবীন্দ্রবীক্ষা, অনিলকুমার সিংহের সূর্যাবর্ত, দক্ষিণারঞ্জন বসুর মধুবাংশ্চ। বিশু মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্র সাগর সংগমে, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রনাথ : উত্তরপক্ষ — এই দুইটি সংকলন গ্রন্থ সম্বন্ধে এইটুকু বলি যে প্রথমটিতে বহু প্রাচীন লেখকের রচনা একত্র হয়েছে, তেমনি আবার বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সংকলন গ্রন্থে রবীন্দ্র-পরবর্তী যুগের কবি সাহিত্যিক সমালোচকদের কথা আছে অর্থাৎ তাঁর লক্ষ্য নব্যযুগের দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ। সুধীর চক্রবর্তীর রবীন্দ্রনাথ : মনন ও শিল্প একটু ভিন্ন জাতের সংকলন গ্রন্থ। জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের মহামানবের সাগর তীরে গ্রন্থে পাই ভারতের নানা ভাষার লেখক এবং বিশ্বের নানা ভাষাভাষী রবীন্দ্রানুরাগীর শ্রদ্ধাঞ্জলি। পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত এবং মূল ভাষা থেকে অনূদিত ফরাসীদের চোখে রবীন্দ্রনাথ এবং গোবিন্দনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ও হিমাংশুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের তথ্যবহুল বিপুল গ্রন্থ রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা—এ সবই প্রকাশিত হয় শতবর্ষ উপলক্ষে। একেবারেই স্বতন্ত্র জাতের গবেষণামূলক গ্রন্থ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য -সম্পাদিত বিশ্বভারতী প্রকাশিত রবীন্দ্র জিজ্ঞাসা প্রথম খণ্ড। শতবর্ষে কলকাতা এবং কলকাতার বাইরে চব্বিশ পরগনা, হাওড়া, হুগলী, নদীয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চল থেকে বহুসংখ্যক স্মারকগ্রন্থের প্রকাশ ঘটে। বাংলার প্রতিষ্ঠিত কবি সাহিত্যিক ছাড়াও বহু গুণী পাঠক এই-সব সংকলন গ্রন্থের লেখক।

এই প্রসঙ্গেই উল্লেখ করি প্রয়াণ ও শতবর্ষ উপলক্ষে কিছু সাহিত্যপত্র বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিশ্বভারতী পত্রিকা, ও সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, বুদ্ধদেব বসুর কবিতা, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের পরিচয়। বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন একটি অপূর্ব স্মারক গ্রন্থ শতবর্ষে প্রকাশ করে অতুলচন্দ্র গুপ্তের সুদক্ষ সম্পাদনায় সম্পাদকের সংহত ঋদ্ধ মুখবন্ধ সহ। এ গ্রন্থেও অতীতকালের মূল্যবান রচনার সুন্দর সংকলন পাই। লেখকবৃন্দের মধ্যে আছেন নবীনচন্দ্র সেন, বিপিনচন্দ্র পাল, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, জগদীশচন্দ্র বসু, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুভাষচন্দ্র বসু, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, অরবিন্দ ঘোষ, যদুনাথ সরকার, রাজশেখর বসু, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিয় চক্রবর্তী, আবু সয়ীদ আইয়ুব, নরেশ সেনগুপ্ত, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অন্নদাশঙ্কর রায় প্রভৃতি, এবং চারজন শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু, যামিনী রায় ও দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী। পত্রিকাটি শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা, বৈদগ্ধ্য ও রুচির পরিচ্ছন্ন মূর্তি নিয়ে উপস্থিত হয়েছে বলেই উল্লেখে কিঞ্চিৎ পক্ষপাত প্রকাশ পেয়ে গেল।

বস্তুত শতবার্ষিকী উপলক্ষে আমরা রবীন্দ্রচর্চার একটা বিরাট কালকে হাতে পাই সংহত আকারে— রবীন্দ্র-প্রতিভার উন্মেষপর্ব থেকে শতবর্ষপূর্তি এই আশি বৎসরব্যাপী বিচিত্রমুখী মননের ছবি। এ শুধু রবীন্দ্রদর্শন নয় আমাদের আত্মদর্শনও।

কাব্যে শ্রদ্ধা নিবেদনের দৃষ্টান্তও অনেক। তার মধ্যে কয়েকটি উল্লেখ করি। সজনীকান্ত দাসের 'পঁচিশে বৈশাখ', বুদ্ধদেব বসুর 'বাইশে শ্রাবণ', বিষ্ণু দে-র 'তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ', অশোকবিজয় রাহার 'যেথা এই চৈত্রের শাল বন', মহম্মদ অজিজুল হকের 'রবীন্দ্র স্মরণে'। এ ছাড়া কয়েকটি বহুজনের কবিতার সংকলিত শ্রদ্ধার্ঘ্যও আছে যেমন প্রভাত বসু সম্পাদিত রবীন্দ্রনামা, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত কালপুরুষ, বিশু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত কবিপ্রণাম, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও কিরণশংকর সেনগুপ্ত সম্পাদিত শতাব্দীশতক, অসীম রাহা সম্পাদিত রবীন্দ্রনাথ : কবিকে নিবেদিত শ্রদ্ধাঞ্জলি, এবং ঢাকার ভারতীয় তথ্যকেন্দ্র প্রকাশিত রবীন্দ্র শতবর্ষ কবিতা সংকলন। এর মধ্যে প্রথমটি শুধু ১৯৪২এ প্রকাশিত। অন্যগুলি শতবর্ষকেন্দ্রিক।

অরুণ মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রবিতান রবীন্দ্র সমালোচনার সংকলন (১৮৭৮ থেকে ১৯১৩)।

রবীন্দ্রজীবনী রচনার ক্ষেত্রে প্রধান পুরুষ এবং পথিকৃৎ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। তাঁর 'রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্র সাহিত্য প্রবেশক' এক অবিস্মরণীয় কীর্তি একেবারে আক্ষরিক অর্থেই। কিন্তু এ গ্রন্থ ছাড়া আর দুটি জীবনী আছে তাঁর। এগুলি সীমাবদ্ধ পরিসরে সংক্ষিপ্ত রচনা— 'রবীন্দ্রজীবনকথা' এবং 'রবিকথা'। স্বল্প পরিসরে আরো যে কটি রবীন্দ্র জীবনী বা জীবনকথা লেখা হয়েছে তার মধ্যে আছে নলিনীকান্ত গুপ্তের 'রবীন্দ্রনাথ', কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়ের 'মহাকবির জীবনকথা', ক্ষিতীশ রায়ের 'আমাদের বিশ্বকবি', দক্ষিণারঞ্জন বসুর 'শতাব্দীর সূর্য', ধীরেন্দ্রলাল ধরের 'আমাদের রবীন্দ্রনাথ', নৃপেন্দ্রকুমার বসুর 'আমাদের বিশ্বকবি'। শেষোক্তটি অবনীন্দ্রনাথের ভূমিকাযুক্ত।

জীবনী আলোচনা নয় কিন্তু এরই কাছাকাছি কিছু রচনা আছে যেখানে রবীন্দ্রসংসর্গে-আসা নানা মনীষী ও বড়ো মাপের মানুষের এবং কিছু ঘটনার কথা উপজীব্য যা কবির ব্যক্তিত্বকে বোঝার সহায়ক এবং জীবনীর অঙ্গবিশেষ। এমন রচনার মধ্যে আছে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রনাথের চেনাশোনা মানুষ'। প্রতিমা দেবীর 'নির্বাণ' অন্যত্র আলোচিত হলেও এ পর্যায়ের অন্তর্গত কেননা এ পুস্তিকায় শেষ কটি দিনের পুঙ্খতাময় বর্ণনা আছে। রবীন্দ্র ব্যক্তিত্বকে নিয়ে লেখা বেশ কয়েকটি বই আছে। এতে আছে ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিকের কথা অথবা সমগ্রভাবে ব্যক্তিত্বের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন বা বিশ্লেষণ চেষ্টা। এগুলির মধ্যে এমন লেখাও আছে যা শুধু রবীন্দ্রনাথকে চিনে নিতে সাহায্য করে এমন নয় তাঁর সমগ্র জীবন ও সৃষ্টিকে দেখার এক পরিপ্রেক্ষিত রচনা করে দেয়। আর প্রকাশভঙ্গিতেও নিছক আলোচনার গণ্ডি অতিক্রম করে সৃষ্টির সীমান্তকে স্পর্শ করে। অন্নদাশঙ্কর

রায়ের 'জীবন শিল্পী' এমনই এক রচনা। রবীন্দ্র ব্যক্তিত্বকে নিয়ে লেখা গ্রন্থের সংখ্যা কিছুমাত্র কম নয়। যে নির্বাচিত তালিকাটি উপস্থিত করছি তা দেখলেই সেটা স্পষ্ট হবে। দিলীপকুমার রায়ের 'তীর্থংকর', প্রমথ চৌধুরীর 'রবীন্দ্রনাথ', যতীন্দ্রমোহন বাগচীর 'রবীন্দ্রনাথ ও যুবাসাহিত্য', অমলেন্দু দাসগুপ্তের 'ঋষি রবীন্দ্রনাথ', নন্দগোপাল সেনগুপ্তের 'অধিনায়ক রবীন্দ্রনাথ', প্রবোধচন্দ্র সেনের 'ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ', শশিভূষণ দাশগুপ্তের 'টলস্টয় গান্ধী রবীন্দ্রনাথ', বিষ্ণু দে-র 'রবীন্দ্রনাথ ও শিল্প সাহিত্য', ভবানী শংকর চৌধুরীর 'জিজ্ঞাসু রবীন্দ্রনাথ', অরবিন্দ পোদ্দারের 'রবীন্দ্রমানস', কানাই সামন্তের 'রবীন্দ্র প্রতিভা', গুণময় মান্নার 'রবীন্দ্রনাথ', দ্বিজেন্দ্রলাল নাথের 'রবীন্দ্রমন ও রবীন্দ্র সাহিত্য', ধীরেন্দ্র দেবনাথের 'রবীন্দ্র দৃষ্টিতে মৃত্যু', অরুণ মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্র সমীক্ষা', সুধীর করণের 'লোকায়ত রবীন্দ্রনাথ', সুধীর করের 'কল্যাণব্রতী রবীন্দ্রনাথ', শচীন অধিকারীর 'সহজ মানুষ রবীন্দ্রনাথ' এবং 'পল্লীর মানুষ রবীন্দ্রনাথ', মার্জোরী সাইক্‌সের 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' (অনুবাদ : হীরেন্দ্রনাথ দত্ত)।

এরই কাছাকাছি রচনা হল স্মৃতিকথা। এগুলির গুরুত্ব উত্তরকালের পাঠকের কাছে খুব বেশি। রবীন্দ্রনাথের মতো একটি ব্যক্তিকে পাওয়ার জন্য যে-কোনো দেশকে বহু কাল প্রতীক্ষা করতে হয়। এ ব্যক্তিত্ব এমন বিশাল, এমন বিচিত্র, এমন সম্পূর্ণ যে একে কাছে পাওয়া এক দুর্লভ অভিজ্ঞতা, সৌভাগ্য তো বটেই। কাছে পাওয়া কথাটা বলা হল বটে কিন্তু মনে মনে বলতে হয় কাছে থেকেও কী অদ্ভুত সুদূর— বিশ্বের সমান মাপের দু-একটি পুরুষের ক্ষণিক সান্নিধ্য ছাড়া যিনি সমগ্র জীবন নিদারুণভাবে নিঃসঙ্গ, বহুজন সংসর্গেও চির একাকী, আমরণ জটিল কর্মে বদ্ধ থেকেও চিরমুক্ত এমন এক রহস্যময় পুরুষকে চোখে দেখা নিঃসন্দেহে দুর্লভ জীবনাভিজ্ঞা। সেই সৌভাগ্যবঞ্চিত উত্তর কালের মানুষের কাছে এই স্মৃতিকথাগুলির গুরুত্ব অপরিমেয়। এগুলিতে যে বর্ণনা আছে তার প্রত্যক্ষতা, যে অনুভবের প্রকাশ আছে তার সজীব টাটকা স্বাদ না দেখার দুঃখ কিছু তো ভোলায়। সব লেখাই যে সমমানের এমন স্বভাবতই নয় ; কিন্তু এখানে যা পাই তাই লাভ। অধিকন্তু ন দোষায়।

এই স্মৃতিকথাগুলির মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করি। অবশ্য ব্যক্তিত্বকে নিয়ে লেখা বইগুলিতেও বেশ-কটি স্মৃতিকথা আছে। তার উল্লেখ আগেই করেছি। তাই এখানে খুব প্রয়োজন ছাড়া আর পুনরাবৃত্তি করছি না। স্মৃতিকথামূলক স্মরণযোগ্য রচনাগুলির মধ্যে আছে— অবনীন্দ্রনাথ ও রানী চন্দের 'ঘরোয়া', 'জোড়াসাঁকোর ধারে', সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি', চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কবি স্মরণে', অসিতকুমার হালদারের 'রবিতীর্থে', প্রমথনাথ বিশীর 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন', মৈত্রেয়ী দেবীর 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ', রানী চন্দের 'গুরুদেব', 'আলাপচারি-রবীন্দ্রনাথ' এবং বুদ্ধদেব বসুর 'সব পেয়েছির দেশে'। এর মধ্যে বেশ-কয়েকটি লেখায় রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতিকে অনুভব করা যায়, যেন স্পর্শ করা যায় তাঁর ব্যক্তিত্বকে।

যদিও এই-সব রবীন্দ্রস্মৃতিকথায় আর রবীন্দ্রশিক্ষাদর্শের আলোচনায় বার বার শান্তিনিকেতন-প্রসঙ্গ এসেছে তবু শান্তিনিকেতন আশ্রম এবং বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠান-বিষয়ক গ্রন্থ স্বতন্ত্র আলোচনার অপেক্ষা রাখে। সাহিত্য, গান, ছবি যেমন রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি তেমনি এই আশ্রম-বিদ্যালয় ও আশ্রমজীবন এবং বিশ্বভারতী তাঁর বিশেষ সৃষ্টি। আর কে না জানে এই সৃষ্টি শুধু তাঁর অনুভব কল্পনা আর স্বপ্নের জগৎ থেকে বেরিয়ে আসে নি, তাঁকে নিয়োজিত রেখেছে সমস্ত জীবন। ১৯০১ থেকে শেষ যাত্রা কিংবা বলা উচিত মৃত্যুর আগে যতক্ষণ তাঁর জ্ঞান ছিল, তাঁকে ভাবতে হয়েছে এই সৃষ্টি নিয়ে, সে ভাবনার মধ্যে দুর্ভাবনার অংশই বেশি। সারা জীবন দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করতে, ভিক্ষাপাত্র নিয়ে দেশ-বিদেশে ঘুরতে হয়েছে এই প্রতিষ্ঠানটির জন্যই। যেন হাজার ভাবনার কেন্দ্র ছিল শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতীর ভাবনা। তার কারণ এই সৃষ্টির মধ্যেই তাঁর জীবন ও জগৎ ঘিরে বিচিত্র স্বপ্ন রূপ পেতে চেয়েছে : শিক্ষার আনন্দময়, মুক্ত, বিচিত্রমুখী রূপের প্রতিষ্ঠা শুধু নয়, তাঁর আরো বড়ো স্বপ্নকে রূপ দিতে চেয়েছেন এই আশ্রমে— জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, দেশ রাষ্ট্র নির্বিশেষে মানুষকে মানুষের কাছে আনার স্বপ্ন। মানবমৈত্রীর এক পীঠস্থান রচনার স্বপ্ন।— যত্র বিশ্বম্ ভবত্যেকনীড়ম্। তাই আমরণ তাঁকে বহু

দুঃখ সহ্য করতে হয়েছে এটিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য। এটি তাঁর জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। বলা একেবারেই বাহুল্য, শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী কোনো আদর্শের সার্থক রূপায়ণ নয়— বস্তুত আদর্শ জিনিসটি তো প্রতিষ্ঠার জিনিস নয়, সে চির অধরা। তার অভিমুখিতাকেই রূপ দেবার চেষ্টা সম্ভব। আর এখানে রবীন্দ্রনাথের সেই চেষ্টার রূপকে দেখতে পাই। তাতে স্খলন পতন ত্রুটির শেষ নেই— না থাকাই অস্বাভাবিক। কিন্তু মানুষকে নিয়ে এত বড়ো ভাবনা পৃথিবীতে খুব কমই হয়েছে এ কথা স্বীকার না করলে সত্যকে অস্বীকার করা হয়। যে-সমস্ত সংবেদনশীল মানুষ এখানে এসেছেন— এদেশের বা বিদেশের ছাত্র, অধ্যাপক, শিল্পী, জ্ঞানী, গুণী তাঁদের হৃদয়ের তন্ত্রীতে আশ্রমগুরু একটি সুরের স্পন্দন জাগাতে পেরেছিলেন। নানা জনের নানা লেখা পড়লে তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। এই লেখকেরা হতে-চাওয়া শান্তিনিকেতনকে ভালোবেসেছিলেন আর ভালোবেসেছিলেন তারই প্রতিষ্ঠাভূমি আশ্রমকে। বহু স্মৃতিকথায় তারই অভিব্যক্তি। আমরা এখানে শুধু গুটি কয়েক নাম করেই ক্ষান্ত হব। অজিত চক্রবর্তীর 'ব্রহ্মবিদ্যালয়', অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ও জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'শন্তিনিকেতন আশ্রম'। উইলিয়ম পিয়ার্সনের (অনুবাদক : অমিয়কুমার সেন) 'শান্তিনিকেতন-স্মৃতি', প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী', সুধীরঞ্জন দাসের 'আমাদের শান্তিনিকেতন'। আগে অন্য প্রসঙ্গে উল্লেখ করলেও নির্দ্বিধায় আবার দুটি অসামান্য রচনার নাম করব এখানে। প্রমথনাথ বিশীর 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন' এবং বুদ্ধদেব বসুর 'সব পেয়েছির দেশে'। পরস্পর অনুপূরক এ দুটি-রচনা— একটি আশ্রমিক ছাত্রের, অন্যটি রবীন্দ্রানুরাগী আশ্রম-অতিথির। একটিতে ভিতরে বসে দেখা আর অন্যটিতে বাইরে থেকে এসে দেখা। কিন্তু দুটি দেখাই শুধু চোখের দেখা নয়, যদিও সে দেখাও আশ্চর্য সুন্দর। দুই কবি-লেখকের অতি সংবেদনশীল মনে শান্তিনিকেতনের সুরটি বেজে উঠেছে ঠিক ঠিক। তাই তাঁদের লেখায় আশ্রমের শরীরী রূপের বর্ণনায় মিলে আছে সেই বস্তু যাকে চোখে দেখা যায় না— আনন্দের আভাস-স্পন্দিত এক ভাবের পরিমণ্ডল। কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আশ্রয়স্থল কিংবা ট্যুরিজ্‌ম্‌-এর মানচিত্রে-চিহ্নিত ভ্রমণবিলাসীর শান্তিনিকেতন নয়, রাবীন্দ্রিক শান্তিনিকেতনের আবহটি, তার প্রাণস্পন্দনটি ধরা আছে বলেই উত্তরকালের পাঠকেরা সাধুবাদ জানাবেন এই দুই লেখকের কলমকে।

এ কথা বলেছি আগেই যে এই পর্বের লেখকেরা শুধু বয়স্ক পাঠককেই গুরুত্ব দেন নি, ভেবেছেন ছোটোদেরও কথা। শিশু ও কিশোর পাঠকদের জন্য বই লেখা হয়েছে অজস্র। যার মধ্যে আছে কিশোর কবির কথা কখনো গদ্য গল্পে কখনো পদ্যে কিংবা তাঁকে নিয়ে লেখা হয়েছে নাটিকা। ছোটোদের জন্য বলেই আয়তনেও ছোটো —পুস্তিকা যা আশ্রয় করে গুটি কয়েক পাতাকেই। দামেও কম। ছোটোদের জন্য লেখা জীবনীই বেশি। যাঁরা লিখেছেন তাঁদের কজনের কিছু লেখার উল্লেখেই সীমাবদ্ধ রাখছি পরিচয়কে।— কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়ের 'ছোটদের রবীন্দ্রনাথ', দেবনারায়ণ গুপ্তের 'তোমাদের রবীন্দ্রনাথ', বিজনবিহারী ভট্টাচার্যের 'প্রভাতরবি', 'নবীন রবির আলো', বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্যের 'কিশোর কবি' (জীবনচরিতমূলক নাটক), লীলা মজুমদারের 'এই যা দেখা', এবং 'কবি কথা', যামিনীকান্ত সেনের 'কবি দাদুর গল্প', 'ছেলেদের রবীন্দ্রনাথ', 'ছোট্ট রবি', সুধীন্দ্র রাহার 'রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলা', হরিপদ চক্রবর্তীর 'কিশোর কবি', মণি বাগচীর 'রবির আলো', অরুণ চক্রবর্তীর 'বিশ্বকবি', অশোক গুহের 'রবি যেদিন কবি হল', গীতা মুখোপাধ্যায়ের 'ছোটদের রবীন্দ্রনাথ'। এর বাইরে আছে আরো কত লেখা যা ছোটোদের পত্রিকার পাতায় দেখা দিয়েছে দিনের পর দিন, নতুন প্রজন্মের পাঠক-মনে একটি বিরাট মানুষের ছবি এঁকে দিয়ে গেছে নানা রঙে।

নিষ্ঠা এবং পরিশ্রমকে যুক্ত করে আর-এক ধরনের কাজ হয়েছে যা বিশেষভাবে উত্তরকালের অনুসন্ধিৎসু এবং গবেষকদের দিকে তাকিয়ে লেখা। এগুলির স্বতন্ত্র মূল্য, স্বতন্ত্র মর্যাদা। সারস্বত জগতে এই কর্মীদের গুরুত্ব অপরিসীম এ কথা আমরা ক্রমশ উপলব্ধি করতে পারছি। এই কাজগুলির মধ্যে আছে পঞ্জী, নির্দেশিকা,

অভিধান এবং একটু ভিন্ন জাতের সংকলন গ্রন্থ । এর মধ্যে আছে— প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্র বর্ষপঞ্জী', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয়', পুলিনবিহারী সেনের 'রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প : তথ্যপঞ্জী', সুকুমার সেনের 'রবীন্দ্ররচনা-ভূনির্দেশিকা', নিরঞ্জন সেন ও দিলীপ মিত্রের 'রবীন্দ্র-দিনপঞ্জী', নির্মলেন্দু রায়চৌধুরীর 'রবীন্দ্র-নির্দেশিকা', হীরেন্দ্রনাথ ঘোষালের 'রবীন্দ্র-সাহিত্যের অভিধান', চিত্তরঞ্জন দেব ও বাসুদেব মাইতির 'রবীন্দ্র-রচনাকোষ' এবং সোমেন্দ্রনাথ বসুর 'রবীন্দ্র-অভিধান' । ভিন্ন জাতির সংকলনের মধ্যে পাই গোপাল রায়ের 'রবীন্দ্রনাথের হাস্য-পরিহাস', বিনয়েন্দ্রনাথ সিংহের 'রবীন্দ্র-সুভাষিত', মদনমোহন গোস্বামীর 'রবীন্দ্রবচন-সমুচ্চয়' ।

রবীন্দ্রচর্চার লিখিত রূপের মোটামুটি একটি পরিচয় উপস্থাপিত করা গেল । কিন্তু অপরাধবোধ যুক্ত হয়ে রইল এর সঙ্গে কেননা অনবধানতায় হয়তো বহু মূল্যবান রচনার নাম উল্লেখ করা হল না । বিশেষত সংকলন-গ্রন্থগুলিতে যে-সব প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে তার লেখকদের নামের বহু অনুল্লেখ নিঃসন্দেহে ত্রুটির মধ্যেই পড়ে। ক্ষমা প্রার্থনা ছাড়া গত্যন্তর নেই ।

ভূমিকায় জানিয়েছি, রবীন্দ্রচর্চার জগৎটি বিরাট আর সেইসঙ্গে বিচিত্র । এও বলেছি, এর সবটাকে ধরাছোঁয়ার মধ্যে পাওয়াও যাবে না । আলোচনার উপসংহারে শুধু গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি চর্চাক্ষেত্রের উল্লেখ করব, অন্যথায় আলোচনা থেকে যাবে নিতান্তই অসম্পূর্ণ ।

আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় নানা স্তরে নির্দিষ্ট পাঠক্রমের সাহায্যে রবীন্দ্রনাথ নিয়ে অধ্যয়ন-অধ্যাপনা করে আসছে দীর্ঘদিন ধরেই । অবশ্য স্বীকার করতেই হবে এই রবীন্দ্রচর্চা বস্তুত রবীন্দ্রসাহিত্যের ক্ষেত্রেই সীমায়িত । রবীন্দ্র-চিন্তা ও মননের অন্য দিকগুলি আজও তেমন গুরুত্ব পেল না অ্যাকাডেমিক জগতে । দর্শন-চর্চায় রবীন্দ্রদর্শন কুণ্ঠা-কৃপণ স্বীকৃতি পেয়েছে এক-আধটি বিশ্ববিদ্যালয়ে । সমাজ-চিন্তার বৃহৎ ক্ষেত্রে তাঁর বাঞ্ছিত অনুশীলন কোথাও হয় বলে জানা নেই । রবীন্দ্রনাথ ছাড়া অন্য মনীষীদেরও কি হয় ?

বিশ্বভারতী ও রবীন্দ্রভারতী এই দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ে হয়তো রবীন্দ্রচর্চার ক্ষেত্র একটু বিস্তৃত। সৃষ্টির কয়েকটি শাখা সেখানে স্পৃষ্ট হয় নানা বিভাগে । রবীন্দ্রসাহিত্য, রবীন্দ্রসংগীত, রবীন্দ্র-চিত্রকলা প্রধানত। বিশ্বভারতীতে এ ছাড়াও পল্লী-চিন্তার দিকও চর্চার অন্তর্গত, বিশেষত শ্রীনিকেতনকেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে । নিছক পাঠ্যের বাইরে শিক্ষার ব্যাপক ক্ষেত্রে রবীন্দ্র-অনুগামিতার একটি ক্ষেত্র বিশ্বভারতীতে আজও আছে নানা প্রাতিকূল্যের মধ্যেও । আছে বটে তবে তার পরিধি ক্রমে সংকীর্ণ হচ্ছে এবং প্রাণশক্তি স্তিমিত হয়ে পড়ছে । এর কারণ-নির্দেশ কিংবা বিশদ বিচার যেহেতু স্বতন্ত্র নিবন্ধের অপেক্ষা রাখে তাই প্রসঙ্গটি উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হতে হচ্ছে । শুধুমাত্র রবীন্দ্রচর্চার জন্যই একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে কলকাতায় । রবীন্দ্রচর্চা ভবন বা টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটুট । জন্মকালের প্রাথমিকতা কাটিয়ে ক্রমশ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে । পঠন-পাঠন ছাড়া প্রকাশনাও এর অঙ্গীভূত । পশ্চিমবাংলার সব বিশ্ববিদ্যালয়েই গবেষণা-স্তরে রবীন্দ্রনাথ একটি বিশেষ স্থান জুড়ে আছেন । বাংলা বিভাগগুলিতে যে গবেষণাকর্ম চলে তার মধ্যে রবীন্দ্র-বিষয়ক নিবন্ধের সংখ্যা উপেক্ষণীয় নয় । সাহিত্যের বাইরে অন্য বিভাগের গবেষণার রবীন্দ্রনাথ থাকলেও তার ক্ষেত্র অতি সীমিত । রবীন্দ্র গবেষণা প্রসঙ্গে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য এবং শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবন। যুক্ত থাকলেও বস্তুত রবীন্দ্রভবন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্বতন্ত্র একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠান । এর অভিলেখাগারে সংগৃহীত আছে রবীন্দ্রনাথ সংক্রান্ত বিপুল তথ্যরাশি—রবীন্দ্রনাথের পাণ্ডুলিপি, চিঠিপত্র, ছবি, গানের রেকর্ড, আলোকচিত্র— এছাড়া দলিল দস্তাবেজ আর নানা দেশ থেকে আহরণ-করা রবীন্দ্রনাথকে লেখা মনীষীর চিঠিপত্র, নিবন্ধ, সংবাদপত্র-কর্তিকা ইত্যাদি ইত্যাদি । এক কথায় রবীন্দ্রনাথকে জানার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানের এত বড়ো আকর আর কোথাও নেই । স্বভাবতই শুধু বিশ্বভারতীর নয়,

সারা দেশের এবং বিদেশের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য রবীন্দ্র গবেষণাগার হল শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবন। রবীন্দ্র ভবনের অভিলেখাগার এবং গ্রন্থাগার দুই-ই রীতিমতো সমৃদ্ধ।

এ কথা বলতেই হবে রবীন্দ্রসৃষ্টির সর্বাধিক প্রচারিত শাখা হলো সংগীত। কলকাতায় অবস্থিত গীতবিতান, দক্ষিণী, রবিতীর্থ, সুরঙ্গমা প্রভৃতি রবীন্দ্রসংগীত প্রতিষ্ঠানগুলির দান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হয়। কলকাতার বাইরেও নির্ভরযোগ্য সংগীত প্রতিষ্ঠান রবীন্দ্রসংগীতের প্রসারে কাজ করে চলেছে। সংগীত-শিক্ষায়তন ছাড়াও বেতার এ ক্ষেত্রে একটি বড়ো ভূমিকা নিয়েছে। কলকাতা বেতার কেন্দ্রের রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষার আসরটি এ গানকে জনপ্রিয় হতে বিশেষ সাহায্য করেছে। এই নিয়মিত শিক্ষার আসরের বাইরেও সাধারণ প্রচারিত অনুষ্ঠানের একটি বড়ো অংশ রবীন্দ্রসংগীত। কোনো একজন সংগীত-স্রষ্টা বোধ হয় বিশ্বের আর কোনো দেশের কোনো কেন্দ্রে এমনভাবে সময়ের 'সিংহভাগ' অধিকার করে নেই। অন্তত আমাদের জানা নেই। অবশ্য বাংলাদেশের ঢাকা বেতার কেন্দ্রের ভূমিকাও এ প্রসঙ্গে স্মরণ করতে হয়। বেতার-মাধ্যম ছাড়া কলকাতা এবং কলকাতার বাইরে রবীন্দ্রসদন এবং অন্যান্য প্রেক্ষাগৃহে প্রায় নিয়মিত অনুষ্ঠানও রবীন্দ্রসংগীতকে জনপ্রিয় ও জনগ্রাহ্য হতে সাহায্য করেছে প্রভূত। প্রখ্যাত গায়ক-গায়িকাদের দানও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

রবীন্দ্র নাট্যাভিনয় অবশ্য এমন নিয়মিত, এমন ব্যাপক হয় নি। তবু বিভিন্ন প্রখ্যাত এবং জনপ্রিয় নাট্যগোষ্ঠী রবীন্দ্রনাটকের অভিনয় করেছেন। একদা শিশিরকুমার ভাদুড়ী কলকাতার রঙ্গালয়ে রবীন্দ্র নাটককে জনপ্রিয় হতে সাহায্য করেছিলেন। তিনি অবশ্য প্রধানত নিয়েছিলেন লঘু রসের কমেডি। আমাদের আলোচ্য পর্বে বহুরূপী গোষ্ঠী রবীন্দ্রনাথের দুরূহ নাটককেই মঞ্চস্থ করার দুঃসাহস দেখিয়েছে প্রথম। আর সে চেষ্টা আশ্চর্য সফলও হয়েছে। যে নাটককে রবীন্দ্র-অনুরাগীদের অনেকে পাঠ্য নাটক বলেই মনে করেছেন, যেগুলি ঠিক অভিনেয় নয়, বহুরূপী হাত বাড়িয়েছে সেই নাটকের দিকেই। রক্তকরবীর আশ্চর্য মঞ্চসাফল্য— পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে দিনের পর দিন অভিনয়ের আয়োজন নিঃসন্দেহে স্মরণীয় ঘটনা। রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাংকেতিক বা তত্ত্বনাট্য অভিনয়ের ক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের সংশয়, শঙ্কা কেটে গেল এই ঘটনায়।

রবীন্দ্রকবিতার আবৃত্তিও এমনি করে জনপ্রিয় অনুষ্ঠানে পরিণত হয়ে গেল। অবশ্য ঠিক এই পর্বে নয়, পরবর্তী পর্বে কবিতা আবৃত্তি, নাট্যপাঠ, গল্পপাঠ, ক্রমশ প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠেয়ের আসন অধিকার করল সংগীতের একাধিপত্য ঘুচিয়ে। আর এর ফলে সাহিত্যরস-আস্বাদন একক পাঠকের নিভৃত পাঠের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে এসে প্রকাশ্য আসরে বহুজনের সম্ভোগের বস্তু হয়ে দাঁড়াল। প্রাচীন সাহিত্যের কীর্তন মঙ্গলকাব্যের আসরের এক নব্য মূর্তি পেয়ে গেলাম আমরা। বেশ অনুভব করা যায় এই প্রক্রিয়া আস্বাদনে এনে দেয় এক নতুন মাত্রা। এক অভিনব উদ্দীপনা থাকে এর মধ্যে। অবশ্য স্বীকার করতেই হয়, নিভৃত পাঠের স্বাদ আলাদা, তার মধ্যে এমন অনেক কিছু আছে যাকে আসরে এসে হারাতে হয়।

দুটি দিনকে স্মরণ করে দুটি উৎসব রবীন্দ্রচর্চায় নৈমিত্তিক উপলক্ষ হিসেবে কাজ করে চলেছে। পঁচিশে বৈশাখ আর বাইশে শ্রাবণ এখন প্রায় আমাদের জাতীয় উৎসবে পরিণত। দেশের সীমা ছাড়িয়ে বিশ্বে ব্যাপ্ত। এর অনেকখানিই অসার এ কথা মেনে নিলেও সার্থকতাকে পুরোপুরি অগ্রাহ্য করা যাবে না। অন্তত নতুন প্রজন্মকে মনে রেখে এ কথা বলতেই হবে।

পঁচিশ বছরের এই-সব লেখালেখি, গান, নাটক উৎসব অনুষ্ঠানের দিকে তাকিয়ে যদি সন্তোষ আর তৃপ্তি অনুভব করি দেশের রবীন্দ্রচর্চায় তা হলে তা হবে রীতিমতো অসংগত। এই কথাটাই কাঁটার মতো বিঁধতে থাকে মনের মধ্যে যে আমার স্বদেশবাসীর বিপুল এক অংশ অশিক্ষিত, এমন-কি নিরক্ষর। রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রসৃষ্টির জগৎ থেকে তাঁরা বহু বহু দূরে। বিশ্বখ্যাত এই নামটি ঘরের মানুষের কাছে অপরিচিত। দেশে শিক্ষার অপ্রসার যতদিন আছে ততদিনই দুর্লঙ্ঘ্য হয়ে থাকছে এই অপরিচয়। আজ তথাকথিত 'দারিদ্র্যসীমার' নীচে যাঁরা তাঁদের

কথা বাদই দিলাম। নিছক অস্তিত্বের লড়াইয়ে যাঁদের স্বল্পায়ু জীবনের সব মুহূর্তগুলি ব্যয় করতে হয় শৈশব থেকেই তাঁদের রবীন্দ্রচর্চা!

বস্তুত আমাদের দেশে রবীন্দ্রচর্চা মুষ্টিমেয় ধনী এবং মধ্যবিত্তের মধ্যেই প্রধানত সীমাবদ্ধ। মধ্যবিত্তের স্তরবৈচিত্র্য সম্পর্কে সচেতন থেকেই কথাটি বললাম। অবশ্য কিছু ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। তবে ব্যতিক্রম তো ব্যতিক্রমই।

কিন্তু এবার অন্য একটি কথায় আসি চর্চাপ্রসঙ্গে। এই যে রবীন্দ্রচর্চার জগৎ এর মধ্যেও কিছু ফাঁক আর ফাঁকি আছে গভীর বেদনা আর লজ্জার সঙ্গে এ কথা স্বীকার করতেই হচ্ছে। আমরা অনেকেই রবীন্দ্রনাথকে প্রমোদের অঙ্গ করে নিয়েছি তাঁকে যথার্থভাবে গ্রহণ করি নি। প্রমোদের সূত্রে বাণিজ্যের কথাও এসে পড়ে। যিনি মানবের প্রতি মমতাবশত স্বদেশ, সমাজ এবং বিশ্বের নানা সমস্যায় ক্লিষ্ট হয়ে সারাটি জীবন নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন বিচিত্র চিন্তায় এবং সাধ্য অনুযায়ী যুক্ত থেকেছেন আমরণ নিরলস কর্মে, যিনি সুন্দরকে ভালোবেসেই অপরিহার্য এক দায়কে স্বীকার করে নিয়েছেন অসুন্দরের বিরুদ্ধে নিত্য লড়াইয়ের সেই চির সংগ্রামী কোমল অথচ কঠিন মানুষটিকে আমাদের পছন্দমতো কাঁচি-ছাঁটা মোলায়েম রবীন্দ্রনাথে রূপান্তরিত করে নিয়েছি। সভা সমিতি উৎসব অনুষ্ঠানে অথবা আত্মকেন্দ্রিক নির্ঝঞ্ঝাট দিনযাপনে যিনি বেশ মিলে যেতে, খাপ খেয়ে যেতে পারেন। আমরা রবীন্দ্রসংগীত শুনি, অথচ তার বহিরঙ্গের আস্বাদনেই সীমাবদ্ধ রাখি নিজেকে, মর্ম গ্রহণে উৎসুক হই না।— 'জীর্ণ পুরাতন যাক ভেসে যাক' সুরময় এই বাণীর তারিফ করি, অথচ জীর্ণ পুরাতনকে আঁকড়ে থাকতেই ভালোবাসি। আমাদের সামাজিক, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, শিক্ষার ধারা ইত্যাদির দিকে তাকালেই এ কথা বুঝতে এবং স্বীকার করতে অসুবিধে হবার কথা নয়। প্রেক্ষাগৃহে 'বাঁধ ভেঙে দাও'-এর গীতরসে বিভোর হওয়াকে, গানের তান মান লয় গায়নভঙ্গির বিচারে প্রবৃত্ত হওয়াকে 'রাবীন্দ্রিক' মনে হয় আমাদের, কিন্তু কোনো অতি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রেও বাঁধ ভাঙার সামান্যতম উদ্‌যোগকে 'অরাবীন্দ্রিক' এবং অভব্য বলে গাল পাড়তে দ্বিধা করি না। রবীন্দ্রচর্চা মানে যে শুধু রবীন্দ্র রচনার পঠন-পাঠন, রবীন্দ্রসংগীত নাটক ইত্যাদির আস্বাদন, সভাসমিতির মৌখিক রবীন্দ্র-অনুশীলনমাত্র নয়, তার অর্থ যে অনেক গভীর, অনেক ব্যাপক, অনেক বেশি জীবনস্পর্শী এ কথা মনে রাখার প্রয়োজন বোধ করি না। রবীন্দ্রচর্চা জীবনচর্চার নামান্তর, জীবনচর্যার সঙ্গে নিত্যযুক্ত। 'সুন্দরকে ভালোবাসি বলেই অসুন্দরের বিরুদ্ধে আমার লড়াই' কথাটি যদি রবীন্দ্রনাথের হয়, তবে আমরাও যদি যথার্থ রবীন্দ্রপ্রেমী হই এবং যথার্থ রবীন্দ্রচর্চায় আত্মনিয়োগ করতে চাই তবে আমাদের কথা হবে 'রবীন্দ্রনাথকে ভালোবাসি বলেই অসুন্দরের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই'। নান্যঃ পন্থা।

রবীন্দ্র-চর্চা
২

গৌতম ভট্টাচার্য

সাহিত্য ইতিহাসের কোনো আন্দোলনকে যেমন বিশেষ সাল তারিখে চিহ্নিত করা যায় না, তেমনি রবীন্দ্রনাথ-বিষয়ক সমালোচনার ধারাবাহিকতা ও বিবর্তনের ইতিহাসকে বিশেষ কোনো সময়সীমায় ধরে তার পর্বান্তর বোঝানো যাবে না । কিন্তু এ কথা স্বীকার্য যে, যে রবীন্দ্রসাহিত্য একদা শুধুই স্তুতি-প্রশংসা অথবা বিদ্রূপ-নিন্দার বিষয় ছিল, তা ক্রমান্বয়ে বিশ্লেষণ আর বোধবুদ্ধির নিরিখে প্রকৃত রবীন্দ্রবিদ্যায় পরিণত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথই হলেন একমাত্র লেখক যাঁর সাহিত্য সমালোচনার ধারাবাহিকতা সূত্রে সাহিত্য সমালোচনার বিবর্তন ও চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে । এবং এ-সত্যও প্রমাণিত হয় যে, যে-কোনো লেখকের প্রকৃত অবস্থান নির্ণয় করতে হলে সময়ের দূরত্বও প্রয়োজন । অন্যান্য অনেক লেখকের ক্ষেত্রেই সময় এবং সাময়িকতার আবহ পার হয়ে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে সমান প্রাসঙ্গিকতায় পৌঁছানো সম্ভব হয় না । ব্যতিক্রম রবীন্দ্রনাথ— হয়তো সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে নতুন করে আবিষ্কার করছেন প্রবন্ধকাররা । তাঁর প্রাসঙ্গিকতার বিভিন্ন দিক উন্মোচিত হচ্ছে আমাদের কাছে । তাই শতবর্ষ অথবা একশো পঁচিশ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে যদিও রবীন্দ্র-বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশের সংখ্যা হঠাৎ করে বেড়ে যায়, কিন্তু তাঁর প্রতি আগ্রহের চিহ্ন কখনোই প্রকাশহীন থাকে নি । 'বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ' প্রকাশিত এক গ্রন্থে বাংলা ভাষায় রবীন্দ্রচর্চার গ্রন্থসূচি প্রকাশ করা হয়েছে । সেখানে দেখা যায় ১৯০৫ সাল থেকে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত রবীন্দ্র-বিষয়ক গ্রন্থের সংখ্যা ১,০৯৬ । এর মধ্যে সর্বাধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে কবির জন্মশতবর্ষে— ১৩৫ । আর তার পর ১৯৮৬ সালে অর্থাৎ ১২৫তম জন্মবর্ষে ৫৫টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে । শুধুই সংখ্যা কোনো গুণগত চর্চার পরিমাপ না করতে পারলেও, রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে আগ্রহ এবং রবীন্দ্রচর্চার ধারাবাহিকতার একটা পরিচয় পাওয়া যায় এর থেকে । রবীন্দ্রনাথ-বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশের দশকভিত্তিক বার্ষিক গড় করলে দেখা যাবে যে তা ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে । ১৯০০ থেকে ১৯১০-এ বার্ষিক গড় ছিল .২ অর্থাৎ মাত্র দুটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল । ১৯১১-২০ তে বার্ষিক গড় ১.৩ । যে বছর নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ সে-বছর তাঁর রচনা বিষয়ে একটিমাত্র গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে— 'রবীন্দ্রসাহিত্যে ভারতের বাণী' । এ-গ্রন্থ নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর লেখা কারণ, প্রথম প্রবন্ধের নাম 'রবীন্দ্রনাথের দিগ্বিজয়' আর চতুর্থ প্রবন্ধ 'ভারতবাসীর নোবেলপ্রাইজ লাভ' । কিন্তু এর পরের বছরই ৩টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয় । ১৯২১ থেকে ৩০-এ বার্ষিক গড় ১.৭, ১৯৩১থেকে ৪০-এ এ-গড় দাঁড়ায় বার্ষিক ৩ খানি গ্রন্থে, রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর ১৯৪১ থেকে ৫০-এ বার্ষিক গ্রন্থ প্রকাশের গড় ৮.৮, ১৯৫১ থেকে ৬০-এ ১০.৬, আর এর পর শতবার্ষিকীর সময়ে ১৯৬১-থেকে ৭০-এ এই গড় ৩২.৪ অর্থাৎ মোট প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ৩২৪টি । তুলনায় পরের দশকে গড় নেবে আসে ২০.৮-এ । মোট ১৯৮১থেকে ৯০ সালে বার্ষিক গড় আবার ৩০.৩-এ পৌঁছায় । আমরা জানি ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস থেকে ১৩১৯ সালে রবীন্দ্রনাথ-বিষয়ক প্রথম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ।

গ্রন্থের নাম 'রবীন্দ্রনাথ (কাব্যগ্রন্থ পাঠের ভূমিকা)', লেখক অজিতকুমার চক্রবর্তী। গ্রন্থের পৃষ্ঠাসংখ্যা ১০৪। এর আগে অন্তত ৪টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ১৩১৮ সালের ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হবার উপলক্ষে জন্মোৎসবের জন্য এ-গ্রন্থ লেখা হয়েছিল। এ-গ্রন্থের উল্লেখ করছি এইজন্য যে সেখানে নিবেদন অংশে যা লেখা ছিল তা রবীন্দ্রচর্চার মূলসূত্রকে ধরিয়ে দেয়, "বড় সাহিত্যিকের বা কবির সকল রচনার মধ্যে অভিব্যক্তির একটি অবিচ্ছিন্ন সূত্র থাকে, সেই সূত্র তাহার পূর্বকে উত্তরের সঙ্গে গাঁথিয়া তোলে, তাহার সমস্ত বিচ্ছিন্নতাকে বাঁধিয়া দেয়। অপূর্ণতা অস্ফুটতা হইতে ক্রমে ক্রমে তাহা সুস্পষ্ট পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়....কবি রবীন্দ্রনাথের সমস্ত রচনার মধ্যে তাঁহার এই ভিতরকার পরিণতির আদর্শের সূত্রটিকেই আমি অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি।" আজকের দিনে আর ওই স্বল্প পরিসরে সামগ্রিক রবীন্দ্রনাথের অনুসন্ধান করেন না কোনো সমালোচক। এ-যুগের রবীন্দ্রচর্চার বৈশিষ্ট্য অণুপর্যবেক্ষণ। অর্থাৎ রবীন্দ্রসাহিত্যের অথবা রবীন্দ্র-বিষয়ক কোনো বিশেষ দিক নিয়ে অনুপুঙ্খ আলোচনা। তারই সঙ্গে তিনি যুক্ত করেন রবীন্দ্রনাথের 'ভিতরকার পরিণতির আদর্শের সূত্রটিকে'।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর সাল ধরে তার পরবর্তী প্রথম পঁচিশ বছরে রবীন্দ্র-বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল প্রায় ৪২২ খানি, আর তার পরবর্তী কুড়ি বছরেই ৪৬৮টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন বিষয়বৈচিত্র্যে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের কাছে। প্রতি যুগেই আমাদের নিরন্তর রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা নতুন করে আবিষ্কার করেছে তাঁকে। ধ্যানে অনুষ্ঠানে, সময়ের প্রয়োজনের প্রাসঙ্গিকতায় তিনি নিয়তই জায়মান এক অস্তিত্ব আমাদের কাছে।

'গীতাঞ্জলি' বিষয়ক প্রথম গ্রন্থ 'গীতাঞ্জলি'-সমালোচনা (প্রতিবাদ)-লেখক উপেন্দ্রকুমার কর। বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত এ-গ্রন্থে লেখকের হাতে লেখা উৎসর্গ : কবীন্দ্র /। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের করকমলে শ্রদ্ধা সহকারে উপহৃত হইল /। উপেন্দ্র ৭ই আশ্বিন; ১৩২১। শিলচর থেকে প্রকাশিত 'সুরমা' সাপ্তাহিক পত্রে রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি নামে যে বিরূপ সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল এ-গ্রন্থে তার প্রতিবাদ আছে। বিরূপ-সমালোচনার উদাহরণ দিলে বিষয়টা স্পষ্ট হবে, "'চরণ ধূলার তলে' মাথা নত করিয়া দিতে হইলে শারীরিক বল প্রয়োগে স্কন্ধদেশ আকর্ষণ করিতে হয়। অতএব এ স্থানে রসভঙ্গ দোষ ঘটিয়াছে। শান্তরসের উপল খণ্ড দ্বিখণ্ডিত হইয়া রৌদ্র রসের উৎস প্রবাহিত হইয়াছে"। অথবা অন্যত্র, "চোখের জলের অহঙ্কারকে ডুবাইবার শক্তি নাই। প্রমাণ— ভারতীয় ষড়দর্শন ও আধুনিক রসায়ন। অতএব কবির উক্তরূপ আকাঙ্ক্ষা ভারতীয় কবিত্বের মত্ত প্রলাপ।"

প্রবন্ধকার উপেন্দ্রকুমার উত্তর দিয়েছেন যে কবি সকল দম্ভ, সকল ঔদ্ধত্য দয়া করে নিজ হাতে দূর করে দেবার জন্য প্রভুর শরণাপন্ন হচ্ছেন। কারণ আত্মাভিমানের ন্যায় ভক্তিমার্গের অন্তরায় আর কিছু নেই, যখনই ভগবৎ কৃপায় ভক্তির মিলনধারা হৃদয়ে প্রবাহিত হয়ে নয়নে প্রেমের অশ্রু ছুটে, কেবল তখনই আমাদের হৃদয়ের দৃঢ়বদ্ধমূল ঐ অভিমানে ভেসে যায়। তাই কবির প্রার্থনা— সকল অহঙ্কার হে আমার / ডুবাও চোখের জলে। আমরা জানি এই তর্ক-বিতর্কের দ্বন্দ্ব-জাল থেকে রবীন্দ্রসমালোচনাকে স্ব-প্রতিষ্ঠ হতে দীর্ঘ সময় লেগেছে। এই গীতাঞ্জলির আলোচনাসূত্রেই রবীন্দ্রসাহিত্য সমালোচনার বিবর্তনের ধারাটি হয়তো স্পষ্ট হয়ে আমাদের কাছে ধরা দেবে। আমাদের আলোচ্য সময়পর্বে এ আলোচনা সংহত ও নিষ্ণাত রূপ পেল বুদ্ধদেব বসুর 'কবি রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে। তিনি জানালেন যে রবীন্দ্রনাথের এমন কোনো গ্রন্থ নেই যা সামগ্রিকভাবে তাঁর প্রতিভূ, হয়তো ব্যতিক্রম 'গীতাঞ্জলি'। এর মধ্যে আছে এক সংগতি বা অখণ্ডতা। গীতাঞ্জলির সবগুলি রচনা পরস্পর-সম্পৃক্ত, একই প্রেরণা ও মনোভাব-সঞ্জাত। অনেকগুলি সমান্তর পথ যেন অবশেষে এখানে মিলিত হয়— প্রকৃতি ও মানবজীবন, নারী ও কবিতা, স্বদেশ, দুঃখ, মৃত্যু ও ভগবান। এই-সব সূত্র এতকাল বিচ্ছিন্নভাবে দেখা দিয়েছে এখন যেন তার সমন্বয় ঘটল।

ইংরেজি গীতাঞ্জলি প্রসঙ্গে সৌরীন্দ্র মিত্রর 'খ্যাতি অখ্যাতির নেপথ্যে' গ্রন্থটির উল্লেখ প্রয়োজন । এখানে আলোচনা হয়েছে— ইংরেজি গীতাঞ্জলি ও ডব্লু. বি. য়েটস্, খ্যাতি অখ্যাতির নেপথ্যে এবং রবীন্দ্রনাথ ও রোমা রোলাঁ । প্রতীচীতে রবীন্দ্রনাথের অভ্যুদয় বরং কবিখ্যাতির প্রসারকে কেন্দ্র করে প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে যে-সব মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে তারই বিচার-বিশ্লেষণ রয়েছে এ গ্রন্থে । পশ্চিমী জগতে কবির খ্যাতি অখ্যাতি নিয়ে যে-সব জল্পনা কল্পনা, অপপ্রচার এবং কপট মূল্যায়ন নানা সময়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে— তথ্যপ্রমাণের সাহায্যে তার যাথার্থ্য প্রমাণ হয় নি কখনো । "সেই সব তথ্যপ্রমাণের যোগে যুক্তি তর্কের আশ্রয়ে পূর্বোক্ত জটিলতার গ্রন্থি মোচন এবং তৎসংক্রান্ত অপপ্রচার এবং কপট মূল্যায়নের যথোচিত বিচারই এই বইটির সামগ্রিক উদ্দেশ্য ।"

গীতাঞ্জলি নিয়ে আপাতত শেষ গ্রন্থ জগন্নাথ চক্রবর্তীর 'গীতাঞ্জলি : অস্তিত্ব বিরহ' । উপেন্দ্রকুমার করের গ্রন্থের প্রতিতুলনায় এ-গ্রন্থের বিচার-বিশ্লেষণের দিকে নজর দিলে রবীন্দ্র-আলোচনার বিবর্তনের ধারাটি স্পষ্ট হয়ে উঠবে । প্রবন্ধকার বলেছেন যে ফ্রয়েডের অনেক আগেই ফ্রয়েডের ব্যাপারগুলো আমরা সাহিত্যে দেখতে পাই । ঠিক তেমনি, রবীন্দ্রনাথ সার্ত্রর কাছ থেকে Existence, Essence, Bad Faith, Nothingness, Choice, Freedom ইত্যাদির বিশেষ বিশেষ সংজ্ঞা শিক্ষা না করেও তাঁর কাব্যে, বিশেষ 'গীতাঞ্জলি' কাব্যে, যেখানে সাধারণত আমরা এটি আশা করি না, অস্তিত্ববাদের মূল কথাগুলির প্রাক্-প্রতিফলন বা প্রাক্-প্রতিধ্বনি ঘটিয়েছেন । প্রবন্ধকারের মতে অস্তিত্বের মুক্ততারই অন্য নাম বিরহবোধ; সার্ত্রর ভাষায়, Nothingness । গীতাঞ্জলির কবি এই মৌলিক ও বিরহ-বোধের ভারেই ভারাক্রান্ত, এই মৌলিক বিষাদেই বিষণ্ন, এবং এই মৌলিক বিরহ বিষাদ চিত্রণেই গীতাঞ্জলির মৌলিকতা ।

আমরা জানি, এ-বিচার হয়তো গ্রাহ্য নয় অনেকের কাছে, কিন্তু রবীন্দ্র-কাব্য বিচারে যে নানা বোধের সীমারেখা তৈরি হচ্ছে তা তাঁর প্রতি আমাদের সজাগ মানসিকতারই পরিচয় । রবীন্দ্রসাহিত্য আলোচনার ক্ষেত্রে এক বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক কবিরা । হয়তো নিজেদের অস্তিত্বের সংকটকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করার জন্যই রবীন্দ্রনাথকে তাঁদের বুঝে নেবার প্রয়োজন ছিল । কোথায় তাঁরা রবীন্দ্রনাথের কাছে ঋণবদ্ধ, কোথায় বা তাঁর 'অনপনেয় ছায়া' থেকে মুক্ত হতে পারছেন এজন্যই প্রয়োজন ছিল রবীন্দ্রসাহিত্য আলোচনার । তাই জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে বা বুদ্ধদেব বসু প্রত্যেকেই বাধ্য হয়েছেন রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে লিখতে । কিন্তু এঁরা প্রত্যেকেই কোনো-না-কোনো সূত্রে রবীন্দ্র-আবহে আক্রান্ত । এঁদের কাব্যপ্রতিভার উন্মেষপর্বে রবীন্দ্রনাথের সর্বগ্রাসী অস্তিত্বই ছিল এক সংকটের সীমারেখা । তাই রবীন্দ্রবিষয়ে প্রকৃত বিচার-বিশ্লেষণ করতে যে অনপেক্ষ সময়ের দূরত্ব ও মানসিকতার প্রয়োজন তা এঁদের ছিল না । তাই বিষ্ণু দে অথবা বুদ্ধদেব বসুকে যথাক্রমে 'রবীন্দ্রনাথ ও শিল্পসাহিত্যের আধুনিকতার সমস্যা' বা 'কবি রবীন্দ্রনাথ' লিখতে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর অন্তত কুড়ি বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে । আমাদের মনে পড়তে পারে যে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর জীবনানন্দ দাশ লিখেছিলেন, "...আমরা এখনো রবীন্দ্রনাথের আনুপূর্বিক ভাস্করতার এত বেশি নিকটে যে ইতিহাসের যেই স্থির পরিপ্রেক্ষিতের দরকার একজন মহাকবি ও মহামানবকে পরিষ্কারভাবে গ্রহণ করতে হলে, আমাদের আয়ত্তে তা নেই ।"

দুই

এই পর্বের উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্র-বিষয়ক প্রবন্ধকার আবু সয়ীদ আইয়ুব । দার্শনিক দৃষ্টি ও কাব্যবোধের সীমারেখা— এ-দুটোকে তিনি মিলিয়েছেন তাঁর আলোচনায় । অমঙ্গলের চেতনা রবীন্দ্রকাব্যের বিভিন্ন পর্যায়ে কীভাবে কখনো সংকুচিত, কখনো সম্প্রসারিত হয়েছে এবং শেষ পর্বের কাব্য রচনায় কত গভীর ও পরিব্যাপ্ত হয়ে উঠেছে– সেটা স্পষ্ট করে তুলেছেন তিনি 'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে । অনেকে অভিযোগ করেন যে জগতের অশুভ, কদর্য, বীভৎস রূপটা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ধরা দেয় নি, তিনি বড়ো বেশি রোম্যান্টিক ভাবালুতায় আচ্ছন্ন— এর সত্যাসত্য বিচার এ-আলোচনার অন্তর্গত । 'পান্থজনের সখা' গ্রন্থে লেখক প্রকাশ করেছেন রবীন্দ্রনাথের গান কবিতা ও নাটকের পিছনে যে জগৎ-নিরীক্ষা এবং ঈশ্বরভাবনার পটভূমিকা কখনো স্পষ্টগোচর কখনো বা আবছা রয়েছে, তারই স্বরূপ-সন্ধান ।

রবীন্দ্রনাথ নিজের কাব্য-সাধনায় ও জীবনচর্চায় যে আসংজ্ঞাত প্রেরণা অনুভব করতেন তাকেই তাঁর 'জীবন-দেবতা' আখ্যা দিয়েছেন । 'জীবন-দেবতা' কি সমস্ত বাধা-বিঘ্ন উত্তীর্ণ করে রবীন্দ্রনাথকে ঈশ্বর পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিতে পারবে ? এর সন্ধান করেছেন লেখক 'পথের শেষ কোথায়' প্রবন্ধে । জীবনের শেষ লগ্নে সারাজীবন ধরে পথ চলার পর তিনি হতাশায় মুহ্যমান হয়ে প্রশ্ন করেছিলেন —"পথের শেষ কোথায়, কী আছে শেষে, শুনতে পেয়েছিলেন শুধু নিজের বুকের মধ্যে 'ঢেউ ওঠে পড়ে কাঁদার'; কিন্তু তখনো 'সম্মুখে ঘন আঁধার' । কিন্তু শেষে ক্ষীণ হলেও নিশ্চিত শরণ আছে কোনো— "পার আছে গো পার আছে"— এভাবেই রবীন্দ্রনাথকে আশা নৈরাশ্য এবং আলো-আঁধারের এক বোধবৃত্তে স্থাপন করেন তিনি ।

শঙ্খ ঘোষ তাঁর 'এ আমির আবরণ' উৎসর্গ করেছেন আবু সয়ীদ আইয়ুবকে । এ-গ্রন্থ গান নিয়ে লেখা প্রবন্ধের সংকলন । গানের সুর নয়, কথাই লেখকের বিষয় । যেমন কবিতার মধ্যে তেমনি তাঁর মনের এক ইতিহাস প্রচ্ছন্ন আছে গানগুলিরও মধ্যে । যেমন ভেবেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ, "রবি কাকার গানের মধ্যেই আছে তাঁর জীবনী" । সেই জীবনেরই দু-একটি অধ্যায় স্পষ্ট করেছেন প্রবন্ধকার তাঁর গ্রন্থে ।

তত্ত্ব ও তথ্যের সমীকরণে রবীন্দ্রসমালোচনার যে নূতন সন্ধানী ও বিশ্লেষণী-ধারা গড়ে উঠছে তা স্পষ্ট হয়েছে শঙ্খ ঘোষের 'নির্মাণ আর সৃষ্টি'র মধ্যে । আলোচনার মধ্যে রয়েছে ছবি কবিতা, নাটক উপন্যাস, দেশ-বিদেশের মনীষীদের সঙ্গে কবির সম্পর্কের ইতিহাস —এরই সমবেত তথ্য বিন্যাসে লেখক সময়ের ইতিহাসের সঙ্গে কবির জীবনের ইতিহাসকে বুঝে নিয়েছেন ।

জীবনের শেষ পনেরো বছর তরুণ লেখকদের সমীপতায় এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথ । তরুণরা এক নতুন আন্দোলন গড়ে তুলেছিল । সেখানে ছিল পাপ আর দুঃখের ভার, মৌনতা আর অমঙ্গলের প্রতাপ । এই আধুনিকবাদের আন্দোলনকে রবীন্দ্রনাথও একদিন লক্ষ্য করেছিলেন তাঁর চারি দিকে, দেখছিলেন এর বহির্বিন্যাস, এর উদ্ধত অবিশ্বাস আর মননধর্মকে— হয়তো নিজের রচনার মধ্যেও এই দ্বিধা আর আবিশ্বাসের প্রবেশ ঘটেছে কখনো । কিন্তু এই দ্বিধা-অস্থিরতার মধ্য দিয়েও ফিরে ফিরে তিনি তাঁর কেন্দ্রের কাছে পৌঁছে যেতে চান । আর এ-দুয়ের সংঘর্ষেই অন্য এক নবীন আধুনিক রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয় ।

সময়ের মধ্যে যিনি কেবলই সচল আর জায়মান ।'নির্মাণ আর সৃষ্টি'-গ্রন্থে সে-ইতিহাসকেই লেখক স্পষ্ট করেছেন ।

রবীন্দ্ররচনায় চিত্রকল্পের ব্যবহার বিষয়ে সম্প্রতি বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচিত হয়েছে । সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন 'আলো-আঁধারের সেতু : রবীন্দ্র চিত্রকল্প' । এ গ্রন্থে তিনি আলোচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা ও প্রতীক, দীর্ঘ কবিতা ও চিত্রকল্পের সংলগ্নতা, রবীন্দ্র-গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যের চিত্রকল্প । তাঁর মতে গীতবিতানের 'প্রকৃতি'র গানের চিত্রকল্পগুলি প্রায়ই প্রতীক । রিক্ততা থেকে পূর্ণতা অথবা পূর্ণতা থেকে রিক্ততার আনাগোনার যে রবীন্দ্র-জীবনভাষ্যের কথা আছে—তা এই ঋতুচিত্রের প্রতীকে ধরা পড়ে । 'মানসী' থেকে 'চৈতালি' এই পর্বে রবীন্দ্র-কবিতায় ব্যবহৃত চিত্রকল্প নিয়ে একটি সুলিখিত গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন তুষারকান্তি মহাপাত্র— 'রবীন্দ্রকবিতা ও চিত্রকল্প' । রবীন্দ্রকবিতার চিত্রকল্প নিয়ে আলোচনা আছে দেবদাস জোয়ারদারের 'তোমার সৃষ্টির পথ— রবীন্দ্র কবিতার চিত্রকল্প : উৎস সৃষ্টি অনুবৃত্তি' গ্রন্থে । রবীন্দ্রকাব্য নিয়ে এ যাবৎ প্রায় একশো কুড়িটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে । এর অধিকাংশই কবির মৃত্যুর পঁচিশ বছরের মধ্যে প্রকাশিত । বস্তুত কবির সমস্ত কাব্য নিয়ে ধারাবাহিক আলোচনা অথবা তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা পরবর্তী পঁচিশ বছর সীমারেখায় অপেক্ষাকৃত কম । পরবর্তীকালে কবিতার আঙ্গিকগত দিক অথবা রূপকল্প নিয়ে আলোচনা হয়েছে ।'বিভিন্ন কবিতা ধরে তার নির্মাণ অথবা বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়েছে ।'রবীন্দ্র কবিতা শতক : প্রথম দশক' অথবা দ্বিতীয় দশক, তৃতীয় দশক এভাবে প্রতিটি খণ্ডে দশটি করে কবিতার আলোচনা করেছেন জগদীশ ভট্টাচার্য । বিশুদ্ধ নান্দনিক দৃষ্টিকোণ থেকে কবিকৃতির আলোচনা করেছেন ক্ষুদিরাম দাস তাঁর 'চিত্রগীতময়ী রবীন্দ্রবাণী' গ্রন্থে । তার আলোচনায় সাতটি অধ্যায়ের ক্রম রয়েছে— পূর্বপ্রসঙ্গ (বাঙলার কাব্যসংস্কার ও রবীন্দ্রনাথ), উজ্জ্বলতম অনুকৃতি—ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী, কাব্যসৌন্দর্যের আবির্ভাব—কড়ি ও কোমল থেকে চিত্রা, সংস্কৃত রীতির অনুশীলন এবং কাব্যসৌন্দর্যে নূতন গুণ ধর্মের প্রসার, সুরসংকেতময় লৌকিক বাণীবন্ধনের সৌন্দর্য, সংকেতময় অর্থচিত্র ও প্রত্যয়নিষ্ঠ কল্পনার প্রাধান্য, সংবৃত কল্পনা ও প্রতিহত গীতধর্মের অধ্যায় । রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা নিয়ে আলোচনা করেছেন অরুণ ভট্টাচার্য অথবা আধুনিকযুগের পাঁচজন কবি জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ, অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব ও বিষ্ণু দে-র সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক বিচার নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন সুতপা ভট্টাচার্য— 'কবির চোখে কবি' । এ ছাড়া রবীন্দ্রকাব্য আলোচনায় এক বিস্তৃত বিষয়-বৈচিত্র্য আছে— রবীন্দ্রকাব্যে ফুল, ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ ও রবীন্দ্র কাব্য, নাট্যকবিতায় রবীন্দ্রনাথ, কাব্য-সাহিত্যে 'আমি'র কথা, পদাবলীর তত্ত্বসৌন্দর্য ও কবি রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রকাব্যভাষা, রবীন্দ্রকাব্যে অলংকার, কবিকাব্যে নেপথ্যচারিণী, রবীন্দ্রকাব্যে পশ্চিমালোক — এইসব বিষয় নিয়ে সম্পূর্ণ গ্রন্থ রচিত হয়েছে ।

রবীন্দ্রকবিতার পাঠান্তর, পাঠভেদ সংবলিত সন্ধ্যাসঙ্গীতের সংস্করণ প্রকাশ করে পুলিনবিহারী সেন এই ধারায় কাজের আদর্শকে স্থাপন করেছিলেন । এই শ্রমসাধ্য ধারায় পরবর্তী কালে যাঁরা কাজ করেছেন তাঁরা কানাই সামন্ত, শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়, অশ্রুকুমার সিকদার প্রভৃতি ।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস বিষয়ে যে পঁচিশটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তার অধিকাংশই অপেক্ষাকৃত

আধুনিক কালের । এ ছাড়া বিভিন্ন উপন্যাস নিয়েও স্বতন্ত্র গ্রন্থ আছে । রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপন্যাসে ব্যক্তি সমাজ, দেশকালে, নরনারীর নিগূঢ় সম্পর্কের মধ্য দিয়ে যে জীবনদৃষ্টিকে প্রতিফলিত করেছেন তার জন্য তাঁকে খুঁজে নিতে হয়েছে উপযুক্ত নির্মাণ-রীতি । এর বিবর্তনের ধারাটি বিভিন্ন উপকরণের সূত্রে অনুসন্ধান করেছেন গোপিকানাথ রায়চৌধুরী তাঁর 'রবীন্দ্র-উপন্যাসের নির্মাণ-শিল্প' গ্রন্থে । এ-আলোচনায় রবীন্দ্র-উপন্যাসে প্রযুক্ত বিচিত্র প্রয়োগ-উপকরণের সূত্রে নির্মাণ-রীতির অন্তর্নিহিত সেই শিল্পচেতনাকেই লেখক প্রকাশ করেছেন । রবীন্দ্র-উপন্যাস আলোচনার ধারায় এটি একটি মূল্যবান সংযোজন । রবীন্দ্র-উপন্যাস নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে অর্চনা মজুমদারের 'রবীন্দ্র-উপন্যাস পরিক্রমা' গ্রন্থে । এ গ্রন্থে নবম ও দ্বাদশ পরিচ্ছেদে যথাক্রমে গোরা ও ফেলিক্স্ হোলট এবং ঘরে বাইরে ও প্রিন্স্ অটোর তুলনামূলক বিশেষ আলোচনা । শুধুই রবীন্দ্র-উপন্যাসের গঠনবিন্যাস আর চরিত্র বিশ্লেষণ নয়, এ-যুগের সমালোচনার ক্ষেত্রে বিশ্বসাহিত্যের পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথকে স্থাপন করা হচ্ছে । 'রবীন্দ্র-উপন্যাসে পাশ্চাত্য অভিঘাত' গ্রন্থে এই-সব বিচার-বিশ্লেষণের বিস্তৃত তুলনামূলক আলোচনা করেছেন শিবানী রায় । বিচ্ছিন্নভাবে এ-বিষয় নিয়ে আলোচনা থাকলেও একটি স্বতন্ত্র-গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনা এই প্রথম । শেষে রবীন্দ্রনাথ-পঠিত বিদেশী গ্রন্থের তালিকাও দেওয়া আছে এ-গ্রন্থে । তিনিটি অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথের তেরোটি উপন্যাস নিয়ে ইতিহাসের প্রেক্ষিতে বিচার করেছেন ভূদেব চৌধুরী তাঁর 'রবীন্দ্র-উপন্যাস : ইতিহাসের প্রেক্ষিতে' গ্রন্থে । রবীন্দ্র-উপন্যাস পাণ্ডুলিপি থেকে সাময়িকপত্র, সাময়িকপত্র থেকে বিভিন্ন সংস্করণে যে পরিবর্জন ও পরিবর্ধন হয়েছে তারই তথ্যভিত্তিক ইতিহাস 'রবীন্দ্র-উপন্যাসে পাঠভেদ', লেখক অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য ।

রবীন্দ্র-উপন্যাস নিয়ে বিরূপ সমালোচনা করেছেন প্রতাপ নারায়ণ বিশ্বাস । তিনি জানিয়েছেন যে 'গোরা' লেখবার সময় নিজের স্বাস্থ্য ও পারিবারিক কারণে রবীন্দ্রনাথ শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে যথেষ্টই উদ্‌বিগ্ন ও বিপর্যস্ত ছিলেন । কিন্তু এর মধ্যে যে তিনি বত্রিশ মাস ধরে নিয়মিত 'গোরা' প্রবাসী পত্রিকার প্রকাশ করতে পেরেছেন তার একমাত্র কারণ 'গোরা' উপন্যাসের মূল কাহিনী, চরিত্র, বিভিন্ন ঘটনা ও বর্ণনা বা সংলাপ জর্জ এলিয়টের Felix Holt the Radical থেকে নকল করা । আর কিছু অংশ তিনি সংগ্রহ করেছিলেন অলিভার গোল্ডস্মিথের The Vicar of Wakefield থেকে ও টুর্গেনিফের Fathers and Sons থেকে ।

'যোগাযোগ' উপন্যাসের সঙ্গে গলস্‌ওয়ার্দির দি ফরসাইট সাগার প্রথম খণ্ড Man of Property-র তুলনা করেছিলেন দেবীপদ ভট্টাচার্য তাঁর 'উপন্যাসের কথা' গ্রন্থে, অর্চনা মজুমদারও তাঁর 'রবীন্দ্র-উপন্যাস পরিক্রমা' গ্রন্থে এ-দুই উপন্যাসের সাদৃশ্য দেখিয়েছেন, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর' গ্রন্থেও উল্লেখ করেছেন এ-দুটি উপন্যাসের সাদৃশ্য কিন্তু প্রতাপ নারায়ণ বিশ্বাস তাঁর 'যোগাযোগ : গল্‌জওয়ার্দি ও রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে দেখিয়েছেন কীভাবে রবীন্দ্রনাথের সার্বিক অনুকরণ এই উপন্যাস । অন্যত্রও তিনি দেখিয়েছেন যে রবীন্দ্রনাথের 'নিশীথে' গল্প Poe-র Ligeia, Movella বা Eleanova গল্পের বিভিন্ন অংশ নিয়ে তৈরি অথবা 'ক্ষুধিত পাষাণ' পো-র Under the Ragged Mountains ও গোতিয়ের Le de la momie থেকে অনুকরণ । লেখক এ ধরনের মন্তব্যও করেছেন যে, "এইজন্যই ক্ষুধিত পাষাণ', 'নিশীথে', 'গোরা' বা 'যোগাযোগ' সাহিত্যের মর্যাদা পাবার যোগ্য নয়, এগুলি শুধু "borrowing"-এর

দৃষ্টান্ত নয়, নিছক plagiarism এর উদাহরণ । 'রক্তকরবী' নাটকও লেখক স্ট্রিণ্ডবার্গের 'A dream play'-র অনুকরণ বলে মনে করেন । তাঁর অভিযোগগুলির উত্তর দিয়েছেন শঙ্খ ঘোষ 'রক্তকরবী : কয়েকটি তথ্য' প্রবন্ধে । এ-দুটি প্রবন্ধ এ-কালের রবীন্দ্রচর্চার একটি উল্লেখযোগ্য দলিল বলে মনে হয় । একটি প্রবন্ধে দেখা যায় যে এখনো রবীন্দ্রনাথ কতদূর এবং কীভাবে অভিযুক্ত হতে পারেন— লেখকের রবীন্দ্র-রচনাপাঠ ও রবীন্দ্র-বিষয়ক তথ্যসন্ধান ঈর্ষণীয় কিন্তু তারই পাশে প্রকৃত রবীন্দ্রবিদ্যার অধিকারী এক আলোচক, প্রতিটি তথ্য ও তত্ত্ব যার আয়ত্তে, ক্রমান্বয় পর্ব অনুসন্ধানে অনাড়ম্বরভাবে প্রতিটি অভিযোগের উত্তর দিয়ে সাতাত্তরটি সূত্রনির্দেশ সমেত বুঝিয়ে দিলেন প্রকৃত রবীন্দ্রচর্চা কতখানি পরিশ্রমসাধ্য ও সংগত চিন্তাবোধের অধীন ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তাঁর পরিবার এবং শান্তিনিকেতনকে কেন্দ্র করে স্মৃতিকথার শেষ নেই । রবীন্দ্রচর্চার ধারায় স্মৃতিকথা কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রামাণ্য ভূমিকার অংশ গ্রহণ করেছে । যদিও আজকের সচেতন গবেষকরা স্মৃতিকথাকে যাচাই করে নিচ্ছেন তথ্যপঞ্জীর নিরিখে, তবুও স্মৃতিকথার ধারায় আজও অনন্য হয়ে আছেন কিছু লেখক— ইন্দিরা দেবী, প্রতিমা দেবী, মৈত্রেয়ী দেবী, সীতা দেবী, প্রমথনাথ বিশী, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রানী চন্দ, অমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়, কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়, নির্মলকুমারী মহলানবীশ, প্রমদারঞ্জন ঘোষ, মীরা দেবী, সুধীরচন্দ্র কর—আজ পর্যন্ত অন্তত পঁয়ষট্টিটি গ্রন্থ রচিত হয়েছে এ-ধারায় । একদা রবীন্দ্রসান্নিধ্যের দুর্লভ সুযোগ যাঁরা পেয়েছিলেন তাঁরা তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন পরবর্তীকালে, ক্রমান্বয়ে স্বাভাবিক কারণেই এ-ধারাটি বিরল হয়ে আসছে । আপাতত এ ধারায় শেষতম সংযোজন হয়তো—শিল্পী ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মনের গ্রন্থ 'স্মৃতিপটে' । ১৯১১ সালে আশ্রম-বিদ্যালয়ে তিনি ছাত্র হিসেবে যোগ দেন । এ-গ্রন্থে যেমন ব্রহ্মবিদ্যালয়ের কথা পাওয়া যাবে, তেমনি আছে কলাভবনের ইতিহাস । আছে বিভিন্ন শিল্পীদের স্মৃতি আর সেইসঙ্গে ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ক্রমান্বয়ে বিশ্বভারতীতে গড়ে ওঠার ক্রমপর্ব ।

রবীন্দ্রনাথের জীবন ও কর্মের সঙ্গে সাহিত্য-রচনার ধারাবাহিকতা মিলিয়ে পড়তে গেলে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রজীবন ও রবীন্দ্রসাহিত্য প্রবেশক' (চার খণ্ড) অপরিহার্য গ্রন্থ । এতদিন গবেষকদের কাছে রবীন্দ্রজীবনীর মতো তথ্যে ও ব্যাখ্যায় পূর্ণাঙ্গ আর কোনো আকর গ্রন্থ ছিল না ।"তথাপি রবীন্দ্রনাথের জীবনের পদ্ধতিসঙ্গত বস্তুনিষ্ঠ কালানুক্রমিক ইতিহাস লিখতে হলে বোধ হয় একটু দূরত্ব থাকলে ভালো হয়" । রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর চল্লিশ বছর বাদে এই রকম একটি জীবনীগ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় প্রশান্তকুমার পালের 'রবিজীবনী' । কেন বা কোথায় স্বতন্ত্র হয়ে উঠল এ-গ্রন্থ ? এতদিন এ-কাজে উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে— রবীন্দ্রনাথের লেখা জীবনস্মৃতি, ছেলেবেলা, প্রকাশিত অপ্রকাশিত চিঠিপত্র, আত্মস্মৃতিমূলক কিছু রচনা বা কথোপকথনের অংশবিশেষ, বিভিন্ন ব্যক্তির স্মৃতিচারণ, নানা পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ ইত্যাদি । রবিজীবনীকারের মতে রবীন্দ্র-জীবনের একটা মোটামুটি চিত্র এই-সব উপকরণের সাহায্যে প্রস্তুত করা সম্ভব । কিন্তু দিনে দিনে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে দেশবাসীর অনুসন্ধিৎসা অনেক ব্যাপক ও কিছুটা আণুবীক্ষণিক রূপ নিয়েছে । প্রভাতকুমারের গ্রন্থ এই প্রয়োজন সিদ্ধ করে না । এ ছাড়া স্মৃতিকথা, এমন-কি, রবীন্দ্ররচিত বা কথিত স্মৃতিকথাও ব্যক্তিবিশেষের মনের রঙে রঞ্জিত হয়ে বা বিস্মৃতিকে কল্পনাজাত তথ্যে ভরিয়ে দিয়ে কখনো কখনো প্রকাশ পায়—সুতরাং অন্যান্য সূত্র

থেকে আহৃত তথ্যের নিকষে তাকে যাচিয়ে নেওয়া দরকার। প্রশান্তকুমার পাল সাহায্য নিয়েছেন ঠাকুর পরিবারের হিসাবের খাতার— যেখানে সাংসারিক ও জমিদারি খরচের বিভিন্ন তথ্য রয়েছে। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রভবনে প্রায় সাড়ে তিনশো এই রকম খাতাপত্র রয়েছে। এর শুরু ১২৬৭-৬৯ বঙ্গাব্দে 'এস্টেটের হিসাব বহি' দিয়ে, শেষ ১৩৫৯ বঙ্গাব্দের 'কালিম্পঙের ক্যাশবহি'তে।

রবীন্দ্রজীবনী রচনার উপাদান হিসেবে ক্যাশবহিগুলির উপযোগিতা অনিবার্য, এরই সাহায্যে লেখক প্রমাণ করেছেন যে রবীন্দ্রনাথ প্রথম যে স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন তার নাম 'ক্যালকাটা ট্রেনিং অ্যাকাডেমি' —জীবনস্মৃতিতে লিখিত 'ওরিয়েন্টাল সেমিনারি' নয়।

প্রশান্তকুমার পাল তাঁর গ্রন্থে চেষ্টা করেছেন রবীন্দ্রনাথ-বিষয়ক যাবতীয় তথ্যের সমাবেশ ঘটাতে। ফলত তাঁর গ্রন্থ রবীন্দ্র-চর্চার ক্ষেত্রে এক অনিবার্য আকরগ্রন্থ হয়ে উঠেছে। এখনো পর্যন্ত এ-গ্রন্থের পাঁচটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। শেষ খণ্ডের সময়সীমা রবীন্দ্রজীবনের ১৩০৮ থেকে ১৩১৪ সাল।

ইউরোপের বিভিন্ন দেশে রবীন্দ্রচর্চা শিথিল হলেও স্পেনে এবং স্প্যানীশভাষী দেশগুলিতে রবীন্দ্রনাথ আজও পঠিত এবং আলোচিত। রবীন্দ্রনাথ যে এখনো সেখানে সম্মানিত ও সমাদৃত তার মূলে আছে আধুনিক স্পেনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হুয়ান রামোন এবং তাঁর স্ত্রী সেনোবিয়া। সেনোবিয়া ও হুয়ান রামোনকে রবীন্দ্রনাথ এক সময় এমনই আচ্ছন্ন করেছিলেন যে সেনোবিয়া রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন যে তিনি তাঁদের নিত্য আধ্যাত্মিক সহচর। স্পেনের হৃদয়ে রবীন্দ্রনাথ যদি স্থান পেয়ে থাকেন তা হলে তার মূল কারণ রবীন্দ্রনাথের প্রতি সেনোবিয়া ও হুয়ান রামোনের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। শিশিরকুমার দাশ ও শ্যামাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'শাশ্বত মৌচাক' গ্রন্থ সেনোবিয়া ও হুয়ান রামোনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কের কাহিনী। ১৯২৪ সালে রবীন্দ্রনাথের আর্জেন্টিনায় আগমন ও ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর আতিথ্যে দিনযাপনের কথা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে শঙ্খ ঘোষ এবং কেতকীকুশারী ডাইসনের গ্রন্থে। অবশ্য সেনোবিয়া-হুয়ান রামোন-রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন শঙ্খ ঘোষই প্রথম। তবুও এ-সম্পর্ক নিয়ে একটি গ্রন্থ রবীন্দ্রনাথের একটি অনালোচিত দিক উদ্ভাসিত করল। এ ছাড়া বিভিন্ন দেশে রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণের সূত্রে আলাদা আলাদা গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এ বিষয়ে অন্তত আঠারোটি গ্রন্থ আছে। শিশিরকুমার দাশ ও তান ওয়েন-এর 'বিতর্কিত অতিথি' গ্রন্থে চীন ভ্রমণের অনুপুঙ্খ বিবরণ আছে। কালিদাস নাগের 'কবির সঙ্গে একশো দিন' ২১ মার্চ থেকে ২ জুলাই ১৯২৪—চীন-জাপান ভ্রমণের অভিজ্ঞতার দিনলিপি। এ ছাড়া এ বিষয়ে গ্রন্থ আছে— বিদেশ ভ্রমণে রবীন্দ্রনাথ, আমেরিকায় রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র-দৃষ্টিতে জাপান।

তিন

ইংলণ্ডবাসের সময় রবীন্দ্রনাথ এক চিঠিতে অজিতকুমার চক্রবর্তীকে লিখেছিলেন, 'শান্তিনিকেতনের বাইরের প্রান্তরশ্রী যেমন অগোচরে ছেলেদের মনকে তৈরি করে তোলে, তেমনি গানও জীবনকে সুন্দর করে গ'ড়ে তোলবার একটা প্রধান উপাদান'—। রবীন্দ্রসংগীতের স্বতন্ত্র মূল্য নিয়ে, অন্যান্য সংগীতের সঙ্গে তার প্রতিতুলনা করে অথবা তার সাহিত্যমূল্য নিয়ে যেমন আলোচনা হয়েছে, তেমনি রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা পরিকল্পনায় সংগীত ও নৃত্য যে অনিবার্য এবং সহাঙ্গ সে কথা স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিলেন শান্তিদেব

ঘোষ তাঁর ছোটো অথচ সারগর্ভ গ্রন্থে— 'রবীন্দ্রনাথের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাদর্শে সঙ্গীত ও নৃত্য' । বিভিন্ন নৃত্যনাট্যের ক্রমান্বয় গড়ে ওঠা, তাদের নৃত্য পরিকল্পনা, আধুনিক ভারতীয় নৃত্যকলার সঙ্গে তার যোগাযোগ ইত্যাদি নিয়ে তাঁর একক আকর গ্রন্থ 'গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক ভারতীয় নৃত্য' ।

রবীন্দ্রসংগীত নিয়ে প্রথম মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল চল্লিশের দশকে । রবীন্দ্রনাথের গানে কথা ও সুরের মেলবন্ধন কীভাবে স্বতন্ত্র সংগীতধারার জন্ম দিল সে কথা জানিয়েছিলেন শান্তিদেব ঘোষ ।

রবীন্দ্রসংগীতে কথা ও সুরের একাত্মতা একটি স্বতঃস্ফূর্ত শিল্পকর্ম । এ মিলন কোনো যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার নয় । রাগ-রাগিণীর ভাবরূপ তাঁর কবিমানসে এমনভাবে ধরা দিয়েছিল, যার ফলে তাঁর গানের কাব্যরসের সঙ্গে রাগ-রাগিণীর ভাবরসটি অঙ্গাঙ্গী জড়িয়ে গেছে । একটির থেকে আর-একটিকে পৃথক করে দেখা অসম্ভব । রবীন্দ্রসংগীত নিয়ে এরকম সুস্পষ্ট আলোচনা করেছেন সুচিত্রা মিত্র তাঁর 'রবীন্দ্রসংগীত জিজ্ঞাসা' গ্রন্থে । রবীন্দ্রসংগীত বিষয়ে প্রায় ৮০ খানি গ্রন্থ রচিত হয়েছে । লেখকদের মধ্যে বিখ্যাত রবীন্দ্রসংগীত শিল্পীরাও রয়েছেন— শান্তিদেব ঘোষ, শৈলজারঞ্জন মজুমদার, সুবিনয় রায়, সুচিত্রা মিত্র, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলিমা সেন । গীতবিতানকে কালানুক্রমিভাবে সাজিয়ে দিয়েছেন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় । রবীন্দ্রনাথের সুর রচনা সম্পর্কীয় দুর্লভ অনেক তথ্যের সমাবেশ করেছেন কিরণশশী দে । সমকালীন গীতিকার রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ও রবার্ট বার্নস্, বাংলা নাটকের গান ও রবীন্দ্র-নাটকের গান এই-সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন সুধীর চক্রবর্তী তাঁর 'গানের লীলার সেই কিনারে' গ্রন্থে । রবীন্দ্রসংগীত বিষয়ে বিভিন্ন চিন্তাভাবনার প্রকাশ ঘটেছে অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে । রবীন্দ্রনাথের গীতসাহিত্য, রবীন্দ্রসংগীতে কীর্তন ও উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রভাব, গীতিকবি ও সুরকার হিসেবে রবীন্দ্রনাথ, গায়ক রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র-সাহিত্যে সংগীতভাবনা, বাঙলা কাব্যসংগীত ও রবীন্দ্রসংগীত—এ সব বিষয় নিয়ে গ্রন্থ রচিত হয়েছে এ যুগে ।

রবীন্দ্রনাথের নাটক বিষয়ে আলোচনার গ্রন্থসংখ্যাও কম নয় । এ বিষয়ে অন্তত ৫২টি গ্রন্থ আমাদের পরিচিত । আমাদের আলোচ্য সময়সীমার মধ্যেও অন্তত ২৫টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে । সেই ১৯২১ সালে একরামদ্দিন মৌলবী লিখেছিলেন 'রবীন্দ্র-প্রতিভা' অথবা ৫৩ পৃষ্ঠার গ্রন্থ 'রক্তকরবীর মর্মকথা' লিখেছিলেন ভোলানাথ সেনগুপ্ত । এ-কালে রবীন্দ্রনাটক নিয়ে আলোচনার বিশেষত্ব শুধু চরিত্র বা ভাব বিশ্লেষণই নয়, রবীন্দ্রনাটকের রূপক সাংকেতিকতা, আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্য, রবীন্দ্রনাটকে পাশ্চাত্য প্রভাব ইত্যাদিও আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে । নাটকের বিষয় এবং নাট্য প্রকরণ লেখকের অম্বিষ্টকে কীভাবে প্রকাশ করেছে এ আলোচনা করেছেন শঙ্খ ঘোষ তাঁর 'কালের মাত্রা ও রবীন্দ্র-নাটক' গ্রন্থে । দেশকাল সচেতন হয়ে নাটকের প্রেক্ষিত রচনার নির্মাণ-ভূমি স্পষ্ট করেছেন প্রবন্ধকার । কোথায় রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত নাট্যধারায় যুক্ত, কোথায় বা স্বতন্ত্র, কোথায় তাঁর সংগীতব্যবহার অনিবার্য ও সুনির্দিষ্ট— এ-সবই যেন মৌল আলোচনার আকারে এ গ্রন্থে রয়েছে । পরবর্তী পর্যায়ে এ আলোচনার বীজ-অংশ নিয়ে রচিত হয়েছে গ্রন্থ । যেমন 'রবীন্দ্রনাট্যে প্রতিমা' অথবা 'রবীন্দ্র-নাটকে আঙ্গিক : রূপক সাংকেতিক' । অবশ্য এ কথা স্বীকার করতে হবে যে এ-দুটি বিষয় নিয়ে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ হল এই প্রথম ।

রবীন্দ্রনাট্যকলা ও মঞ্চসৃষ্টি এবং পরবর্তী বিকাশ ও বিবর্তনের ধারাটি অনুসন্ধান করেছেন পুলিন

দাস 'মঞ্চ অভিনয় নাট্যকলা ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে। রবীন্দ্রনাট্যধারায় মঞ্চ-অভিনয় ক্রমান্বয়-চর্চার ইতিহাস রয়েছে এ গ্রন্থে। এরই সঙ্গে উল্লেখ্য 'রবীন্দ্রনাথের থিয়েটার'। কেমন করে রবীন্দ্রনাথ মহলা দিতেন, শেখাতেন নাচগান আর অভিনয়ের যাবতীয় কলাকৌশল, প্রযোজনার সমগ্র রূপটি কীভাবে বিকশিত হয়ে উঠত— বিভিন্ন স্মৃতিকথা আর বর্ণনা থেকে সেই তথ্য সংগ্রহ করেছেন বিষ্ণু বসু। রবীন্দ্রনাটকের অভিনয় রীতি, রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক চেতনা, রবীন্দ্রনাটক ও মঞ্চ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন কুমার রায় তাঁর 'নাট্য ভবিতব্য ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে।

রবীন্দ্রনাথ চলচ্চিত্রের নির্বাক এবং সবাক দুটো যুগকেই দেখেছেন। নির্বাক যুগে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য অবলম্বনে প্রথম চলচ্চিত্র তোলে তাজমহল ফিল্ম কোম্পানি— ছবির নাম 'মানভঞ্জন'। সে ছবি মুক্তি পায় ১৯২৩ সালে। নির্বাক যুগে রবীন্দ্রনাথের পাঁচটি লেখা চলচ্চিত্রায়িত হয়েছিল। আর সবাক যুগে 'দেনাপাওনা' প্রথম ছবি ১৯৩১ সালে। মধু বসুর আত্মজীবনীতে আছে রবীন্দ্রনাথ নিজে গিরিবালা ছবির সংলাপ অংশ সংশোধন করেছিলেন—"আমি গল্পটা কিছু কিছু বাড়িয়ে চিত্রনাট্য তৈরী করলাম। তারপর গুরুদেবকে সেটা দেখাতেই তিনি জায়গায় জায়গায় সংশোধন করে সংলাপ লিখে দিলেন।" এই অপেক্ষাকৃত নতুন মাধ্যমটির সঙ্গেও যে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক কম ছিল না সে বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা গড়ে ওঠে অরুণকুমার রায়ের 'রবীন্দ্রনাথ ও চলচ্চিত্র' গ্রন্থটি পড়লে। রবীন্দ্রচর্চায় এও এক নতুন সংযোজন।

চার

টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট রবীন্দ্রচর্চার একটি কার্যসূচী গ্রহণ করেছিল— বিভিন্ন সাময়িকপত্র থেকে রবীন্দ্র-আলোচনা সংগ্রহ। সেই ধারায় প্রথম গ্রন্থ ছিল নন্দরাণী চৌধুরীর 'সাময়িকপত্রে রবীন্দ্র প্রসঙ্গ' (সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। সাহিত্য) —এই গ্রন্থে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সাহিত্য পত্রিকায় যে রবীন্দ্রালোচনা করেছিলেন তা সংকলিত। দ্বিতীয় খণ্ড 'প্রবাসী' থেকে সংকলিত। তৃতীয় খণ্ড 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকা থেকে সংকলিত। প্রথম খণ্ডে আছে রবীন্দ্রসাহিত্যের আলোচনা, দ্বিতীয় খণ্ডে রবীন্দ্রজীবন ও সাহিত্যের সন্নিবেশ বৃহৎ জগতের পটভূমিকায় এবং তৃতীয় খণ্ড প্রধানত আশ্রম কথা। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকে রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথ-বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ রবীন্দ্রগবেষণার পক্ষে অত্যন্ত জরুরি।

বীরেন্দ্র বিশ্বাসের 'রবীন্দ্র শব্দকোষ' প্রকাশিত হয়েছে ১৯৭১ সালে। আট বছর নিরলস পরিশ্রম করে একক প্রয়াসে রচিত এ গ্রন্থ এ-যুগের রবীন্দ্রচর্চার এক বিরলতম উদাহরণ। যা একটি প্রতিষ্ঠানের কাজ তা তিনি একাই সম্পাদন করেছেন। এখন কমপিউটারের সাহায্যে বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কারিগরি সহায়তায় রবীন্দ্ররচনার কন্‌কর্ডান্স তৈরি করছে। রবীন্দ্রনাথ-ব্যবহৃত যে-কোনো শব্দের সপ্রসঙ্গ বর্ণানুক্রমিক সূচি এই কন্‌কর্ডান্স। এর আগে নির্মলেন্দু রায়চৌধুরী রচনা করেছিলেন 'রবীন্দ্র নির্দেশিকা', চিত্তরঞ্জন দেব ও বাসুদেব মাইতি প্রকাশ করেছিলেন 'রবীন্দ্র রচনাকোষ', সোমেন্দ্রনাথ বসু করেছেন 'রবীন্দ্র অভিধান'।

এ-সময়ের একটি উল্লেখযোগ্য কোষগ্রন্থ 'রবীন্দ্র গ্রন্থসূচি'। জাতীয় গ্রন্থাগারের তত্ত্বাবধানে এই

পরিশ্রমসাধ্য অবশ্যকৃত্য কাজটি করেছেন স্বপন মজুমদার । রবীন্দ্রগ্রন্থের প্রকাশবৈচিত্র্যের রূপটিও তিনি তুলে ধরেছেন পাঠকের সামনে । প্রথম খণ্ডে আছে 'কবি কাহিনী' থেকে 'অচলায়তন' পর্যন্ত । প্রকাশক, আখ্যাপত্র, ভূমিকা, সংস্করণভেদ প্রভৃতি যাবতীয় তথ্য সংগৃহীত আছে এ-গ্রন্থে ।

রবীন্দ্রনাথের পত্রসাহিত্য নিয়েও অনেক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে । গৌরচন্দ্র সাহার 'রবীন্দ্র পত্রাবলী : তথ্যপঞ্জী' গবেষকদের পক্ষে একান্ত সহায়ক গ্রন্থ । ১৩৭৯ সালের ৩০ চৈত্র পর্যন্ত প্রকাশিত মোট চার হাজার সাতানব্বইটি চিঠির তথ্য রয়েছে এ-গ্রন্থে । চিঠিপত্রে বিধৃত ঘটনা ও তথ্যের সন্ধান কবির জীবন ও সাহিত্য বিষয়ে গবেষকদের সাহায্য করবে । পরিশিষ্টে প্রাপক নির্দেশিকা ও বিষয় নির্দেশিকাও আছে ।

বিশ্বভারতী থেকে কবির চিঠিপত্রের সংকলন প্রকাশিত হয়েছে আজ পর্যন্ত তেরোটি খণ্ড । 'দেশ' পত্রিকায় ১৯৩৫ সাল থেকেই রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র প্রকাশিত হতে থাকে । প্রায় আঠারো শো চিঠিপত্র প্রকাশিত হয়েছে এখানে । প্রথম দিকে অধিকাংশ চিঠির পত্রপরিচয় ও সম্পাদনা করেন পুলিনবিহারী সেন । পরবর্তীকালের অধিকাংশ চিঠির সম্পাদনা করেন পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় । পত্রসাহিত্য নিয়ে অন্তত বারোখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে । চিঠিপত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন সৌরীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী, ছিন্নপত্রাবলী নিয়ে আলোচনা করেছেন গোপালচন্দ্র রায়, রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র নিয়ে সামগ্রিক আলোচনা করেছেন বীণা মুখোপাধ্যায় তাঁর 'চিঠিপত্রে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে । বিভিন্ন চিঠিপত্রে অভিব্যক্ত রবীন্দ্রচিন্তা যেমন সাহিত্য, শিল্পকলা, স্বদেশ ও বিশ্ব, পল্লী, শিক্ষা, দর্শন আধ্যাত্মিকতা এরকম বিষয় বিভাজন করেও গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে জয়শ্রী চক্রবর্তীর 'রবীন্দ্র-পত্র : রবীন্দ্রভাবনা' । রবীন্দ্রনাথের সমগ্র পত্রাবলীর সটীক সংস্করণ প্রকাশ রবীন্দ্র-গবেষকদের পক্ষে একান্ত জরুরি বলে মনে হয় ।

রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তা একালের রবীন্দ্রগবেষণার একটি বহুচর্চিত বিষয় । আজ পর্যন্ত অন্তত কুড়িখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে এ-বিষয়ে । রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তা ও ভূমিকার পূর্ণাঙ্গ ও সামগ্রিক আলোচনা করেছেন নেপাল মজুমদার তাঁর 'ভারতের জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ' (ছয় খণ্ড) নামক গ্রন্থে । এ ছাড়াও বহু মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য লেখকের নজরে আসে, যা তাঁর গ্রন্থভুক্ত ছিল না, অথবা অন্য কোথাও প্রকাশিত হয় নি । সে-সব তথ্য তিনি একত্র করেছেন 'রবীন্দ্রনাথ : কয়েকটি রাজনৈতিক প্রসঙ্গ' গ্রন্থে । চিন্মোহন সেহানবীশের 'রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লবীসমাজ'একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ । এ গ্রন্থের মূল বিষয় রবীন্দ্রনাথের চোখে বিপ্লবী এবং বিপ্লবীদের চোখে রবীন্দ্রনাথ । এ গ্রন্থের আর-একটি উল্লেখযোগ্য লেখা বিপ্লবী জীবনের সন্ধিক্ষণে রবীন্দ্রনাথ । কীভাবে রবীন্দ্রনাথের গান কবিতা কথা সাহিত্য প্রবন্ধ সেদিন প্রেরণা জুগিয়েছে বিপ্লবী বন্দীদের সে-আলোচনাও এর বিষয়ভুক্ত । কলকাতার টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট থেকে প্রকাশিত 'বিপ্লবীদের চোখে রবীন্দ্রনাথ' এ-ধারারই গ্রন্থ। লেখিকা বিপ্লবীদের সাক্ষাৎকার নিয়ে রচনা করেছেন এ-গ্রন্থ । কীভাবে রবীন্দ্রনাথের লেখা প্রেরণা জুগিয়েছে বিভিন্ন বিপ্লবীদের সে-সব কথাই আছে এখানে । নলিনীকিশোর গুহ, জীবনতারা হালদার, গণেশ ঘোষ, বীণা দাস প্রভৃতি বিপ্লবীদের সাক্ষাৎকার আছে এ-গ্রন্থে ।

অরবিন্দ পোদ্দার লিখেছেন, 'রবীন্দ্রনাথ । রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব' । লেখক দেখাতে চেয়েছেন যে জমিদাররূপে ঔপনিবেশিক আর্থনীতিক-রাজনৈতিক কাঠামোয় রবীন্দ্রনাথের অবস্থান নির্দিষ্ট; অন্য দিকে, কবিরূপে তাঁর অস্তিত্ব কোনো সীমা দ্বারা চিহ্নিত নয়, সেখানে দুঃখজর্জর ভারতবর্ষের স্বপ্ন-অধ্যাসের

সঙ্গে অন্বিত থাকা তার ঐকান্তিক আকৃতি । তাঁর অবস্থান, জ্ঞাতসারেই হোক আর অজ্ঞাতসারেই হোক, তাঁর চিন্তা-মননকে প্রভাবিত, সম্ভবত নিয়ন্ত্রিতও করেছে । পক্ষান্তরে, ঐ নিয়ন্ত্রণের সীমা ও শাসন লঙ্ঘন করাতেই তাঁর কবি-সত্তার স্ফূর্তি । এই দ্বৈত-সত্তার পারস্পরিক সম্পর্কে, বৈপরীত্য, বিক্ষোভ ও ঈপ্সিত সংশ্লেষের মধ্য দিয়ে তাঁর রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের যে বিকাশ—কাব্য-গল্প-প্রবন্ধ-উপন্যাসেও তার প্রতিফলন ঘটেছে । এ-সবই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়। যদিও আদিত্য ওহদেদার তাঁর 'রবীন্দ্র-বিদূষণ ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে এই মতামতের সমালোচনা করেছেন । তাঁর মনে হয়েছে লেখক যে শুধু রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে নানাভাবে ত্রুটিপূর্ণ দেখতে চেয়েছেন তাই নয়, কবিকে নানাভাবে অভিযুক্ত করেছেন তিনি, তাঁর ব্যক্তিত্বে কলঙ্ক লেপন করেছেন ।

রবীন্দ্রনাথের সমাজচিন্তার বিবর্তনের ধারার অনুসন্ধানে এ-যুগের রবীন্দ্র-সমালোচকরা অনেক বেশি সচেতন । বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবনের প্রকল্প 'রবীন্দ্রনাথের চিন্তা-জগৎ'-এর তৃতীয় গ্রন্থ 'সমাজচিন্তা' । লেখকের সুচিন্তিত বৃহৎ ভূমিকা সমেত কালানুক্রমিক সমাজচিন্তা সংক্রান্ত রবীন্দ্র রচনার সংকলন রয়েছে এখানে । সম্পাদনা ও সংকলন করেছেন সত্যেন্দ্রনাথ রায় । রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় সমাজতন্ত্র নিয়েও গ্রন্থ রচিত হয়েছে ।'রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ ও সমাজ', 'রবীন্দ্রনাথ ধর্ম ও সমাজ', 'সমাজ : প্রগতি : রবীন্দ্রনাথ' অথবা 'সাম্প্রতিককালের সমাজ রাজনীতি ও রবীন্দ্রনাথ'— এই বিষয়েও সম্পূর্ণ গ্রন্থ রচিত হয়েছে ।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা নিয়ে এ পর্বে অন্তত দশটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে । এর মধ্যে যেমন দীর্ঘ ভূমিকাসহ সত্যেন্দ্রনাথ রায়ের রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা-বিষয়ক সংকলন আছে, তেমনি রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, ছোটোগল্পে রবীন্দ্রশিক্ষার উপাদান বিষয়ে আলোচনাও আছে । এর আগের পর্বে 'রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা চিন্তা' নিয়ে মূল্যবান গ্রন্থ লিখেছেন প্রবোধচন্দ্র সেন । রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তার মৌলিকতা, অন্যান্য দেশের শিক্ষাবিদ্‌দের চিন্তাভাবনার সঙ্গে রবীন্দ্রচিন্তার তুলনামূলক আলোচনা করেছিলেন সুনীলচন্দ্র সরকার 'রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন ও সাধনা' গ্রন্থে । 'রবীন্দ্রশিক্ষাচিন্তার আলোকে জাতীয় শিক্ষানীতি' নামে গ্রন্থ লিখেছেন জ্যোতির্ময় ঘোষ । তাঁর মনে হয়েছে যে রবীন্দ্রচিন্তার আলোকে কেন্দ্রীয় সরকারের জাতীয় শিক্ষানীতি 'সাংঘাতিক' । কারণ "ভারতবর্ষের ইতিহাসের বাস্তব গতিপ্রকৃতি এবং মূল লক্ষ্য ও অভিপ্রায় "বৈচিত্র্যের মধ্যেই ঐক্যের" বস্তুনিষ্ঠ ও অনিবার্য যে সত্যের গভীরে নিহিত, কেন্দ্রীয় সরকারের জাতীয় শিক্ষানীতি সেই মৌলিক সত্যকেই, সেই বাস্তব পরিস্থিতিটিকেই অস্বীকার করে । পক্ষান্তরে ভারতবর্ষের ইতিহাসের এই সত্যটিকেই বস্তুনিষ্ঠ ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ শুধু নির্ণয়ই করেননি, তাকে গ্রহণ ও পরিপুষ্ট করেছেন" ।

রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান চিন্তা বিষয়ে অন্তত পাঁচটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে । ক্ষুদিরাম দাস রবীন্দ্র কল্পনায় বিজ্ঞানের অধিকার নিয়ে আলোচনা করেছেন । বিভিন্ন কবিতায় বিজ্ঞানের অনুষঙ্গ কীভাবে আসছে । রবীন্দ্রসাহিত্যে বিজ্ঞানের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেছেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য । দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'কালের মন্দিরা : আধুনিক বিজ্ঞান ও রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে দেখিয়েছেন বিজ্ঞান বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ কতখানি সজাগ ও সচেতন ছিলেন । পরমাণুর অধিকাংশ কেন্দ্রে নিউট্রন নামক যে তড়িৎবর্জিত মৌলকণাটি থাকে, গবেষণাগারে তার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় ১৯৩২-এ । আবার ঐ বছরই ধনতড়িৎযুক্ত কণা পজিট্রনও আবিষ্কার হয় । ১৯৩৭-এ প্রকাশিত 'বিশ্বপরিচয়ে' এ দুটি কণা সম্বন্ধেই আলোচনা আছে— আবার ১৯৩৭

সালের জ্যোতিপদার্থবিজ্ঞানের পরীক্ষার খবর দিচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ ১৯৩৯ সালের নতুন সংস্করণে। এ ছাড়াও এ-বিষয় নিয়ে গ্রন্থ আছে অমিয়কুমার মজুমদার এবং পরিমল গোস্বামীর।

পাঁচ

রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা এক অপার বিস্ময়ের জগৎ গবেষকদের কাছে। কবির মন কি কখনো অশুভ আর অমঙ্গলস্পৃষ্ট হয়ে রূপমিতির অন্য এক পৃথিবী খুঁজে নিয়েছিল অথবা সাহিত্যের অখণ্ড বিশ্বাসের জগৎ থেকে অপসৃত হয়েছেন তিনি কখনো যার প্রকাশ এই চিত্রকলায়— এমত সব প্রশ্ন উঠেছে চিত্রকর রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে।

শোভন সোম রচিত 'তিন শিল্পী' গ্রন্থে চিত্রকর রবীন্দ্রনাথ নিয়ে আলোচনা আছে। রবীন্দ্রনাথ কেন বিশ্বভারতীতে কলাভবন স্থাপন জরুরি মনে করেছিলেন এবং তিনি নিজে কেনই বা ছবি আঁকতে গেলেন —এই প্রশ্নের সঙ্গে নন্দলাল, রবীন্দ্রনাথ ও রামকিঙ্করের রচনায় বিশ্লেষণাত্মক আলোচনার সূত্রে তাঁদের বিশিষ্টতা ও আধুনিক শিল্পে তাঁদের ভূমিকা চিহ্নিত করা এ-গ্রন্থের লক্ষ্য।

রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলার সঙ্গে তাঁর সাহিত্যের সম্বন্ধ বিচার নিয়ে মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এ-গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের ছবি আঁকার ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হয়েছে। এরপর দুটি ধারায় ছবির আলোচনা—বিষয়ভিত্তিক ও আঙ্গিকগত। আঙ্গিকের আলোচনাসূত্রে য়ুরোপীয় শিল্প-আন্দোলনের দুটি তরঙ্গের কথা আছে— 'এক্সপ্রেশনিজম ও রবীন্দ্রনাথ' এবং 'অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট ও রবীন্দ্রনাথ'। একই সঙ্গে আলোচনা রয়েছে রবীন্দ্র-চিত্র ও রবীন্দ্রসাহিত্যের তুলনামূলক বিচার নিয়ে। বিদেশে রবীন্দ্র-চিত্রকলার নানা তথ্য ও বিশেষজ্ঞের মত সংগ্রহ করেছেন 'আর্টিষ্ট রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে দিলীপ মালাকার। এ-বিষয় নিয়ে মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছেন সত্যজিৎ চৌধুরী 'চিত্রকর রবীন্দ্রনাথ'।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেশ-বিদেশের বহু মনীষীর তুলনামূলক আলোচনাকে কেন্দ্র করে বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ও কালিদাস, রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল নিয়ে গ্রন্থ রচিত হয়েছে। বিদেশের কবি মনীষীদের সঙ্গেও প্রতিতুলনার সূত্রে রচিত হয়েছে বহু গ্রন্থ —দান্তে গ্যেটে রবীন্দ্রনাথ, টলস্টয় গান্ধী রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ওয়ার্ডসওয়ার্থ, রবীন্দ্রনাথ ও দীনবন্ধু এন্ড্রুজ, রবীন্দ্রনাথ ও পিয়র্সন, রবীন্দ্রনাথ ও রোটেনস্টাইন প্রভৃতি।

বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সমালোচনার তুলনামূলক আলোচনা করেছেন সত্যেন্দ্রনাথ রায়। রবীন্দ্রনাথ-বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পর্কের নানা প্রসঙ্গে পর্যালোচনা আছে অমিত্রসূদন ভট্টাচার্যের 'অন্যোন্যদর্শন বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে। এ ছাড়া বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বঙ্কিমচন্দ্রে'র সংকলক তিনি। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ নিয়ে গোপালচন্দ্র রায়ও পূর্বে গ্রন্থ রচনা করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের সম্পর্ক নিয়ে জিজ্ঞাসা এ কালে প্রাধান্য পেয়েছে। এ বিষয়ে অন্তত ছ'টি গ্রন্থ রচিত হয়েছে। অমিতাভ চৌধুরী লিখেছিলেন 'কবি ও সন্ন্যাসী'। এ ছাড়াও আছে 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন রবীন্দ্রনাথ' অথবা 'চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ' নামে গ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী নিয়েও অন্তত ছটি গ্রন্থ আছে। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রও গবেষকদের একটি প্রিয় বিষয়। অন্তত পাঁচটি

গ্রন্থ রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে ।

রবীন্দ্র-বিষয়ক কিছু উজ্জ্বল চিন্তার নিদর্শন পাওয়া যায় ভবতোষ দত্তের 'রবীন্দ্রচিন্তা চর্চা' এবং 'রবীন্দ্র সাহিত্য প্রসঙ্গ' গ্রন্থ দুটিতে । রবীন্দ্রনাথের মানবিকতাবোধ, কাব্যবোধ, আধ্যাত্মিকতাবোধ এই-সব মৌল বিষয়ের স্থানাঙ্ক নির্ণয়ে রবীন্দ্রব্যক্তিত্বের স্বরূপ নির্ণয় করেছেন লেখক 'রবীন্দ্রনাথের সত্যানুসন্ধান' প্রবন্ধে ।'কার্ল এরিখ হ্যামারগ্রেন' লেখাটি একটি বিরলচর্চিত বিষয় । রবীন্দ্রসাহিত্যে পাঠে প্রবেশের বোধের সীমারেখা তৈরি করেছেন লেখক তাঁর 'রবীন্দ্রসাহিত্য প্রসঙ্গ' গ্রন্থে । এখানে চিন্তাঋদ্ধ প্রবন্ধ 'রবীন্দ্রকাব্য পাঠ' ও 'রবীন্দ্রনাটকের নায়ক' । এ ছাড়াও রয়েছে 'পাউনড-রবীন্দ্রের কাব্যদ্বন্দ্ব' এবং 'রবীন্দ্রকাব্যে ছন্দোমুক্তি' ।

প্রেমচন্দ, শরৎচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ নিয়ে আলোচনা করেছেন জ্যোতির্ময় ঘোষ তাঁর 'সত্য যে কঠিন' গ্রন্থে । এ ছাড়াও আছে, 'ভদ্রলোক, শ্রমজীবী ও রবীন্দ্রনাথ' বা 'রবীন্দ্র-উপন্যাসের দ্বন্দ্ব ও বস্তুভূমি' নামে প্রবন্ধ । লেখক এ গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে মার্কসীয় দ্বন্দ্বমূলক-পদ্ধতির একটি প্রধান লক্ষণ যে ক্ষুদ্রতম থেকে বৃহত্তম বস্তু— সমগ্র প্রকৃতিই প্রতিনিয়ত আবির্ভূত ও তিরোহিত হচ্ছে, প্রতিমুহূর্তেই পরিবর্তন সংঘটিত হচ্ছে, সকল বস্তুই নিরবচ্ছিন্ন গতি ও রূপান্তরের অবস্থায় আছে— এই প্রধান লক্ষণটিও রবীন্দ্রসাহিত্যে আদ্যন্ত অনুস্যূত হয়ে আছে । কারণ রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য রচনায় নিরবচ্ছিন্ন গতির এই তত্ত্বটি পরিস্ফুট ।

'জাতীয় সংহতি ও রবীন্দ্রনাথ', 'রবীন্দ্রনাথ ও যুগসংকট'— এই-সব বিষয় নিয়ে মূল্যবান আলোচনা করেছেন উজ্জ্বলকুমার মজুমদার তাঁর 'নবীন রাজা' গ্রন্থে । এ ছাড়া এ গ্রন্থে আছে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির ঐতিহাসিক ধারার পর্যবেক্ষণ । সেখানে তাঁর সৃষ্টির ভেতর থেকে প্রাচীন কোনো মিথকে বেছে নিয়ে তার ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করে সেখানে তার ঐতিহাসিক ও সামাজিক তাৎপর্য দেখিয়েছেন লেখক ।

রবীন্দ্রচিন্তা চর্চার একটি নতুন সংযোজন হয়েছে 'আধুনিক দর্শন ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে । রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে অস্তিত্ববাদী দর্শনের একটি তুলনামূলক আলোচনা করেছেন লেখক । এ ছাড়া এ গ্রন্থে পাশ্চাত্য চৈতন্যবাদী দর্শনের পটভূমিকায় রবীন্দ্র-চিন্তার বিশ্লেষণ করেছেন লেখক ।

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "ভারতবর্ষের চিরকালের যে চিত্ত সেটার আশ্রয় সংস্কৃত-ভাষায় । এই ভাষার তীর্থপথ দিয়ে আমরা দেশের চিন্ময় প্রকৃতির স্পর্শ পাব ।" রবীন্দ্ররচনায় এই সংস্কৃতের ব্যবহার এবং প্রভাব বিষয়ে আমরা অবহিত । কিন্তু টীকা-ভাষ্য স্বীকৃত মূল সংস্কৃতে সাহিত্যের পরম্পরাগত অর্থ ও তাৎপর্য রবীন্দ্রনাথ যথাযথ অনুসরণ করেছেন কতদূর ? কোথায় বা তার ব্যাখ্যা একান্ত তাঁর নিজস্ব অথবা কোথায় ভিন্ন ভিন্ন শ্রুতিকে কবি রূপান্তরে একই সঙ্গে যুক্ত করেছেন— এ-সবের অনুপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন সুখময় ভট্টাচার্য তাঁর 'সংস্কৃতানুশীলনে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে । পম্পা মজুমদারের 'রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস' গ্রন্থও এ বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য । কিন্তু তাঁর পরিধি-নির্দেশ ছিল— তর্কাতীত বিষয়গুলির উপস্থাপন এবং সমস্ত বিতর্কণীয় ও সন্দিগ্ধ বিষয়কে সযত্নে পরিহার । সুখময় ভট্টাচার্য বিতর্কণীয় বিষয়গুলির উপস্থাপন করেছেন এবং রবীন্দ্রনাথ কোথায় মূলানুগ, কোথায় বা তাঁর বিচ্যুতি ঘটেছে মূল গ্রন্থের অর্থ থেকে সে বিষয়েও মন্তব্য করেছেন । রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধ বিষয় নিয়ে স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন সুধাংশুবিমল বড়ুয়া ও রাধারমণ জানা । 'রবীন্দ্রনাথ ও ভারতীয় সাহিত্য'

নামে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন সুধাময় চট্টোপাধ্যায় । পাঁচটি পরিচ্ছেদে সম্পূর্ণ এই গ্রন্থের শেষ দুটি অধ্যায় যথাক্রমে 'রবীন্দ্রনাথ ও ওড়িয়া সাহিত্য' এবং 'রবীন্দ্রনাথ ও অসমীয়া সাহিত্য' । এর আগে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে তিনি হিন্দি, মারাঠী, গুজরাতী, কন্নড়, তেলুগু, তামিল এবং উর্দু ভাষায় রবীন্দ্রানুসরণ নিয়ে আলোচনা করেছেন । রবীন্দ্রনাথ ও ভারতীয় সাহিত্য নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার সুযোগ রয়েছে । ভবিষ্যতে গবেষকদের দৃষ্টি এদিকে পড়বে বলে আশা করা যায় ।

ছয়

১২৯১ সালের ৫ মাঘ সিটি কলেজ হলে রবীন্দ্রনাথ রামমোহন রায় সম্পর্কে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন । এই প্রবন্ধ ১২৯১ মাঘ সংখ্যায় ভারতীতে প্রকাশিত হয় । ১২৯১ সালের ফাল্গুন সংখ্যায় 'প্রবাহ' পত্রিকায় মহেন্দ্রনাথ রায়ের প্রবন্ধ ছাপা হয়, "ভারতী পত্রিকায় প্রচারিত শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রামমোহন রায়' প্রস্তাবের সমালোচনা" । সেখানে লেখক মন্তব্য করেছেন যে রবীন্দ্রনাথের কীর্তিনাশা প্রবৃত্তি রামমোহন রায়ের চরিত্র হনন করেছে আর দ্বিতীয় অভিযোগ তিনি অক্ষয় কুমার দত্তের 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' গ্রন্থ থেকে ভাব ও ভাষা চুরি করেছেন । রবীন্দ্রবিরোধী সমালোচনার এই সূচনা পর্ব । এর পর আরো একশো বছর ধরে তিনি অভিযুক্ত হয়েছেন বার বার । এ-বিষয় নিয়ে আলোচনা আছে সুজিতকুমার সেনগুপ্তর 'জ্যোতির্ময় রবি ও কালো মেঘের দল' এবং আদিত্য ওহদেদার -এর 'রবীন্দ্র-বিদূষণ ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে । হয়তো সে বিদ্রূপ-বিদূষণের পরিমাণ এখন ক্রমান্বয়ে ক্ষীণতর কিন্তু লুপ্ত নয় । তাই রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত দুঃখ করে জানিয়েছিলেন যে রবীন্দ্রনাথের ১২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে আমরা কম ঘটা করিনি । কত সেমিনার, কত বক্তৃতা, কত পদযাত্রা কিন্তু কোনো শ্রমসাধ্য কাজ আমরা করিনি । রবীন্দ্রবিদ্যার কোনো নতুন দিগন্তের দিকে আমরা অগ্রসর হইনি । কোনো নতুন পথনির্দেশ করার কথা ভাবিনি । রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে নতুন কথা দু একজন বলেননি এমন নয় । কিন্তু সে কথার সার এই যে, "রে মূঢ় বাঙালি, তুমি রবীন্দ্রনাথকে যত বড় কবি বলে ধরে নিয়েছ তিনি তত বড় কবি ছিলেন না । তাঁর নোবেল পুরস্কার ছিল এক ধরণের বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ার মতো" । (রবীন্দ্রচর্চার ভবিষ্যৎ)

'দেশ' পত্রিকার ৩৪তম বর্ষ ৪০সংখ্যায় নীরদচন্দ্র চৌধুরী লিখেছিলেন 'দুই রবীন্দ্রনাথ' । দেশী ও বাঙালি রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর অন্য এক রবীন্দ্রনাথে রূপান্তরিত হয়েছেন ।" এই রবীন্দ্রনাথ প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন ১৯১৩ সনের ২৩ নভেম্বর শান্তিনিকেতনে । কিন্তু বাঙালি ছাড়া অন্য কিছু হওয়া তাঁর ক্ষমতার বাইরে ছিল ফলত কৃত্রিম ও অভিনেতা রবীন্দ্রনাথের জন্ম । এ ছাড়াও তিনি মন্তব্য করেন যে ১৯২৬ সালে প্যারিসে ছাপা ভিক্টর হুগোর ছবির বই ১৯২৭ সালে শান্তিনিকেতনে আসে । সেই বই দেখে রবীন্দ্রনাথও ১৯২৮ সালে ছবি আঁকতে শুরু করেন । তাঁর ভাষায়, "কবি ভিক্টক হুগো যদি চিত্রকর হইতে পারিলেন আমি কবি রবীন্দ্রনাথ চিত্রকর হইব না কেন ?" কিন্তু তিনি খেয়াল করলেন না যে ১৯০০ সালেই জগদীশ বসুকে লেখা এক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "শুনে আশ্চর্য হবেন Sketch Book নিয়ে বসে বসে ছবি আঁকছি । কিন্তু কুৎসিত ছেলের প্রতি মার যেমন অপূর্ব স্নেহ জন্মে, তেমনি যে বিদ্যেটা ভাল আসে না, সেইটের ওপরেই অন্তরের টান থাকে ।" সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে তাঁর গ্রন্থ 'আত্মঘাতী রবীন্দ্রনাথ' । বস্তুত নীরদ চন্দ্র চৌধুরীর সমালোচনা

পড়লে বোঝা যায় যে রবীন্দ্রনাথ-বিষয়ক যাবতীয় তথ্য তাঁর আয়ত্তে নেই, ব্যক্তিগত কিছু ধারণার বিচার-বিশ্লেষণ তাঁর কাছে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ।

সুভো ঠাকুরের 'বিস্মৃতি চারণায়'ও রবীন্দ্রনাথকে বিষয়সম্পত্তি বিষয়ে লোভী ও স্বার্থপর প্রমাণ করা হয়েছে । 'রবীন্দ্রবিতর্ক' গ্রন্থে গোপালচন্দ্র রায় সুভো ঠাকুরের প্রতিটি অভিযোগের উত্তর দিয়েছেন । দ্বারকানাথের উইলের অংশ উদ্ধার করে তিনি দেখিয়েছেন সুভো ঠাকুরের 'বিস্মৃতিচারণা'র সঙ্গে বাস্তবের কোনোই মিল নেই ।

প্রতাপ নারায়ণ বিশ্বাস 'রবীন্দ্রনাথের রহস্য গল্প ও অন্যান্য প্রবন্ধ' গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন গল্প প্রায় প্রতিটি ডিটেলে 'পো'র আক্ষরিক অনুবাদ । তাঁর রক্তকরবী সংক্রান্ত অভিযোগের উত্তর দিয়েছেন শঙ্খ ঘোষ সে কথা আগে আলোচনা করা হয়েছে ।

'স্বভাবত স্বতন্ত্র রবীন্দ্রনাথ' লিখেছেন নিত্যপ্রিয় ঘোষ । স্বাতন্ত্র্য অর্থে বিচ্ছিন্নতা, বিযুক্তি বোঝালে রবীন্দ্রনাথের জীবনে যোগটাই বড়ো কথা, যোগের চেষ্টাই তাঁর প্রবল । কিন্তু তবুও তাঁর জীবনে বিযুক্তির ঘটনা ঘটেছে বারে বারেই । রবীন্দ্রনাথের এই বিযুক্তির অধ্যায়গুলি, লেখকের মতে, সাধারণত এড়িয়ে যাবার চেষ্টা হয় অথবা বিচ্ছিন্নভাবে দেখা হয় । এ ঘটনাগুলোকে দেখা হয় রবীন্দ্রনাথেরই দৃষ্টিকোণ থেকে । লেখক তাই অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে সেই-সব ঘটনার বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন । যেমন রবীন্দ্রনাথ ও বিপিনচন্দ্রের সম্পর্ক নিয়ে তাঁর মন্তব্য— "মনে হয় সাহিত্য সমালোচনার চাইতে রাজনীতিই বেশি কাজ করেছিল রবীন্দ্রনাথের বিপিনচন্দ্র সম্বন্ধে বিমুখ হতে" ।

নিত্যপ্রিয় ঘোষের অন্য গ্রন্থ 'মুক্ত একক রবীন্দ্রনাথ' । রবীন্দ্রসাহিত্য ও মার্কসীয় নন্দনতত্ত্ব এই দুটি বিষয় এই গ্রন্থের মূলে রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের মার্কস্‌বাদী ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন নি । কিন্তু মার্কস্‌বাদ সম্পর্কে কতটুকু অবহিত ছিলেন তিনি ? তাঁর জীবৎকালে বাংলা সাহিত্য আলোচনায় মার্কস্‌বাদ সেভাবে ব্যাখ্যা করা হত, সেটা কি স্পষ্ট মার্কস্‌বাদ ? মার্কস্‌বাদী নন্দনতত্ত্ব দিয়ে রবীন্দ্রসাহিত্য কি ব্যাখ্যা করা যায়— এই-সব প্রশ্নেরই উত্তর খুঁজেছেন লেখক তাঁর গ্রন্থে ।

এ-লেখকের আপাতত শেষ গ্রন্থ 'শুকনো পাতা মলিন কুসুম' । রবীন্দ্রসাহিত্যপাঠে আমরা অনেক সময়ে অসংগত আশা পোষণ করি, ফলে রচনার সুর আর স্বর বিস্তৃতভাবে আসে আমাদের কাছে । কখনো ভুল খবরের উপর ভিত্তি করে আমরা কবিতার বা গল্পের ব্যাখ্যা করি । লেখক চেয়েছেন এই গ্রন্থে 'নতুন তথ্যের ভিত্তিতে রবীন্দ্ররচনার কোনো কোনো দিকের স্পষ্টতর আর সত্য ব্যাখ্যা' ।

শুধু রবীন্দ্রস্তুতিতেই আমরা তৃপ্ত নই। আজ তাঁর মৃত্যুর পাঁচ দশক উত্তীর্ণ হয়ে যাবার পরও তাঁকে নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই আমাদের । তা হলে কি ভাবতে হবে কোনো তেমন স্থায়ী মূল্য এখনো গড়ে ওঠে নি তাঁর ? ঋষি বা গুরুদেব বলে নয় অথবা ভক্ত অভক্তের প্রশ্ন নয়, কেন তাঁর প্রতি ঈষৎ অশ্রদ্ধায় আমরা নীরব থাকতে পারি না— যেন সে ঐতিহ্যের অন্য নাম । তাঁর উত্তরাধিকার আমাদের সহজাত— সে গর্ব আমাদের সকলের । তাই, তাঁর প্রতি কোনো অবিচার মন্তব্যে আমরা ক্ষুব্ধ হই, বিচলিত হই । প্রতিবাদ করা কর্তব্য মনে করি। আর এই-সব বিতর্কের মধ্য থেকে তিনি উজ্জ্বলতর হয়ে ক্রমান্বয়ে নতুন অর্থমাত্রায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেন ।